বাংলা একাডেমী

বাংলা সাহিত্যকোষ

১

বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রতিনিধিত্বশীল কোষগ্রন্থ। এর ব্যাপ্তি আদিকাল থেকে আধুনিক কালের ২০০০ সাল পর্যন্ত।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যে সব বাঙালি লেখকের জন্ম তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থ ও উল্লেখযোগ্য রচনার পরিচিতি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যে সব দেশি ও বিদেশি মনীষীর জীবন ও কর্ম বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের পরিচিতিও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাহিত্য, ধর্ম, দার্শনিক তত্ত্ব; পৌরাণিক চরিত্র; সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ের পরিচিতিও উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রতিটি ভুক্তির শেষে সংকলকদের নাম সংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যকোষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যকোষ

প্রথম খণ্ড : স্বরবর্ণ অংশ

সম্পাদনা

সেলিনা হোসেন

নূরুল ইসলাম

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যকোষ
প্রথম খণ্ড : স্বরবর্ণ অংশ

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪০৮/আগস্ট ২০০১

বাএ ৪২০০
[২০০১–২০০২ গসফো : সংকলন ১]

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
সেলিনা হোসেন
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
যমুনা প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং কোং
৮/৩ নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত টাকা মাত্র

BANGLA ACADEMY BANGLA SAHITYAKOSH : Pratham Khanda [Encyclopedia of Bengali Literature : Vol. I]. Edited by Selina Hossain and Nurul Islam. Published by Selina Hossain, Director, Research Compilation and Folklore Division. Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : August 2001. Price : Tk. 300.00 only.

ISBN 984-07-4200-0

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমী 'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধান' নামে একটি অভিধান সংকলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর প্রথম ভাগ 'পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সম্পাদনায় ১৯৬৫ সালে, দ্বিতীয় ভাগ 'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে'র স্বরবর্ণ অংশ ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় ১৯৭৪ সালে ও ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর সম্পাদনায় ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ভাগ 'বাংলা সাহিত্য কোষে'র প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৬৬ সালে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি উপসঙ্ঘ গঠিত হয়। ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, ড. আহমদ শরীফ, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, শাহেদ আলী, মিয়া মহম্মদ আবদুল হামিদ প্রমুখ এর সদস্য ছিলেন। উপসঙ্ঘ কোষগ্রন্থটির সংকলন ও সম্পাদনার একটি নীতি-পদ্ধতি তৈরি করেন। অতঃপর উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি কারণে এর কাজ থেমে যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর প্রকল্পটি পুনরায় চালু করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংকলন ও সম্পাদনার নীতিমালা নতুন আঙ্গিকে গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাপূর্বকালের উপসঙ্ঘ পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত উপসঙ্ঘের সদস্য ছিলেন ড. আহ্‌মদ শরীফ, কবি আবদুল কাদির, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, আবদুল হক ফরিদী, মুহম্মদ মহিয়ুদ্দীন, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ ও ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী। এ উপসঙ্ঘ কর্তৃক প্রণীত রূপরেখা অনুসারে ১৯৭৮ সালে ভুক্তি রচনা শুরু হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তাবৃন্দ ভুক্তি সংকলন করেন। এছাড়া উপসঙ্ঘের কয়েকজন সদস্যও সংকলক ও সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। এভাবে কোষগ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের অগ্রগতি মাঝপথে পৌছার অনেক আগেই নানা ধরনের জটিল সমস্যার কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘ আঠারো বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৯৮ সালে প্রকল্পটি পুনরায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবার গ্রন্থটির নাম স্থির করা হয় 'বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যকোষ'। গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক সেলিনা হোসেন ও সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুল ইসলামের উপর এর সম্পাদনার ভার অর্পিত হয়। অতঃপর তাঁরা কোষগ্রন্থটির প্রথম খণ্ড (স্বরবর্ণ অংশ) প্রকাশের লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, সৃষ্টিশীল লেখক ও বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তাদের নতুনভাবে ভুক্তি সংকলনের জন্য অনুরোধ করা হয়। তাতে আশানুরূপ সাড়াও পাওয়া যায়। নতুন ভুক্তি সম্পাদনা ও পুরাতন ভুক্তি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে উভয়ের সমন্বয়ে আলোচ্য খণ্ডের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করা হয়। এর ফলস্বরূপ 'বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্য কোষ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। আমরা আনন্দিত, দেরিতে হলেও বইটির একটি খণ্ড প্রকাশ করতে পেরেছি। সম্পাদক, সংকলক ও প্রকাশনা কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য-নিষ্ঠা ও উৎসাহের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

এ কোষগ্রন্থের ব্যাপ্তি প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে আধুনিক কালের ২০০০ সাল পর্যন্ত। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যেসব লেখকের জন্ম তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থ ও উল্লেখযোগ্য রচনার পরিচিতি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিককালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা বাঙালির ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে তা-ও সংকলিত হয়েছে।

এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে :

www.pathagar.com

১. বাঙালি কবি-সাহিত্যিক ও গীতিকারদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ;

২. বিশিষ্ট দেশি ও বিদেশি দার্শনিক, চিন্তাবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ, ধর্মবেত্তা, রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যাঁদের জীবন ও কর্ম বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ;

৩. বাংলা ভাষার প্রতিনিধিত্বশীল গ্রন্থ—কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, গবেষণা-প্রবন্ধ, সমালোচনা, সংকলন-সম্পাদনা, শিশু-সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, রসরচনা, জীবনী, স্মৃতিকথা, শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ;

৪. বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রতিনিধিত্বশীল গ্রন্থের পরিচিতি ;

৫. বাংলা ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, সাহিত্যের রূপতত্ত্ব-রসতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্বের সংজ্ঞার্থ বর্ণনা এবং প্রধান প্রধান ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতি ;

৬. বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাহিত্য, ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্ব ; ধর্মীয় ও জাতীয় ঐতিহ্য ও পৌরাণিক চরিত্র ; ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব ; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ; ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ; নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ; লোকসাহিত্য ও লোকতত্ত্ব ; সাহিত্য-পত্রিকা ও সংবাদপত্র ইত্যাদির পরিচিতি।

তথ্যসমূহ যতদূর সম্ভব নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো সহৃদয় পাঠক যদি ভুলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তা হলে আমরা বাধিত হবো। অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য এমন অনেক ভুক্তি অসতর্কতা বা ভুলবশত বাদ পড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

ব্যঞ্জনবর্ণ অংশের ভুক্তিগুলো কয়েক খণ্ডে প্রকাশের কাজ অব্যাহত থাকবে। সেগুলো প্রকাশিত হলে কোষ গ্রন্থটির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যাবে। তখন এর দোষ-গুণ বিচার করা সহজ হবে।

এ গ্রন্থের সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ড. রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

তারিখ
২ আগস্ট ২০০১

www.pathagar.com

সংকলক পরিচিতি ও নাম সংক্ষেপ

অলকা নন্দিতা কবি ও সমালোচক। এনজিও কর্মী	অ.ন.
আজহার ইসলাম প্রাবন্ধিক ও গবেষক। প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা	আ.ই.
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক (প্রয়াত), টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	আ.ন.ম.ব.র.
আনোয়ারা খাতুন গবেষক। স্কুল শিক্ষিকা	আ. খা.
আবদুল গফুর গবেষক। প্রাক্তন উপপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা	আ.গ.
আবদুল জলিল ভূঁইয়া গবেষক। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীকাইল কলেজ, কুমিল্লা	আ.জ.ভূঁ.
আবুল হাসান শামসুদ্দিন গবেষক। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা	আ.হা.শা.
আবু সৈয়দ গোলাম দস্তগীর কবি। প্রাক্তন পরিচালক (শিক্ষা), বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	আ.সৈ.গো.দ.
আলমগীর জলিল প্রাবন্ধিক ও গবেষক। প্রাক্তন উপপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা	আ.জ.
আলম তালুকদার শিশুসাহিত্যিক। সরকারি কর্মকর্তা	আ.তা.
আহমদ কবির প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়., ঢাকা	আ.ক.
আহমাদ মাযহার প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক। ম্যানেজার, শুকতারা প্রিন্টার্স লিঃ, গাজীপুর	আ.মা.
করুণাময় গোস্বামী গবেষক ও প্রাবন্ধিক। প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি কলেজ	ক.গো.
কাজী রোজী কবি ও সমালোচক। সরকারি কর্মকর্তা	কা.রো.
খালেক বিন জয়েনউদদীন ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক। কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার	খা.বি.জ.উ.
গৌরাঙ্গ মণ্ডল পিএইচডি গবেষক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা	গৌ.ম.
জোবাইদা নাসরীন গবেষক। কর্মকর্তা, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ প্রকল্প', বাংলা একাডেমী, ঢাকা	জো.না.
জ্ঞানবিকাশ বড়ুয়া প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। প্রাক্তন কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক	জ্ঞা.ব.
ড. মাসুদুজ্জামান কবি ও প্রাবন্ধিক। সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	ড. মা.জা.
ড. শাহীদা আখতার গবেষক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ	ড.শা.আ.
তনুজা শর্মা প্রাবন্ধিক। এনজিও কর্মী	ত.শ.
নূরুল ইসলাম গবেষক ও প্রাবন্ধিক। উপপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা	নূ.ই.
পাপড়ি রহমান গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। সম্পাদক, 'ধূলিচিত্র'	পা.র.
প্রীতিকুমার মিত্র গবেষক। পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	প্রী.মি.
বিপ্রদাশ বড়ুয়া কথাসাহিত্যিক। প্রাক্তন উপপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা	বি.ব.
বিশ্বজিৎ ঘোষ গবেষক ও প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	বি.ঘো.

www.pathagar.com

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী গবেষক। প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বদরুন্নেসা কলেজ, ঢাকা — ম.চৌ.

মনসুর মুসা গবেষক ও প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা — ম.মু.

মনিরউদ্দীন ইউসুফ কবি ও অনুবাদক। সম্পাদক (প্রয়াত), 'কৃষি সমাচার', কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, ঢাকা — ম.ই.

মাঈনউদ্দিন জাহেদ কবি। প্রভাষক (বাংলা), বেসরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম — মা.জা.

মাজেদা সাবের গবেষক। প্রাক্তন অধ্যাপক, সরকারি কলেজ — মা.সা.

মালেকা বেগম প্রাবন্ধিক ও গবেষক। নারী-নেত্রী — মা.বে.

মাহবুব আজাদ গবেষক। কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা — মা.আ.

মাহবুবুল হক প্রাবন্ধিক ও গবেষক। সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম — মা.হ.

মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক গবেষক। প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা — মু.আ.রা.

মুহম্মদ আবদুল জলিল গবেষক। অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী — মু.আ.জ.

মোহাম্মদ আলমগীর মিয়া গবেষক। কর্মকর্তা, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ প্রকল্প', বাংলা একাডেমী, ঢাকা — মো.আ.মি.

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ কবি ও গবেষক। সম্পাদক : 'উষালোকে' — মো.শা.

রশীদ হায়দার কথাসাহিত্যিক। প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা — র.হা.

রহিমা আখতার কল্পনা কবি ও প্রাবন্ধিক। কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা — র.আ.ক.

শাজাহান ঠাকুর গবেষক। প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), সরকারি কলেজ — শা.ঠা.

শামসুল আরেফিন প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। কর্মকর্তা, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা — শা.আ.

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ভাষা বিশেষজ্ঞ। অধ্যক্ষ (প্রয়াত), সরকারি কলেজ — শি.প্র.লা.

সাজ্জাদ আরেফিন (মোবারক হোসেন) গবেষক ও সম্পাদক। সহপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা — সা.আ.

সুজন বড়ুয়া শিশুসাহিত্যিক। কর্মকর্তা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা — সু.ব.

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাবন্ধিক, গবেষক ও অনুবাদক। অধ্যাপক (প্রয়াত), বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা — সু.মু.

সুব্রত বড়ুয়া কথাসাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখক। পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা — *সু.ব.

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা — সে.হো.

সৈয়দা আইরিন জামান প্রাবন্ধিক ও গবেষক — সৈ.আ.জা.

স্বরোচিষ সরকার গবেষক ও প্রাবন্ধিক। সহকারী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী — স্ব.স.

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী
বাংলা সাহিত্যকোষ

অংশুমান : হিন্দু পুরাণের সূর্যবংশীয় রাজা সগরের পৌত্র। সগররাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করে মহর্ষি কপিলের আশ্রয়ে রাখেন। সগর তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে কপিলের কাছে পাঠান। পুত্রগণ কপিলকে দোষারোপ করলে মহর্ষির যোগানলে তাঁরা ভস্মীভূত হন। তখন সগর পৌত্র অংশুমানকে পাঠান। অংশুমান পাতালে গিয়ে মুনিকে স্তববাক্যে সন্তুষ্ট করে অশ্ব ফিরিয়ে এনে যজ্ঞ সমাপন করেন। পরে জানতে পারেন যে, গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে এনে গঙ্গার জলে সগরপুত্রদের ভস্ম স্পর্শ করাতে পারলে তাঁরা উদ্ধার পাবেন। সগরের মৃত্যুর পর অংশুমান রাজা হন। গঙ্গাকে আনবার জন্য তিনি তপস্যাও করেন, কিন্তু সফল হবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আ. ই

অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না তা অকর্মক ক্রিয়া। যে বাক্যের 'কি' অথবা 'কাকে' প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ কোনো পদ পাওয়া যায় না, সে বাক্যের ক্রিয়াপদটি অকর্মক ক্রিয়া। যথা, আমি নদী তীরে বেড়াই। সে মাঠে খেলে। 'কি বেড়াই', 'কি খেলে', 'কাকে বেড়াই' বা 'কাকে খেলে' প্রশ্নের উত্তর এ বাক্য দুটোতে পাওয়া যায় না। তাই 'বেড়াই' ও 'খেলে' ক্রিয়াপদ দুটো এখানে অকর্মক। ২. ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন বিশেষ্যপদ একই বাক্যে ব্যবহৃত হলে অকর্মক ক্রিয়াও সকর্মক হতে পারে। বাক্যে ব্যবহৃত এরূপ ধাতুজ বা ক্রিয়াজ-বিশেষ্যপদকে সমধাতুজ কর্ম বলে। উদাহরণ : কত রকম 'খেলা'ই তো খেললে। খুব এক 'ঘুম' ঘুমালে। ৩. মূল ধাতুর পরে 'আ' যোগ করে যে প্রযোজক ক্রিয়া তৈরি হয় তা সবসময় সকর্মক। যেমন :

অকর্মক	সকর্মক
বেলা হাসে	বেলা 'রাহেলাকে' হাসায়।
তুমি ঘুম থেকে জাগো।	সে তোমাকে ঘুম থেকে জাগায়।

শি. প্র. লা.

অক্ষয়কুমার দত্ত : লেখক। বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে ১৮২০ সালের ২০ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পিতাম্বর দত্ত। মাতা দয়াময়ী দেবী। পিতাম্বর খিদিরপুর টলিজ নলার কুতঘাটের কেশিয়ার ছিলেন। পনের বছর বয়সে নিমাইমনির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কলকাতার ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমানে নবম শ্রেণী) পাঠকালে পিতার মৃত্যু ঘটলে স্কুল ত্যাগ করেন। ১৮৩৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮৩৯) সদস্য মনোনীত হন। পরের বছর (১৮৪০) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, ১৮৪০) ভূগোল ও পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৪৩) সম্পাদনা (১৮৪৩-১৮৫৫) তাঁর জীবনের এক অনন্যসাধারণ কীর্তি। এতে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেশে বিদ্যাচর্চার এক সুবর্ণ যুগের সূচনা করেন। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ব্রাহ্মধর্ম (১৮২৮) গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ সালে কলকাতা নর্মাল স্কুলের (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত, ১৮৫৫) প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। শিরোরোগে আক্রান্ত হলে ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে শিক্ষকতার কাজ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের আদি স্রষ্টা। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের আদলে বাংলায় বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক রচনার ধারা প্রবর্তন করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভূগোল (১৮৪১), বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ ১৮৫১, ২য় ভাগ ১৮৫৩), চারুপাঠ (১ম ভাগ ১৮৫৩, ২য় ভাগ ১৮৫৪, ৩য় ভাগ ১৮৫৯), ধর্মনীতি (১৮৫৬), ভারতবর্ষীয়

www.pathagar.com

উপাসক-সম্প্রদায় (১ম ভাগ ১৮৭০, ২য় ভাগ ১৮৮৩)। অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ বাংলা শিশু-সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। মধ্য বয়সে দুরারোগ্য শিরোরোগে আক্রান্ত (১৮৫৭) হলে অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। গঙ্গার তীরে বালি গ্রামে বাগান-বাড়ি নির্মাণ করে বাকি জীবন সেখানে কাটান। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, তবে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না। শেষ জীবনে অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন। ১৮৮৬ সালের ১৮ মে বালিতে মারা যান। নূ. ই

অক্ষয়কুমার বড়াল : কবি। কলকাতার চোরাবাগানে ১৮৬০ সালে এক সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালীচরণ বড়াল। আদি নিবাস চন্দননগর। কলকাতার হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইনসিউরেন্স কোম্পানির অফিসে প্রধান কর্মচারীর পদে চাকরি করতেন। শোকাত্মক কাব্য 'এষা' (১৯১২) রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। মৃত পত্নীর স্মৃতিচারণ করে লেখা এ কাব্যে গার্হস্থ্য-জীবনের ও নারী-প্রেমের আলেখ্য ব্যঞ্জনময় ভাষায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭), শঙ্খ (১৯১০) তাঁর অপরাপর কাব্যগ্রন্থ। বাংলা গীতিকবিতার ধারায় অক্ষয়কুমার বড়াল আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। ১৯১৯ সনের ১৯ জুন (৪ আষাঢ় ১৩২৬) কলকাতায় পরলোগ গমন করেন। নূ. ই

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : ইতিহাসবিদ। কুষ্টিয়া জেলার শিমুলিয়া গ্রামে ১৮৬১ সালের ১ মার্চ মাতার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস গুড়নই গ্রাম, রাজশাহী। পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় রাজশাহী দেওয়ানি আদালতে চাকুরি করতেন। মাতা সৌদামিনী দেবী, স্ত্রী হৃদ্‌কমল দেবী (পাবনা জেলার তাঁতিবন্দের জমিদার-কন্যা)। রাজশাহী বোয়ালিয়া সরকারি স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (১৮৭৮), রাজশাহী কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ. (১৮৮০), কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে বি.এ. (১৮৮৩) ও রাজশাহী কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এল. (১৮৮৫) পাস করেন। অতঃপর রাজশাহী আদালতে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। শরৎকুমার রায় ও রমাপ্রসাদ চন্দের সহযোগিতায় রাজশাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' (১৯১০) স্থাপন করেন। এ সমিতির আজীবন পরিচালক ছিলেন। রাজশাহী থেকে ত্রৈমাসিক ঐতিহাসিক পত্রিকা 'ঐতিহাসিক চিত্র' (১৩০৫—১৩০৬) প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। বাংলা ভাষায় বঙ্গদেশ ও বাঙালির ইতিহাস রচনার তিনি অন্যতম পথিকৃত। 'সিরাজদ্দৌলা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। যে সব ইংরেজ ঐতিহাসিক ব্রিটিশ শাসকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বঙ্গের নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নির্দয়, ঔদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারী হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন, অক্ষয়কুমার তাঁর গবেষণার সাহায্যে তাঁদের সে সব বক্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সিরাজদ্দৌলার সত্যনিষ্ঠ জীবনী রচনা করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : সমরসিংহ (১৮৮৩), সিরাজদ্দৌলা (১৮৯৮), সীতারাম রায় (১৮৯৮), মীর কাসিম (১৯০৬), গৌড়লেখমালা (১৯১২), ফিরিঙ্গি বণিক (১৯২২) ও অজ্ঞেয়বাদ (১৯২৮)। রাজসরকার তাঁকে কায়সার-ই-হিন্দ সুবর্ণপদক (১৯১৫) ও সি.আই.ই. উপাধি (১৯২০) প্রদান করেন। ১৯৩০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি (২৭ মাঘ ১৩৩৬) রাজশাহীতে পরলোকগমন করেন। নূ. ই

অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী : কবি ও গীতিকার। ১৮৫০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মিহিরচন্দ্র চৌধুরী। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রদত্ত সুর অনুযায়ী তিনি ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে অক্ষয় চন্দ্রের কয়েকটি গান আছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'উদাসিনী', 'সাগরসঙ্গমে', 'ভারতগাথা' প্রভৃতি। মৃত্যু : ১৮৯৮। ক. গো.

অক্ষয়চন্দ্র সরকার : লেখক। হুগলী জেলার চুঁচুড়া নামক স্থানে ১৮৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস কনকশালী। পিতা কবি ও সাহিত্যসমালোচক

www.pathagar.com

রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার (সাবজজ)। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৬৩ সালে এন্ট্রান্স, হুগলী কলেজ থেকে ১৮৬৫ সালে এফ. এ. ও ১৮৬৭ সালে বি.এ. এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৬৮ সালে ল' পাস করেন। এম.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। কর্মজীবনে প্রথমে বহরমপুরে ও পরে চুঁচুড়ায় ওকালতি করেন। ১৮৭৩ সালে চুঁচুড়া থেকে 'সাধারণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৭ বছর এ পত্রিকা পরিচালনা করেন। 'নবজীবন' পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৮৮৪-১৮৮৯) ছিলেন। দেশি শিল্পোৎপাদন ও স্বায়ত্ত-শাসনোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি তাঁর বিপুল আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। Rent Bill ও Age of Consent Bill (Act X)-এর বিরোধিতা করে বৃটিশবিরোধী মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেন ও স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি জোর দেন। রায়তের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের (চট্টগ্রাম, ১৩১৯) মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩০৪—১৩০৫, ১৩২০) ও ভারত সভার প্রথম যুগ্ম সহ-সম্পাদক (১৮৭৬) পদে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) অধিবেশনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' (১৮৭২) তাঁর প্রথম রচনা 'উদ্দীপনা' প্রকাশিত হয়। রচিত কাব্যগ্রন্থ : শিক্ষানবীশের পদ্য (১৮৭৪)। গদ্যগ্রন্থ : সমাজ সমালোচনা (১৮৮৪), সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র (১৩১৮), মোতিকুমারী (১৩২৪), রূপক ও রহস্য (১৩৩০), পিতাপুত্র (আত্মজীবনী), মহাপূজা, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। যুক্তাক্ষরবর্জিত শিশুপাঠ্য 'গোচারণের মাঠ' তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার বই। ১৯১৭ সালের ২ অক্টোবর পরলোক গমন করেন। নূ. ই.

অক্ষর : বাংলা ছন্দের একটি পরিভাষা হিসেবে 'অক্ষর' শব্দটি বিভ্রান্তিমূলক বলে ছন্দতাত্ত্বিকরা মনে করেন। সাধারণভাবে 'অক্ষর' শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্ণ বা Letter। লিখিত হরফ মানেই বর্ণ বা Letter। কিন্তু ছন্দ জিনিসটা চোখে দেখার নয়, কানে শোনার। চিত্র দিয়ে ছন্দের কারবার নয়, ছন্দের কারবার ধ্বনি নিয়ে। ধ্বনি সবসময় উচ্চারণ-নির্ভর, দৃষ্টি-নির্ভর নয়। সুতরাং 'অক্ষর'কে যদি হরফ বা বর্ণ হিসেবে ধরা যায়, তাহলে ছন্দের প্রাথমিক শর্ত শব্দের উচ্চারিত ধ্বনিরূপকে উপেক্ষা করা হয়। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে ও অভিধানে অবশ্য 'অক্ষর' শব্দের দুটো অর্থ— এক. বর্ণ বা Letter ; দুই. Syllable। এই দ্বিতীয় মানেটিকেই বাংলা ছন্দে 'অক্ষর' হিসেবে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজি Syllable-এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'অক্ষর'। কিন্তু শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক বলে কোনো কোনো ছান্দসিক Syllable-এর ভিন্ন বাংলা পরিভাষা করতে চান (যেমন প্রবোধচন্দ্র সেন Syllable-এর পরিভাষা করেছেন 'দল')। সুতরাং অক্ষরের সংজ্ঞা হচ্ছে— বাগ-যন্ত্রের এক প্রযত্নসাধিত উচ্চারিত ধ্বনি। যেমন, ক, ব, স, ই, উ, ওই, আন্, উল্ ইত্যাদি। 'বর্ণ' আর 'অক্ষরের' পার্থক্য বোঝানোর জন্য একটি শব্দ নেওয়া যাক, যেমন 'কমল'। এই শব্দে বর্ণ তিনটি—ক, ম, ল ; কিন্তু অক্ষর দুইটি 'ক' এবং 'মল'। 'প্রশান্ত' শব্দে বর্ণ তিনটি প্র/শা/ন্ত, অক্ষরও তিনটি প্র/শান্/ত। 'আগন্তুক' শব্দে বর্ণ চারটি আ/গ/ন্তু/ক, অক্ষর তিনটি আ/গন্/তুক। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বর্ণ হচ্ছে শব্দের লিপি-বিভাগ, আর অক্ষর হচ্ছে শব্দের উচ্চারণ-বিভাগ। অক্ষর দুই রকম। এক. মুক্তাক্ষর ; দুই. বদ্ধাক্ষর। আ. ক.

অক্ষরবৃত্ত (মিশ্রবৃত্ত) : বাংলা কবিতার অন্যতম ছন্দোরীতির নাম অক্ষরবৃত্ত। যে ছন্দোরীতিতে মুক্তদল (open syllable) সর্বত্র এক মাত্রা এবং রুদ্ধদল (closed syllable) শব্দের আদি ও মধ্যে এক মাত্রা ও প্রান্তে দুই মাত্রা হিসেবে গণ্য তাকে বলে অক্ষরবৃত্ত (Composite metre)। এই রীতিতে রুদ্ধদলের উচ্চারণ অবস্থানভেদে দুই রকম হয়—কোথাও সংকুচিত, কোথাও প্রসারিত। সংকুচিত রুদ্ধদল

www.pathagar.com

এক মাত্রা এবং প্রসারিত রুদ্ধদল দুই মাত্রা হিসেবে পরিমিত হয়। উদাহরণ —

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
(রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল, 'প্রাণ')

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ১১টি মুক্তদলে ১১ মাত্রা, ১টি সংকুচিত আদি রুদ্ধদলে (সুন্) ১ মাত্রা, ১টি প্রসারিত প্রান্ত রুদ্ধদলে (দর্) ২ মাত্রা ; মোট ১৪ মাত্রা। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ১০টি মুক্তদলে ১০ মাত্রা, ২টি প্রসারিত প্রান্ত রুদ্ধদলে (বের, চাই) ২ মাত্রা করে ৪ মাত্রা ; মোট ১৪ মাত্রা। এই ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ গাঢ়বদ্ধ ও মন্থর। অক্ষরবৃত্তের উচ্চারণ বাংলা কথ্য ও স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুরূপ। অক্ষরবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাল থেকে অদ্যাবধি সর্বাধিক ব্যবহৃত ছন্দোরীতি। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কাহিনীকাব্য ও মহাকাব্য এই ছন্দে রচিত। বাংলা ছন্দশাস্ত্রের রূপকার প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯২২ সালে অক্ষরবৃত্ত নামকরণ করেছিলেন। তারপর প্রায় ৫০ বছরে তা বহুল পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত নামটি এই ছন্দের চরিত্রজ্ঞাপক নয় বিধায় প্রবোধচন্দ্র নিজেই ১৯৬৫ সালে তা বর্জন করে এর নতুন নামকরণ করেন মিশ্রবৃত্ত। বর্তমানে উক্ত দুইটি পরিভাষাই ব্যবহৃত হচ্ছে। শা. ঠা.

অক্ষৌহিণী : হিন্দু পুরাণ মতে অক্ষৌহিণী এমন একটি সৈন্যবাহিনী যাতে পদাতি থাকে ১০৯, ৩৫০, অশ্ব থাকে ৬৫, ৬১০, হস্তী থাকে ২১, ৮৭০ এবং রথ থাকে ২১,৮৭০। মোট সংখ্যা ২,১৮,৭০০। বাংলা ভাষায় অগণিত সংখ্যা বুঝাতেও অক্ষৌহিনী শব্দটি ব্যবহৃত হয় (নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী)। আ.ই.

অখিল নিয়োগী : ১৯০৫ সালের ১ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছোটবেলার দিনগুলি কেটেছে ময়মনসিংহের সাঁকরাইল গ্রামে। গাঁয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কলকাতায় চলে আসেন। সেখানে স্কটিশ স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও সিটি কলেজ থেকে আই.এস.সি পাস করে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে কমার্শিয়াল আর্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকায় ছোটদের বিভাগ 'ছোটদের পাততাড়ি'র পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং 'স্বপনবুড়ো' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। 'স্ত্রী–অ' নামেও মাঝে মাঝে লিখে থাকেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, হাসির কবিতা, ছড়া লিখেছেন। চিত্রশিল্পী হিসাবেও এককালে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। 'মাসপয়লা' শিশু মাসিকের সম্পাদনায়ও তিনি কিছুকাল জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। তিনি শিশু ও কিশোর সংগঠন "সব পেয়েছির আসর" এর প্রতিষ্ঠাতা। ছেলেমেয়েদের জন্য নাট্য রচনায় ঝোঁক খুব বেশি। অজস্র গ্রন্থের রচয়িতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : স্বপনবুড়োর শৈশব (১৯৫৫), উড়ন্ত চাকি (১৯৫৫), কিশোর অভিযান (১৯৫১), ছেলেদের একাঙ্কিকা (১৯৪১), তালবেতাল, তিব্বত ফেরৎ তান্ত্রিক (১৯৪১), নাট্যে প্রণাম (১৯৬১), পরীর গল্প (১৯৫৯), বনপলাশীর ক্ষুদে ডাকাত (১৯৫১), বাঘমামা (১৯২৭), ভূতুড়ে দেশ (১৯৩১), মায়াপুরী, শশী শ্যামলের সাঁকো (১৯৫৩), শিশু নাটিকা (১৯৪১), স্বপনবুড়োর ছড়া, স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী (১৯৫৯), হুল্লোড় (১৯৫৩), হাসির হল্লা (১৯৪১), স্বপন–বুড়োর সফর, সাতসমুদ্দুর তের নদীর পাড়ে (৩য় মুদ্রণ, ১৯৫৬) ইত্যাদি। আ. জ.

অগত্যা : ফজলে লোহানী সম্পাদিত মাসিক 'অগত্যা' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৫৬ সালে। ১০৭ ইসলামপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এ কাগজটির মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন আবু সঈদ নাসির। 'অগত্যা'র প্রত্যেক সংখ্যার গায়ে 'বিচিত্র মাসিকপত্র' কথাটি মুদ্রিত থাকতো। আত্মপ্রকাশের পর কাগজটি সাহিত্য সংস্কৃতি অনুরাগী তরুণদের কাছে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশেষ করে এটির প্রতি সংখ্যায় তৎকালীন রক্ষণশীল ও পাকিস্তানের তাহজিব তমদ্দুনের ধারক–বাহকদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক রচনাদি প্রকাশিত হতো। এসব

www.pathagar.com

রচনার ভাষাও ছিল তীক্ষ্ণ, রসাত্মক ও কৌতুকোদ্দীপক। পাশাপাশি মননশীল রচনা, চলতি ঘটনা, শিল্পকলা, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাও থাকতো। প্রথম সংখ্যার লেখক ও বিষয়-সূচির দিকে তাকালে কাগজটির মান সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প ক্ষেত্রে নির্দেশ : সৈয়দ আলী আহসান, পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের চিত্রনাট্য : আল নাসির, আন্তন শেখভ : মুসা মনসুর। গল্প : রাজদ্রোহী : ফতেহ্ লোহানী, আলেকজান্ডার কেন এগোলেন না? : ফজলে লোহানী, বারো ঘণ্টা : খাজা আহমদ আব্বাস (অনুঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম)। কবিতা : আশীর্বাদ : শাহাদৎ হোসেন, অগত্যা : ফররুখ আহমদ, পাখী : শামসুল হুদা, '৪৯ সাল-পাগলের সুদিন : নাজির আহমদ, ডলারের স্পর্দ্ধা অসীম : তাছিকুল আলম খাঁ, পরিবেশ : উত্তরীয় সেন, নাসিক : ইরফান। এছাড়া আদ্যোপান্ত ইত্যাদি। অপ্রাসঙ্গিক, সিনেমা, বেতার, চিঠিপত্র, রোজনামচা, এসব বিভাগও ছিল। কাগজটি সম্বন্ধে বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম মন্তব্য করেছেন, ফজলে লোহানী সম্পাদিত 'অগত্যা' আত্ম-প্রকাশের পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। কলকাতার অচলপত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই পত্রিকার বিশিষ্টতা ছিল নতুন সাহিত্যিক সৃষ্টি, সমালোচনা ও চিঠিপত্রের জবাবে বাকচাতুর্য। তবে মাঝে মাঝেই এই পত্রিকায় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতি আক্রমণাত্মক উক্তি প্রকাশিত হত, ফলে তরুণ পাঠকদের কাছে বাহবা পেলেও প্রবীণদের কাছে পত্রিকাটি বিশেষ সমাদৃত হয়নি।" অধ্যাপক আবদুল কাইউমের মন্তব্যটি আপেক্ষিক, একমাত্র সত্য নয়। বর্তমান বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ লেখক 'অগত্যা'য় লিখেছেন এবং সেসময় মাসিক 'অগত্যা'কে কেন্দ্র করে ঢাকায় প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তুখোড় সাহিত্য আড্ডা। 'অগত্যা' ১ম সংখ্যার (৬৪ পৃষ্ঠা) মূল্য ছিল আট আনা। ১৩৪৮ সনে প্রকাশিত হয় 'প্রথম অসাধারণ সংখ্যা' ১৯৬ পৃষ্ঠার এ সংখ্যার মূল্য ছিল দুই টাকা। ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 'অগত্যা'র প্রকাশ কাল ছিল শ্রাবণ ১৩৫৯ সন, আগস্ট ১৯৫২ সাল। মা. আ

অগস্ত্যজাতক : বৌদ্ধজাতকের একটি আখ্যান। আখ্যানটি হচ্ছে,—ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত বোধিসত্ত্বের দানকর্মের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি এই সুকৃতির দ্বারা লোকসমাজে বিখ্যাত হন। বোধিসত্ত্ব অতঃপর 'অগস্ত্য' নাম পরিগ্রহ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মসাধনার কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়। অনেক দর্শনার্থী বোধিসত্ত্বের কাছে ভিড় জমায়। অগস্ত্য তাদেরকে নিরাশ না করলেও তাঁর ধর্মসাধনা দর্শনার্থীদের ভিড়ে অনেক সময় বিঘ্নিত হতে থাকে। তিনি তখন কারাদ্বীপে অরণ্যচারী হয়ে নির্জন সাধনায় নিয়োজিত হন। সাধক অগস্ত্যকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র অতঃপর অরণ্যের বৃক্ষস্থ ফলমূল সমুদয় অদৃশ্য করেন। অগস্ত্য নামধারী বোধিসত্ত্ব তখন কেবল বৃক্ষপত্র আহার করে কালযাপন করতে থাকেন। ইন্দ্র পত্রগুল্মাদিও অপসরণ করে ফেলেন। এই অবস্থায় অগস্ত্যকে বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্রাদি খেয়ে সাধনায় নিয়োজিত থাকতে হয়। ইন্দ্রের কৌতূহল তখন বাড়ে। তিনি ছদ্মবেশে অগস্ত্যের কাছে গিয়ে তাঁর এই কঠোর তপ-সাধনার কারণ জানতে চান। অগস্ত্য বলেন, জন্মান্তর-চক্র থেকে মুক্তিসাধনাই হচ্ছে তাঁর কাম্য। ইন্দ্র অতঃপর নিষ্কাম সাধক অগস্ত্যকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বর দান করেন। আ. ন. ম. ব. র.

অগস্ত্যযাত্রা : অগস্ত্যযাত্রার অর্থ চিরকালের জন্য চলে যাওয়া বা শেষ যাওয়া। মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে অগস্ত্যযাত্রা সম্পর্কে প্রচলিত উপাখ্যানটি হলো,—একদা বিন্ধ্যপর্বত তার শীর্ষদেশ উচ্চে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসে যার ফলে সূর্যের পথ-পরিক্রমা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বিন্ধ্য অগস্ত্যকে মানতেন। দেবতারা তখন পরামর্শ করে বিন্ধ্যকে নত শির করার জন্য অগস্ত্যকে অনুরোধ করেন। বিন্ধ্য অগস্ত্যকে

www.pathagar.com

আদেশ করেন যতদিন তিনি দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরে না আসেন ততদিন সে যেন অবনত মস্তকে থাকে। অগস্ত্যও ফিরে আসেন নি, বিন্ধ্যও উচ্চশির হয় নি। এই উপাখ্যান থেকে অগস্ত্য-যাত্রার অর্থ দাঁড়ায় শেষ যাওয়া। ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে অগস্ত্য অনন্তকালের জন্য দক্ষিণ দেশ যাত্রা করেন। এই কারণে হিন্দু সম্প্রদায় এই দিনে বিদেশ-যাত্রা থেকে বিরত থাকে। আ. ন. ম. ব. র.

অগাস্টাস : প্রথম রোম সম্রাট এবং জুলিয়াস সিজারের ভগ্নীর পৌত্র। বাল্য নাম অক্টেভিয়াস। জন্ম ২৩ সেপ্টেম্বর, খ্রিঃ পূঃ ৬৩ অব্দ এবং মৃত্যু ১৯ আগস্ট, ১৪শ খ্রিস্টাব্দ। পিতার নাম কয়াস অক্টেভিয়াস। তাঁর মাতা ছিলেন জুলিয়াস সিজারের ভগ্নী জুলিয়ার কন্যা এটিয়া। সিজার তাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তদবধি তাঁর নাম হয় "কাইয়ার জুলিয়াস সিজার অক্টেভিয়েনাস" পরে রোমক সিনেট তাঁকে সম্মানসূচক 'অগাস্টাস' উপাধি প্রদান করেন। অগাস্টাস সিজারের সেনাপতি হিসেবে স্পেন, জার্মানি ও আফ্রিকায় বহুযুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁর বিদেশ অবস্থানকালে সিজার নিহত হন। এ সংবাদ পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং সিজারের বিরোধী দল ও এর নেতৃবৃন্দকে, বিশেষত ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে রোমক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেন। এক্ষেত্রে অ্যান্টনি ছিলেন তাঁর সহায়ক। পরবর্তীকালে অ্যান্টনির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তিনি অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রাকে অ্যাক্‌টিয়ামের নৌযুদ্ধে পরাজিত করেন। অগাস্টাসের রাজত্বকাল ছিল খুবই গৌরবময়। শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য-স্থাপন, রোম নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি, রাস্তাঘাটের উন্নতিবিধান ও সম্প্রসারণ তাঁর গৌরবময় রাজত্ব-কালের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর সময়ে রোমক সাহিত্য উন্নতি লাভ করে। ভার্জিল, ওভিদ প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত লেখকের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এজন্য তাঁর সময়কার সাহিত্য-যুগ 'অগাস্টীয় সাহিত্য-যুগ' নামে চিহ্নিত। তাঁর রাজত্বকালেই যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়। অগাস্টাসের মৃত্যুর পর তদীয় সৎপুত্র টাইবিয়ারিয়াস তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। মু. আ. রা.

অগ্নি : হিন্দু পুরাণোক্ত অন্যতম প্রধান দেবতা। আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি এই তিনরূপে অগ্নি বিরাজমান। যজ্ঞাগ্নি রূপেই অগ্নি পূজিত। পার্থিব দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই প্রধান। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অগ্নিকে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অগ্নি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী। পাবক, পবমান ও শুচি অগ্নির পুত্র। অগ্নির বাহন ছাগ। বিভিন্ন নামে অগ্নির পরিচয়--অনল, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর, বহ্নি, সপ্তজিহ্ব ইত্যাদি। মহাভারতে উক্ত হয়েছে,—শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে অতিরিক্ত হবি ভক্ষণ করে অগ্নি দারুণ অগ্নিমান্দ্য রোগে আক্রান্ত হন। ব্রহ্মার উপদেশে অগ্নি রোগমুক্তির জন্য খান্ডববনের জীবজন্তু, দৈত্যদানব ও সর্প ভক্ষণের ইচ্ছা করলে, খান্ডববন দেবরক্ষিত বলে, ইন্দ্র তাতে বাধা দেন। অগ্নি তখন কৃষ্ণ ও অর্জুনের শরণাপন্ন হলে তাঁরা রাজি হলেন, কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব জ্ঞাপন করলেন। অগ্নি বরুণদেবের থেকে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব-ধনু ও অক্ষয় তূনীরদ্বয় এনে অর্জুনকে দেন এবং কৃষ্ণকে দেন সুদর্শনচক্র ও কৌমদকী গদা। তখন কৃষ্ণ ও অর্জুনের দ্বারা খাণ্ডবদাহন হলে অগ্নি তা খেয়ে রোগমুক্ত হন। ম. চৌ.

অগ্নি : বনফুল। প্রকাশকাল ১৯৪৬। ভারতের ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক অংশুমান আগস্ট আন্দোলনের নেতা। ইংরেজ ডেপুটিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে তার কারাদণ্ড হয়। ঠাঁই হয় কারাগারের অন্ধকার সেলে। সেখানে বসে সে দেশের মুক্তির কথা ভাবে। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে আরও বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটে। নীহার ও তার স্ত্রী অন্তরা এদের অন্যতম। একসময় দু'জনেই কম্যুনিজমের

www.pathagar.com

অনুসারী ছিল। কিন্তু কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও নীহার ক্যাপিটালিস্ট সরকারের অধীনে চাকরি করে। আগস্ট আন্দোলনের সময় সশস্ত্র মিলিটারী বাহিনী নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহ দমনে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করে। এর পুরস্কার-স্বরূপ রায় সাহেব খেতাব পেয়েছে। প্রাক্তন কমরেড স্বামীর এই ক্ষুদ্রতা দেখে অন্তরা সংকুচিত হয়ে যায় ক্ষোভে আর লজ্জায়। এ সময়ই তার পরিচয় ঘটে অংশুমানের সঙ্গে। তার বিদ্রোহী মূর্তি অন্তরাকে মুগ্ধ করে। কম্যুনিজমের অসঙ্গতি দেখে অন্তরা আহত হয়। তার সে অনুভূতি চিঠির মাধ্যমে ব্যক্ত করে প্রাক্তন কমরেড মীনা দত্তকে। প্রকৃতপক্ষে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে লেখক কম্যুনিজমের সমালোচনাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসারকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে খুন করার দায়ে অন্তরারও ফাঁসির আদেশ হয়। ড. শা. আ.

অগ্নিকুক্কুট : পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮) রচিত প্রবন্ধ-পুস্তক। প্রথম প্রকাশ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ। মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'গো-জীবনী' পুস্তকে গোহত্যা নিবারণকল্পে আলোচিত বিষয়ের প্রতিবাদে ও বিপক্ষে পণ্ডিত মাশহাদী তাঁর এই পুস্তক রচনা করেন। বৈদিক শাস্ত্রে হিন্দু মুনি-ঋষিদের গোমাংস ভক্ষণ সম্পর্কে নজীর পাওয়া যায়। সুতরাং মুসলমানদের শাস্ত্রসম্মত গোমাংস ভক্ষণ নিষেধকরণের প্রশ্নই ওঠে না। মাশহাদী 'অগ্নিকুক্কুট' পুস্তকে দৃঢ়ভাবে তাঁর এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আ. ই

অগ্নিকোণ : কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১০, প্রকাশক : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-১২। প্রচ্ছদপট : অজিত গুপ্ত। 'অগ্নিকোণ' কাব্যগ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেছেন সিঙ্গাপুরের যে তিনজন শহীদ—ব্রিটিশের ফাঁসিকাঠে আন্তর্জাতিক গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের যে মহাবিপ্লবী অভ্যুত্থান তার ভাষ্যকার এই 'অগ্নিকোণ'। সমষ্টি এবং ব্যক্তির যে প্রকাশকে আধুনিক কবিতা একই সঙ্গে বৈপরীত্য এবং ঐক্যের ধারায় দেখতে চেয়েছে, তার সমান্তরাল অভিব্যক্তি রয়েছে অগ্নিকোণে। যেমন : 'রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়/অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ।' এরই পাশাপাশি 'মিছিলের মুখ' কবিতায় একটি অপূর্ব মেয়ের মুখচ্ছবির অভিব্যক্তি দেখা যায়। 'মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ/মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত/আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত/ বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র/আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান।' পা. র.

অগ্নিগর্ভ—মহাশ্বেতা দেবী : প্রকাশকাল : ১৯৭৭। ভারতের নকশাল আন্দোলনের খণ্ডচিত্র প্রতিফলিত এ উপন্যাসে। সত্তরের দশকে ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে নকশাল আন্দোলন। পরাধীন ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যে লক্ষ্য ও ধরন ছিল, নকশাল আন্দোলনও অনেকটা অনুরূপ লক্ষ্যেই পরিচালিত। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও গ্রামভারতের আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি আসে নি। এদিক থেকে কংগ্রেস সরকারের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্য ও রূপরেখা। এই পটভূমিতেই সূত্রপাত ঘটে নকশাল আন্দোলনের। এ সময়ের রাজনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় খুন—নিজের দলের ও অন্য দলের সদস্যদের খুন, পুলিশকে খুন এবং পুলিশ কর্তৃক খুন। এই বিপ্লবীরা ছিল মূলত জনবিচ্ছিন্ন, যদিও তারা জনগণের নামেই রাজনীতি করত। নকশালপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের তখন পুলিশ নির্মমভাবে নির্যাতন করত। পুলিশের নৃশংস নির্যাতনের চিত্রই অগ্নিগর্ভ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। এক অগ্নিগর্ভ সময়ের রাজনীতির চালচিত্র হিসেবে উপন্যাসটি গভীর তাৎপর্যবহ। ড. শা. আ.

www.pathagar.com

অগ্নিপরীক্ষা : আশাপূর্ণা দেবী রচিত প্রণয় ও দাম্পত্য সংঘাতময় উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯৫২ সাল। উপন্যাসের কাহিনীতে স্থান পেয়েছে একটি প্রাচীন বনেদী পরিবারের জীবনাদর্শ ও ভগবৎপ্রীতির কারণ হিসেবে দেবমন্দিরের মহিমা কীর্তন। মন্দিরের চত্বরতলে একদা এক প্রাচীনপন্থী জমিদারের আবেগ-অনুরোধে বুলু ও তাপসী দুই কিশোর-কিশোরীর দাম্পত্য পরিণতি ঘটে। হেমপ্রভা-চিত্রলেখার জীবনাদর্শ পরে তাপসীর ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে। অনেকদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর মুখার্জীর ছদ্মবেশে বুলুই তাপসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নতুন সম্পর্কের আলোকপাত করে। কিন্তু ছদ্মবেশ যখন উন্মোচিত হয় তখন তাপসীর মনে হয়েছে বুলু আত্মপরিচয় গোপন রেখে নিজের কৈশোর জীবনের বধূটির দাম্পত্য নিষ্ঠা পরীক্ষা করেছে এবং এই উপলব্ধিই তাপসীর আত্মসম্মানে আঘাত হানে। সুতরাং বুলুর প্রতি তার দারুণ অভিমান জাগে। শেষ পর্যন্ত বুলু বুঝতে পারে তাপসীর দাম্পত্য নিষ্ঠা যাচাই করতে গিয়ে সে নিজেই ঠকেছে। তাপসী নিজের মনের সঙ্গে এতদিন বোঝাপড়া করে জানতে চেয়েছে সে কতটুকু দ্বিচারিণী-বৃত্তির প্রশ্রয় দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গণে যেই দেবতাকে সাক্ষী করে একদা উভয়ের দাম্পত্য পরিণতি ঘটেছিল, বহুদিন পরে সেই দেবতার সামনেই উভয়ের অসম্পূর্ণ দাম্পত্য মিলন পরিপূর্ণ হয়। আ. ই

অগ্নিপুরাণ : অগ্নিদেবতার মুখ থেকে নির্গত হওয়ায় এর নাম অগ্নিপুরাণ। মহামুনি বশিষ্ঠকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই পুরাণ নির্গত হয় এবং এর নাম অষ্টম পুরাণ হয়। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে প্রলয়, সৃষ্টি, প্রকরণ ও অগ্নিকার্য, দেব প্রতিষ্ঠা, নরক বর্ণনা, প্রায়শ্চিত্ত বিধান, তীর্থাদি মাহাত্ম্য, জ্যোতিষ, আশ্রমবিধি, দীক্ষা, পূজাপদ্ধতি, সন্ধ্যাবিধি, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, ছন্দ, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি। এর শ্লোক সংখ্যা ১৫,৪০০। ম. চৌ.

অগ্নিবান : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রহস্য গল্প। লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (ভাদ্র ১৩৫৫ ব.) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যরসিক মন এই গল্পের কাহিনীতে আধুনিক যুগের শয়তানী লীলাকে জীবন্তরূপে অঙ্কন করেছেন। প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক দেবকুমার অভাবিতভাবে এক মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেন। মানুষকে হত্যা করার যজ্ঞচক্রে নিয়তির লীলা কিন্তু বিপরীত পন্থায় ক্রিয়াশীল হয়। শত্রুর বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত অগ্নিবাণ শেষ পর্যন্ত তীব্রভাবে আঘাত হানে তাঁরই প্রাণপ্রিয় পুত্রকন্যার বুকে। অদৃষ্টের ফাঁদে জড়িত দেবকুমারের ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডিকে লেখক অত্যন্ত দরদের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যোমকেশের জবানীতে লেখক গল্পশেষে মন্তব্য করেছেন—'মানুষ যেদিন অন্যকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সেদিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্মাণ করেছিল, আজ সারা পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই যে হিংসার কুটিল বিষ তৈরি হচ্ছে এও মানুষ জাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে।' এ গল্পে মানবজীবন সত্যেরই এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আ. ই

অগ্নিবীণা : কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। কলকাতার আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩২৯)। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা কবিতার বিকাশের ধারায় নজরুলের অগ্নিবীণা নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। এ-কাব্যের বিদ্রোহব্যঞ্জক ভাবের জন্য নজরুল বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত লাভ করেন। একই কারণে প্রকাশের অল্প কিছুদিন পরে গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। অগ্নিবীণা কাব্যে সঙ্কলিত হয়েছে মোট বারটি কবিতা। সঙ্কলিত কবিতাগুলো হচ্ছে—'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'রণভেরী', 'সাত্-ইল্-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণী' এবং

www.pathagar.com

'মোহররম'। অগ্নিবীণা নজরুল ইসলামের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী সামূহিক অবক্ষয় এবং ভারতের স্বাধিকার-আকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক আলোড়ন-উদ্দীপনার পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে আলোচ্য কাব্য। অগ্নিবীণা নজরুলের প্রাতিস্বিক কবিচৈতন্যের সামূহিক বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক। ভাব-পরিমণ্ডল জীবনার্থ এবং প্রকরণ-প্রকৌশলে অগ্নিবীণা বাংলা কবিতার ধারায় এক সম্পূর্ণ নতুন নির্মাণ। অগ্নিবীণা কাব্যে নজরুল কবিতাকে স্থাপন করেছেন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন-বাস্তবতার জটিল আবর্তে। এ কাব্যে কবি অসত্য-অকল্যাণ-অমঙ্গল, ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সামাজিক অপশক্তি--এই ত্রিমাত্রিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই বিদ্রোহকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য কবি ভারতীয় পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন অফুরান শক্তি। কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার মূলীভূত প্রেরণাশক্তি রোমান্টিকতা। এই রোমান্টিকচেতনার অন্তর্প্রেরণায় আলোচ্য কাব্যে তিনি উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী। এ-কাব্যে নজরুলের অন্যতম স্বাতন্ত্র্য এই যে, ভারতীয় পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য ব্যবহারে তিনি অর্জন করেছেন সমান সাফল্য। বিষয়ভাবনা এবং জীবনার্থের মতো, শব্দ-ব্যবহারেও অগ্নিবীণা কাব্যে নজরুল স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য-সচেতনতা, আলোচ্য কাব্যে নজরুলের কবিভাষায় নিয়ে এসেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। বি. ঘো

অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী : কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ঢাকার রাখাল প্রকাশনা সংস্থা থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। এ গ্রন্থে কবির ইতিহাস-চেতনা ও জাতীয়তাবোধের শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে। মুহম্মদ নূরুল হুদা তামাটে বাঙালি জাতির শেকড়-সন্ধানী কবি। কবির এই শেকড়সন্ধান প্রধানত এক দ্রাবিড়াকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। 'অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী' কাব্যের পূর্ব-পর্যন্ত এই দ্রাবিড়াই তামাটে জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছে। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে এসে অতীতের সেই শ্যামাঙ্গী কিশোরী দ্রাবিড়া পরিণত হয়েছে আগুনে পোড়া এক মৃন্ময়ী নারীতে। অতীতের ভূগোল থেকে কবি এবার উঠে এসেছেন সমকালের মৃত্তিকায়। এইভাবে দ্রাবিড়া এবং মৃন্ময়ী, অতীত এবং বর্তমান মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতায় নির্মাণ করে সময়ের এক ঐকতান। নানা বিষয়ে কবিতা থাকলেও এই জীবনবোধই আলোচ্য কাব্যের প্রধান সুর। বি. ঘো.

অগ্নিস্বাক্ষরা—রিজিয়া রহমান। : ছোটগল্পের বই। বইটি প্রকাশ করেছেন ঢাকার আবুল বাসার মোহাম্মদ সিদ্দিক। প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭৪। লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস-সমর্থিত আবহে কল্পিত বাস্তবতা, ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রেম ও বিদ্রোহ, আদিম আধিপত্যবাদ ও ঈর্ষা, প্রকৃতি প্রীতি, তীব্র রোমান্টিকতা, বিপন্ন মানবতা, দারিদ্র্য-দীনতা, মানুষের মূল্যবোধের ভিন্নতা ও পরিবর্তনশীলতা—এই বিষয়সমূহকে ভিত্তি করে রচিত মোট দশটি গল্প সংকলিত হয়েছে এ বইয়ে। গল্পগুলো হচ্ছে : অগ্নিস্বাক্ষরা, সিন্ধুপতন, প্রেম একটি নদী, অনন্যা পৃথিবী, সমুদ্র প্রিয়া, নির্জন প্রহর, কার্পেট, মৌন আকাশ, এক কান্নার স্বাদ, লালটিলার আকাশ। নামগল্প 'অগ্নিস্বাক্ষরা' অত্যন্ত মর্মস্পর্শী মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ গল্প। ইংরেজ কুঠিয়াল বা নীলকরদের অত্যাচারের পাশাপাশি দেশীয় জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের ঘৃণ্য দাসমনোবৃত্তি, কাপুরুষতা ও কামলোলুপ চরিত্রের দলিলস্বরূপ এ গল্প। তারই মাঝে মূল চরিত্র অগ্নিময়ী নারী গুলনাহার অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে, মেরুদণ্ডহীন স্বামীর স্ত্রী হয়েও বাংলাব্যাপী তীতুমীরের ব্যাপক বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে যায় আত্মাহুতির মাধ্যমে। 'সিন্ধুপতন' গল্পের প্রেক্ষাপট পাঁচ হাজার বছর আগেকার সমৃদ্ধ সিন্ধুনগর, প্রধান চরিত্র সিন্ধুনগরের বাঁধ-দূর্গ প্রহরী শিবার্ক। আখ্যানের শেষ পর্যায়ে তার পীড়িত প্রেমিক

www.pathagar.com

মনের ঈর্ষা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের প্রাকমুহূর্তে অন্ধ আবেগে ভেঙে দেয় নগর রক্ষা বাঁধের দেয়াল। প্রাচীন সভ্যতার প্রেক্ষাপটে এটি একটি সর্বকালীন মানবিক আখ্যান। 'প্রেম একটি নদী'তে নায়িকা রোখসানা নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী। তার প্রতি দুই সহপাঠীর প্রেম ও পারস্পরিক ঈর্ষা তাকে নিয়ে যায় প্রাগৈতিহাসিক মাতৃতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী গুহা জীবনের অনুভূতিতে, স্বপ্নে সে আদিম সমাজের হবু রানীর ভূমিকায় তাকে নিয়ে খুনোখুনির চিত্র দেখে। এ তিনটি গল্প একই ধারায়। বাকি গল্পগুলোও মনের মানবীর চিরন্তন প্রেম, ঈর্ষা, সাধারণ মানুষের বাঁচার সংগ্রাম, বঞ্চিত মানবতার আবেদনে সমৃদ্ধ। কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবন ও বঞ্চনার আড়ালের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নিয়ে লেখা 'কার্পেট' গল্পটি খুই সংবেদনশীল। সবগুলো গল্পের উপস্থাপনা কৌশল দক্ষ ও ভাষা সাবলীল। আর বিষয়বস্তু সুনির্বাচিত ও সর্বজনীন আবেদনে ঋদ্ধ। র. আ. ক.

অগ্রগামী : প্রবোধকুমার সান্যাল রচিত স্ত্রী-পুরুষের নতুন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬ সাল। এতে প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু প্রেমের সনাতন ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক ও বিপ্লবাত্মক শিল্পীমানস কার্যকরী করার চেষ্টা আছে। মায়ালতা ও সুরপতি পরস্পরের মধ্যে প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছে। এদিকে মায়ার সান্নিধ্যে সৌন্দর্যের উপাসক ও কবি অমরেশ কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করে। অমরেশের সহায়তায় মায়া হরিদ্বার আসে। লেখক প্রেম সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিচেতনা আনলেও তার প্রতিষ্ঠায় ততখানি সফল হন নি। এর মধ্যে অন্তঃসঙ্গতির অভাবই পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা নতুন অথচ সমাজ বিরোধী সম্পর্ককে পরীক্ষামূলকভাবে গড়ে তোলার প্রয়াস এতে লক্ষ করা যায়। কিন্তু উপন্যাসে এই প্রেমের পরিকল্পনা তেমন সার্থক-ভাবে বিকাশলাভ করে নি। আ.ন.ম.ব.র.

অগ্রদানী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে 'রসকাল' (বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) গল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভোগী এবং লোভী ও আত্মসম্মান জ্ঞানরহিত এক অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অদৃষ্টের মর্মান্তিক পরিহাসের কথা এতে বিবৃত হয়েছে। উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর জীবনের সব রস একাগ্রীভূত হয়েছে তার রসনাগ্রে। এক দঙ্গল সন্তানের জননী চক্রবর্তী-গৃহিণী অভাবের সংসারে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। গাঁয়ের বিত্তবান শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রী শিবরানীর পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়। অথচ দরিদ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী বেশ কয়েকটি সন্তানের জননী। দশ বিঘা জমি ও আজীবন প্রসাদের লোভে শিবরানীর ষষ্ঠ সন্তানের প্রসবকালে পূর্ণ চক্রবর্তী তার সূতিকাগৃহ আগলে রাখার ভার নেয়। একই সময়ে শিবরানীরও প্রসবকাল উপস্থিত। উভয়ের সন্তান ভূমিষ্ট হয়। অচেতন শিবরানীর মুমূর্ষু পুত্র আগলে রাখে চক্রবর্তী ও দাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাথায় তখন নতুন ফন্দি খেলে। দারিদ্র্যের চরম অভিশাপ থেকে কি পুত্র-বিনিময়ের দ্বারা তার নিজের সন্তানকে রক্ষা করা যায় না? শ্রাবণের ঘন তমসাচ্ছন্ন রাত্রির নীরব পরিবেশে অবশেষে পুত্রবদলের পালা শেষ হয়। দশ বৎসর পরে শিবরানীর মৃত্যুর পর শ্যামাদাস বাবুর বংশধরের মাতৃশ্রাদ্ধকালে অগ্রদান করে পূর্ণ চক্রবর্তী। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস! চৌদ্দ বৎসর পর শ্যামাদাস বাবুর সন্তানের মৃত্যু হলে তার শ্রাদ্ধে অগ্রদানীর ভার পড়ে পূর্ণ চক্রবর্তীরই উপর। কিন্তু সে যে তারই ঔরসজাত সন্তান। লোভী ব্রাহ্মণ পূর্ণ এবার শ্যামাদাস বাবুর পা জড়িয়ে ধরে—পারবে না সে। কিন্তু তাকে পারতেই হবে। নিজের সন্তানের পিণ্ডি ভোজন করতে হবে তাকে। পুরোহিত বলে, 'খাও হে চক্রবর্তী।' গল্পের এই শেষ বাক্যে তারাশঙ্কর প্রবৃত্তিরূপিনী নিয়তির নির্মমতাকে অনবদ্য শিল্পরীতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজভোগের লালসায় একদা পূর্ণ তার নিজপুত্র জমিদারকে সঁপে দিয়েছিলো। কিন্তু সেই

www.pathagar.com

পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তার শ্রাদ্ধে পিণ্ডভক্ষণে ব্রাহ্মণের সর্বগ্রাসী লোলুপতার নিবৃত্তি ঘটলেও নিয়তির কঠোর শাস্তি থেকে সে রক্ষা পায়নি। 'অগ্রদানী' তারাশঙ্করের শিল্পীমনের এক অনবদ্য সৃষ্টি। আ. ই

অঘোরনাথ : বাংলাদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ও গ্রন্থকার। তিনি ১৮৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ। অঘোরনাথ ১২ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। টোল ও পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি ১৮৫৭ সালে কলকাতায় গিয়ে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি এই ধর্মীয় আন্দোলনকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে এর প্রচারে ব্রতী হন। ঐ বছরই তিনি ঢাকায় এসে একটি ব্রাহ্ম সাধকমণ্ডলী গড়ে তোলেন। ১৮৬৫ সালে বিজয়চন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে অঘোরনাথ পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামে ধর্মপ্রচার করেন। এ কাজের জন্য পরে তিনি মুঙ্গের, উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাবেও গমন করেন। কর্মজীবনে তিনি কিছুকাল কলকাতায় শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'ধ্রুব ও প্রহলাদ', 'দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ', 'ধর্মসোপান', 'উপদেশাবলী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থ রচনা। ১৮৭৯ সালে ব্রহ্মানন্দ প্রবর্তিত 'নব অধ্যয়ন' আন্দোলনের পুরোধারূপে অঘোরনাথ পালি, সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্মের মূল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এটিই বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। অঘোরনাথ শৈশবকাল থেকেই নিরামিষাশী, শুদ্ধাচারী ও উপাসনানুসারী ছিলেন। তিনি ১৮৮১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মু. আ. রা.

অঘোরনাথ চক্রবর্তী : গায়ক। ১৮৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বাজপুর গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিক বংশে জন্ম। অঘোরনাথ কলকাতায় সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁর প্রধান ওস্তাদ ছিলেন ধ্রুপদ-খেয়াল গায়ক আলী বখ্শ। পরে মুরাদ আলী খাঁ, দৌলত খাঁ এবং শ্রীজান বাঈয়ের নিকটও তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ধ্রুপদ, ভজন ও টপ্পাগানে অঘোরনাথের সমকক্ষ গায়ক তৎকালে খুব কমই ছিল। অতুলনীয় কণ্ঠ মাধুর্যের জন্য তিনি দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন এবং সর্বভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি বিপুল খ্যাতির সঙ্গে বারানসী ও বোম্বাইয়ে কাটিয়েছেন। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লীর দরবারে অঘোরনাথ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসাদে তাঁর চারখানি গান রেকর্ড করা হয়। গানগুলি হলো--'বিফল জনম বিফল জীবন', 'আনন্দ বন গিরিজা', 'গোবিন্দ মুখারবিন্দ' ও 'নজরা দিল্ বাহার'। কাশীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাঁকে 'সঙ্গীত-রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, পুলিনবিহারী মিত্র, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট গায়ক তাঁর সঙ্গীতশিষ্য ছিলেন। অঘোরনাথ ১৯১৫ সালে বারানসীতে পরলোক-গমন করেন। মু. আ. রা.

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় : লেখক। প্রথম জীবনে শান্তিনিকেতনের আচার্য ও তত্ত্বাবধায়ক এবং পরে 'তত্ত্ববোধনী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। শেষ জীবনে নলহাটিতে বসবাসকালে তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অঘোরনাথের রচনাবলীর মধ্যে আছে শ্রীমৎ রূপ-সনাতন, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী প্রমুখ মহাপুরুষের জীবনী। এছাড়া তিনি 'মেয়েলী ব্রত' নামক গ্রন্থও রচনা করেন। ম. চৌ.

অঘোরপন্থী : শৈব ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ। যে শিব সর্বব্যাপারে অনাসক্ত, যাঁর আচার-ব্যবহার

www.pathagar.com

লোকাচার বহির্ভূত, যিনি পুরীষ-চন্দন সমজ্ঞান করেন, তিনিই অঘোর নাথ। এই অঘোর নাথের উপাসকরাই হলেন অঘোরপন্থী। যাঁরা নিজের এই অঘোরনাথ রূপের সাধক, তাদের প্রথমে যথানিয়মে অঘোরমন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। এই মন্ত্রকে তাঁরা অত্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন মনে করেন। সাধারণ সন্ন্যাসীরা অঘোরপন্থীদের দৈবশক্তি সম্পন্ন বলে বিশ্বাস করেন। অঘোরপন্থীরা বীভৎস বস্তু সম্পর্কে বিকারহীন এবং ঘৃণারহিত। কোনো কোনো বিষয়ে কাপালিকদের আচরণের সঙ্গে এঁদের আচরণের সাদৃশ্য দেখা গেলেও, এঁরা কাপালিকদের ন্যায় নরহত্যা করেন না বা শক্তির নিকট নর বলি দেন না। তবে তাঁরা শিবের ন্যায় শ্মশানচারী ; মৃত নরমাংস ভোজনে এঁদের অরুচি নেই। অঘোরপন্থীরা উলঙ্গ থাকেন। তাঁদের জীবনধারণের প্রয়োজন সামগ্রী খুবই কম বলে তাঁরা লোকালয়ে বড় একটা আনাগোনা করেন না। তাঁদের যোগ শ্মশানযাত্রী শববাহকদের সঙ্গে ; তাদের কাছ থেকেই এঁরা আহার্য এবং পানার্থে কারণবারি সংগ্রহ করেন। এই অঘোরপন্থীদের সাধন-পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। বুদ্ধদেব এঁদের মতো উলঙ্গ সাধু-সম্প্রদায়কে 'অচেলক' বলতেন। এ দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর নতুন সভ্যতার-প্রভাবে এবং আইনের শাসন কঠোর-ভাবে চালু হওয়ার ফলে এঁদের সাধন-পথ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং ক্রমে এঁদের সংখ্যাও কমে আসে। বর্তমানে অঘোরপন্থী সাধকের দেখা বড় একটা মিলে না। সু. মু.

অঙ্ক : একটি নাটক সাধারণত কয়েকটি পর্বে বিভক্ত থাকে। এই পর্বকে নাটকে 'অঙ্ক' (act) বলে। প্রতি অঙ্ক আবার কয়েকটি দৃশ্যে (scene) বিভক্ত থাকে। নাট্যরসের বিকাশ ও অভিনয়ের সুবিধার জন্য অঙ্কের মাধ্যমে নাটকীয় কাহিনীর এরূপ খণ্ডিতকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাচীনরীতির নাটকে ঘটনার সূচনা বা আদি মধ্য বা চরম রূপ এবং অন্ত বা পরিণতি থাকে। সে প্রয়োজনে ঘটনাকে অঙ্কে ও দৃশ্যে ভাগ করতে হয়, ঘটনাকে পূর্ণতা দানই লক্ষ্য। অভিনয়কালে বিভিন্ন বাস্তব ও বিচিত্র দৃশ্যের উপস্থাপনার জন্যও নাটকীয় অঙ্ক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা আছে। নাটকীয় কাহিনী প্রধানত পাঁচটি অঙ্কেই বিভক্ত থাকে। তবে তার ব্যতিক্রমও হয়। সেক্সপীয়রের নাটকগুলো পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট, আবার বার্নার্ড শ ও ইবসেনের কোনো কোনো নাটকের অঙ্ক তিন থেকে চারটি। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের অঙ্ক পাঁচ থেকে দশ অঙ্ক পর্যন্ত হয়, যেমন কালিদাসের 'বিক্রমো-র্বশী'র অঙ্কসংখ্যা পাঁচ, ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্তম'-এর ছয়, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর সাত এবং ভবভূতির 'মালতীমাধবম'-এর দশ। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ইত্যাদি নাটকে পঞ্চাঙ্ক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তাঁর 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি নাটকের অঙ্ক মাত্র একটি। সাম্প্রতিককালে তিন অঙ্কবিশিষ্ট নাটকের সংখ্যা চালু হয়েছে। আজকাল একাঙ্কিকাও বহুল প্রচলিত। আ. ই.

অঙ্গ : প্রাচীন ভারতের রাজ্য বিশেষ, যা খ্রিস্টপূর্ব ছয় ও পাঁচ শতকে এর ষোড়শ জনপদের অন্যতম ছিল। বর্তমান বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা সমবায়ে এ রাজ্য গঠিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগের সময় অঙ্গরাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিম্বিসার ছিলেন অঙ্গ-মগধের রাজা। অজাতশত্রু যুবরাজ অবস্থায় অঙ্গের শাসক ছিলেন। ঋগ্‌বেদে অঙ্গের উল্লেখ নেই ; কিন্তু অথর্ববেদ মতে অঙ্গবাসীরা ছিল ব্রাত্য জাতি। এদের বসতি ছিল শোণ ও গঙ্গার অববাহিকায়। পুরাণ ও মহাভারত মতে বলিরাজার অনুরোধে দীর্ঘতমা নামে এক অন্ধ ও বৃদ্ধ ঋষি রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তান উৎপাদন করে। এঁরা হলেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম। বলিরাজার এই পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র যে পাঁচটি রাজ্য শাসন করেন, তাঁদের নামানুসারেই ঐ রাজ্যগুলির নামকরণ করা হয়। কিন্তু রামায়ণ মতে মদন বা কামদেব শিবের কোপে এখানে অঙ্গ পরিত্যাগ করে অনঙ্গ হন বলেই দেশটির নাম হয় অঙ্গ। রামায়ণ ও মহাভারতে অঙ্গরাজ্যের বহুল উল্লেখ আছে। রাজা দশরথের অন্তরঙ্গ মিত্র লোমপাদ

www.pathagar.com

(রোমপাদ) অঙ্গরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দুর্যোধন কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করার কাহিনী সর্বজনবিদিত। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে এ রাজ্য গঠিত হয়। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা (চম্পাপুরী বা চম্পানগরী) ; মহাভারতসহ বিভিন্ন পুরাণে এর প্রাচীন নাম মালিনী বা মলিন। গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনের কোনো কোনো ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় চম্পা, বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পুণ্যতীর্থস্থান। তাছাড়া এটি প্রাচীন ভারতের শিল্প এবং বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিল। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খ্রিস্টীয় ছয় শতকে ভারত ভ্রমণের সময়ে চম্পা নগরে এসেছিলেন; তাঁর বিবরণে এর নাম চান্-পো। এখনও ভাগলপুরের কাছে চম্পার অস্তিত্ব বিদ্যমান। ম. চৌ.

অঙ্গ : জৈনদের প্রধান ধর্মসাহিত্য আগমশাস্ত্রের অংশবিশেষ। 'দৃষ্টিবাদ' ছাড়া আগমশাস্ত্রের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ ; কিন্তু অঙ্গগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র এগারো ; দৃষ্টিবাদসহ বারো। এগুলি দ্বাদশাঙ্গ নামে অভিহিত। এই বারোখানা গ্রন্থ জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। এগুলি ছাড়া বারোখানা উপাঙ্গ গ্রন্থও আছে। কথিত আছে যে, জৈন সাধুগণ এই দ্বাদশাঙ্গ কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। মহাবীরের নির্বাণ লাভের পর ১৬০ বছর পর্যন্ত এগুলি লোকের মুখে মুখেই প্রচারিত হত। অতঃপর এগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। অঙ্গগ্রন্থের মূল বক্তব্য এই যে, প্রতি সদ্পদার্থের মধ্যে প্রতিক্ষণেই যুগপৎ উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতির কাজ চলছে ('উপ্পনেই বা বিগমেই বা ধুবেই বা') এ ত্রিপদী বাক্যই জৈনদর্শনের মূল কথা এবং এটাই জৈনদর্শনে 'পরিণামবাদ'। জৈনদের দ্বাদশাঙ্গগ্রন্থে এ মূলতত্ত্বই নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। ম. চৌ.

অঙ্গদ : রামায়ণে উক্ত কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। এঁর জনক কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালি এবং জননী তারা। বালি রাম কর্তৃক নিহত হলে পিতৃব্য সুগ্রীব রাজা হন এবং অঙ্গদকে যুবরাজ রূপে অভিষিক্ত করেন। বানরসেনার অধিনায়ক রূপে তিনি রামের পক্ষে লঙ্কায় যুদ্ধ পরিচালনা এবং সীতা উদ্ধারে রামকে সহায়তা করেন। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর অঙ্গদ কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন। ত. শ.

অঙ্গহীনা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত পণ প্রথা বিষয়ক ছোটগল্প। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'প্রদীপ' নামক পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। পরে লেখকের 'নবকথা' (ডিসেম্বর ১৮৯৯ সাল) নামক গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যাদায় সমস্যাকে এই গল্পে রূপায়িত করা হয়েছে। সংক্ষেপে এর কাহিনীটি হচ্ছে—জমিদার পুত্র মোহিনীর সঙ্গে শ্যামাচরণ বাবু তার কন্যা শৈলবালার বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু পাত্রপক্ষের দাবি তিন হাজার টাকা। এই দাবি পূরণ করা শ্যামাচরণ বাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং জমিদার পুত্রের আশা তাকে ছাড়তে হয়। পরিশেষে দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রের সঙ্গে শৈলবালার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু কন্যা অঙ্গহীনা এই অভিযোগে বিয়ের রাতে বর পালিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে মোহিনীই শেষ পর্যন্ত শৈলবালাকে বিয়ে করে। মোহিনীর পিতা পরে সব জানতে পেরে শৈলবালাকে পুত্রবধূরূপে স্বীকৃতি দেন এবং সাদরে গ্রহণ করেন। পণ প্রথা ও কন্যা বিয়ের সমস্যা আরো জটিলভাবে উপস্থাপিত করার অবকাশ এই গল্পের কাহিনীতে থাকলেও লেখক তা পরিহার করেন। তার ফলে গল্পের বাস্তবতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বরের পিতা রায় মশায়ের চরিত্রে অর্থ গৃধ্নুতার ছবি আরো সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুললে কাহিনী বাস্তবতার রঙে রঞ্জিত হতে পারতো। অ. ন.

অঙ্গারপর্ণ : মহাভারতের চরিত্র বিশেষ। কুবেরের সখা ও গন্ধর্বরাজ। এর অপর নাম চিত্ররথ ও দগ্ধরথ। অঙ্গারপর্ণ ইন্দ্রের সারথির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর একটি বিচিত্র রথ ছিল বলে এঁর অপর নাম হয় চিত্ররথ। পান্ডবগণ একচক্রা গ্রাম থেকে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পাঞ্চালের দিকে যাচ্ছিলেন। সে সময় সোমাশ্রয়ণ তীর্থে গঙ্গায় নারীপরিবৃত হয়ে অঙ্গারপর্ণ জলবিহারে রত ছিলেন।

www.pathagar.com

পান্ডবরা সেখানে উপস্থিত হলে তাঁদের দেখে অঙ্গারপর্ণ বিরক্তি বোধ করেন। তিনি নিজের ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হয়ে সগর্বে বলেন যে, তাঁর জলবিহারের সময় দেবতারাও সেখানে আসতে সাহস পান না ; অথচ পান্ডবরা মানুষ হয়ে কোন সাহসে সেখানে এসেছেন! এভাবে অর্জুনের সঙ্গে তর্কাতর্কি হতে হতে শেষ পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অর্জুন আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে অঙ্গারপর্ণের রথ দগ্ধ করে দেন। তদবধি তাঁর আরেক নাম হয় দগ্ধরথ। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অঙ্গারপর্ণ অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী কুম্ভীনসীর অনুরোধে ও যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন তাঁর প্রাণভিক্ষা দেন। এর পরে অবশ্য অর্জুনের সঙ্গে অঙ্গারপর্ণের সখ্য স্থাপিত হয় এবং তিনি অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা দান করেন। ঐ বিদ্যার বলে ত্রিলোকের সবকিছু ইচ্ছামাত্র দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া অঙ্গারপর্ণ অর্জুনকে একশো গন্ধর্ব দেশীয় অশ্ব দিয়ে সে সবের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। ম. চৌ.

অঙ্গিরা : হিন্দু পুরাণোক্ত চরিত্র বিশেষ। ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র এবং তাঁরই মুখ থেকে নিঃসৃত। তিনি কর্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেন। উতথ্য ও বৃহস্পতি এঁর দুই পুত্র। মতান্তরে, তিনি দক্ষকন্যা স্মৃতিকে বিবাহ করেন। সপ্তর্ষি ও দশজন প্রজাপতির মধ্যে অন্যতম। অঙ্গিরা ঋগ্‌বেদের বহু শ্লোকের রচয়িতা। তবে অথর্ববেদের মন্ত্র সংকলনে তাঁর ও তদীয় বংশধরদের খ্যাতিই বেশি। অঙ্গিরা অথর্বার নিকট থেকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে। এজন্য অথর্ববেদের অপর নাম 'আঙ্গিরস বেদ'। ত. শ.

অঙ্গুরীয় বিনিময় : ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৮৫৭ সাল। কাহিনী গড়ে উঠেছে চরিত্রসমূহে খানিকটা সত্য আরোপ, খানিকটা কাল্পনিক ভাবের অবতারণার মাধ্যমে। ইতিহাসখ্যাত চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিবজী, আরংজেব, শাহজাহান, রোসিনারা, জয়সিংহ, রামদাস স্বামী প্রমুখ। এদের চরিত্রচিত্রনে ঐতিহাসিক সত্য অনুসরণের নিষ্ঠা উপেক্ষা করতে পারেন নি। আরংজেবের দাক্ষিণাত্য আক্রমণ ও শিবজীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কাহিনী এবং তার সঙ্গে জড়িত বিষয়াবলীতে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা যথাযথ পালিত হয়েছে কিন্তু উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ গিরিকন্দরে নারার অপহরণ, শিবজী-রোসিনারার প্রণয়, রোসিনারার কাছে শিবজীর বিয়ের প্রস্তাব এবং রোসিনারার মহৎ আত্মবিসর্জনের চিত্র। লেখকের আবেগ ও কল্পনার ঐশ্বর্যেরই এখানে জয় হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্য এবং কল্পনার আদর্শে যে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে তাতে ঘটনা কোথাও কোথাও মনস্তত্ত্বের নিয়ম-নীতিতে বাঁধা পড়েছে এবং সেখানে লেখকের মৌলিকতার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় আরংজেবের অন্তর রহস্য উদঘাটনের স্বগতোক্তিতে, সৈনিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাতে শিবজীর প্রচেষ্টায় এবং তার রণনীতিতে। তবে ঘটনাবিবৃতিতে অথবা বর্ণনায় অনেক সময় অযথা তথ্যভার আরোপ উপন্যাসের গতি মন্থর করেছে। সা. আ.

অচল পদাবলী : নির্মলেন্দু গুণের দশম কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৮২। প্রকাশক : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার, ঢাকা। মূল্য : বারো টাকা মাত্র। প্রচ্ছদ : প্যাটি বয়সনের শিল্পকর্ম অবলম্বনে নির্মলেন্দু গুণ। আটান্নটি প্রেমের কবিতার সংকলন। কবিতাগুলোর উপজীব্য মিলনাত্মক প্রেম। সংসারের খুঁটিনাটি অনুষঙ্গে মিলনাত্মক প্রেমের বিচিত্র রূপ এখানে বাঙ্ময়। কোনো কোনো কবিতায় কবির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভাষ্য রবীন্দ্র-কবিতার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে ব্যঞ্জিত হয়ে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। তবে অচল পদাবলীর কবিতাগুলো মিলনাত্মক হলেও কিছু কিছু কবিতা মিলনের তৃপ্তিসুখ-বন্দনায় উজ্জ্বল, আর এক ধরনের কবিতার মিলন সুখ দীর্ঘ না হওয়ার আশঙ্কায় ব্যথিত। কলা প্রকৌশলের দিক থেকে দেখলে বলতে হবে এ বইয়ের অধিকাংশ কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা, কিছু কিছু কবিতা

www.pathagar.com

অবশ্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও লিখিত। অধিকাংশ কবিতাই আয়তনে নাতিদীর্ঘ। কয়েকটি সনেটও রয়েছে। **আ. মা.**

অচলায়তন : রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম। কবি ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে শিলাইদহে বসে নাটকটি রচনা করেন। ১৩১৮ সালের পূজা সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় নাটকটি প্রথম মুদ্রিত হয়। ধর্ম, সমাজ ও আচারের নামে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছিল সেখান থেকে আমাদের সংস্কার, অভ্যাস ও যুক্তিকে মুক্তি দানের আহ্বান ঘোষিত হয়েছে এ নাটকে। মহাপঞ্চক ও তাঁর অনুসারিগণ জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে নীচ ও অস্পৃশ্য আখ্যা দিয়ে নিজেদের একান্তভাবে পৃথক করে নিয়েছিল, কতকগুলি অর্থহীন মন্ত্রতন্ত্রের অনুশাসন দ্বারা সমাজের মধ্যে তারা অভিশপ্ত গন্ডি রচনা করেছিল। ক্ষমাশীল আচার্য আর প্রাণবন্ত পঞ্চক তাদের এই গন্ডির মধ্যে স্থান লাভ করতে পারে নি, কারণ তাঁরা সংস্কারের দাসত্ব করতে চায়নি। অবশেষে সত্যের আঘাতে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে পড়লো ; মিথ্যাদম্ভে এতদিন যারা নিজেদের তৈরি বৃত্তে আবদ্ধ ছিল, তাদের সঙ্গে উন্মুক্ত আকাশতলবাসী জনসাধারণের সক্রিয় যোগাযোগ ঘটলো। এ নাটকে প্রাণশক্তির সঙ্গে জড়শক্তির সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। এখানে পঞ্চক প্রাণশক্তি এবং মহাপঞ্চক জড়শক্তির প্রতীক। প্রাণশক্তির কাছে জড়শক্তির পরাজয়ে নাটক শেষ হয়েছে। **আ. হা. শা.**

অচিন রাগিনী : সতীনাথ ভাদুড়ী রচিত উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসগুলোর একটি। নতুন-দিদিমা, তুলসী, ও পিলে—এই তিনটি প্রধান চরিত্রের আশ্রয়ে নারীর অপরূপ শ্রীমণ্ডিত সর্বাত্মক ভালোবাসা, সমসাময়িককালে গ্রামীণ জীবনে বিবাহিত নারীর বন্দিদশা ও নারীর স্বাতন্ত্র্য, বাংলার গ্রামীণ জীবনের সামগ্রিক মধুরতা, সৃষ্টিশীল কিশোরদের দূরন্তপনা, নাট-সমাজের চিত্র, সর্বোপরি মানবচরিত্রের বিচিত্র সম্পর্কের সমন্বয়ে এবং প্রধানত সংলাপধর্মী পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের আখ্যান। উপন্যাসের বাইরের অবয়বের চেয়ে নতুন-দিদিমা, তুলসী ও পিলের আন্তর্জাতিক উত্থান-পতনসমূহ প্রধান হয়ে উঠেছে। ৩৩ বছর বয়সের পার্থক্য নিয়ে স্বামীর ঘর করতে এসেও নতুন-দিদিমা যে 'টান-ভালোবাসা'র মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছে তাতে প্রকাশ পেয়েছে নারীর শক্তির আসল স্বরূপ। বিপরীতে লেখক আঘাত করেছেন বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে। নতুন-দিদিমা ও বাংলাদেশের মাধুর্য-দুইই একাকার হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে শিশু/কিশোর মনস্তত্ত্বের সার্বিক পরিচয় মেলে পিলে ও তুলসী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার কথ্যভাষার মিষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা উপন্যাসে। প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৪, প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। প্রচ্ছদ : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। **মো. আ. মি.**

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : সাহিত্যিক। পিতার কর্মস্থল নোয়াখালী শহরে ১৯০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস মাদারীপুর জেলার দাসর্তা গ্রামে। পিতা রাজকুমার সেনগুপ্ত নোয়াখালী মাইজদি কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। মাতার নাম হেমলতা দেবী, স্ত্রী নীহার কণা। পিতার মৃত্যুর (১৯১৬) পর নোয়াখালী ছেড়ে কলকাতার ভবানীপুরের বকুলবাগান রোডে অগ্রজ জিতেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের (কলকাতা হাই কোর্টের উকিল) বাড়িতে আসেন। ১৯২০ সালে কলকাতার সাউথ সুবার্বান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। সুবার্বান কলেজ থেকে ১৯২২ সালে আই.এ. ও ১৯২৪ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ পাস করেন। ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৯ সালে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। কল্লোলের (১৩৩০) সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুর (১৩৩২) পর 'কল্লোল'

www.pathagar.com

সম্পাদনার অলিখিত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে বিচিত্রার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুদিন আলিপুর (কলকাতা) আদালতে আইন ব্যবসা করেন। ১৯৩১ সালে মুন্সেফ পদে চাকরিতে যোগদান করেন। পরে সাব-জজ ও জেলা-জজ হন। ১৯৬০ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পাশাপাশি রচনা করেছেন ধর্মগুরুদের জনপ্রিয় জীবনচরিত। তাঁর 'পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ' (১ম খণ্ড ১৩৫৮, ২য় খণ্ড ১৩৫৯, ৩য় খণ্ড ১৩৬১, ৪র্থ খণ্ড ১৩৬৪) একটি বহুল পঠিত জীবনীগ্রন্থ। তাঁর উপন্যাস, গল্প ও কবিতা বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অগণিত মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও প্রেম-বিরহ তাঁকে আলোড়িত করেছিল এবং সে সব মানুষের অন্তরঙ্গ জীবন-কথা তাঁর লেখায় কাব্যময় ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : বেদে (১৩৩৫), বিবাহের চেয়ে বড়ো (১৩৩৮), কাকজ্যোৎস্না (১৩৩৮), প্রথম কদম ফুল (১৯৬১) ; গল্প : টুটা-ফাটা (১৩৩৫), ইতি (১৩৩৮), অকাল বসন্ত (১৩৩৯), হাড়ি মুচি ডোম (১৩৫৫); কবিতা : অমাবস্যা (১৩৩৬), প্রিয়া ও পৃথিবী (১৩৪০), উত্তরায়ন (১৩৮১) ; স্মৃতিকথা : কল্লোল যুগ (১৯৬১)। সাহিত্যকীর্তির জন্য তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৫) ও উত্তরায়ন কাব্যগ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৫) প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২৯ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। নূ. ই.

অচিরবতী : ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে প্রবাহিত রাপ্তি নদীর প্রাচীন নাম। কোশল দেশের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরী এই নদীর ওপর অবস্থিত ছিল। অচিরবতীকে পঞ্চ মহানদীর অন্যতম বলা হতো। পালি সাহিত্যে এই নদীর নাম সুবিখ্যাত। সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে এর উল্লেখ 'অজিরবতী' বানানে দেখা যায়। এই নদীকে সম্ভবত ঐরাবতীও বলা হতো এবং তা থেকেই রাপ্তি নামের উদ্ভব হয়েছে। আ. খা.

অচেনা : উত্তম পুরুষে বর্ণিত বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত প্রথম বই এবং প্রেমের উপন্যাস। লিলি নামক এক তরুণীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং প্রণয়ের কাহিনী ৯ মার্চ থেকে ২৭ মার্চের দুপুর পর্যন্ত মোট ১১ দিন বিস্তৃত। উপন্যাসে অজস্র স্বপ্নের ব্যবহার আছে। চট্টগ্রামের গ্রাম, পাহাড়, কর্ণফুলী এবং চট্টগ্রাম শহর--এর পটভূমি। কালুর ঘাট সেতুর উপর এই প্রণয় কাহিনীর সমাপ্তি। জ্বা. ব.

অচেনাকে চিনে চিনে : অশোক মিত্র রচিত প্রবন্ধ সংকলন। এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধের সংখ্যা তেরো। প্রকাশ করেছে দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৬। মূল্য : ৬০ রুপি। অশোক মিত্র প্রবন্ধ লেখেন বিষয়কে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত অথবা খণ্ডনের মধ্য দিয়ে। ভাষা অনেকটা ধ্রুপদ ধাচে। এই প্রবন্ধ সংকলনের ১ম প্রবন্ধ জীবনানন্দ দাসকে নিয়ে। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'প্রগতি কল্লোলের উদ্দাম অধ্যায়ে, জীবনানন্দের দিকে তাকাবার মতো কারো অবসর ছিলো না। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে আছে নিজের নিয়ত ঠিকানা পাল্টানোর জীবন, তড়িৎ হারিয়ে যাওয়া ধ্যানের বিচ্ছিন্ন ধন, স্মৃতির গম্বুজ অরুণ কুমার সরকারের সঙ্গে ইত্যাদি। এসব প্রবন্ধে অশোক কুমার মিত্র পাঠককে নিয়ে যান ১৯৪৫ সালের কলকাতায়। যেখানে 'যুদ্ধ হয়তো সদ্য থেমেছে কি থামেনি, অপরিসর ঘর, আড্ডা, সিগারেটের ছাই, ধোয়া, সাদা পেয়ালায় সঙ্গে চা, রবীন্দ্রনাথের গানের টুকরো, অসংখ্য টকুরো কবিতার অক্ষেঘহিণী পংক্তি'তে। আবার দেখা গেছে সম্পূর্ণ আবেগ বর্জিত ঋজু গদ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। প্রায় তিন দশকের বেশি সময়ের বিভিন্ন বাঁকে চিন্তাশীল অশোক মিত্রের এই প্রবন্ধ সংকলন পাঠককে নিয়ে যায় বিচিত্র পথে। সে. হো.

অচ্যুত গোস্বামী : লেখক। ফরিদপুর জেলার কমলাপুর গ্রামে ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শশিমোহন গোস্বামী। কলকাতা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাস করেন। ১৯৪০ সালে ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪২ সালে মার্কসবাদী পাক্ষিক প্রতিরোধ প্রকাশ করেন এবং তা কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গে দুই বছর সম্পাদনা করেন। উলবেড়িয়া কলেজ ও পরে বিজয়গড় কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থ। উপন্যাস : কানাগলির কাহিনী, রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর, মৎস্যগন্ধা, স্বর্গচ্যুত হে ঈশ্বর। গদ্যগ্রন্থ : ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস। ১৯৮০ সালে পরলোকগমন করেন। ন. ই

অচ্যুতচরণ চৌধুরী, তত্ত্বনিধি : ভক্ত বৈষ্ণব ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা অচ্যুতচরণ চৌধুরীর জন্ম সিলেটে। আজীবন অক্লান্ত সাহিত্য সাধনার জন্য তিনি সরকার থেকে একটি সাহিত্য-ভাতা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে— 'ভক্ত নিবাণ', 'রঘুনাথ দাসের জীবনী', 'গোপাল ভট্ট জীবনী', হরিদাস জীবনী', 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী', 'শ্রীচৈতন্যচরিত', 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ), 'সাধুচরিত', 'নিতাই লীলালহরী', 'শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ' ইত্যাদি। আ. ন. ম. ব. র.

অচ্যুত দাস : ১৬শ শতকের উৎকল-রাজ প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক ছ'জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির অন্যতম। অচ্যুত দাস ছিলেন চৈতন্য মতের অনুসারী এবং সনাতন গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু তিনি তাঁর বৈষ্ণব ধর্মমতের অন্তরালে বুদ্ধের উপাসনা করতেন। ফলে তৎকালীন রাজা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিরাগভাজন হন। অচ্যুত দাস রচিত গ্রন্থ 'শূন্যসংহিতা'। আ. ই

অচ্যুতানন্দ : বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বৈষ্ণব ভক্ত অদ্বৈতাচার্যের পুত্র। সীতা দেবীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' মতে, অদ্বৈতাচার্যের ছয় পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠতম। আনুমানিক ১৫০৯ সালের কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম হয়। অচ্যুতানন্দ বাল্যকাল থেকেই শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। যৌবনে তিনি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ লীলাকালে গৌরাঙ্গ মাঝে মাঝে অদ্বৈতের ঘরে আসতেন। অচ্যুতানন্দ তখন তাঁর নিকট কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ ও বিদ্যাভ্যাস করেন এবং অল্পকালের মধ্যে সুশিক্ষিত হয়ে উঠেন। তিনি ক্রমে সংসারবিরাগী হয়ে ওঠেন এবং গৌরাঙ্গের স্বস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাপ্রভু লীলাচল চলে গেলে কিছুদিন পর অচ্যুতানন্দও সেখানে গিয়ে তাঁর সংস্পর্শ লাভ করেন। ভাগবত গ্রন্থের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এ কারণেই সম্ভবত তিনি বিখ্যাত ভাগবত-পাঠক গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া তিনি নৃত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রথযাত্রাদি উপলক্ষে অচ্যুতানন্দ নৃত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর অচ্যুতানন্দ শান্তিপুরে এসে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন সীতাদেবীর প্রাণস্বরূপ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাতার সঙ্গেই অবস্থান করতেন। ভক্ত সমাজে অচ্যুতানন্দের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। তিনিই হরিচরণ দাসকে 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। খেতুরির ষড়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে মহোৎসব হয়, তাতে অচ্যুতানন্দ উপস্থিত ছিলেন ; প্রধানত তাঁর চেষ্টার ফলেই ঐ উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়। কেশবভারতী গৌরাঙ্গের গুরু ছিলেন এমন কথা পিতার মুখে শুনে তিনি মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, যিনি জগৎগুরু, তাঁর কোনোগুরু থাকতে প্যারে না। ম. চৌ.

অজ : হিন্দু পুরাণোক্ত চরিত্র বিশেষ। অযোধ্যার মহারাজ রঘুর পুত্র, দশরথের পিতা এবং রামচন্দ্রের পিতামহ। শাপভ্রষ্টা অপ্সরা বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তিনি পথিমধ্যে এক হস্তী কর্তৃক আক্রান্ত হন। তার আদেশে হস্তীটি গুরুতর আহত হয়ে এক অপরূপ গন্ধর্বে রূপান্তরিত হয়। প্রিয়ম্বদ নামে এই গন্ধর্ব জনৈক ঋষিকে উপহাস করায় তাঁরই অভিশাপে তিনি মত্ত

www.pathagar.com

হস্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। অজ তাঁকে হস্তীরূপ থেকে মুক্ত করায় তিনি অজকে 'সম্মোহন বাণ' দান করেন। এ বাণের সাহায্যে অজ স্বয়ংবর সভার সকল রাজন্যকে পরাজিত করে ইন্দুমতীকে স্বীয় পত্নীরূপে লাভ করেন। এই ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হয়। একদা ইন্দুমতী উদ্যানে বিহার করছিলেন। এমন সময় আকাশপথে গমনশীল মহর্ষি নারদের বীণার অগ্রভাগ থেকে এক দিব্য পুষ্পমালা তাঁর বুকে পড়ে এবং তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর দশরথের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে অজ স্বর্গারোহণ করেন। কালিদাসের রঘুবংশের অষ্টম সর্গে পত্নীবিয়োগে অজবিলাপের বর্ণনা আছে। মু. আ. রা.

অজ একপাদ : ঋগবেদে বর্ণিত প্রাচীন দেবতা বিশেষ। ঋগবেদে এই দেবতাটিকে একপদ বিশিষ্ট অজরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কোনো প্রাচীন টোটেম-বিশ্বাসের উপর এর অধিষ্ঠান। এর সম্পর্কে 'মিথে'র ব্যবহার নেই, তবে এই দেবতার অনুরূপ কয়েকটি দেবতার কল্পনা আছে। পরবর্তীকালের দেবকল্পনায় অজ একপাদের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে। যেমন, শিবের একপাদ মূর্তি। মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে। মহাভারতে অজ একপাদ একাদশ রুদ্রের অন্যতম এবং শিবের উপাধি রূপে গণ্য হয়েছে। আ. ই

অজগর : হরিপদ দত্ত। উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড মাঘ ১৩৯৫ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইতিহাস সংশ্লেষিত রাজনৈতিক ধারার উপন্যাস। পটভূমি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে আশির দশকের জিয়াউর রহমানের শাসনামল পর্যন্ত বিস্তৃত। পটভূমি ঢাকার অদূরে লেখকের জন্মস্থান নরসিংদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ভারতবর্ষ তথা পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ রয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস আটপৌরে, সহজ সরল। বাংলাদেশের গ্রাম আস্তে-ধীরে কিভাবে পালটে গেছে তার এক নিখুঁত চলচ্ছবি পাওয়া যাবে এ লেখাতে। কথক হরিপদ দত্তের প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের অন্দরমহল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। ফলত উপন্যাসের সামগ্রিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে এটা একটা ইতিবাচক দিক। এছাড়া হিন্দু মিথের পাশাপাশি মুসলিম মিথকে স্বরচিত ভঙ্গিতে ব্যবহার করে পাঠককে চমকে দিয়েছেন। অনুষঙ্গ হিসেবে স্লোগান, পাঁচালি, কবিগান, বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তির যথার্থ প্রয়োগ করে লেখক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পেয়ারা-জয়নাল জুটি ছাড়াও নূরী চরিত্রের বহুমাত্রিক দিক লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। মতাদর্শের দিক থেকে হরিপদ দত্তের প্রথম পুরুষ বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। ফলে চরিত্রগুলোর চেতনা তাত্ত্বিকভাবে সফল হলেও প্রায়োগিক দিক থেকে ততটা সফল হয় নি। ফলে প্রধান প্রধান চরিত্রের সার্বিক বিকাশ ও উত্তরণ ঘটে নি 'অজগর'-এর মৃত্যুর পরেও আবার বনে নতুন অজগর দেখা যায়। এখানে অজগর প্রতীকী অর্থে অর্থাৎ পৃথিবীর তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তথা শোষক শ্রেণীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন লেখক। এছাড়া অজগরকে মহাকালরূপী সময়ের রূপক হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। এখানে সব কিছু ধ্বংস হলেও অজগররূপী মহাকাল নির্মম, নির্মোহ হয়ে কখনই ধ্বংস প্রাপ্ত হন না। হরিপদ দত্তের কৃতিত্ব এখানেই যে, অজগর উপন্যাসে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্ধি-সন্ধি হদিস করে, রাজনৈতিক মাত্রাকে প্রাধান্য দিয়ে বামপন্থী মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ শতকের সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন। গৌ. ম.

অজগর রাজা পধুং মাং : রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি পার্বত্য জেলার লোককাহিনী ও রূপকথার সংকলন। সম্পাদক ও সংকলক : বিপ্রদাস বড়ুয়া। রাজকুমারী মগরি (মারমা রূপকথা), যাইওয়ানসা (ত্রিপুরা কাহিনী), ভোগা কাইন (ঘুমি কিংবদন্তি), অজগর রাজা পধুং মাং (চাকমা রূপকথা), বনবিলাস (চাকমা রূপকথা) ও ভোগা হ্রদ (বোম

কিংবদন্তি) এই ছয়টি কাহিনী আছে। প্রকাশক দি মিডিয়া, ১৩০ নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা ১২১৭। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪। পৃষ্ঠা ৭২। মূল্য ৪০.০০ টাকা। জ্ঞা. ব.

অজন্তা : ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত একটি পাহাড়ের গুহাবলী, যা ভারতীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন বহন করে। প্রায় ২৫০ ফুট উঁচু একটি খাড়া পাহাড়ের পার্শ্বদেশ কেটে গুহাগুলি নির্মিত এবং ১৮০০ ফুট ব্যাপী অর্ধবৃত্তাকারে সেগুলি অবস্থিত। দু-একটি অসম্পূর্ণ গুহাসহ এগুলির সংখ্যা তিরিশ। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে গুহাগুলি তৈরি হয়। এগুলির মধ্যে পাঁচটি বৌদ্ধ-মন্দির ও বাকি পঁচিশটি সঙ্ঘারাম। অধিকাংশ গুহাই নির্মিত হয় বাকাটকদের রাজত্বকালে। শৈলখণ্ড স্থাপত্যের বিবর্তনধারায় অজন্তার গুহাগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির গাত্রস্থ অসংখ্য দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া দেয়ালচিত্রগুলিতে নরনারীর ললিত সৌন্দর্য ও বিচিত্র আবেগ নিখুঁত ও জীবন্তরূপ লাভ করেছে। চিত্রগুলি তৎকালীন সমাজের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কার-বিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্রাদি, এমনকি যুদ্ধবিগ্রহ প্রক্রিয়ারও প্রামাণ্য দলিল বিশেষ। এতে বৌদ্ধ শিল্পকলার একটা ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। শব্দটি 'অজন্টা' বানানেও প্রচলিত। ম. চৌ.

অজন্তা : অসিতকুমার হালদার রচিত চিত্রশিল্প সংক্রান্ত গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৯১৩ সাল। খ্যাতনামা শিল্পী অসিতকুমারের এই গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যে ইন্ধ্যাদ্রি পর্বতগাত্রে খোদিত অজন্তা গুহায় ভারতের বিভিন্ন চিত্রের যে উৎকৃষ্ট নির্দশন উৎকীর্ণ রয়েছে তারই মনোজ্ঞ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ শিল্পী বন্ধুর সাথে অজন্তায় গিয়ে লেখক অজন্তার চিত্র ও শিল্পকলা সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাইই তিনি সহজ, সরল ও স্পষ্টভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। আ. ই

অজন্তা অপরূপা : নারায়ণ সান্যাল। গবেষণামূলক গ্রন্থ। ভারতের হায়দারাবাদের অজন্তা একটি অনন্য প্রাচীন বৌদ্ধ গুহা-চিত্রশালা। ১৮১৭ সালে একদল ইংরেজ সৈন্য এটি আবিষ্কার করে। নারায়ণ সান্যাল ১৮২৯ সালে অজন্তা ভ্রমণ করে এর একটি আনুপূর্বিক বর্ণনা লেখেন, সেই বইয়ের নাম 'অজন্তা অপরূপা'। ১৮২৯ সালে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিকীতে। এভাবে অজন্তার আবিষ্কার শুরু হয়। গ্রন্থে মোট ১১টি পরিচ্ছেদ আছে। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী ধরে তিনি গুহাচিত্রগুলোর বর্ণনা দেন কাব্যিক গল্পভাষায়। গ্রন্থে মূল চিত্রের প্রচুর চিত্রের স্কেচ ও মূলচিত্র ছাপা হয়েছে। প্রকাশক হৃষীকেশ বারিক, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯। রূপান্তরিত প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ২১৫, মূল্য ৩০.০০ রুপি। বি.ব.

অজমুখ : হিন্দু পুরাণোক্ত দক্ষ প্রজাপতির অপর নাম। দক্ষ এক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞে জামাতা শিব ও কন্যা সতী ছাড়া আর সব দেবদেবীই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই এ যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। শিব তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালে সতী কালী, তারা প্রভৃতি মূর্তি ধারণ করলেন। এতে শিব ভীত হয়ে পালিয়ে যান। দক্ষ যজ্ঞের শুরুতে পিতা দক্ষ শিবনিন্দা আরম্ভ করলে পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী যজ্ঞস্থলেই দেহত্যাগ করেন। তার আগে তিনি পিতাকে বলেছিলেন, যে মুখে পিতা তাঁর স্বামীর নিন্দা করেছেন, সেই মুখ 'ছাগমুখ' হবে। সতীর দেহত্যাগের খবর পেয়ে অনুচরসহ শিব এসে যজ্ঞ ভণ্ডুল করে দক্ষের মস্তক ছিন্ন করে ফেলেন। তারপর দক্ষপত্নীর স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শিব দক্ষের প্রাণদান করলেও তাঁর দেহোপরি ছাগমুণ্ড সংযোজিত করে দেন। তদবধি দক্ষের নাম হয় 'অজমুখ'। মু. আ. রা.

www.pathagar.com

অজয় : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি পার্বত্য নদী। সাঁওতাল পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে উৎপন্ন হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সীমানা নির্দেশ করে কাটোয়া শহরের নিকট ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কেবল বর্ষাকালেই নদীটি নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকে। বছরের অন্য সময় পায়ে হেঁটেই তা পার হওয়া যায়। এই নদী-উপত্যকায়, বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কয়লাখনির অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কবি জয়দেবের বাসভূমি কেন্দুবিল্ব বা জয়দেব-কেঁদুলি গ্রাম এবং বর্ধমান জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' অজয় নদীর তীরে অবস্থিত। **আ. খা.**

অজয় : সজনীকান্ত দাস রচিত প্রণয়সংঘাতময় উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক অজয়ের জীবনের শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত প্রণয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তার জীবনে প্রথম প্রেমের সাক্ষাৎ ঘটে ডলি ও ডেজি সংস্পর্শে। সেখান থেকে কলকাতায় এসে সে তার মামাতো বোনের সহপাঠিনী রেণুর সঙ্গে প্রেম-সম্পর্ক গড়ে তোলে। অজয়ের মনে প্রেমের আবির্ভাবের পুলক ও আনন্দের অভিব্যক্তি হয়েছে কবিতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার প্রেমের চেতনায় এক অনাসক্ত মনের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কবিতার মারফৎ রেণুকে সে এই কথাই জানিয়েছে। রেণু তার প্রণয়াস্পদকে চিরকালের মিলন-সূত্রে গাঁথবার প্রয়াস পায়, কিন্তু অজয়ের সতর্কবাণী তাকে সংযত করে। সুতরাং তাকে ছেড়ে রেণু অন্যত্র বিয়ের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। অন্যদিকে ডলির বিবাহিত জীবন তার বাল্যপ্রেমের স্মৃতিতে তিক্ত হয়ে ওঠে। অনেক দিন পরে অজয়ের সাক্ষাতে তার বাল্য প্রণয়ের স্মৃতি উজ্জ্বল রেখায় জ্বলে ওঠে। এরপর অজয়ের প্রেমচেতনা নগ্ন যৌনক্ষুধা ও কামপ্রবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়। রেণুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে সে জীবনের এই নতুন উপলব্ধিকে রূপায়িত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু কিছুদিন পর অজয় নিজেই এই কামতাড়িত জীবন থেকে মুক্তির সন্ধান করে। সে কবিতা চর্চায় সফলতা আনয়নের চেষ্টা করে। তারপর বিমলাকে নিয়ে অজয় গ্রামে ফিরে আসে, কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রতিকূলতায় উভয়ে গ্রাম থেকে নির্বাসিত হয়ে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ায়। বিমলার গর্ভের সন্তানের মধ্যে ডলি, রেণু, বিমলা এই তিনজনের মাতৃত্বই যেন আত্মপ্রকাশ করে। উপন্যাসের কাহিনী কবিত্ব ও মনস্তত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেও চরিত্রের বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হয়েছে। **আ. ই.**

অজয় ভট্টাচার্য : কুমিল্লা জেলার শ্যামগ্রামে ১৯০৬/৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজ-কুমার ভট্টাচার্য। অজয় ভট্ট্যাচার্য কবি, গীতিকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক। 'অধিকার', 'শাপমুক্তি', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'মহাকবি কালিদাস' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা করেন। 'শুক ও সারী', 'রাতের রূপকথা', 'ঈগল ও অন্যান্য কবিতা', 'সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা' ইত্যাদি তাঁর কবিতার বই। গানের বই 'আজো ওঠে চাঁদ' (১৩৫২) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে', 'ওগো বাদল রাতি', 'একদিন যবে গেয়েছিল পাখি', 'আজো ওঠে চাঁদ', 'আমার দেশে যাইও সুজন', 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা' ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় গান। তাঁর বহু গানের সুরকার ছিলেন শচীন দেববর্মণ। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর অনুজ। ১৯৪৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। **নূ. ই.**

অজয় রায় : প্রাবন্ধিক। ১৯২৮ সালের ২১ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জের কটিয়াদিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রমথনাথ রায়। তিনি ভারতের বেনারস, বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকায় লেখাপড়া করেছেন। সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্থনীতি বিষয়ে। অজয় রায়ের পেশা লেখা ও রাজনীতি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই রাজনীতিভিত্তিক। তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। পদচিহ্ন (১৯৬৯), উষালগ্ন (১৯৬৯) ও পরিচিত কাহিনী (১৯৬৯) নামে তিনটি উপন্যাস ছাড়াও তাঁর প্রধান

www.pathagar.com

রচনা বাঙলা ও বাঙালি (১৯৭৭), বাংলাদেশের অর্থনীতি : অতীত ও বর্তমান (১৯৭৮), আমাদের জাতীয়তার বিকাশ (১৯৮২), বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা : সংকট ও সমাধান (১৯৮৩), রাজনীতি কি ও কেন (১৯৮৬), পুঁজিবাদী অর্থনীতি (১৯৮৬), বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহ (১৯৮৭) ও সাম্প্রতিক (১৯৮৬)। এ-সমস্ত রাজনৈতিক রচনাসমূহের বাইরে রয়েছে জীবনীগ্রন্থ : সত্যেন সেন (১৯৮৮) ও শিশুতোষ গ্রন্থ : ছোটদের হো-চি-মিন (১৯৭৭)। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ তাঁর রচনার অন্যতম দিক। র. হা.

অজাচার : অজের ন্যায় আচার থেকে শব্দটির উৎপত্তি। পরস্পরের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে বলে বিবাহ নিষিদ্ধ এমন নিকটাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গমকে অজাচার বলা হয়। বিবাহ নিষিদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। অনেক সমাজে সমগোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার প্রাচীনকালে কোনো কোনো সমাজে সহোদর ভাইবোনের মধ্যেও বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিশরের টলেমি রাজবংশ এর দৃষ্টান্ত। ম. চৌ.

অজাতশত্রু : (ক) মহাভারতোক্ত জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের নামান্তর। যুধিষ্ঠির কাউকে শত্রু বলে মনে করতেন না বলে তাঁকে অজাত-শত্রু বলা হয়। (খ) উপনিষদোক্ত জনৈক রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল বারাণসী। তিনি সমগ্র বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মহর্ষি গর্গ অজাত-শত্রুকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য বারাণসীতে যান। রাজা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে মহর্ষির নিকট তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে তাঁকে সহস্র ধেনু পুরস্কার দেয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা শাস্ত্রে এত ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, গর্গ তাঁকে উপদেশ দেয়া দূরে থাক তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান দেখে বিস্মিত হন এবং নিজেই তাঁর নিকট অনেক উপদেশ গ্রহণ করেন। ঐ যুগে যেসব ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চা করতেন, অজাতশত্রু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আ. না.

অজাতশত্রু : মগধের হর্যবংশীয় রাজা। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৪-৪৬২ অব্দ। বৌদ্ধ মতে অজাতশত্রু বৃদ্ধ পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। পরে বুদ্ধদেবের নিকট এরূপ পাপকাজের জন্য তিনি অনুতাপ প্রকাশ করেন। অজাতশত্রু শক্তিশালী শাসক ছিলেন। পিতৃহত্যার অপরাধের শাস্তিদানের জন্য তাঁর মাতুল ও বিমাতার ভাই কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রতিবেশী অন্যান্য শাসকের সঙ্গে মিলে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর প্রসেনজিৎ পরাজিত হয়ে অজাতশত্রুর নিকট স্বীয় কন্যার বিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি এবং যৌতুক-স্বরূপ কাশীগ্রাম তাঁর নিকট প্রত্যর্পণ করেন। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে বাধাদানের জন্য অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোন নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত পাটলিগ্রামকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন। পরবর্তীকালে এটিই পাটলিপুত্র নামক এক সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়। অজাতশত্রু লিচ্ছবিদের নিকট থেকে বৈশালী অধিকার করেন। জৈনসূত্র অনুসারে পূর্বভারতে অবস্থিত ছত্রিশটি গণশাসিত রাজ্য সমবায়ও তাঁর নিকট পরাজিত হয়। তিনি মগধরাজকে বৃহত্তর ও অধিকতর শক্তিশালী করে মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। অজাতশত্রু বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ কারণে বৌদ্ধ বিবরণ অনুসারে তিনি যেমন বুদ্ধের অনুগামী ছিলেন ; অপরপক্ষে জৈনরাও তাঁকে জৈনধর্মাবলম্বী বলে দাবি করেন। তাঁর রাজত্বকালেই বুদ্ধ ও মহাবীরের মৃত্যু হয় বলে কথিত আছে। আ. খা.

অজানার উজান : ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত জনপ্রিয় কিশোরপাঠ্য বারোয়ারি উপন্যাস। 'মাসপয়লা' সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৩৪০ সনে উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়ক এক কিশোর। নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে সে জীবনপথে এগিয়ে যায়। গল্পের আরম্ভ হয় মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক, উপসংহার টানেন ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। মধ্যভাগে লেখেন

www.pathagar.com

যথাক্রমে শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন সাহা, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবিনয় রায়চৌধুরী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র। আ.ই

অজিতকুমার গুহ : লেখক ও শিক্ষাবিদ। কুমিল্লা শহরের সুপারিবাগান নামক স্থানে ১৯১৪ সালের ১৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নৃপেন্দ্রকুমার গুহ, মাতা বিধুমুখী দেবী। বিক্রমপুরের আবদুল্লাপুর গ্রামের জমিদার গুহ বংশের সন্তান। পিতামহ মদনমোহন গুহ আইন ব্যবসার কারণে কুমিল্লার সুপারিবাগানে বসতবাড়ি স্থাপন করেন। কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা থেকে ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৩২ সালে আই.এ. ও ১৯৩৪ সালে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৯ সালে বাংলায় এম.এ.পাস করেন। দু' বছর (১৯৪০-১৯৪২) শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা সাহিত্যে শিক্ষা লাভ করেন। বি.টি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকার প্রিয়নাথ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন (১৯৪২-১৯৪৮)। ১৯৪৮ সালে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ করেন। পরে বাংলা বিভাগের প্রধান হন। ১৯৬৮ সালে এই পদ থেকে পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এ আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করায় ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) গ্রেফতার হন। দু' বছর নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে কারাগারে আটক থাকেন। ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারি করা হলে পুনরায় গ্রেফতার হন। তাঁকে প্রায় এক বছর কারারুদ্ধ রাখা হয়। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী, মুক্তবুদ্ধির ভাবুক ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্রুত-কীর্তি অধ্যাপক। পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির ধারা তথা বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি একজন পথিকৃতের কাজ করেছেন। সুন্দর, মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী চিরকুমার অজিত গুহ একজন সুবক্তা ও রুচিশীল গদ্যশিল্পী হিসেবেও খ্যাত। সমৃদ্ধ ভূমিকাসম্বলিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' সম্পাদনা এবং কালিদাসের 'মেঘদূত' অনুবাদ তাঁর প্রধান কাজ। ১৯৬৯ সালের ১২ নভেম্বর কুমিল্লার সুপারি-বাগানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নূ. ই

অজিতকুমার ঘোষ : নাট্য গবেষক। নোয়াখালী জেলার সায়েস্তা নগরে ১৯১৯ সালের ১ জনুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজেন্দ্রপাল ঘোষ। কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (বাংলা), পিএইচ. ডি. ও ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও কলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলা নাটকের গভীর ও তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ, নাটকের মঞ্চাভিনীত রূপের রীতি ও কলাকৌশল এবং বাংলা নাট্যশালা ও নাট্য আন্দোলনের ধারা তাঁর গবেষণায় বিস্তৃতভাবে উঠে এসেছে। গতিশীল ভাষা ও বিষয়ের পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা নাটকের ইতিহাস (১৯৪৬), নাটকের কথা (১৯৫৯), বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা (১৯৬০), শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য (১৯৬৭), বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস (১৯৮৫), নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ (১৯৯১)। নূ. ই

অজিতকুমার চক্রবর্তী : লেখক ও সঙ্গীতশিল্পী। ফরিদপুর জেলার মঠবাড়ি নামক স্থানে ১৮৮৬ সালের ২০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীচরণ চক্রবর্তী। ১৯০৩ সালে বি.এ. পাস করে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯১০ সালে বৃত্তি লাভ করে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলাত যান। রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদ করে ইংল্যান্ড ও ইউরোপে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করে তোলেন। একাজে তিনি পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি কলাবিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি ছিল সর্বজনস্বীকৃত।

www.pathagar.com

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যাতারূপেও তিনি সুপরিচিত। 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯১২) ও 'কাব্য-পরিক্রমা' (১৯১৪) রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওপর তাঁর দু'টি বহুল আলোচিত গ্রন্থ। ক্ষিতিমোহন সেন সংকলিত 'কবীন্দ্র-দোহার' অনেকগুলি পদ তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ 'One Hundred Poems of Kabir' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। জীবনীসাহিত্য রচনায়ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১১) ও 'রামমোহন চরিত' (১৯১৬) তাঁর দু' খানি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ। 'বাতায়ন' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন বহু বিদেশী কবি ও নাট্যকারের সৃষ্টিকর্ম। সতীর্থ কবি-বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের রচনাবলী সংকলন তাঁর আরেকটি অন্যতম কাজ। মৃত্যু. ১৯১৮। নূ.ই

অজিতকুমার দত্ত : কবি। মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে ১৯০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অতুলকুমার দত্ত। ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল থেকে ১৯২৪ সালে এন্ট্রাস ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯২৬ সালে এফ.এ. পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে বি.এ. অনার্স (বাংলা) এবং ১৯৩০ সালে এম.এ. (বাংলা) উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' (১৩৪২) পত্রিকার প্রথম দিকের যুগ্ম-সম্পাদকদের একজন। পরবর্তী কালে 'দিগন্ত' সাহিত্য-বার্ষিকী সম্পাদনা করেন। দিগন্ত পাবলিশার্স (১৯৪৯) নামক প্রকাশনা সংস্থারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতা রিপন কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে। পরে চন্দননগর, বারাসত ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নেন। ত্রিশের দশকের বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'কল্লোলের' (১৯২৩) নিয়মিত লেখক। আধুনিক বাংলা কবিতার তিনি অন্যতম রূপকার। প্রেমের সৌরভ তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। অজিত দত্তের নায়িকার নাম মালতী, যেমন জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন। কবিতার বই : কুসুমের মাস (১৯৩০), পাতালকন্যা (১৯৩৮), নষ্টচাঁদ (১৯৪৫), পুনর্নবা (১৯৪৬), ছায়ার আলপনা (১৯৫১), জানালা (১৯৫৯), কবিতা-সংগ্রহ (১৯৫৯), সাদা মেঘ কালো পাহাড় (১৯৭১)। রম্যরচনা : জনান্তিকে (১৯৪৯), মন পবনের দাও (১৯৫০)। প্রবন্ধ : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস (১৯৬০)। অনুবাদ : কথা-ভারতী, দুর্গাপূজার গল্প। ব্যক্তিগত রচনা লিখতেন 'বৈরতক' ছদ্মনামে। ১৯৭৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় মারা যান। নূ. ই

অজিত কৌর : ভারতের পাঞ্জাবি ভাষার বিখ্যাত লেখিকা। মূলত গল্প-উপন্যাস তাঁর সৃষ্টিকর্মের এলাকা হলেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তিনি বিচরণ করেন। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। চলচ্চিত্র, বই ও নাটকের উপর সমালোচনা করে নিবন্ধ লেখেন। ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বইয়ের অনুবাদ করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'খানা বাদোশ' বাংলা ভাষায় 'জিপসী নদীর ধারা' নামে অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত লেখিকা জয়া মিত্র। এই বইটির জন্য তিনি সাহিত্য অকাদমী পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ Pebbles in a Tin Drum ও Dead End ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, মালয়ালম, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, বুলগেরিয়, ফরাসি, রুশ, পোলিশ ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। Kulwant Singh Virk বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক কমিশন প্রাপ্ত হন এবং বইটি সাহিত্য অকাদেমী থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি খুশবন্ত সিং, হেনরি জেমস, হমর্ন, কে.এ. আব্বাস, সীতাকান্ত মহাপাত্র, রমাকান্ত রথ প্রমুখের রচনা থেকে পাঞ্জাবি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর নিজের আটটি বই উর্দুতে অনূদিত হয়ে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়। ভারতের

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গল্প, উপন্যাস পাঠ্য। গবেষকরা তাঁর রচনার ওপর তিয়াত্তরটি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে দিল্লিতে অবস্থিত একাডেমী অব ফাইন আর্টস ও লিটারেচারের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। সে. হো.

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় : কবি। ন্যায়রত্নের জন্ম ১৮৩৯ সালে, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপে। পিতার নাম রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিখ্যাত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও কবি মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ছিলেন অজিতনাথের শিক্ষাগুরু। পারিপার্শ্বিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে যে কোনো সময়ে দ্রুত কবিতা রচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। দ্ব্যর্থবোধক ও শ্লেষাত্মক কবিতা রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। অজিতনাথ সাপ্তাহিক 'বিশ্বদূত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি রচিত অন্তর্ব্যাকরণ নাট্য-পরিশিষ্টের 'রাজসরণী' নামক টীকা, কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ, 'বকদূত', 'চৈতন্যশতক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯১৬ সালে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। ১৯২০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আ. ন. ম. ব. র.

অজ্ঞেয়বাদ/অজ্ঞাবাদ : দার্শনিক মতবাদ বিশেষ। বিশ্বজগতের অতীন্দ্রিয় সত্তা, যথা আত্মা ঈশ্বর ইত্যাদি বা পরম তত্ত্ব মানবজ্ঞানের অনধিগম্য বিষয়,—এই মতবাদ অজ্ঞেয়বাদ বা agnosticism নামে পরিচিত। অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে কি নেই, অজ্ঞেয়বাদীগণের এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় নি। অজ্ঞেয়বাদী প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদ/empiricism-কে অবলম্বন করে বলেন যেহেতু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই আমাদের একমাত্র সম্বল, সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে বা বলতে পারি না। শতপথ-ব্রাহ্মণ, সাংখ্যদর্শন, বৌদ্ধ শূন্যবাদ ইত্যাদি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে অজ্ঞেয়বাদের নানা নিদর্শন দেখা যায়। গোড়াতে অজ্ঞেয়বাদ ঈশ্বরতত্ত্বে নিবদ্ধ থাকলেও তা বিজ্ঞানের যন্ত্রযুগের প্রসারে অন্যক্ষেত্রেও ভাববাদকে আঘাত করে, কান্ট-অজ্ঞেয়বাদ বিরোধী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরতত্ত্বকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। আর ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর 'এ্যান্টিডুরিং' গ্রন্থে অজ্ঞেয়বাদের অসারতা দেখিয়েছেন। আ. ই.

অঞ্জনী টোড়ী : দিবা গেয় রাগ। এই রাগে কোমল গানধবি শুদ্ধ ও কোমল ধৈবত এবং কোমল ও শুদ্ধ উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। আরোহে ছয় স্বর এবং অবরোহে সাত স্বর প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আরোহে গান্ধার বর্জিত। বাদীস্বর পঞ্চম, সংবাদীস্বর তারষড়জ। ঠাট কাফি। আরোহ : স র ম প ধ প ম দ ন র্স। অবরোহ : স ণ ধ ম প দ প জ্ঞ র স। ক. গো.

অঞ্জলি : কিশোরদের জন্য শিক্ষামূলক মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি চট্টগ্রাম থেকে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (১৮৯৮ খ্রিঃ) রাজেশ্বর দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদক 'অঞ্জলি' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন—'এইখানি শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বালক-বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা ইহার প্রাণ।' ভাদ্র সংখ্যার নাম পৃষ্ঠা থেকে লেখা হয় 'মাসিক পত্র ও সমালোচনা'। তখন থেকে পত্রিকায় সমালোচনার রেওয়াজ হয়। পত্রিকার বিষয় শিক্ষার্থীদের চেয়ে শিক্ষকগণের জন্যই বেশি উপযোগী ছিল। 'অঞ্জলি'তে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের নাম কিংবা সূচি থাকতো না। 'তত্ত্ব-খবরে' জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ই অধিক প্রাধান্য পায়। 'নানা কথা'য় স্বদেশ ও বিদেশের অনেক ঐতিহাসিক, বিজ্ঞান বিষয়ক ও ভৌগোলিক জ্ঞান বিতরণ করা হতো। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'অঞ্জলি'তে 'চীন পরাধীন-পরতার পরিণাম' নামক একটি প্রবন্ধে চীনের মহা ঐতিহ্য ও তার বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে বালক-বালিকাগণকে অবহিত করানো হয়। আ. ই.

অডেন, ডব্লিউ. এইচ : কবি। ১৯০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। হল্টের গ্রাসামস স্কুলে ও অক্সফোর্ডের

www.pathagar.com

ক্রাইস্টচার্চে শিক্ষালাভের পর কিছুদিন স্কুল-শিক্ষকের কাজ করেন ; তখন থেকেই জীবিকার উপায়রূপে কবিতা লেখা শুরু হয়। তাঁর প্রথমদিকে প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে 'ড্যান্স অব ডেথ' (Dance of death), 'লুক স্ট্রেঞ্জার্স' (Look Strangers) প্রধান। ১৯৩৭-এ 'লুক স্ট্রেঞ্জার্স' বইটি 'অব দিস আইল্যান্ড' নামে আমেরিকা থেকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি হিসাবে অডেন সর্বত্র পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯৩৬ সালে বিখ্যাত জার্মান-সাহিত্যিক টমাসম্যানের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁকে কবিতার জন্য 'কিং জর্জ স্বর্ণপদক' পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথমদিকে অডেনের উপর কার্লমার্ক্স ও ফ্রয়েডের প্রভাব পড়ে। তখন আঙ্গিকগত নতুন কলাকৌশল ও বিষয়বস্তুতে সামাজিক উদ্দেশ্যের ঝোঁক তাঁর মধ্যে প্রবল হয় ও বৈপ্লবিক চিন্তার প্রভাব ও আবেগ তাঁকে স্পেনের গৃহযুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট করে। জ্যেষ্ঠ কবি টি. এস. এলিয়টের দার্শনিক প্রবণতার প্রতি অডেন বিরূপ ছিলো, কিন্তু টমাস হার্ডির সহজ প্রকৃতিচর্চা তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৯৩৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নেন ; ১৯৪৮ সালে কবিতার জন্য 'পুলিটজার' পুরস্কার পান। পরিণত বয়সে তাঁর চিন্তার ভিত্তি হয় কিয়ার্কেগার্ডের প্রবর্তিত অস্তিত্ববাদ। অডেন প্রধানত কবি। তাঁর অন্যান্য কাব্য গ্রন্থের মধ্যে 'এনাদার টাইম', 'নিউ ইয়ার লেটার', 'এইজ অব এঙ্গজাইটি', নানস্' (Nuns), 'শীল্ড অব একিলাস' (Shield of Achiles), 'হোমেজ টু ক্লিও' (Homage to Clio), 'সিটি উদাউট ওয়াল্‌স' (City Without Walls) প্রধান। পৃথিবীর কোনো কোনো তরুণ কবির উপর অডেনের প্রভাব ক্রিয়াশীল দেখা যায়। ম. ই

অতদ্‌গুণ : উপযুক্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও যদি গুণ গ্রহণ না হয়, তবে তাকে অতদ্‌গুণ অলঙ্কার বলে। যেমন—'অনুরাগে পরিপূর্ণ হৃদয়ে আমার/ নিত্য নিবসিছ তুমি ; তবু কেন প্রিয়।/ একটুও অনুরাগ কর না ধারণ? (রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)। প্রিয়ের জন্য প্রিয়ার হৃদয় অনুরাগে পূর্ণ, নিত্যদিন প্রিয় প্রিয়ার হৃদয়ে বিরাজ করছে ; কিন্তু প্রিয়ার মনে হচ্ছে, প্রিয়ের হৃদয়ে তার জন্য একটুও অনুরাগ নেই। প্রিয়ের হৃদয়ে প্রিয়ার জন্য অনুরাগ রূপ গুণ গ্রহণের অভাবহেতু এখানে অতদ্‌গুণ অলঙ্কার হয়েছে। শি. প্র. লা.

অতলের আঁখি : হাসান আজিজুল হক। প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশক : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাশ রোড, ঢাকা-১০০০, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, প্রচ্ছদ : সুখেন দাশ, পৃষ্ঠা ২২৪. মূল্য : ১৪০.০০। হাসান আজিজুল হক এই প্রবন্ধ সংকলনটিতে দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মননের এলাকাটিকে সম্প্রসারিত করেছেন। গ্রন্থের চরনাগুলোও লেখক সেভাবেই বিন্যস্ত করেছেন। যেমন—সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজ ভাবনা, ভাষা শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব স্মরণ। বাংলা সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের অখণ্ড প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে লেখকের আগ্রহ। ধারণ করতে চান তিনি বিশ্বনাগরিকের চেতনা। এই উপমহাদেশের দর্শন চর্চার কথা বলতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেছেন কোনো দর্শনই দেশকাল সমাজ নিরপেক্ষ নয়। এই অঞ্চলের নিস্তরঙ্গ সহজ জীবন ও জীবিকা কোনো গুরুতর অথবা গূঢ় জীবন জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়নি বলেই কি ভারতীয় ও বাংলাদেশের চিরায়ত দর্শন শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্মবাদে ধাবিত হয়? সাতচল্লিশ, বাহান্ন, উনসত্তর, একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষের অর্জন তো সামান্য নয়। কিন্তু সমাজ ভাবনায়, সংস্কৃতি চিন্তায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় অকল্পনীয় ব্যর্থতার গ্লানিও কম নয়। রাজনীতির পচন, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষার অধঃপতন এসব আমাদের ব্যর্থতার চিত্র। অতলের আঁখি গ্রন্থে লেখক এসব সমস্যা সম্পর্কে অকপটে নিজের উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন। এই উপলব্ধির মধ্যেও লেখক তাঁর যুক্তিকে আরো সংহত

www.pathagar.com

করতে প্রয়াসী হয়েছেন। লেখকের এসব গভীর সঞ্চারী ভাবনার মূল উৎস সমাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দায়বোধ। পা. র.

অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা, রত্ন পরীক্ষা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাঁচটি বেনামি রচনা। 'কস্যাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামে প্রথম রচনা 'অতি অল্প হইল'। এর প্রকাশকাল ১৮৭৩ সাল। উক্ত বেনামিতে দ্বিতীয় রচনা 'আবার অতি অল্প হইল'। এর প্রকাশকাল ১৮৭৩ সাল। পুস্তিকা দুখানি বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রতিবাদে বিদ্যাসাগরের বেনামিতে লেখা বিতর্কমূলক উত্তর-প্রত্যুত্তর। তৃতীয় রচনা 'ব্রজবিলাস', 'কবিকুল তিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত-ভাইপোস্য' বেনামিতে লেখা নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবা বিবাহ বিরোধী সংস্কৃত বক্তৃতাবলীর উত্তর। প্রকাশকাল ১৮৮৫ সাল। চতুর্থ রচনা 'বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা', 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণ' বেনামিতে বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন ও স্মৃতিরত্ন উপাধিধারী তিন পণ্ডিতের যথার্থ পরিচয় প্রদানকল্পে লেখা। রচনার প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরস্য' প্রণীত পঞ্চম রচনা 'রত্নপরীক্ষা'র প্রকাশকাল ১৮৮৬ সাল। এসব রচনা যে বিদ্যাসাগরেরই লেখা, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথাক্রমে 'পুরাতন প্রসঙ্গ ১ম পর্যায়' ও 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে' এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মানব প্রেমিক বিদ্যাসাগর বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী এসব পুস্তিকায় ভাষাবৈশিষ্ট্য ও যুক্তিনির্ভরতা ছাড়াও রঙ্গমুখরতা ও ব্যঙ্গপ্রবণতার চমৎকার পরিচয় রেখে গেছেন। তখনকার সাহিত্যিক সমাজে এরূপ উচ্চাঙ্গের রসিকতা সৃষ্টি একরূপ অসম্ভব ছিল। এরূপ রসরসিকতা সকলে একসঙ্গে উপভোগ করতে পারে। ভাষা-নির্মাণে বিদ্যাসাগর সাধুরীতিকে কথ্য রীতিতে নিয়ে এসেছেন। সব মিলে স্টাইলের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের রচনারীতি এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলা চলে। আ. গ.

অতিনাটক : নাটকীয় বিষয়বস্তু যখন অস্বাভাবিক ঘটনা-বিন্যাসের সাহায্যে চিত্রিত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিসমাপ্ত হয়, তখন তাকে অতিনাটক বা Melodrama বলে। প্রাচীন গ্রিক নাট্যসাহিত্যে Molodram বলতে এক প্রকার সঙ্গীতবহুল নাটককে বোঝাতো। পরবর্তীকালে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনা-সম্বলিত নাটকের নাম দেওয়া হয় মেলোড্রামা। এই জাতীয় নাটকে ঘটনা ও চরিত্র সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা নাটকীয় দ্বন্দ্বের গুরুত্ব থাকে না, শুধু আবেগের বাহুল্য প্রকাশ পায়। নাটকীয় কাহিনী অবাস্তব ও চরিত্রসমূহ কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়। কোনো মহৎ ভাব ও চরিত্রের রূপায়ণ না থাকায় পাঠকচিত্তে এর আবেদনও খুব সীমিত থাকে। আ.ন.ম.ব.র.

অতিপর্ব : কোনো কোনো সময় পর্ববিভাগ কালে দেখা যায় পংক্তি কিংবা চরণের প্রথমে কিছু অংশ বাড়তি রূপে থাকে। এইটিই হচ্ছে 'অতিপর্ব'। যেমন,

বাগিচায়। বুলবুলি তুই। ফুল শাখাতে। দিসনে আজি। দোল।
আজো তার। ফুল কলিদের। ঘুম টুটেনি। তন্দ্রাতে। বিলোল।।
আজো হায়। রিক্ত শাখায়। উত্তরি বায়। ঝুরছে। নিশিদিন।
আসেনি। দখনে হাওয়া। গজল গাওয়া। মৌমাছি। বিভোল।।

[নজরুল ইসলাম]

'বাগিচায়' 'আজো তার' 'আজো হায়' 'আসেনি' হচ্ছে অতিপর্ব। অতিপর্বকে বাদ দিয়েই কাব্যপংক্তির নিয়মিত পর্ববিভাগ করতে হয়। আরেকটি দৃষ্টান্ত,

আমি বিপুল ভুবন কিরণে করি যে আগে,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।

[রবীন্দ্রনাথ]

প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির 'আমি' এবং 'তবু' হচ্ছে অতিপর্ব। প্রয়োজন মতো অতিপর্বের ব্যবহারে ছন্দ-দোলায় বৈচিত্র্য ও গতি সৃষ্টি হয়। 'অতিপর্ব' নামটি প্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া ('ছন্দ-পরিক্রমা' দ্র:)। আ.ক.

www.pathagar.com

অতিশয়োক্তি : উপমেয় ও উপমানের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ধর্মের জন্য অভেদত্ব কল্পনা করে কবি যখন উপমানকেই প্রাধান্য দেন, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করে ফেলে তখন সেখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। কিন্তু উপমান সর্বেসর্বা রূপে উপমেয়কে গ্রাস করলেও তাকে একেবারে লোপ করে না। কাব্যিক চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে উপমেয়কে ব্যঞ্জনায় বা তাৎপর্যে দেখানো হয়। তাই বাক্যে উপমেয় সরাসরি উল্লিখিত হয় না। যেমন--'হায় শূর্পনখা।/কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগী,/কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা/এ ভুজগে।' (মধুসূদন)। উপমান 'ভুজগ' ; উপমেয় রামচন্দ্রকে উপমান ভুজগ একেবারে গ্রাস করে ফেলায় বাক্যে তা অনুপস্থিত। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের পাঁচটি রূপ দেখিয়েছেন— (ক) ভেদে অভেদ ; এই রূপে ভিন্ন বস্তুকে এক বা অভিন্নভাবে কল্পনা করা হয়। যেমন—'মারাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ অনলে আজ,/ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন গর্জিলো দুমরাজ।' (রবীন্দ্রনাথ)। উপমান 'পতঙ্গপাল' উহ্য উপমেয় 'সৈনিকবৃন্দকে পারস্পরিক অভেদত্বের জন্য গ্রাস করে নিজের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছে। সাহিত্যে ভেদে অভেদ রূপে সৃষ্ট অতিশয়োক্তিকেই আলঙ্কারিকগণ খাঁটি অতিশয়োক্তি বলেছেন। এরূপ আর একটি উদাহরণ—'অলখ মরুর মরসুমী ফুল, হালকা হাওয়ায় ভেসে,/রাজা হারুণের হারেম হইতে হেথা সে দাঁড়ালো এসে' (নন্দগোপাল সেনগুপ্ত)। উপমান 'ফুল' উহ্য উপমেয় 'ইরাণী মেয়ে'কে আচ্ছন্ন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। (খ) অভেদে ভেদ ; এই রূপে এক বা অভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন বলে মনে করা হয় ; যেমন—'যে বিধু দেখেছি সখি নাথের পার্শ্বে বসি।/ আরে, সে বিধু নহে এ যে হবে অন্য শশী॥/ সে অতি শীতল এ যে খরতর-ছবি।/ কিম্বা আমি রে সেই নহি, এ হবে রবি॥' (কৃষ্ণানন্দ)। একই চাঁদ ভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। (গ) সম্বন্ধে অসম্বন্ধ ; এই রূপে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বস্তুর সম্বন্ধ অস্বীকার করা হয়। যেমন—'আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান/ কেবল শরম খানি রেখেছি' (রবীন্দ্রনাথ)। হৃদয়, প্রাণ ও শরমের পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকলেও তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। (ঘ) অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ; উদাহারণ—'আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,/ মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা' (রবীন্দ্রনাথ)। কবি, সন্ধ্যাতারা ও কাননের মধ্যে পারস্পরিক অসম্বন্ধ থাকলেও তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। (ঙ) কারণ-কার্যের পৌর্বাপর্য-বিপর্যয় ; উদাহরণ--'হরিণনয়না সুন্দরী যবে, আকুলিত হ'ল মনে,/ বকুল রসাল ফোটেনি তখনও পৃথিবীর বনে বনে।' (সংস্কৃত থেকে)। অর্থাৎ বসন্ত আসার আগেই (কারণ) হরিণনয়না সুন্দরীরা আকুলিত হয়েছে (কার্য)। সু.মু,

অতীতকাল : 'কালের' বা সময়ের চিহ্ন যুক্ত না হলে বাক্যে ক্রিয়াপদ বক্তার সম্পূর্ণভাব ব্যক্ত করতে পারে না। বাঙলা ক্রিয়াপদে কাল ও পুরুষ (person) চিহ্ন আবশ্যিক (কিন্তু বচন চিহ্ন নেই)। যে কাজ অতীতে ঘটেছিল, তার কালকে অতীতকাল বলে। যথা—রহিম গতকাল বাড়ি গিয়েছিল। অতীত কালের কয়েকটি শাখা বিভাগ রয়েছে। যথা :

(ক) সাধারণ অতীত—করিম গরীব ছিল।
(খ) ঘটমান অতীত—করিম কলেজে পড়ছিল।
(গ) পুরাঘটিত অতীত—করিম পড়েছিল
(ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত—করিম সকালে ব্যায়াম করত।

বাঙলা ব্যাকরণে এগুলোর পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করা হয়। শি.প্র.লা.

অতীত জীবনের স্মৃতি : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। স্মৃতিমূলক গ্রন্থ। বইটি প্রকাশ করেছে নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৮৭। দীর্ঘ জীবনের অধিকারী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের আত্মজীবনী এ বই।

www.pathagar.com

লেখকের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের খুঁটিনাটি ঘটনাবলী সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এতে। জন্মপরবর্তী সময় থেকে শুরু করে লেখকের আশি বছর বয়স পর্যন্ত যে ব্যাপ্তিকাল, তাতে শুধু মানুষ হিসেবে তাঁর বেড়ে ওঠার বিবরণই নয়, আছে অবিচ্ছেদ্য পারিপার্শ্বিকের ক্রম-বিবর্তনের কথাও। আর তাই এ বই আত্মজীবনী হয়েও উপন্যাসের বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ। একটি অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি শৈশব থেকেই সম্মানের জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু সে জীবনে বিলাসের আতিশয্য সম্ভবত বাড়াবাড়ি পর্যায়ের ছিলো না। সেজন্যেই তাঁর সুযোগ হয়েছে তাঁদেরই সাধারণ প্রজাদের সন্তানদের সাথে মেশার, একটি সাদাসিধে গ্রাম্য বালকের মতো আপাত তুচ্ছ বহু বিচিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করার। একটি হিন্দু অধ্যুষিত গাঁয়ের মাত্র 'চারঘর মুসলিম ভদ্রলোক'-এর মধ্যে লেখকের পরিবার ছিল অন্যতম। তবে তাঁদেরও পূর্বপুরুষ আদিতে হিন্দু ছিলেন। ১১২০ বঙ্গাব্দে তাঁদের পূর্বপুরুষ প্রেম নারায়ণ চৌধুরী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মোহাম্মদ ইসলাম খান চৌধুরী নামে পরিচিত হন। এরপর প্রসঙ্গক্রমে সে এলাকায় ইসলাম ধর্মের প্রসারের ইতিহাস, হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িক সমাজবিকাশের কথা এসেছে। এসেছে এলাকার বিভিন্ন কিংবদন্তীর কথা ; কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো ব্যক্তিত্ব এবং সরোজিনী নাইডু, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকসহ বিভিন্ন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের সিলেটে আগমন প্রসঙ্গ। আছে সারাদেশে ক্রমশ প্রেক্ষিত বদলের বিবৃতি ও সেসবের সাথে লেখকের সম্পৃক্তির কথা। লেখকের বাবা সরাসরি কংগ্রেসের রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। ফলে তাঁর পরিবারে দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব ছিলো স্বাভাবিক। লেখকের ছাত্র জীবন ও কর্মজীবনে এদেশে ও বিশ্বপ্রেক্ষাপটে ঘটেছে বিশাল রাজনৈতিক ঘটনাবলী, এ সময় সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে প্রভাব এ ভূখণ্ডেও পড়েছিলো, সে সবের উল্লেখ রয়েছে এ বইয়ে। বইটিতে কোনো পর্ব বিভাজন নেই বা কোনো শিরোনামাঙ্কিত অধ্যায় নেই। দীর্ঘ প্রলম্বিত লয়ের ধারাবাহিক রচনার কোথাও কোথাও ইতিহাস ও রাজনীতির বিবৃতি, কোথাও নিজের ব্যক্তিজীবন বিকাশের বর্ণনা রয়েছে। রয়েছে সুদীর্ঘ অতীত থেকে পুরুষানুক্রমে বিকশিত তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস। গ্রন্থে কোনো তথ্যসূত্র/ গ্রন্থপঞ্জি বা পরিশিষ্ট নেই, কোনো টীকা ভাষ্যও নয়। জানা যায়, তিনি মরমী কবি হাছন রাজার দৌহিত্র, তাছাড়া তিনি বাংলার পাঠান সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ'র আমল থেকে প্রতিষ্ঠিত বনেদি জমিদার পরিবারের ছেলে। সে বিবেচনায় এ গ্রন্থে তাঁর ঐতিহ্যবাহী পরিবারের একটি বংশলতিকা সংযুক্ত হলে তা রচনাটিকে সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণতা দিতে পারতো ; পাঠকের জন্যেও তা হতো সহায়ক।

র. আ. ক.

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : কথাসাহিত্যিক। নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার অন্তর্গত রাইনাদি গ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ ভাগের কিছুকাল পর তিনি পশ্চিমবাংলায় চলে চান। সোনার গাঁ জি.আর. ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক ও কলকাতার রিপন কলেজ হতে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নাবিকের কাজ নিয়ে তিনি সারা পৃথিবী চষে বেড়ান। পরবর্তী সময়ে দেশে ফিরে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.কম. এবং বাণীপুর পোস্টগ্র্যাজুয়েট বেসিক কলেজ থেকে বি.এড. পরীক্ষায় পাস করেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এবং পরে সিনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে মনোনীত হন। শেষে বহরমপুর ছেড়ে কলকাতা এসে কারখানার ম্যানেজার পদে দশ বছর কাজ করেন। এরপর একটি প্রকাশনী সংস্থার উপদেষ্টা, ১৯৭৬ সাল থেকে 'অমৃতবাজার', 'যুগান্তর' পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করে ১৯৯৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে লেখাই জীবিকা। তাঁর পঞ্চাশাধিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে',

www.pathagar.com

'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'একটি জলের রেখা ও তারা তিনজন', 'শেষদৃশ্য', 'নগ্ন ঈশ্বর', 'আবাদ', 'ঝিনুকের নৌকা', 'দুই ভারতবর্ষ', 'সমুদ্রমানুষ' প্রভৃতি। তিনি ক্লাসিক লেখক হিসেবে পরিচিত এবং 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বাংলা সাহিত্যের একটি বিরল উপন্যাস। তাঁর লেখায় পঞ্চভূতের মধ্যে 'জল' অন্যতম বিষয়বস্তু। পৃথিবীর কম লেখকই এ বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করে সফল হয়েছেন। নিভৃতপ্রিয় এ লেখক কথাসাহিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্কিমস্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। গৌ.ম.

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান : পণ্ডিত, ধর্মগুরু, অনুবাদক, সম্পাদক, দার্শনিক। ৯৮২ সালে বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা কল্যাণশ্রী ও মাতা রাণী প্রভাবতী। তিনি ছিলেন পিতামাতার মধ্যম পুত্র। তাঁর আদি নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। বার বছর বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দীক্ষা গ্রহণ করলে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। গভীর ধ্যান-সাধনা ও প্রবল প্রজ্ঞার জন্য তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় তিনি সংক্ষেপে অতীশ বা অতীশা নামে অভিহিত হতে হতে তাঁর পুরো নাম প্রচলিত হয়ে যায় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বৌদ্ধ ভিক্ষুর দীক্ষা গ্রহণের পর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিহারে ত্রিপিটকের তিনটি খণ্ড--সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক আয়ত্ত করেন। বিদ্যার্জনে তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। বাংলা সাহিত্যে যে চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য বৌদ্ধগান ও দোঁহা বা চর্যাপদ রচনা করেছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁদের অনেকের সাহচর্য লাভ করেন। তন্ত্রসাধনায় তিনি সিদ্ধপুরুষ হয়ে ওঠেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৩১ বছর বয়সে আরো গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য মালয়দেশের সুবর্ণ দ্বীপে গমন করেন। সুবর্ণদ্বীপের আচার্য ধর্মকীর্তি তখন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন। সেই ধর্মকীর্তির নিকট ১২ বছর বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে ৪৪ বছর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফিরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভারতের ওদন্তপুরী, সোমপুরী ও বিক্রমশীল বিহার পরিচালনার পাশাপাশি অধ্যাপনা করেন। তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এসময় তিনি পশ্চিম ভারতে তীর্থিকরাজ কর্ণ এবং মগধরাজ নয়পালের মধ্যে যুদ্ধে সন্ধিস্থাপনের ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। বৌদ্ধধর্মের বিকৃত প্রচার রোধ করার জন্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৪০ সালে ৫৮ বছর বয়সে তিব্বত গমন করেন। সেখানে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতে তিনি কোথাও স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন বসবাস করেন নি। ধর্মসংস্কার যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে সেই লক্ষ্যে তিনি সতত সর্বত্র বিচরণশীল ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি রচনা করে যেতেন অমূল্য গ্রন্থাদি। তিনি তিব্বতের ধর্ম, ইতিহাস, রাজকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্রনামা ও সর্বোপরি 'তাঞ্জুর' নামে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থসহ দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। প্রাচীন তিব্বতের যে কোনো আলোচনা করতে গেলে তাঁর শরণাপন্ন হতে হবেই। তিব্বতবাসীরা গৌতম বুদ্ধের পরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ গুরু হিসেবে সম্মান দেন। সেখানে তিনি 'জোবো ছেনপো বা মহাপ্রভুরূপে পূজিত হয়ে থাকেন। প্রাচীন বাংলার এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশেও তিনি স্মরণীয়। বাংলা আর সংস্কৃত ভাষায়ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলোর কোনোটিই এখন আর পাওয়া যায় না। তবে তাঁর প্রায় সব গ্রন্থের অনুবাদ তিব্বতে আজও রক্ষিত আছে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে ১৩ বছর অবস্থান করার পর ৭২ বছর বয়সে ১০৫৪ সালে লাসার কাছে ঞেথাং বিহারে পরলোকগমন করেন। ১৯৭৮ সালের ২৮ জুন অতীশ দীপঙ্করের পবিত্র দেহভস্ম রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চীন থেকে এনে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষণ করা হয়। **সু. ব.**

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : গদ্যশিল্পী। টাঙ্গাইল জেলার বিন্যাফৈর গ্রামে ১৮৮৪ সালের ১০ মে জন্মগ্রহণ

করেন। পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন রংপুর কোর্টের একজন আইন ব্যবসায়ী। অতুলচন্দ্র রংপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯০১ সালে এন্ট্রাস পাস করেন। অতঃপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট আর্টসক্লাশে ভর্তি হন। এ কলেজ থেকে ১৯০৩ সালে এফ.এ., ১৯০৫ সালে ইংরেজি ও দর্শনে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৯০৬ সালে দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০৭ সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এল. পাস করেন। এরপর রংপুর আদালতে ওকালতি শুরু করেন। কিছুকাল রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯১৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বছর পর অধ্যাপনা ত্যাগ করে পুনরায় আইন ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করেন। কালক্রমে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮–১৯৪৬) বন্ধু অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন 'সবুজপত্রের' (১৩২১–১৩৩৪) নিয়মিত লেখক ও বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৯২৮) বাংলা সাহিত্যের রসতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য বই। ভারতীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের জটিল সিদ্ধান্ত আধুনিক কালের পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করে তিনি সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন এ গ্রন্থে। প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ : শিক্ষা ও সভ্যতা (১৩৩৪), পত্রাবলী (১৯৩১), নদীপথে (১৯৩৭), জমির মালিক (১৩৫১), সমাজ ও বিবাহ (১৩৫৩) ও ইতিহাসের মুক্তি (১৩৬৪)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ–সভাপতি (১৩৪৯–১৩৫৪) ছিলেন। অনাথনাথ দেব পুরস্কার (কলকাতা বিশ্বদিব্যালয়, ১৯১৮) ও ডি.এস. উপাধি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭) লাভ করেন। ১৯৬১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। নূ. ই

অতুলপ্রসাদ সেন : গীতিকার ও কবি। ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে ১৮৭১ সালের ২০ আগস্ট মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস মগর, নড়িয়া—শরীয়তপুর (বৃহত্তর ফরিদপুর)। পিতার নাম রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদ চিকিৎসক ও ঢাকার ওষুধ ব্যবসায়ী ছিলেন। মাতা হেমন্তশশী দেবী। তের বছর বয়সে অতুলপ্রসাদ পিতৃহীন হন (১২৯১ সনে)। অতঃপর মাতামহ ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্তের লক্ষ্মীবাজারের (ঢাকা) বাড়িতে প্রতিপালিত হন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯০) পাস করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের কারণে কলকাতায় পরিচিত মহলে বাস করা তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। লোকনিন্দা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে মামাদের প্রচেষ্টায় ব্যারিস্টারি পড়ার মানসে লন্ডন চলে যান। ১৮৯৪ সালে মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০০ সালে মাতুল–কন্যা হেমকুসুম দেবীর (স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কন্যা) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্কটল্যান্ডে সম্পন্ন হয় তাঁদের প্রেমঘটিত এ বিবাহ। স্ত্রীর কোপন স্বভাবের জন্য অতুল প্রসাদের সংসারজীবন সুখের হয় নি। কর্মজীবন কাটান লক্ষ্ণৌ শহরে। লক্ষ্ণৌ আদালতে আইন ব্যবসায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১১ সালে লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস–চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের (১৯১৬) অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২০) কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন তহবিলে এককালীন দশ হাজার টাকা দান করেন। বাংলা গানের তিনি একজন বিশিষ্ট স্রষ্টা। দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রীতি, ঈশ্বরভক্তি এবং প্রেমানুরাগ তাঁর গান ও কবিতার ভাববস্তু। তাঁর 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা' গানটি বাঙালির মাতৃভাষা প্রীতির একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান। তাঁর গান বাঙালির মন ও বাংলা ভাষাকে ভাবে ও সুরে

www.pathagar.com

কল্লোলিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহ লাভ করেছিলেন অতুলপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশেষ' কাব্যটি অতুলপ্রসাদের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। কাকলী, গীতিগুচ্ছ (১৯২১) ও কয়েকটি গান তাঁর রচিত গান ও কবিতার বই। ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট লক্ষ্ণৌতে মৃত্যুবরণ করেন। নূ.ই.

অত্যন্তাভাব : ন্যায়বৈশেষিক মতে 'অভাব' হচ্ছে সাতটি স্বীকৃত সত্যের অন্যতম। অভাবকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার। অত্যন্তাভাব এই তিন প্রকার সংসর্গা-ভাবের অন্যতম। সাধারণত 'নাই' বা 'নাস্তি' শব্দের মাধ্যমে অবাভকে বোঝানো হয়ে থাকে ; যেমন—'ইহ ভূতলে ঘটো নাস্তি' অর্থাৎ ভূতলে ঘট নাই। ঘটের অত্যন্তাভাব এক্ষেত্রে বর্তমান। অত্যন্তাভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত,—'বায়ুতে রূপ নাই' অর্থাৎ বায়ুতে রূপের অভাব—এই অর্থে এটি প্রযোজ্য হয়েছে। আ.ন.ম.ব.র.

অত্রি : হিন্দু পুরাণোক্ত ঋষি। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে অত্রির পরিচয় বিভিন্ন। ১. ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং ঋগ্বেদের মন্ত্রস্রষ্টাদের অন্যতম। অথর্ববেদে তাঁর প্রাধান্য দেখা যায়। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ আত্রেয় গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা। অতি প্রাচীনকালে আত্রেয়দের মধ্যে কেবল প্রভাকরই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রভাকরের বংশধরগণই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরবর্তীকালে আত্রেয়গণ অর্ণবপোত নির্মাণে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ২. ব্রহ্মার চক্ষু হতে উৎপন্ন এবং সপ্তর্ষির মধ্যে অন্যতম। তিনি দক্ষের কন্যা অনসূয়ার পাণি গ্রহণ করেন। পুত্র লাভের আশায় তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কোনো এক পর্বতে তপস্যা করেন। তাঁদের তপস্যায় প্রীত হয়ে ত্রিমূর্তি উপস্থিত হয়ে তাঁদের অংশ হতে তিনটি পুত্র দান করেন। তাঁরা হলেন দত্তাত্রেয়(=বিষ্ণু), দুর্বাসা (=শিব) ও সোম (=ব্রহ্মা)। ৩. মতান্তরে অত্রি দশ প্রজাপতির অন্যতম। রামচন্দ্র বনবাসকালে তাঁর আশ্রমে কিছুদিন বাস করেছিলেন। মু. আ. রা.

অথর্ববেদ : চতুর্থ বেদ। কেউ কেউ একে বেদ বলে মানেন না। মনুসংহিতায় ও অমরকোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঋক, সাম ও যজুঃ এই তিন প্রকার বেদ আছে, কিন্তু দান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ববেদ বলে চতুর্থ বেদের উল্লেখ আছে। এই বেদের অনেক শাখার মধ্যে কেবল শৌনক শাখাটি এখন পাওয়া যায়। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ শাখায় ৭৩০ সূক্ত ও ২০ খণ্ড বর্তমান। এর কিছু অংশ গদ্যে ও অবশিষ্ট অংশ বৈদিক ছন্দে রচিত। "অথর্ব বেদের বহু মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য অর্থলাভ, রোগনাশ, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, পারিবারিক মঙ্গলপ্রাপ্তি, ভূতনিবারণ প্রভৃতি শুভ মনোবাঞ্ছা পূরণ ; এবং অপরদিকে শত্রুধ্বংস, শত্রুরাষ্ট্র উৎখাত, বিরুদ্ধ পক্ষের উৎপীড়ন, বন্দীকরণ প্রভৃতি বিপরীত পক্ষের জন্য অমঙ্গলজনক বাসনাও কতকগুলি মন্ত্রের উদ্দেশ্য।" (বাংলা বিশ্বকোষ)। ম. চৌ.

অদম্য পথিকের গান : সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্‌র কবিতাগ্রন্থ। চল্লিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের কারো ওপর ভরসা না করে আপন মনে চলা অদম্য পথিকের মতোই কবি এই গ্রন্থে নিজের অনুভব ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। কবি এখানে আত্মনিমগ্নতার গভীর প্রান্ত থেকে ঠিক সরবে নয়—উপলব্ধি প্রকাশের ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন ব্যক্তি ও সমষ্টির সমসাময়িক অস্থিরতার নিরেট বয়ান। বিষয় হিসেবে এ গ্রন্থে সমন্বিত হয়েছে নাগরিক জীবনের অস্থিরতা, অসহায়ত্ব ও বেদনা, শাসক ও প্রতিবাদী জনতার দ্বন্দ্ব, নরনারীর প্রণয়, মানবিকতা ও অমানবিকতার দ্বন্দ্ব, সামরিক শাসন ও রাজনীতির বিচিত্র প্রসঙ্গ। আশা ও হতাশার সম্মিলনে সমকালের প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে যে অনুভব প্রকাশিত হয়েছে—তা সার্বিক মানবচরিত্রের বহুবর্ণিল বোধ। গ্রন্থের উপকরণ হিসেবে নগরজীবন, গ্রামীণ জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনের নানা প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। গ্রন্থের বিশেষ কবিতাগুলো হচ্ছে : 'অক্ষম মানুষ বোঝে', 'লাল নীল এবং ধূসর', 'প্রশ্ন বটে', 'দাম হবে নির্ভুল পাঁচসিকে', 'আশা করি ভেবে দেখবেন',

www.pathagar.com

'আষাঢ়ের গড়িমসি', 'সবার শেষে ছক', ও 'একরোখা ও জেদী লোকগুলোর কথা।' কবিতাগুলো ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে রচিত। হাসান হাফিজুর রহমানকে উৎসর্গকৃত এবং কাইয়ুম চৌধুরীর চমৎকার প্রচ্ছদে বইটির প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২। প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা। মো. আ. মি.

অদিতি : দক্ষরাজার কন্যা ও কশ্যপ মুনির পত্নী। তাঁর গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, বরদমনু ও পর্জন্য—এই দ্বাদশ দেবতার জন্ম হয়। এজন্য তাঁকে দেবমাতাও বলা হয়ে থাকে। বামন অবতারে তাঁকে বিষ্ণুর মাতারূপে অভিহিত করা হয়েছে। সমুদ্রমন্থনে কুণ্ডল উত্থিত হলে ইন্দ্র তাঁকে সেই কুণ্ডল দান করেন। পারিজাতলাভের জন্য কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে বিবাদ হলে তিনি তার মীমাংসা করেন। অদিতির ভগ্নী দিতি থেকে দৈত্যকুলের জন্ম। ত. শ.

অদ্বয়বজ্র : একজন বিখ্যাত সহজিয়া বা সহজযানী সিদ্ধাচার্য। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। মহীপাল, দীপঙ্কর, নরো-পা প্রভৃতির সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। অদ্বয়বজ্রের অন্য নাম অবধূতী-পা। বজ্রাচার্য নামেও তিনি পরিচিত। উত্তরবঙ্গের দেবী-কোটবিহারে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি বজ্রযান সম্পর্কিত কিছু গ্রন্থ ও বৌদ্ধ সংকীর্তন পদ রচনা করেন। কিছু বাংলা গ্রন্থ রচনাও করেছেন, তিব্বতী ভাষায়ও তাঁর অনুবাদ আছে। এ ছাড়া তিনি সোমপুর মহাবিহারের পণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র রচিত গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন। মু. আ. জ.

অদ্বিতীয়া : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের দাম্পত্য প্রণয় সংঘাতের গল্প। 'বনফুলের গল্প' (১৯৩৬) নামক গল্পগ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দাম্পত্য জীবনের এক হাস্যকর অসঙ্গতিকে নিয়ে 'অদ্বিতীয়া' গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। প্রভাবতীর বিশ্বাস ছিল স্বামীর কাছে তিনি এক অদ্বিতীয়া স্ত্রীরত্ন। কিন্তু এক সময় দেখা গেলো স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তাবে স্বামী রাজি হন এবং যথারীতি গোঁফ কামিয়ে তরুণ সেজে একদিন তিনি বিয়েও করে বসেন। ফুলশয্যার রাতে ষড়যন্ত্রটি ধরা পড়ে। শ্যালিকা ছিল এই ষড়যন্ত্রের হোত্রী। নববধূর সঙ্গে মিলনের আনন্দ নিয়ে স্বামীপ্রবর যখন বাসরশয্যায় আবির্ভূত হন তখন দেখা গেল সাত সন্তানের জননী তাঁর প্রথমাই পালঙ্ক আলো করে বসে আছেন। পুরুষের হৃদয় পরীক্ষায় শ্যালিকার এই নির্মম রসিকতায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হন, কিন্তু স্ত্রীর চেয়ে স্বামী বেচারার লাঞ্ছনাই হয় বেশি। দাম্পত্য প্রেমের এই গল্পটিতে পুরুষজাতি সম্পর্কে নারী জাতির যে বিরূপ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তা একদিক থেকে কৌতুককর সন্দেহ নেই, আবার অন্যদিকে চরম বেদনাদায়ক ও শোকাবহও বটে। বনফুল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ ও কৌতুক রসের দ্বারা 'অদ্বিতীয়া' গল্পে দাম্পত্য প্রেমের এই মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন। জীবনরঙ্গশালায় মানব-জীবনের অসঙ্গতিই কখনো কখনো তাঁর জন্য ট্র্যাজেডির বীজ বয়ে আনে এবং সেই ট্র্যাজেডিই হচ্ছে মানুষের নিয়তি। শত কৌতুকের মধ্যেও সেই ট্র্যাজেডি ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের জীবনে আনে বাস্তবতার রূঢ় সংঘাত এবং তার পরিণামও যে কত নিদারুণ হয় 'অদ্বিতীয়া' গল্পটি তার সুন্দর নিদর্শন। ম. চৌ

অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী : বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কীর্তন গায়ক। ১৮৩৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান চড়িয়াগ্রাম, পাবনা। প্রকৃত নাম ভীমকিশোর রক্ষিত। তিনি বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও কীর্তন শিক্ষা শুরু করেন এবং নানা স্থান থেকে দীর্ঘকাল শিক্ষার ফলে মনোহরসাহী কীর্তনে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন। অদ্বৈতদাস পরে বৃন্দাবনে নিজের টোলে হরিনামাবৃত ব্যাকরণ ও ভাগবতে অধ্যাপনা করেন। ৭৬ বছর বয়সে তিনি নবদ্বীপে আশুতোষ তর্কভূষণের নিকট তিন বছর কাল নবন্যায় শিক্ষা করেন ও পরে বৃন্দাবন ফিরে আসেন। তিনি ১৯২৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মু. আ. জ.

www.pathagar.com

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। শৈশবেই পিতা-মাতাকে হারান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল থেকে ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। আর্থিক অনটনে শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে কলকাতা গমন করেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের কর্মজীবন শুরু হয় সাংবাদিক হিসেবে। 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় কিছুকাল কাজ করার পর তিনি বিভিন্ন সময় 'নবশক্তি', 'আজাদ', 'মোহাম্মদী', 'যুগান্তর' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ করেন। কর্মসূত্রে তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিকতা করতে করতে তিনি সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ হন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' শিরোনামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। উপন্যাসটি প্রকাশের মধ্য দিয়েই তিনি লেখক হিসেবে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। কিন্তু পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশের আগেই উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায় এবং পাঠকদের অনুরোধে পুনরায় তিনি তা রচনা করেন। এছাড়া তাঁর আরো দুটি উপন্যাস হলো : 'রাঙামাটি' ও 'সাদা হাওয়া'। গল্পগ্রন্থ— 'দল বেঁধে'। তাঁর 'জীবনতৃষ্ণা' উপন্যাসটি 'লাস্ট ফর লাইফ'-এর অনুবাদ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন মালো সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের সদস্য। 'তিতাস একটি নদীর নাম' সেই মৎস্যজীবী মানুষদেরই কাহিনী। এই উপন্যাস তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই বাস্তবচিত্র। কোনো কোনো গবেষকের মতে এটি 'জেলে জীবনের মহাকাব্য'। বস্তুতপক্ষে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সমগ্র সাহিত্যকর্মই তাঁর বাস্তব জীবনের অকপট প্রকাশ। অকৃতদার এই মানুষটির আজীবনের সঙ্গী ছিল কেবল বই। নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে তিনি যে অজস্র বই সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই দুর্লভ গ্রন্থরাজি রামমোহন লাইব্রেরিকে দান করা হয়। ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল মাত্র ৩৭ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সু. ব.

অদ্ভুত আঁধার এক : 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ'—এই পংক্তিটির সাথে বাংলাভাষী পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। পংক্তিটি জীবনানন্দ দাশের লেখা 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতার প্রথম পংক্তি। এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ, ১৩৬১ সংখ্যায়। সমালোচকদের মতে, 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটি সুররিয়ালিস্ট ইংরেজিভাষী ওয়েল্সীয় কবি ডিলান টমাসের একটি কবিতার প্রায় আক্ষরিক জীবনানন্দীয় সংস্করণ। এই কবিতাটি জীবনানন্দের মৃত্যুর পর রণেশ দাশ গুপ্ত সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভারে প্রকাশিত হয়। আবদুল মান্নান সৈয়দের-বিবেচনায় 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটি জীবনানন্দের উপান্ত পর্যায়ের কবিতাবলীর অন্তর্গত। দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের কুফল কবি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার রাষ্ট্রনায়কদের ভেতর থেকে সূক্ষ্মবোধ তিরোহিত হয়ে গেছে, অথচ তাঁদের নির্দেশ ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই অচল। পাশাপাশি পৃথিবীতে কিছু প্রতিশ্রুতিশীল বিবেকবান মানুষও আছেন কিন্তু তাঁরা ক্ষমতাবান নন। এই কবিতায় কবি অন্ধ বলতে 'প্রতীকী অন্ধত্ব' বুঝিয়েছেন। সৈ.আ.জা.

অদ্ভুত-নাট্য : যে সব ক্ষুদ্র নাটকে উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে নৃত্যগীতের প্রাধান্য থাকে তাদেরকে অদ্ভুত-নাট্য বলা হয়। এক সময় এই জাতীয় নাটকে কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি বা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান অথবা যে কোনো প্রশংসিত বিষয়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার রেওয়াজ ছিল, পরে এতে বিদ্রূপের অংশটি যথাসম্ভব বাদ দিয়ে কেবল আনন্দ বিতরণের ধারাটি বজায় রাখা হয়। অদ্ভুত-নাট্যে বিদ্রূপের স্পর্শ থাকলেও সেই বিদ্রূপ অন্যের মনে বেদনা বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। চরিত্র-

www.pathagar.com

চিত্রণে কতকটা অসম্ভব কল্পনা থাকলেও নাটকীয় কাহিনী বাস্তবতার কাছ-ঘেঁষা। সর্বোপরি নির্মল হাস্যরস বা Humour-এর ছাটা কাহিনীর সর্বত্র অন্তর্লীন থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' Extravaganza-র চমৎকার নিদর্শন। আ.ই.

অদ্ভুত রামায়ণম্ : মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত সুবিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ। অদ্ভুত কবিত্ব নিয়ে বাল্মীকি এ কাহিনীর বক্তা এবং ভরদ্বাজ শ্রোতা। সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত বাল্মীকি রচিত সংক্ষেপে রামায়ণের কাহিনীটি হচ্ছে বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ রাজার রূপলাবণ্যময়ী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে নারদ ও পর্বত উভয়েই তাঁর পাণিপ্রার্থী হন, কিন্তু বিষ্ণুর কৌশলে তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একথা জানতে পেরে নারদ ও পর্বত বিষ্ণুকে মর্ত্যে জন্ম গ্রহণের অভিশাপ দেন। তদনুসারে বিষ্ণু দশরথের ঘরে রামরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মন্দোদরীর গর্ভে সীতার জন্ম হলে গর্ভনিঃসারণ করে মন্দোদরী তাঁকে কুরুক্ষেত্র নামক জায়গায় প্রোথিত করেন। হলকর্ষণে রাজর্ষি জনক সীতাকে ভূমির ভিতর থেকে প্রাপ্ত হন। পরে পরিণত বয়সে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হয়! রামের বনবাসকালে লংকেশ্বর দশানন কর্তৃক সীতা অপহৃত হন। রাম কপিকটক সাহায্যে সীতাকে উদ্ধার করেন। অযোধ্যায় ফিরে সীতার মুখে সহস্রস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত শুনে রাম তার বধার্থে পুষ্করদ্বীপ গমন করেন। কিন্তু রামচন্দ্র সসৈন্যে পরাজিত হলে সীতা কালিকা মূর্তি ধারণ করে রাবণকে নিধন করেন। কাহিনীর কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে উক্ত কাহিনী অবলম্বন করে বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হয়। বাঙালি কবিদের উপর বাল্মীকির প্রভাব যথেষ্ট। নদীয়ার রাধামাধব হালদার অদ্ভুত রামায়ণের একখানি পদ্যানুবাদও করেন। এছাড়া রাজশেখর বসু বাংলায় এর গদ্যানুবাদ করেছেন। মু.আ.জ.

অদ্ভুতাচার্য : তাঁর প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও সংস্কৃতে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বপ্রতীক আরো দুটো রামায়ণ রচিত হয়— 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও যোগবাশিষ্ঠ বা অধ্যাত্ম-রামায়ণ। সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ' অনুবাদ করেছিলেন বলেই তাঁর নাম অদ্ভুতাচার্য। তিনি সোনাবাজু পরগনার করতোয়াকূলে অমৃত কুণ্ডা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম বর্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত। তিনি ছিলেন সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি। এই ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে কবিকে সপ্তদশ শতকের লোক বলে ধরে নেওয়া যায়। রজনীকান্তের সম্পাদনায় অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ অদ্ভুত রামায়ণ নামে মুদ্রিত হলেও মূল সংস্কৃতে রচিত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে এর তেমন সাদৃশ্য নেই। কাব্যখানি আয়তনে বৃহদাকার হলেও বর্ণনা রীতি তেমন উৎকৃষ্ট নয়। বিশেষ করে কবি রামায়ণের চরিত্র চিত্রণে উত্তরবঙ্গের জনজীবনের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এ কারণেই অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ জনপ্রিয়তার বিচারে স্থান বিশেষে কৃত্তিবাসের রামায়ণকেও অতিক্রম করতে পেরেছিল। মু.আ.জ.

অধিকরণ কারক : ক্রিয়ার স্থান, কাল ও আধারকে অধিকরণ কারক বলে। এক কথায় যাতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। বনে বাঘ আছে। তিলে তৈল আছে। রাত্রে তারা দেখা যায়। বনে, তিলে, রাত্রে যথাক্রমে স্থান, আধার ও কালজ্ঞাপক অধিকরণ কারক। অধিকরণ কারকে এ,য়, তে বিভক্তি বা মধ্যে, উপরে, নিকটে, নিচে প্রভৃতি কারক অব্যয় বলে। যে স্থান, বিষয়, অবস্থা, কিম্বা কালকে আধার বা আশ্রয় অথবা অবলম্বন করে কোনো ঘটনা ঘটে, অথবা কোনো কিছু বিদ্যমান থাকে তাকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন—দুগ্ধে মাখন আছে। অধিকরণ কারক তিন প্রকার। যথা—(ক) আধার অধিকরণ—এটি তিন প্রকার : উপশ্লেষিক বা ঐকদেশিক, বৈষয়িক ও অভিব্যাপক।

www.pathagar.com

(খ) কাল অধিকরণ ও (গ) ভাব অধিকরণ কারক। শি.প্র.লা.

অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক/বিশিষ্ট রূপক : উপমানে কোনো বিশেষ অথবা অসম্ভব ধর্মের কল্পনা করে যদি সেই অসম্ভব ধর্মযুক্ত উপমানকে উপমেয়ের উপর অভিন্নভাবে আরোপ করা হয়, তবে সেখানে অধিকাররূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক বা বিশিষ্ট রূপক সৃষ্টি হয়। উপমানে একটি বৈশিষ্ট্য অধিক আরূঢ় হয় বলে এই জাতীয় অলঙ্কারকে অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক বলা হয়। যেমন—'বয়ন শরদ সুধানিধি নিষ্কলঙ্ক' (জ্ঞানদাস)। রাধার বদনকে শরতের চাঁদের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে, চাঁদে কলঙ্ক থাকলেও রাধার মুখকে এখানে কলঙ্কমুক্ত বলা হয়েছে। চাঁদ নিষ্কলঙ্ক, এই অসম্ভব কল্পনা করে কবি চাঁদকে রাধার বদনে আরোপ করেছেন। সুতরাং এখানে অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক সৃষ্টি হয়েছে। এইরূপ আরো কয়েকটি উদাহরণ, যেমন—(ক) অপরূপ পেখলুঁ রামা/কণকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণহীন হিমধামা (বিদ্যাপতি)। হরিণ অর্থ কলঙ্ক, হিমধামা চাঁদ এবং রামা রাধা। (খ) নাহি কালদেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি/ তুমি অচপল দামিনী (রবীন্দ্রনাথ)। (গ) সারা দেহব্যাপী তড়িতের খেলা এ কি দেখি অচপল (নন্দগোপাল সেনগুপ্ত)। এখানে দেহের যৌবনদীপ্তিকে 'অচপল তরিৎ' কল্পনা করায় অধিকাররূপক বৈশিষ্ট্য রূপক সৃষ্টি হয়েছে। আ. ই

অধিবাস : কোনো শুভ কাজের পূর্বে অবশ্য করণীয় একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অধিবাসের মধ্য দিয়ে। সাধারণত বিয়ের আগের দিন এই আচার সম্পাদিত হয়। এ দিন বর-কনের পিতা ও মাতা সংযম পালন করেন নিরামিষ ও ফল-দুধ খেয়ে। অধিবাসের শুরুতে পুত্র-কন্যার সুখী জীবন কামনা করে পিতা দেবতাদের উদ্দেশে পূজা অর্পণ করেন। অধিবাসের উপচার হিসেবে বাইশটি মাঙ্গল্যদ্রব্য নতুন কুলায় সাজানো হয়। দ্রব্যগুলো হচ্ছে : পঞ্চশস্য অর্থাৎ ধান, তিল, যব, সরিষা ও মাষকলাই, গঙ্গামৃত্তিকা, চন্দন, শিলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পঞ্চপ্রদীপ, দর্পণ, দধি, ঘৃত, মধু, ফুল, ফলম দূর্বা, শঙ্খ, সিঁদুর ও কাঁচা হলুদ। অধিবাসের সময় কনেকে নতুন শাড়ি পরানো হয়। এ শাড়ি লাল বা যে কোনো উজ্জ্বল রঙের হতে পারে। তবে কালো নয়। কারণ কালো অশুভের প্রতীক। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বর ও বধূর মধুময় জীবনের আশীর্বাদ স্বরূপ কূলায় সাজানো মাঙ্গল্য দ্রব্যগুলো তাদের কপালে ছুঁইয়ে দেন। তারপর কুলার উপর পাথরের নোড়ার সাহায্যে বর ও কনেকে দিয়ে কলাই ও হলুদ ভাঙিয়ে সধবারা তা তাদের স্পর্শ করান। বিয়ের দিন বিকেলে আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পর উভয় বাড়ির সধবা মহিলাগণ ওই দ্রব্যগুলো পিষে সুগন্ধি তেলসহ বর ও কনের গায়ে মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেন। বর ও কনের অধিবাস উভয়ের বাড়িতে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোথাও অধিবাসের দিন বিকেলে সধবারা বাড়ির উঠোনে কলাগাছ তলায় বর ও কনের গায়ে হলুদ দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এই হলুদের পর্বটি বেশ জাঁকজমকপূর্ণ হয়। অধিবাস অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বর ও কনের হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কোনো কোনো স্থানে বরণডালায় অধিবাসের দ্রব্যগুলো সাজিয়ে প্রতিটির নাম উচ্চারণ করে পুরোহিত মন্ত্র পড়েন এবং এগুলো দিয়ে বর-কনের অধিবাস হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। অঞ্চলভেদে অধিবাসের সময় আরও নানা প্রকার স্ত্রী-আচার পালন করা হয়। ড. শা. আ.

অধুনা : শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সংকলন। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। উপদেষ্টা সম্পাদক—শামসুর রাহমান। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক—ইউসুফ হাসান। সম্পাদনা সহযোগী—তুষার দাশ। প্রকাশক—ফরিদ আহমেদ, অধুনা প্রকাশন, বাড়ি ৮/১, সড়ক ৪, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৫। মুদ্রক—উষা আর্ট প্রেস, ১২৭/১ লালবাগ

www.pathagar.com

রোড, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা–১৩২। মূল্য দশ টাকা। 'আমাদের বক্তব্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সম্পাদক 'অধুনা' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। 'আমাদের বক্তব্যে'র অংশ বিশেষ : '...সাহিত্যচর্চা, আমরা বিশ্বাস করি, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জীবন যেখানে বাঁচার লড়াই, সকল বাধাবিপত্তি উজিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার সংকল্প, দ্বিধাদ্বন্দ্বে জটিল, আনন্দ ও বিষাদে বহুমাত্রিক, সত্যের অন্বেষায় সর্বদা সচকিত—সেখানেই দৃষ্টি মেলে দিতে আমরা উৎসুক। আমরা মানবতা, প্রগতি ও কল্যাণের সপক্ষে।' ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ থেকে জানুয়ারি ১৯৮৭—এই এক বছরে 'অধুনা'র মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়েই 'অধুনা' তার অবয়বে একটি 'নিজত্ব' ফুটিয়ে তুলতে এবং প্রগতিশীল নবীন-প্রবীণ লেখক ও রুচিশীল পাঠকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। **সা. আ.**

অধ্যাত্মবিদ্যা : সাধারণত যে বিদ্যা বা শাস্ত্রে আত্মা-বিষয়ে আলোচনা থাকে তাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলা হয়। এই বিদ্যায় যে বৈশিষ্ট্য বা তত্ত্বের ইঙ্গিত দেয়া হয় তা হলো,— আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি জড় বস্তুর অতিরিক্ত এক বিশেষ চেতন পদার্থ। আত্মার তত্ত্বজ্ঞান থেকেই মোক্ষ বা সিদ্ধি লাভ হয়। অধ্যাত্মবিদ্যার এই তত্ত্ব অনুসারে ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাক ছাড়া ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ বিখ্যাত ব্যক্তিই অধ্যাত্মবাদী। অধ্যাত্মবিদ্যায় উপনিষদ ও বেদান্তের স্থান সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তবে অধ্যাত্মবাদী নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। যেমন, অদ্বৈতবেদান্তমতে জীব ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম স্বরূপগত দিক থেকে অভিন্ন এবং তা চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মালেই সিদ্ধি বা মোক্ষ লাভ হয়। সাংখ্যমতে মূল তত্ত্ব দুটি,—চেতন হচ্ছে পুরুষ বা আত্মা এবং জড় হচ্ছে প্রকৃতি বা অব্যক্ত। পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেক জ্ঞান থেকেই মোক্ষ বা সিদ্ধি লাভ হয়। ন্যায়মতে আত্মা হচ্ছে দ্রব্য, জ্ঞানস্বরূপ নয়, জ্ঞান আত্মার অন্যতম গুণমাত্র। মোক্ষে আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান অপেক্ষিত, তবে এ বিষয়ে অন্যান্য অনেক পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানও আবশ্যক। **আ. ন. ম. ব. র.**

অধ্যাত্ম রামায়ণ : ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গ্রন্থ বিশেষ। গ্রন্থটি শিব-পার্বতীর কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত। এতে যে রামকাহিনীর বিবৃতি আছে তা মূলত কলিযুগে মুক্তির সাধন রূপে রামভক্তিরই মাহাত্ম্য কীর্তন। রামভক্তির মাহাত্ম্য-বর্ণনায় এর বিষয়বস্তু 'রামহৃদয়', 'রামগীতি' এরূপ দু'টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রন্থ খ্রিস্টীয় ১৪শ-১৫শ শতকে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এর লেখক পরিচয় অজ্ঞাত। **মু. আ. জ.**

অধ্যাস : আভিধানিক অর্থ ভ্রান্ত উপলব্ধি। মানুষের মনোবৃত্তির একটি বিশেষ অবস্থা। এক ধরনের প্রত্যক্ষকরণে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলেও যে কোনো দেখার বিভ্রান্তিকে অধ্যাস বা Illusion বলা যায় না। সাধারণত একটি বস্তু বা ঘটনার স্থলে অন্য বস্তু বা ঘটনার দর্শন কিংবা মনে হওয়াকে অধ্যাস বলা হয়। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম। এরূপ দেখার মধ্যে অবশ্যই একটি বস্তুর উপস্থিতি থাকবে এবং তা ব্যক্তির মনে উদ্দীপনা আনবে। দড়ি একটি বস্তু, তার সঙ্গে সাপের মিল থাকায় পথিকের মনে সাপের ধারণা জন্মায়। অবশ্য অনেক সময় অতিকল্পনার প্রভাবে মিল না থাকলেও বাস্তব বস্তুটি ভ্রান্ত ধারণা জাগাতে পারে। এরূপক্ষেত্রে বাইরের বাস্তবতার প্রভাবে অধ্যাস সৃষ্টি হয়। যেমন, মরুভূমিতে কিংবা রৌদ্রকরোজ্জ্বল উত্তপ্ত স্থানে তৃষ্ণার্ত পথিকের মরীচিকা দর্শন। অনেক সময় শারীরবৃত্তিক বিশৃঙ্খলার জন্য মানুষের চোখে ভুল দেখা বা মনে ভুল শোনার অবস্থা ঘটে। যেমন প্রলাপ। আসলে কোনো বিশেষ বস্তুর উদ্দীপনা ছাড়া অধ্যাস সৃষ্টি হয় না। **আ.ই.**

www.pathagar.com

অনতিক্রান্ত বৃত্ত—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বইটি প্রকাশ করেছে মুক্তধারা। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৭। সমকালীন পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ-রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের বই। প্রাসঙ্গিক সূত্রে ক'জন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য দু'একটি গ্রন্থের আলোচনাও প্রবন্ধাকারে স্থান পেয়েছে এতে। বইটিতে মোট চৌদ্দটি প্রবন্ধ রয়েছে : ১. সেই পুরাতন বৃত্ত, ২. দার্শনিক দারিদ্র্য, ৩. সাহিত্যের দর্শনানুসন্ধান, ৪. সমালোচক বুদ্ধদেব বসু, ৫. স্বতঃস্ফূর্ত পলায়ন, ৬. 'পুতুল নাচ' ও 'পদ্মানদী', ৭. কবি এবং প্রতিনিধি, সংস্কৃতির, ৮. সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নে, ৯. ঐতিহাসিক, তবে কোন অর্থে? ১০. দ্বিতীয় পথ, ১১. মুখের ভাষা, বুকের কাঁপন, ১২. অচলিষ্ণু গতিবেগ, ১৩. সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা, ১৪. ভিন্ন এক প্রান্তরে। প্রবন্ধগুলোতে লেখক কখনো তির্যক তীক্ষ্ণতায় আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে কটাক্ষ করেছেন, কখনো স্বদেশের দুর্দশায় বেদনাকাতর অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বহু আয়োজন-আন্দোলনেও শেষপর্যন্ত চিরায়ত বৃত্তাবদ্ধ সমাজের প্রথাদাসত্ব, সচেতন মানুষের পলায়নী মনোভাব, বিজ্ঞান ও প্রগতিবিমুখ চিন্তাজড়তার কথা তিনি বলেছেন কখনো উদাহরণসহ, কখনো প্রতীকী উপস্থাপনায়। সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে এ দু'বিষয়ের পারস্পরিক যোগসূত্রের কথা বলা হয়েছে। অন্তর্গত ঐক্যসূত্রে অঙ্গাঙ্গি জড়িত বিষয় দুটোর চর্চায় যুক্ত মনীষীদের কথাও এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র, কীটস, হোমার, মিল্টন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের কর্মের তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। তিনটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারার প্রতিনিধি হিসেবে বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জসীমউদ্‌দীনের উল্লেখযোগ্য রচনার আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তিনটি ভিন্ন প্রবন্ধে। এ বইয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়েও রয়েছে কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ। পুরনো ধ্যান ধারণা, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ও সংকীর্ণতায় ঘুরপাক খাওয়া আমাদের আত্মক্ষয়ী প্রবণতা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে লেখক সচেতন আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে নিজস্ব দৈন্যের বৃত্ত থেকে নিজেদের অতিক্রমণকে জরুরি বলে মত ব্যক্ত করেছেন। বইটি সুসংবদ্ধ আলোচনার সাথে প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ। কিন্তু এতে কোনো তথ্যসূত্র বা গ্রন্থপঞ্জি নেই।
র. আ. ক.

অনধিকার : গল্পগ্রন্থ। লেখক সুব্রত বড়ুয়া। মোট গল্প ছয়টি : 'অনধিকার', 'মধ্যাহ্নের পাখি', 'গ্রহণের কাল : বসন্ত', 'আত্মপক্ষ', 'শাদা হাওয়া' ও 'অতসীকে ভালোবাসি'। নৈঃসঙ্গ, একাকীত্ব, ও বেদনাবোধ গল্পগুলোর প্রধান বিষয়। নিঃসঙ্গতার উৎস নর-নারীর প্রণয়ের অসফলতাজনিত প্রেক্ষাপট। 'মধ্যাহ্নের পাখি'র মতোই নিঃসঙ্গ নন্দিতা। 'লোকটা'-র (স্বামী) সংসার করতে গিয়ে নন্দিতার কেবলই পূর্ব প্রেমিক সুমিত্রদার অভাববোধে কলঘরের অন্ধকারে কাঁদতে ইচ্ছে করে। 'আত্মপক্ষে'-এর নিঃসঙ্গ গল্পলেখক দীপিতার প্রসঙ্গে আনমনা হয়, দৈনন্দিন জীবন তার এলোমেলো হয়ে ওঠে। প্রেমিক অতীনের জায়গায় অন্য 'লোক'কে স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়ার ফলে ইতির যে বেদনাখচিত রক্তক্ষরণ তাই নিয়ে 'শাদা হাওয়া' গল্প। অন্যদিকে অতসীর সঙ্গে ভিন্ন পুরুষের বিবাহকালীন কয়েক ঘণ্টায় প্রেমিকের স্মৃতিরোমন্থনজাত যে অন্তর্জাগতিক মর্মবেদনা—তা নিয়েই গড়ে উঠেছে 'অতসীকে ভালোবাসি' গল্প। আত্মজীবনকে বিবর্ণ করে সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করা এবং অবশেষে তাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন এক বৃদ্ধের অবসর জীবনে একাকীত্বের হাহাকারময় পরিণতির গল্প 'অনধিকার'। প্রায় সবগুলো গল্পেই চরিত্রগুলোর মনোজাগতিক বিবরণের মাধ্যমেই গল্পগুলো উপস্থিত। সৈয়দ ইকবালের জ্যামিতিক প্রচ্ছদে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৭। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১।
মো. আ. মি.

অনন্ত অন্বেষা : রাবেয়া খাতুন। বইটির প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৩৭৪। সাধারণ সামাজিক মানুষের কাছে

www.pathagar.com

কৌতূহলোদ্দীপক হাওয়াই জাহাজে আকাশচারী পেশায় রত মানুষের জীবনচিত্র সম্বলিত উপন্যাস। চাকরির দায়িত্বপালনসূত্রে এয়ারক্রাফটে আজ এদেশে কাল ওদেশে উড়ে বেড়ানো ওয়াহিদ নামের এক বত্রিশ বছর বয়সী পরিপূর্ণ যুবক উপন্যাসের মূল চরিত্র। উড়োজাহাজে স্টুয়ার্ডের চাকরি তার, ভ্রমণ-পাগল এ যুবক চাকরিসূত্রে দেশ ভ্রমণের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আনন্দিত চিত্তে। সুযোগ পেলেই বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করে। এরকম এক ভ্রমণকালেই রাওয়ালপিণ্ডি-মারীর পথে পিণ্ডি প্রবাসী মৃত কর্ণেলের সম্ভ্রান্ত বাঙালি বিধবা স্ত্রী নার্গিসের সাথে তার দেখা। জানা যায়, নার্গিস ওয়াহিদের চাইতে ছ'বছরের বড়। কিন্তু অতিসাবধানতার পরেও আন্তরিক সৌহার্দ্যের ফলে নার্গিসের আভিজাত্য ও সংযম আর ওয়াহিদের কুণ্ঠার বাঁধ ভেঙে দু'জন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ওয়াহিদের বৃদ্ধা মা প্রথম পুত্র অর্থাৎ ওয়াহিদের বড় ভাইকে দুর্ঘটনায় অকালে হারিয়ে একমাত্র নাতি টুটুলের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ব্যাকুল ; বিধবা রূপসী পুত্রবধূকে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ওয়াহিদের সাথে বিয়ে দিয়ে সবকূল রক্ষা করতে চান। এই পারিবারিক টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত ওয়াহিদ এক বিশেষ ক্রান্তিকালে বিয়ে করে নার্গিসকে। তাদের গভীর ভালবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কোনো ফাঁক ছিলো না, কিন্তু নার্গিসের ছেলে কিশোর রুমী মেনে নিতে পারে না ওয়াহিদকে। এভাবে প্রতিমুহূর্তের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ জীবন নিয়ে বিয়ের প্রথম বার্ষিকী পালনের আগেই ওয়াহিদ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নার্গিসকে ভুল বুঝে। কিন্তু ছ'বছর বিচ্ছিন্ন ও যন্ত্রণাদগ্ধ থাকার পর সে আবিষ্কার করে নার্গিস শুধু ভালবাসাবঞ্চিত আর্তই নয়, তারুণ্যে উপনীত সন্তান রুমী স্বাবলম্বী হয়ে আপনবৃত্তে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ায় সে সর্বস্বহীনা। সময়ের ভারে ক্লান্ত বিবর্ণ নার্গিস তার সমস্ত আভিজাত্য, লাবণ্য, রুচি ও বিত্ত নিয়েও এতোটা রিক্ত যে নিজের বিচ্ছিন্ন স্বামীর খোঁজে আসতেও সে ভীত। তার এই অবয়ব ওয়াহিদের তীব্র আত্মাভিমান, ভ্রান্তি, জেদ ও দ্বিধাকে গুঁড়িয়ে দেয়—জয়ী হয় শাশ্বত প্রেম। ওয়াহিদ নতুনরূপে গ্রহণ করে তার নিজস্ব নারীকে। এই মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরোও কিছু অনুষঙ্গ, শাখা কাহিনী, জাহাজে চাকরির পরিবেশ-প্রতিবেশ, জীবনপ্রণালী। প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের চিত্তাকর্ষক বর্ণনাও। সহজভঙ্গিতে বর্ণিত এ উপন্যাসের ব্যতিক্রমী পটভূমি আকর্ষণীয়, কাহিনীর আবেদন শক্তিশালী। র. আ. ক.

অনন্ত গোঁসাই : রাঢ়ের বাউল-সাধক ও বাউল-গান রচয়িতা, উনিশ শতকে বর্তমান ছিলেন। অনন্তর গানগুলো দীর্ঘ ; তবে তা গূঢ়ার্থবোধক ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। 'বাঙলার বাউল ও বাউল গান' (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত), 'হারামণি' (৭ম খণ্ড, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত) ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর গান সঙ্কলিত হয়েছে। নূ. ই

অনন্তব্রত : হিন্দু সমাজের ব্রত বিশেষ। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দশী থেকে শুরু করে চতুর্দশ বৎসর অবধি অনন্তব্রত পালন করা হয়। এই ব্রতের পূজনীয় দেবতা হচ্ছেন বিষ্ণু। তিনি অনন্তদেব রূপে কল্পিত হন। অনন্তব্রত পালনের কয়েকটি নিয়ম আছে। যেমন, যারা এই ব্রত পালন করে থাকেন তাদেরকে চতুর্দশ সূত্র দ্বারা তৈরি এবং বিষ্ণুনামের ধারা বিশেষভাবে শুদ্ধীকৃত চতুর্দশ গ্রন্থিযুক্ত ডোরা হাতে ধারণ করে এই ব্রতকথা শুনতে হয়। আ. ন. ম. ব. র

অনন্ত মূর্তি : কন্নড় ভাষার কথাসাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচক। তাঁর রচনা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি ১৯৩২ সালে কর্নাটকের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব-কৈশোর কাটে গ্রামে। এম.এ. পড়ার সময় তিনি শহরে আসেন। মহিশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্য রচনা করেন। যেমন : গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ও

www.pathagar.com

কবিতা। তবে উপন্যাসে তাঁর খ্যাতি এবং পরিচিতি অনেক বেশি ব্যাপক। তাঁর গল্প উপন্যাসে মডার্ণ প্যারালাল রীতি পরিলক্ষিত হয়। তিনি পুরনো মূল্যবোধকে সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে নতুন আবরণে উপস্থাপন করেন। তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম : প্রকৃতি, কার্তিক ও ঘাটশ্রাদ্ধ। তাঁর রচিত তিনটি উপন্যাস হলো ভারতীপুরা, আভাস্তে ও সংস্কার। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'সংস্কার' উপন্যাসটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সমালোচকের মননশীল আলোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য বই হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সমালোচক লিখেছেন, 'উপন্যাসটি গ্রামের এক পুরোহিত প্রাণেশচার্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্কটকে তুলে ধরে। প্রাণেশ্চার্য তার সমস্ত ধর্মীয় ও প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস একদিন ঝেড়ে ফেলতে বাধ্য হয় শূদ্র দেহজীবীনী চান্দ্রীর শারীরিক টানে। পণ্ডিত তার গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কারণ সে আর তার জাতির যোগ্য আচার্য নয়। এক সময় সে ফিরেও আসে, তার নতুন এবং পরিবর্তিত অস্তিত্বকে ঘোষণার সচেতন মন নিয়ে।' সমালোচক আরো লিখেছেন, 'প্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্ন, শরীর এবং মন, ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার চলাচলে অনন্ত মূর্তির কথাসাহিত্যে জীবনের এক মহোৎসব'। কন্নর সাহিত্যে তিনি আধুনিক সমালোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর সমাচেলাচনা সাহিত্যে তিনি যে নিজস্ব মূলসূত্র সংযোজন করেছেন সেটি তাঁর সমালোচনা সাহিত্যকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। সে. হো.

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীতাচার্য ও গীতরচয়িতা। ১৮৩২ সালে বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গঙ্গা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ স্থাপিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিষ্ণুপুর রাজদরবার থেকে 'সঙ্গীত কেশরী' খেতাবও প্রাপ্ত হন। গীতরচয়িতা রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। কোন কোন সঙ্কলন গ্রন্থে অনন্তলালের গান সংকলিত রয়েছে। পুত্র রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও বহু কৃতী সঙ্গীতশিল্পী অনন্তলালের শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ক. গো.

অনন্যা : মহিলাদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা : লায়লা সামাদ। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ-১৩৬২ (জুলাই-আগস্ট-১৯৫৫) সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এ পত্রিকাটি ৪ বৎসর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। শামসুল ইসলাম কর্তৃক আল-হেলাল প্রেস, ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো এবং ১/এ মগবাজার রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। বার্ষিক মূল্য : ৬০০ (ছ' টাকা)। উপন্যাস, ছোট গল্প, কথিকা, প্রবন্ধ, কবিতা, রূপসজ্জা, শিশুর যত্ন, সেলাই, রান্না ও সিনেমার খবরাখবর এ পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ ছিল। সা. আ.

অনন্যা : মহিলা-পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি ১৯৮৮ সালের ১৫ অক্টোবর প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যের পাশাপাশি মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্মসচেতনবোধ জাগ্রত করার জন্যে এ সাময়িকীর জন্ম। এর সম্পাদক তাসমিমা হোসেন এবং নির্বাহী সম্পাদক দিল মনোয়ারা মনু। মহিলাদের বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক সমস্যা নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করে সেগুলো রিপোর্ট, ফিচার কিংবা নিবন্ধ আকারে অনন্যা প্রতিনিয়তই তুলে ধরে। মহিলাদের স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়েও অনন্যার দৃষ্টি এড়ায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কথা, কর্মজীবী মহিলাদের কথা এবং সংস্কৃতিসচেতন মহিলা ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনার নানা দিক অনন্যা প্রকাশ করে। অনন্যার বিশেষ সংখ্যাগুলো মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কা. রো.

অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার : অনন্যা সাহিত্য পত্রিকা প্রতি বছর 'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে থাকে। ১৯৯৪ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। নারীর সামাজিক

www.pathagar.com

মর্যাদা ও সমঅধিকারের সপক্ষে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনন্যা সাহিত্য পত্রিকা তার জন্মলগ্ন থেকেই এ কাজ করে যাচ্ছে। মহিলাদের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা যে সমাজের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির জন্যে একটি বড় বাধা অনন্যা পত্রিকা তা অনুধাবন করেছে এবং আঘাত হানছে সেই গোঁড়ামির দরজায়। অনন্যা সাহিত্য পত্রিকা থেকে অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার প্রদান সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে সুধী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রথম অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন। পরবর্তী সময়ে যাঁরা এ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন : রিজিয়া রহমান, নীলিমা ইব্রাহিম, দিলারা হাশেম, রাবেয়া খাতুন, সনজিদা খাতুন, জাহানারা ইমাম প্রমুখ। এছাড়া ১৯৯৪ সাল থেকে অনন্যা বছরের শীর্ষ দশজন নারী ব্যক্তিত্বকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আসছে। এদেশের অধিকার বঞ্চিত, নির্যাতিত ও পিছিয়ে পড়া নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যারা সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে নিরলসভাবে কাজ করে সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের সম্মান জানানোকে 'অনন্যা' নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, আইন ও মানবাধিকার, রাজনীতি, খেলাধুলা, শিক্ষা, গবেষণা, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র, সংগীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনন্যার এই শীর্ষদশ পদক ও সম্বর্ধনা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। **কা. রো.**

অনন্বয়/অনন্বয়োপমা : একই বস্তু যদি উপমেয় ও উপমান, এই দুই রূপেই বর্তমান থাকে, তবে সেখানে অনন্বয় অলঙ্কার হয়। যেমন— (ক) অনির্বাচ্য নিরুপমা <u>আপনি আপন সমা</u>/ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি। (ভারতচন্দ্র)। (খ) <u>গোরাচাঁদের তুলনা গোঁরাচাঁদ গোঁসাই রে</u>/বিচার করিয়া দেখ সভে। (পরমানন্দ)। (গ) অতিখল অতিছল অতীব কুটিল-/<u>তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল</u>। (গিরিশচন্দ্র)। (ঘ) বহুর মাঝারে সেই একজন,/এক সে দেহের একটি গঠন-/<u>তার যাহা কিছু তাহারি মতন</u>। (মোহিতলাল)। **আ. ই**

অনল প্রবাহ : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) রচিত জাতীয় জাগরণমূলক কাব্য। প্রথম প্রকাশ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। 'অনল প্রবাহ' কাব্যকে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জীবন-ভাষ্য রূপে আখ্যায়িত করা যায়। অগ্নির লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে কবি সর্বহারা জাতিকে অন্ধকারের ভিতরে আলোক ও মুক্তিপথের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে কবি মুসলমানদের অধঃপতন ও দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করেছেন। যা হারিয়ে গেছে তার জন্য শোক কথা বৃথা। বরং জাতির হৃতগৌরব কী করে উদ্ধার করা যায় সেই চিন্তাই এখন মুখ্য। মুসলমানদের প্রতি এই আশ্বাস ও বিশ্বাসের বাণীই 'অনল প্রবাহে'র মর্মকথা। অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতির প্রতি অপরিসীম দরদের বশে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী জাতির মুক্তি ও উদ্ধারকল্পে জাতিকে আহ্বান করে বলেছেন,—'উঠ তবে ভাই। উঠ মুসলমান,/জাগ তবে সবে ধরি নব প্রাণ,/সাধহ কর্তব্য রাখিবারে মান,/এখনি নিশার হবে অবসান।/এখনি ভাতিবে আলোক রাশি।' **আ. ই**

অ-নাটক : যেসব নাটকে নাটকীয় রীতিনীতি যথাযথ পালন করা হয় না, তাদেরকে অ-নাটক বা Anti-play বলে। প্রচলিত ছক বা নিয়মের ধারা রক্ষা করে এসব নাটকের প্লট বা কাহিনী গড়ে ওঠে না। কাহিনীতে যেখানে-সেখানে এলোমেলো ঘটনার বর্ণনা লক্ষ করা যায়। কয়েকটি মাত্র চরিত্র ঘুরে-ফিরে কখনো প্রতীকী উপস্থাপনায় আবার কখনো বহির্বাস্তব ঘটনার বিবৃতিতে কিংবা অন্তর্বাস্তব দিকের ব্যাখ্যানে চিত্রিত হয়। অ-নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণত অবক্ষয়ী সমাজের মানুষ এবং তার জীবন-আবর্তনের একঘেয়ে বিষাদকাতর আলেখ্য অবলম্বনে গড়ে ওঠে। বাদল সরকার রচিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি অ-নাটকের দৃষ্টান্ত। **আ. ই**

অনাদি কুমার দস্তিদার : রবীন্দ্রবিদ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কণ্ঠশিল্পী। ১৯০৩ সালে সিলেটে

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে ১৯২০ সালে এন্ট্রান্স পাস করেন। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেখেন ভীমরাও শাস্ত্রী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখের কাছে। বীণা বাদনেও পারদর্শী ছিলেন। শান্তিনিকেতনের বাইরে তিনিই রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানে ব্রতী হন। বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানিতে রবীন্দ্রসংগীতের ট্রেনার ছিলেন। রাইচাঁদ বড়ালের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। শিশির ভাদুড়ীর উৎসাহে কয়েকটি নাটকে সঙ্গীত পরিচালনা করেন। উদয় শঙ্করের নৃত্যদলের সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী স্বরলিপি সমিতি গঠন করলে তিনি তার সম্পাদক হন ও এখান থেকে বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রণয়ন করেন। চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর পথিকৃৎ ভূমিকা ছিল। তিনি 'রবীন্দ্রতত্ত্ব বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ক. গো.

অনার্য : ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে যারা বেদ রচনা করেছে, তারা আর্য নামে পরিচিত। আর্যদের ভারত আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বহু জাতির লোক এদেশে বসবাস করতো। এই আদিম অধিবাসীরা অনার্য নামে পরিচিত। সুতরাং অনার্য বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণীকে বোঝায় না। আর্যগণ ভারতে এসে এসব আদিম জাতিকে পরাজিত করে তাদের বাসভূমি দখল করে। অনার্যদের মধ্যে অনেকে দাসরূপে আর্য সমাজভুক্ত হয়ে ক্রমে শূদ্র নামে পরিচিত হয়। অনেকে আবার দুর্গম পর্বত ও অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। তাদের বংশধরগণ এখনো সেসব অঞ্চলে বসবাস করে। বৈদিক সাহিত্যে এসব প্রাচীন জাতি দাস, নিষাদ, দস্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত। আর্যগণ অবজ্ঞাভরে এদের কুৎসিত চেহারা, কৃষ্ণবর্ণ, অবোধ্যভাষা ও ধর্মহীনতার কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু তারা যে শক্তিশালী ছিল এবং তাদের পদানত করা যে আর্যগণের পক্ষে খুব সহজসাধ্য হয় নি, তার পরিচয়ও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া অনার্যরাও যে উন্নতমানের সভ্যতার অধিকারী ছিল, তার প্রমাণ সিন্ধু সভ্যতা। বর্তমান কালের কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা, খাসিয়া, ভুটিয়া, নাগা, কিরাত, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি জাতি প্রাচীন অনার্য জাতির বংশধর। তাদের ভাষা আর্য থেকে পৃথক এবং তাদের দৈহিক গঠনেও অনেক প্রভেদ রয়েছে। আর্যদের রচিত বেদের ভাষা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষা উদ্ভূত। যেমন– বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, গুজরাটি রাজস্থানী, কাশ্মীরি প্রভৃতি। কিন্তু অনার্যদের ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষাও মূলত অনার্য ভাষা। তবে অনার্যদের ভাষার সহিত আর্য ভাষার বহু সংমিশ্রণ ঘটেছে। আর্য ভাষায় অনেক অনার্য শব্দ প্রবেশ করেছে। এরূপে একদিকে যেমন অনার্য জাতির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে আর্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি আর্য ধর্ম এবং সমাজেও অনার্য জাতির প্রভাব স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। আ. খা.

অনিরুদ্ধ ভট্ট : বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেনের গুরু ও সেন রাষ্ট্রের ধর্মাধ্যক্ষ। তাঁর সময়কাল খ্রিস্টীয় বারো শতক। অনিরুদ্ধ ভট্ট বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বরেন্দ্রভূমির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং মীমাংসক কুমারিল ভট্টের মতবাদে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বল্লাল সেন তাঁর কাছে পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর 'দানসাগর' গ্রন্থে তাঁর ভট্টগুরুর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অনিরুদ্ধ ভট্টের রচিত গ্রন্থের নাম 'পিতৃদয়িতা' ও 'হারলতা'। এই গ্রন্থদ্বয়ে অশৌচ, শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতি বিবিধ হিন্দু অনুষ্ঠানের ও নিত্যকর্মের বিস্তৃত আলোচনা আছে। তাঁর গ্রন্থের পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে, তিনি বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত চম্পাহট্টি বা

www.pathagar.com

চম্পাহাটি নামক গ্রামের অধিবাসী এবং চম্পাহট্টীয় মহামহোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর 'হারলতা' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তিনি গঙ্গাতীরবর্তী বিহারপট্টক নামক গ্রামে বাস করতেন। কারও কারও মতে চম্পাহাটি গ্রামটি তিনি দান হিসেবে পেয়েছিলেন। ম. চৌ.

অনিল সরকার : কবি। ১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী। তাঁর ছাত্র জীবন কেটেছে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার এমবিবি কলেজে পড়ার সময় সাম্যবাদী মতাদর্শের গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তা আরো ব্যাপক ভিত্তিলাভ করে। শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করেও তিনি সে পেশায় যুক্ত থাকতে পারেন নি। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর রাজনীতির কারণে তাঁর যাত্রাপথ হয়েছে কন্টকবহুল। কখনও তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছে, কখনও পাহাড়ে–জঙ্গলে কাটিয়ে রাজনীতির আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। এর পাশাপাশি কবিতা ছিলো আর একদিক। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা, পর্যটন, সংস্কৃতি, তফসিলী জাতি ও পশ্চাৎপদ শ্রেণী উন্নয়নের মতো বিভাগগুলির মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু সমানভাবে চলছে তাঁর কবিতা রচনা। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ও ছড়ার সংকলন হলো : শেষ পল্টন, স্বজনের মুখ, কালবদলের ছড়া, প্রীজনভ্যান, ব্রাত্যজনের কবিতা, একুশ ও অন্যান্য কবিতা ও হীরাসিং হরিজং। তিনি ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় কবি এবং সমানভাবে পরিচিত আসাম, মেঘালয়সহ উত্তর–পূর্ব ভারতে। অনুবাদের মাধ্যমে অনিল সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠকের কাছে পরিচিত। তিনি পেয়েছেন আম্বেদকর ফেলোশিপের সম্মান। কবি অনিল সরকার কবিতাকে অবসর মুহূর্তের সৃষ্টি বলে মনে করেন না। বর্তমান কালের জটিল দ্বন্দ্বকে সমাজের যাবতীয় অন্যায়ের এবং ব্রাত্যজনের সংগ্রামের চিত্রকে তিনি চিহ্নিত করে। তাঁর কবিতা অবদমিত, অসম্মানিত শোষিত এবং নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। সে. হো.

অনিলা স্মরণে : কমলকুমার মজুমদার রচিত উপন্যাস। একটি কিশোরীর পিতৃ–বিয়োগের শোক কীভাবে তাকে বিষণ্ন, কাতর ও প্রায় ভূতগ্রস্ত করে তুলেছিল, তাই নিয়ে রচিত। এই কাহিনীতে অতি সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে সেই কিশোরীর মায়ের পুনর্বিবাহ ও অবচেতন মনের পাপবোধ, বিপিতার অস্বভাবী পরিবর্তন এবং মা ও মেয়ের অনিবার্য দ্বন্দ্ব। সে কাহিনী শুধু উৎকণ্ঠা–উদ্বেলই নয়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও ক্ষুরধার। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১০২, মূল্য : ১২ রুপি। বি. প.

অনিশ্চিত রাগিনী : আবু রুশদ রচিত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি। প্রকাশক : স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন : কালাম মাহ্মুদ। মূল্য : চার টাকা মাত্র। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আছেন একজন বৃদ্ধ, বিপত্নীক ভদ্রলোক। উপন্যাসে তাঁকে কফিল সাহেব নামে সম্বোধন করা হয়েছে। পেশাগত জীবনে তিনি জগন্নাথ কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ব্যক্তিগত জীবনে চার সন্তানের জনক। কফিল সাহেব তাঁর শেষ জীবনে চারদিকে নৈতিক অবক্ষয়ের খণ্ড খণ্ড চিত্র প্রত্যক্ষ করছেন। যথেষ্ট কম সময়ের ব্যবধানে পরিপ্রেক্ষিত আর প্রেক্ষাপট যেন বদলে গেছে। তাঁর ছেলে সময়মত অফিসে যাচ্ছে না ; নাতির মধ্যে ভদ্রতাবোধ গড়ে ওঠে নি ; রাস্তাঘাটে ছেলেরা মেয়েদের উত্যক্ত করছে ; পরীক্ষার্থীরা পাস করার সুবিধার্থে সেন্টার বদলাচ্ছে ; কফিল সাহেবের ছোট মেয়ে মা হতে গিয়ে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে ; ছোট ছেলে টাকার লোভে একজন বিধবার (স্বভাব ভাল নয়) বাড়িতে থাকতে শুরু করেছে ইত্যাদি। কফিল সাহেবের বাসার উল্টোদিকে জাফর সাহেব নামে একজন অর্ধশিক্ষিত লোককে আলিসান বাড়ি করতে দেখা গেছে। সে কফিল

www.pathagar.com

সাহেবের ছাত্র, পেশায় ব্যবসায়ী। অবৈধভাবে অনেক টাকার মালিক হয়েছে সে। টাকা থাকবার কারণে সবাই তাকে খুব সম্মান করে। কফিল সাহেবের নাতনী সকিনা জাফর সাহেবের বড় ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করে। সমগ্র উপন্যাসে কফিল সাহেব একাকিত্বের যন্ত্রণায় অস্থির। তিনি মাঝে মাঝেই ঠাট্টা করে তাঁর নাতনীকে বলেছেন, তিনি আবার বিয়ে করতে চান। উপন্যাসের শেষে নাতনীর বিয়ের সময়ে তিনি 'গুরুতর এক সিদ্ধান্ত নেন : তিনি আবার এক সঙ্গিনী বেছে নিবেন।' উপন্যাসে মূল বিষয়গুলোকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে লেখক কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সৈ. আ. জা.

অনুকরণ/অনুকৃতিবাদ : গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতে জাগতিক বস্তু মাত্রই প্রতীয়মান সত্য। এই সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পী যখন সৃষ্টিপ্রেরণা লাভ করেন, তখন অবশ্যই তাঁকে সৃষ্টি প্রকৃতির অনুসরণের আশ্রয় নিতে হয়। তবে শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টিকল্পে যে অনুকরণ–প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায় তা জাগতিক বিষয় বা প্রকৃতির হুবহু নকল নয়। অনুকরণের আসল অর্থ হচ্ছে বিষয়ের ভাবসত্যের প্রতিষ্ঠা। অনুকরণ প্রক্রিয়াটি কোনোক্রমেই যান্ত্রিক নয়। এই প্রক্রিয়া যথার্থই হৃদয়ভাবের দ্বারা সিদ্ধ। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলের মতে শিল্পের সাধারণ ধর্মই হচ্ছে অনুকরণ। বিপুল সৃষ্টিরহস্যে শিল্পের অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। শিল্পী সেই সৃষ্টির অনুকরণ করেই শিল্পের সম্ভাবনাকে সাফল্য–মণ্ডিত করে তোলেন। জীবনের ঘটনাসমূহকে সাজিয়ে গুছিয়ে কবি বৃত্তের কাঠামোতে তাদেরকে রূপদান করেন। অনুকরণের ফলেই এই রূপসৃষ্টি সম্ভব হয়। অনুকরণকে তাই 'Ideal Representation' বলা যায়। ড্রাইডেন বলেছেন, অনুকরণ কল্পনাপ্রধান একটি মানসিক ব্যাপার। তাঁর মতে অনুকরণের তিনটি স্তর,— উদ্ভাবন বা invention, পরিশিল্পনা বা variation এবং সুষ্ঠু শব্দ সংযোজনা। উদ্ভাবনায় কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে, পরিশিল্পনায় সৃষ্টির সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় এবং যথাযোগ্য শব্দ সংযোজনায় সৃষ্টির সৌষ্ঠব প্রকাশ পায়। অনুকরণ বস্তুসত্তার প্রতিরূপ বা কল্পরূপ মাত্র নয়। কোনো বিশেষ মুহূর্তে প্রকৃতি, সমাজ বা জীবনের সত্য যখন ভাব বা ভাবনার রূপ ধারণ করে তখন তার অভিব্যক্তি সম্ভব হয় অনুকৃত শিল্পের মাধ্যমে। কাব্যসাহিত্য বা চিত্রকলায় বর্ণিত সত্য অনুকরণের ফলেই বাস্তব সত্য থেকে পৃথক। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কবি তব মনোভূমি, রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' আ. ই.

অনুকল্প : রিজিয়া খান। উপন্যাস। এটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে পরিচিতি লাভ করেছে। উপন্যাসটির পরিচিতি প্রসঙ্গে প্রথম সংস্করণে বলা হয়েছিল : "দেহ এবং মন– এদের সম্পর্ক ওতপ্রোত হলেও জীবনের কাঠামোর এরা স্বতন্ত্র তল। পরিপার্শ্ব এবং ঘটনা প্রবাহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্যবহারিক জীবনে যেসব কাজ আমরা করে থাকি, তা মনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পক্ষান্তরে মনও আমাদের ব্যবহারিক জীবনের কার্যক্রম– এমনকি পরিপার্শ্বকেও অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।" আশরাফ ফিরোজ, আরশাদ, রেণু, খুশী এরা সকলেই বাস্তব জীবনের নানা টানাপোড়েনের যত না তার চেয়ে বেশি মানসিক ঘাত–প্রতিঘাত আর বৈকল্যের শিকারে পরিণত হয়ে অস্থির যন্ত্রণায় নির্যাতিত হয়েছে। রেণু আর আশরাফ সম্পর্কে খালাতো ভাইবোন হলেও ছেলেবেলায় দুজনেই একই মহিলার স্তন্যপান করেছিল বলে ধর্মীয় বিধানের বিধিনিষেধের জন্য এরা দুজনেই ভালবাসার জ্বালামুখে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়েছে। তবু মনের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। কাহিনীর জট এখানেই নিহিত। ঘটনাসংস্থার আঙ্গিক ও চরিত্র নির্মাণের দিক থেকেও 'অনুকল্পে'র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সা. আ.

অনুকার অব্যয় বা ধ্বনাত্মক অব্যয় : কড়কড়, ধবধবে, ছিপছিপে, সাঁসাঁ, হনহন, ছলছল, ঝিকিমিকি প্রভৃতি ভাব ও ধ্বনিপ্রতীক

www.pathagar.com

অব্যয়কে ব্যাকরণে অনুকার অব্যয় বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। এগুলো বাক্যে নামবিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। অনুকার অব্যয় বাঙলা ভাষার দেশজ বিশেষ সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে "ইহারা না থাকিলে বাঙলায় বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হইত।"— অতএব অনুকার অব্যয় বর্ণনাসূচক পদ। যেভাব বা অনুভূতি অন্য প্রকারে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব, তা-ই অনুকার অব্যয় যোগে প্রকাশিত হয়। এরূপ : ভনভন, হোহো, ঝাঁ ঝাঁ, বোঁ বোঁ, ফিনফিনে, ফিকফিক, বিড়বিড়, হিড়হিড়, জ্বলজ্বলে ইত্যাদি। **শি. প্র. লা.**

অনুকূল : প্রতিকূল কারণ যদি অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাকে অনুকূল অলঙ্কার বলে। যেমন— (ক) অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি/ভুজপাশে বাঁধি করদণ্ড। (ভারতচন্দ্র)। রজ্জু বন্ধনরূপ দণ্ড বাঞ্ছিত বা অনুকূল নয়, কিন্তু সুন্দর বিদ্যার বাহুরূপ রজ্জু-বন্ধনে সানন্দে আবদ্ধ হতে চায়। এখানে সুন্দরের কাছে প্রতিকূল বিষয় অনুকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। (খ) 'এই বলিয়া অভিশাপ দিব, আপনার যেন অনেকক্ষণ চলৎশক্তি না থাকে।' (রবীন্দ্রনাথ)। 'চোখের বালি' উপন্যাস বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের উক্তি প্রতিকূল কারণ মহেন্দ্র কিংবা বিনোদিনী উভয়ের কাছে অনুকূল বলে মনে হয়েছে। **আ. ই**

অনুকূলচন্দ্র, শ্রীশ্রীঠাকুর : জনসেবক, সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রন্থকার। ১৮৮৮ সালে পাবনা জেলার হেমায়েতপুরে জন্ম জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শিবচন্দ্র চক্রবর্তী। অনুকূলচন্দ্র বাল্যাবধি ভক্তিপ্রবণ ও সেবাধর্মপরায়ণ ছিলেন। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়া শেষ করে স্বগ্রামে এসে চিকিৎসা বৃত্তিতে নিয়োজিত হন ; কিন্তু ধর্মের আকুতিতে তাঁর ডাক্তারখানা ধর্মালোচনার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তিনি মাতার নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধনচর্চায় ব্রতী হয়ে একটি 'কীর্তন-চক্র' গড়ে তোলেন এবং তাঁর মাধ্যমে সৎকথন ও সৎকর্মানুষ্ঠানের নীতি প্রচার করতে থাকেন। তাছাড়া 'সৎসঙ্গ' আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমের আদর্শ ছিল কর্মোদ্যোগ, স্বাবলম্বন ও দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে সাধনায় দক্ষতা অর্জন। অনুরাগী ভক্তবৃন্দ নিয়ে অনুকূলচন্দ্র তপোবন বিদ্যালয়, মাতৃবিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দেশ বিভাগের এক বছর আগে ১৯৪৬ সালে অনুকূলচন্দ্র বিহারের দেওঘরে চলে যান। সেখানেও নতুন করে পাবনার অনুরূপ আশ্রম এবং শিক্ষা, ধর্ম ও কর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করেন। অনুকূলচন্দ্রের নিজস্ব ছাপাখানা থেকে আশ্রমের মুখপত্র 'শাশ্বতী' এবং প্রায় ৪৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এসব গ্রন্থ অনুকূলচন্দ্রের লেখা। ধর্ম, অর্থ, পরমার্থ, গৃহ, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর আদর্শ ও উপদেশবাণী ঐসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির মধ্যে 'পুণ্য-পুঁথি', অনুশ্রুতি (৬ খণ্ড), চলার সাথী, শাশ্বতী (৩ খণ্ড), 'প্রীতি-বিনায়ক' (২ খণ্ড), 'বিবাহ-বিধায়না', 'সমাজ-সন্দীপনা', 'যতি অভিধর্ম' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। দেওঘরেই ১৯৪৯ সালে অনুকূলচন্দ্রের মৃত্যু হয়। **আ. ন. ম. ব. র.**

অনুগামী প্রায় সমার্থক শব্দ : বাংলা ভাষায় বহু যুগ্ম শব্দ আছে যেগুলোর রূপে কিছু ভিন্নতা থাকলেও শব্দ দুইটি সমার্থক। এই শব্দগুলোকে অনুগামী সমার্থক শব্দ বলে। যেমন— অভাব-অভিযোগ, অনুনয়-বিনয়, আপদ-বিপদ, আমোদ-প্রমোদ, আত্মীয়-স্বজন, জ্বালা-যন্ত্রণা, জোত-জমি, ঠাট্টা-তামাশা, ভুল-ভ্রান্তি, ভাব-গতিক। **শি. প্র. লা.**

অনুগামী শব্দ : বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্যে যখন একটি শব্দ বাপদ দ্বিরুক্ত হয়, তাকে দ্বিরুক্তি বা শব্দদ্বৈত বা পদদ্বৈত বলে। এগুলো বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন :

১. ধ্বনির দ্বিরুক্তি : ঠং ঠং, কচ্‌কচ, ধপধপ ;
২. পদের দ্বিরুক্তি –ভালয় ভালয়, যার যার, হেসে হেসে, ঘরে ঘরে ইত্যাদি ;
৩. শব্দের দ্বিরুক্তি– বাড়িবাড়ি, বস্তাবস্তা, ভূরিভূরি, ভালভাল, যেযে ;

www.pathagar.com

৪. আবার সমার্থক-ভিন্নার্থক এবং বিপরীতার্থক ও ধ্বন্যাত্মক অনুগামী বা সহগামী পদও রয়েছে ,যেমন :

ক. সমার্থক অনুগামী শব্দ—বাধা-বিঘ্ন, হৈ-হল্লা, বিষয়-সম্পত্তি, দুঃখ-কষ্ট, নথি-পত্র, বন-জঙ্গল, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি ;

খ. বিপরীতার্থক অনুগামী শব্দ – হার-জিত, আসা-যাওয়া, লঘু-গুরু, জন্ম-মৃত্যু, ছোট-বড়, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ ইত্যাদি ;

গ. ভিন্নার্থক অনুগামী শব্দ – ডাল-ভাত, অন্ন-বস্ত্র, কাঠ-খড়, ধোপা-নাপিত, জল-বায়ু, ঘর-দোর, পথ-ঘাট, জল-স্থল, খেত-খামার, হাঁস-মুরগি, মাছ-তরকারি, নদী-নালা ইত্যাদি ;

ঘ. ধ্বন্যাত্মক অনুগামী শব্দ-কাপড়-চোপড়, চা-টা, ঘুম-টুম ইত্যাদি। শি.প্র.লা.

অনুগীতা : মহাভারতে উল্লিখিত অশ্বমেধ পর্বের একটি অংশবিশেষ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর অর্জুন সেই সব উপদেশ পুনর্বার প্রদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অবশ্য গল্পের আধারে তিনি মোক্ষধর্মের ইতিহাস শোনান। এছাড়া অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ এবং বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাও আলোচনা করেন। এই অংশটিই মহাভারতে অনুগীতা বলে উল্লিখিত হয়েছে। অনুগীতায় সিদ্ধব্রাহ্মণ এবং কশ্যপ ও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সংবাদ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। সা. মু.

অনুগ্রহমূর্তি : সৌম্য পর্যায়ের শিবমূর্তি বিশেষ। এই জাতীয় শিবমূর্তির প্রতিটির পেছনেই কোনো না কোনো পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান থাকে। পুরাণে নানাভাবে শিবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিবের অনুগ্রহমূর্তির পেছনে যেসব কাহিনী আছে তাতে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শিব বিভিন্ন ভক্তের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে নানা-ভাবে তাদের মঙ্গল সাধন করছেন। এই জাতীয় মূর্তির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি হচ্ছে বিষ্ণুনুগ্রহ মূর্তি বা চক্রদানমূর্তি, পাশুপতাস্ত্রদানমূর্তি, চণ্ডেশানুগ্রহমূর্তি, রাবণানুগ্রহমূর্তি ইত্যাদি। আ.ন.ম.ব.র.

অনুজ্ঞা : আদেশ, অনুরোধ, নির্দেশ আদেশ ইত্যাদি বুঝতে অনুজ্ঞা ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। বর্তমানকাল ও ভবিষ্যৎকালেই শুধু অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। মধ্যম পুরুষে ও প্রথম পুরুষেই কেবল এরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়। যথা—অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ

(ক) বর্তমান কাল :

সাধারণ	মধ্যমপুরুষ	:	তুমি বা তোমরা	যাও।
তুচ্ছার্থক	"		তুই বা তোরা	যা।
সাধারণ	প্রথম পুরুষ	:	সে বা তারা	যাক বা যাউক।
সম্ভ্রমাত্মক মধ্যমপুরুষ	প্রথম পুরুষ	:	আপনি বা আপনারা	যান বা যাউন।
		:	তিনি বা তাঁরা	

(খ) ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ	মধ্যমপুরুষ		তুমি বা তোমরা	যেও, যাইও।
তুচ্ছার্থক	"		তুই বা তোরা	যাস, যাইস।
সাধারণ	প্রথম পুরুষ	:	সে বা তারা	যাক, যাউক।
সম্ভ্রমাত্মক	মধ্যমপুরুষ	:	আপনি বা আপনারা	যাবেন।
"	প্রথম পুরুষ	:	তিনি বা তাঁরা।	

অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে সাধারণত মধ্যমপুরুষের কর্তা উহ্য থাকে। আদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি কাজগুলো অনুক্ত উত্তমপুরুষই ক'রে থাকে ব'লে উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ হয় না, কারণ নিজেকে নিজে আদেশ, অনুরোধ করা যায় না। অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ অনুজ্ঞাবাচক ও পরোক্ষ অনুজ্ঞাবাচক। প্রথম পুরুষের অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত। শি.প্র.লা.

অনুজ্ঞা ভাব : যে ক্রিয়ার ভাব দ্বারা আদেশ, নির্দেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়া বলে। ইংরেজি ভাষার Imperative ও optative mood আর বাঙলায় অনুজ্ঞাভাব নামে অভিহিত। যেমন—

ক. আদেশাত্মক অনুজ্ঞা : "এখন খেতে যাও।"

খ. নিষেধাত্মক অনুজ্ঞা : "মিথ্যে কথা বলো না।"
গ. উপদেশাত্মক অনুজ্ঞা : "সব সময় শরীরের যত্ন নিবে।"
ঘ. অনুরোধাত্মক : "দয়া করে আমার বাড়ি চলুন।"
ঙ. প্রার্থনা মূলক : "হে খোদা, আমাকে ক্ষমা কর।"
চ. আশীর্বাদ : "খোদা তোমার মঙ্গল করুন।"

শি.প্র.লা.

অনুপম দিন : সৈয়দ শামসুল হক রচিত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬২। এতে পুরুষের দ্বৈত প্রেমের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। বীথি তার পিতার অনুজের বাসায় থেকে কলেজে পড়ে। খুড়তুত ভাই আবুর সঙ্গে তার ভাব জন্মে। অবশ্য আবু স্বীকার করে না যে, সে বীথিকে ভালবাসে। সহপাঠিনী বিলকিসের প্রতি সে সচেতনভাবে অনুরক্ত। আবুর মা-বাবা, ভাই-বোন বাড়িশুদ্ধ সবাই বুঝতে পেরেছে যে, আবু বীথিকেও ভালবাসে। বাইরের আত্মীয়-স্বজনের কাছেও ব্যাপারটি গোপন থাকে না। পশ্চাতে কোন কলঙ্ক ঘটে যাবার আশঙ্কায় বড় কাকা এসে বীথিকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। আবু এতে মর্মাহত হয় না। বিলকিসের চিন্তায় সে মশগুল। আবুকে না পাওয়ার বেদনায় বীথির অন্তরের তার ছিড়ে যায়। বাঁচার ইচ্ছা তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। জীবনের এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আবু বীথির প্রতি তার অবচেতন ভালবাসা তীব্রভাবে অনুভব করে। নায়ক-নায়িকার মনোবিশ্লেষণে এবং সংঘাতময় চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

কা. রো.

অনুপমার প্রেম : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) রচিত একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প। ১৩২০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্য'পত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে 'কাশীনাথ' (১৯১৭) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের ছয়টি পরিচ্ছেদ-পরম্পরায় যে সমস্ত শিরোনাম আছে সেগুলো হলো—বিরহ, ভালোবাসার ফল, বিবাহ, বৈধব্য, চন্দ্রবাবুর সংসার ও শেষ দিন। গল্পের কাহিনী তারই অনুসরণ করেছে। অনুপমা বাপের বড়ো আদরের মেয়ে। সে গ্রামের রাখাল মজুমদারের ছেলে সুরেশকে ভালোবাসে। পিতামার চেষ্টায় সুরেশের সঙ্গেই অনুর বিয়ে ঠিক হয়, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক সুরেশ বিয়ের রাত্রেই পলায়ন করে। জাতি কুল রক্ষার্থে তখন অনুপমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা জগবন্ধু বাবু অনুকে সেই রাত্রেই গ্রামের বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলাল দত্তের হাতে সমর্পণ করেন। অনুপমার কৈশোরের স্বপ্ন এক নিমেষে নিষ্ঠুর বাস্তবের আঘাতে ধূলিসাৎ হয়। গ্রামের অপর একটি যুবক ললিত মোহন অনুপমাকে ভালোবেসে জেলে গিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে। ইতিমধ্যে অনুপমা বিধবা হয় এবং তার পিতামাতাও প্রাণত্যাগ করেন। অনুপমা তখন ভাইয়ের বাড়িতে দাসীবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। গল্পের পরিসমাপ্তিতে আত্মহত্যা করতে গিয়ে অনুপমা তার প্রত্যাঘাত প্রেমিক ললিতমোহন কর্তৃক উদ্ধার লাভ করে তারই পরিচর্যায় সুস্থ হয়। এই শেষ অংশে লেখক ললিতের সঙ্গে অনুপমার জীবনের একটা সম্ভাব্য নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠবার ইঙ্গিত দান করেন। গল্পের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তিতে একটা ভাবগত অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয় — মধুর ব্যঙ্গে যার শুরু, নির্মম পরিণতিতে তার পরিসমাপ্তি। গল্পের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা বিবৃতিমূলক, তবে তার সংলাপে নাটকীয় কলাকৌশল সৃষ্ট হয়েছে।

অ. ন.

অনুপ্রাস : একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্তভাবে অথবা বিযুক্তভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে তাকে অনুপ্রাস বলে। যেমন, 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি/গরজে গগনে গগনে/গরজে গগনে॥' এই বাক্যনিচয়ে 'গ'-ধ্বনিটি বারোবার উচ্চারিত হওয়ায় 'গ'-এর অনুপ্রাস লক্ষ করা যায়। অনুপ্রাসে স্বরধ্বনির সম্মান কম। স্বরবর্ণের বারবার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ধ্বনিগত বৈচিত্র্য দেখা দেয় না। ফলে তাকে অনুপ্রাস বলা চলে না। যেমন, 'মূক রাজাগারে বেদনা-তিমির।

www.pathagar.com

চিতাভূমে জাগা আনিছে সমীর/কত না অনাথা পুরকামিনীর, মর্ম্মবিদারী রব।' এই বাক্যে তেরোবার 'আ'-ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু এরা মূল্যহীন। ফলে এদের দ্বারা অনুপ্রাস সৃষ্টি হয় নি। বাংলায় প্রধানত তিন প্রকার অনুপ্রাস দেখা যায়। যেমন, অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যানুপ্রাস ও ছেকানুপ্রাস। অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারীরূপে শ্রুত্যানুপ্রাস নামে অপর একটি অনুপ্রাস রয়েছে। বাংলায় এর স্বতন্ত্র আসন নেই। বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য-সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জনধ্বনি 'শ্রুত্যানুপ্রাস' গঠন করে। দৃষ্টান্ত :

১। সরল অনুপ্রাস- সশঙ্ক লঙ্কেশসূর স্মরিলা শঙ্করে।

২। গুচ্ছানুপ্রাস- নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গে।

৩। ছেকানুপ্রাস (বা একানুপ্রাস) - কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।

৪। শ্রুত্যানুপ্রাস- ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া।

৫। মালানুপ্রাস- শিশির কণায় মানিক ঘনায় দূর্বাদলে দীপ জ্বলে।

৬। অন্ত্যানুপ্রাস- (পদান্তমিলজাত)
- জামা।
- মানা।

৭। বৃত্ত্যানুপ্রাস নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগনব। সাধারণ আদ্য-অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত : ফুলিয়া ফুলিয়া ফেলিল সলিল। কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, চলচপলার চকিত চরণে। শি.প্র.লা.

অনুবর্তন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৫০) রচিত উপন্যাস। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ২২ জুলাই ১৯৪২ সাল। তার আগে 'অনুবর্তন' অন্য কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি 'খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে' শিক্ষকতা কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি জাঙ্গীপাড়া ও হরিনাভিতে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার সেই অভিজ্ঞতাকেই তিনি 'অনুবর্তনে' কাজে লাগান। জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করলে বিভূতিভূষণ কলকাতা ছেড়ে বনগ্রাম চলে আসেন এরূপ একটি ঘটনা 'অনুবর্তনে' লিপিবদ্ধ হয়েছে। যদুবাবু ও তার স্ত্রীর কলকাতা ত্যাগের কাহিনী এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। 'অনুবর্তনে' শিক্ষকদের মধ্যে যে দলাদলি ও কোন্দল লক্ষ করা যায়, বিভূতিভূষণের দিনলিপি-গ্রন্থে 'তৃণাঙ্কুরে' তার উল্লেখ আছে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপন্যাসের ক্ষেত্রবাবু, নারাণবাবু ও যদুবাবুর প্রাইভেট টিউশনির চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিপত্নীক শিক্ষক ক্ষেত্রবাবুর মানসিকতার সঙ্গে বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার ব্যক্তি-মানসিকতার সাযুজ্য সৃষ্টি করেছেন। তাই 'অনুবর্তন' বেশির ভাগ তাঁর নিজের জীবনেরই কাহিনী। ক্লার্কওয়েল সাহেব অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে এক গোষ্ঠীভুক্ত হলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। প্রবীণ নারায়ণবাবু সৎ লোক, কিন্তু ছাত্র চুনির প্রতি বাৎসল্যবশত ধনী গৃহিণীর অপমান নীরবে মেনে নেন। যদু মুখুজ্জে বিভূতিভূষণের আশ্চর্য সৃষ্টি। কোনো অপমান তাকে বিচলিত করে না, অভাবের জ্বালায় স্ত্রীকে দরিদ্র আত্মীয়ের বাড়ি ফেলে আসেন, ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ স্কুলের পয়সা থেকে নিজের উদরপূর্তি করতে দ্বিধা করেন না। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসব কথা স্মরণ করে তিনি ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যদুমুখুজ্জে বিভূতিভূষণের সাহিত্যের এক শিল্পদক্ষ ট্র্যাজিক চরিত্র। মরণকালে তার ঐ আত্মচিন্তার মধ্যে মানুষ বিভূতিভূষণকে খুঁজে পাওয়া যায়। আ. গ.

অনুমান : হেতু বা কারণ থেকে যদি কার্যের উৎপত্তি হয় এবং অন্য অলঙ্কার যোগে তা কাব্যসৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়, তবে তাকে অনুমান অলঙ্কার বলে। যেমন- 'মনে হেন' অনুমানি/ হৃদয়ে তোমার উদিয়াছে প্রিয়-বদন-চন্দ্রখানি ;/ তাহারি কিরণে অঙ্গ তোমার পাণ্ডুতামণ্ডিত,/ তন্বী, তোমার নয়নকমল যে-ও দেখি নিমীলিত।' (শ্যামাপদ চক্রবর্তী)। এখানে কারণ বা হেতু হচ্ছে, বিরহিণীর অঙ্গের পাণ্ডুতা ও নয়নকমলের

www.pathagar.com

নিমীলিত হওয়া। এই কারণ থেকে অনুমান হচ্ছে, বিরহিণীর হৃদয়ে প্রিয়তমের মুখচন্দ্রের উদয় হয়েছে। এর সঙ্গে রূপক অলঙ্কারের যোগ থাকায় এখানে অনুমান অলঙ্কার হয়েছে। কিন্তু কেবল কারুর চোখের জল থেকে দুঃখের অনুমান হলে অনুমান অলঙ্কার হবে না, কেননা তাতে অলঙ্কার-যোগে কাব্য-চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস নেই। আ. ই

অনুমান : আরজ আলী মাতুব্বর। প্রবন্ধ সংকলন। গ্রন্থটি ১৩৯০ সনের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের রচনাগুলো রচিত হয়েছিল ১৩৮৮ হতে ৮-৩-১৩৮৯ সময়ের মধ্যে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ অংকন করেন লেখক নিজে। এই গ্রন্থে ৭টি প্রবন্ধ আছে। যেমন : 'রাবণের প্রতিভা', 'ফেরাউনের কীর্তি', 'ভগবানের মৃত্যু', 'আধুনিক দেবতত্ত্ব', 'মেরাজ', 'শয়তানের জবানবন্দি', 'সমাপ্তি'। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন : মূলত 'অনুমান' তুচ্ছ বিষয় নয়। এর আশ্রয় না নিয়ে মানুষের এক মুহূর্তও চলে না। অনুমান বার বার শক্তি ক্ষীণ বলেই ইতর প্রাণী-মানুষের চেয়ে এত পিছনে এবং মানুষ এত অগ্রগামী তার অনুমান করবার শক্তি প্রবল বলেই। ভবিষ্যতের চিন্তা মাত্রেই অনুমান, কতক অতীতেরও। আর ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়ের চিন্তা ও অনুমান করতে পারে বলে 'মানুষ' হতে পেরেছে/ 'অনুমান'-এর বাস্তব ও অবাস্তব দু'টি রূপ আছে। তবে 'ভবিষ্যৎ' তাবৎ 'বর্তমান'-এ পরিণত না হয়, তাবৎ সে 'রূপ' ধরে পড়ে না। আবার এমন অনুমানও আছে, যার বাস্তব রূপ কোনো কালেই ধরা পড়তে চায় না। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলোর ভেতর দিয়ে লেখক যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা যে কোনো শিক্ষিত মানুষকেই ভাবাবে এবং নানা বিষয়ে তার মনে চিন্তার উদ্রেক ঘটাবে। এই বইয়ের শেষ রচনার নাম 'সমাপ্তি'। তিনি লিখেছেন 'বর্তমানে আমার বয়স প্রায় ৮৩ বছর। কাজেই আজ আমি যে 'সমাপ্তি' নিবন্ধটি লিখছি, বাহ্যত এ পুস্তিকাখানার সমাপ্তি হলেও মূলত আমার জীবনেরও সমাপ্তি। এইটুকু উল্লেখ করে তিনি নিজের জীবনের কথা বলেছেন। শেষে উল্লেখ করেছেন যে, 'আমার প্রণীত বা সম্পাদিত আলোচ্য যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকাই হচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যু দিনের বাঞ্ছিত 'দামামা'র অংশবিশেষ। এছাড়া আমার অন্যান্য কৃতকর্মেও রয়েছে ঐ একই প্রেরণা। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মানব কল্যাণ'। এই বইটি একজন লেখকের জীবন-দর্শনের চিত্র। সে. হো.

অনুমিতিবাদ : সংস্কৃত আলঙ্কারিক আচার্য ভট্ট শঙ্কুকের রসবিষয়ক সিদ্ধান্তকে অনুমিতিবাদ বলা হয়ে থাকে। শঙ্কুর মতে রস কেবল সহৃদয়জনেরই হৃদয়বেদ্য জিনিস। নট-নটীগণ অভিনয় করেন, কিন্তু শিল্পের রস নামক বস্তুটি তাঁদের চিত্তে জাগ্রত হয় না, কেবল সহৃদয় সামাজিকের চিত্তেই সেই রসের অনুভূতি সম্ভব হয়। সহৃদয়জন কর্তৃক স্থায়ীভাবের অনুমানকেই প্রকৃত রসানুভূতি বলা যায়। ধূম বহ্নির অনুমাপক ; বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব সহযোগে সৃষ্ট রসানুভূতিও স্থায়ী চিত্তবৃত্তির অনুমাপক। অভিনয়কালে নট যখন তাঁর দক্ষ অভিনয়ের মাধ্যমে রসের প্রবাহ সৃষ্টি করেন, তখন সেই রস সংক্রমিত হয় সহৃদয় দর্শকের চিত্তে। দর্শকের চিত্তে স্থায়ীভাবের এই উপলব্ধি বা অনুমানই হচ্ছে সাহিত্যে অনুমিতিবাদ। দর্শকের মনে রসের বিভ্রম বা অনুমান সৃষ্টির মূলে নটের অভিনয়-নৈপুণ্য অপরিহার্য। দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য নট আপন সত্তা বিস্মৃত হয়ে অভিনয় করেন, কিন্তু অভিনয়চাতুর্যে মুগ্ধ হয় সহৃদয় দর্শক। কাজেই মহৎ অভিনয় দৃষ্টে দর্শকের মনেই কেবল অলৌকিক রসের বোধ জন্মে, অভিনেতা-অভিনেত্রী তার কারণ মাত্র। আ. ই

অনুর পাঠশালা : মাহমুদুল হক। উপন্যাস। রচনাকাল ১৯৬৭। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় রোকেয়া সুলতানা'র প্রচ্ছদে সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। উপন্যাসের পটভূমিতে রাজধানী মফস্বল, অভিজাত লোকালয়, পশ্চাৎপদ ঋষিপাড়া একাকার হয়ে গেছে। বেলা বারোটার মধ্যে স্কুল ছুটি শেষে

www.pathagar.com

বাড়ি ফেরা অনুর ভালোবাসাহীন জীবনযাপন, একাকীত্ব, ক্রোধ যেন সমসাময়িক জীবন–ব্যবস্থার ফল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অন্বেষী ব্যক্তি ক্রমশ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, বিচ্ছিন্ন হয়েছে অনুর বাবা, অনুর মা আর এর ফল ভোগ করেছে অনু। প্রধান চরিত্র অনু ও সরুদাসীর পাশাপাশি গৌণ চরিত্র টোকানি, গেনদু, রাণীখালা, মন্টু, মঞ্জু এমনকি ঋষিপাড়ার পথ চিনিয়ে দেয়া ছেলেটি পর্যন্ত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংলাপহীন রাণী ফুফুর প্রসঙ্গও যেন এ উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আসে। অনুর চোখ দিয়ে তিনি যে বিশ্বকে দেখেছেন বা বর্ণনা করেছেন তা আয়তনে ছোট কিন্তু গভীরতায় অতল। মানুষের যাবতীয় সুন্দর, কদর্য মুহূর্তগুলো, মানুষ ও মানুষের প্রকৃতি, নিসর্গকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মাহমুদুল হক তাঁর উপন্যাসের জন্য তৈরি করে নিয়েছেন এক নতুন ভাষা, প্রয়োগ করেছেন নতুন নির্মাণ কৌশল। যেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের সামগ্রিক চেহারাটুকু। জীবন সংলগ্ন বা জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে আছে যে চলতি ভাষা মাহমুদুল হক সংলাপে তাকে গ্রহণ করেছেন। ভাষার এ চাতুর্য তাঁর উপন্যাসের সাফল্যের অন্যতম দিক। এ উপন্যাসে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুর স্কুলের প্রসঙ্গ আছে। আর কোথাও তার স্কুলে যাওয়া আসা ঘরে পড়াশুনার পরিচয় নেই, কিন্তু উপন্যাসের নাম অনুর পাঠশালা, সাতচল্লিশ উত্তর বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পরাধীনতার বোধ জেগে উঠেছিল, ষাটের দশক ছিল রাজনীতি–পীড়িত, মধ্যবিত্তের যেমন ঠিকানা ঘটছিল তেমনি বাড়ছিল অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট। সেই সংকটের কালে মাহমুদুল হক উপস্থিত করলেন অনুকে, তার একদিকে সাপের মতো হিলহিলে ঘর, অন্যদিকে জানলা দিয়ে চোখে পড়া বিশাল আকাশ। সেই আকাশের নিচে অসংখ্য মানুষ, অনেক রকম মানুষ। অনু তার ভেতরের এবং বাইরের পৃথিবী থেকে ক্রমাগত গ্রহণ করেছে, এই তার পাঠশালা। কিন্তু অনুদের জিজ্ঞাসা আছে, মুক্তি নেই। অনুর পাঠশালা শুধু একজন অনুর আলেখ্য নয়, সংকট–পীড়িত প্রতিচ্ছবি। অ.ন.

অনুরাগবল্লী : গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের তত্ত্বজিজ্ঞাসা সংক্রান্ত গ্রন্থ। গ্রন্থের রচয়িতা মনোহরদাস। রচনাকাল চৈত্র, ১৬১৮ শতাব্দ বা ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যে নীরস ঘটনাবিবৃতির মধ্যেও বৈষ্ণব সমাজের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুশিষ্য পরম্পরায় রচিত। এতে বৈষ্ণব সমাজ, আচার্য, কুলকথা ও গুরুশিষ্যের নানা চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পরিবেশিত হয়েছে। আ. ই

অনুরাধা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮) রচিত গল্প। ১৩৪০ সনের চৈত্রসংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মতী ' ও 'পরেশ' গল্পের সঙ্গে একত্রে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮ মার্চ, ১৯৩৪ সালে। হরিহর ঘোষালের বিপত্নীক পুত্র জমিদার বিজয় ঘোষাল একজন বিলেত ফেরত ও সাহেবী চালচলনে অভ্যস্ত। মাতৃহীন বালক কুমারকে সঙ্গে নিয়ে সে গনেশপুর গ্রামে এসে ভূতপূর্ব জমিদার বাড়ি দখলের আয়োজন করে। জরাজীর্ণ জমিদারের তেইশ বছরের অনূঢ়া কন্যা অনুরাধা নিঃশর্তে বাড়ি ছেড়ে দিতে রাজি হয়। ইতিমধ্যে মাতৃহীন কুমারের সঙ্গে অনুরাধার বাৎসল্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনুরাধার সংযম ও আত্মমর্যাদাবোধ বিজয়কে মুগ্ধ করে। সুতরাং বৃদ্ধ বিপত্নীক ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর সঙ্গে অনুরাধার বিয়ের সংবাদে বিজয়ের মনে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া জাগে। বৌদির ভগিনী অনিতার সঙ্গে বিজয়ের সঙ্গে যে বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হয়, অনিতা নিজেই তা ভেঙ্গে দিলে বিজয়ের আনন্দের সীমা থাকে না। বিজয়ের সঙ্গে অনুরাধার সম্পর্ক নিরূপণে মূলত দৌতকার্য করেছে বিজয়ের পুত্র কুমার। বিজয়ের পত্নী নির্বাচনের চেয়ে বালকের মাতৃনির্বাচনই এখানে প্রধান। অনুরাধার আখ্যান উপন্যাসের বিস্তৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে। কাহিনীর স্বাভাবিক অগ্রগতিতে ধাপে ধাপে বিজয় ও অনুরাধার আখ্যান এমন একটি পরিণতিতে স্থিতি লাভ করে

www.pathagar.com

যেখানে অনুরাধার পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতিতে পাঠকচিত্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। গল্পটি রোমান্টিক হলেও প্রেমনির্ভর নয়। ত.শ.

অনুরূপা দেবী : ঔপন্যাসিক। ১৯৮২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার শ্যামবাজারস্থ মামাবাড়িতে জন্ম। পিতার নাম মুকুন্দ দেব। ঠাকুরদাদা ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী। মাতামহ নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সেকালের নাট্যজগতের অন্যতম পুরোধা। অনুরূপা দেবীর আদি নিবাস হুগলী জেলার নতীবপুরে। শৈশবে প্রখ্যাত পণ্ডিত অনন্তরাম মিত্র, বেনীমাধক ভট্টাচার্য এবং ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যচর্চার দীক্ষা নেন। কথাসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে বড়বোন ইন্দিরা দেবীর অনুপ্রেরণায়। বিহারের পুরেই তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা (গল্প) ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়, যা কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ও অন্যতম প্রধান উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১) ওখানে বসেই লেখা। এই মূজাফরপুর অবস্থানকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে মাধুরীর সঙ্গে তিনি 'চ্যাপম্যান গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারি বিহারে ভূমিকম্প হলে কলকাতা চলে আসেন এবং পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর বহু উপন্যাস নাট্যাকারে রূপান্তরিত হয়েছে এবং মঞ্চে ও ছায়াচিত্রে স্থান পেয়েছে। 'পোষ্যপুত্র' ছাড়া মা (১৯২০), মন্ত্রশক্তি (১৯১৫), মহানিশা প্রভৃতি বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : বাগদত্তা (১৯১৪), জ্যোতিহারা (১৯১৫), উত্তরায়ণ, পথহারা, চক্র, বিবর্তন, সর্বাণী, গরীবের মেয়ে, হারানো খাতা, জোয়ার ভাঁটা, রামগড়, প্রাণের পরশ, মধুমল্লী, কুমারিল ভট্ট ইত্যাদি। ১৯১৯ 'সরস্বতী' ও ধর্মচন্দ্রিকা উপাধিলাভ। ১৯২৩ সালে বিশ্বমানব মহামণ্ডল থেকে ভারতী ও রত্নপ্রভা উপাধি প্রদান। ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করে এবং ১৯৪৪ সালে লীলা লেকচারার পদে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যু ১৯ এপ্রিল ১৯৫৮ সাল। খা.বি.জ. উ.

অনুরোধের গল্প : হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত গল্প-সংকলন। প্রথম প্রকাশনা : আগস্ট, ১৯৮৭। জাগরী প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বইটির দুটি প্রধান আকর্ষণ এর প্রচ্ছদ ও সম্পাদকের অনুরোধে ৩০ জন 'গল্প-উদাসীন'-এর লেখা ৩০টি গল্প। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী পূর্ণেন্দুপত্রী। যাঁদের গল্প সংকলন করা হয়েছে তাঁরা হলেন আতিকুল হক চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মুতী, আবুল হোসেন, আল-মুজাহিদী, আহমেদ হুমায়ূন, ওবায়েদ-উল-হক, কাজী ফজলুর রহমান, কামরুল হাসান, খোন্দকার আলী আশারফ, জাহানারা আরজু, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নূরুল ইসলাম, ফয়েজ আহ্‌মদ, বি.এম. আব্বাস এ.টি., মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, মোফাজ্জল করিম, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রোকনুজ্জামান খান, লুৎফর রহমান সরকার, শামসুর রাহমান, সন্‌জীদা খাতুন, সন্তোষগুপ্ত, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, সৈয়দ আলী আহসান, হায়াৎ মামুদ। লেখকদের কেউই পেশাগত ও চর্চাগত ক্ষেত্রে গল্প লেখক নন। তবে প্রায় সকলেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সূত্রে লেখালেখির সাথে যুক্ত। সম্পাদক হোসনেআরা শাহেদের কৃতিত্ব তিনি অনুরোধ করে ৩০ জন ব্যক্তিকে গল্প লেখায় উদ্বুদ্ধ করে 'অনুরোধের গল্প' প্রকাশ করেছেন। যাঁদেরকে আমরা নানাক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে হতে দেখেছি তাঁরা গল্প লিখেছেন এবং সেসব গল্প বেশ উপভোগ্য হয়েছে। লেখকরা গল্পের মধ্যে নিজ নিজ দর্শন, আদর্শ ও চর্চার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নাট্যজগতের নাট্যকার আতিকুল হক চৌধুরীর 'গোলাপী রঙের পর্দা' গল্পটি নাট্যরসে পূর্ণ। আবদুল্লাহ আল-মুতী বিজ্ঞান-সাধক, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আজীবন সংগ্রাম

ও সাধনা। তাঁর 'জাদুর আঙটি' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বপ্নে দেখা জাদুর আংটি মনে করে পথে কুড়িয়ে পাওয়া রূপোর আংটি হাতে পরে বালক মজিদ কিভাবে ভালো থাকার স্বপ্ন দেখতে দেখতে দুর্ঘটনায় মারা যায়। শিল্পী কামরুল হাসান এক সময়ে স্বনামখ্যাত ব্রতচারী নাচের শিল্পী ছিলেন। তিনি 'লাল ট্যাক্সি' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন ব্রতচারী দলের কাহিনী। কবি সুফিয়া কামাল ও মতিয়া চৌধুরীর গল্পে রাজনৈতিক ও মানবতাবাদী আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। ৩০ জন লেখকের গল্পেই তাঁদের জীবন দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। এই দিক থেকে বইটির একটি ভূমিকা আছে। মা. বে.

অনুষ্ঠান সঙ্গীত : বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত ও গীত সঙ্গীত অনুষ্ঠান সঙ্গীত হিসেবে পরিচিত। এই সঙ্গীতের মধ্যে গাজন, গম্ভীরা ও ভাদু বা ভাদুই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'ভাদু' ভাদ্র মাসের গীত এবং 'গাজন' চৈত্র-সংক্রান্তির গান। গাজন গান আমাদের লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। সারা চৈত্র মাস ধরে গাজনের উৎসবে এই গান গাওয়া হয়। 'গম্ভীরা' এক ধরনের পালাগান। এ গান অভিনয়ের মাধ্যমে গীত হয়। তাই সঙ্গীতের আবেদনের চেয়েও অভিনয়গত কলাকৌশল এতে প্রধান হয়ে ওঠে। গম্ভীরা গানের মূল গায়ক একজন নানা, আরেকজন নাতি। এই নানা-নাতির বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমাজের নানা সংকট, দুর্নীতি, মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অন্যান্য কাহিনী। এ গানের ভাষা ব্যাঙ্গাত্মক। গম্ভীরা গানের সুর ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়ার সুরের সংমিশ্রণ। হারমোনিয়াম, তবলা-বাঁয়া, মন্দিরা, খঞ্জনী ও দোতারা সহযোগে এবং কার্ফা ও ঝুমুর তালে গীত হয় এ গান। 'গম্ভীরা' প্রকৃতপক্ষে সাল-তামামি গান। ভাদু গান প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলের মেয়েদের গান। সাঁওতাল এবং অন্যান্য অদিবাসীদের মধ্যেও এ গানের প্রচলন রয়েছে। মেয়েলী আচার পালনের সঙ্গে সঙ্গে ভাদুগান গেয়ে মেয়েরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে। ভাদু গান ছড়ার সুরে গাওয়া হয়। অনুষ্ঠান সঙ্গীতের মধ্যে আরও রয়েছে টুসু গান, বিয়ের গান, ধামাইল গান, ধানভানার গান, চিঁড়ে কোটার গান, হোলির গান প্রভৃতি। 'টুসু' পৌষ মাসের গান। এটি ভাদু গানের মতোই ছড়ার সুরে মেয়েরা গেয়ে থাকে। মকর-সংক্রান্তির দিন শেষ হয় টুসু উৎসব ও টুসু ভাসান পর্ব। টুসু শস্যের প্রতীক। বাংলাদেশের বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়েলী আচারের অনুষঙ্গ হিসেবে গীত হয় বিভিন্ন ধরনের বিয়ের গান। বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রতি পর্বেই রয়েছে বিশেষ বিশেষ গান। 'ধামাইল' সিলেট অঞ্চলের যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের গান। বিয়ের আচারের শুরুতেই মেয়েরা ধামাইল গান গেয়ে থাকে। নবান্ন উৎসব উপলক্ষে নতুন ধান ভানতে এবং চিঁড়ে কোটার সময় গাওয়া হয় ধানভানার ও চিঁড়ে কোটার গান। হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে গীত হয় হোলীর গান। ড. শা. আ.

অনুস্মৃতি : নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদার (১৯০৪-১৯৭৩) স্মৃতিকথার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ এটি। স্প্যানিশ ভাষায় এই অনুস্মৃতির নামকরণ করেছিলেন 'Confiesco que be vivido : memoirs' এর বাংলা অর্থ আমি এখনো জীবিত : আমার অনুস্মৃতি। হারভি সেন্ট মার্টিন এই বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে নাম দেন 'Memoirs'। এই ইংরেজি সংস্করণ থেকে বইটি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেন ভবানীপ্রসাদ দত্ত। ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে বইটি প্রকাশ করে 'রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি', ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট ,কলকাতা ৭০০০৭৩। বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮২। পাবলো নেরুদা ছিলেন একাধারে কবি, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রদূত। তাঁর জীবন ছিল বিস্ময়কর ঘটনাবহুল ও সংগ্রামমুখর। কখনো তিনি হয়েছেন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থী আবার কখনো বা নির্বাসিত উদ্বাস্তু। সেসব উজ্জ্বল ও দগ্ধ স্মৃতি তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন কাব্যিক ভাষায়। এক সামান্য রেল শ্রমিকের

www.pathagar.com

পরিবারে পাবলো নেরুদার জন্ম। ছেলেবেলাকার দক্ষিণ চিলির প্রকৃতি আর জঙ্গলের আহ্বান-সঙ্গীত দিয়ে তাঁর অনুস্মৃতির শুরু। তারপর সানতিয়াগোতে তাঁর ছন্নছাড়া ছাত্রজীবনকে তিনি এঁকেছেন কোমলতম ভালোবাসার তুলি দিয়ে। চিলির বাণিজ্য দূত হিসেবে বার্মা, সিংহল ও জাভা দ্বীপ পরিক্রমার একাকীত্ব ও বঞ্চনার করুণ রোমন্থন তাঁর অনন্য শৈলীর কারণে হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের দিনগুলোর বিবরণ এমন জ্বলন্ত যে পাঠকের মনকে ক্ষমাহীন ক্রোধ ও অক্ষম দুঃখবোধে ভরিয়ে তোলে। পাবলো নেরুদার বন্ধু ও সুহৃদদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববরেণ্য সেই সব মানুষ যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করেছেন। যেমন—ফ্রেদেরিকো গারসিয়া লোরকা, ইলুয়ারড, এরাগোঁ, পাবলো পিকাসো, রিভেরা, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, মাও সে তুঙ, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, চে গুয়েভারা, সালভেদোর আলেন্দি প্রমুখ। এই অনুস্মৃতির মধ্য দিয়ে পাঠকেরা একটি যুগের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। শত্রু-মিত্র সব চরিত্রই কবির লেখনী চাতুর্যে চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। এই অনুস্মৃতি পাবলো নেরুদার আত্মজীবনী নয়। অস্থির যুগের মহত্তম এক কবি-জীবনের স্মৃতিচারণ মাত্র। তবে এটি কোনো এক ব্যক্তি মানুষের জীবনস্মৃতি নয়, এটি চিরন্তন সাহিত্য ও সমাজ ইতিহাসের এক সামগ্রী। পাবলো নেরুদা জীবনের প্রায় শেষার্ধে এই অনুস্মৃতি লিখতে শুরু করেছিলেন। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁর প্রিয় বন্ধু সালভেদোর আলেন্দি নিহত হওয়ার মাত্র বারো দিন পরেই কবি মারা যান। অনুস্মৃতির শেষ অধ্যায় তিনি লেখেন সামরিক অভ্যুত্থানের পরে অর্থাৎ মৃত্যুর অল্প ক'দিন আগে। সামরিক অভ্যুত্থান ও কবির মৃত্যুর কারণে শেষ অধ্যায়ের সম্পাদনার কাজ ব্যাহত হয়। কবি-পত্নী ম্যাটিলভে নেরুদা ও মিগুয়েল ওতেরো সিলভা কবির এই শেষ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন। কবির মৃত্যুর ছ'মাস পরে আর্জেন্টিনা ও স্পেনে স্প্যানিশ ভাষায় অনুস্মৃতির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে 'অনুস্মৃতি' এক মূল্যবান সংযোজন। কবি, রাজনীতিক ও ব্যক্তি পাবলো নেরুদাকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে অনুস্মৃতি এক অপরিহার্য গ্রন্থ। সু. ব.

অনেক কথার কথা : ফয়েজ আহমদ রচিত প্রবন্ধের বই। অতীত ও সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য কতিপয় সমস্যার ওপর আলোচনা এবং মূল্যায়নধর্মী দশটি প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থভুক্ত প্রথম প্রবন্ধের নাম : সাম্প্রদায়িকতা ও একুশের ঐতিহ্য। এই প্রবন্ধে লেখক অতীতে কোন্ কোন্ সরকার কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষক সেজে রাজনীতিকে কলুষিত করেছে এবং ভাষা আন্দোলনে মূল প্রেরণা থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছে তা তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের অন্য একটি প্রবন্ধ 'সেই উত্তাল মার্চে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিত'। প্রবন্ধটি রাজনীতি সম্পৃক্ত, বেশ উল্লেখযোগ্য এবং মূল্যায়নধর্মী। উক্ত প্রবন্ধে লেখক মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, অতীতে দেখা গেছে দেশে দুর্যোগ নেমে এলে আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা বেশি নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং কারাভোগ করেছেন। ফলে দুর্যোগ থেকে এই পার্টি বারবার জনপ্রিয় পার্টিতে পরিণত হয়েছে। একই প্রবন্ধে লেখক শেখ মুজিব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'কেউ শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে এদেশের ইতিহাস থেকেই বিতাড়নের স্বপ্ন দেখেন, তাহলে ভবিষ্যতের জেনারেশনকে খণ্ডিত ইতিহাস দিতে হবে এবং তা হবে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য। অতীতে এমন ইতিহাস আছে যেখানে শেখ মুজিব মুখ্য, অনেকেই গৌণ।' গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে : ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় অনীহা কেন? সুলতানের সাথে কথোপকথন, সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও নীতিমালা, সাংবাদিকতা ও পাঠকের অভিযোগ, মোসাফিরের কথায় ও তৎকালীন রাজনীতি

ষাটের দশকে সশস্ত্র বিদ্রোহের পুরোধা, সাম্রাজ্যীর উপহার : লুণ্ঠিত হংকং, আবার আসব। জুলাই ১৯৮৬ সালে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে : নওরোজ সাহিত্য সংসদ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন : মামুন কায়সার। মূল্য : ত্রিশ টাকা। মা. আ.

অনেক তারার হাতছানি : আসকার ইবনে শাইখ রচিত নাটক। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা। এই নাটকে একটি পরিবারের আত্মত্যাগের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের মূল বক্তব্য : এক লোক কয়েক বছর আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। তার একমাত্র তরুণ ছেলে সিপাহী হাসান বাগদত্তা স্ত্রীকে ফেলে সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়ে নিজেও শহীদ হন। অন্য দিকে পীতাম্বর নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক কেরানী ছোট ভাইকে জিম্মি রেখে বারুদ ঘরের চাবি নিয়ে বাসায় ফেরার পরপরই কোম্পানির লোকেরা তার ছোট ভাইকে হত্যা করেন। চারিদিকে তখন গোলাগুলি হচ্ছে, ভীত সন্ত্রস্ত পীতাম্বর এর ভেতর বেরিয়ে পড়েন এবং রাস্তার ওপর বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা লাশের মধ্যে ভাইকে খোঁজার সময় গোরা সৈন্যরা দেখা মাত্র তাকে গুলি করে হত্যা করে। অকালে বিধবা হন পীতাম্বরের স্ত্রী সৌদামিনী। অথচ ব্রিটিশদের পরম অনুগত পীতাম্বর অনেক অনুরোধেও বিদ্রোহীদের হাতে বারুদ ঘরের চাবি তুলে দেন নি। উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ কতো স্বতস্ফূর্ত হতে পারে, এমনকি নববধূর প্রতি ভালোবাসাও যে গৌন হয়ে যেতে পারে, হাসানের শহীদ হওয়া এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত 'অনেক তারার হাতছানি' নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। সহজ কিন্তু তির্যক সংলাপও এই নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার সহযোগিতায় নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন আবদুর রউফ। মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। মা. আ.

অন্তঃপুরের আত্মকথা : চিত্রা দেব রচিত প্রবন্ধ-বই। বইয়ের ফ্লাপে লেখা আছে, '১৮০৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে যাঁদের জন্ম— বাংলার প্রথম মহিলা আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দেবী থেকে নির্যাতিতা বধূ অমিয়বালা দেবী পর্যন্ত- এমন প্রায় ষাট জন বঙ্গনারীর লেখা বিভিন্ন আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা কিংবা দিনলিপিতে ছড়ানো-ছিটানো নারীজীবনের খণ্ডচিত্রগুলোকে একত্র করে তার মধ্য দিয়ে তিনি·(চিত্রা দেব) তুলে ধরেছেন বঙ্গললনাকুলের মানসিক বিবর্তনের প্রামাণ্য, বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ এক বিবরণ। বাংলার নারী-জাগরণের ইতিহাসে এ বিবরণের মূল্য যে কী অপরিসীম, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।' প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৬৬, মূল্য : ২৫.০০ রুপি। বি. ব.

অন্তঃশীলা (১ম খণ্ড), আবর্ত (২য় খণ্ড), মোহানা (৩য় খণ্ড) : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) রচিত প্রেম, সমাজ ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত একই কাহিনী সম্বলিত ত্রয়ী উপন্যাস। তিনটি খণ্ড যথাক্রমে ১৯৩৫, ১৯৩৭ ও ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। নরনারীর আত্মজিজ্ঞাসা ও প্রেমোপলব্ধির কাহিনী এতে বিবৃত হয়েছে। কাহিনী বর্ণনায় লেখকের তীক্ষ্ণ মননশক্তির প্রকাশ হয়েছে। খগেনবাবুর দাম্পত্য বিরোধের চিত্রে তার জীবন-সমালোচনার সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে। সাবিত্রী সন্দেহপ্রবণা নারী। একদিকে তার স্থূল ফ্যাশন-প্রিয়তা, অন্যদিকে খগেনবাবুর অসহিষ্ণু আদর্শ—এই উভয়ের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত সাবিত্রী আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এর পেছনের রহস্য হচ্ছে সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সঙ্গে খগেনবাবুর হৃদয়াবেগের সম্পর্ক। খগেনের প্রতি রমলার শুশ্রূষাই এই প্রেমের কারণ। এই প্রেম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খগেনবাবুর কাশীর নির্জন প্রবাসে গমন এবং কাশীর ধর্ম সাধনার প্রতিক্রিয়া তার মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। জীবন সম্পর্কে তিনি নবশক্তির সন্ধান পান। রমলার

প্রতি প্রেমের পরিবর্তে তার কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। জীবনের নতুন উপলব্ধিতে তিনি কাশী থেকে সুদূরে অজ্ঞাতবাস ও পরিব্রাজকের জীবন শুরু করেন। 'অন্ত:শীলা'র কাহিনী এখানেই শেষ হয়। 'আবর্তে' তার বিশ্লেষণের জের চলে। রমলা এখানে নীতিবিচ্যুৎ ও শালীনতাহীন নগ্নতার বাস্তব প্রকাশ। সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে খগেন বাবুর প্রতি তার কামনা নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করে। রমলার ছোট ভাই বিজন রমলার এই পরিণতিকে ক্ষুব্ধ অনুযোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থচিত্ত তরুণ সুজনের স্নেহচ্ছায়ে আশ্রয় খোঁজে। হিমালয়-ভ্রমণ ও হরিদ্বারের আশ্রমে খগেনবাবু রমলার কামনারঞ্জিত স্মৃতিতে আত্মভাবপীড়িত হয়ে কাশী ফিরে আসে এবং রমলার উপস্থিতিতে প্রেমের সহজ মাধুর্য উপলব্ধি করে। 'মোহানা' এই ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ পর্যায়। এখানে মাসিমার মৃত্যুতে খগেনবাবু ও রমলার মিলনে সমস্ত লৌকিক বাধা অপসারিত হয়। কিন্তু খগেনবাবুর প্রৌঢ়সুলভ অনাসক্তির কারণে এই মিলন সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। বিজন এখানে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। ধর্মঘটের নেতা সফিক। খগেনবাবু পরিশেষে সফিকের কর্মপন্থাকেই অনুসরণ করে। রমলা রঙীন ভাবাবেগে স্বচ্ছন্দ বিহার শুরু করে। আ.ই.

অন্তরঙ্গ : সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত সচিত্র রম্য মাসিক। 'অন্তরঙ্গ' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৬৭ সালে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয় নি। ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে সম্পাদকের নাম ছাপা হয় সৈয়দ শামসুল হক, সহযোগী সম্পাদক কাইয়ূম চৌধুরী, প্রধান সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ কাফি। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় দপ্তর ছিল ৮, নজরুল ইসলাম সড়ক, ফিরিঙ্গি বাজার এবং মুদ্রিত হতো আর্ট প্রেস চট্টগ্রাম থেকে। 'অন্তরঙ্গ' প্রথম সংখ্যায় 'ব্যক্তিগত' কলামে উল্লেখ করা হয় '...অন্তরঙ্গ'র দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ সংবাদ পরিবেশনের দূত হিসাবে উপস্থিত হলো। বিশ শতকের সব চেয়ে জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্র 'অন্তরঙ্গ'র প্রধান সুর, সঙ্গে মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন, চিত্রকলা, সাহিত্যও থাকবে। 'অন্তরঙ্গ' রম্য মাসিক রূপে প্রকাশিত হলেও দৃষ্টিনন্দন ও রুচিশীল কাগজ হিসেবে সুধী পাঠকদের নিকট বেশ সমাদৃত হয়েছিল। ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, অনুবাদ গল্প ছাড়াও খ্যাতনামা দেশি-বিদেশি লেখক ও সংস্কৃতি ব্যক্তিত্বের অবদানের ওপর আলোচনা ও ফিচার ছিল এ কাগজের অন্যতম আকর্ষণ। শিল্পকলা বিষয়ক সমালোচনাও ছিল এ কাগজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন প্রখ্যাত কথাশিল্পী, কবি ও সাহিতিক এ কাগজে লিখেছেন, যেমন, আনিস চৌধুরী, শওকত আলী, সরদার জয়েনউদ্দীন, রশীদ হায়দার, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, মুনীর চৌধুরী, জিয়া আনসারী, আনিসুজ্জামান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আবদুল হাই, শামসুর রাহমান প্রমুখ। বিভিন্ন সংখ্যায় ম্যাক্সিম গোর্কী, আব্রাহাম ইভান, ইসমত চুগতাই, সা'দত হোসেন মান্টো, কৃষণ চন্দ প্রমুখের অনুবাদ রচনাও প্রকাশিত হয়েছে মাসিক 'অন্তরঙ্গে'। "অন্তরঙ্গ" ১১ ও ১২ সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয় মে-জুন ১৯৬৮ সালে। শেষোক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় "এক বছর পূর্ণ হলো 'অন্তরঙ্গের'। এই এক বছরের ইতিহাস কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সম্পাদকীয় দপ্তরের গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হবে। পরবর্তী সংখ্যাগুলো সৈয়দ মোহাম্মদ শফি একান্তভাবে সম্পাদনা করবেন।" 'অন্তরঙ্গ' প্রথম সংখ্যার মূল্য ছিল : এক টাকা। মা. আ.

অন্তরঙ্গ আলোকে : নজরুল ও প্রমীলা— আসাদুল হক : স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। প্রকাশক : নজরুল ইনস্টিটিউট, ৩৩০/বি, সড়ক নং ২৮ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রচ্ছদ : সৈয়দ লুৎফুল হক। পৃষ্ঠা ১৬ + ৯৮। মূল্য : ৫০.০০ টাকা US $ 3.00। সংগীত শিল্পী ও নজরুল গবেষক আসাদুল হক তাঁর 'অন্তরঙ্গ আলোকে : নজরুল ও প্রমীলা' গ্রন্থে নজরুল ও প্রমীলার

www.pathagar.com

প্রেম, পরিণয় এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের দাম্পত্য-জীবনের বাস্তব আলেখ্য সবিস্তারে অঙ্কন করেছেন। এ গ্রন্থ একাধারে গ্রন্থকারের এবং কবি-পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের, কবির বন্ধু-বান্ধব ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্মৃতিচারণ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং পত্র-পত্রিকা ও নানা গ্রন্থ থেকে রচিত তথ্য-তত্ত্ব ও দলিল দস্তাবেজ সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থকার পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় কবি-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট সূত্রে সম্পর্কিত হয়ে অসুস্থ ও বাক শক্তিহীন নজরুল, শরীরিকভাবে অসুস্থ ও পঙ্গু, অথচ মানসিকভাবে সুস্থ ও সতেজ এবং পতিপরায়ণা ও সেবাব্রতী প্রমীলা নজরুলকে যেভাবে দেখেছেন, তারই আলেখ্য অঙ্কন করেছেন এ-গ্রন্থে। এ-গ্রন্থে একটি বিশেষ প্রাপ্তি হচ্ছে, লেখক আসাদুল হককে লেখা প্রমীলা নজরুলের স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি। র. হা.

অন্তর মন্তর : মাহবুব তালুকদার রচিত ছড়া গ্রন্থ। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : রফিকুন নবী। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৮৬, ডিসেম্বর ১৯৭৯, মূল্য : পনেরো টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যাবিহীন অন্তর মন্তর ঠিক শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ নয়। সমাজের অনিয়ম, সমাজ বাস্তবতা, মহান মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে লেখা ছড়ার এই বইটির অঙ্গসজ্জা ভারি সুন্দর। ছড়ার শিরোনাম না থাকলেও এক একটি ছড়া নির্ধারিত বিষয়কে নিয়ে লেখা। একটি ছড়ায় রূপের বর্ণনা, অন্য একটি ছড়ায় প্রজাপতির কাছে বর প্রার্থনাসহ বিভিন্ন বিষয়কে ছড়ার ছন্দে ও মিলে গাঁথা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আগরতলা, খাজা সাহাবুদ্দীন, পাকিস্তানের জিন্না, পাক বেতারের খবর, পাকিস্তানের রাজার ফটো, কাঁদে ইয়াহিয়া, ফিরে আসুন শরণার্থী, ইয়াহিয়া খাঁ, হিংটিং ছট, টিক্কা খাঁ, এহিয়া খাঁর জল্লাদে, মুক্তিসেনা, ভুট্টোপাতিক, আলবদর ও পাকবন্দীসহ দুলাইনের মন্ত্রী হওয়ার ছড়াটি অত্যন্ত সুন্দর। মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা ছড়াকারের বিখ্যাত ছড়া—নোটন নোটন মুক্তিসেনা, ঝোটন বেঁধেছে/ইয়াহিয়ার রক্তধারায় নাইতে নেমেছে। বিদেশ থেকে খানের পোলা, ভিক্ষা নিয়েছে/মুক্তিসেনা গ্রেনেড ছুড়ে শিক্ষা দিয়েছে। উহ! বড্ড লেগেছে। খা.বি.উ..জ.

অন্তরাল : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জীবন সমস্যামূলক নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৯৪২ সাল। চিত্রশিল্পী ভবতোষ মুখুজ্যে, স্ত্রী মাধবী ও একমাত্র উচ্চশিক্ষিতা কন্যা ঝর্ণা। ঝর্ণার জন্মদিনে তারই পাণিপ্রার্থী রণেশের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মাধবীর মনে ভাববৈলক্ষণ্য দেখা দেয়। বিগত জীবনের কোনো স্মৃতি যেন তার মনের পটে ভেসে ওঠে। এরপর থেকে মাধবীর মনে সংসার সম্পর্কে একটা নিস্পৃহ ভাব পরিলক্ষিত হয়। রণেশ উচ্চশিক্ষিত ও মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী। রণেশের সংস্পর্শে ঝর্ণাও মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হয়। রণেশের বন্ধু সুবিনয় রণেশ ও ঝর্ণার ঘনিষ্ঠতায় ঈর্ষান্বিত। সুবিনয়ের ছোট বোন রেখা তাতে ইন্ধন যোগায়। কেননা রেখাও রণেশের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। এদিকে রণেশের আসল পরিচয় লাভের জন্য মাধবী উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কারণ রণেশ সম্পর্কে তার মনে এক রহস্যের সূত্রপাত হয়। ঝর্ণার পরামর্শে সুবিনয়ও শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয়। কিন্তু রণেশের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির প্রখরতার তুলনায় সুবিনয় অত্যন্ত দুর্বল। তাই ঝর্ণাকে সে আকর্ষণ করতে পারে না। জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে সুবিনয় শেষ পর্যন্ত এক শ্রমিক বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দেয়। সুবিনয়ের মৃত্যুর পর ঝর্ণার কুমারী-মাতৃত্ব প্রকাশ পায়। কলঙ্ক থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ভ্রূণহত্যা। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ঝর্ণা ভ্রূণহত্যায় রাজি হয় না। রণেশ ঝর্ণাকে সমর্থন করলেও ভবতোষ বাবুর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পায় রণেশও মাধবীর কুমারী জীবনের সন্তান। এই সংবাদে ভবতোষ বাবু একেবারে ভেঙে পড়েন। কিন্তু মেয়ের অপত্য স্নেহের কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি নতি স্বীকার করেন। মানুষের প্রচলিত নীতির অন্তরালে অবাঞ্ছিত সন্তানের অধিকার-বোধের এক চিরন্তন জিজ্ঞাসাকে নাট্যকার

www.pathagar.com

'অন্তরাল' নাটকে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আ.ন.ম.ব.র.

অন্তরে ভিন্ন পুরুষ—রশীদ হায়দার : গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮০। প্রকাশক মল্লিক ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬+১১৬। মূল্য : ৫.০০ টাকা। এই গল্পগ্রন্থে গল্প আটটি, গল্পগুলো যথাক্রমে অচেনা, পলাতক, আত্মপক্ষ, মাত্রা, নিষিদ্ধ এলাকা, জয়, চোর ও স্বাদ। গ্রন্থের নাম 'অন্তরে ভিন্ন পুরুষ', কিন্তু এই নামে কোনো গল্প নেই। লেখক গল্পসমূহের চরিত্র নিরূপণ করে বলতে চেয়েছেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আরেকটি মানুষ বাস করে। সেই মানুষই দৃশ্যমান মানুষটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ৮টি গল্পের মধ্যে ৬টি গল্প সংসার, প্রেম, অনিশ্চিত জীবন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখিত। বাকি দু'টির একটি (নিষিদ্ধ এলাকা) নিষিদ্ধ পল্লীর এক মেয়েকে নিয়ে লেখা ; আর একটি 'স্বাদ' মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক। তবে 'স্বাদ' মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা হলেও এর পেছনে কার্যকর রয়েছে প্রেম। রশীদ হায়দারের গল্প উপস্থাপনা সুখপাঠ্য। সহজভাবে, নির্মেদ গদ্যে তিনি নির্মাণ করেন কাহিনী, সৃষ্টি করেন চরিত্র। সে. হো.

অন্তর্জলী যাত্রা—কমলকুমার মজুমদার : বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৫-১৯৭৯) রচনাবলী। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত তাঁর অন্তর্জলী যাত্রা—উপন্যাসের আঙ্গিক-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্নতর মাত্রার সংযোজন হিসাবেই আবির্ভূত হয়। এই উপন্যাসের চিত্রময় কাহিনীকাঠামো এমন এক দৃঢ়বদ্ধ প্রস্তর-দেয়ালের মতো সুগঠিত এবং এর ঘটনা-পরিকল্পনা বাঙালি হিন্দু-সমাজের এমনই এক ঘোর তমসাচ্ছন্ন বাস্তবতার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়ানো যে, বইটি পড়তে গিয়ে একটি বিপন্ন বোধের ঊষর বেলাভূমিতে পাঠক আছড়ে পড়েন। কালরাত্রির কালগঙ্গায় বৃদ্ধ সীতারামের অন্তর্জলী যাত্রার আয়োজন উপলক্ষে সমবেত মানুষগুলোর তৎপরতার ভেতর বৈজুনাথ চাঁড়ালের তীক্ষ্ণ ও তীব্র বিদ্রূপের কষাঘাত, উচ্ছল যৌবনের অধিকারী যশোবতীর ভাগ্যবিড়ম্বনার এই কাহিনী যেন চলমান ছায়াচিত্রের উপর্যুপরি আলোছায়ার প্রেক্ষাপটে মুদ্রিত। এই মুদ্রণের উপযুক্ত ভাষাভঙ্গিটি কমলকুমারের নিজস্ব উদ্ভাবন ; অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব। বৈজুনাথ চাঁড়ালের মুখের কথায় হিন্দু-সমাজের অন্যায়, অনাচার, অধর্মের অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে গিয়ে যশোবতীর বানভাসি হওয়ার ঘটনায় লেখক হিন্দু-ধর্মের জাতিভেদ প্রথারই সতীত্ব রক্ষা করেন ব্রাহ্মণবৎ পরম নিষ্ঠায়। মো. শা

অন্তহীন যাত্রা : রাহাত খান রচিত গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে। প্রকাশক : কালি কলম প্রকাশনী, ৩৪, বাংলা-বাজার, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ শিল্পী : আবুল বারক্ আলভী। মূল্য : বার টাকা মাত্র। মোট সাতটি গল্পের সংকলন এই গল্পগ্রন্থটি। গল্পসমূহ হলো : চুড়ি, উদ্বেল পিপাসা, শরীরের পক্ষে বিপক্ষে, মধ্যিখানে চর, সবুজ আলোকপাত, দুঃখিনী কমলা এবং অন্তহীন যাত্রা। 'উদ্বেল পিপাসা' গল্পে একজন মহিলা তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে রেখে অন্যের সাথে চলে গেছে। জীবনের চাওয়াকে মহিলা অস্বীকার করতে পারে নি। কারণ মানবতা তাঁর মনকে স্পর্শ করে নি। 'মধ্যিখানে চর' গল্পে দেখা যায় সবুজ একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু পরে সে বিভিন্ন টানাপোড়েনে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। বিচ্যুত হলে কি হবে! চিরন্তন আদর্শের প্রতি তাঁর মধ্যে এক ধরনের আকুলতা থেকেই গেছে। গল্পগ্রন্থের নাম গল্প 'অন্তহীন যাত্রী'। এই গল্পে একজন কথক তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন নিপুণভাবে। তাঁর মধ্যে এক ধরনের নীতিবোধ এক সময়ে ছিল কিন্তু সেই সূক্ষ্মবোধ কখন যেন তার থেকে হারিয়ে গেল। পরে আর কোনো বিষয়ে সে অনুতাপও করছে না। গল্পগ্রন্থে লেখক এমন অনেক কথা বলেছেন,

www.pathagar.com

যা হয়তো অন্যেরা এড়িয়ে যাবে। গল্পে ঘটনার চেয়ে বর্ণনা বেশি। গল্পসমূহে লেখক সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের বিচিত্র চিত্র তুলে ধরেছেন। বেশ কয়েকটি গল্পে মুক্তিযুদ্ধের আবহ বিদ্যমান। মানুষকে একসময় না একসময় অন্তহীন যাত্রা করতেই হয়। এ ব্যাপারে মানুষের নিজের উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এটাই নিয়তি। সৈ. আ. জা.

অন্ত্যানুপ্রাস : সমিল কবিতার দুই চরণের পদান্তমিলজাত অভিন্ন ধ্বনিকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে। যেমন, 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥' অন্ত্যানুপ্রাসে অনুপ্রাসের অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রে শিথিল। এতে স্বরধ্বনিকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। বাংলা কবিতায় শুদ্ধ স্বরধ্বনির অন্ত্যানুপ্রাস-সৃষ্টি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'শোন্, শোন্ লো রাজার ঝি,/ তোরে কহিতে আসিয়াছি,-/ কানু হেন ধন পরাণে বধিলি একাজ করিলি কি' (কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি)। 'কহিলা কবির স্ত্রী/মাথার উপরে বাড়ি পড়োপড়ো তাঁর খোঁজ রাখ কি? (রবীন্দ্রনাথ)। অনেক সময় ব্যঞ্জনাশ্রিত না হয়ে শুধু স্বরেই অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি হয়। যেমন, 'এখন বলে যাও গামাপা ধা/ আশের বেলা শুধু আ আ আ আ'। তবু স্বরধ্বনির অনুপ্রাস স্বীকৃত নয়। আ. ই.

অন্ধ কথামালা—রশীদ হায়দার : উপন্যাস। ১ম কলকাতা সংস্করণ জুন, ১৯৮২। প্রকাশক : ডি.এম. লাইব্রেরি, ৪২ বিধান সরণি, কলকাতা-৬। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা ৯১। মূল্য : ৮.০০। ১ম বাংলাদেশ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। প্রকাশক : অনিন্দ্য প্রকাশন, ৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৯৬। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। মুক্তিযোদ্ধা বেলটু রাতে বিছানায় অপেক্ষা করতে থাকে কখন তার বন্ধুরা ডেকে নিয়ে যাবে ; যাবে বুড়িদ-র সাঁকোটা উড়িয়ে দিতে। অপেক্ষা করতে করতে চোখে ঘুম নামে, এক সময় কিছু ফিসফিস কথা শুনে সজাগ হয়ে যায়। ভাবে তার সহযোদ্ধারা এসেছে, কিন্তু ঠিক তখনই কারা যেন তার মুখ বেঁধে ফেলে, চোখ ও হাতও বেঁধে ফেলে। সেই অবস্থায়ই তাকে মারতে মারতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। নিয়ে যেতে থাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। চোখ ও হাত বেঁধে নিয়ে যাওয়ার নায়ক বেলটুরই ছেলেবেলার খেলার সাথী মোকসেদ। বেলটুর বোধের অগম্য একই গ্রামে জন্ম, বড় হয়ে ওঠা সাথী মোকসেদ আসলে বিশ্বাসঘাতক, স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদী একজনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বিশ্বাস হতে চায় না, কিন্তু সে যে এখন বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর গন্তব্যে যাচ্ছে, এটাই এখন বাস্তব সত্য। মূল ঘটনা এটা হলেও 'অন্ধ কথামালা'-র প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখকের রচনাশৈলী। বেলটুর বাড়ি থেকে বধ্যভূমির দূরত্ব একমাইল, ঘটনার সময়ও এক ঘণ্টার বেশি নয়। কিন্তু চোখ বাঁধা বেলটু অন্ধ অবস্থায়ই যেন সবকিছু দেখতে পায় ; এক মাইল পথের খুঁটিনাটি বর্ণনা শুধু বর্ণনায় সীমাবদ্ধ না থেকে পাবনার একটি গ্রাম তথা বাংলাদেশের একটি জনপদের কথা হয়ে ওঠে। লেখক গতানুগতিক ভঙিতে ঘটনার বিবরণ দেন না, একটি ঘটনার সূত্র ধরে আর একটি ঘটনা, তা থেকে আরো একটি ঘটনা, এমনি করে ঘটনা পরম্পরায় আবার মূল সূত্রে ফিরে আসা ; এমনিভাবে চক্রাকারে একটি বিশাল জনপদ, মুক্তিযুদ্ধ, মানুষের চরিত্র, প্রেম, আপনজনদের মৃত্যু, বিয়ে, দেশ-প্রেম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংস্কার-কুসংস্কার, বিশ্বাসঘাতকতা, দেশের মুক্তির জন্যে মানুষের আকুতি ইত্যাদি বিষয় রূপায়িত হয়েছে। সে. হো.

অন্ধ করতালি : কবি সানাউল হক খানের প্রথম কাব্য সংকলন। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪, ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮০। বইটির মোট ৪৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। জীবন-দর্শনের মোহ ও মোহভঙ্গ, প্রেম ও মমত্ববোধের এক সমন্বিত বোধের সন্ধান মেলে কবিতাগুলোতে। বিষয় ও প্রকরণ সচেতন কবি কখনও ইতিহাসে বিশ্বাস স্থাপন করেন। কখনও চৈতন্যের ঘোরতর আঁধারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন

www.pathagar.com

ঈগলের মতো ঘুরে বেড়ান। আবার কখনও চুরি করে দুধ-খাওয়া বেড়ালের মতো একান্তে হাই তোলেন। বইয়ের উল্লেখযোগ্য কবিতা—একই আবর্তে, পরাণমাঝির ঘাট, কুকুরের লেজ, আত্মবিশ্লেষণ, ওঙ্কার, তোমাকে শোনাব, শেষ চিহ্ন, নুনের পাথর ইত্যাদি। সময়ের ভাঙন, সমাজের অবক্ষয়, ভোরের সূর্যোদয়, সানাউল হক খানের কবিতায় জড়াজড়ি করে আছে। সুখ থেকে যেমন দুঃখকে পৃথক করা যায় না, আনন্দ থেকে বেদনাকে তেমনি শিল্পের উঠোনে বসে কবি শোনান মানবতার গান। গ্রন্থে গানের এই সুর কখনও কখনও করুণ কখনও উচ্চকিত কিন্তু বিরক্ত উদ্রেককারী বিকট বা বিকৃত নয়। শা. আ.

অন্ধকার যুগ/তমসা যুগ/বা সন্ধিযুগ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুর্কি বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তী দেড় দুইশত বছর কালকে সন্ধিযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সন্ধিযুগের ব্যাপ্তি কাল ছিল ১২০০ সাল থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত দেড়-দুইশত বছর। এই সময়কার বাংলা সাহিত্যের কোন লিখিত নিদর্শন গবেষকদের হাতে এসে পৌঁছে নি। এই যে সাহিত্যিক শূন্যতার কথা শুনতে পাওয়া যায় তার জন্যেই কেউ কেউ এই যুগকে অন্ধকার যুগ বা তমসাযুগ বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। চর্যাগীতি বাঙলায় রচিত বলে বাঙালি বিদ্বানদের বিশ্বাস। এরপরে দেড়/দুশ বছর ধরে আর কোন বাংলা-ঘেঁষা রচনার সন্ধান মেলেনি। তুর্কিদের বঙ্গবিজয়ের পথ ধরে দেশে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল বলেই নাকি সাহিত্য-শিল্পের রাজ্যে এক অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছিল। এমনি ধারণা থেকেই 'অন্ধকার যুগ' বা তমসাযুগ কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। ইদানীং বিশিষ্ট গবেষকগণের অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে একে অন্ধকার যুগ না বলে সন্ধিযুগ বলাই সমীচীন মনে করা যায়। এই যুগের লিখিত কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন হাতে না এলেও পরবর্তী যুগের গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত বিবরণী থেকে জানা যায় এই যুগের সাহিত্য ছিল প্রধানত লোকসাহিত্য ; তার প্রধান রূপ ছিল গীত ও পাঁচালী। মনে হয় পাঁচালীর আকারে ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত এমনকি মহা কাব্যের আদিরূপের সূচনা এই যুগেই হয়েছিল। নাথগীতিকার আদিরূপও এই সময় সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায় চৈতন্যের জন্মের অনেক কাল আগে থেকেই মনসার গীত, শিবেরগান, চণ্ডীর গান, যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীত চালু ছিল। এইগুলো মৌখিক আকারে সন্ধিযুগেই প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। এর পরবর্তী যুগে এসব ধারার সাহিত্যের পূর্ণায়ত বিকাশ ঘটেছিল। সু.মু.

অন্ধকার সিঁড়ি : আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে। প্রকাশক : সাহিত্য ভবন, ১০৭, আগাসাদেক রোড। প্রচ্ছদ এঁকেছেন : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : তিন টাকা বার আনা মাত্র। গ্রন্থটিতে মোট ৯টি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পসমূহ : জরিপ, লাল জুতো, বৃষ্টি, আঁতুড়ঘর, পুনর্মিলন, ছেঁড়া কোট, উত্তাপ, সমতল এবং অন্ধকার সিঁড়ি। গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'জরিপ'। অতিলৌকিক এক আবহ এই গল্পে বিরাজ করেছে। 'ছেঁড়াকোট' গল্পে দেখা গেছে একজন কেতাদুরস্ত ব্যক্তি নাম আশরাফ, যে রাজনৈতিক নেতা হবার স্বপ্ন দেখত—তাঁর কি করুন পরিণতি। তাঁর স্ত্রী ভালো কোনো নারী নয়। আশরাফ নামের লোকটি বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে তাঁর মেয়ের জন্মদিনে কিছু জিনিস নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ভাই তাঁকে জোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। গল্পগ্রন্থের নাম গল্প 'অন্ধকার সিঁড়ি'—এই গল্পে শত প্রতিকূলতার মাঝেও নারী হৃদয়ে মা হবার প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে। সংসারের টানাপোড়েনে লীনা নামের মেয়েটিকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে অন্য ব্যক্তির মনোরঞ্জন করতে হয়েছে। যে ব্যক্তির সাথে তাঁর দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে পেশায় ডাক্তার এবং বিবাহিত। লীনার অন্তঃসত্ত্বা হবার খবর শুনে সে

www.pathagar.com

লীনার থেকে সরে যায়। আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পের পাত্র–পাত্রীরা আমাদের সমাজ সংসারেই নিত্য বসবাস করে। তাঁর গল্পে মানবজীবনের বিভিন্ন টানাপোড়েন বহুকোণে অঙ্কিত। সৈ. আ. জা.

অন্ধকারে একা : কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌র দ্বিতীয় কবিতার বই। ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা থেকে এটি অক্টোবর ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৫০টি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা সংকলিত হয়েছে। সমাজ, ঐতিহ্য, রাজনীতি, দেশ, ব্যক্তি—এসবই তাঁর কবিতার বিষয়। বইয়ের প্রতিটি সনেটের প্রতিটি পংক্তিই অষ্টাদশ অক্ষর বিশিষ্ট। পংক্তির অক্ষর ১৪–এর বদলে ১৮ হওয়াতে প্রবহমানতা বেড়েছে, প্রকাশভঙ্গিও হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত। কবি বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনায় রঙ মিশিয়ে এক স্বপ্নময় কাব্যজগৎ তৈরি করেছেন। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো কবি সচেনতভাবে দুর্বোধ্যতা পরিহার করেছেন। বইয়ের নাম–কবিতা 'অন্ধকারে একা' যেন আমাদের প্রিয় পৃথিবীর অন্ধকারে নিমজ্জনের এক প্রতীকী উপাখ্যান। কবি এই শতাব্দীর পোড়–খাওয়া ঘন অন্ধকার রাতে একা জেগে থাকেন। যেখানে চাঁদ নেই, তারা নেই ; আছে শুধু দূরের প্রান্তর আর অরণ্যের রেখা। যেখানে নীলিমা নিহত, আকাঙ্ক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ, দীপ বিধ্বস্ত সেখানে তিনি উচ্চরেখ স্বপ্নের মিনার গড়েন। 'অন্ধকারে একা' কাব্যগ্রন্থে ব্যর্থতা যেমন আছে তেমনি আছে উজ্জ্বল আশাবাদ। এই আশাবাদ আমাদের বোধকে সচকিত করে। শা. আ.

অন্ধকূপ–হত্যা : হলওয়েল–বর্ণিত তথাকথিত হত্যাকাণ্ড। নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে লোকচক্ষে ঘৃণ্য করবার জন্যেই এ গল্প তৈরি করেছিল হলওয়েল প্রমুখ ইংরেজ লেখক। ইংরেজদের সূত্রে জানা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকারের পর নবাব সিরাজুদ্দৌলা নাকি ১৭৫৬ সালের ২০ জুন কলকাতার ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে অন্ধকূপ নামে পরিচিত ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সারারাত বন্দী করে রাখেন। পরদিন দেখা যায় যে বন্দীদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাস সিয়ারুল মুতাখখেরীন (গোলাম হুসাইন বিরচিত) ও রিয়াযুস্–সালাতীনে (গোলাম হুসাইন সেলিম বিরচিত) এ ঘটনার উল্লেখমাত্র নেই। পরবর্তীকালেও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই কাহিনীর সত্যতা ও এই ব্যাপারে নবাবের দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ ২০ জুন সন্ধ্যায় নবাবের সেনাবাহিনীর হাতে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দী থাকা সম্ভব ছিল না। ইংরেজ লেখকদের বিবরণ থেকেই তা জানা যায়। দ্বিতীয়ত ২৬৭ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট কক্ষে ১৪৬ জন লোকের স্থান সঙ্কুলান কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তৃতীয়ত অন্ধকূপ নবাবের তৈরি কোনো কারাকক্ষ ছিল না ; ইংরেজরাই ঐ কক্ষে বন্দীদের আটক রাখত। অতএব ঐতিহাসিকদের মতে অন্ধকূপ হত্যার সঙ্গে সিরাজুদ্দৌলার কোনো যোগ ছিল না। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, অন্ধকূপ প্রকোষ্ঠে কয়েকজন বন্দী রাখা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধে আহতসহ কয়েকজন মারাও হয়ত গিয়েছিল। কিন্তু হলওয়েল অসদুদ্দেশ্যে ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছে। নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর–পূর্ব কোণে অন্ধকূপের কাছে ইংরেজ সরকার কর্তৃক যে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের ফলে তা অপসারিত হয় (১৯৪০)। আ. খা

অন্ধ তীরন্দাজ : কথাশিল্পী কায়েস আহমদের প্রথম গল্পগ্রন্থ। ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী হাশেম খান। মূল্য : নয় টাকা। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে কায়েস আহমদ একটি ভিন্ন কণ্ঠস্বর। তাঁর গল্পের ভুবন একদম নিজস্ব এবং গল্পের ভাষা প্রচলিত ভাষার বাইরে এক নতুন নির্যাস। এই গ্রন্থে মোট আটটি

www.pathagar.com

গল্প আছে। প্রতিটি গল্পে ভাষা এবং বিষয়ই বলে দেয় কায়েসের নির্বাচন এবং উপস্থাপনা বৈচিত্র্য জলের ভেতরে ভিন্ন জলের মতো। প্রথম গল্প 'অন্তর্লীন চখাচখী'র রচনাকাল ১৯৭৩। শেষ গল্প 'গন্তব্য' রচিত হয়েছে ১৯৭৭ সালে। এই কয় বছরের ভেতরে দেখা মানুষ এবং প্রকৃতি কিভাবে উল্টেপাল্টে এক হয়েছে লেখকের বোধে সেই এক হওয়া দারুণভাবে গেঁথেছে। চারদিকের ঘটনাবলীর ভেতর থেকে উঠে এসেছে মানুষের বুকের ভেতরের যন্ত্রণা—সে যন্ত্রণা কখনো বন্দী সময়ের, কখনো চোরাবালিতে পা হড়কে পড়ে যাওয়া আর্তনাদের। বইয়ের 'অন্ধ তীরন্দাজ' গল্পটি রচিত হয় ১৯৭৬ সালে। খুব তাচ্ছিল্যের ঢঙে গল্পের শুরু। কয়েকজন ভাড়াটে খুনি স্টেশনের ধারে মদ খেয়ে হল্লা করছে। তারা ট্রেন আসার অপেক্ষায় আছে। ট্রেন থেকে নামবে একজন তাকে খুন করতে হবে। তারা নিয়োজিত হয়েছে বলাই মাইতির দ্বারা, যার অনেক পয়সা। আকালের সময় কালোবাজারি করে এ পয়সা উপার্জন করেছে সে। এখন অঞ্চল প্রধান হওয়ার খায়েস হয়েছে তার। সেজন্য পথের কাঁটা বিজয় ঘড়ুইকে সরিয়ে দিতে হবে। একসময় ভাড়াটে খুনির একজন হাঁফতে হাঁফতে বলে আমাকে মেরে ফেল, আল্লাহর কসম, তোরা আমাকে এখানে খুন করে রেখে যা, আর বাঁচতে ভাল্লাগেনা, 'আমাকে মেরে ফেল পচা, তোর পায়ে পড়ি।' ওর কান্না দেখে বাকিরা থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের মনে হয়, 'সমস্ত মাঠটা ওদের বুকের ভেতর ঢুকে যেতে থাকে।' এভাবেই সব গল্পের ভেতর মানুষ তার যাবতীয় দায়ভার বহন করে বেড়ায়। সে. হো.

অন্ধ লাঠিয়াল : হারুন হাবীবের গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ১৯৯৯। প্রকাশক : ম্যাগনাস ওপাস, বারো আজিজ সুপার মার্কেট, দ্বিতীয় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। অন্ধ লাঠিয়ালে গল্পের সংখ্যা নয়টি। গল্পগুলো যথাক্রমে প্রথম প্রলয়, ওস্তাদ ভাই—তার প্রতিপক্ষ, পুরনো এক খণ্ডচিত্র, বিধাতৃ সঙ্গমে, ঝড় ও মানুষের গান, শিকড়, অন্ধ লাঠিয়াল, প্রিয় অরণ্য পরাণে, হিমছড়িতে। এ গ্রন্থের প্রায় সব গল্পই বৈচিত্র্য নির্ভর। সমাজের নানা অসঙ্গতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন লেখক। সামাজিক অবস্থায় তরুণ সমাজ ক্রমে বিপথগামী হয়ে উঠেছে। মানুষের মাঝে আর বিন্দুমাত্র মানবিকতাও অবশিষ্ট নেই। আজ লাঠিয়ালের মতো তরুণ সমাজ একের পর এক অপরাধ ঘটিয়ে যাচ্ছে—অথচ তারা জানেনা কেন এসব করছে! কার জন্যই বা করছে। বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা যুক্ত হওয়াতে গল্পগুলো নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রায় সব গল্পেই লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রেম, বিরহ, ভালোবাসা, মানবীকতা, দুঃখ-বেদনা যন্ত্রণা, সামাজিক অসংগতি সব মিলিয়ে গল্পগ্রন্থটি অন্যরকম মনোযোগ দাবি করে। পা. র.

অন্নংভট্ট : তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত। তিনি আঠারো শতকের লোক। অনুমান করা হয় অহংভট্ট অন্ধ্রদেশীয় ছিলেন। পিতা তিরু মলাচার্য। 'অন্নংভট্ট' শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত 'অনন্তভট্টে'র সংক্ষিপ্ত রূপ, অথবা কানাড়া 'অন্নভট্টে'র সংস্কৃত রূপান্তর। তিনি নিজাম আলির অধিকারভুক্ত গরিকপাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কৌণ্ডিন্যপুরে তিনি ন্যায় পড়াতেন। নৈয়ায়িক রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। 'তর্কসংগ্রহ' নামে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রথম শিক্ষার্থীদের পাঠের সুবিধার জন্য সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করে 'অন্নংভট্ট' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 'দীপিকা' নামে তর্কসংগ্রহের একটি টীকাও রচনা করেন। অন্নংভট্ট নির্দেশিত 'তর্ক' শব্দ অর্থে বৈশেষিক সম্মত সাতটি পদার্থকে বোঝায় এবং 'সংগ্রহ' অর্থে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অন্নংভট্ট-রচিত গ্রন্থটি তৎকালে বিশেষভাবে সমাদৃত ও জনপ্রিয় হয় এবং পরেও শিক্ষার্থীদের জন্য তার পঠন-পাঠন প্রচলিত হয়। অন্নংভট্টের অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে—'মিতাক্ষয়া', 'তত্ত্ববোধিনী টীকা' ইত্যাদি। আ. ই.

www.pathagar.com

অন্নকূট : হিন্দুদের উৎসব বিশেষ। পর্বতচূড়ার আকারে অন্ন সাজিয়ে এ উৎসব করা হয়। দেয়ালির পরের দিন কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদে কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানের বৈষ্ণব মন্দিরে সাড়ম্বরে এ উৎসব পালিত হয়। জয়দেব প্রমুখ সাধকের তিরোধান তিথি উপলক্ষে বছরের অন্য সময়েও এ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অন্নকূট মূলত গোবর্ধন পূজা। এ পূজায় গোময় বা অন্নের দ্বারা গোবর্ধনগিরির প্রতীক নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। গোবর্ধন পর্বতের নিকটবর্তী একটি পর্বতের নামও অন্নকূট। বরাহপুরাণের ১৬৪শ অধ্যায়ে এর পরিক্রমার বিধান আছে। বাংলার স্মৃতিগ্রন্থে অন্নকূট উৎসবের নাম নেই। আ.খা.

অন্ন চাই আলো চাই : কবি মহীউদ্দীন সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৬। 'অন্ন চাই আলো চাই', পাওনিয়ার প্রেস, ২ রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও সাহিত্য শিবির, বাঘরা, ঢাকা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হতো। উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করা। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কবিতা গান প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করায় পত্রিকাটি দেশের প্রগতিশীল মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'অন্ন চাই আলো চাই'-এর ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এর অধিকাংশ লেখাই সম্পাদক নিজের নামে ও ছদ্মনামে লিখতেন। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সূচিপত্র : 'আখেরী জঙ', 'ঘোড়ার প্রেম', 'কিছু লোক মরবেই', 'গরীবদের কথা', ও 'গান্ধিজী নিহত হয়েছেন'। প্রথম সংখ্যায় কমিউনিস্ট নেতা ও 'কম্পগাস' সম্পাদক পান্নালাল দাশগুপ্তের লেখা 'আখেরী জঙ' মুদ্রিত হয়েছিল। এটি তিনি লিখেছিলেন মাহমুদ জালাল ছদ্মনামে। সরকার বিরোধী এ লেখাটির জন্য তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ সরকারের আদেশে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। সা. আ.

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় : পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ১৮৬১ সালে নোয়াখালি জেলার পূর্ব-সোমপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম কালীকিঙ্কর ঠাকুর। অন্নদাচরণ সংস্কৃত সাহিত্য ও বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে প্রথমে নোয়াখালি জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত ও পরে কাশীর ঈশ্বর পাঠশালার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁকে বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে অন্নদাচরণ 'ধর্মশাস্ত্রকোষ' নামে একটি বিরাট গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, যা তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া তিনি সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'কৌমুদী' (কলাপ ব্যাকরণের কাতন্ত্র-পরিশিষ্টের কঠিনতম অংশসমূহের সবলীকৃত টীকা) এবং 'শ্রীরামাভ্যুদয়ম' ও 'মহাপ্রস্থানম্' শীর্ষক দু'খানি মহাকাব্য। বাংলা ভাষায় রচিত 'ষড়দর্শনের রহস্য', 'ষড়দর্শনের চিত্র', 'অলঙ্কার', 'কাব্যচন্দ্রিকার সরল টীকা', 'শব্দখণ্ড' প্রভৃতি গ্রন্থের জন্য তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বারানসীতে 'আর্যমহিলা বিদ্যালয়' স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯২২ সালে অন্নদাচরণকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কাশীর ভারত ধর্মমণ্ডলও তাঁকে ঐ উপাধিতে সম্মানিত করেন। কাশীধামেই অন্নদাচরণের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। আ. রা.

অন্নদামঙ্গল (অন্নপূর্ণামঙ্গল) : মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তাঁরই সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ১৭৫৩ সালে রচনা করেন অন্নদামঙ্গল কাব্য। কাব্যটি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। তিনটি খণ্ড এক সঙ্গে গ্রথিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিন খণ্ড তিনটি স্বতন্ত্রকাব্য। প্রথম খণ্ডে আছে অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা, তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনী। অন্নদামঙ্গলে পঞ্চদেবতার বন্দনা থেকে শুরু করে মর্ত্যলোকে

www.pathagar.com

নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম এবং অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রার কথা বর্ণিত হয়েছে। 'অন্নদামঙ্গল' কবি ভারতচন্দ্রের অসাধারণ কবিত্ব শক্তি ও পাণ্ডিত্য মহিমায় সমুজ্জ্বল। ভারতচন্দ্র শুধু আঠারো শতকের নয় গোটা মধ্যযুগেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ভারতচন্দ্র জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হৃতসম্পদ ভারতচন্দ্র আবাল্য দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিজীবী রূপে তিনি মুলাজোড়ে বাস করতেন। নাগরিক চেতনা, ব্যঙ্গপ্রবণতা, শৃঙ্গাররসাসক্তি পরিশিলিত ভাষা ও ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ প্রভৃতির জন্যে তাঁর কাব্য ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। সংস্কৃত শ্লোকরচনায় ও দোভাষীরীতি (হিন্দি-বাংলা) প্রয়োগেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল প্রশংসনীয়। কা. রো.

অন্নদাশঙ্কর রায় : সাহিত্যিক। ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলের এক উদারপন্থী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিমাইচরণ রায় ও মাতা হেমনলিনী রায়। ১৯২৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯২৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯২৭-১৯২৯ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে সিভিলিয়ান শিক্ষানবীশরূপে অবস্থান করেন। এ সময়ই ইউরোপে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তিনি লিখতে শুরু করেন 'পথে প্রবাসে' শিরোনামে। এই রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের মধ্য দিয়েই তিনি লেখক হিসেবে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। প্রথম জীবনে বাংলা, ইংরেজি ও ওড়িয়া তিন ভাষাতেই সাহিত্যচর্চা করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার মাধ্যম হিসেবে কেবল বাংলা ভাষাকেই বেছে নেন। রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী ছাড়াও জীবন-চেতনা ও সাহিত্য-ভাবনায় মহাত্মা গান্ধী, টলস্টয় ও রম্যা রলাঁর দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ ছিলেন। পরে পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের সচিব নিযুক্ত হন। এ পদ থেকে ১৯৫১ সালে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে সার্বক্ষণিক সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর কিছুকাল শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে পুনরায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাহিত্যকৃতির বিপুলতা বিস্ময়কর। গদ্য-পদ্য উভয় মাধ্যমে তিনি সমান সক্রিয়। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও লিখেছেন প্রচুর। বাংলা ছড়াকে বিষয়-বৈচিত্র্যে, শব্দে-ছন্দে, রূপে-রসে তিনি আবিষ্কার করেছেন নতুনভাবে। তাঁর কবিতা, গল্প ও উপন্যাস গভীর মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। তাঁর প্রবন্ধগুলোতে ঘটেছে উদার সংস্কৃত মনের প্রতিফলন। মুক্ত চিন্তার জন্য আঞ্চলিকতার সীমানা ছাড়িয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন যথার্থ এক বিশ্বনাগরিক। বাঙালিজীবনের বহুমুখী সমস্যা-সঙ্কট ও সমাধানের সূত্র সন্ধানে তাঁর লেখনী এখনো সজীব। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় এক শ। বেশি লিখেছেন প্রবন্ধ। প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা ৪০-এর বেশি, উপন্যাস-২০, গল্প-৬, কবিতা-১৪, ভ্রমণকাহিনী-৪ এবং ছড়া-১০। রবীন্দ্রনাথ (১৯৬২), আর্ট (১৯৬৮) ও গান্ধী (১৯৬৯) তাঁর সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর অন্যতম। অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯৩৫ সালে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা পি ই এন-এর সদস্য হন। বর্তমানে তিনি এই সংস্থার ভারতীয় কেন্দ্রের সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান। ১৯৫৭ সালে তিনি পি ই এন-এর বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য জাপান যান। তার উপর লিখিত ভ্রমণকাহিনী 'জাপানে'র-জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, ভারত সরকারের পদ্মভূষণ, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম, বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.

www.pathagar.com

লিট। সাহিত্য অকাদেমি তাঁকে দিয়েছে প্রথম বিশেষ সদস্য বা ফেলো পদের সম্মান, তিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির সভাপতি। সু. ব.

অন্নপূর্ণা : দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩–১৯০৭) রচিত উপন্যাস। লেখকের যোগেশ্বরী উপন্যাসের পরিশিষ্ট। এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী হচ্ছে, সোনারপুরের জমিদার উমাশংকর ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় সর্বস্ব দান ও ব্যয় করে পত্নীসহ বর্ধমানের এক গ্রামে অজ্ঞাতবাস করেন। রাণী করুণাময়ীর ছদ্মবেশে উমাশংকরের গুরুপত্নী যোগেশ্বরী এখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। গুরু ঘনানন্দের আদেশে উমাশংকর অতঃপর কাশীবাসে যান। ঘনানন্দ তখন মৃত্যুশয্যায়। উমাশংকরের কিছু সম্পত্তি তিনি নিলাম করেছিলেন। মৃত্যুর আগে নিজের সমুদয় সম্পত্তি এবং সেই নিলামকৃত সম্পত্তি তিনি উমাশংরকে দান করে যান। ঘনানন্দ ও যোগেশ্বরী পরিশেষে যোগাবলম্বনে প্রাণত্যাগ করেন। নীতি ও কর্তব্যের আদর্শ প্রচারই এই উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য। তার ফলে এর চরিত্রসমূহ উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হতে পারে নি। তবে গুরু ঘনানন্দের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় আছে। মু.আ.জ.

অন্নপূর্ণা গোস্বামী : কথাসাহিত্যিক। জন্মস্থান কলকাতা। জন্মসাল ১৯১৬। পিতা–এন.সি. লাহিড়ী ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর অন্নপূর্ণা গোস্বামী ডাঃ অবনী মোহন গোস্বামীর সঙ্গে পরিণীতা হন। শৈশবকাল থেকেই কবিতা লেখার প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল। পনেরো বছর বয়সে প্রথম কবিতা 'এস' প্রকাশিত হয় তৎকালীন 'পুষ্পপাত্র' মাসিক পত্রে। স্বামীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহায়তায় তিনি সাহিত্য জীবনে সাফল্য লাভ করেন। ঘরে তিনি বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চাও করেন। স্বামীর চাকরি উপলক্ষে অন্নপূর্ণা গোস্বামী ডুয়ার্সের জঙ্গল, চা বাগান, পাহাড়-পর্বত, গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে কথাশিল্পের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় রেলকর্মীদের বিচিত্র জীবন এবং সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনী। সাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ কর্তৃক 'সাহিত্যকুশলী' এবং যশোর সাহিত্য সংস্থা কর্তৃক সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লীলা পুরস্কার' পান। ১৯৫৩ সালে আন্তর্জাতিক সাহিত্য প্রতিযোগিতায় তাঁর 'স্বপ্ন' গল্পটি প্রথম পুরস্কার পায়। অন্নপূর্ণা গোস্বামীর উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্য—এবার অবগুণ্ঠন খোল, ভ্রষ্টা, সংগোপনে, বাঁধনহারা, এক ফালি বারান্দা, মৃগতৃষ্ণিকা, রেল লাইনের ধারে, স্বাগতম ইত্যাদি। আ. জ. ভূ.

অন্নপূর্ণার মন্দির : নিরুপমা দেবী রচিত সামাজিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯১৩ সাল। তারাপুর গ্রামের রামশঙ্কর বাবুর সংসারে তাঁর স্ত্রী জাহ্নবী দেবী, এক ভ্রাতৃবধূ, দুই কন্যা সতী ও সাবিত্রী এবং দুইপুত্র হরিশঙ্কর ও কালী। গ্রামের জমিদারের একমাত্র কন্যা কমলা সতীর অন্তরঙ্গ সখী। গ্রামের আর একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নারায়ণ মৈত্র। মৈত্র মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বর। স্ত্রীর মৃত্যুর পর নারায়ণ মৈত্রের বৃদ্ধা শ্যালিকা অন্নপূর্ণা সংসারের ভার নেন। মৈত্র মশায়ের মৃত্যুর পর বিশ্বেশ্বর তাঁর নির্ধারিত সৎ পথে দিন অতিবাহিত করে। একদা কমলা পুকুরে পড়ে যায়। সেদিন বিশ্বেশ্বরই তার জীবন রক্ষা করে। এরপর বিশ্বেশ্বরের প্রতি কমলার অনুরাগ জন্মে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চাঁদপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়ে যায়। এদিকে জাহ্নবী দেবী ও অন্নপূর্ণা দেবী সতীর সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের বিয়ে ঠিক করলেও বিশ্বেশ্বর তাতে অমত করে। ফলে বৃদ্ধ তিনকড়ি লাহিড়ীর সঙ্গে সতীর বিয়ে হয় এবং বিয়ের কিছুদিন পরই সতী বিধবা হয়। দুশ্চরিত্র জমিদার নরেন্দ্র ভাদুড়ী একদিন পুকুরঘাটে সতীকে দেখে প্রেম নিবেদন করে। সতী ঘরে ফিরে বিশ্বেশ্বরের কাছে চিঠি লেখে। সেই চিঠির সারমর্ম এই, জমিদার নরেন ভাদুড়ীর সঙ্গে সে চাঁদপুর চলে যাচ্ছে। বিশ্বেশ্বর

www.pathagar.com

সতীদের বাড়ি ছুটে এসে দেখে সতী বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বেশ্বর সতীর ছোট বোন সাবিত্রীকে বিয়ে করে তাদের সংসারের ভার নেয়। সেই দিনই অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর সাধের বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বেশ্বরকে তিনি উপদেশ দেন, এই সম্পত্তির আয়েই যেন গ্রামের নিঃস্ব লোক কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পায়। **অ. ন.**

অন্নপ্রাশন : শিশুর প্রথম অন্নভক্ষণ উপলক্ষে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠনই অন্নপ্রাশন। বালকদের ছয় থেকে আট মাস আর বালিকাদের সাত থেকে নয় মাস বয়সে এই অনুষ্ঠান করা হয়। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের এটি প্রথম। দ্বিতীয় সংস্কার 'নামকরণ' উৎসব এই অন্নপ্রাশন উৎসবের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত এই দুই সংস্কার উপলক্ষে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আধুনিক কালে হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসার ফলে এসব আচার-অনুষ্ঠান আর অবশ্য করণীয় বলে বিবেচিত হয় না। ফলে এ জাতীয় অনুষ্ঠান আজ-কাল দরিদ্র হিন্দুরা দায়সারাভাবে পালন করে থাকে। সম্পন্নগৃহস্থ পরিবারে অন্নপ্রাশন উৎসব আজও কিছুটা ঘটা করে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। **ড.আ.শা.**

অন্য ঘরে অন্য স্বর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ। প্রকাশকাল : মে ১৯৭৬। প্রকাশক : ফরহাদ আলী, অনন্যা। উৎসর্গ : মা মরিয়ম ইলিয়াসকে। অন্তর্ভুক্ত গল্প : নিরুদ্দেশ যাত্রা, উৎসব, প্রতিশোধ, যোগাযোগ, ফেরারী, অন্য ঘরে অন্যস্বর। গল্পগুলোর রচনাকাল : ১৯৬৫-১৯৭৫। ব্যক্তিমানুষই এই বইয়ের গল্পগুলোর উপজীব্য। বিশেষত সমাজের অতি সাধারণ মানুষেরা অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলোর চরিত্র হিসেবে এসেছে, কোনো অবস্থাতেই তারা সমাজের 'নায়ক' বা Hero পর্যায়ের কেউ নয়। অর্থাৎ গল্পের চরিত্রেরা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমানুষই থেকে যায়, ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ হয় না। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি স্বতন্ত্র এক গদ্যভাষারীতি উপহার দিয়েছেন। স্বাতন্ত্র্য এর তীক্ষ্ণতায়, দৃঢ় বুনটে ও সুনির্দিষ্টতায়। বর্ণনাকে যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছেন, পরিস্থিতির স্থূলতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কখনো শৈল্পিক-ভাবে আবার কখনো সরাসরি অলঙ্কারবিহীন-ভাবে ; আবার কোথাও কোথাও ভাষাকে দেখা গেছে কাব্যমাধুর্যে সিক্ত হয়ে উঠতে। প্রথমবারের মতো পুরনো ঢাকার জনজীবন এই বইয়ের গল্পগুলোয় বিশেষত্ব পেয়েছে। তা আমাদের কথাসাহিত্যে যুক্ত করেছে নতুন স্বাদ। **আ. মা.**

অন্যরকম : জুলফিকার মতিনের লেখা গল্পসংকলন। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ২০০০ (স্টুডেন্ট ওয়েজ)। মোট দশটি গল্প আছে বইটিতে। গল্পগুলোর নাম যথাক্রমে : যন্ত্রণার সুখ, শোণিতে শতধা, নারী কাপুরুষ ও গর্ভিণী মাতা, শিকার, অন্যরকম ভালবাসা, বৃত্তাবদ্ধ, আয়ু গণনা, অরক্ষিত প্রহর, এক তরুণী ও এক বৃদ্ধা, জাতিস্মরেরা। ১৯৭০ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গল্পগুলো লেখা। গল্পগুলোর রচনাশৈলী কিছুটা অন্যরকম। অধিকাংশ কাহিনীতে রূঢ় বাস্তবতা প্রতিফলন সত্ত্বেও গল্পের ভাষায় ব্যবহৃত প্রতীকী ব্যঞ্জনা, সংকেত ও অর্থালঙ্কার গল্পগুলোকে অনেকটা কাব্যধর্মী করে তোলে। গল্পগুলো সমাজের এমন কিছু অস্বাভাবিক চরিত্রকে উপহার দেয়, যাকে দুর্লক্ষ্য বলা কঠিন। এসব চরিত্র কখনো উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবনের অধিকারী, কখনো তারা পিতামাতার জীবনযন্ত্রণার দায়ভার বহন করে, কয়েকটি চরিত্র নেশাগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট, কয়েকটি চরিত্রে সমকালের অসুস্থ রাজনীতির প্রতিফলন আছে, আছে দুষ্ট আমলা এবং ঋণখেলাপি চরিত্র, অবশিষ্ট কয়েকটি চরিত্র ঘুণধরা সমাজের নির্বিকার সাক্ষীমাত্র। বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে লেখক চরিত্রসমূহের মনোবিশ্লেষণ করেছেন। চরিত্র চিত্রণে লেখকের নির্মোহ অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। তবে গল্পবর্ণনার মধ্যে কোথাও কোথাও লেখকের তীব্র ব্যঙ্গ ও কটাক্ষপাত তাঁকে উদ্দেশ্যবাদী লেখকের সারিতে দাঁড় করায়। **স্ব. স.**

www.pathagar.com

অন্যরকম আটদিন : শাহরিয়ার কবির রচিত কিশোর উপন্যাস। সময় প্রকাশন, ঢাকা থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে আমাদের কলুষিত রাজনীতিতে শিশু-কিশোরদের কেমন করে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তার মনোজ্ঞ বিবরণ রয়েছে। লেখকের কথায় তাঁর উল্লেখ এরকম—'অন্যরকম আটদিন' যখন লেখা হয় তখন ভারতের 'বিজেপি'রা বাবরী মসজিদ ভাঙেনি, আমাদের দেশের জামাতীরাও মন্দির ভাঙেনি। অনেক আগে পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছিলো সীমান্ত এলাকায় জামাতের স্থানীয় নেতাদের অনেকে চোরাচালানীর সঙ্গে জড়িত। 'অন্যরকম আটদিন' লেখার সময় সেই রিপোর্টটির কথা মাথায় ছিলো। আর এ কথা কে না জানে বাংলাদেশের জামাতীদের সঙ্গে ভারতের বিজেপি'র গোপন আতাঁত আছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুই কিশোর। একজন ইরফন হাবিব টুপুল। আর একজন জয়ন্ত কুমার সরকার। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হয় দুজনেরই। ওরা বাড়ি থেকে পালিয়ে নজমুল আবেদিন নামের এক কালোবাজারী সন্ত্রাসীর খপ্পরে পড়ে। চালান হয়ে যায় ভারতে। ওখানে ওদের পত্রবন্ধু স্বপ্নার বাবা জাস্টিস মিত্র ও বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারের সময়োচিত হস্তক্ষেপে ওরা মুক্তি পায়। পরদিন কলকাতায় সব কাগজে দুই বাংলাদেশী তরুণের দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ ছাপা হয়, যাদের সাহায্যে কলকাতার পুলিশ দুই দুর্ধর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আর তাদের চক্রকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। 'অন্যরকম আটদিন' ঘর পালানো শিশু-কিশোরদের সচেতন করে তুলবে বলেই বিশ্বাস হয়। **শা. আ.**

অন্বিষ্ট : বিষ্ণু দে রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৯৫০ সালে। বিষ্ণু দের মার্ক্সীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে 'অন্বিষ্ট', 'যুযুৎসুর খেদ' ইত্যাদি কবিতায়। সমাজকে কবি ব্যষ্টি নিরপেক্ষভাবে দেখেছেন। প্রতিকূল যুগধর্মে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের যে বিড়ম্বিত অবস্থা, তার অবসানের একমাত্র উপায় ব্যষ্টিকে সমষ্টির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া। জনগণের সংহতিতেই আসবে জনগণের মুক্তি। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মিলনে যে সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হবে তাতে সংহতি আসবে দ্রুত এবং তার ফলে মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচার অধিকার পাবে, কবির ভুবন তখন মনোরম হবে, মানুষের বাঁচার আনন্দ সার্থক হবে। তাই কবি কামনা করেছেন,—'আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই/সূর্য্যাস্তে ও সূর্য্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই/হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ/অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।' (অন্বিষ্ট)। পুরনো সমাজের সঙ্গে সংগ্রামে নতুন সমাজসংগঠন এই সংহতিগুণেই জয়ী হবে এবং সেই নতুন সমাজে জন্ম নেবে বলিষ্ঠ, সৃষ্টিশীল ও দায়িত্ববান মানুষ। ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির মিলনে প্রেমের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রিয়ার প্রতি ভালোবাসা আর জগতের প্রতি ভালোবাসা একাকার সাধিত হলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির মিলনে কোনো বাধা থাকে না। কবি-প্রিয়া নিত্য-সঙ্গিণী থাকায় পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য কবিকে বিচলিত করতে পারে না ; কবি সীমাহীন বিশৃঙ্খলার মধ্যেও জনগণের সংহতি দেখেন। তাই কবি প্রিয়াকে যেমন বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ অনুভব করেন, নিজেও তেমনি বাঁচবার প্রেরণা পান,—'জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে/তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া/তোমারই ঘাটের গাছে/ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে। জল দাও আমার শিকড়ে॥' (জল দাও)। 'অন্বিষ্টের কবিতাগুচ্ছ বিষ্ণু দের সেই আকাঙ্ক্ষিত জগৎ ও জীবনকেই প্রকাশ করেছে। **আ.ই.**

অন্বিষ্ট জীবন : আবু জাফর। প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ মোহসীন। পৃষ্ঠা ১৩৪। মূল্য ৬০.০০। প্রাবন্ধিক আবু জাফর পেশায় অধ্যাপক। গবেষণার চারিত্রও তাঁর রচনায় বিদ্যমান। 'অনিষ্ট জীবন'-এ সাতটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। ১. কল্লোলীয় ভাবাদর্শের প্রেক্ষাপটে : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের স্বতন্ত্রতা; ২. 'রথের

www.pathagar.com

রশি' রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যতিক্রমধর্মী নাটিকা; ৩. কুমু ; ৪. মিলনের দূত নজরুল ইসলাম ; ৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কয়েকটি ছোটগল্প ; ৬. হৃদয়ের রক্তক্ষরিত উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা' ও ৭. শার্ল বোদলেয়ার। শেষোক্ত প্রবন্ধটি মৌলিক নয়, অনুবাদ। আবু জাফর প্রতিটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন বিশ্লেষণধর্মী মন নিয়ে। বিষয়ের গভীরে গেছেন ; প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট লেখকদের মনন, সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। র. হা

অনিষ্ট হৃদয় অপচিত হৃৎপিণ্ড : উপন্যাস। সোভিয়েত বিজ্ঞানী অস্ত্রচিকিৎসক নিকোলাই আসোমভ তৎকালীন সোভিয়েত ইউক্রেন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী কিয়েভের স্থায়ী অধিবাসী এই উপন্যাসের লেখক। বাংলায় অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন শর্মা। রোগ ও যন্ত্রণা নিরাময়-সংক্রান্ত বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, নিবন্ধ ইত্যাদির রচয়িতা নিকোলাই আসোমভ। তাঁর রচনাবলী শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যেই নয়, মানুষের জন্য উচ্ছ্বিত ভালোবাসায়ও অভিসিঞ্চিত। এই বরেণ্য বিজ্ঞানী একজন সমাজসেবীও। এই বইটি সর্বসাধারণের জন্য লিখিত অস্ত্রোপচারী এক ডাক্তার ও ছোট্ট একটি মেয়ের হৃৎপিণ্ড অস্ত্রোপচারের উপন্যাস। করুণা, আবেগ ও বেদনার নিবিড় অনুভূতিপৃক্ত এর আবেদন অন্তর্ভেদী, অলোকসামান্য। প্রকাশক প্রগতি প্রকাশন, মস্কো। বাংলায় প্রকাশকাল ১৯৭৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭১। মূল্য লেখা নেই। বি. ব.

অপভ্রংশ : ভারতীয় আর্যভাষার একটি স্তরের নাম অপভ্রংশ। প্রাকৃত ভাষার শেষ এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা-সমূহের সূচনার অন্তর্বর্তীকালে অপভ্রংশ ভাষার স্তর ধরা হয়। কেউ কেউ একে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর বলে অভিহিত করেন। 'অপভ্রংশ' নামটি প্রাকৃত বৈয়াকরণ পতঞ্জলি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। শব্দটির অর্থ [[অপ + √ ভ্রংশ + অ (ঘঞ্) - ভা] সাধুভাষা হতে ভ্রষ্ট কিংবা বিকৃতভাবে উচ্চারিত শব্দ। পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন পতঞ্জলির অনুসরণে প্রাকৃতের শেষ স্তরটিকে অপভ্রংশ বলে স্বীকার করেছেন। গ্রীয়ার্সন প্রত্যেকটি আঞ্চলিক প্রাকৃত অর্থাৎ শৌরসেনী বা মাগধী বা মহারাষ্ট্রী ইত্যাদির শেষস্তরে, এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বাঙলা, হিন্দি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি ভাষার আদিস্তরে একটি করে অপভ্রংশ অবস্থা কল্পনা করেছেন। অপভ্রংশের সময় সম্পর্কে এতসব জটিল কূটতর্ক আছে যে তার আলোচনাকে যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা কষ্টসাধ্য। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এর বিস্তার কাল ধরা হয়। অপভ্রংশে রচিত গীতিকবিতার সংকলন 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রথিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিম পাঞ্জাবের কবি আবদুর রহমান তাঁর 'সংনেহয় রাসক' কাব্যটি অপভ্রংশে রচনা করেন। ম. মু.

অপর অরণ্য : অনুবাদ-কবিতা। অনুবাদক : রফিক আজাদ। প্রকাশক : নন্দিতা, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ মানিক দে। ১ম প্রকাশ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। পৃষ্ঠা ৫৬। মূল্য ২০.০০। এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে ৩২টি অনূদিত কবিতা। পৃথিবীর খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে অনুবাদক যাঁদের কবিতা অনুবাদ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন : রাইনার ক্যুনৎসে, পেটার হান্ডকে, গুন্টার গ্রাস, মাহমুদ দারবিশ, ভর্তৃহরি, গুন্টার আইক্‌ষ্, লিওপোল্‌দ সেদার সেন্ঘর, পাবলো নেরুদা, ফিলিপ লার্কিন, যোহান হোল্‌ফগাং ফন গ্যোয়েটে, গলওয়ে কিনেল, ভিসেন্ডি আলেইহান্দ্রে, হাইনরিখ হাইনে, রিচার্ড এবরহার্ট, পাউল সেলান, টেড হিউজ, আঁদ্রেই ডজনোমেন্‌স্কি, হান্‌স্ কারোসা, ডম মোরেস, ইয়র্হে লুই বোর্হেস ও ফ্রিডরিখ হ্যোলডার্লিন। অনুবাদক 'সবিনয় নিবেদন'-এ অনূদিত কবিতাগুলোকে 'অনুবাদ বলার সাহস নেই ; মৌলিক রচনাও নয় এরা' বললেও পাঠক মূল কবি ও অনুবাদকের মৌলিকত্ব লাভ করবে। পা.র.

অপরাজিত : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস, পথের পাঁচালীর পরিপূরক

www.pathagar.com

কথাশিল্প। ১৩৩৬ সনের পৌষ থেকে ১৩৩৮ সনের আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম দুখণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সনে। প্রকাশক ও মুদ্রক সজনীকান্ত দাস। এর প্রথম নাম ছিল 'আলোক সারথি'। অপরাজিত উপন্যাসে অপুর কৈশোর ও যৌবনকালের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ড. নীহার রঞ্জন রায়, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ রচনাকে একখানি epic উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। কাহিনীর প্রথম অংশে সর্বজায়ার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অপুর জীবনে মোড় স্বাভাবিক নিয়মেই অন্যদিকে ঘুরে। কলকাতার কলেজ জীবনের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তার জীবনে যতখানি বৈচিত্র্য আনেনি ততখানি এনেছে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া অপর্ণার মধুময় সান্নিধ্য। অপর্ণার সঙ্গে অপুর দাম্পত্য প্রণয় বেশ সুখকরভাবেই চলছিল, যেন তার জন্মভূমি নিশ্চিন্দিপুরের এক প্রতিনিধিকেই সে পেয়েছে, কিন্তু মৃত্যু এসে অতর্কিতে ছিনিয়ে নেয় তার এত সাধের অপর্ণাকে। উদাসীন অপু অপর্ণার মৃত্যুর কারণ কাজলকে তার মাতামহের বাড়িতে রেখে পালিয়ে যায় নিরুদ্দেশের পথে। আরো একটি মৃত্যু অপুর অনুভূতিতে পূর্ণতা এনেছে—সে হচ্ছে লীলার বিষপানে মৃত্যু। তারপর সে ফিরে এসেছে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে হঠাৎ কাজলকে দেখে তার মনে হলো আত্মজের ভিতর দিয়ে শিশু অপু যেন আবার ফিরে এসেছে। দূর্গা নেই, সর্বজায়া নেই, অপর্ণা নেই, লীলাও নেই, কিন্তু নিশ্চিন্দিপুর আছে। চব্বিশ বছরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু যেন আবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরে এসেছে। আ. গ.

অপরাজেয় জ্যাক লন্ডন : উপন্যাস। লেখক জ্যাক লন্ডন। অ্যাবিসমান ব্রুট বা 'অপরাজেয়' গল্পটি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বক্সিং সম্পর্কিত রচনাগুলোর অন্যতম একটি ছোট উপন্যাস। জ্যাক লন্ডনের চরিত্রের দুটি বিশেষ দিক এই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে। প্রথমত তিনি ছিলেন 'ক্লীন স্পোর্টস'-এর অনুরাগী আর দ্বিতীয়ত তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। একজন বক্সার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রিং-এর মধ্যে প্রবেশ করে। প্রচণ্ড শক্তি ও কৌশলের ভয়াবহ যুদ্ধ-সদৃশ্য খেলাকে কেন্দ্র করে যে পরগাছা শ্রেণী মুনাফা লোটে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তিনি, উন্মোচিত করেছেন পেশাদারি মুষ্টিযুদ্ধের ক্লেদাক্ত স্বরূপকে। অন্যটি তাঁর মেলানেশিয়ার সমুদ্র অভিযানের উপর লেখা গল্প দ্য সীড অফ ম্যাকয় বা 'অথৈ জলের ডাক'। এটিও জ্যাকের একটি অনবদ্য গল্প। বিশ্বসাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের নাম জ্যাক লন্ডন। তিনি নিজেও ছিলেন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের একজন। ভয় বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের শব্দগুলোকে তিনি তাঁর জীবন-অভিধান থেকে নির্মমভাবে বর্জন করেছিলেন। ৪০ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন কেটেছে রূঢ় জীবনের লবণাক্ত স্বাদ গ্রহণ আর সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে মানুষের অপরাজেয় সত্তার সন্ধানে। ১৮৭৬ সালের ১২ জানুয়ারি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে জ্যাক জন্মগ্রহণ করেন। নিজের রহস্যাবৃত জন্মের কারণে জ্যাক আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। তাঁর দুটি আকর্ষণ বই ও সমুদ্র। তাঁর কল অফ দ্য ওয়াইল্ড, দ্য সন অফ দ্য উলফ, হোয়াইট ফ্যাং কালজয়ী উপন্যাস। তাঁর মৃত্যু হয় ২২ নভেম্বর ১৯১৬ সালে। বইটির ভাষান্তর করেছেন অসীম চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : দীপায়ন, ২০ কেনাব সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৬, পৃষ্ঠা : ১৩২, মূল্য : ২০ রুপি। বি. ব.

অপরাধ জগতের ভাষা : ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক রচিত অপরাধ জগতের ভাষা নিয়ে গবেষণামূলক বই। সূচিপত্রে আছে—সূচনা, পশ্চিম বাংলার অপরাধ জগৎ, নিষেধ ও কুসংস্কার, ইঙ্গিত, ভাষার কারিকুরি, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট। ১৯৭৩ সালে রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ। প্রকাশক

www.pathagar.com

দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃষ্ঠা : ১৬৯, মূল্য : ১৬ রুপি। বি.ব.

অপরাধ জগতের শব্দকোষ--পশ্চিম বাঙলা : ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক রচিত অভিধান। ভূমিকা, পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগৎ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ তালিকাপঞ্জি, সঙ্কেত-অক্ষর ও চিহ্ন, গ্রন্থপঞ্জিসহ অভিধান। অভিধানের শেষে আছে— 'শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত বাঙালি অবাঙালি এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত ইংরেজি ধার-করা শব্দ', 'ভূরি-প্রয়োগসহ শব্দ তালিকা', 'ইংরেজি ও ইংরেজি-বাঙলা/হিন্দি শব্দের ভূরি-প্রয়োগ তালিকা' এবং 'শব্দ-সংযোজন'-এর জন্য ৪টি সাদা পৃষ্ঠাসহ ৪টি অধ্যায়। প্রকাশক : নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। পৃষ্ঠা : ১৭৬, মূল্য : ৫ রুপি। বি.ব.

অপরিচিতকরণ : গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রুশ প্রকরণবাদী সাহিত্য-সমালোচনার একটি শৈল্পিক রীতি হিসেবে অপরিচিতকরণের (Formalism) সূত্রপাত। রুশ ভাষায় অপরিচিতকরণের অর্থ 'রহস্যময় করে তোলা'। পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রকরণবাদী শিল্পতাত্ত্বিক ভিক্টর স্কোলোভস্কি। তিনি বলেছেন, দৈনন্দিন অভ্যেসের অন্তর্গত হয়ে গেলে মানবীয় সংবেদনা সহজ, স্বয়ংসিদ্ধ, স্বাভাবিক হয়ে আসে। এর তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা যায় হারিয়ে। মনের মধ্যে তা কোনো অভিঘাত তোলে না। ফলে শিল্পের লক্ষ্য ও কাজ হওয়া উচিত এই দৈনন্দিন স্বয়ংসিদ্ধ অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ সারা জীবন ধরে নানা ধরনের চিরাচরিত পরিবর্তনহীন অভ্যেসের দ্বারা গ্রস্ত থাকে। শিল্পীর কাজ হচ্ছে এই পরিচিত সংবেদনা থেকে শিল্পকে অপরিচয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া। পাঠকের মনে এভাবেই নতুন সজীব সংবেদনা সৃষ্টি করতে হয়, আর তা হলেই শিল্পকর্ম তার কাছে হয়ে উঠবে অকর্ষক। প্রকরণবাদীরা বলেছেন, রচনার মধ্যে উপজীব্য বিষয়ের প্রমুখন (foregrounding) তৈরি করে এই সংবেদনা সৃষ্টি করা যায়। কবিতার ভাষায় বিচ্যুতি এনেও অপরিচয়ের সংবেদনা তৈরি করা সম্ভব। প্রকরণবাদীগণ প্রমুখন ও বিচ্যুতিকে শিল্পসৃষ্টির উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রাগ স্কুলের ভাষাবিজ্ঞানীদের লেখাতেও স্বয়ংসিদ্ধতা ও প্রমুখন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের মতে স্বয়ংসিদ্ধ দৈনন্দিনতাযুক্ত সাহিত্য ভাষাগত দিক থেকে বিশেষ কিছু সাধারণ প্রসঙ্গকেই শুধু প্রকাশ করে থাকে। এ ধরনের সাহিত্য তাই কখনোই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। অন্যদিকে প্রমুখন হচ্ছে এমন এক ধরনের ভাষাগত উপকরণ যা স্বাভাবিক ভাষারীতির তুলনায় পৃথক বলে পাঠকের মনোযোগি তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। স্কোলোভস্কি বলেছেন, শিল্পের লক্ষ্য হচ্ছে অজানা বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে শিল্পভোক্তার মধ্যে গভীর অনুভব সঞ্চারিত করা। বস্তুবিষয়কে অপরিচিতকরণের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা যায় এই অনুভব। প্রাগ স্কুলের মতে প্রধানত দুইভাবে সাহিত্যে ও কবিতায় অপরিচিতকরণের আবহ সৃষ্টি করা যায় : প্রথমত, তথ্যধর্মী জ্ঞানমূলক পরিচিত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে এড়িয়ে যেতে হবে ; দ্বিতীয়ত, বস্তুবাদী পরিবেশের পরিবর্তে বিশেষ অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। তবে এ সবের জন্যে যা করা সবচেয়ে জরুরি তা হচ্ছে, ব্যক্তি যাতে তার ব্যক্তিত্ব ও ভাবনার গভীরতার স্তরে পৌঁছুতে পারে সাহিত্য বা কবিতার ভাষাকে সেইভাবে সৃষ্টি করতে হবে। প্রকরণবাদের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অপরিচিতকরণ রীতিটি সমকালীন লেখক-শিল্পীর মধ্যে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈপ্লিবিক রীতি হিসেবেও তা গ্রাহ্য হয়েছে। ব্রেখট্ তাঁর নাটকে বিচ্ছিন্নতার (alienation) যে আবহ তৈরি করেছিলেন, তা এই অপরিচিতকরণেরই প্রভাব বলে অনেকে মনে করেন। প্রমুখনের ধারণা এসেছিল মনোবিজ্ঞানের সংবেদন সংক্রান্ত আকার-পটভূমি (figure-groud) থেকে। সমকালীন শিল্প-সমালোচকগণ প্রমুখন ও অপরিচিতকরণ পরিভাষা দুটি একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই দুটি

www.pathagar.com

পরিভাষার মূল কথা একই, 'কবিতার ভাষা' অন্যান্য ভাষা থেকে বিশেষভাবে আলাদা। হ্যান মুকারোভোস্কির মতে, 'কাব্যিক ভাষার কারুকাজগুলি লুকিয়ে আছে দূরস্থিত প্রমুখননির্ভর উচ্চারিত ভাষার মধ্যে।' প্রমুখনের উল্টো দিকে আবার পটভূমির (background) অবস্থান। পটভূমি বা প্রেক্ষাপট তৈরি করেও সাহিত্যে অপরিচিতকরণের আবহ সৃষ্টি করতে হয়। এই পটভূমি ব্যবহারের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গোয়েন্দা উপন্যাসে। গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক এ জন্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার কোনো না কোনো সূত্র পূর্বে উল্লেখ করেন, যা রহস্য উন্মোচনে পরে তার কাজে লাগে। পাঠক পটভূমিনির্ভর সেই সূত্র ধরে গল্পের রহস্য সম্পর্কে রসাস্বাদন করেন। বলা হয়েছে যে, অপরিচিতকরণের জন্যে তাই অবলম্বন করা হয় নানা রীতিপদ্ধতি। মূল কথা হলো সাহিত্যে পরিচিত প্রসঙ্গের বা অনুষঙ্গের কথা থাকতে পারে, কিন্তু তাকে অপরিচিত করে, কিছুটা দূরস্থিত করে উপস্থাপন করতে হবে ; যাতে তা পাঠককে আকৃষ্ট করে। ড. মা. জা.

অপরিচিতা : সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পগ্রন্থ। গল্পসংখ্যা সাত। 'অপরিচিতা', 'পরিচিতা', 'ফেরবার পথ', 'রথের তলে', 'ষড়যন্ত্র মামলার রায়', 'অনাবশ্যক', 'ঈর্ষা'। প্রধানত বাঙালি চরিত্রের বিভিন্ন দিক, বাঙালির ঐতিহ্য ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ও দেশবিভাগোত্তর বাঙালির পরিবর্তন--এসবই গল্পগুলোর বিষয়। 'ফেরবার পথ' গল্পে ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে ফেরার পথে একজন ভারতীয় রাজকুমারী ও তার সঙ্গী অল্পবয়স্ক এস. সিংকে নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে স্ক্যান্ডাল ছড়ায়। গল্পের শেষে পাঠক জানতে পারে তারা মা ও সন্তান। 'রথের তলে' গল্পে 'নাট-সংস্কৃতি'র মাহাত্ম্য ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ট্রাজিক পরিণতি বিবৃত হয়েছে। ইংরেজ সূত্রে আধুনিকতার আগমনে কিভাবে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়েছে— তাই এ গল্পের প্রতিপাদ্য। 'ষড়যন্ত্র মামলার রায়' গল্পে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি মামলার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবীদের মাহাত্ম্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। 'ঈর্ষা' একটি হাস্যরসাত্মক গল্প। সবগুলো গল্পেই সতীনাথ ভাদুড়ীর নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মেলে। প্রচ্ছদ : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪/বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা–১২। আ. মো. মি.

অপরূপ রূপকথা : বুদ্ধদেব বসু অনূদিত রূপকথার বই। হান্স ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডেরসেনের তেরটি রূপকথা এই বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে কলকাতা থেকে। তখন গল্পের সংখ্যা ছিল এগার। ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় অনুবাদক আরো দুটি গল্প যোগ করেন। বইয়ের গল্পগুলো হল : 'কুৎসিত হাঁস', 'কোকিল ও কলের কোকিল', 'রুটি মাড়িয়ো না', 'আঙুলিনা', 'ঠান্ডা দেশের পণ্ডিত', 'লাটিম ও বল', 'রাজার নতুন পোশাক', 'দেশলাইয়ের বক্স', 'লাল জুতো', 'ছোট-কালু বড়-কালু', 'এক খোসায় পাঁচ জন', 'রাজকন্যা ও মটরশুঁটি', 'ছোট জলকন্যা'। আন্ডেরসেনের অসংখ্য গল্প থেকে বাছাই করে এই তেরটি গল্প অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। গল্পগুলোর বিষয় যেমন অভিনব, তেমনি আশ্চর্য এগুলোর ঘটনা বিন্যাস। লেখকের কল্পনার বিস্তার শিশু-কিশোর পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে। রূপকথা হলেও এগুলো গ্রিম ভাইদের রূপকথার মতো সংগৃহীত বা পুনর্কথন নয়, আন্ডেরসেনের মৌলিক সৃষ্টি। অদ্ভুতের সঙ্গে বাস্তব, তামাশার সঙ্গে কান্না, বিদ্রূপের সঙ্গে বেদনা মিশিয়ে এমন রঙ-বেরঙের খামখেয়ালি গল্প আন্ডেরসেনের আগে শিশু-কিশোরদের জন্য আর কেউ লেখেন নি। বুদ্ধদেব বসুর জাদুকরা গদ্যরীতি বাংলায় গল্পগুলোকে দিয়েছে নতুন ব্যঞ্জনা। বাংলাদেশেও 'অপরূপ রূপকথা' বইয়ের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস

www.pathagar.com

রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা, নতুন আঙ্গিক বিন্যাসে বইটি প্রকাশ করে। বইটির নতুন প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন দীপক রায়। বইটির পৃষ্ঠা : ১১৪ এবং মূল্য : ৬০.০০। সু. ব.

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : নাট্যকার, নট ও নাট্য-পরিচালক। জন্মস্থান যশোর, মতান্তরে মহেশপুর, নদীয়া, জন্ম তারিখ ২০ জুলাই ১৮৭৫। পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থায়ই নাট্যশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। স্টার থিয়েটারের প্রখ্যাত অভিনেতা অমৃতলালের কাছে এবং পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দু শেখরের কাছে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁরই আদর্শে তিনি নাটক রচনা শুরু করেন। ১৩১১ সনে (১৯১৮ সালে) পেশাদার নাট্যাভিনেতা রূপে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে নাট্যকার, অভিনয়-শিক্ষক ও থিয়েটার-পরিচালক রূপে খ্যাতিমান হন। অপরেশচন্দ্র অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত নাটক—রঙ্গিলা (১৩২১ সন), উর্বশী, দু-মুখো সাপ, রাখীবন্ধন, ছিন্নহার, রামানুজ (১৯১৬), অযোধ্যার বেগম, কর্ণার্জুন (১৩৩০ সন), শুভদৃষ্টি, ইরানের রাণী। গীতিনাট্য--বাসবদত্তা, বন্দিনী, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, অপ্সরা। নাট্যরূপ—পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি, মা (১৯৩৪ সন)। উপন্যাস—পুষ্পাদিত্য, ফুল্লরা, ছিন্নহার, চণ্ডীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, মগের মুলুক, শকুন্তলা, ভদ্রা। আত্মজীবনী—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর। ১৯৩৪ সালের ১৫ মে তিনি পরলোক গমন করেন। আ. ই

অপর্ণা দেবী : কীর্তন গায়িকা ও প্রচারক। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম। অপর্ণা দেবী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা। ১৯১৬ সালে ব্যারিস্টার সুধীরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর অসবর্ণ বিয়ে হয়। অপর্ণা দেবী ও তাঁর স্বামী ১৯১৯ সাল থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তাঁদের বাড়িটি ছিল দেশকর্মী ও বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল। বৃন্দাবনের বিখ্যাত নবদ্বীপ ব্রজবাসীর ছাত্রী অপর্ণা দেবীর বৈষ্ণব দর্শন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল। তাছাড়া কীর্তনের সুগায়িকা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে কীর্তনের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তিনি ও তাঁর স্বামী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিদেশে কীর্তন প্রচারের জন্য তিনি স্বামীর সঙ্গে ত্রিশের দশকে ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেন। অপর্ণা দেবী শিক্ষিত অভিজাত মেয়েদের নিয়ে 'ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ' নামে একটি সম্প্রদায়ও গঠন করেন। কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। তন্মধ্যে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' এবং 'কীর্তন পদাবলী'-র নাম উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অপর্ণা দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৯৭৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আ.খা.

অপাদান কারক : 'মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়', গাছ হইতে ফল পড়ে', ছাদে জল পড়ে। —,যা কোনো ঘটনার উৎপত্তিস্থান—যা থেকে কোনো বস্তু বা ব্যক্তি উৎপন্ন, চলিত, নির্গত, নিসৃত, উত্থিত, পতিত, প্রেরিত, গৃহীত, দৃষ্ট, শ্রুত, সূচিত, নিবারিত, অন্তর্হিত, রক্ষিত ইত্যাদি হয় তাকে অপাদান কারক বলে। কি বা কোথা থেকে, কি থেকে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে অপাদান কারক পাওয়া যায়। উদাহরণ—দুধ থেকে দধি হয়। অপাদান কারকে সাধারণত বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যথা--বিপদে মোরে রক্ষা কর। এবং 'হইতে', থেকে, প্রভৃতি অনুসর্গ বিভক্তির পরিবর্তে বসে। বিশেষ অর্থে অন্য বিভক্তি ও অনুসর্গও বসে। যথা—'মুখ **দিয়া** খই ফুটে'। **শিক্ষককে** ছাত্ররা ভয় পায়। **জমিতে** সোনা ফলে। যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে রাত্রি হয়। শি. প্র. লা.

অপারেশন কাঁকনপুর : আলী ইমামের লেখা শিশুতোষ গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮ সালের মে মাসে। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : আফজাল হোসেন, মূল্য : বোর্ড বাঁধাই ৬.০০ টাকা, সুলভ সংস্করণ : ৩.৫০ টাকা। মোট এগারোটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন : কাঁকনপুর কতদূর, অন্যরকম পিকু,

www.pathagar.com

নতুন বন্ধু, সেই ভয়ানক চাউনি, রহস্যময় অতিথি, বাঘমুণ্ডীর পথে, সোনার হাঁস, ঘুমপাড়ানী গান, রাতের অভিযান, সোনালি দিন ও মুখের ছবি। গ্রন্থটির মূল চরিত্রে রয়েছে পিকু নামের একটি কিশোর। তাঁর বাবার বদলির চাকরি। এই গ্রন্থে দেখা গেছে পিকুর বাবা কাঁকনপুর নামক স্থানে ফরেস্ট অফিসার হিসেবে এসেছে। পিকু ছেলেটা অন্য রকমের। যে কোনো বিষয়ই সে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে। ফুল, পাখি, মাছ, গাছপালা–সবকিছুর প্রতিই তার রয়েছে অপার আকর্ষণ। কাঁকনপুরে ক্যানারি সাহেব নামে একজন ধূর্ত লোক বাস করত। সে মূর্তি পাচার এবং ছেলে ধরার ব্যবসা করত। কাঁকনপুরের লোকেদের সে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের ঘুমপাড়ানি গান, ল্যাপল্যান্ডের হরিণের হাড়ের তৈরি বাঁশির মায়াবী সুর, তাহিতি দ্বীপের মন উতল করা গান, নিগ্রো মাঝিদের আর্তনাদ ভরা করুণ সুর ইত্যাদি শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখত। পিকু শুরু থেকেই লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। একরাতে সে একাকী অভিযান চালিয়ে লোকটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। এরপর পিকু পুলিশকে খবর দেয়। শিশু-কিশোরদের উপযোগী এ বইয়ে বিষয়ের দিক থেকে আকর্ষণীয়, তবে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে লেখক আরো সচেতন হতে পারতেন। সৈ. আ. জা.

অপহ্নুতি : অপহ্নুতির অর্থ অস্বীকার। উপমেয় অর্থাৎ প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়কে অস্বীকার বা গোপন করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় বলে এই অলঙ্কারের নাম অপহ্নুতি। না, নয়, ছলে ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। ছলে শব্দপ্রয়োগে অপহ্নুতি হলে উপমেয় ও উপমান একই বাক্যে বসে এবং না, নয় শব্দযোগে এই অলঙ্কার গঠিত হলে উপমেয় ও উপমান পৃথক বাক্যে বসে। যেমন—শিশির বিন্দুর ছলে উষা দেবী কুতূহলে/ফুল্ল ললিণীর ভালে/পরাইছে সাবধানে মুকুতার মালা (অজ্ঞাত)। এখানে উপমেয় শিশির বিন্দু এবং উপমান মুকুতার মালা। ছলে শব্দপ্রয়োগে প্রকৃত উপমেয়কে অস্বীকার করে অপ্রকৃত উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং উপমেয় ও উপমান একই বাক্যে অবস্থান করেছে। এরূপ আরো কয়েকটি উদাহরণ,—(ক) বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিনা (মধুসূদন)। (খ) দেবতা আশিস ছলে বরষে শিশির (অক্ষয় বড়াল)। (গ) ষড়ঋতু ছলে ষড়রিপু খেলে/কাম হতে মাৎসর্য (যতীন্দ্রনাথ)। না, নয় শব্দ প্রয়োগে উপমেয় ও উপমানকে পৃথক রেখে সৃষ্ট কয়েকটি অপহ্নুতি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত ; যেমন,—(ক) এ তো মালা নয়গো, এ যে তোমার তরবারি (রবীন্দ্রনাথ)। (খ) ও যেন বৃষ্টি নয়;/কোনো বিরহিণী দিগ্বধুর অশ্রান্ত ক্রন্দন (রবীন্দ্রনাথ)। আ.ই.

অপূর্ণ পর্ব বা অপূর্ণ পদী পর্ব : কাব্য পংক্তির পূর্ণ পর্বগুলির মাত্রাসংখ্যার সমতা থাকতে হবে। মাত্রা সংখ্যা সমান বলেই ওগুলি পূর্ণ পর্ব। যেমন,

আমরা দুজনা। স্বর্গ-খেলনা। গড়িব না ধরনীতে।
মুগ্ধ ললিত। অশ্রুগলিত। গীতে।

[রবীন্দ্রনাথ]

এখানে প্রতি পূর্ণ পর্বের অর্থাৎ 'আমরা দুজনা' 'স্বর্গ খেলনা' ইত্যাদির মাত্রা সংখ্যা ছয়। কিন্তু 'নীতে', ও 'গীতে' এই দুটি অংশের মাত্রা সংখ্যা দুই এবং এই দুটি অংশ পংক্তিশেষে অবস্থিত। এই অংশ দুটিই অপূর্ণ পর্ব। সুতরাং কবিতার পংক্তি-শেষে পূর্ণাবয়ব পর্বের চেয়ে ছোট মাপের অংশ থাকলে তাকে অপূর্ণ পর্ব বা অপূর্ণ পদী পর্ব বলে। অপূর্ণ পর্বের ব্যবহার বাংলা ছন্দে রীতিসিদ্ধ, বিশেষত : বাংলা মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে ছন্দ-দোলার বিরাম অপূর্ণ পর্বে সংঘটিত হয়। অনেকক্ষণ ধরে সমমাত্রিক পর্বের দোলা একঘেয়ে লাগবে। অপূর্ণ পর্ব সেই ক্লান্তিকর একঘেয়েমি ঘুচিয়ে দেয় এবং যতি বা বিরাম স্থল নির্দেশ করে। তাছাড়া কবিতার অন্ত্যমিলের ব্যাপারটিও ঘটে থাকে অপূর্ণ পর্বে। কবিরা এক থেকে পাঁচ মাত্রা পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের অপূর্ণ পর্বের রীতি দেখিয়েছেন। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অপূর্ণ পর্বের ব্যবহার-বৈচিত্র্য অধিক। দুই মাত্রার অপূর্ণ পর্বের দৃষ্টান্ত পূর্বোদ্ধৃত অংশে দেখানো

www.pathagar.com

হয়েছে ; এক, তিন, চার ও পাঁচ মাত্রার অপূর্ণ পর্বের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো।

এক ও তিন মাত্রার

সন্ধ্যা হলে　কুমারী দলে　বিজন তব　দেউলে　(৩ মাত্রা)
　জ্বালায়ে দিত　প্রদীপ যতনে,　(১ মাত্রা)
শূন্য হলে　তোমার তূণ　বাছিয়া ফুল　মুকুলে　(৩ মাত্রা)
　সায়ক তারা　পড়িত গোপনে　(১ মাত্রা)
(রবীন্দ্রনাথ)

চার মাত্রার

কামারের সাথে　হাতুড়ি পিটাই।
ছুতোরের ধরি। তুরপুন
কোন সে অজানা　নদীপথে তাই
জোয়ারের মুখে　টানি গুণ
(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

পাঁচ মাত্রার

এই যৌবন　জল-তরঙ্গ　রোধিবি কি দিয়া　বালির বাঁধ?
কে রোধিবি এই　জোয়ারের টান　গগনে যখন　উঠেছে
চাঁদ?

(নজরুল ইসলাম)

আ. ক.

অপূর্ব নৈবেদ্য : দেবেন্দ্রনাথ সেন রচিত গীতিকাব্য। কবির এই কাব্যগ্রন্থে কিছু ভিন্ন স্বাদের কবিতা স্থান পেয়েছে। বাংলা সনেট রচনার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের দক্ষতা আছে, 'অপূর্ব নৈবেদ্যে'র 'সনেটগুচ্ছ' এবং 'গোলাপ গুচ্ছের' (১৯১২) সনেট সমূহ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। তবে অনেক ক্ষেত্রে তা শিথিল শিল্পকলায় পর্যবসিত। সনেটের গাঢ় সুঠাম কায়াকে কবি সহজরীতি ও ভাবুকতার দ্বারা গড়ে তুলেছেন। তাঁর সনেটে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 'অপূর্ব নৈবেদ্যে' মিরেন্ডা, জুলিয়েট ইত্যাদি প্রশস্তিমূলক কবিতার পাশাপাশি কিছু ঝাঁঝালো ব্যঙ্গ কবিতাও আছে। হাল্কা ছাঁচে কিছু কিছু সরস কবিতাও কবি লিখেছেন। তাতে নির্মল কৌতুক রসের প্রাধান্য। ঝাঁঝালো ব্যঙ্গ কবিতা হিসেবে 'কবির জন্ম' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় যেমন বর্ণের উল্লাস আছে, তেমনি আছে অতিভাষণের অপচয়।　মু. আ. জ.

অপেরা গীতিনাট্য, যাত্রা : সঙ্গীতবহুল নাটকের নাম অপেরা। 'অপেরা' শব্দটি এসেছে ইটালি থেকে। বাংলায় 'অপেরা'কে যাত্রার প্রতিশব্দ রূপে মনে করা হয়। সম্ভবত : নৃত্যগীতের প্রাধান্য থেকে 'অপেরা' যাত্রার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রধানত সঙ্গীতের মাধ্যমেই অপেরার নাট্যরস ও বক্তব্য দর্শকের চিত্তে সঞ্চার করা হয়। অপেরার সংলাপেও কাব্যের মেজাজ থাকে। গীতিধর্মিতার আমেজে পাত্রপাত্রীদের মুখের ভাষা সুষমামণ্ডিত হয়। গিরিশ ঘোষের 'আবু হোসেন', ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'কিন্নরী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ধ্যানভঙ্গ', রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' ইত্যাদি অপেরার নিদর্শন।　আ. ই

অপ্রকাশিত নজরুল : সম্পাদিত গ্রন্থ। সম্পাদনা করেছেন ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। সূচিপত্রে আছে—২টি কবিতা 'মীরা' ও 'ভারতী আরতি', গান ১৫৫টি ; অগ্রন্থিত গান ২৬টি, অসংশনত ৫টি ; নাটিকাগুলো—'ঈদল্ ফেতর রেকর্ড নাটিকা', 'বিলাতী ঘোড়ার বাচ্চা', 'বাঙ্গালী ঘরে হিন্দি গান', 'জন্মাষ্টমী রেকর্ড নাটিকা' এবং 'প্ল্যানচেড রেকর্ড নাটিকা'। প্রকাশক : হরফ, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭। প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃষ্ঠা : ১২৬, মূল্য : ২৫ রুপি।　বি. ব.

অপ্রতিরোধ্য রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ : বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর রচিত প্রবন্ধের বই। রবীন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ থেকে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পীদের কাজের ওপর মূল্যায়ন ছাড়াও নাটক, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা মোট তেইশটি প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে। 'অপ্রতিরোধ্য রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা' এ দুটো হচ্ছে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে লেখক মন্তব্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঔপনিবেশিক আদর্শবাদ এবং ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিভিন্ন মুহূর্ত কাজ করেছে। এসব বিভিন্ন মুহূর্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন তাঁর নান্দনিকতা। তাঁর আদর্শবাদে যুক্ত উপনিষদের ভারতবর্ষ এবং বেন্থাম মিথের উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড, এই যুক্ততা তাঁর বুদ্ধিবাদী পরিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা অভ্যন্তরীণ ঐক্য তৈরি করেছে।' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ 'লোকবাদী নজরুল'ও বেশ উল্লেখযোগ্য। এই

www.pathagar.com

প্রবন্ধের শেষের দিকে লেখক বলেছেন, 'বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে—সবাই নজরুলকে (এবং জসীমউদ্‌দীনকে) নিয়ে বিপদে পড়েছেন এবং বিব্রত হয়েছেন। তিরিশ দশকীয় আধুনিকতার সংজ্ঞার মধ্যে নজরুলকে (এবং জসীমউদ্‌দীনকে) তাঁরা খাপ খাওয়াতে পারেন নি, অন্য পক্ষ নজরুল (এবং জসীমউদ্‌দীন) কবি হিসেবে প্রধান বলে তাদের বহিষ্কার করতে পারেন নি বঙ্গীয় আধুনিকতা থেকে। এই বিপজ্জনক এবং বিব্রত সমস্যার অর্থ হচ্ছে আধুনিকতার একটি মাত্র আয়তন তৈরি করা সম্ভব নয় কিংবা আধুনিকতার একটি মাত্র পঠন সম্ভব নয়।' শওকত ওসমান, জয়নুল আবেদিন, হাসান হাফিজুর রহমান এবং কামরুল হাসানকে নিয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ, লোকশিল্প, নাটক, সংস্কৃতি ও মৌলবাদের অশুভ উত্থান নিয়ে লেখা 'ফতোয়ার বিরুদ্ধে' সহ প্রত্যেকটি প্রবন্ধ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় বৈচিত্র্য ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার কারণে গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলো লাভ করেছে ভিন্নমাত্রা। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে : আগামী প্রকাশনী। প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৯৬। প্রচ্ছদ শিল্পী : উত্তম সেন। মূল্য : ষাট টাকা। মা. আ.

অপ্রতুল পুতুল নাচে : ইউসুফ পাশার কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক : পালক পাবলিশার্স, ২৯ বঙ্গবন্ধু এ্যাভেনিউ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব। শেষ প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : রফিকুর রহমান। মূল্য : পনেরো টাকা। ছত্রিশটি কবিতা নিয়ে অপ্রতুল পুতুল নাচে। সবগুলো কবিতাই ব্যক্তিগত অনুভূতি, প্রেম-ভালোবাসা, চাওয়া এবং না পাওয়ার নিপুণ প্রকাশে পরিপূর্ণ। একটি কবিতায় আছে শৈশবের কথা (খেলা), আর একটি কবিতায় আছে কৈশোরের বর্ণনা (কিশোর কোকিল) আর অপ্রতুল পুতুল নাচে শিরোনামের কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে অপ্রতুল প্রণয়ের দুঃখবোধ। 'কৃষকের মাটি' এই কাব্যগ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। সংকলিত অনেক কবিতাই সমিল ও ছন্দবদ্ধ। লালন ও হাছন রাজাকে নিয়ে রচিত কবিতাটি খুবই সুন্দর।

বাজারে তুই নিপুণ করে একতারাটা বাজা
সময় কোথায় এই জীবনে হৃদয় দিয়ে শুনি
মানব জমিন রইলো পতিত হয়নি ফসল বুনা
দেহের ভিতর ফসল ফলে কি করে তরতাজা
কে আছে রে অমন কৃষক কে আছে সৎ গুণী
বাজারে তুই নিপুণ করে একতারাটা বাজা
নামাজ পড়ে কোথায় লালন সঙ্গে হাছন রাজা?

কাব্য গ্রন্থটির একটি চমৎকার প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন অকাল প্রয়াত শিল্পী কাজী হাসান হাবীব। খা. বি. উ. জ.

অপ্রস্তুত প্রশংসা : অপ্রস্তুত অর্থাৎ যা বর্ণনীয় নয় এরূপ বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা যখন প্রস্তুত অর্থাৎ মূল বক্তব্য বা যথার্থ বর্ণনীয় বিষয়কে বোঝানো হয়, তখন সাহিত্যে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়। বর্ণনীয় বিষয়টি এরূপ অলঙ্কারে ব্যঞ্জনায় প্রাপ্ত হয় বলে কাব্যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়। এখানে প্রশংসার অর্থ স্তুতি নয়, বর্ণনা ; এবং বর্ণনা মানে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনায় প্রস্তুতের প্রতীতি। এই প্রতীতি পাঁচ প্রকারে সিদ্ধ হয় ; যেমন—(ক) সামান্য বা সাধারণ অপ্রস্তুতের দ্বারা বিশেষ প্রস্তুতের প্রতীতি,—'সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে/মনোহর মায়া-কায়া ধরি; তার পরে/সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীন রূপে/আলো করি অন্তর বাহির।' (রবীন্দ্রনাথ)। চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের এই উক্তিতে যে বিষয়ের বর্ণনা আছে তা সুন্দর ও মহৎ এবং তা সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; সুতরাং তা সাধারণ বা সামান্য অপ্রস্তুত। কিন্তু তা আসল বর্ণনীয় বিষয় নয় ; এর মাধ্যমে কবি বোঝাতে চেয়েছেন চিত্রাঙ্গদার বাহ্যসত্তার অন্তরালবর্তী অনুপম সৌন্দর্যময়ী গোপন-চারিণী সত্তাটি। এটিই কবির প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং এখানে অপ্রস্তুত সামান্যের বর্ণনায় প্রস্তুত বিশেষের প্রতীতি হয়েছে। (খ) বিশেষ অপ্রস্তুতের উল্লেখে সামান্য প্রস্তুতের প্রতীতি,—'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে/কামড় দিয়াছে পায়,/ তা' বলে কুকুরে কামড়ানো কি রে/মানুষের শোভা পায়? (সত্যেন দত্ত)। কুকুর মানুষকে কামড়াতে পারে, কিন্তু

www.pathagar.com

মানুষের পক্ষে কুকুরকে কামড়ানো সম্ভব নয়। এই বিশেষ অপ্রস্তুত থেকে প্রতীতি হচ্ছে একটি সামান্য বা সাধারণ প্রস্তুতের অর্থাৎ অধম আচরণ উত্তমকে অনুসরণ করে না। (গ) অপ্রস্তুত কার্যের দ্বারা প্রস্তুত কারণের প্রতীতি,—'চাঁচর কেশের চিকন চূড়াটি/সে কেন বুকের মাঝে। সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব গায়,/মোরা হলে মরি লাজে॥' (চণ্ডীদাস)। কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত কাটিয়েছেন, এই কারণটিই এখানে মূল বক্তব্য, কিন্তু তার উল্লেখ নেই। কৃষ্ণের কার্যেই তা ব্যক্ত হয়েছে। অতএব এটি কার্যকারণ ভাবের অপ্রস্তুত প্রশংসা। (ঘ) কারণ অপ্রস্তুত থেকে কার্য প্রস্তুতের প্রতীতি,—'কহিল সে তারি স্নেহে বিবর্দ্ধিত মৃগশিশুটিরে/আজ হতে মাতা বলি' জেনো, বৎস, আমার সখীরে!' (শ্যামাপদ চক্রবর্তী)। (ঙ) অপ্রস্তুতের উল্লেখে সদৃশ প্রস্তুতের প্রতীতি,—'অহো, বুঝিলাম তবে/কোন পণ চহ জিনিবারে, কোন্ চাঁদ/পেতে চাও হাতে। ভালো, পুরাইব সাধ/দিলাম অভয়!' (রবীন্দ্রনাথ)। অপ্রস্তুত চাঁদ উল্লিখিত হলেও এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুত মালিনীকেই (মালিনী নাটকের) বোঝানো হয়েছে। আ. ই

অপ্পয্যদীক্ষিত : পণ্ডিত। একাধারে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ এবং দার্শনিক। নামান্তরে অপ্পয়-দীক্ষিত ও অপ্পদীক্ষিত। কাঞ্চীর নিকটবর্তী অড়য়প্পন নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সময়কাল আনুমানিক ১৫৫০–১৬২২ সাল। শিবভক্ত এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রঙ্গরাজধ্বরির পুত্র। অপ্পয্যদীক্ষিত বিজয়নগর রাজ্যের বহু রাজার সভাপণ্ডিত রূপে খ্যাতিলাভ করেন। এসব রাজার মধ্যে চিন্নতিম্ম, চিন্নবোম্ম এবং বেঙ্কটের নাম তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা ভট্টোজি অপ্পয্যদীক্ষিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অপ্পয্যদীক্ষিত প্রায় শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থ-- অলঙ্কার সম্পর্কিত আলোচিত গ্রন্থ 'কুবলয়ানন্দ' ও 'বৃত্তিবার্তিক', অর্থচিত্র নিয়ে আলোচিত গ্রন্থ 'চিত্রমীমাংসা', মীমাংসা বিষয়ক গ্রন্থ 'বাদনক্ষত্রমালা', বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ 'পরিমল', শঙ্করভাষ্য অনুসারে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দার্শনিক ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'ন্যায়রক্ষামান', বিভিন্ন অদ্বৈত আচার্যদের মতবাদের বিবরণ-মূলক গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ' আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্যের মতের আলোচনা 'ন্যায়মুক্তাবলী', রামানুজের মতের আলোচনা 'নয়ময়ূখমালিকা', শৈবদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 'শিবার্কমণিদীপিকা' ইত্যাদি। আ. ই

অপ্সরা : হিন্দু পুরাণ অনুসারে অপ্ অর্থাৎ জল থেকে উৎপত্তি হওয়ায় তাদের নাম অপ্সরা। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনকালে বহু পরিচারিকাসহ সমুদ্র থেকে তারা ওঠে। দেবদানব কেউ তাদের গ্রহণ করেননি। তারা সংখ্যায় ৬০ কোটি। কামদেব তাদের অধিপতি। ইন্দ্রসভায় নর্তকী ও গায়িকারূপে তারা দেবতাদের বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে থাকে। তপস্যাবলে দেবতাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী হওয়ার ভয়ে দেবগণ মাঝে মাঝে অপ্সরাদের দ্বারা তপস্যারত মনি ঋষিদের প্রলুব্ধ করে ধ্যানভঙ্গ করাতেন। এভাবে অপ্সরা মেনকার দ্বারা বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ হয়, যার ফলে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। অপ্সরারা মায়াবলে নিজেদের দেহপরিবর্তনে সক্ষম। তাদের সৌন্দর্য ও যৌন আবেদনের কথা সুবিদিত। স্বর্গে তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে, কখনো কখনো মর্ত্যেও আগমন করে। অপ্সরাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, সুপ্রিয়া, মঞ্জুঘোষ, সরমা প্রভৃতি। ত. শ.

অফুরন্ত গল্পগ্রন্থ—প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রকাশক-শ্রী জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩ হ্যারিসন রোড, কলকাতা–৬, প্রথম নতুন সংস্করণ : ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬০, দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬০। প্রচ্ছদ সজ্জা : অজিত গুপ্ত, মূল্য : দুটাকা আট আনা। অফুরন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি সমাদৃত গল্পগ্রন্থ। তিনি কথাশিল্পী ও কবি হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা গদ্যের এবং তা গল্প। এটির নাম শুধু কেরানী,

সেকালের প্রবাসীতে ছাপা হলে রাতারাতি তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস পাঁক। তার কবিতার বই প্রথমা। প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী। এককালে বাংলা ছোটগল্প রচনায় তিনি যুগান্তর এনেছিলেন। আবার রোমাঞ্চকর গল্প রচনায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ঘন্টাদার কাবলু কাকার গল্প আজো ছোটদের কাছে সমান প্রিয়। তার প্রথম দিকের গল্পে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ রয়েছে। সমাজে উপেক্ষিত যাঁদের জীবন দুঃখ কান্নায় ভরা, পাঁক–পঙ্কিল এবং অপাংক্তেয় ও উপেক্ষিত, তাদের হাসি–কান্নার কথাই তার গল্পে বেশি করে স্থান পেয়েছে। অফুরন্ত গল্প গ্রন্থটিতে রয়েছে মোট ন'টি গল্প। এগুলোর শিরোনাম হলো : অফুরন্ত, ছুটি, অনাবশ্যক, লাল তারিখ, অরণ্য স্বপ্ন প্রত্যাগত, সহস্রাধিক বই, পুনরুক্তি ও জীবন সীমায়। জীবন সীমা গল্পটির পরিণতি বেশ রোমাঞ্চকর ও সকরুণ। মাধব তার স্ত্রীকে দেখছে অন্তহীন যাত্রায়। আর সে যাত্রায় স্ত্রী সৌরভীর সঙ্গী ধানকলের কেরানি বাবু। প্রায় অর্ধশতাধিক আগে লেখা গল্পগুলোর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি এখনো তরতাজা। গ্রন্থটি কবি বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গিত। খা.বি.জ.উ.

অবকাশ রঞ্জিনী : নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭–১৯০৯) প্রথম খণ্ড কবিতার সংকলন। গ্রন্থটি দুই ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশকাল যথাক্রমে ১২৭৮ ও ১২৮৪ বঙ্গাব্দ। 'অবকাশ রঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নবীনচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যে প্রতিশ্রুতিশীল কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি তাঁকে বাংলা কাব্যভুবনে স্বাগত জানন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'অবকাশ রঞ্জিনী'র দীর্ঘ আলোচনায় নবীনচন্দ্র সেনকে 'সুকবি' ও 'শব্দচতুর' কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন। একজন নতুন কবির জন্য এ ছিল এক দুর্লভ সম্মানের ব্যাপার। 'অবকাশ রঞ্জিনী' নবীবচন্দ্র সেনের সৌন্দর্যচেতনা, স্বদেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ ও স্বাদেশিকতার পরিচয়–চিহ্নিত প্রথম স্মারক কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথম ভাগের তিনটি মুদ্রণ (প্রথম প্রকাশ ১২৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৮৪ ও তৃতীয় সংস্করণ ১২৯১) ও দ্বিতীয় ভাগের দুটি মুদ্রণ (প্রথম প্রকাশ ১২৮৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৯৫) এর ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তারই সাক্ষ্য বহন করে। এ ছাড়া পরবর্তীকালে রচিত নবীনচন্দ্র সেনের শ্রেষ্ঠ স্বদেশ প্রেমের কাব্য 'পলাশির যুদ্ধে'র বীজ 'অবকাশ রঞ্জিনীতে নিহিত ছিল। সা. আ.

অবক্ষয়বাদ : লেখক বা শিল্পীর মনের হতাশা বা নৈরাশ্যজনিত কারণে সাহিত্য বা শিল্পের অবক্ষয় ঘটলে তার তাত্ত্বিক নাম হয় অবক্ষয়বাদ বা Decadentism। অবক্ষয় যুগে সমাজ জীবনে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। সাহিত্যও অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকতায় পরিণত হয়, শালীনতা ও সম্ভ্রমবোধেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সমস্যার চাপে অনেক লেখক ও শিল্পীর জীবন হতাশায় আচ্ছন্ন হয়। এই অবস্থায় তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পে অবক্ষয়ের এক দুঃখজনক রূপ লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণীর অবক্ষয়বাদী শিল্প ও সাহিত্যে জীবনের কোনো সুষ্ঠু রূপ থাকে না, সামাজিক ধ্যানধারণা সম্পর্কেও লেখকের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ থাকে না। ইন্দ্রিয়–বিলাস ও যৌনচেতনার অভিব্যক্তি অবক্ষয়বাদী শিল্প–সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। লেখকের আত্মগত উপভোগ ও বাসনা–কামনার প্রাধান্য থাকায় এই জাতীয় সাহিত্য সৎ সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। আ.ই.

অবচেতনে রাজাধিরাজ : কবি মোফাজ্জল করিমের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশ কাল : ১৫ এপ্রিল ১৯৮৩। প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা–২। প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবীব। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা আছে : আব্বা আম্মা আমি ভালো আছি। মোট ৪৬টি কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত। কবিতাগুলো আশাহতের বেদনা, আশাবাদীর প্রেরণা ও রোমান্টিকতা ইত্যাদি মৌল আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসে উজ্জ্বল। ধ্বনিময়তায় ব্যঞ্জনা, ছন্দোবৈচিত্র্য ও

www.pathagar.com

গীতিময়তায় ঋদ্ধিমান এর কবিতাগুলো। সমগ্র বইটিকে যদি একটি খেয়াল গান হিসাবে কল্পনা করা হয় তাহলে বলা যায় দয়িতার প্রতি দয়িতের রোমান্টিক আকর্ষণ অনেকটা খেয়াল গানের বাদীস্বরের মতো নানা রূপে বার বার ফিরে ফিরে আসে। সমকালীন জীবনের অসঙ্গতির অনুষঙ্গ প্রকীর্ণ হয়ে আছে গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলিতে। আ. মা.

অবতার : হিন্দু পুরাণমতে পৃথিবীর পাপভার অবতারণের জন্য দেবদেবী সময়ে সময়ে মনুষ্যমূর্তিতে কিংবা অন্য জীবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। অধর্মের নাশ, ধর্মসংস্থাপন এবং জীবোদ্ধার এর উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা ও দেবী মাহাত্ম্যে বিষ্ণু ও জগজ্জননীর এরূপ আবির্ভাবের কথা আছে। অবতার দু'রকমের হয়ে থাকে--অংশাবতার ও পূর্ণাবতার। বিষ্ণুর অবতারই অধিক পরিচিত। পৃথিবীর রক্ষক হিসেবে তিনি বহুবার অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে অবতারতত্ত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের "বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম" এ উক্তিতে অবতারতত্ত্বের সমর্থন মেলে। বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে অবতারের বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা বরাহ, কূর্ম ও মৎস্য অবতারে পৃথিবী সৃষ্টি ও রক্ষা করেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভগবানের চার, ছয় বা দশ মূর্তির কথা বলা হয়েছে। হরিবংশে আছে ছয় মূর্তির কথা। বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে দশ অবতারের উল্লেখ আছে। ভাগবত পুরাণে তিন স্থানে যথাক্রমে বাইশ, তেইশ ও ষোল অবতারের নাম পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্র সংহিতায় পাওয়া যায় উনচল্লিশ অবতারের নাম। মহাভারতের যুগে বিষ্ণু সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে পরিগণিত হওয়ায় তখন থেকেই অবতার হিসেবে তাঁর প্রকাশ শুরু হয় এবং পুরাণের যুগেই দশ অবতারে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এই দশ অবতারের নাম—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। অবতাররূপে তাঁরা প্রসিদ্ধ। তবে অন্যান্য পুরাণে বেদব্যাস, নারদ, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি প্রমুখের নামও অবতারতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত দেখা যায়। ইংরেজিতে 'ইনকারনেশন' বলে একটা কথা আছে, যার অর্থ অবতারবাদ। এর ধারণা গ্রিক এবং খ্রিস্টানধর্মেও বিদ্যমান। খ্রিস্টানদের মতে যিশু মানব সন্তান হলেও তাঁর মধ্যে মানবসুলভ পাপাচার ছিল না। তিনি রক্তমাংসে গড়া দেবতা ছিলেন। "ঈশ্বরের বাণীকে দেহ দেয়া হল"—বাইবেলের এই উক্তি থেকেই অবতারবাদের ধারণা পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মে অবতারবাদের স্থান নেই। আ.মা.

অবতার : প্রহসন। রচয়িতা রসরাজ অমৃতলাল বসু। সেকালে স্টার থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। যারা বাইরে ধর্মের মুখোশ পরে নিজেদের পরম ধার্মিক ও ভগবদভক্ত প্রতীয়মাণ করে লোক সমাজকে প্রভাবিত করে এবং ভিতরে নীতিগর্হিত ও অসদাচরণ দ্বারা যাবতীয় কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়, মূলত সেইসব ভণ্ড ব্যক্তিদের লক্ষ্য করেই প্রহসনখানি রচিত হয়। মু. আ. জ.

অবতার নাচ : বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলের হিন্দু সমাজে প্রচলিত লোকনৃত্য। বাংলা সালের শেষে চড়ক ও গম্ভীরার উৎসবে মন্ত্রপূত মুখোশ পরে এই নৃত্য করা হয়। অবতার নাচের ভাবভঙ্গি বিচিত্র রকমের। দশ অবতারের রূপ ও লীলা প্রকট করাই এ নাচের উপজীব্য। আ. খা.

অবদান/অপদান : বৌদ্ধ সাহিত্যের অংশবিশেষ, যার 'উল্লেখযোগ্য কার্য'। সংস্কৃতে যা অবদান, পালিতে তা-ই 'অপদান' নামে অভিহিত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত অবদানগুলিতে বুদ্ধের অতীত জন্মের নীতি অথবা ধর্ম সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী বিবৃত হয়েছে। জাতকের মতো অবদানও বৌদ্ধ সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং জাতকের সঙ্গে এর সাদৃশ্যও রয়েছে। অবদানের সূচনায় বুদ্ধ কোথায় কোন্ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের কাহিনী

www.pathagar.com

বর্ণনা করেছেন, তার উল্লেখ করা হয়। কাহিনীটির শেষে একটি নীতিবাক্য থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে অবদানের তিনটি অংশ লক্ষ করা যায়—(১) বর্তমান প্রসঙ্গ ; (২) অতীত কাহিনী ও (৩) একটি নীতি। অতীত কাহিনীর নায়ক যদি স্বয়ং বোধিসত্ত্ব হন তবে সেই অবদানকে জাতকও বলা হয়। কোনো কোনো অবদানে বুদ্ধদেব অতীত কাহিনী বর্ণনার পরিবর্তে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। প্রথম পর্বের অবদানগুলিতে হীনযানী ভাবধারা পরিলক্ষিত হলেও পরবর্তীকালের অবদান সাহিত্য পুরোপুরি মহাযানী ভাবসমৃদ্ধ। পালি অপদানের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর বিখ্যাত শ্রাবক-শ্রাবিকাদের ঐতিহ্যমূলক জীবনীগ্রন্থ। তাঁদের বর্তমান জীবনের কর্মকাণ্ড ও পরমার্থলাভ কেমন করে জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-দুষ্কৃতি ফলভোগরূপে গৌতম-পূর্ব একাধিক বুদ্ধের প্রসাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা সম্ভাবিত হয়েছিল, অপদানে তা-ই ধারাবাহিকভাবে পদ্যাকারে বর্ণিত হয়েছে। জাতকের কাহিনীগুলিতে বোধিসত্ত্ব নায়ক এবং বিভিন্ন জন্মে তাঁর কার্যাবলী 'দশপারমী'র পূরণস্বরূপ। অপদানের অতীত বা বর্তমান কাহিনীগুলির সেরূপ কোনো লক্ষণ নেই। কেবল ভূতপূর্ব বুদ্ধদের আন্তরিক সেবা ও তার স্থলে ভবিষ্যৎ জন্মে পরম সৌভাগ্য ও জীবনমুক্তি লাভই অপদানে সংগৃহীত পদ্যাবলীর বিষয়বস্তু। অপদানের রচনা ও শব্দগঠনে স্থানে স্থানে বৈদিকোত্তর সংস্কৃত ভাষার ছাপ পড়েছে। আ. খা.

অবধী : ভারতের অযোধ্যা রাজ্যের ভাষাকে অবধী বা আওয়াধী বলে অভিহিত করা হয়। এ ভাষা পূর্বাহিন্দীর একটি শাখা বলে পরিচিত। পনের শতকের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই এক'শ বছরে ভারতের অন্যান্য এলাকায় যেমন মুসলমান সংস্কৃতি প্রভাবে শিল্পসাহিত্য বিকশিত হয়েছে, আওয়াধ এলাকায়ও তাই হয়েছে। অবধী সাহিত্যে এ সময়েই সম্পদশালী হয়। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবতী' (ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ) এবং তুলসী দাসের 'রামচরিত-মানস' প্রাচীন অবধী সাহিত্যের সম্পদ বলে পরিচিত। ম. মু.

অবধূত : শৈব-ধর্মোপাসক। তাদের সাধন-প্রণালী, আচার-ব্যবহার বিচিত্র। অবধূত তিনিই যিনি একই সঙ্গে ত্যাগ ও ভোগের অনুসরণ করেন। অথচ কোনোটিতেই আসক্ত হন না। সর্বপ্রকার প্রকৃতি বিকারকে তিনি 'অবধূনোর্তি' অর্থাৎ উপেক্ষা করেন বলেই তিনি অবধূত। নানা শ্রেণীর অবধূত সাধকের কথা জানা যায়। যেমন— শৈবাবধতূ, গৃহস্থাবধূত, দ্বিগম্বর অবধূত, পরমহংস অবধূত ইত্যাদি। শৈবাবধূতরা শৈব সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন। তাঁরা বর্ণাশ্রমাচারের অতীত এবং সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত। গৃহস্থাবধূত সস্ত্রীক গার্হস্থ্য জীবন-যাপন করেন। তাঁরা সর্বপ্রকারে শুচি-শুভ্র সাধকের জীবন কামনা করেন। তাঁরা গুরুভক্ত, জ্ঞানী, নিষ্কাম শিবার্চনা-পরায়ণ। তাঁদের পক্ষে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও অবৈধ যৌনাচার বর্জনীয়। দিগম্বর অবধূতরা সর্বভোগী, তাঁরা সর্বজাতির ধর্মকর্মে যোগদান করেন। তাঁরা আহারে-বিহারে স্বাধীন। মদ্যপান, অগম্যাগমন কোনো কিছুই তাঁদের জন্য বারণ নেই। পরমহংস অবধূত ধর্মীয় কোনো বিধিনিষেধের আওতায় আসেন না, তাঁরা শোকমোহশূন্য। আত্মভাব-সন্তুষ্ট নিঃসঙ্গ কর্মত্যাগী। তাঁরা বিবাহ করেন না বা কারও কোনো দান গ্রহণ করেন না। সু. মু.

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রশিল্পী ও সাহিত্য-শিল্পী। ১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র। পারিবারিক পরিবেশে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাহিত্য ও শিল্পকলায় দক্ষতা অর্জন করেন। ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চাও করেন। আর্ট স্কুলের শিক্ষক ইটালিয়ান গিলার্ডি

www.pathagar.com

ও ইংরেজ পামারের কাছে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি এবং জাপানি শিল্পী টাইকানের কাছে জাপানি চিত্রাঙ্কনরীতি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে তিনি শিল্পচর্চা করেন ভারতীয় রীতিতে। তাঁর সারা জীবনের সাধনা ছিল ভারতীয় চিত্রকলার নিজস্ব অবয়ব গঠন ও ভারতীয় শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় রীতিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম হলো কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্রাবলি, বজ্রমুকুট, ঋতু সংহার, বুদ্ধ ও সুজাতা ইত্যাদি। জাপানি রীতিতে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম ওমর খৈয়াম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচর্চা ভারতীয় শিল্পধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর শিল্পাদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি স্থাপন করা হয়। ১৯১৩ সালে লন্ডন ও প্যারিসে এবং ১৯১৯ সালে জাপানে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এইসব প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ভারতীয় চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৮ সালে কলকাতা আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসেবে। ১৯২৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য-শিল্পী হিসেবেও বিশিষ্ট। চিত্রকর্মের মতো তাঁর সাহিত্যকর্মও অনন্যসাধারণ। অনুপম তাঁর গদ্যভঙ্গি। প্রায় সব লেখাই তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্য। কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্য, দুর্লভ খেয়ালিপনা, ভাষার জাদু আর শিল্প কুশলতার চমৎকারিত্বে বড়রাও বিস্ময়াভিভূত হন। তাঁর কোনো কোনো লেখা দেশী-বিদেশী ইতিহাস ও রূপকথার নব রূপায়ণ। যেমন, গৌতম বুদ্ধের গল্প 'নালক' (১৯১৬), রঁস্তাদের লেখা গল্পের নতুন রূপ 'আলোর ফুলকি' (১৯৪৭), লাগারলফের লেখার ছায়ায় টানা 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১)। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই : 'ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), 'ভূতপরীর দেশ' (১৯০৯), রাজকাহিনী (১৯০৯), 'খাজাঞ্চির খাতা' (১৯২১), 'মাসী' (১৯৫৪) ইত্যাদি। ধার করা কাহিনীই হোকা আর নিজের ভেতর থেকে টেনে আনা অভিজ্ঞতার স্মৃতিই হোক—সর্বত্রই তিনি অদ্বিতীয় কথক। চিত্রশিল্পের ওপর তাঁর বই 'সহজ চিত্র শিক্ষা' (১৯৪৬), 'শিল্পায়ন' (১৯৫৫) এবং বড়দের জন্য 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১) অসাধারণ। ১৯৫১ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। সু. ব.

অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি : প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬) রচিত চরিত্রপ্রধান গল্প। ১৩৩৯ সনে ফাল্গুন সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে 'নীললোহিতের আদিপ্রেম' (১৯৩৪) গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্পে অবনীভূষণের চরিত্র-বিশ্লেষণই প্রাধান্য লাভ করেছে। নানা ঘটনা-পরম্পরায় অবনীর চরিত্রের পরিবর্তন হয়। ছাত্রজীবনে সে ছিল সংকল্পে দৃঢ় ও দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত। পরবর্তীকালে তার কর্মস্পৃহা ও পরোপকারের প্রবণতা বিসর্জন দিয়ে নিজের জীবনকে এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডিতে পরিণত করে। অবনীর জীবন শেষ পর্যন্ত এক সর্বনাশের পথে মোড় ফেরায়। জমিদার কামদাপ্রসাদের কন্যার বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সে একদিন কৃষ্ণপুর যায়। বিবাহ-বাসরে বিখ্যাত বাইজি বেনজীরের মুখে একটি মল্লারের ঠুংরি শুনে অবনী বিমুগ্ধ হয়। এতদিন সে তারের যন্ত্রে যে জিনিস পায় নি, স্ত্রীকণ্ঠে সেই রহস্যের সন্ধান পায়। এই পরিবর্তন অবশেষে তাঁকে মদ ধরতে বাধ্য করে। শেষটায় তাঁর এই দশা হলো যে সে শ্যাম্পেনের সাধ ধেনোয় মেটাতে শুরু করে। এদিকে অবনীর চরিত্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীর চরিত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ষোলকলায় ফুটতে থাকে। কিন্তু তাঁর স্ত্রীও একদিন মারা যায়। নিঃসন্তান অবনীভূষণ শেষ পর্যন্ত তন্ত্রসাধনায় দীক্ষা নেয়। সা. আ.

অবন্তী : প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ। এর রাজধানী ছিল শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত উজ্জয়িনী-নগরী। এই রাজ্য বর্তমান মালব ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ জুড়ে বিস্তৃত। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অবন্তী নামক একজন রাজা

www.pathagar.com

উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। কালক্রমে সুবিস্তৃত অবন্তী জনপদ উত্তর ও দক্ষিণ অবন্তী নামে দ্বিধাবিভক্ত হয়। উত্তর অবন্তীর রাজধানীরূপে উজ্জয়িনীই থেকে যায় এবং দক্ষিণ অবন্তীর রাজধানী হয় মাহিষ্পতী-নগরী। উজ্জয়িনীকেন্দ্রিক মূল অবন্তী রাজ্যকে বর্তমানে পশ্চিম মালব বলা হয়। জনপদটির মালব নামকরণ সম্ভবত খ্রিস্টীয় সাত শতকের পরবর্তীকালের ঘটনা। ভারতের ঐতিহ্যে অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী-নগরী সুবিখ্যাত। এর প্রথম কারণ সুপ্রসিদ্ধ মহাকাল-মন্দির এখানেই অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ ইহা বিক্রমসংবতের প্রতিষ্ঠাতা ও কিংবদন্তীবর্ণিত সুবিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। শক ও গুপ্তযুগে উজ্জয়িনী জ্যোতিষবিদ্যাচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও প্রবন্ধের বহুস্থলে অবন্তী ও এর রাজধানী উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে। আ. খা.

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক-জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা : ড. সুকুমার বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে এদেশীয় রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনী। ঘৃণ্য নরপশু এইসব ঘাতক দালালদের কারণেই মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে, হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে, ধর্ষিত ও নির্যাতিতের সংখ্যাও অগণিত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ইতিহাসের নজিরবিহীন গণহত্যার সমর্থন-সহযোগিতায় হত্যা-নির্যাতন-কারীদের কাতারে সামিল হয় এ দেশীয় কিছু ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন, বিশেষ করে ডা. মালিক মন্ত্রিসভার সদস্যদের সহ বেশকিছু বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা এ বিষয়ে ছিলো বহুমুখী। বইটি ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের প্রায় সবক'টি জেলায় শান্তি কমিটি গঠন ও তাদের তৎপরতার বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজাকার, আলবদর ও আলশামস্ বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তানি দোসর রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর তৎপরতার সংবাদ স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে ডা. এ.এম. মালিক ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের তৎপরতার বিষয়টি। পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়টি এবং সবশেষে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাকিস্তানি সামরিক সরকার ও সেনা তৎপরতার খণ্ড চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এই উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুট এবং অত্যাচার-নির্যাতনের সঙ্গে তাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বইটিতে এমন অনেক দুর্লভ আলোকচিত্র পাওয়া যাবে যার মধ্য দিয়ে বর্তমান এবং আগামী প্রজন্ম পাকিস্তানি দোসরদের চিহ্নিত করার সুযোগ পাবেন। জো. না.

অবরোধবাসিনী : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সর্বশেষ প্রকাশিত বই "অবরোধ-বাসিনী"। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, পাঞ্জাব, দিল্লী ও আলিগড়ের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারের (সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ঘটনাও আছে) পর্দার নামে অবরোধের অমানবিক কতগুলো ঘটনার বর্ণনা আছে এ গ্রন্থে। রোকেয়া নিজে এগুলোকে 'ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসিকান্না' বলে অভিহিত করেছেন। আর ড. লায়লা জামান 'নকসাধর্মী' ও মোতাহার হোসেন সুফী 'চিত্রধর্মী" রচনা বলেছেন। এতে এরকম মোট ৪৭ টি 'ঘটনার হাসিকান্না' চিত্র অথবা নকসা আছে। নকসাগুলো কলকাতার মাসিক মোহাম্মদীর মহিলা মহফিলে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৯২৮-১৯৩০) ১৯৩১ সালে এগুলো 'অবরোধবাসিনী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বই এর নিবেদনে রোকেয়া লিখেছেন, 'আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি।

www.pathagar.com

উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের সাগর তীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি, আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজ সেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।' রোকেয়ার এ বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় সে সময়কার মুসলমান সমাজের অবস্থা। **মা. সা.**

অবলাকান্ত মজুমদার : কবি ও নাট্যকার। জন্মস্থান যশোর জেলার ব্রহ্মপুর গ্রাম, জন্ম তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২। পিতা কবি রজনীকান্ত মজুমদার। বিএসসি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে যশোর সাহিত্য সংঘের সংগঠক ও সম্পাদক হন। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ 'নাট্যভারতী' ও 'কবিভূষণ' উপাধি লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য কাব্য : মধুগীতি, সুরভি, মন্দাকিনী, কাত্যায়নী ইত্যাদি। নাটক : মহাকবি মধুসূদন, রাজা সীতারাম রায়, হিরন্ময়ী, জীবন প্রদীপ, আত্মোৎসর্গ, সমরশিখা, মুক্তেশ্বরী, কর্মবীর শিশিরকুমার ইত্যাদি। কয়েকটি প্রবন্ধের বই : প্রদীপ, ইন্দ্রধনু, মহত্ত্বমন্দির, দেশপ্রাণ ইত্যাদি। **কা.রো.**

অবহট্ঠ : অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ (অপভ্রষ্ট) প্রায়ই সমার্থক শব্দ। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ যাকে লৌকিক বলেছেন, গ্রীয়ার্সন তাকেই বলেছেন অপভ্রংশ, আবার অপভ্রংশেরই অপর নাম অবহট্ঠ (<অপভ্রষ্ট)। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) সংস্কৃত শাস্ত্রবানের ভাষা এবং অপভ্রংশ শাস্ত্রহীনের ভাষা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই পতঞ্জলির কাছে 'দেবদত্ত' শুদ্ধ 'দেবদিন্ন' অশুদ্ধ, 'বর্দ্ধুতে' ব্যবহার্য 'বড়ঢতি' অপাঙ্‌ক্তেয়। প্রাকৃত বৈয়াকরণরা 'অপভ্রংশ' নামকরণে পতঞ্জলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যে সর্বজনীন রূপটি লোকসাহিত্যের বাহক হয়ে উঠেছিল তাই প্রাচীন অপভ্রংশ। প্রাচীন অপভ্রংশের যে অর্বাচীন রূপটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার অব্যবহিত পূর্ব অবস্থা তা-ই অর্বাচীন অপভ্রংশ বা লৌকিক বা অবহট্ঠ। সুকুমার সেন অর্বাচীন অপভ্রংশকে অবহট্‌ঠ নাম দিয়েছেন। অবহট্ঠের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে প্রথমার একবচনে বিভক্তিহীনতা অথবা 'উ' (< প্রাকৃত 'ও') বিভক্তি ; শব্দ-ও ধাতুরূপে নিতান্ত সরলতা ; ক্ষুদ্রার্থক 'ইক' প্রত্যয় হতে নতুন করে স্ত্রীলিঙ্গের উৎপত্তি ; শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদের বিভিন্নকালের অর্থে ব্যবহার। ষষ্ঠীর একবচনে 'হ' বিভক্তি ; স্বার্থিক প্রত্যয়ের প্রাচুর্য, সংস্কৃতের প্রভাবহীনতা ; পূর্বে অপ্রাপ্ত শব্দের ও ধাতুর প্রচলন ইত্যাদি। **ম. মু.**

অবিদ্ধকর্ণ : নৈয়ায়িক ও টীকাকার। ড. মহেন্দ্রকুমার জৈন প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন অবিদ্ধকর্ণ নামে দু'জন দার্শনিক ছিলেন। একজন ৬২০-৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বর্তমান ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক এবং ন্যায়ভাষ্যের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার ছিলেন। প্রখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত শান্তরক্ষিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তাঁর অনেক মত খণ্ডন করেন। কমলশীলের মতে তাঁর গ্রন্থের নাম 'তত্ত্বটীকা'। অপর একজন অবিদ্ধকর্ণ ৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বর্তমান ছিলেন। তিনি 'চার্বাকমতানুগামী', 'পুরন্দরসূত্র' গ্রন্থের রচয়িতা। **আ. ই.**

অবিনাশ চন্দ্র দাস : লেখক ও সাংবাদিক। জন্মস্থান কোতলাপুর, বাকুড়া, জন্ম সাল ১৮৬৭। পিতা হরিনাথ দাস। এম.এ. এবং বি.এল. পাশ করার পর ১৯২০ সালে পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। বৈদিক ইতিহাসে তিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'স্বদেশ' নামে একটি পত্রিকা পরিচালনা করেন। এছাড়া তাঁর সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সাহিত্যিক হিসেবেও সুনাম অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী-কথাসাহিত্য : পলাশ বন, অরণ্যবাস, কুমারী ও সীতা। নাটক : প্রভাবতী ও দেবব্রত। বৈদিক ইতিহাস : Rig-Vedic India ও Rig-Vedic Culture. ১৯৩৬ সালে তিনি মারা যান। **আ. জ.**

www.pathagar.com

অবিনাশ সাহা : জন্মস্থান ঢাকা জেলার সাভার। জন্ম তারিখ ২৪ ভাদ্র ১৩২৯। পিতা-মহেনচন্দ্র সাহা। প্রাথমিক শিক্ষা-স্বগ্রামের অধর চন্দ্র উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ডাক্তারি পড়তে কলকাতায় আসেন, কিন্তু পড়া এগোয়নি। তখন সাহিত্য সৃষ্টিতেই আত্মসমর্পণ করেন। প্রবর্তক, নবশক্তি, সংহতি প্রভৃতি কাগজে প্রথমে কবিতা প্রকাশ হতে থাকে। ১৯৩৬ সালে প্রথম কবিতার বই 'পূর্বোত্তর' বেরোয়। এ সময় 'অত্রি' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ১৯৫০ সালে কাহিনী কাব্য 'তরঙ্গ' বের হয়। কিন্তু অবিনাশ সাহা মূলত একজন কথাশিল্পী। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি উপন্যাসেই রূপ দিয়েছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : কামনার বহ্নিশিখা (১৯৪৩), প্রিয়া ও পরকীয়া (১৯৪৪), নিশার স্বপন (১৯৪৫), জয়া (১৯৪৫), অন্তরাল, লীলালিপি, প্রাণগঙ্গা ইত্যাদি। আ.জ.

অবিনির্মাণ : সমকালীন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি তাত্ত্বিক পরিভাষা 'অবিনির্মাণ' (Deconstruction)। অবিনির্মাণ বলতে সাধারণত কোনো রচনার (text) নিবিড় গভীর পাঠ বোঝায়। আন্তরাচনিক পদ্ধতিতে বিষয় পরিচর্যার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মনে করা হয়, যে-লেখাই হোক না কেন তাতে সমধর্মী, যৌক্তিক অর্থের পরিবর্তে থাকে পরস্পর বিপরীতধর্মী নানা অর্থ। অবিনির্মাণ বলতে তাই কখনো পারস্পরিক বা বিপরীতধর্মী বয়ান (discourse) বা বহুত্ববাচক, সংঘর্ষসংকুল বর্ণনাশৈলীর (narrative) অর্থগত ও ভাষাগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বোঝায়। অবিনির্মাণের স্রষ্টা ও প্রবক্তা ফরাসি দার্শনিক জাঁক দেরিদা। দেরিদা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমী সংস্কৃতিতে মানুষ দ্বিমুখী বৈপরীত্যের (binary opposition) মাধ্যমে তাদের ভাবনাচিন্তাকে প্রকাশ করে থাকে। যেমন শাদা/কালো, নারী/ পুরুষ, শুরু/ শেষ, চেতন/অবচেতন, উপস্থিত/অনুপস্থিত, কথন/ লিখন ইত্যাদি। দেরিদা বলেন, ভাবনাচিন্তনের এই দ্বার্থক (dichotomy) ব্যবহারকে সহজ-সরল করে দেখার কিছু নেই। বিপরীতধর্মী এসব ভাবনা আসলে মানুষের ভেতরে বদ্ধমূল হয়ে থাকা গভীর ব্যাপক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিরই ছোট ছোট সংস্করণ। এরই প্রভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতি নিজেদের সংস্কৃতিকে হাঁ-ধর্মী ও শ্রেষ্ঠ আর অন্যদের (গরীব তৃতীয় বিশ্বের) সংস্কৃতিকে ভাবে না-ধর্মী ও নিকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠত্বের এই ভাবনাই তাদের শাসক ভাবতে শিখিয়েছে, অন্যদের মনে করেছে সবসময় শাসিতই থেকে যাবে। দেরিদা বলেন, এভাবে অনুপস্থিতির (absence) পরিবর্তে উপস্থিতি (presence), লিখনের (writing) বদলে কথনকেই (reading) গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। দেরিদা অবিনির্মাণের মাধ্যমে দার্শনিকতার দ্বারা সমর্থিত পশ্চিমী আধিপত্যবাদী এই ভাবনা ও কাজকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। তিনি প্রতিস্পর্ধী ভাবনা উপস্থাপন করেছেন। তবে বৈপরীত্যকে আবার অন্য এক বিপরীত দিয়ে (যেমন শাদা/কালোকে কালো/শাদা) এই সমস্যার সহজ সরল সমাধান টানতে চাননি। তাঁর মতে এটা করা হলে তা হয়ে উঠতো একটা চমৎকার ফাঁদ থেকে অন্য আর একটা ফাঁদে পা দেয়ার নামান্তর। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য হলো বৈপরীত্যের সীমান্য মুছে ফেলা, শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টতার বিপরীতধর্মী ভাবনাচিন্তাকে উপড়ে ফেলা। দেরিদা লক্ষ্য করেছেন, বক্তার উপস্থিতির কারণে উচ্চারিত ভাষাকে উপস্থিতি এবং অবশ্যম্ভাবী আদর্শ অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয়েছে। একে মনে করা হয়েছে হাঁ-ধর্মী। অন্যদিকে লেখক নেপথ্যে থাকার কারণে লিখিত রচনাকে মনে করা হয়েছে না-বাচক, অনুপস্থিতজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। লিখিত রচনা তাই ঠিক ঠিক অর্থ দেয় না। এই যে উচ্চারিত ভাষা ও উপস্থিতিকে গুরুত্ব দেয়া-এটাই পশ্চিমী অর্থকেন্দ্রিকতার (logocentrism) মূল কথা। দেরিদা রচনার পুরুষকেন্দ্রিক (phallocentricism) আরও একটা অর্থ আছে

www.pathagar.com

বলে উল্লেখ করেছেন, যা অর্থকেন্দ্রিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। পুরুষকেন্দ্রিক এই অর্থের অন্তর্নিহিত বক্তব্য হচ্ছে, ঈশ্বর আলোর স্রষ্টা, পৃথিবীর স্রষ্টা এবং নারীর আগে তিনি পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষের পাঁজর থেকে নারী সৃষ্টি। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জনক সোস্যুরের চিহ্নতত্ত্বকে বিনির্মাণ তত্ত্বে ব্যবহার করেছেন দেরিদা। সোস্যুর উচ্চারিত ভাষাকে উপস্থিত, অবশ্যম্ভাবিতা ও আদর্শ অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখেছেন। অন্যদিকে লিখিত রচনাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে অনুপস্থিত, অস্পষ্ট ছবির সঙ্গে। ফলে বলা হয়েছে লিখিত রচনা বিশ্বাসযোগ্য বা ঠিক ঠিক অর্থ প্রকাশের উপযুক্ত নয়। লিখিত রচনার অর্থ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্ধিগ্ধ হতে পারি না। দেরিদা বলেন, সোস্যুর-কথিত চিহ্ন (sign) আসলে কোনো বস্তুর 'উপস্থিতির ইঙ্গিত' দেয় মাত্র, যে বস্তুটাকে নির্দেশ করা হয় (signified) সেই বস্তু কখনোই বাস্তবে উপস্থিত থাকে না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি নির্দেশিত ধারণা আসলে আমাদের অনিঃশেষ ধারণাপ্রবাহের মধ্যে বিরাজমান এক-একটি 'অন্য' (other) হিসেবেই উপস্থিত রয়েছে, অন্যকেই তা নির্দেশ করছে। ফলে যে অর্থ ভাষার দেয়ার কথা তা স্থগিত (defer) থেকে যাচ্ছে। কেননা ভাষা বস্তু নয়, বস্তুকে তা নির্দেশ করে মাত্র। স্থগিত হয়ে যাওয়া এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই দেরিদা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ভাষা একই সঙ্গে যেমন বস্তুপার্থক্যকে নির্দেশ করে, তেমনি আবার অর্থকেও স্থগিত করে দেয়। এই ব্যাপারটি বোঝাবার জন্যে দেরিদা একটি ফরাসি শব্দ ব্যবহার করেছেন–différance। শব্দটির মূলে রয়েছে একটি ফরাসি ক্রিয়া différer, যা 'পার্থক্য' অথবা 'স্থগিত হওয়া'–দুই অর্থই দেয়। দেরিদা বলছেন, শব্দ এভাবে দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, শব্দ যে বস্তুকে বোঝাতে চায় তার উপস্থিতিকে নির্দেশিত করে। দ্বিতীয়ত, অন্য শব্দের তুলনায় পৃথক বলে তা ভিন্ন অর্থ দেয়। différance শব্দটি আবার ফরাসি নামপদ différence হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ 'পার্থক্য'। অর্থাৎ différance ও différence এই দুটি শব্দের a-কে e অথবা e-কে a করে দিলেই তাদের অর্থ একেবারে বদলে যায় ; কিন্তু তাদের উচ্চারণে কোনো পার্থক্য ঘটে না। দেরিদা এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, উচ্চারিত ভাষাকে পশ্চিমা দার্শনিকরা এতদিন যে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন, তা অর্থহীন। কথিত ভাষার তুলনায় লিখিত ভাষার গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। অর্থ অনুসন্ধানের জন্যে তাই ভাষাকে নানা দিক থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হবে। পাঠ্যবস্তুকে ব্যাখ্যা করতে হবে স্বাধীনভাবে। বিশেষ করে লেখক যা বলতে চেয়েও ভাষায় প্রকাশ করতে পারেননি, সেই অকথিত, অব্যাখ্যাত প্রসঙ্গকে লেখকের রচনার উপর ভিত্তি করেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্থাৎ দেরিদা একটি রচনায় যে প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় তার পরিবর্তে যা অনুল্লেখিত থেকে গেছে তার বিশ্লেষণে আগ্রহী হওয়ার জন্যে পাঠকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দেরিদার বিশ্লেষণ-রীতি তাই যা লেখা হয়েছে তার ব্যাখ্যামাত্র নয়, বরং লেখকের সীমাবদ্ধতার কারণে যে প্রসঙ্গ অনুক্ত বা অনুল্লিখিত থেকে গেছে তারও বিশ্লেষণ। ফলে, দেরিদার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের রীতিপদ্ধতিকে বিনির্মাণ (reconstruction) না বলে অবিনির্মাণ (deconstruction) বলা হয়েছে। এই অবিনির্মাণের অর্থ তাই শুধু বিশেষরূপে নির্মাণ নয়, বিশেষরূপে অনির্মাণের নির্মাণ। দেরিদা লক্ষ্য করেছেন, সমগ্র পশ্চিমী দর্শন আধিদৈবিক দ্বারা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আক্রান্ত। লেখকদের রচনাও তা থেকে মুক্ত নয়। অবিনির্মাণের লক্ষ্য তাই শুধু ভাষা নয়, আধিদৈবিক দর্শন যাতে ভাষাকে সংকীর্ণ করে না ফেলে ভাষাকে তা থেকে মুক্ত করাও এর লক্ষ্য। অর্থাৎ অবিনির্মাণ দর্শন ও সাহিত্যকে একাকার করে ফেলতে চায় না। রচনার মধ্যে কী নেই, কী বাদ পড়লো, কী-কী প্রসঙ্গে বেশি বলা হলো--সে-

www.pathagar.com

সবও দেখতে চায়। অবিনির্মাণের স্বভাব হচ্ছে মিতালি/সংঘর্ষের। এই রীতিটি 'সবকিছু ধূলিসাৎ করে না, বহুবিভাগ করে না, যা সত্তাকে অস্তিত্ববোধ দিচ্ছে সেখানে প্রশ্ন তোলে' (গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক)। তাকে বিনির্মাণ করে। ইতিবাচক এই অবিনির্মাণের মূল কথা হচ্ছে : "পাঠ্যের আন্তরিক নিয়ম ঘনিষ্ঠভাবে সযত্নে অনুশীলন করে, সেই নিয়ম অনুযায়ী সেই সূত্রাবলির সূত্র, সেই গ্রন্থের গ্রন্থিকে নতুন বোনায়, নতুন পড়ায়, নতুন লেখায় ব্যবহারযোগ্য করে। এই জন্যেই অবিনির্মাণ বলে সবই টেক্‌সচুয়াল নয় বরং টেক্‌সটাইল। লাতিন 'টেক্সেরে' মানে তাঁতে বোনা,-গ্রন্থি দিয়ে গ্রন্থ, সূত্র দিয়ে শাস্ত্র" (গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক)। ড. মা. জা.

অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া : সম্পাদনা মইনুল হোসেন। ইত্তেফাক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা থেকে স্মারক গ্রন্থটি ১ জুন ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রধানত ১৯৭৩ সালের ইত্তেফাক তফাজ্জল হোসেন স্মৃতি সংখ্যায় মুদ্রিত এবং পুনঃমুদ্রিত লেখাগুলোই সংকলিত হয়েছে। সৎ, সাহসী ও সত্যভাষী সাংবাদিক হিসেবে মানিক মিয়া জীবদ্দশায় এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ইত্তেফাকের পাতায় মোসাফির ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' ও 'রঙ্গ-মঞ্চ' লিখে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এ দেশের প্রতিটি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। এ গ্রন্থে মানিক মিয়ার ওপর বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিদগ্ধজনের ২২টি লেখা মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া মোসাফিরের ডায়েরি থেকে, তিনটি মৃত্যু সম্পর্কে মোসাফির, একটি উদ্বোধনী ভাষণ, একটি ছাত্র সভায় প্রদত্ত ভাষণ, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মোসাফিরের সেই কালজয়ী কলাম থেকে, পল্টন থেকে সেক্রেটারিয়েট, সহযোগী সংবাদপত্রের চোখে, নিজের গড়া জীবন--শীর্ষক দশটি আলোচনার আটটির রচয়িতা তফাজ্জল হোসেন। বিশিষ্ট লেখকদের তালিকায় রয়েছেন—শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, রণেশ দাশগুপ্ত, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মাহবুব-উল-আলম, আহমেদ হুমায়ূন, আবদুল হাফিজ, মোহাম্মদ মাহফুজুউল্লাহ, আবদুস সালাম, ওবায়েদ উল হক, জহুর হোসেন চৌধুরী, সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য সংযোজন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'আমার মানিক ভাই' শীর্ষক লেখাটি। মানিক মিয়ার কাজের স্বীকৃতি এবং মূল্যায়নে বঙ্গবন্ধুর লেখাটি পাঠককে কৌতূহলী করে তুলবে। রচনার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো : "একটা বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত ছিলাম। এবং তা হলো, বাংলার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ভিন্ন বাঙালির মুক্তি নেই, এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না। আর ছিল না বলেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও দু'জন দু'ফ্রন্টে থেকে কাজ করেছি। আমি কাজ করেছি মাঠে-ময়দানে আর মানিক ভাই তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে।" শা. আ.

অবেলায় অসময়—আমজাদ হোসেন : বইটি প্রকাশ করেছে সঞ্চিতা প্রকাশনী। প্রকাশকাল : নভেম্বর ১৯৭৫। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একদল মানুষের ভয়ার্ত ভাসমান জীবনের কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস। একটি নৌকায় অনেকগুলো মানুষের সাথে সদ্যবিবাহিত এক দম্পতির মনুষ্যাকৃতি পাকিস্তানী শ্বাপদে আক্রান্ত জনপদ থেকে মুক্তির পথে অনির্দেশ্য যাত্রার বর্ণনায় উপন্যাসের শুরু। এই দম্পতির নববধূটি বাসররাতে গুলিবিদ্ধ হয়। পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণে গ্রামছাড়া আলী মাঝির হাতে এই উদভ্রান্ত মানুষে বোঝাই নৌকার বৈঠা। সে নিজেও হানাদার আক্রান্ত এক বিপর্যস্ত গাঁয়ের সর্বস্বহারা মানুষ। তার নৌকায় ঘাট-অঘাট থেকে ঠাঁই নিয়েছে সন্তানহারা মা বাবা, আহত দম্পতি, রোগী, শিশুসহ অসহায় মা

www.pathagar.com

এবং বিপন্ন অনেক মানুষ। নৌকার ভেতরে ভয়, ক্ষুধা, ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় এ মানুষদের মধ্যে ছোট-বড়, জাত-বেজাত বংশমর্যাদা, দাপট—কিছুই নেই। বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষ সবকিছু ভুলে শুধু মানুষ হিসেবে একে অপরের সাথে মিশে বেঁচে থাকবার চেষ্টায় রত। এই বিড়ম্বিত মানুষের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা বেদনার ইতিহাস ও ভয়াবহ সর্বনাশের কাহিনী আছে। এদের নিয়ে আলী তার নৌকা ভেড়ায় বহু দূর-দূরান্তের অচেনা ঘাটে, কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের সকল জনপদেই কমবেশি একই দুর্দশার চিত্র। অভিন্ন আতংকে সবখানেই বিবর্ণ মানুষ, পশুপ্রায় মনুষ্যজীবন নিয়ে তারা ক্রমাগত পালিয়ে বেড়াচ্ছে স্থান থেকে স্থানান্তরে। দীর্ঘ দুঃসহ জলযাত্রায় মরিয়া হয়ে একসময় প্রায় সকলে একমত হয়ে যখন নৌকার আশ্রয় ছেড়ে পায়ে হেঁটে সীমান্ত পার হতে উদ্যোগ নেয়, তখনই মূর্তিমান মৃত্যুদূতের মতো একদল মিলিটারি নৌকায় ওঠে। তারা উঠবার আগে আলী মাঝি ছাড়া বাকি সকলে পাটাতনের নিচে লুকিয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে মিলিটারিদের আলী চার ঘণ্টার নদীপথ পার করে ভিন্ন গ্রামে পৌঁছে দেয়। ততক্ষণে পাটাতনের নিচে মারা গেছে আহত নবপরিণীতা সাকিনা, একটি অবুঝ শিশু কেঁদে উঠতে চাইলে সকলের জীবনের মূল্যে শিশুটির মা নিজ সন্তানকে গলা টিপে মেরেছে ; কাশির রোগী পচা সকলের নিরাপত্তার জন্য কাশি বন্ধ রাখতে নিজেই তীব্র শক্তিতে টিপে ধরেছে নিজের গলা—পরিণামে মৃত্যু। লাশগুলোকে নিরুপায় নদীতে ভাসিয়ে আবারও কয়েকদিন ভেসে ভেসে একটি সবুজ গ্রামে পৌঁছানোর মুখে সে গ্রামটিকেও সহসা আক্রান্ত হতে দেখে অন্যদিকে নৌকার মুখ ঘোরায় আলী। কিন্তু প্রবল মৃত্যুভয়ে তাড়িত বেশকিছু মানুষ তবু উঠে পড়ে নৌকায়। আবারও সন্ত্রাসতাড়িত, গোলাবারুদের শব্দ আর আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়ায় অস্পষ্ট, মানুষের হাহাকার আর গলিত লাশের দুর্গন্ধে দুঃসহ জনপদ দু'পাড়ে রেখে একদল বিধ্বস্ত মানুষ নিয়ে অনির্দেশ্য অচেনার দিকে যাত্রা করে আলীর নৌকা। নির্দিষ্ট পরিণামমুখী কাহিনীবিন্যাস এতে নেই, তবে উপন্যাসটি সূত্রবদ্ধভাবে অনেকগুলো কাহিনীর সমাহারে পাঠককে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ধরে রাখে। এ কাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতার চিত্র। র. আ. ক.

অবোধ-বন্ধু : উনিশ শতকের একটি উল্লেখযোগ্য মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি ১২৭৩ সনের ফাল্গুন মাস (১৮৬৬ সাল) থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পরে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। 'অবোধবন্ধু'র প্রথম প্রকাশ অবশ্য ১৮৬৩ সালে হয়, তবে তা নিয়মিত ছিল না। পত্রিকার অনেকগুলো রচনা ইংরেজি গ্রন্থ ও ইংরেজ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত হয়। 'অবোধবন্ধু'র অনেক রচনা বালক পাঠ্যের উপযোগী নয়। যেমন, 'অপূর্ব পতন', 'পতির অত্যাচার', 'সংসার', 'বিরহিনী', 'বঙ্গসুন্দরী' ইত্যাদি কবিতাবলী। পত্রিকার সম্পাদক বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। কবির 'সুরবালা' কাব্যের কিছু অংশও এতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বিষয়াবলী 'অন্ত:পুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যূহের' অধিগম্য হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। এ পত্রিকা তিন বছর চলে। 'অবোধবন্ধু'তে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চরিতকথা, গল্প, কবিতা ও গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি বালক চিত্ত ও আকর্ষণে অবশ্য একেবারে ব্যর্থ হয় নি। 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশিত মূল ফরাসি থেকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকৃত বিলেতি পৌল বর্জিনী গল্পের সরল বঙ্গানুবাদ পড়ে 'জীবন স্মৃতিতে' ব্যক্ত কিশোর রবীন্দ্রনাথের চিত্তহরণজনিত ভাবোচ্ছ্বাস তাৎপর্যহীন নয়। আসলে এ পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশুর মনোরঞ্জন ও শিক্ষাদান। সা.আ.

অব্যক্ত : বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রচিত প্রবন্ধ সংকলন। এই গ্রন্থটি

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে, আশ্বিন মাসে। এতে অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণ ইত্যাদি ২০টি প্রবন্ধ হচ্ছে : (১) যুক্ত কর, (২) আকাশ স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ, (৩) গাছের কথা, (৪) উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু, (৫) মন্ত্রের সাধন, (৬) অদৃশ্য আলোক, (৭) পলাতক তুফান, (৮) অগ্নি পরীক্ষা, (৯) ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে, (১০) বিজ্ঞানে সাহিত্য, (১১) নির্ব্বাক জীবন, (১২) নবীন ও প্রবীণ, (১৩) বোধন, (১৪) মনন ও করণ, (১৫) রাণী-সন্দর্শন, (১৬) নিবেদন, (১৭) দীক্ষা, (১৮) আহত উদ্ভিদ, (১৯) স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ, এবং (২০) হাজির। যশস্বী এই বিজ্ঞানী সাহিত্যকর্মেও যে কতখানি সাবলীল ও দক্ষ ছিলেন তা সংকলন গ্রন্থটির প্রতিটি রচনায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ভাষার লালিত্য ও সুপ্রযুক্ত শব্দাবলি ছাড়াও জগদীশচন্দ্রের রচনার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, ভাবনার স্বচ্ছতা এবং অনবদ্য সরস ভাষাভঙ্গি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য যে অতি চমৎকারভাবে সহজবোধ্য ভাষায় পরিবেশিত হতে পারে জগদীশচন্দ্র বসুর এই প্রবন্ধগুলি তারই নিদর্শন। রচনার প্রসাদগুণে এসব প্রবন্ধ কালোত্তীর্ণ সাহিত্যরূপে পরিগণিত। তবে তত্ত্ব ও তথ্যের অসাধারণ সুনিপুণ উপস্থাপনই 'অব্যক্ত' বইটির শেষ কথা নয়। এই প্রবন্ধগুলিতে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের দেশ-কাল-সমাজভাবনাও গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। বইটির ভূমিকাস্বরূপ কথারম্ভে তিনি লিখেছেন, 'মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সেই ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল।' 'অব্যক্ত' ভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনার বহুবিধ বিষয় যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি তাতে বিধৃত হয়েছে জড়জগৎ ও জীবজগতের চমকপ্রদ নানা কথা। তাঁর নিজের ভাষায় 'চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত, তাহার দুই-একটি কাহিনী বর্ণিত হইল।' ***সু. ব.**

অব্যয় পদ : বাংলা ভাষায় অনেকগুলো শব্দ আছে যেগুলোর কোন পরিবর্তন হয় না এবং বিশ্লেষণ করা যায় না—এই শব্দগুলোকে অব্যয় বলে। অব্যয়গুলো কখনও দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্যের সংযোগ, বিয়োগ বা সম্বন্ধ নির্ণয় করে, কখনও হাঁ, না ইত্যাদি ভাবের অভিব্যক্তি ঘটায়, কখনও বাক্যের অলঙ্কার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—ও, এবং, আর, আবার, তাই, তো, হাঁ, না, হঠাৎ, বরং, অর্থাৎ, বা, অথবা, বস্তুত, যথা-তথা, যেমন-তেমন, আলবৎ, নিশ্চয়, খুব, শাবাশ, খাসা নয়, হয়ত, বেশ বেশ, ছি ছি, আচ্ছা, তাই নাকি, যেহেতু-সেহেতু, হায় হায়, কিংবা, বটে, শন্‌শন্‌, মর্‌মর্‌, গর্‌গর্‌, অতি, অন্য, অপর, অন্তত, কি ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয় পদ—পুকুরের ঐ কাছে না ! লিচুর এক গাছ আছে না ! গাছে গে যেই চড়েছি। আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা ভেলটা দাঁড়িয়ে হোআ। দেখে যেই আঁৎকে ওঠা কুকুরও জুড়লে ছোটা। ঠাসঠাস, দ্রুম দ্রাম শুনে লাগে খটকা, হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল সাদাকে বলেছিস লাল? বাপরে কি ডানপিটে ছেলে। অব্যয় তিন প্রকার : সমুচ্চয়ী, অনন্বয়ী ও অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বা কারক অব্যয়। অর্থানুসারে সমুচ্চয়ী অব্যয় ছয় প্রকার : সংযোজক, বিয়োজক, সংকোচক, অনুকার, হেতুবোধক, প্রশ্নসূচক। **শি.প্র.লা.**

অব্যয়ীভাব সমাস : যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয় এবং অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য লাভ করে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। এ সমাসের ব্যাসবাক্যে অব্যয়টিকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অব্যয়টির ব্যাখ্যামূলক বা অর্থবোধক শব্দ। যথা—কূলের সমীপে-উপকূল, দিন দিন-প্রতিদিন ইত্যাদি। সামীপ্য, অনতিক্রম, বীপ্সা, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, অভাব, পর্যন্ত, পশ্চাৎ প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা—

www.pathagar.com

(ক) সামীপ্য – কূলের সমীপে = উপকূল। (খ) বীপ্সা – জন জন = প্রতিজন। (গ) যোগ্যতা – রূপের যোগ্য = অনুরূপ। (ঘ) সাদৃশ্য – বনের সদৃশ = উপবন। (ঙ) অভাব– মিলের অভাব = গরমিল। (চ) পর্যন্ত – কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ। (ছ) পশ্চাৎ – পশ্চাৎ গমন = অনুগমন। (জ) ক্ষুদ্রতা – ক্ষুদ্র নদী = উপনদী। (ঝ) অনতিক্রম্যতা – বিধিকে অতিক্রম না ক'রে = যথাবিধি। (ঞ) অতিক্রম – বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল। (ট) সামান্য–ঈষৎ নত = আনত। (ঠ) বিভিন্ন অর্থে – অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ। **শি.প্র.লা.**

অভয়াকর/অভয়ঙ্কর গুপ্ত : বাংলা পালবংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। গৌড়নগরে জন্ম। কারও কারও মতে অভয়াকর ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ঝারিখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। অভয়াকরের পিতা ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং মাতা ছিলেন ব্রাহ্মণী। শৈশবে ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি অধ্যয়নের পর যৌবনে তিনি বেদ–বেদান্তে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ অহর্তের সাহচর্যে এসে অভয়াকর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। কয়েক বছর নালন্দায় অবস্থান এবং তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করে এক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দায় অধ্যাপনার পর তিনি বিক্রমশীল বিহারের অন্যতম আচার্য নিযুক্ত হন। রামপালের (১০৯১–১২০৬) সমসাময়িক এই প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী বৌদ্ধ পণ্ডিত কালচক্রযান সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'যোগাবলী', 'মর্মকৌমুদী' ও 'বোধিপদ্ধতি' এই তিনখানির নাম জানা যায়। বিক্রমশীলায় অধ্যাপনার সময় অভয়াকর প্রজ্ঞাপারমিতার এক মূল্যবান টীকা রচনা করেন। প্রজ্ঞাপারমিতার জন্য তিনি 'শাক্যমতালঙ্কার', অভিধর্মের জন্য 'লোকসংক্ষেপ', বিনয়ের জন্য 'ভিক্ষু বিদ্যা–তিলক' এবং মধ্যমিকার জন্য 'মধ্যমামঞ্জরী' রচনা করেন। রামপাল প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারের (উত্তর বঙ্গ) পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র অভয়াকরের দু'–তিনটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করায় তিনি তিব্বতে একজন 'পাঞ্জেনরিণ পৌছেই' অর্থাৎ রাজগুণালঙ্কৃত লামারূপে শ্রদ্ধা পান। তিনি প্রায় ২০ খানি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। রামপালের রাজত্ব–কাল অবসানের পূর্বেই অভয়াকরের মৃত্যু হয়। **আ. খা.**

অভয়ামঙ্গল : অভয়ামঙ্গল–মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডী আখ্যায়িকা–কেন্দ্রিক। কাব্যগুলো চণ্ডীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল নামেও পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেব চণ্ডী আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচনা করেন 'অভয়ামঙ্গল'। কবির পিতার নাম কবিচন্দ্র। পাঁচালী রচনাকাল ইন্দুবাণ ঋষিবাণ বেদ সম জিত/রচিলেক রামদেবে সারদাচরিত।' অতএব গ্রন্থ রচনাকাল ১৬৫৩ সাল, মতান্তরে ১৬৫৭–৫৯ সাল। দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলে দ্বিজ মাধবের সারদাচরিত্রের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদসত্ত্বেও তাঁর কাব্যটির স্বাতন্ত্র্য আছে। বিশেষ করে তিনি বহু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ও ধুয়া সংযোজন করে কাব্য খানিকে অধিকতর গীতিময় রূপদান করেছেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র অপর নাম অভয়ামঙ্গল। **আ. জ.**

অভয়ের বিয়ে : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত প্রণয়সংঘাতময় উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৩১ সাল। অভয় সংসার সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ ও আত্মভাববিহ্বল। তার সঙ্গে মায়া ও সরমা দুই বোনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। উভয় বোন অভয়কে দাবি করে। কিন্তু এই জটিলতা মোচনের জন্য সরমা অভয়ের প্রতি নিজের দাবি প্রত্যাহার করে মায়ার পথ নিষ্কন্টক করে। তারপর কাহিনী নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। শেষ পর্যন্ত সরমা মায়ার পরিত্যক্ত প্রণয়ী অজয়কে পতিরূপে গ্রহণ করে। সরমা ও মায়ার চরিত্রবিশ্লেষণে মনস্তত্ত্বের পরিচয় আছে। অ.ন.

অভাগীর স্বর্গ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সমাজচেতনা প্রসূত গল্প। ১৩২৯ সনের মাঘ

www.pathagar.com

সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে 'হরিলক্ষ্মী' (১৯২৬) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের কাহিনীতে প্রাধান্য লাভ করেছে স্বামিপরিত্যক্তা অভাগীর ব্যক্তিগত জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এ কাহিনীতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ জমিদার-গিন্নীর আড়ম্বরপূর্ণ শবদাহের দৃশ্য দেখে বাউড়ির মেয়ে কাঙালির মা অভাগীও তার মৃত্যুর পর সেরূপ চিতাশয্যা কামনা করে। নিষ্করুণ দারিদ্র্যের মধ্যে অনশনক্লিষ্টা নারীর জীবনের এই শেষ প্রার্থনার মধ্যে তার স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছাটাও প্রকাশিত হয়। ছেলের কাছে অভাগী তার অন্তেষ্টিক্রিয়ায় জমিদার-গিন্নীর চিতাশয্যার মতো উচ্চবর্ণসুলভ সংস্কার বিধি পালনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। কিন্তু তার সেই আকাঙ্ক্ষা সমাজের বৈরীতা ও জমিদারি ব্যবস্থার হৃদয়হীন প্রতিকূলতায় সার্থক হতে পারে নি। এ কাহিনীতে একদিকে দারিদ্র্য, অনাহার নিয়ে সমাজনির্দিষ্ট জাতিভেদপ্রথার এক মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে অভাগী, কাঙালি, রসিক দুলে, রাখালের মা, বিন্দির পিসী ; অন্য মেরুতে বিত্ত, প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্য নিয়ে অধিষ্ঠিত আছে অধর গোমস্তা, ঠাকুরদাস মুখুয্যে, ভট্টচার্য মশায় এবং জমিদারের দারোয়ানটি পর্যন্ত। বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিক প্রকরণের দিক থেকে বিচার করলে 'অভাগীর স্বর্গ' শরৎপ্রতিভার এক অন্যতম মহৎ সৃষ্টি। সৈ.আ.জা.

অভিজিৎ সেন : কথাসাহিত্যিক। বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে ১৯৪৫ সালের ২৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। পার্ক সার্কাস এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাস করেন। জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কেরানির চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ছয় বছর চাকরির পর ১৯৬৯ সালে তা পরিত্যাগ করে চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন নকশাল আন্দোলনে যোগদান করেন। এ সশস্ত্র আন্দোলনের দর্শন ভুল বুঝতে পেরে ১৯৭৩ সালে তা ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। অতঃপর বালুরঘাটে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে চাকরি নেন। কিছুকাল পরে এ চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৭৬ সাল থেকে গৌড় গ্রামীণ ব্যাংকে কর্মরত আছেন। অভিজিৎ সেনের লেখায় গ্রামের মানুষ এবং তার ক্রিয়াই প্রধান। মানুষের শুভবুদ্ধি ও সংগ্রামের ওপর আস্থাশীল এই লেখক মানুষের মনের বৈচিত্র্যময় ও জটিল ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যায় দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। তিনি অরিজিৎ, মহাদেব প্রভৃতি ছদ্মনামেও লেখালেখি করেন। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসসমূহ হলো : রুহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫), অন্ধকারের নদী (১৯৮৮), ছায়ার পাখি (১৯৯৩), আঁধার মহিষ (১৯৯৩), ঝড় (১৯৯৩), বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর (১৯৯৫), হলুদ রঙের সূর্য (১৯৯৬) এবং মধ্যবর্তী বন্দর (২০০০)। আর তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হলো : দেবাংশী (১৯৯০), ব্রাহ্মণ্য ও অন্যান্য গল্প (১৯৯৪), অভিজিৎ সেনের ছোটোগল্প (১৯৯৬) এবং অভিজিৎ সেনের **পঞ্চাশটি গল্প** (২০০০)। তিনি দুবার বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধা বসু স্মৃতি পুরস্কার এবং ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। গৌ.ম.

অভিজ্ঞান বসন্ত : অমিয় চক্রবর্তী রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ সাল। 'অভিজ্ঞান বসন্তে'র কবিতাগুলো 'প্রাথমিক', 'প্রদক্ষিণ', 'সূর্যখণ্ডিত ছায়া', 'মন মাধ্যাহ্নিক', 'সংসার' ও 'দিন যাপন' এই কয়টি ভাগে বিভক্ত। 'অভিজ্ঞান বসন্তে'র দুটি বৈশিষ্ট্য—অন্তর্জগতের বিচিত্র অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব ও কবিতায় চিত্রধর্মিতা। কবি দৃষ্টির সমগ্রতায় বুঝেছেন বহির্জগতের নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে অবহিতি তা আসলে অভিজ্ঞতার শুরু এবং কবির অন্তর্জগতে তাঁর প্রবেশ থেকেই কেবল বাইরে তাঁর সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভব। এই

www.pathagar.com

ধ্যানী দৃষ্টিই 'অভিজ্ঞান বসন্তে'র মূল সুর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে অভিজ্ঞতার বিষয় সংগৃহীত হলেও তাতে অন্তর্জগতের রহস্যানুভূতির স্পর্শ না থাকলে বাইরে তার প্রকাশ সুন্দর হয় না। এই বিশেষ দৃষ্টিচেতনা থেকে যেসব কবিতার উদ্ভব তাকে অর্থবহ করেছে কবির অভিজ্ঞতার বিষয়, যেমন—'ছুঁল য়ুরোপের এল্ম্ গাছ, সেই রাইন্, গির্জে-চূড়ো গ্রাম,/ সাদা বেড়া, স্কুলের বাগান, আর বন্ধু-মুহুতে হবে যাদের নাম।/ জাহাজ ফিরবে না, ট্রেন চল্‌বে না যেদিক ; /ঢেকে দিল সম্পূর্ণ জীবন :/ একটি দৃষ্টিনির্ভর ক্ষণ॥' (হাইফা)। টুকরো শব্দের মালায় অভিজ্ঞতার ছবি—'দার্জ্জিলিং এর মেঘলায়-মেশা/ স'রে-/ যাওয়া ছবি/ ভোরে পাওয়া রবি নেশা' (সৌখিন ভ্রমণ)। চিত্রধর্মী গুণের চমৎকার প্রকাশ,—'হালে বলদ জুৎচে,/ ঝাঁপি মাথায় চাষী বৃষ্টিতে চারা পুঁতচে;/ পস্‌লা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম ভাপ,/ ধান-পাকানো তাপ ;/ টন্‌টনে নেবু ফুলে ঠাণ্ডা হাওয়া,/ সোনালি-কাঁটা কাঁঠাল, ভরাট আম,/ ঝিকঝিকে গ্রীষ্মে পাওয়া।' (বসুধা)। প্রতীক ধর্মিতা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অভিজ্ঞান বসন্তে'র 'সংকল্প' কবিতায় কবি মনকে ক্যাপটেনের, দেহকে ইঞ্জিনের এবং প্রাণকে জাহাজের চিত্রকল্পে রূপ দিয়েছেন। যেমন—'মন/ ক্যাপ্‌টেনের চোখ/ কয়লাকল ঘুরচে বিদ্যুৎ জ্বলচে চাকা চল্‌চে হাল নিয়ন্ত্রিত/ইঞ্জিনের যান্ত্রিক খালাসী বিবিধ দিনরাত নিজের জায়গায়/জাহাজ চল্‌চে/ আমি।'

আ. ই

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা : কবি কালিদাস রচিত সাত অংক বিশিষ্ট একটি সংস্কৃত নাটক। নাটকটির দুটি পাঠ—একটি বাংলা অক্ষরে লেখা পুথিতে, অপরটি নাগরী ও দক্ষিণ ভারতের লিপিতে লেখাপুথিতে। এর কাহিনীটি হচ্ছে : মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং অপ্সরা মেনকার গর্ভে এক কন্যা-সন্তানের জন্ম হয়। শিশুটির জন্মের পর বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়ে তপস্যা করতে চলে যান। মেনকাও সদ্যজাত কন্যাকে বনের মধ্যে ফেলে রেখে নিজের পথে যাত্রা করেন। তখন শকুন্তপাখি তার পাখনা দিয়ে ঢেকে রেখে শিশুটিকে রক্ষা করতে থাকে। মহামুণি কণ্ব ঐ অবস্থায় শিশুটিকে পেয়ে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান। তিনি তাকে সযত্নে লালন-পালন করতে থাকেন। শকুন্ত বালিকা শিশুটিকে রক্ষা করেছিল বলে কণ্ব তার নাম রাখেন শকুন্তলা। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মত একদিন বনে মৃগয়ায় যান। তিনি কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হন। শকুন্তলাও রাজার প্রতি আসক্ত হয়। গান্ধর্বমতে তাদের বিয়ে হয় এবং সেখানে দুষ্মন্ত কয়েক দিন থাকেন। অভিজ্ঞান হিসেবে তিনি নিজের আংটি শকুন্তলাকে প্রদান করে রাজধানীতে ফিরে যান। রাজাকীয় কাজের চাপে একসময়ে তিনি শকুন্তলাকে ভুলে যান। এদিকে শকুন্তলার গর্ভে পুত্র ভরতের জন্ম হয়। কয়েক বছর পর শকুন্তলা ভরতকে নিয়ে রাজার কাছে আসে। রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারেন নি। এর আগে স্বামী চিন্তায় আত্মবিস্মৃত শকুন্তলা মহামুনি দুর্বাসাকে অবহেলা করলে মুনিবর তাঁকে অভিশাপ দেন। পতিগৃহ যাত্রাকালে দুষ্মন্ত প্রদত্ত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নদীর জলে হারিয়ে ফেললে এক মৎস্য তা গলঃধকরণ করে। যথাসময়ে স্বামী গৃহে পৌছলে দুর্বাসার অভিশাপ অনুযায়ী দুষ্মন্ত স্বীয় অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখতে না পেয়ে শকুন্তলাকে অপরিচিতা জ্ঞান করে বিদায় দেন। এক ধীবরকর্তৃক ধৃত মৎস্যের উদর থেকে সেই অঙ্গুরীয় দেখে দুষ্মন্তের সব কথা মনে পড়ে। রাজা পুনরায় মৃগয়ায় যান। সেখানে নিজ পুত্রকে দেখে কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে পুনর্মিলন হয়। এই কাহিনী অবলম্বন করেই কালিদাস তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' রচনা করেন। প্রথমে উইলিয়াম জোন্স এবং পরে স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস ইংরেজিতে শকুন্তলার অনুবাদ করেন। তখন

www.pathagar.com

ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানিতে, এর ব্যাপক প্রচার হয় এবং প্রাচ্য সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপবাসীদের আকর্ষণ বাড়ে। বাংলায়ও এর কয়েকটি অনুবাদ হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতার ছাতুবাবুর গৃহে এর বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয়। কুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ বেঙ্গল থিয়েটারে অনেকদিন একাধারে অভিনীত হয়। অন্যান্য যে সমস্ত বাঙালি সাহিত্যিক শকুন্তলার সার্থক অনুবাদ ও সারানুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রমথনাথ সরকার, গোবিন্দ চন্দ্র রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ। আ. জ.

অভিধম্ম কোষ/অভিধর্মকোষ : পুরুষপুরের (বর্তমান পেশোয়ারের) বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক বসুবন্ধু বিরচিত বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। অভিধর্মের টীকা গ্রন্থ। ৮ খণ্ডে ও ৬০০ কারিকায় রচিত এই গ্রন্থে বসুবন্ধু অভিধর্মের প্রায় সকল বিষয়েরই আলোচনা করেছেন। অতি সুন্দর ও সহজভাবে তিনি ধাতু, ইন্দ্রিয়, কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। গ্রন্থখানির শেষ অধ্যায়ে 'আত্মা' সম্পর্কে বৌদ্ধ মতবাদের একটি অতি সুন্দর আলোচনা আছে। প্রধানত সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের জন্য রচিত হলেও অভিধম্মকোষের দার্শনিক উৎকর্ষের জন্য তা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণেরই একটি অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বসুবন্ধু এ গ্রন্থের একটি ভাষ্যও রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থের মূল সংস্কৃত পুঁথি এখনো পাওয়া যায়নি। সৌভাগ্য-ক্রমে পণ্ডিত যশোমিত্র বিরচিত এ গ্রন্থের টীকা পাওয়া গেছে ; যা অভিধম্মকোষ পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছে। পরমার্থ ও হিউয়েন-সাঙকৃত এ গ্রন্থের দু'টি চীনা অনুবাদ পাওয়া যায়। এই চীনা অনুবাদ অনুসরণ করেই রাহুল সাংকৃত্যায়ন পুনরায় গ্রন্থটির সংস্কৃতরূপ দিয়েছেন। আ. খা.

অভিধর্ম-দর্পণ : শীলানন্দ ব্রহ্মচারী-কৃত বৌদ্ধ দর্শন ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা গ্রন্থ। দুই খণ্ড একত্রে সংকলন। বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা নিয়ে গঠিত অভিধর্ম ত্রিপিটকের অন্যতম পিটক। এতে বর্ণিত বিষয়বস্তু এত দুরূহ ও জটিল যে, বিচক্ষণ আচার্যের সাহায্য ব্যতীত এর অধ্যয়ন দুঃসাধ্য। এজন্য এর পঠন-পাঠন এমনকি বৌদ্ধ দেশসমূহেও সীমাবদ্ধ। পারিভাষিক শব্দাদির দুর্বোধ্যতার জট ছাড়িয়ে সহজ-সরল ভাষায় সংক্ষেপে অভিধর্মের গভীর তত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক একজন বৌদ্ধভিক্ষু ও পণ্ডিত। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এম.এ. পরীক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত। প্রকাশক : শ্রীতন ব্রহ্মচারী, পি ৬৮ বসুনগর, উত্তর-২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। প্রকাশকাল : ১৩৯৮। পৃষ্ঠা : ১৬১, মূল্য : ২২ রুপি বি. ব.

অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ : ত্রিপিটকের অন্তর্গত সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি। মূল বই রচনা করেছেন আচার্য অনুরুদ্ধ। তাঁর গ্রন্থের নাম 'অভিধম্মথসঙ্গহ'। আচার্য অনুরুদ্ধ দাক্ষিণাত্য-বাসী ছিলেন। সমগ্র অভিধর্ম্ম-পিটক এবং তার অর্থ-কথাদির (ভাষ্যাদির) মধ্যে অভিধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট, ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হয়েছে তারই সার-সংকলন 'অভিধম্মথ-সঙ্গহ'। বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি এই গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। অভিধর্ম্ম হলো বৌদ্ধ দর্শনের পিটক। অন্য দুটি পিটক হলো – সূত্র ও বিনয়। এই তিন পিটক নিয়ে ত্রিপিটক। প্রকাশক : ইউ.আর. মুৎসুদ্দি এণ্ড সন, ছাপা হয়েছে চট্টগ্রামের বাণী প্রেসে। প্রকাশকালের তারিখ নেই, তবে ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার 'মুখবন্ধ' এবং লেখকের 'বক্তব্য' অধ্যায়ে জুলাই ১৯৪০ লেখা আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা শুদ্ধিপত্রসহ ৩০০, মূল্য ২ টাকা। বি. ব.

অভিধা : বাচ্যার্থ বা আক্ষরিক বা সাধারণ অর্থই অভিধা। 'গৌরবরবি'-র রবি রূপকার্থ। যেমন— রবির সাধারণ অভিধা আকাশের সূর্য এবং যে শক্তি বলে ব্যঙ্গার্থ মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয় তাকে অভিধা বলে। এই শক্তি শব্দের মুখ্য অর্থের প্রতীতি জন্মায় বলে একে শব্দের মুখ্যশক্তিও বলা হয়। যেমন—'গঙ্গা' শব্দটি দ্বারা একটি নদী বিশেষের প্রতীতি জন্মে। 'গঙ্গা'র এই বাচ্যার্থ বোধন শক্তিকেই 'অভিধা' রূপে চিহ্নিত করা যায়। আ. ই.

অভিধান : অভিধান কোনো সাধারণ গ্রন্থ নয়। এটি একটি বিশেষ ধরনের গ্রন্থ। একটি ভাষার জনগোষ্ঠী যে শব্দ ব্যবহার করে অভিধানে সেই ভাষার শব্দ সংকলিত হয়। এই গ্রন্থে ক্রমরূপান্তরের ভেতর দিয়ে শব্দের ব্যবহার চিহ্নিত হয়। নতুন নতুন শব্দ অভিধানে সংযোজিত হয়, যার ফলে মানুষের মুখের ভাষার ব্যবহার-বৈচিত্র্য বিধৃত থাকে অভিধানে। প্রথম ইংরেজি অভিধান প্রকাশিত হয় ১৬০৪ সালে। আমেরিকায় প্রথম অভিধান রচিত হয় উনিশ শতকের শুরুতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় অভিধান সংকলনের প্রথম চেষ্টা হয় পর্তুগিজ মিশনারিদের হাতে। এই অভিধানে বাংলা শব্দ রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। বাংলা হরফে প্রথম যে অভিধানটি প্রকাশিত হয় সেটি ছিল দ্বিভাষিক। এই অভিধানটির নাম 'ইংরাজি ও বাঙ্গালি ভোক্যাবিউল্যারি'। এর প্রকাশকাল : ১৭৯৩ সাল। ১৮১৭ সালে বাংলা ভাষায় প্রকৃত বাংলা অভিধান প্রণয়ন করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। এই অভিধানের নাম 'বঙ্গ ভাষাভিধান।' এরপর সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে প্রতিটি বড় ভাষাগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব অভিধান প্রণয়ন করেছে। শব্দের ইতিহাস, ব্যুৎপত্তি, অর্থ ইত্যাদি নিয়ে অভিধানের আয়তন বেড়েছে। প্রবহমান ভাষার প্রাণস্পন্দন অভিধানের ভেতর ধ্বনিত হয়। অভিধান একটি আকর গ্রন্থ। সে. হো.

অভিধান : মোহাম্মাদ আবদুল কাইউম। অভিধান বিষয়ক গ্রন্থ। তিনটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। যেমন : অভিধানের কথা, বাঙলা অভিধানের ইতিহাস, অভিধানে আমোদ। এই বইটিতে লেখক স্বল্প পরিসরে অভিধানের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। প্রাথমিক তথ্য ও জ্ঞান লাভের জন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি একটি সহজবোধ্য রচনা। সু-লিখিত এবং তথ্যবহুল। একই সঙ্গে শব্দ কত ভাবে ব্যবহৃত হয়, কিভাবে শব্দের অর্থ পাল্টে যায়, একসময় শব্দের অর্থ কি ছিল, অন্য সময় কি হয়েছে এসব বিষয় লেখক চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। ১৯১৬ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'বাঙ্গালা অভিধানে আমোদ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'বাঙ্গালা অভিধান আমোদের অফুরন্ত খনি'। অভিধান কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে সহজপাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সে প্রসঙ্গে তিনি আমোদের কথা উল্লেখ করেছেন। লেখক অভিধানকে এভাবে ব্যবহারযোগ্য করার ইঙ্গিত দিয়েছেন যার ফলে সাধারণজনের ভাষাজ্ঞান পরিশীলিত হয়। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার ভাষাকে যেন বিকৃত না করে। নিঃসন্দেহে এটি একটি আন্তরিক প্রয়াস। সে. হো.

অভিধান-চিন্তামণি : সংস্কৃত কোষ গ্রন্থ। গ্রন্থটি রচনা করেছেন জৈনপণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি। এর বঙ্গানুবাদ করেন নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ। এর কান্ডগুলো হলো : দেবাধিদেব কাণ্ড, দেবকাণ্ড, মর্ত্যকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, তির্যক কাণ্ড ও সামান্য কাণ্ড। অনুবাদে মূলগ্রন্থের বিস্তৃত সূচিপত্র ও গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। হেমচন্দ্র সূরির এই কোষগ্রন্থটি প্রামাণিক অভিধান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আ.না.

অভিধান রত্নমালা : সংস্কৃতভাষায় রচিত একটি শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থ। এটি খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এর রচয়িতা হলায়ুধ একজন কবি ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ব্রাহ্মণ সর্বস্বাদি রচয়িতা হলায়ুধ মিশ্র নন। ১৮৬১ সালে Thomas Aufrecht (টমাস অফ্রেক্ট) নামক এক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সম্পাদনায় লন্ডন

www.pathagar.com

থেকে 'অভিধান রত্নমালা'র একটি সংস্করণ বের হয়। এর ফলে গ্রন্থটি সম্পর্কে অনেক কথা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে। এটিও পদ্যে রচিত বাছাই করা কিছু সংস্কৃত শব্দের একটি সংগ্রহ বা সংকলন। সু.মু.

অভিনন্দ : গৌড়নিবাসী কবি। জীবনকাল ৯শ/১০শ শতক। তিনি পালবংশীয় যুবরাজ হারবর্ষের সভাকবি ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। হারবর্ষকে পালরাজ দেবপালের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অমরকোষের টীকাকার সর্বানন্দ (১২শ শতক) ও রায়মুকুট (১৫শ শতক) অভিনন্দের কতকগুলো শ্লোক 'রামচরিতে' উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এক অভিনন্দ 'কাদম্বরী কথাসার' নামক গ্রন্থ প্রণেতা। তিনিও রামচরিতের অভিনন্দ এক ও অভিন্ন কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেননা 'কাদম্বরী কথাসার' রচয়িতা নিজেকে জয়ন্ত ভট্টের পুত্র বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে 'রামচরিতে'র রচয়িতা অভিনন্দের পিতার নাম শতানন্দ বলে জানা যায়। 'কাদম্বরী-কথাসারে'র রচয়িতা আত্মপরিচয় ছলে নিজের পূর্বপুরুষ-গণের কাউকে গৌরবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। 'যোগবাশিষ্ট-সংক্ষেপ' নামক একখানি গ্রন্থ গৌড়বাসী অভিনন্দের নামের সঙ্গে যুক্ত। আ. ই

অভিনবগুপ্ত : দর্শন, সাহিত্য, তন্ত্র ইত্যাদি ভারতীয় বিদ্যার এক অসাধারণ প্রতিভা। কাশ্মীরের এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১০শ শতক। অভিনবগুপ্তের পিতা নৃসিংহগুপ্ত 'চুখল' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর মাতা বিমলা বা বিমলকলা। পূর্বপুরুষ অত্রিগুপ্ত তৎকালীন কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্যের অনুরোধে কান্যকুব্জ থেকে কাশ্মীরে এসে বসবাস করেন। অভিনবগুপ্ত শৈব এবং সরাজীব ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি প্রায় চল্লিশটির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। শৈব আগম-শাস্ত্র, প্রত্যভিজ্ঞান দর্শন, অলঙ্কার ও নাট্যশাস্ত্রের উপর লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বোধ-পঞ্চ-দশিকা', 'মালিনী বিজয়-বার্তিক', 'পরাত্রিংশিকা-বিবরণ', 'তন্ত্রালোক', 'তন্ত্রসার', ধ্বন্যালোকলোচন', 'অভিনব ভারতী', 'ভগবদ্‌গীতার্থ সংগ্রহ', 'পরমার্থসার' ও 'প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী'। এ ছাড়া তিনি 'ক্রমস্তোত্র' ও 'ভৈরবস্তর' নামক দার্শনিক স্তোত্রও রচনা করেন। সু.মু.

অভিনয় : সংস্কৃত নাট্য শাস্ত্রানুযায়ী বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় নিয়োজিত পাত্রপাত্রীদের দ্বারা নাটকীয় বিষয়বস্তুর অনুকরণাত্মক উপস্থাপনাকে অভিনয় বলে। বাস্তব জীবনে ব্যক্তিগত ভাব, অনুভব কর্ম অনুযায়ী যেমন মানুষের কণ্ঠস্বর চোখ, মুখ, হাত প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক রূপ লাভ করে ভাবের অভিব্যক্তি দানের জন্যে, নাটকেও তেমনি ভূমিকানুসারে কৃত্রিম আবেগ সৃষ্টি করে স্বভাবের অনুকরণ বা অভিনয় করতে হয়। নাটকাদির পাত্রপাত্রীদের ভূমিকাসমূহ যখন সংলাপের দ্বারা প্রকাশ পায় তখন তাকে বাচিক অভিনয় বলা হয়। আধুনিক বেতার নাটকগুলো এরূপ বাচিক অভিনয়ের দ্বারা প্রচার লাভ করে। ইংরেজিতে এরূপ অভিনয়ের জন্য অপরিহার্য সজ্জা ও প্রসাধনকে Make-up বলা হয়। আ.ন.ম.ব.র.

অভিনয়, অভিনয় নয় : বুদ্ধদেব বসু রচিত রোমান্টিক প্রেমের গল্প। প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সনের বৈশাখ সংখ্যা ও দ্বিতীয় গল্পটি ১৩৩৬ সনের কার্তিক সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায়। পরে দু'টি গল্পই লেখকের 'অভিনয় অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩০) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'অভিনয়' গল্পে প্রতুলের সঙ্গে বিনোদিনী ওরফে বিনুর রোমান্টিক প্রণয়ের গাথা ব্যক্ত হয়েছে। বিবাহিতা নায়িকার সঙ্গে প্রেমের বিষয়টি গাঢ় হওয়ার অবকাশ পায় নি। প্রতুল নিজেই শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীকে সুকৌশলে তার স্বামীর সঙ্গে বরিশাল পাঠিয়ে দিয়ে এই খামখেয়ালি প্রেমের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই প্রেমের কল্পনায় লেখক মাটির

www.pathagar.com

পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি, কল্পনার রঙিন আকাশে প্রতুল বিশেষ করে বিনুকে বিচরণের অবকাশ দিয়েছেন। নায়িকার বিচ্ছেদে নায়কের মনে ট্র্যাজেডির পরিবর্তে কমেডিরই আনন্দ সঞ্চার হয়। এই গল্পে প্রেম সম্পর্কে লেখকের বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটেছে। 'অভিনয় নয়' গল্পে প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গি কতকটা পরিবর্তিত হয়েছে। রমার সঙ্গে প্রতুলের বিবাহ-পূর্ব প্রেম কতকটা রোমান্টিক ভাবের দ্বারা পরিচালিত হলেও উভয়ের প্রেমের সফলতা আসে বিবাহের মাধ্যমে। চরিত্র হিসেবে প্রতুল ধূর্ত, কিন্তু প্রতারক নয়। 'অভিনয়' গল্পে বিনোদিনীকে সে স্বামীর সঙ্গে মিলিত করেছে, 'অভিনয় নয়' গল্পে রমাকে সে জীবন সঙ্গিনী করেছে। বিনোদিনী বিবাহিতা, সুতরাং তাকে জীবন-সঙ্গিনী করতে বাধা আছে, কিন্তু অবিবাহিতা রমাকে সে সহজেই জীবন-সঙ্গিনী করতে সমর্থ হয়েছে। অ.ন.

অভিনয় ও অভিনেতা (১ম খণ্ড) : নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত। সম্পাদনা করেছেন ড. বিভূতি মুখোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ডের সূচিতে আছে 'অভিনয় ও অভিনেতা', 'বহুরূপী বিদ্যা', 'বর্তমান রঙ্গভূমি', 'নৃত্য' ও 'পৌরাণিক নাটক'। অভিনয় ও মঞ্চায়ত সম্পর্কিত বই। প্রকাশ করেছে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬, পৃষ্ঠা ৬২, মূল্য ৩.৫০ রুপি। বি. ব.

অভিব্যক্তিবাদ/প্রকাশবাদ : সাহিত্য বা চিত্রশিল্পে যখন তার বহিরাবরণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মর্মোদঘাটনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তখন তাকে 'অভিব্যক্তিবাদ' রূপে চিহ্নিত করা যায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকেই শিল্প সাহিত্যে অভিব্যক্তিবাদের সূচনা হয়। ১৯১২ সালে জার্মান নাট্যকার Reinhard Sorge-এর 'Der bettler' নাটকে অভিব্যক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করে। শিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রান্সেই প্রথম অভিব্যক্তিবাদের সূচনা হয়। ১৯০১ সালে চিত্রকর Herve এই রীতির প্রবর্তন করেন। অনেক সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী তখন থেকে তাঁদের শিল্পকর্মে বস্তুর বাহ্যরূপ অপেক্ষা তার আন্তর রহস্য উদ্‌ঘাটনে উৎসুক হন। অভিব্যক্তিবাদী শিল্প সাহিত্যে তাই শিল্পীর মানসলোকের প্রকাশ প্রাধান্য লাভ করে। বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে শিল্পী বস্তুগত সত্যের চেয়ে ভাবগত সত্যের প্রকাশে উৎসাহিত হন। বহিরাঙ্গিক রূপের আড়ালে যে সত্য, তাকেই তিনি অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে প্রকাশ করেন। তবে আবেগ সেখানে প্রাধান্য লাভ করে না। তাই সম্ভাব্য সত্যের গণ্ডিও তাতে ঠিক থাকে। প্রকাশবাদী চিত্রে যেমন গাঢ় রঙ দিয়ে শিল্পীর অনুভূতির তীব্রতা বুঝানো হয়, প্রকাশবাদী সাহিত্যে তেমনি ভাষার ওজস্বিতায় আসল সত্য বুঝানো হয়ে থাকে। আ.ই.

অভিব্যক্তিমূলক নাটক : চরিত্রের সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে অন্য কিছুর অভিব্যক্তি যে সমস্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অভিব্যক্তি-মূলক/প্রকাশবাদী বা expressionistic drama বলে। এই শ্রেণীর নাটকে চরিত্রসমূহের কোনো নাম থাকে না ; নরনারী, কিশোর, জনতা, শিক্ষক, শ্রমিক ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চারিত্রিক লেবেলে নাটকের পাত্রপাত্রীদের চিহ্নিত করা হয়। ব্যক্তিনামে এরা পরিচিত হয় না। অর্থাৎ নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র এক একটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন, কর্মচারী বা বড় বাবু—এভাবে তারা পরিচিত হয়। এই জাতীয় নাটকের মাধ্যমে মানুষ তার নিজস্ব সত্তায় প্রকাশিত না হয়ে বৃহৎ জনসমাজের প্রতিভূরূপে উপস্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ', প্রতাপচন্দ্রের 'আজব দেশ', শৈলেশগুহ নিয়োগীর 'ফ্লু' ইত্যাদি অভিব্যক্তিমূলক নাটকের নিদর্শন। প্রতাপচন্দ্রের 'আজব দেশে'র চরিত্রগুলো হচ্ছে ,'যাহাদের শুধু গোঁফ আছে', 'যাহাদের শুধু দাড়ি আছে' ইত্যাদি এবং শৈলেশগুহের 'ফ্লুর' চরিত্রগুলো যমপুরীতে 'কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর' এবং তাদের পাশে নবাগত ফ্লু'। ফার্মের মতো লেখা হলেও

www.pathagar.com

এই জাতীয় নাটক চরিত্রধর্মে expressionistic drama-র দলভুক্ত। আ. ই

অভিমন্যুবধ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত পৌরাণিক নাটক। 'অভিমন্যুবধ' গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এখানে বীররস এবং করুণ রসের চমৎকার সমন্বয় সাধন হয়েছে। নাটকের প্রথম ভাগে সুভদ্রা ও উত্তরার ভাবব্যাকুল চিত্তচাঞ্চল্য ও গণকের অশুভ আশংকায় কাহিনীর পরিণতির একটা অমঙ্গল ভাব সূচিত হয়েছে। যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে উত্তরার মিনতিতে যে কাতরতা ফুটেছে তা পাঠক ও দর্শকের মনে সমবেদনার সৃষ্টি করে। অদৃষ্টের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামরত পুরুষকারের আধার অভিমন্যু যখন অন্যায় সমরের নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হয় তখন মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিতের অসহায় পতনের কথা মনে পড়ে। ট্র্যাজিক পৌরাণিক নাটক হিসেবে 'অভিমন্যুবধ' গিরিশ ঘোষের নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করেছে। কোনো অসঙ্গত স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণায় নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতি ক্ষুণ্ন করা হয়নি। মু. আ. জ.

অভিযাত্রী : সত্যেন সেন রচিত উপন্যাস। ১৯৬৯ সালে কালিকলম, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন বাংলাদেশের 'মাসিমা' হিসেবে সুপরিচিত মনোরমা বসুকে। বাংলাদেশের শহরে বন্দরে ঘুরে ঘুরে সংগ্রামী মানুষদের তথ্য সংগ্রহ করে ১৭টি অধ্যায়ে রচনা করেছেন বইটি। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অভিযাত্রীরা, আর এক একুশে ফেব্রুয়ারি, বাঘা যতীন, স্বদেশী আন্দোলনের মশালবাহী বরিশাল, গনি মোল্লা, জুম্মন মিঞা, কুমুদা, কারাজীবনের একটি অধ্যায়, মাহাঙ্গুবানিয়া, চারু-বোন-- এরকম ১৭টি বিষয় ও ব্যক্তিত্ব-চরিত্র তাঁর 'অভিযাত্রী' বই-এ ফুটে উঠেছে। ইতিহাসের বিস্মৃত সময়, ঘটনা ও চরিত্র সাহিত্যিকের কলমে-ভাষায়-আবেগে সাহিত্যরস তথা জীবন-রসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মা.রে

অভিযান : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যনাটিকা। প্রকাশক : সুবর্ণ, ১৫০, ঢাকা স্টেডিয়াম, ঢাকা-১০০০। প্রচ্ছদ শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। 'অভিযান গ্রন্থে দুটো অংশ রয়েছে (১) অভিযান, (২) সূর্য প্রণাম। সূর্য প্রণামেরও দুটো ভাগ (ক) সূর্যপ্রণাম (উদয়াচল) (খ) সূর্যপ্রণাম (অস্তাচল)। কবি সুকান্ত বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। কাব্যের একটা নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করেছিলেন। 'অভিযান' গ্রন্থেও আমরা সেই নতুন ধারার পরিচয় পাই। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা নেই। অভিযানের উদয়ন চরিত্রকে তাই বলতে দেখি—'শোনো ওগো বিদেশের কন্যা/ব্যাধি দুর্ভিক্ষের বন্যা/আমরাই প্রাণ দিয়ে বাঁধব/তোমাদের কান্নায় আমরাও যোগ দিয়ে কাঁদব।' কবির চিন্তার এই স্বচ্ছতা সম্ভব হয়েছিল চল্লিশ দশকের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে। ব্যাপক গণআন্দোলনের তুফানে যে বিদ্রোহ ঘনিয়ে উঠেছিলো তিনি তাকে এভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছেন—'চলবেনা অন্যায়! খাটবেনা ফন্দি/ আমাদের আদালতে আজ তুই বন্দি।' সূর্যপ্রণাম উদয়াচলে রয়েছে আগমনী, আবির্ভাব, বরণ, মঙ্গলাবরণ, আহ্বান, স্তব, অবশেষ, মিনতি। সূর্যপ্রণাম অস্তাচলে রয়েছে প্রান্তিক, শেষ মিনতি, আয়োজন, যাত্রা, বিদায় ও প্রণতি। শিশু-কিশোর উপযোগী ও কাব্যনাটিকাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্বার্থক সৃষ্টি। পা. র.

অভিযান : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট উপন্যাস। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। তার আগে গোপাল হালদার সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এক সাধারণ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে তারাশঙ্কর 'অভিযান' উপন্যাস রচনা করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় উপন্যাসটি ছায়াচিত্রেও রূপান্তরিত হয়। মফঃস্বলের ট্যাক্সি চালকের দৈহিক শ্রমের বাইরে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। 'অভিযানে'র

পটভূমি হচ্ছে বালুকাময় লাল আঠালো ও কঙ্করসঙ্কুল মৃত্তিকার উদাস প্রান্তর– যার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে গিরবরজা গাঁয়ের সন্তান নরসিংয়ের পুরনো মডেলের যাত্রীবাহী ট্যাক্সি। নরসিং তার স্ত্রী জানকী ও শ্যালক রামকে নিয়ে একটি ছোট সংসার বেঁধেছে। জানকীর মৃত্যুর পর কামনার কালীদহের কাল–ভুজঙ্গিনী ফট্‌কি তার জীবনের অঙ্গনে আবির্ভূত হয়, কিন্তু নরসিং তাতে উন্মুক্ত হয় না। একদিন তার নিরুদ্ধ কামনার প্রকাশ ঘটে স্কুল শিক্ষয়িত্রী খ্রিস্টান মেয়ে মেরী নীলিমা দাসকে দেখে। কিন্তু নীলিমাকে সে পায়নি। মুর্শিদাবাদের গ্রামপথে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালানোর প্রেরণাও যেন সে তখন হারিয়ে ফেলে। এরপর মুর্শিদাবাদ ছেড়ে তার পুরনো গাড়ি ছুটে চলে অণ্ডালের কয়লাখাদের দিকে। সঙ্গে ফট্‌কি, তার সংসারের নতুন ঘরণী। নরসিং পূর্ব পুরুষের ভিটে ত্যাগ করে, দেশান্তরে গিয়ে জীবিকার নতুন পথ খোঁজে এবং ফট্‌কিকে নিয়ে ঘর বেঁধে তার ছন্নছাড়া জীবনে হয়তো বা বৈচিত্র্যের সন্ধান করে। বাল্যকাল থেকে ভাগ্যহত ও অনাদৃত নরসিংয়ের জীবন কাহিনীকেই তারাশঙ্কর তাঁর অসাধারণ লিপিকুশলতা ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। আ. গ.

অভিশপ্ত নগরী : সত্যেন সেনের উপন্যাস। প্রকাশক : পুথিপত্র প্রকাশনী। ৯/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ দেবদাস চক্রবর্তী। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৪। মূল্য : ৫.০০ টাকা। বাইশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে রয়েছে ইহুদি জাতির পতনের সময়কার তার সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, রাজতন্ত্র এবং সর্বোপরি রাজতন্ত্র ও পুরোহিত তন্ত্রের মধ্যে বিরোধের নিগূঢ় ভাষ্য। ইহুদি জাতি কালের আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে দেশে দেশে সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত এক স্বতন্ত্রজগত গড়ে তুলেছে। বস্তুত ইহুদি দ্বৈপায়ন চরিত্র অনুধাবন তাবৎ বাইবেলের নির্যাসকে আত্মস্থ করা থেকেই সম্ভব। উপন্যাসের চরিত্র চিত্রনে এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। 'ইতিহাসের যে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ভেলভেটের জুতো নিচে নামছে আর কাঠের জুতো উপরে উঠছে' সেই ইতিহাস চেতনা 'অভিশপ্ত নগরীর' সূত্রধর। বাইবেলের 'বুক অব দি প্রোফেট' : যেরেমিয়া খণ্ডের ভিত্তিতে লিখিত 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের ঘটনাকাল। 'অভিশপ্ত নগরী' যিরুশালেমের পতনের ওপর দাঁড়িয়ে শুধু একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এখানে ইহুদি সমাজের ধারাবাহিক ট্র্যাজেডির পিছনে সমাজের কোনো কোনো শক্তি কিভাবে কাজ করেছে : রাজতন্ত্র ও পুরোহিত তন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ; ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব অন্তসারহীনতার বিরুদ্ধে বিবেকের বিদ্রোহ— এখানে যা নবী যেরেমিয়ার প্রত্যাদেশে উচ্চারিত ; সংক্ষেপে রাজতন্ত্র, পুরোহিত তন্ত্র ও নবী—এই ত্রিমুখী সংঘাত ইহুদি সমাজের বৈশিষ্ট্য তার নিখুঁত বিশ্লেষণ এখানে সমুপস্থিত। অপর দিকে বিজেতারা যেরেমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর যে সুযোগ গ্রহণ করেছিল তার প্রতিদান নবী যেরেমিয়াকে দেয়ার জন্য আগ্রহ থেকে ইহুদি চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে আরও গভীর করেছে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায় নবী যেরেমিয়ার বিলাপের মধ্যে সংশয় আর দ্বিধার পদধ্বনি শোনা যায়। বাইবেলের চরিত্রগুলোকে উপন্যাসের মানুষের রক্ত মাংসের রূপ দেয়া, শোকহীন হৃদিহীন স্বর্গকে ধরার সুখ দুঃখের রসে মণ্ডিত করার প্রতিভাই নয়—তার মূল তাৎপর্যকে উদঘাটন করে এ কালের পারানির নৌকায় তুলে দিয়েছেন লেখক। পা. র.

অভিশপ্ত সাধনা : শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪–১৯৭৩) রচিত সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯২০ সাল। ভারতপ্রবাসী জনৈক আরব–ব্যবসায়ী পিতার মৃত্যুর পর রাবেয়া বেগ মিথ্যা ঋণে সর্বস্ব হারায়। সে তখন পিতৃবন্ধু জনৈক বৃটিশ কর্ণেলের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে কর্ণেলের সহায়তায় পেশোয়ার প্রবাসী জনৈক বৃদ্ধ জ্যোতিষীর নিকট টাইপিস্টের চাকরি পায়। রাবেয়া অধ্যাপকের সহকারী খাঁ সাহেবের পরিবারভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

রাবেয়া ট্রেনে অধ্যাপকের ভাগিনেয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মিঃ মতি চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হয়। মি: চৌধুরী রাবেয়াকে অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাব দিলে রাবেয়া অধ্যাপকের দ্বারা নিজের জন্মরাশি বিচার করে তার প্রতিকূল অবস্থা দেখে উক্ত বিয়েতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। অধ্যাপক তাকে জানায় পুরুষকারের শক্তি বলে সে ভাগ্যলিপি পরিবর্তিত করতে পারে। এরপর মিঃ চৌধুরী রাবেয়ার অনেক অনিষ্ট সাধন করে। রাবেয়া চৌধুরীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মিলিটারী হাসপাতালে নার্সের কাজ গ্রহণ করে। মিঃ চৌধুরী নিজের নাম গোপন করে সৈন্যবিভাগে চাকরি নেয়। ঘটনাচক্রে সে নিজেই অসুস্থ হয়ে রাবেয়ার চিকিৎসাধীন হয়। রাবেয়া অধ্যাপকের কাছে কিছু জ্যোতিষ বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলো। সে মি: চৌধুরীর ললাট-লিপি গণনা করে চৌধুরীর মৃত্যু আসন্ন দেখতে পায়। ইতিমধ্যে পাপিষ্ঠ চৌধুরী প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে তীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা রাবেয়ার কণ্ঠচ্ছেদ করার চেষ্টা করে, কিন্তু রাবেয়া পুরুষকারের বলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। মিঃ চৌধুরী রাবেয়াকে হত্যা করতে না পেরে নিজেই সে ক্ষুর দ্বারা আত্মহত্যা করে। পরে রাবেয়া স্নায়বিক অবসাদে দুর্বল হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কা.রো.

অভিশপ্তা : হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত ছোট গল্প। হেমেন্দ্রকুমারের গল্পে প্রেমের সাধনাই গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে তোলে। 'অভিশপ্তা' এই জাতীয় একটি গল্প। মানমন্দিরে বন্দি এক অভিশপ্তা নারীর প্রেতাত্মা তার অন্ধ প্রেমিকের গান শুনার জন্য অবিরামভাবে ঘুরে বেড়ায়। রাজা জয়সিংহের আদরিণী রমণী ছিল সে। কাশীর মন্দিরে একদিন এক সুডৌল গৌরতনু তরুণ যুবকের গান শুনে সে মুগ্ধ হয়। তখন থেকে যুবকের প্রতি তার প্রেমের সূত্রপাত হয়। রাজা জয়সিংহ ব্যাপারটি অবগত হয়ে সেই সুবেশ তরুণের চোখ দুটি জন্মের মতো অন্ধ করে দেন। অন্ধ যুবকের হতাশা ও যন্ত্রণার একমাত্র কারণ সে। নিজেকে সে চরম পাপিষ্ঠা বলে অভিহিত করে। মৃত্যুর পরেও তাই তার তৃষিত আত্মা যুবকের প্রতি এক অন্ধ আবেগে আলোড়িত হতে থাকে। যুবকের সকরুণ রাগিণী মিশ্রিত সঙ্গীত শুনবার জন্য তার অভিশপ্তা আত্মা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে তা শুনবে। হেমেন্দ্রকুমারের 'অভিশপ্তা' গল্পে নায়িকার রূপতৃষ্ণা প্রবল। নায়িকারাও চিত্রকরের পটে আঁকা ছবির মতো অপরূপ সুন্দরী। দেহজ সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রত্যেকেই সচেতন। 'অভিশপ্তা' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র প্রভাব অনুভূত হয়। মা.সা.

অভিষেক : মন্ত্রপূত দ্রব্যাদি ও গীতবাদ্য সহযোগে বিশেষ স্নানের পর পূজাবেদীতে দেবপ্রতিষ্ঠা কিংবা রাজার প্রথম সিংহাসনারোহণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বিশেষ। দেবতার বিশেষ পূজা উপলক্ষেও অভিষেকের বিধান আছে। দোলযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবে বিষ্ণুর এবং দুর্গাপূজায় দুর্গার অভিষেক কিংবা মহাস্নান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুর্গার মহাস্নান উপলক্ষে প্রতিটি মন্ত্রপূত দ্রব্য ব্যবহারের সময় পৃথক রাগ-রাগিণী সহকারে পৃথক-বাদ্য বাজানো হয়। এ কাজে ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে আছে-পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, স্বর্ণোদক, ইক্ষুরস, গজদন্তমৃত্তিকা, বরাহদন্তমৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা ইত্যাদি। রাজার রাজ্যাভিষেকে পূজা-হোমাদি কর্ম সম্পাদনার পর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও মৃন্ময় কলসে রাখা গন্ধামোদিত পুণ্যনদীর জল স্বর্ণভূষিত শঙ্খে গ্রহণ করে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পুরোহিত কিংবা অমাত্য রাজা ও রানীর মাথায় ছিটিয়ে দেন। তারপর রাজার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়া হয়, তাঁর সম্মুখে ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন তুলে ধরা হয় এবং রাজপদ গ্রহণের জন্য তাঁকে যথানিয়মে আহ্বান জানানো হয়। শাক্ত সাধকদের মধ্যেও অভিষেকের ব্যবস্থা আছে। এই অভিষেকের দ্বারা সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, বাধাবিপত্তি দূর হয় এবং সাধনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে। অভিষেক উপলক্ষে স্থাপিত কলসের জল পূজাশেষে যজমানের মাথায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ছিটিয়ে দেয়া হয়। আ. খা.

www.pathagar.com

অভেদ : সাধারণভাবে 'অভেদ' বলতে বোঝায় যে কোনো বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতার ভাব বা অবস্থা/Idendity। মনোবিদ্যায় অবশ্য এক বিশেষ ধরনের একাত্মীকরণের অবস্থা বা পর্যায়কে 'অভেদ' বা 'Identification' বলে। এরূপ ক্ষেত্রে 'অভেদে'র দুটি অর্থগত বৈশিষ্ট্য থাকে। স্মৃতি উজ্জীবনের সময় মানুষের মনে যখন অতীত অভিজ্ঞতার জাগরণ ঘটে, তখন অভেদের একটি পর্যায় হয়। অতীত অভিজ্ঞতার কারণে মানুষ কোনো বিষয় বা ব্যক্তিকে মনে করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করতে পারে। মন:সমীক্ষণবাদীরা 'অভেদ' বলতে যে কথাটি বোঝেন তা হলো,—শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভাবাবেগ, emotion ইত্যাদি প্রক্ষোভগত কারণে একটি বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে যখন কোনো ব্যক্তির সম্পর্ক বা মনোভাব প্রগাঢ় হয়, তখন সে-ব্যক্তি ঐ বিশেষ ব্যক্তিটির ন্যায় আচরণ বা ব্যবহার করে। মু.আ.রা.

অভেদানন্দ, স্বামী : রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম। পূর্বনাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র। জন্মস্থান কলকাতা। জন্ম তারিখ ১৮৬৬ সালের ২ অক্টোবর। ১৮৮৪ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামী অভেদানন্দ নাম গ্রহণ করে সন্ন্যাসব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮৯৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় পঁচিশ বছরকাল আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, কানাডা, জাপান, হংকং, ক্যান্টন, ম্যানিলা প্রভৃতি দেশে অবস্থান করে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯২১ সালে কলকাতা ফিরে আসেন ও ১৯২২ সালে তিব্বত যান। ১৯২৩ সালে দেশে ফিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ও ১৯২৪ সালে দার্জিলিংয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ১৯৩৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে দেহত্যাগ করেন। ইংরেজি ও বাংলায় স্বামী অভেদানন্দ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা রচনা : মনের বিচিত্ররূপ, আত্মবিকাশ (১৩৩২), বেদান্তবাণী (১৩৩৩), ভালবাসা ও ভগবৎ প্রেম (১৩৩৪), হিন্দুধর্মে নারীর স্থান (১৩৩৫), কাশ্মীর ও তিব্বতে। সম্পাদনা : বিশ্ববাণী (১৩৩৪-৪৫)। ইংরেজি গ্রন্থ : India and her people (১৯০৬), Gospel of Ramkrishna, Sayings of Ramkrishna, Re-incarnation (১৯০২), How to be a yogi, Devine Heritage of Man, Does Soul exist after Death (১৯২৪), Human affection and Devine love (১৯২৪), Religion of Twenteeth century, Self knowledge Scientific, Basic of Religion (নিউইয়র্ক, ১৯০৯), Unity and Harmony (নিউইয়র্ক, ১৯১৬), Why a Hindu accepts Christs and rejects Churchianity (১৯২৪), Swami Vivekanda and his words (১৯২৪)। ১৯৩৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। আ. ই

অভেদী : প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত একটি ধর্মবিষয়ক পুস্তক। প্রথম প্রকাশ ১৮৭১ সাল। গল্পচ্ছলে ধর্মবিষয়ক উপদেশদান এর মূল উদ্দেশ্য। অন্বেষণচন্দ্র এর নায়ক, তিনি নীতিপ্রচারের বাহক মাত্র। রূপকচ্ছলে লেখক মায়া, ধর্ম এবং আত্মজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ বাক্য বর্ষণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে প্যারীচাঁদ থিয়সফি চর্চা করেছেন। সেজন্য আত্মার অমরতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। ফলে 'অভেদী'তে তিনি হিন্দুনারীর সহমরণের দৃশ্যকে সমর্থন করেছেন। প্যারীচাঁদের মানসিকতার স্ববিরোধী ভাব এতে লক্ষ করা যায়। হিন্দু জাতীয়তার প্রতি অত্যধিক সহানুভূতির ফলে প্যারীচাঁদ সমাজ সংস্কারে উৎসাহী হয়েও সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত হতে পারেননি। সে কারণেই অভেদীতে হিন্দুর সহমরণের মর্মান্তিক দৃশ্যকেও মনোহর রূপে চিত্রিত করতে পেরেছেন। আ. গ.

www.pathagar.com

অভ্র-আবীর : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক : শ্রী অজিত শ্রীমানী, আর. এইচ. শ্রীমানী এন্ড সন্স, ২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : ১৯১৬, মূল্য : সাড়ে তিন টাকা। এ বইটি বাংলা সাহিত্যের 'ছন্দের জাদুকর' নামে খ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ হয় তেরশ বাইশ সালের বাসন্তী পূর্ণিমায়। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে ভূমিকায় কবি উল্লেখ করেন : অভ্র আবীরের দেবতা বাক, ছন্দ শতরূপা সরস্বতী, ভাষা সন্ধ্যাভাষা। ঋষি কবির একজন অপ্রাচীন শিষ্য-ইহার কল্পনাকৃৎ, পরিকল্পনাকৃৎ শ্রী অসিতকুমার হালদার। তাঁর রচিত কাব্যে স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে ছন্দ নির্মাণ কৌশল, বিষয়বস্তু এবং শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে। অভ্র-আবীর তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাঁর বহু কবিতা বাংলাভাষী পাঠকের মুখে মুখে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন : শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই গ্রন্থটিতে রয়েছে তাঁর পাঠক নন্দিত কবিতা ইল্‌শেগুড়ি, কবর-ই-নূরজাহান, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি, চট্টলা, জাতির পাঁতি, নীলপরী, মৌলিক গালি, লালপরী, সবুজপরী, স্বর্গদ্বারে ও স্বাগত। অনেকগুলো কবিতা প্রখ্যাত মনীষীদের নিয়ে লেখা। এঁরা হলেন আচার্য ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইৎমদ-দ্দৌলা, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ডেভিড হেয়ার, সম্রাজ্ঞী মমতাজ, দীনবন্ধু মিত্র, মহাকবি মধুসূদন, রাজর্ষি রাম মোহন, প্যারীচাঁদ মিত্র, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র, গোখলে ও কবিবর দিজেন্দ্রলাল রায়। গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি কবিতার প্রথম স্তবকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযুষ দানে,
মমতা তোর মেদুল হ'ল মধুর হল। নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ—নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুনতে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চল্‌ছে কিবা!
দেখ্‌ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

এরকম অনেক কবিতা এ গ্রন্থে সংকলিত। অভ্র-আবীর বাংলা কাব্যের একখানি চিরায়ত গ্রন্থ। **খা.বি.জ.উ.**

অমর একুশে : ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য রাজপথে জীবন দিয়েছিল। সেই থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির শুধু শহীদ দিবস নয়, ত্যাগ ও শক্তির দিবসও। এই দিন বাঙালিকে উজ্জীবিত করে, অনুপ্রাণিত করে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে। বলা হয় ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ। একুশে ফেব্রুয়ারির এই চিরশক্তির রূপ বাঙালির মহান ঐতিহ্য। একে কেন্দ্র করে রচিত হয় শিল্প সাহিত্য। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে অমর একুশে হিসেবে প্রতীকী চেতনায় ভাস্বর হয়ে আছে। **সে. হো.**

অমর একুশে—হায়াৎ মামুদ। উনিশ শ' বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এ দেশে কি ঘটেছিল এবং এর পূর্বাপর ঘটনাপঞ্জি নিয়ে রচিত গ্রন্থ 'অমর একুশে'। বাংলা একাডেমী ১৯৮৫ সালে গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এ দেশে ভাষার জন্য যে আন্দোলন হয়েছিলো সে আন্দোলনে ছাত্র জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ভাষার দাবিতে শহীদ হন—আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, সফিউর রহমান, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবদুস সালাম প্রমুখ। হায়াৎ মামুদ অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এ ইতিহাস তাঁর গ্রন্থে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'কাঁদতে আসি নি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি' শীর্ষক মাহবুবুল আলম চৌধুরী রচিত একুশের প্রথম কবিতার উল্লেখ এবং আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী রচিত একুশের বিখ্যাত গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। **শা. আ.**

অমর একুশের প্রবন্ধ : বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন। সংকলনটির সম্পাদনার সাথে যুক্ত

www.pathagar.com

ব্যক্তিরা হচ্ছেন—মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সেলিনা হোসেন, নূরুল ইসলাম ও মোবারক হোসেন। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০০। প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার। পৃষ্ঠা : ৩২০। মূল্য : ১৫০.০০ টাকা। সংকলনটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 'প্রসঙ্গ কথা' থেকে জানা যায় : 'একুশে ফেব্রুয়ারির মাহাত্ম্য আজ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ফলে একুশকে নতুনভাবে জানার, বোঝার ও বিশ্লেষণের এক নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। যুগের এ দাবি মেটাতে হলে আমাদের গদ্য শিল্পী, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের একুশ বিষয়ক চিন্তা-চেতনার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।' সংকলনটিতে ৪৫ জন লেখকের সর্বমোট ৫৮টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন ভাষাপণ্ডিত, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক-শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, রাজনৈতিক অঙ্গনের ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, সৃজনশীলকর্মের শিল্পী প্রমুখ নানাজন। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে খণ্ডিত বাংলার পূর্বাংশের মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম শুরু ১৯৪৭ সাল থেকেই। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল এ ভূ-খণ্ডের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা লাভের পথে প্রথম দর্পিত পদক্ষেপ—বাঙালির প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল—যার সফল পরিণতি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। 'অমর একুশের প্রবন্ধে' অন্তর্ভুক্ত রচনাসমূহে বিগত প্রায় সাড়ে পাঁচ দশকে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সংগ্রাম ও অর্জনের ইতিহাস বিবৃত রয়েছে। সা. আ.

অমর কোষ : সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থ। রচয়িতা অমরসিংহ। গ্রন্থের আসল নাম ছিল 'নাম লিঙ্গানুশাসন'। উত্তরকালে বইটির এই মূল নাম পরিবর্তিত হয়ে রচয়িতার নামানুসারে নাম হয় 'অমর কোষ'। এতে লিঙ্গানুসারে শব্দের সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থ প্রচলিত অভিধান-জাতীয় কিছু নয়। বাছাই করা শব্দের সংগ্রহ বা সংকলন মাত্র। এতে সংকলক কতগুলো সংস্কৃত শব্দকে স্বরাদিকাণ্ড, ভূম্যাদিকাণ্ড ও সামান্যকাণ্ড—এই তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক কাণ্ডকে আবার কতগুলো বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। মূল সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দ ও লিঙ্গ শ্লোকাকারে লিখিত হয়েছে। কতগুলো সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দও এতে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। এই কোষ-গ্রন্থে শব্দ দুই রূপে সংকলিত হয়েছে—একার্থ ও নানার্থ। গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত। সংস্কৃতে রচিত যাবতীয় কোষ-গ্রন্থই অবশ্য পদ্যে রচিত। এটি প্রাচীন কালের জ্ঞানার্থীদের একটা বড় প্রয়োজন মিটিয়েছিল। 'অমর কোষ'-গ্রন্থে অনেক নতুন শব্দ, বিশেষত কথ্যভাষা থেকে শব্দ গৃহীত হয়েছিল বলে এর টীকাভাষ্য রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন পরবর্তী কালের অনেক পণ্ডিত। অমরকোষের টীকাকারদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন একাদশ শতাব্দীর ক্ষীরস্বামী, দ্বাদশ শতাব্দীর বন্দ্যঘটয়ীয় সর্বানন্দ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর রায়মুকুট। ক্ষীরস্বামী-রচিত টীকা প্রাচীনতম ও সর্বাধিক পরিচিত। রচয়িতা অমরসিংহ বৌদ্ধপণ্ডিত ছিলেন বলে জানা যায়। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন হিসেবে তাঁর নামের উল্লেখ থাকায় পণ্ডিত হিসেবে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি সম্ভবত ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী লোক ছিলেন। সু.মু.

অমরনাথ ভট্টাচার্য : সঙ্গীতজ্ঞ। ১৮৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যও সঙ্গীতবিদ ছিলেন। পিতার কাছেই অমরনাথের সঙ্গীত শেখার সূচনা হয়। পরে ধ্রুপদ গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী এবং ধামারী বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের

www.pathagar.com

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে পরিচিত হন। শেষ বয়সে তিনি বাংলা গানেরও চর্চা করতেন। অমরনাথ ভট্টাচার্য ১৯৫৮ সালে বিশ্বভারতীর ভিজিটিং অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বারানসী ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে ১৯৬৫ সালে 'সঙ্গীত রত্ন' এবং সুরেশ সঙ্গীত সংসদ ১৯৬৭ সালে 'বাঙলার সঙ্গীতজ্ঞ' উপাধিসহ একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। অমরনাথ সারাজীবন অপেশাদার গায়ক ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। আ. ন. ম. ব. র.

অমরসিংহ : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১২৯৬ সন। সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিতে উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। বিহারের বিদ্রোহী নেতা কুমারসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরসিংহের ঘটনাবহুল জীবন এতে চিত্রিত হয়েছে। একখণ্ড ভূখণ্ডের অধিকারী রাজপুত বীর কুমারসিংহ যৌবনের উচ্ছৃখলতায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সিপাহী বিদ্রোহকে অবলম্বন করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরসিংহ হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার সংকল্প করেন। মুসলমান ফকির ফুলসিংহ এ ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করেন। কিন্তু অমরসিংহের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজ সরকার বিদ্রোহীদের দমন করে। অমরসিংহ ফিরে আসেন। তাঁর পত্নী রানী তাঁকে দেখে আবেগবিহ্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বাসঘাতক রামসরণ রানীকে অপহরণ করে নিলে ফুলশাহের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়। এদিকে রামসরণ যখন অমরকে বন্দি করে, তখন ইংরেজ রমণী মিম হাইলর ওরফে লরা তাঁকে কৌশলে মুক্ত করে। অমরের প্রতি লরার হৃদয় দৌর্বল্য ছিল। অমরের ভ্রাতৃবধূ লছমী রামসরণের গুলিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে দেবরকে রক্ষা করেন। অমরসিংহ রানীকে নিয়ে নেপালে পলায়ন করেন। অমরসিংহের পারিবারিক জীবনের চিত্র কতকটা বাস্তবসমৃদ্ধ রূপে চিত্রিত হয়েছে। কুমারসিংহের মৃত্যু দৃশ্যে করুণ রস উৎসারিত হয়েছে। ফুল শাহ একটি মহাপুরুষ চরিত্র। আ.ই.

অমরাবতী : হিন্দুপুরাণ মতে স্বর্গের অন্যতম নাম। ইন্দ্রের রাজধানী। বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত অমরাবতী দেবতাদের বাসভূমি ও সুমেরু পর্বতের উপর অবস্থিত। এখানে জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ ও মৃত্যু নাই এবং চিরবসন্ত বিরাজমান। অমরাবতীতে নন্দনকানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভী, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি সুখসাধন সামগ্রী বিদ্যমান ও নৃত্যগীতাদি মুখরিত অপ্সরা, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরগণ অবস্থান করেন। সু.মু.

অমরুশতক : সংস্কৃত 'শতক' কাব্য। এ ধরনের কাব্যে সাধারণত একজন কবির রচিত একশতটি শ্লোক থাকে। এরূপ সংকলনকে কোষ কাব্যও বলা হয়। অমরুশতকের চার চারটি ভাষ্য পাওয়া গিয়েছে। এদের শ্লোকসংখ্যা ৯৬ থেকে ১১৫। সকল ভাষ্যেই সাধারণ শ্লোকের সংখ্যা ৫১টি। অমরুশতক শৃঙ্গাররস প্রধান শ্লোকের সমষ্টি। শ্লোকগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকার বিভিন্ন মানসিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। অমরু কাব্য সম্পর্কে ধ্বনিকার বলেছেন : 'অমরুর এক একটি শ্লোক যেন এক একটি প্রবন্ধ।' বস্তুত নায়ক-নায়িকার প্রণয় বর্ণনার নৈপুণ্যে, ভাষাসৌষ্ঠবে, ছন্দোবৈচিত্র্যে ও আলেখ্য চিত্রণে অমরুশতকের শ্লোকগুলো অনবদ্য ও অতুলনীয়। সংস্কৃতে রচিত যাবতীয় শতক বা কোষকাব্যের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতদের মতে, অমরুর কবির কবিত্বশক্তি কালিদাসের সমতুল্য। তাই চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য। অমরুর ব্যক্তি-পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন সর্বপ্রথম অমরুর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এ থেকে এটুকুই শুধু নিশ্চিত করে বলা যায় যে অমরুআনন্দ বর্ধনের পূর্ববর্তী। সু. মু.

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ : সাহিত্যিক। তাঁর জীবনকাল ১৯০৭ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনসংগ্রাম কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করে খ্যাতিমান হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর নাম : 'চরকাশেম, 'পদ্মদীঘির বেদেনী', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী' ও 'দক্ষিণের বিল'। অমরেন্দ্রনাথ আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি স্বপরিবারে ভারতে চলে চান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আ. ন. ম. ব. র.

অমর্ত্য সেন : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ। মাতামহ শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক ক্ষিতিমোহন সেনের কর্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে ১৯৩৩ সালের ৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি মানিকগঞ্জে। পিতা আশুতোষ সেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। পিতামহ সারদামোহন সেন ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ। মাতা অমিতা সেন। অমর্ত্য সেন তাঁর বাল্যজীবন কাটান ঢাকার ওয়ারি এলাকার লারমিনি স্ট্রিটের বাড়িতে। ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন শান্তিনিকেতন থেকে। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. অনার্স (১৯৫৩), কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক ও পিএইচ.ডি. (১৯৫৯) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের অর্থনীতি ও দর্শনের অধ্যাপক। কেমব্রিজের পূর্বে যাদবপুর, অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে এক নতুন ধারার অবতারণা করেন যা মানব কল্যাণমুখী অর্থনীতি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, অপুষ্টি, সামাজিক অসাম্য ও নারী-পুরুষের বৈষম্যের কারণ ব্যাখ্যা করে এসব সংকট মোচনের উপায় অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ দিয়েছেন, কেবলমাত্র উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি-নির্ভর অগ্রগতি অর্থহীন উন্নয়নে পর্যবসিত হবে যদি না দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষ তার সুযোগ পায়। তাঁর তত্ত্বানুসারে গরিব মানুষের শ্রমবিক্রির অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলেই কেবল দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়া যাবে। অমর্ত্য সেন তাঁর এই কল্যাণ অর্থনীতি তত্ত্বের জন্য ১৯৯৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম এশীয় আর নোবেল বিজয়ী দ্বিতীয় বাঙালি। তাঁর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অমর্ত্য সেন তাঁর পুরস্কারের অর্থ (৯ লাখ ৩৮ হাজার ডলার) দিয়ে 'প্রতীচী ট্রাস্ট' (২০০০) নামে ঢাকা ও কলকাতায় দুইটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দুঃস্থ মহিলারা পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য এ ট্রাস্ট থেকে অর্থ সাহায্য পাবে। প্রকাশিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ : The Choice of Techniques (1960), Collective Choice and Social Welfare (1970), Economic Inequality (1973), Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), Employment, Technology and Development (1995). নূ. ই

অমল ধবল চাকরি : রাহাত খান রচিত উপন্যাস। বইটি প্রকাশ করেছেন মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ] ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮২। সময়ের স্রোতে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সমৃদ্ধির সন্ধানে ধাবমান ক'জন তরুণের ঘাত প্রতিঘাতময় একটি পর্বের মনোজ্ঞ লেখচিত্র। এই পরিমণ্ডলের পাঁচ বন্ধু—ফরহাদ, রকিব, রফিক, কেয়া ও আলী হায়দার টুনু। এরা একসময় একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো, অভিন্ন সূত্রে গাঁথা ছিলো তাদের সুখ-দুঃখ আনন্দ কৌতুক, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এরপর সময়ের ব্যবধানে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় ভিন্ন পরিমণ্ডলে অধিষ্ঠিত, স্ব স্ব মৌলিক প্রবণতায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত। প্রত্যেকেরই

www.pathagar.com

জীবনে এসেছে নতুন পরিচিত জন, কারো ভাগ্যে জুটেছে প্রতারণা, কেউ সমাজ রাজনীতির মার প্যাঁচে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছে। কিন্তু জীবন থেমে নেই। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সাংবাদিক রফিক, যার চাকুরিচ্যুতির খবর দিয়ে কাহিনীর শুরু, যার তারুণ্যের এক বিশেষ সময়ের অভিজ্ঞতা স্বাধীনতাউত্তর তাৎপর্যপূর্ণ কালপর্বকে তুলে ধরে, তারই জীবনের আরেকটি পর্যায়ে উপন্যাসের শেষ। রফিকের সাথে রমনাপার্কে দেখা হওয়া 'মে এণ্ড বেকার'-এর প্রাক্তন বৃদ্ধ কর্মী যিনি এখন লুকিয়ে ভিক্ষা করেন, একদা আশ্চর্য সুখী নবপরিণীতা ফওজিয়া, স্বামীর হাতের পুতুল কস্তুরী, বিশাল সম্পন্ন পরিবারের কর্ত্রী আশি বছরের বৃদ্ধা ফুফু, রহস্যময় আকর্ষণীয় সংগ্রামী নারী কেয়া, স্বপ্নবিলাসী ফরহাদ এবং কেয়ার প্রেমিক নাজির—যে কেয়ার প্রতি তুমুল প্রেমে আচ্ছন্ন ও বিবাহেচ্ছু কিন্তু অন্যের কাছে শোনা একটি কুৎসিৎ রটনায় সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে যেতে পারে—এরা সবাই এককেটি ভিন্ন ধারার মানব চরিত্রের প্রতিনিধি। জুলিয়ার গাইড হিসেবে 'মনপসন্দ' চাকরিটি পেয়ে রফিক যখন এই বিদেশিনীকে সুখী ফওজিয়ার মুখ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের শেষ প্রতিনিধি ফুফুকে দেখাতে নিয়ে যায়—দেখে-ফওজিয়া স্বামী পরিত্যক্তা, ফুফু অনতি-অতীতে লোকান্তরিতা ও তাঁর কর্তৃত্বের বিশাল সংসারটি খণ্ড বিখণ্ড। একদা জীবনের যে বৈভব রফিককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল, সামান্য সময়ের ব্যবধানে তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবু এরই মধ্যে জীবন ছুটছে অন্য আরেক বৈচিত্র্যের উৎস সন্ধানে। জীবনের অর্থই হলো গতিবেগ। পরিবর্তন। প্রবহমানতা। মানুষের ভূমিকা হচ্ছে সেই প্রবহমানতার সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে নিজস্ব অবস্থান তৈরির নিরন্তর সংগ্রাম করে চলা। খুব আকস্মিক ধুন্ধুমার ঘটনাবিক্ষেপের প্রাবল্য উপন্যাসে নেই, যেন আমাদেরই দৈনন্দিন জীবনের চিত্রাবলী ধীর লয়ে ফুটে উঠছে আর তা ছুঁয়ে যাচ্ছে পাঠকের মন, তাকে একাত্ম করে নিচ্ছে কাহিনীর আরো গভীরে। লেখকের এই স্বতঃস্ফূর্ত রচনাভঙ্গি বইটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। র. আ. ক.

অমল হোম : সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমালোচক। জন্মস্থান চব্বিশ পরগনার মজিলপুর নামক স্থান। জন্ম সাল ১৮৯৪। পিতা গগনচন্দ্র হোম। কর্মজীবনে প্রথমে 'প্রবাসী' ও 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকায় শিক্ষানবীশ রূপে যোগদান করেন। পরে সাংবাদিক রূপে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'বেংগলী' পত্রিকায়, লাহোরের 'দি পাঞ্জাবী' পত্রিকায় ও কালীনাথ রায়ের 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯২০ সালে এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' নামক দৈনিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ পালের সহকর্মী রূপে কর্মগ্রহণ করেন। তখন পণ্ডিত জওহরলালের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ সালে কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পরিকল্পিত মিউনিসিপ্যাল পত্রিকার দায়িত্ব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁকেও গ্রহণ করতে হয়। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর সাংবাদিকতা থেকে অবসর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 'ডাইরেক্টর অব পাবলিসিটি' পদে যোগদান করেন। পরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের 'চীপ ইনফরমেশন অফিসার' রূপে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহস্পর্শ লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক অপ্রকাশিত ঘটনার তিনি একজন একনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রাহক। রচিত গ্রন্থাবলী : পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, Some Aspects of Modern Journalism in India, Rammohon Roy and His works ইত্যাদি। ১৯৭৫ সালের ২৩ আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন। আ. ন. ম. ব. র.

অমলেন্দু দাসগুপ্ত : সাংবাদিক ও লেখক। ১৯০৩ সালে মাদারীপুর (ফরিদপুর) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগৎচন্দ্র দাসগুপ্ত। ছাত্র-জীবনে অগ্রজ নীরেন্দ্র দাসগুপ্তের ন্যায় স্বদেশীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। জেলে মাদারীপুর দলের বন্দিবিপ্লবীদের

www.pathagar.com

সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ধরা পড়ে কারাবরণও করতে হয়। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ১৯৩০ সালে বি. এ. পড়ার সময় পুনরায় গ্রেপ্তার হন। প্রায় আট বছর কাল ফরিদপুর, সিউরী, বকসাদুর্গ, দেউলীবন্দী-শিবির এবং প্রেসিডেন্সি জেলে কাটান। মুক্তির পর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক পরিচালিত 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামও ছিলেন। ১৯৪০ সালে পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৪৬ সালে ছাড়া পান। এরপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বক্‌শ ক্যাম্প', 'বন্দীর শিবির', 'তেটিনিটি' প্রভৃতি। তিনি ১৯৫৫ সালের ১১ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। আ. জ. ভূ

অমাবস্যা : অথর্ববেদে দেবতা রূপে কল্পিত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে সিনীবালী ও কুহু নামক দুজন দেবীকে অমাবস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। অমাবস্যায় আচরিত অনুষ্ঠানসমূহ চন্দ্র-সংক্রান্ত বিবিধ প্রাচীন বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অমাবস্যা প্রধানত কৃষ্ণপক্ষ শিব এবং দেবীকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্যও অমাবস্যা বিশেষ উপযুক্ত সময় রূপে গণ্য। আ. ই

অমিতাভ : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) রচিত অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় সৃষ্ট ছোট গল্প। লেখকের 'জাতিস্মর' (ফাল্গুন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের প্রথম গল্প। এ গল্পের কাহিনী খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে কল্পিত। জাতিস্মরের মুখ দিয়ে গল্পের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। কাহিনীতে তথাগত বুদ্ধের মৈত্রী-করুণা-প্রেমোচ্ছলিত হৃদয়ের জ্যোতির্ষণে দুর্ধর্ষ অসুর প্রকৃতির দিঙনাগ এবং শ্রেণী নায়ক কুমারদত্তের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। মহামানব বুদ্ধ তাঁর দিব্যনয়নের অমৃতবর্ষী আলোকে হিংসাদ্বেষ জিঘাংসা কলুষিত মানুষের জীবন নবমহিমায় উদ্ভাসিত করে তোলেন। সামান্য পৌরাণিক কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য শিল্পকুশলতার সঙ্গে এই মহামূল্যবান জীবনকাহিনী রচনা করেছেন। ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে লেখক কাহিনীর বিচার করেছেন, ফলে তাঁর রচনা গালগল্পে পর্যবসিত না হয়ে মানবের জীবনেতিহাস হয়ে উঠেছে। •সু.ব.

অমিতাভ গুপ্ত : পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার কেউটা গ্রামে ১৯৪৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী, ১৯৬৭ সালে স্কটিস চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ পাস করেন। তিনি কলকাতা মওলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক। ১৯৭০-৮০ সালে রবীন্দ্র রচনাবলী কমিটিতে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়ক হিসেবে কাজ করেন। তিনি দুই বাংলাতেই উত্তর আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, অনূদিত, সম্পাদিত তাঁর প্রায় অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ এ অব্দি প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতবর্ষের দিকে' অনূদিত সংকলন গ্রন্থের জন্য তিনি বিশেষ পরিচিতি পেয়েছেন। এছাড়া 'সূর্যে ধ্বনিপটে' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। বাংলা কবিতায় তিনি ক্রমশ নিজস্ব ভঙ্গি অনুসন্ধানের দিকে চলেছেন। কবিতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৮৯ সালে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার এবং ১৯৯২ সালে উত্তরাপথ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। গৌ ম.

অমিতাভ দাশগুপ্ত : কবি। ১৯৩৫ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা সেইন্ট পলস্ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। এক সময় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। এছাড়া মানুষের সঙ্গে মিশেছেন তিনি নিবিড়ভাবে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার বিষয় কবিতায় এসেছে কখনো তির্যকভাবে, কখনো লড়াকু মেজাজে এবং তার ফলে কবিতার রূপ ও ভাববস্তু হয়েছে অগ্নিগর্ভ জ্যোতির মতো। শিল্পপ্রকরণে তিনি

www.pathagar.com

দেশী ও বিদেশী শব্দের ঢালাও প্রয়োগ দক্ষতা দেখিয়েছেন। অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার বই—সমুদ্র থেকে আকাশ (১৯৫৭), মৃত শিশুদের জন্য টফি (১৯৬৪), মধ্য রাত্র ছুঁতে আর সাত মাইল (১৯৬৭)। সম্পাদিত কবিতা সংকলন—কবিতার পুরুষ (১৯৭০)। আ. জ. ভূ.

অমিত্রাক্ষর (অমিল প্রবহমান পয়ার) : বাংলা কবিতার একটি বিশেষ পঙ্‌ক্তিরূপের নাম অমিত্রাক্ষর। বহুল প্রচলিত পয়ারকাঠামোর উপর ভিত্তি করে তা রচিত। পয়ারের সুনির্দিষ্ট বিধান হচ্ছে, ৮ মাত্রার পূর্ণপদের পর অর্ধযতি, এবং পরবর্তী ৬ মাত্রার অপূর্ণপদের পর পূর্ণযতি পড়ে। অমিত্রাক্ষরে এই বিধান লঙ্ঘন করে যতি প্রয়োগ করা হয় একই সঙ্গে প্রবহমান ভাব ও স্পন্দ সৃষ্টির অনুকূলে। ফলে পর্ব, পদ বা পঙ্‌ক্তি শেষে কোথাও যতি পড়ে, কোথাও বা লুপ্ত হয়। তবে পয়ারের ১৪ মাত্রার সমাবেশটুকু প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই সুরক্ষিত থাকে। এছাড়া অমিত্রাক্ষরে বর্জন করা হয়েছে প্রচলিত পয়ারের পঙ্‌ক্তিপ্রান্তের মিল (rhyme)। কারণ, মিলের বন্ধনও যে ভাবমুক্তির অন্যতম বাধা। তাই মিল তুলে দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ভাবের স্বচ্ছন্দ গতি। মোট কথা, স্বাধীনযতি ও মুক্তিগতি মিলবিহীন ১৪ মাত্রার প্রবহমান পঙ্‌ক্তিরূপই অমিত্রাক্ষর। এই ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেই একে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। ছন্দশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সেন এর শাস্ত্রীয় নাম দিয়েছেন অমিল প্রবহমান পয়ার। উদাহরণ—

নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাখব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে, ফুল-দল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

[মেঘনাদবধ কাব্য (প্রথম সর্গ)]

মিল্‌টনের blank verse অনুসরণে মধুসূদন বাংলায় অমিত্রাক্ষর রচনা করেন। তবে অমিত্রাক্ষর, five-stress line ও foot (পর্ব) নির্ভর blank verse-এর অনুকার নয়, ১৪ মাত্রার পয়ারপঙ্‌ক্তি ভিত্তিক এক অনবদ্য প্রবহমান পঙ্‌ক্তিরূপ। এর সফল প্রয়োগ মেঘনাদবধ কাব্যে (১৮৬১) লক্ষিত হয়। অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের ফলে বাংলা ছন্দে অভিনব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শা. ঠা.

অমিয় চক্রবর্তী : কবি। ১৯০১ সালের ১০ এপ্রিল শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সালে ডি. ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৬-১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব ছিলেন। ১৯৪০-১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এবং ১৯৪৮-১৯৬৭ সালে হাওয়ার্ড, বস্টন ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক প্রাচ্যধর্ম ও সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। বিশ শতকের বাংলা কবিতায় যে অস্থির ভাবপ্লাবন দেখা দেয়, অমিয় চক্রবর্তী সেই প্লাবন থেকে নিজেকে রক্ষা করে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকারী হিসাবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। নতুন যুগের কাব্যধারায় তিনি সূক্ষ্ম মানসিকতা আনয়নের পক্ষপাতী, সাহিত্যের ক্লেদ, লাঞ্ছনা ও আবর্জনাকে ধুয়েমুছে কবিতার সুঠাম দেহ নির্মাণে তিনি সারাজীবন নিরলস সাধনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং কীটস তাঁর প্রিয় কবি। কেননা, দুজনই তাঁর কাছে সুন্দরের অনুপম সুরকার। উপরন্তু ইয়েটস, ফ্রস্ট, রিলকে এবং এজরা পাউন্ডের কবিতার রসাস্বাদনে তিনি আনন্দ পান। অমিয় চক্রবর্তী মনে করেন, 'প্রাণের সর্ববিধ কোমল, মর্মগত এবং শক্তিময় প্রকাশের মতো কাব্য-রচনার মূল্যও অসীম'। এই চরম সংশয়াপন্ন অস্থির মানসিকতার যুগেও আজকের দিনের কবিতার উত্তরণে তিনি আশাবাদী। তাঁর অভিমত, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি, এখন নানা দিকে দেশ-দেশান্তরে তার উজ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। অমিয় চক্রবর্তীর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ : খসড়া (১৯৩৮), এক মুঠো (১৯৩৯), মাটির দেয়াল (১৯৪২), অভিজ্ঞান বসন্ত (১৯৪৩),

www.pathagar.com

দুরযানী (১৯৪৪), পারাপার (১৯৫৩), পালাবদল (১৯৫৫), ঘরে ফেরার দিন (১৯৫৫) ইত্যাদি। ১৯৮৭ সালে তিনি লোকান্তরিত হন। আ. জ. ভূ

অমিয়-ধারা : কবি কায়কোবাদের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক : পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ৭৩/৭৪ পাটুয়াটুলি, ঢাকা। প্রকাশকাল : তৃতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৭৬, প্রচ্ছদপট : মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মূল্য : পাঁচ টাকা। প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থটিতে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব প্রেমের কবিতা সম্বলিত করা হয়েছিলো। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখেছেন : 'বহুদিন পরে এবার অমিয় ধারার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণের ত্রুটিগুলি যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া অধ্যাত্মিক প্রেমের কতকগুলি নতুন কবিতা এতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। ভালো কি মন্দ করিয়াছি, সে বিচারের ভার সুধী পাঠকের উপরে অর্পিত হইলো। তবে সেগুলি যে পাঠকদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, সে আশা আমার আদৌ নেই, কেননা, কবিতা স্বর্গীয় জিনিস অমৃতের উৎস।' অমিয়-ধারা আধ্যাত্মিক কবিতার একটি চমৎকার গ্রন্থ। গ্রন্থিত কবিতার রসমাধুর্য ও মহান সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তন ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত বিখ্যাত 'আজান' এই গ্রন্থটিতে রয়েছে। এ ছাড়াও এ গ্রন্থটিতে রয়েছে প্রথমেই জগদীশ্বর শিরোনামের আর একটি চমৎকার কবিতা। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। তৃতীয় খণ্ডটি 'বঙ্গীয় মোস্লেম' সমাজের নেতার উদ্দেশে লেখা। দ্বিতীয় খণ্ডটি মুসলমান ভ্রাতাদের অনুরোধে লেখা। হিন্দু পাঠকদের পাঠ না করার জন্য কবি খণ্ডের শুরুতে বিনীত অনুরোধ করেছেন। এই গ্রন্থটির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো : প্রাণের বীণা, দিনের শেষে, স্মৃতি, মৃত্যু, সুখ, ভুল, বাসর ঘর, আহ্বান, শিশির বিন্দু, শশধর, গোরস্থান, দুনিয়া, অর্ঘ্য, মানবজন্ম, বঙ্গভাষার কাব্য কুঞ্জ, সেকেন্দ্রা, হিন্দু-মুসলমান, আমাদের গ্রাম, কবির দ্বিতীয় আহ্বান এবং কায়কোবাদের স্মৃতি লিপি। খা. বি. জ. উ.

অমিয় নিমাইচরিত : অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪২-১৮৭১) প্রণীত একটি বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ। গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ হচ্ছে গৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, পাঠ্যাবস্থা, যৌবনে সন্যাস গ্রহণ, প্রেম ও ভক্তির বিকাশ, হরিনাম কীর্তন ইত্যাদি। বিষয়সমূহের বর্ণনায় শিশির ঘোষের কবিমনের চমৎকার বিকাশ ঘটেছে। দুখণ্ডে বিভক্ত এ পুস্তকের একটি ইংরেজি অনুবাদও লেখক নিজেই করেছেন। আ. জ.

অমিয়ভূষণ মজুমদার : কথাসাহিত্যিক। ভিন্নধারার গদ্যশিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ১৯১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার শহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি বাড়ি বাংলাদেশের পাবনা জেলার পাকুরিয়ায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৩৯ সালে ডাক ও তার বিভাগে চাকরি নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে কুচবিহার শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। অমিয়ভূষণ মজুমদার লেখালেখি শুরু করেন পঞ্চাশ দশকে। তাঁর অধিকাংশ রচনা নতুন সাহিত্য ও মাসিক চতুরঙ্গে প্রকাশিত হয়। উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে আলাদা স্থান করে নেন। তাঁর উপন্যাসে সাধারণ মানুষ, গ্রামজীবন ও দেশভাগের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। গড় শ্রীখণ্ড ও রাজনগর তাঁর বহুল পঠিত উপন্যাস। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম নীল ভূইয়া। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় রাজনগর। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো : বিশ্ব মিস্তিরের পৃথিবী, চাঁদ বেনে, মহিষকুড়ার উপকথা, নির্বাস, মধু সাধুখাঁ, নয়নতারা, দুখিয়ার কুঠি, বিবিক্তা, পাঞ্চকন্যা, দীপিতার ঘরে রাত্রি, এই অরণ্য এই নদী এই দেশ, ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ, ম্যাকডেফ মাহো ও অন্যান্য গল্প এবং কেন লিখবো। 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্কিম পুরস্কার এবং রাজনগর উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার

www.pathagar.com

লাভ করেন ১৯৮৬ সালে। সাপ্তাহিক দেশ কর্তৃক গত ৫০ বছরের সাহিত্য জরিপে তাঁর রচিত 'রাজনগর' গ্রন্থটিকে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও 'একটি বিপ্লবের সত্য' গল্পটিকে শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৮ জুলাই ২০০১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। খা. বি. জ. উ.

অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা : লায়লা সামাদ রচিত গল্পগ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে। প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী, ৪১, নয়া পল্টন, ঢাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : বারো টাকা মাত্র। গ্রন্থটিতে মোট ৯টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলোর নাম 'অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা', 'তিল', 'সিঁড়িতে অন্ধকার', 'বসন্তের পাখীরা', 'যখন গান গায়', 'আলোকিত অন্বেষণ', 'বিপ্লুত বাসনা', 'জয়েন্ট', 'জীবন যেমন' এবং 'সভানেত্রী'। গল্পগ্রন্থের নামগল্প অমূর্ত আকাঙ্ক্ষায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অবস্থান করেছে আজন্ম দুঃখিনী এক মেয়ে, নাম সুরমা। তাঁর অস্তিত্ব যন্ত্রণাক্লিষ্ট। সুরমা তাঁর মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলবার প্রয়াসে রাতের অন্ধকারে সেলিমের প্রেমিক নতুন বৌয়ের শাড়ি-গয়না চুরি করে পরেছে। সেখানে নীতিবোধ, সংযম সবকিছু তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। 'তিল' গল্পে চিবুকের নিচে তিল শোভা পাচ্ছে এমন একজন অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়েকে শহীদ বিয়ে করেছে। কিন্তু নিয়তি এমনই যে, তিন মাসের মধ্যেই মেয়েটির ক্যান্সার ধরা পড়ে। 'সভানেত্রী' গল্পে দেখা যায় মহিলা সমিতির সভানেত্রী আবেদা আফজল একজন বাক্‌সর্বস্ব মহিলা। তিনি যা বলেন, বলার প্রয়োজনেই বলেন। তাঁর বাস্তব চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। লায়লা সামাদের 'অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা' গল্পগ্রন্থে মানব জীবনের বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে গল্পগুলোয় বিষয়গত বহুমাত্রিকতার অভাব রয়েছে। সৈ. আ. জা.

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : ছান্দসিক, সাহিত্য-সমালোচক, প্রাবন্ধিক। জন্ম রংপুর জেলায় ১৯০২ সালে। আদি নিবাস যশোরের নবগঙ্গা তীরবর্তী কাশীপুর গ্রামে। পিতা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা পান্না দেবী। তাঁর বাল্যকাল কাটে রংপুর-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চলে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯২২ ও ১৯২৬ সালে যথাক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে এবং অনিয়মিত (নন্‌কলেজিয়েট) ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক (১৯২৭-৩৮) হিসেবে কাজ করার পর ১৯৩৮ সালে কলকাতায় যোগমায়া কলেজে (আশুতোষ কলেজের প্রাতঃবিভাগ) যোগদান করেন এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পড়ান। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ইংরেজির খণ্ডকালীন প্রভাষক নিযুক্ত হন এবং যোগমায়া কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর পাঁচ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। বাংলা কবিতার ছান্দসিক হিসেবে অমূল্যধনের অবদান পথিকৃতের। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় লেখা কবিতার ছন্দ নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ছন্দ নিয়ে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই প্রথম সুগভীর আলোচনার সূত্রপাত ঘটান গত শতাব্দীর শেষ দিকে (১৯২০)। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল প্রবোধচন্দ্র সেনের ভাষায় 'বিশ্লেষক' বা 'ছন্দব্যাকরণের' নয়, 'স্রষ্টার'। অমূল্যধনই সেদিক থেকে বললে 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' (১৯৩২) গ্রন্থে প্রথম 'বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা' করেন। রবীন্দ্রনাথ এজন্যে তাঁকে অভিষিক্ত করেছেন 'ছন্দতত্ত্বে প্রবীণ' সম্মাননায়। অমূল্যধন তিনটি বাংলা সমালোচনা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার দুটি রবীন্দ্রবিষয়ক। তার প্রণীত এই গ্রন্থগুলি হচ্ছে : কবিগুরু : রবীন্দ্রকাব্যের মূলসূত্র (১৯৬৪), রবীন্দ্রনাথের মানসী (১৯৬১) এবং আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (১৯৬১)। তাঁর একমাত্র শিশুতোষ গ্রন্থ নবাব কাহিনী (১৯৮০)। ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থ : Sanskrit Prosody :

www.pathagar.com

Its Evolution (1976)। এছাড়া গ্রন্থভুক্ত হয়নি বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত এরকম বেশকিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বেতালভট্ট ছদ্মনামে তিনি কিছু ব্যঙ্গ ও রম্যরচনাও লিখেছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ড. মা. জা.

অমৃত : পুরাণে উক্ত হয়েছে, পৃথুরাজার উপদেশে ধরিত্রীকে গাভী ও ইন্দ্রকে বৎস করে দেবতাদের দ্বারা হিরন্ময় পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হয় এবং তাতেই অমৃত উৎপন্ন ময়। দুর্বাসার অভিশাপে ঐ অমৃত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। পরে উক্ত প্রক্রিয়ায় সমুদ্রগর্ভ থেকে অমৃত আহরণ করা হয়। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে অমৃতের সঙ্গে দধি, সুরা, সোম, লক্ষ্মী, অশ্ব, কৌস্তভ, পারিজাত এবং পরিশেষে কালকূট উঠে। অসুরদের বিভ্রান্ত করতে বিষ্ণু মোহিনী বেশে দেবতাদের মধ্যে অমৃত বন্টন করেন, তখন রাহু অমৃত গ্রহণ করলে তার মস্তক খণ্ডিত হয়। পরাজিত হয়ে অসুরেরা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। সুধা, পীযূষ ও জীবনবারি দেবতারা পান করে অমর হয়েছেন। মহাভারতে অমৃত সম্পর্কে বলা হয়েছে, অসুরদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে দেবতারা হীনবল হলে তাঁরা বিষ্ণুর কাছে অমরত্বের প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তখন কূর্মরূপ ধরে সমুদ্রমন্থন করে অমৃত সংগ্রহে দেবতাদের সহায়তা করেন। মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড রূপে এবং বাসুকী সর্পকে মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করে সমুদ্রগর্ভ থেকে অমৃত আহরণ করা হয়। আ. ই

অমৃত কুম্ভের সন্ধানে : কালকূট। প্রকাশকাল ১৯৫৫, কলকাতা। এ উপন্যাসের মধ্য দিয়েই 'কালকূট' ছদ্মনামে সমরেশ বসুর উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। একই সঙ্গে এক জীবনদর্শন থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটে এক ভিন্নতর জীবনদর্শনে। মার্কসবাদ থেকে তিনি ঝুঁকলেন অধ্যাত্মবাদের দিকে। প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রতি বছর যে কুম্ভমেলা হয়ে থাকে, যেখানে ভারতবর্ষের সকল স্তরের মানুষের সমাবেশ ঘটে, সেই মহামানবের মিলনমেলাই 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ১৯৫৪ সালে সমরেশ বসু গিয়েছিলেন কুম্ভমেলায়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন— 'চোখের সামনে কল্পনা এঁকে দিল একটি ছবি। প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে মহামানবের মেলা। বলতে কি, কেমন একটা শিহরণ ঢেউ দিল প্রাণে। বাঁশির ডাক শুনতে এবার ভুল হলো না। সারাদেশের মূর্তিখানি যদি দেখতে হয়, তবে সেই মেলার প্রাঙ্গণে চলো।... ভেবেছিলাম, সারা ভারতের দর্শন পাব ওই সঙ্গমভূমিতে। কিন্তু দেখছি বিশ্ব করে কোলাকুলি। পশ্চিমের গোরা–গৌরীরাও দেখছি মিলেছে এসে।' সমরেশ বসু কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন রিপোর্টারের চোখ নিয়ে দেখতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ভ্রমণকাহিনী হয়ে উঠল এক বিস্ময়কর উপন্যাস, যা তাঁকে পৌঁছে দেয় সাফল্যের তুঙ্গে। 'দেশ' পত্রিকায় প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এ উপন্যাস। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসের মধ্যে সমরেশ বসুর দ্বিতীয় সত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এখান থেকেই তাঁর লেখার রীতিও বদলে গেল। কুম্ভমেলায় যাওয়া গোষ্ঠী থেকে জনতায়—জীবন মন্থন করে যে বিশ্বাস অমৃতরূপ লাভ করে তার খোঁজে। লোকাচারের পাপপূণ্য পেরিয়ে গঙ্গা এবং যমুনার গলাগলি যেই ত্রিবেণীতে, সেখানে গিয়ে কালকূট সমরেশ প্রত্যক্ষ করলেন অখণ্ড ভারতের জীবনপ্রবাহকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের সামাজিক–রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের ব্যাপক ভাঙন মানুষকে করে তুলেছে দিশেহারা। চারপাশের বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। তাই তারা আশ্রয় খুঁজেছে ধর্ম ও ঈশ্বরে। শুভ মূল্যবোধ ও জীবনের সুস্থতার সন্ধানে, আত্মশুদ্ধির আকুলতায় তারা ছুটে গেছে পূণ্যভূমিতে, সঙ্গমের জলে অবগাহন করে হতে চেয়েছে পবিত্র। মানুষের বিশ্বাসের সংকট থেকে উত্তরণের আকুতিই অভিব্যক্ত হয়েছে এ উপন্যাসে। কুম্ভমেলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর লেখকের অধ্যাত্ম অনুভূতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ড. শা. আ.

www.pathagar.com

অমৃত পথযাত্রী : সুবোধ ঘোষ। পঞ্চাশের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম রূপকার সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর জীবন, তাঁর রাজনীতি, আদর্শ ও চিন্তাধারার একটি স্বচ্ছ ও অনুপুঙ্খ লেখচিত্র এঁকেছেন এই জীবনী গ্রন্থে। জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ সালে। ভারতের গুজরাটে জন্মগ্রহণকারী একটি অতি সাধারণ ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান মহাত্মা গান্ধী কালের পরিক্রমায় কিভাবে ভারতের রাজনীতির তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধানতম প্রাণপুরুষে পরিণত হলেন, তারই হৃদয়গ্রাহী বিবরণ তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষার সারল্য, উপস্থাপনার আপাত রোমাঞ্চকর চমৎকারিত্ব ও বিশ্লেষণের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায়। সর্বমোট পনেরোটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এক মহামনীষীর শৈশব, কৈশোর থেকে শুরু করে তাঁর শিক্ষা, মানস গঠনের নানা উপাদান, ভবিষ্যৎ জীবনের এক সত্যসন্ধ কর্মযোগী সংগ্রামী মহাপুরুষের আবির্ভাবের ইঙ্গিতবহ ঘটনাবলী এবং সার্বিক জীবনাদর্শের গভীরতর মর্মবাণীর তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণসমূহ। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস রাজনীতি ও সত্যাগ্রহ, তাঁর স্বপ্ন-কল্পনার আরাধ্য বিশ্বব্যাপী রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, গান্ধীর রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক প্রায়শই গান্ধীর নিজস্ব বক্তৃতা-বিবৃতি ও রচনার উদ্ধৃতি ব্যবহার করে। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-দর্শন, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মতাত্ত্বিকের জীবন ও আধুনিক জীবনদর্শনসঞ্জাত সাহিত্যের অধ্যয়ন থেকে গান্ধীবাদের যে অদৃশ্য পরিকাঠামো ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করে ওঠে, লেখক এই গ্রন্থে সাফল্যের সঙ্গে তার অন্তরের স্বরূপটি উন্মোচন করেছেন নিজের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে। মা. শা.

অমৃতলাল গুপ্ত : উনিশ শতকের গীতিকার। ঢাকায় জন্ম। কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন' গানটি রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ক. গো.

অমৃতলাল বসু : নাট্যকার ও অভিনেতা। ১৮৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৈলাশচন্দ্র বসু। ১৮৬৯ সালে কলকাতা জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। দুই বছর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাশীতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কলকাতায় তার চর্চা শুরু করেন। কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। পরে সরকারি চিকিৎসক হিসেবে পোর্টব্লেয়ার যান। কিছুকাল পুলিশ বিভাগে চাকরি করেন। নাট্যকার, অভিনেতা ও মঞ্চ পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের সৈরিন্ধ্রী চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনয়-জীবন শুরু করেন। এরপর গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, স্টার, মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রহসন, রোমান্টিক ও পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন। তবে প্রহসন রচনায় অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। চিন্তা ও কর্মের রাজ্যে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধি। সামাজিক প্রগতি, উনিশ শতকের নবজাগরণ, নারীস্বাধীনতা, ইংরেজি শিক্ষা ও হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি তাঁর প্রহসনগুলো রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য নাটক-প্রহসন : হীরকচূর্ণ (১৮৭৫), তিলতর্পণ (১৮৮১), চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে (১৮৮৪), তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯০), বাবু (১৮৯৪), গ্রাম্যবিভ্রাট (১৮৯৮), হরিশচন্দ্র (১৮৯৯), সাবাস আটাশ (১৯০০), বিজয়বসন্ত (১৯০১), বৈজয়ন্তবাস (১৯০১), খাসদখল (১৯১২), ব্যাপিকা বিদায় (১৯২৬), দ্বন্দ্বেমাতরম (১৯২৬), কালাপানি। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী এবং বাগ্মীরূপেও পরিচিত ছিলেন। শ্যামবাজার অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুলের সেক্রেটারি, সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি এবং এশিয়াটিক

www.pathagar.com

সোসাইটির সভ্য ছিলেন। হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসন রচনার জন্য তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে 'রসরাজ' উপাধি পান। ১৯২৯ সালের ২ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নূ. ই.

অমৃত সমান : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চোরাই মদের আড্ডাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত নাটক। গঙ্গামণি নাম্নী একজন নারী এই নাটকের মূল চরিত্র। দলের রানী রূপে সে পরিচিত। মদের চোরাকারবাদীদের সঙ্গে সে জড়িত। দলে আসার আগে তার নাম ছিল কনকলতা। স্বামীর অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষিত যুবক নির্মল তাকে ভালোবেসে ফেলে। কনক নির্মলের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। নির্মল ধরা পড়ে। নারীহরণের অপরাধে তার পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়। কুলত্যাগিনী কনকলতার সমাজে স্থান হয় না। জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে চোরাকারবারীদের দলে ভিড়তে হয়। এদিকে নির্মল জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কনকলতাকে খুঁজে বের করে তারই সঙ্গে বাস করতে থাকে। কিন্তু কনকের অসৎ ব্যবসাকে সে সমর্থন করতে পারে না। তাই একদিন সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। পনেরো বছর উদভ্রান্তের মতো এখানে–সেখানে ঘুরে নির্মল ভৈরব রূপে শেষ পর্যন্ত কনকের কাছেই ফিরে আসে। ঘৃণ্য কাজে নিয়োজিত থাকলেও কনক তার মানবীসত্তাকে বিসর্জন দেয়নি। ভৈরব নির্মলকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। একথা জানতে পেরে দলের সর্দার জয়রাম ভৈরবকে খুন করার চেষ্টা করে। গঙ্গামণি তাকে বাঁচাতে গেলে জয়রাম তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করার জন্য উদ্যত হয়। কিন্তু পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের আগেই সে তার এতদিনের সঞ্চিত অর্থ সৎকর্মে দান করে বিষপানে আত্মহত্যা করে। জয়রামের মতো সমাজবিরোধীদের উৎখাত করার জন্য গঙ্গামণি সবাইকে নির্দেশ দিয়ে যায়। সমাজ–সমস্যাকেই মূলত এই নাটকে রূপায়িত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কা.রো..

অমৃতসর : ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত একটি জেলা ও জেলা–সদর। অমৃতসর শহর শিখদের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। সম্রাট আকবর শ্রদ্ধাবশত চতুর্থ শিখগুরু রামদাসকে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পুকুরসহ একখণ্ড ভূমি দান করেন। রামদাস পুকুরটির সংস্কার সাধন করে এটিকে বৃহৎ সরোবরে পরিণত করেন। পরে এর নামকরণ করা হয় 'অমৃতসর'। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন দেব সরোবরের মাঝখানে হরিমন্দির নির্মাণ করেন। উক্ত মন্দিরকে কেন্দ্র করেই ক্রমশ একটি উন্নত শহর গড়ে ওঠে এবং তা শিখ জাতি কর্তৃক মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তৈমুর, আহ্মদ শাহ্ আবদালী প্রমুখের অভিযানকালে এই শহরের পত্তন ঘটে এবং মন্দিরটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী শিখেরা সিরহিন্দের যুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে ; মন্দিরটি পুনঃস্থাপিত হয় এবং অমৃতসর কিছুদিনের জন্য প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পায়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অমৃতসর জেলা রণজিৎ সিংহের অধিকারে আসে। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের (১৮৪৯ খ্রিঃ) ফলে পাঞ্জাবের অবশিষ্টাংশের সহিত অমৃতসরও ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাওলাখ অ্যাক্ট পাশ হলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। উক্ত সভায় ব্রিটিশ সেনাদলের গুলিবর্ষণে নিরস্ত্র লোক হতাহত হয়। এর ফলে সারা ভারতে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব অত্যন্ত তুঙ্গে ওঠে। এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নাইট–উপাধি ত্যাগ করেন। অমৃতসর একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র এবং তা ভারী ও কুটিরশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার নানা মেলা ও উৎসবের মধ্যে বৈশাখী মেলা ও দেয়ালি উৎসব প্রধান। নববর্ষ উপলক্ষে বৈশাখী মেলা শিখদের নিকট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অমৃতসরের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে 'দরবার সাহেব' স্বর্ণমন্দির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের অভ্যন্তরে জমকালো রেশমি চন্দ্রাতপতলে শিখদের প্রধান পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব' রক্ষিত আছে। স্বর্ণমন্দির থেকে ১১০ গজ দূরে গুরু হর গোবিন্দের পুত্র বাবা অটলের স্মৃতিসৌধ বিদ্যমান। সাধারণের বিশ্বাস, বাবা

www.pathagar.com

অটল ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এই স্মৃতিসৌধের উপর থেকে সমগ্র অমৃতসর শহর দেখা যায়। আ. খা.

অমৃতস্য পুত্রা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬) রচিত পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৩৮ সালে। বিত্তবান বীরেশ্বর দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে তার প্রথমা স্ত্রী একমাত্র পুত্র শ্যামলালকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা আর বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। শ্যামলালও পিতার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করে। এটুকু হলো কাহিনীর পূর্ব অংশ। পরের কাহিনী শ্যামলালের ছেলে অনুপমকে নিয়ে। তার মা সাধনা পুত্রকে পিতার আদর্শে গড়ে তোলে। একদিন ঘটনাচক্রে অনুপমের সঙ্গে শ্যামলালের পিতা অর্থাৎ তার দাদুর সাক্ষাৎ ঘটে। বীরেশ্বরের অর্থে অনুপম বিলেত যাওয়া স্থির করে। অনুপমের যুক্তি হলো তার পিতা শ্যামলাল যে টাকা বীরেশ্বরের কাছ থেকে খরচ করতো পুত্র হিসেবে পিতার সেই অর্থের দাবীদার একমাত্র অনুপমই। তার মা সাধনা হয়তো এতে ছেলের উপর অসন্তুষ্ট হবে, হয়তো তার মুখই দেখবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনুপমকে তা করতেই হবে। বীরেশ্বর কিন্তু অনুপমকে তার মায়ের প্রতি আদর্শবান হতে উপদেশ দেয়, কিন্তু তার দাবীর টাকা দিতেও অসম্মত হয় না। সাধনা এ খবর শুনে স্বামীর অবর্তমানে নিজের তেজ ও অভিমানকে সম্বল করে গ্রামে শ্যামলালের নির্জন পরিত্যক্ত ভিটেয় সান্ত্বনা খোঁজে। আদর্শবান পিতার সন্তানের আদর্শচ্যুতিই হচ্ছে উপন্যাসের তাৎপর্য। আজকের দিনে অর্থই মানুষের জীবনের মান ও ন্যায়নীতি নির্ধারণ করে। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'য় অনুপম চরিত্রের মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আধুনিক জীবনবোধেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসের অপ্রধান কয়েকটি চরিত্র সীতা পিসীমা, অনুপমের খুড়তুতো ভাই শঙ্কর ও শঙ্করের মা এবং শঙ্করের ভাগ্নে সতু, রহস্যময়ী নারী তরঙ্গ ইত্যাদি। *সু.ব.

অমৃতা প্রীতম : ভারতের পাঞ্জাবি ভাষার কবি। তিনি ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। ২৪ বছর বয়সে তিনি ৯টি কবিতার বই প্রকাশ করে সমকালীন সাহিত্য পাঠকের দৃষ্টিতে একটি অঘটন ঘটিয়ে ফেলেন। প্রথম থেকে তাঁর কবিতায় কণ্ঠস্বর ছিলো স্বকীয়তায় ভরপুর এবং প্রচলিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র। তিনি ক্রমাগত সাহিত্যের ভুবনে নিজেকে এক উজ্জ্বল তারকায় উদ্ভাসিত করেন। তিনি মার্কসবাদী চেতনায় প্রদীপ্ত ছিলেন। সাহিত্যে মানববোধের যে চিত্র ফুটিয়ে তোলেন সেটি তার সৃষ্টি ক্ষমতার বিস্ময়। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় তার কবিতার বই 'পাথর সঙ্গীত।' তাঁর অন্যান্য বই : আমি ভারতের ইতিহাস (১৯৪৯) ; প্রত্যুষের লগ্ন (১৯৫২) ; শোন হে পথিক (১৯৫৫) ; নাগমনী (১৯৬৪) ; কাগজ ও ক্যানভাস (১৯৭৩) প্রভৃতি। বিশটি কবিতার সংকলন ছাড়াও তাঁর রয়েছে পঁচিশটি উপন্যাস, পনেরটি ছোট গল্প সংকলন এবং তেইশ খণ্ড গদ্য। তিনি ১৯৫৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৫২ সালে জ্ঞানপীঠসহ অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন পদ্মশ্রী উপাধিতে এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করে। সে. হো.

অম্বপালী/আম্রপালী : বুদ্ধভক্ত জনৈকা নারী। বৈশালীর রাজোদ্যানে তাঁর জন্ম হয় এবং উদ্যান রক্ষক কর্তৃক তিনি প্রতিপালিত হন। আম্রোদ্যানপালক তাঁকে কন্যাবৎ লালন পালন করায় তাঁর নাম হয় অম্বপালী বা আম্রপালী। তিনি এমন অনিন্দ্যসুন্দরী ও রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন যে, যৌবনে পদার্পণ করলে তাঁকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের রাজকুমারগণ সচেষ্ট হন। কিন্তু তিনি বিয়ে না করে সভা-নর্তকীর পেশা গ্রহণ করেন এবং পর্যাপ্ত সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারিণী হন। একদা বৈশালীর উদ্যানে বুদ্ধকে দেখে অম্বপালী তাঁর নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করেন। কথিত আছে যে, লিচ্ছবিরাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধ এই বারবণিতার ঘরেই নানা উপচারে

www.pathagar.com

ভোজন করেছিলেন। অম্বপালী বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘকে একটি 'বিহার' দান করেন। আপন পুত্রকে তথাগতের ধর্ম প্রচার করতে দেখে তিনি সংসার ত্যাগ করে দিব্যজ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি দৈহিক ও পার্থিব সকল বস্তুর নশ্বরত্ব উপলব্ধি করেন এবং অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। পালি পদ্যগ্রন্থ 'থেরী গাথা'য় অম্বপালীর অমূল্য জীবনদর্শন কবিত্বময় ভাষায় ও মর্মস্পর্শী ভাব-ব্যঞ্জনায় বর্ণিত হয়েছে। এই গাথাগুলিতে তাঁর করুণ আত্মস্মৃতি, প্রগাঢ় অনুভূতি এবং অকপট আত্মনিবেদন মহিমান্বিত ও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আ. খা.

অম্বরীষ : হিন্দু পুরাণোক্ত সূর্যবংশীয় রাজর্ষি। ভাগবত থেকে জানা যায়, তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাই বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর রক্ষার্থে তাঁকে সুদর্শনচক্র দান করেন। এক সময় অম্বরীষ দ্বাদশীর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় দুর্বাসা তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে স্নান করতে চলে যান। এদিকে পারণার সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে দেখে রাজা বিষ্ণুপাদোদক পান করে পারণা রক্ষা করেন। এমন সময় দুর্বাসা নদী থেকে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা অবগত হন। তিনি মহাক্রুদ্ধ হয়ে জটা উৎপাটন করে ভূতলে নিক্ষেপ করেন। উক্ত জটা প্রকাণ্ড উগ্রদেবতা রূপ ধারণ করে অম্বরীষকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়। তখন বিষ্ণু প্রদত্ত সুদর্শনচক্র উপদেবতাকে ধ্বংস করে দুর্বাসাকে বিনাশ করার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। ব্রহ্মা ও শিবের কাছে আশ্রয় না পেয়ে দুর্বাসা বিষ্ণুর নির্দেশে অম্বরীষের শরণাপন্ন হন। অম্বরীষের নির্দেশে সুদর্শনচক্র শান্ত হয় এবং দুর্বাসা রক্ষা পান। তখন রাজা মুনিকে ভোজন করিয়ে নিজে ভোজন করেন। অম্বরীষ পরে পুত্রদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তপস্যার জন্য অরণ্যে চলে যান। আ. খা.

অযোধ্যা : পুরাণ অনুসারে সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর কোশল রাজ্যের রাজধানী। সূর্যবংশীয় রাজারা এখানেই রাজত্ব করতেন। রামচন্দ্রের রাজত্বকালে এই স্থান সমৃদ্ধশালী হয়। শ্রাবস্তীর রাজারাও এই স্থানে রাজত্ব করেছেন। বৌদ্ধরাজ অশোকের সঙ্গেও এই রাজ্য সম্পর্কযুক্ত ছিলো, এমন কি কাশ্মীররাজ মেঘবাহনের শাসনাধীনেও ছিলো। বিক্রমজিৎ নামক জনৈক হিন্দুরাজা মেঘবাহনকে পরাভূত করে এই রাজ্য উদ্ধার করেন। পরে পালবংশীয় রাজারা এখানে আনুমানিক ৬৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন। এরপর অযোধ্যা জঙ্গলে পরিণত হয়। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হিমালয় অঞ্চলের থারু নামক এক অসভ্য জাতি অযোধ্যার জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজের দ্বারা সেখানে বসবাস শুরু করে। তার এক শতাব্দী পরে চন্দ্রবংশীয় রাজারা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এসে থারুদের বিতাড়িত করেন। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রদেব অযোধ্যা অধিকার করেন। এরপর এই রাজ্য ভড় নামক এক জৈন মতাবলম্বী গোত্রের অধীনে আসে। ১১৯২ সালে মহম্মদ ঘোরী কনৌজ জয় করে অযোধ্যা লুণ্ঠন করেন। ব্রিটিশ অধিকার পর্যন্ত অযোধ্যা তুর্কি-মুঘল শাসনাধীনে থাকে। অযোধ্যা উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত। লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ প্রভৃতি অযোধ্যারাজভুক্ত অঞ্চল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অযোধ্যার শেষ নওয়াব ওয়াজেদ আলীকে পদচ্যুত করে ব্রিটিশ সরকার রাজ্যটিকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীন করে। আ. ই

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী : অনুবাদক, গীতরচয়িতা ও তত্ত্ববিদ। তাঁর জন্মসাল জানা যায় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সদস্য ও আচার্য হন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন। বেশ কিছু ভক্তিগীতি রচনা করেন। তাঁর 'মন চল নিজ নিকেতন' গানটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বাংলা গীতসমূহের অন্যতম। 'ব্রাহ্ম বিদ্যালয়' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৮৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ক. গো.

অরক্ষণীয়া—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-সমস্যামূলক উপন্যাস। মাসিক

www.pathagar.com

পত্রে প্রথম প্রকাশ ১৩২৩ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ২০ নভেম্বর ১৯১৬ সালে। অরক্ষণীয়ায় জ্ঞানদার উপর সমাজের ক্রূরতম নির্যাতন মাতৃ-স্নেহের ধারাটিকেও বিশুষ্ক করে দিয়েছে। স্বল্পভাষী জ্ঞানদার অনুভূতির প্রকাশে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট বাক সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। দারিদ্র্য তাকে নিষ্পেষিত করেছে, ম্যালেরিয়া তার স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে, স্বর্ণমঞ্জরী তাকে অশেষ গঞ্জনা দিয়েছে, তার চেয়ে বড়ো আঘাত পেয়েছে সে প্রেমাস্পদ অতুলের কাছ থেকে। জ্ঞানদার প্রতি জননী দুর্গামণির স্নেহও ভয়ে, শোকে ও কুসংস্কারে মলিন হয়েছে। সর্বাপেক্ষা চরম লজ্জা ও অপমানের কারণ হয়েছে সে যখন বিয়ের বাজারে নিজেকে বিকাবার জন্য স্বহস্তে সজ্জানুষ্ঠান করে নারীত্বের অশেষ লাঞ্ছনা করলো। জ্ঞানদার মামি পোড়া কাঠের ন্যায় বিকট চেহারা ও কলহ নৈপুণ্য নিয়েও হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটি স্নেহের ধারা লালন করেছে। কপট নীচাশয় স্বামী শম্ভুর বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে, অসহায় বিধবা দুর্গামণি ও তার কন্যা জ্ঞানদাকে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে, এমন কি রুগ্ন জ্ঞানদার চিকিৎসার জন্য একমাত্র অলঙ্কার বন্ধক দিয়েছে। কাহিনীর শেষ পর্বে অসহায় জ্ঞানদার সঙ্গে তার মাতৃশ্মশানে অতুলের পুনর্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সম্ভবত অতুলের অনুশোচনাই তার কারণ। নিজের ভুল ও অপরাধ বুঝতে পেরে অতুল দুর্ভাগিনী জ্ঞানদাকে গ্রহণ করলো এমন একটি ইঙ্গিত দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। অ.ন.

অরণ্য পর্ব্বত নদী ও সমুদ্র : আশরাফউজ-জামানের গল্পগ্রন্থ। প্রকাশক : মোহাম্মদ কাশেম, মখদুমী অ্যান্ড আহছানউল্লাহ লাইব্রেরি, বাবু বাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫৬। মূল্য : দুই টাকা। 'অরণ্য পর্ব্বত নদী ও সমুদ্র' প্রকাশিত হয়েছিল ৫২ বছর আগে। আমাদের কথা সাহিত্যে আশরাফউজ-জামান একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'খেয়া নৌকার মাঝি' গল্পটি একসময় দশম শ্রেণীর কথা বিচিত্রায় পাঠ্য ছিলো। এই গল্পগ্রন্থটিতে রয়েছে চারটি গল্প। গল্প চারটির নামেই গ্রন্থটির শিরোনাম। অরণ্য গল্পটি শুরু হয়েছে অরণ্যের বর্ণনা, পর্ব্বত গল্পটির পর্বতের বর্ণনা, নদী গল্পটির শুরু নদী এবং সমুদ্র গল্পটির শুরুও সমুদ্রের বর্ণনা দিয়ে। গল্পের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি এবং গ্রন্থটির নামকরণ পাঠকদের চমকে দেবার কথা। প্রত্যেকটি গল্পই সাধু ভাষায় লেখা। নদী গল্পটিতে গ্রন্থকার লিখেছেন : সুতীক্ষ্ণ স্রোতধারা, ঘূর্ণি আবর্তে বহিয়া চলিতেছে প্রবল বেগে। উঁচু বালিয়ারি পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে খণ্ড খণ্ড হইয়া। ... জোহরা ঘড়ির দিকে তাকাইল। রাত দশটা। রেয়াজ শহরের ক্লাবে গিয়াছে। শনিবার রাত্র। ক'টায় ফিরিয়া আসিবে কিছুই ঠিক নাই। এমনি করে বাকি গল্প তিনটির অপূর্ব বর্ণনা। পর্ব্বত গল্পটি আরেফের পর্ব্বতারোহণের ঘটনা বিধৃত। তার স্ত্রী, মা ও শাহেদ এই গল্পটির অপর চরিত্র। তিনটি চরিত্রই দ্বান্দ্বিক। দুই রঙে আঁকা প্রচ্ছদপটটি সুন্দর। কিন্তু অঙ্কন শিল্পীর নাম নেই। খা. বি. জ. উ.

অরণ্যষষ্ঠী : জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠী। জামাইষষ্ঠী নামেই অধিকতর পরিচিত। সন্তানের ও সন্তানতুল্য জামাতাদের মঙ্গলকামনায় এই দিনে মহিলাদের অরণ্যে গিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীর পূজা ও ফলমূল আহারের বিধান আছে। পুত্রবতী জননীদের অনেকে এই উপলক্ষে ষষ্ঠীব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ব্রতকথায় বাপ-মা কর্তৃক সব রকমের বায়না পূরণ করার উল্লেখ আছে। সে অনুসারে মায়েরা আজও সন্তানের বায়না পূরণ করে থাকেন। বিশেষত জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে সুখাদ্য ও নতুন বস্ত্র দিয়ে সন্তান ও সন্তানতুল্য জামাতাদের খুশি করার ব্যবস্থা আছে। ষষ্ঠীদেবীকে যেসব ফলমূল ও মিঠাইমন্ডা উপহার দেয়া হয়, সংস্কৃতে তা 'বায়ণ' নামে পরিচিত ; মূলত তারই অংশ বায়না বা বাটা নামে সন্তান ও জামাতাদের মধ্যে বেঁটে দেয়া হয়। বর্তমানে ব্রত বা পূজা অনুষ্ঠানের প্রচলন সর্বত্র দেখা না গেলেও সন্তানকে বিশেষত জামাতাকে

www.pathagar.com

আপ্যায়ন করার প্রথা বাংলাদেশের সর্বত্র বহুল প্রচলিত। ম. চৌ.

অরণ্যের অধিকার : মহাশ্বেতা দেবী রচিত উপন্যাস। আদিবাসী মুণ্ডাদের কাহিনী নিয়ে নির্মিত এই উপন্যাস। বাস্তবতা এবং লেখকের কল্পনাজাত শৈলীর অনবদ্য প্রয়াস উপন্যাসের পটভূমিকে করেছে মননগ্রাহ্য এবং শিল্পিত। বইয়ের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, "এই উপন্যাস রচনায় সুরেশ সিং রচিত 'Dust Storm and Hanging Mist'বইটির কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। সুলিখিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি ছাড়া বর্তমান উপন্যাস রচনা সম্ভব হতো না।" ইতিহাসের এই মৌল দিক যেমন এই উপন্যাসের অন্যতম দিক, তেমনি জীবনের ছোটখাটো চিত্রগুলো উঠে এসেছে আশ্চর্য বুনলে। একসময় ছোটনাগপুর অঞ্চলের বীরসাইত মুণ্ডারা জ্বলে উঠেছিলো বিদ্রোহের আগুনে। অভ্যুত্থানের নায়ক ছিল বীরসা। তার বাবা সুগানা মুণ্ডা, মা করমি মুণ্ডানির ঘরে ১৮৭৫ সালে জন্ম হয় বীরসার। ওদের দাবি ছিল ভাতের দাবি। উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখক লিখছেন, "মুণ্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে।...কোনো না কোনোভাবে ভাত বীরসার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বেশিরভাগ সময়েই বীরসার যে উদ্ধত ঘোষণা 'মুণ্ডা' শুধু ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মত ভাত খাবে না।" এই ভাতের লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে বীরসা। ফলে' মুণ্ডাদের কাছে বীরসার পরিচয় ছিল 'ভগবান'। এই ভগবানের ডাকে তারা সাহসী হয়েছিলো, প্রতিবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো, দিকুদের অবিচারের বিচার চেয়েছিলো এবং সাহেবের গুলি বুক পেতে নিয়েছিলো। বন আদিবাসীদের জীবনের প্রাকৃতিক সত্য। বীরসার হৃদয়ে অরণ্যের প্রতি তীব্র টান দেখিয়েছেন লেখিকা। বলছেন, 'বীরসা বুঝতে পারছিল ওর অরণ্য-জননী কাঁদছে। অরণ্য ধর্ষিতা, দিকুদের হাতে, আইনের হাতে বন্দিনী। জননী অরণ্য বলছিল, মোরে বাঁচা বীরসা। আমি শুদ্ধ শুচি নিষ্কলঙ্ক হব। মাটিতে মুখ ঘসছিল বীরসা, গাছের গায়ে গা ঘষছিল।' এ উপন্যাসের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে বীরসার ভগবান বলে পরিচিতি লাভের পরই লেখিকা তার ভেতরে অরণ্যের অধিকার সম্পর্কিত ধারণা তীব্র করে তোলে। বীরসার চেতনায় অরণ্য সর্বপ্লাবী হয়। বিদ্রোহ এবং প্রকৃতির এই দৈবাত সহ-অবস্থানে উপন্যাস হয়ে ওঠে আদিবাসীদের জীবনের গল্পগাঁথা। এ গাঁথার শেষ নেই। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। সে. হো.

অরণ্যের ক্যানভাস : খালেদা এদিব চৌধুরী রচিত কিশোর উপন্যাস। বইটির প্রকাশক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৮৫। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন ফরিদা জামান। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০, মূল্য ১৫.০০ টাকা। 'অরণ্যের ক্যানভাসে'র কেন্দ্রীয় চরিত্র রঞ্জু একজন কল্পনাপ্রবণ তরুণ। সদ্য ম্যাট্রিক পাস করে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েই সে মামার ক্যামেরাম্যান বন্ধু রবিনের সঙ্গে ভারতের নৈনিতালে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। নৈনিতালের নৈসর্গিক সৌন্দর্য রঞ্জুকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে এবং তার শিল্প-চেতনাকে নাড়া দেয়। সে একজন বড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। নৈনিতালের বন-পাহাড়ের প্রাণবন্ত বর্ণনা বইটির অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সু.ব.

অরণ্যের সুর : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা। কবি-হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির অতি সরল ও অকৃত্রিম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যগ্রন্থে। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। বাঙালি মুসলিম মহিলা কবি হিসাবে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাই (১৯০৬-১৯৭৯) প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, প্রথম সনেট লেখেন এবং গদ্যছন্দে কবিতা রচনা করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-প্রভাবিত মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার কাব্যভাবনা। প্রকৃতির নানা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ যেমন তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছে তেমনি জাতীয়-মঙ্গলের বিষয়ও উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। জীবনের অনিত্যতা, ব্যক্তিগত স্মৃতি, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, জাতীয় জাগরণ ও

www.pathagar.com

কদাচিৎ রোমান্টিকতার প্রশ্রয় আছে তাঁর কাব্যে। 'হাসি-কান্নার দোলায় সেথায় দুলিয়া নিত্য আমি/ রচিব জীবন-কাব্য সুখে দুখে দিবা আর যামী' এবং 'সে মাটির ঘ্রাণে মোর সারা প্রাণ উন্মুখ আকুল/ নিত্য ফুটায়ে তাই—এখানে ছড়াই মোর স্বপ্নের ফুল'—কবির কাব্যভাবনার এই মূল সুর, আর ভালোবাসার চাদরে তাঁর স্বপ্নসাধ জড়িয়ে আছে। লিখেছেন, 'স্রোতের সমান জেগে রয় শুধু ভালোবাসা। দুরাশার ভীতিহীন মর্মমূলে স্বপ্ন সাধ আশা।' এই ভালোবাসাই চিরন্তন এবং তা চিরন্তন করে তোলে সবকিছুকে। বইটি প্রকাশ করেছে আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৬৩। মূল্য : দুই টাকা। মো. শা.

অরন্ধন : একটি বিশেষ দিনে রন্ধন কাজ বন্ধ রাখাকে বলা হয় অরন্ধন। এটি একটি লোকাচার। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় ভাদ্র সংক্রান্তি, শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন অর্থাৎ শীতল ষষ্ঠীর দিন, দশহরা, শ্রাবণ-সংক্রান্তি প্রভৃতি দিনে এই প্রথা পালন করা হয়। এই প্রথা অনুসারে উক্ত বিশেষ বিশেষ দিনে ঘরে কোনো রান্না হয় না। আগের দিন রাত্রে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য পরের দিন খাওয়া হয়। অঞ্চলভেদে আচারটির নাম রান্নাপূজা, গোটাসিদ্ধ খাওয়া, ঢেলাফেলা, পান্তাপালা প্রভৃতি। আঞ্চলিক ভাষায় অরন্ধনকে আরন্দ বলা হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে যে অরন্ধন হয় তাকে 'বুড়ী-আরন্দ' এবং অন্যান্য দিনের অরন্ধনকে 'ইচ্ছা-আরন্দ'ও বলে। কোনো কোনো স্থানে দশহরার দিন থেকে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে এবং অন্যান্য কিছু দিনে এই অরন্ধন পালিত হয়। অরন্ধনের দিন গৃহিণীরা উনুনের ভিতরে ও বাইরে আলপনা দেন এবং ঘরে ঘরে মনসা পূজা করেন। ড. শা. আ.

অরবিন্দ ঘোষ : দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও যোগী। তিনি ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়সে শিক্ষার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান। পরবর্তীকালে আই.সি.এস. পরীক্ষায় পাস করেন, কিন্তু অশ্বচালনা পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় চাকরি লাভে ব্যর্থ হন। ১৮৯২ সালে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' বৃত্তি পান। ১৮৯৩ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বরোদা কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময় মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯০২ সালে ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমারকে তিনি বিপ্লবী দল গঠনে বঙ্গভূমে পাঠান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বরোদার চাকরি ত্যাগ করেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় বিদ্যাপীঠ ন্যাশনাল কজেলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এক সময় রাজা সুবোধ মল্লিকের ইচ্ছানুসারে ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে উক্ত পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশ ও আলিপুর বোমা মামলার আসামীরূপে আদালতে বিচারাধীন হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মামলা পরিচালনা করেন এবং অরবিন্দ মুক্তি পান। অতঃপর তিনি সনাতন ধর্মপ্রচার, জাতীয় দল গঠন ও ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন' ও বাংলা 'ধর্ম' পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। পরে ফরাসি মহিলা মাদাম পল রিশার (শ্রীমা) সহযোগিতায় পণ্ডিচেরীতে আশ্রম তৈরি করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দর্শনমূলক ইংরেজি পত্রিকা 'আর্য'তে আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। লেখক রূপে 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত হন। ইংরেজি ও বাংলা মিলে অন্যূন চল্লিশটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ — ইংরেজি : The Life Divine Essays on Gita, Sabitri, Mother India, The Hero and the Nymph, Songs of Myrtilla and other poems, The Age of Kalidasa, A System of National Education, The Renaissance in India, Speeches of Aurobindoo. বাংলা : কারাকাহিনী, ধর্ম ও জাতীয়তা, অরবিন্দের পত্র ইত্যাদি। ম. চৌ.

অরিষ্টনেমা : মহাভারতোক্ত এক ঋষি। জনৈক হৈহয়-রাজকুমার মৃগভ্রমে তাঁর পুত্রকে হত্যা করেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত

www.pathagar.com

চিত্তে তিনি নিহত ব্যক্তির পিতার অন্বেষণ করতে করতে মহর্ষি অরিষ্টনেমার আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি তাঁর হাতে নিহত মুনিপুত্রকে জীবিত দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যান। রাজকুমার এর কারণ জিজ্ঞেস করলে অরিষ্টনেমা বলেন যে, তাঁরা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করেন, ব্রাহ্মণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বলেন এবং অতিথিসেবা ও ঋষিদের সংস্পর্শে বাস করেন বলে তাঁদের মৃত্যুভয় নেই। ম. চৌ.

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্য-সমালোচক, প্রাবন্ধিক। ছদ্মনাম ভাস্কর উপাধ্যায়, চারুদত্ত। জন্ম কলকাতায় ১৯৩০ সালে। কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশের রংপুরে। লেখাপড়া করেছেন কলকাতা ও হুগলীতে। ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাস করেন। সুরেন্দ্রনলিনী স্বর্ণপদক ও কৃষ্ণকুমার দত্ত রৌপ্যপদক প্রাপ্ত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার উপর গবেষণা করে ১৯৫৭ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান পিএইচডি ডিগ্রি। ছোটগল্পের উপর গবেষণা করে ১৯৮৪ সালে অর্জন করেন ডিলিট উপাধি। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৯৫৭-৬৭) ও কোচবিহার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে (১৯৬৭-৬৯) অধ্যাপনার পর ১৯৬৯ সালে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দশক (১৯৬৯-৭৯) অধ্যাপনার পর আগরতলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট সেন্টারে এবং বাংলা বিভাগে প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান পদে কাজ করেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাস রচনা করে তিনি যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস ও বাংলা সমালোচনার ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে তা আরও স্থায়ীত্ব পায়। তাঁর বীরবল ও বাংলা সাহিত্য পড়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, 'বীরবলের রূপচেতনা ও ভাস্কর্য নৈপুণ্য লেখকে এসে বর্তেছে।' কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর (১৯২৩-৮২), শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার ও কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা এবং বাংলা ছোটগল্পের বছর (১৯৮১-১৯৮০) শীর্ষক বইগুলি বাংলা কথাসাহিত্যের গবেষক রূপে তাঁর খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থ : Pramatha Chaudhury, রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ, রবীন্দ্রসমীক্ষা, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। ড. মা. জা.

অরুণকুমার সরকার : কবি, সমালোচক। জন্ম কলকাতার কালিঘাটে ১৯২১ সালে। শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। চল্লিশের দশকে আধুনিক বাংলা কবিতায় দুটি ধারার সূত্রপাত ঘটে : দায়বদ্ধ কবিতা এবং আত্মগত লিরিক কবিতা। নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী এই শেষোক্ত ধারার উল্লেখযোগ্য কবি। দায়বদ্ধ বিবৃতিধর্মী কবিতার পরিবর্তে তাঁদের কবিতা ছিল রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত—অনুভূতিনির্ভর, ইঙ্গিতধর্মী, স্বল্পবাক্। অরুণকুমারের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দুটি : দূরের আকাশ (১৯৫৯) ও যাও উত্তরের হাওয়া (১৩৭২)। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় প্রেম, নারী ও নিসর্গ। ব্যক্তিগত জীবনযাপন ও যৌবধর্ম কবির মনে তৈরি করেছে একধরনের রোমান্টিক আবিষ্টতা। কোনো গভীর দায়বদ্ধতা নয়, সমাজ যে আজ 'শতছিন্ন, রিফুকর্মের অতীত'—তার জন্যে দায়ী ব্যক্তি নিজেই। তাই ব্যক্তির করুণ-রঙিন স্মৃতিলোকেই পাওয়া যেতে পারে মুক্তির ইশারা। 'দূরের আকাশ' নামকরণের পেছনেও রয়েছে এই স্মৃতির প্রভাব। প্রকৃতপক্ষে এই সংবেদনা এবং কবিতার ভাষা শরীরে ছড়িয়ে পড়া সঙ্গীত-সম্মোহনই অরুণকুমার সরকারের কবিতার বৈশিষ্ট্য। কবিতা ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত হয়েছে একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী (১৯৮১)। ড. মা. জা.

www.pathagar.com

অরুণমল্লার : রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে নিষাদ শুদ্ধ ও কোমল উভয় অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমেই এই রাগে সাত স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাদী স্বর মধ্যম, সংবাদী স্বর ষড়জ। ঠাট খাম্বাজ। আরোহ : স র গ র গ ম প ন ধ ন র্স। অবরোহ : ম ণ ধ প ম প ধ ম গ র স। ক.গো.

অরুণ মিত্র : কবি ও অনুবাদক। ১৯০৯ সালের ২ নভেম্বর যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা করেন বঙ্গবাসী কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছিলেন। মাত্র ৬ বছর বয়সে তিনি কলকাতা আসেন। ১৬ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা 'বেনু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভিক্টোর হ্যুগোর অনুবাদ পড়ে তিনি লিখতে শুরু করেন। একসময় তিনি ফারসি কবিতা অনুবাদে প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'প্রান্তরেখা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় কাব্য 'উৎসের দিকে'। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬৩) সম্পাদিত পত্রিকা অরণি। ১৯৪৮ সালে প্যারিসের সারবন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। প্রগতি লেখক আন্দোলন ও গণনাট্যের সমর্থক এবং সারা জীবন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। তাঁর কবিতায় মানুষের প্রতি মমতা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং প্রতিবাদের কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। স্লোগান নয়, সযত্নে কাব্যশরীর নির্মাণ করেছেন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় আশয় নিয়ে। এককথায় বাংলা কবিতায় তাঁর স্থান আলাদা। পল এ্যালুয়ারের কবিতা তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিত গ্রন্থ। মঞ্চের বাইরে মাটিতে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ। ১৯৭৯ সালে 'শুধু রাতের শব্দ নয়' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার ও ১৯৮৭ সালে 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৯২ সালে ফরাসি সরকার তাকে 'লিজিয় অফ অনার' সম্মানে ভূষিত করেন। কলকাতার দেশ পত্রিকার পাঠক জরিপে তাঁর রচিত 'ঘনিষ্ঠ তাপ' গ্রন্থটি গত অর্ধশতকের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অরুণ মিত্র ২০০০ সালের ২২ আগস্ট মঙ্গলবার সকালে মৃত্যুবরণ করেন। খা.বি.জ.উ.

অরুণাভ সরকার : কবি। ১৯৪১ সালের ২৯ মে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পড়াশুনা করেন, সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত আছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'নগরে বাউল' ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই নামের ভেতর দিয়ে তাঁর কবিসত্তার পরিচয় ফুটে উঠে। অসংখ্য মানুষের ভেতরে বাস করেও মানুষ বাউলের মতো আত্মমগ্ন দার্শনিক উপলব্ধিতে অন্যমানুষ হয়ে যেতে পারে—এমন উপলব্ধি নিয়ে তাঁর কবিতায় উঠে আসে নগর জীবন, প্রেম ও প্রকৃতি। তিনি ছোটদের জন্যও লিখেন। তাঁর ছড়া এবং কাহিনী-কাব্যগুলো মিষ্টি ভাষায় রচিত এবং হৃদয়গ্রাহী। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতার বই 'কেউ কিছুই জানে না'। ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন কাহিনী কাব্য 'খোকনের অভিযান' (১৯৭৮), ইলশে গুঁড়ি (কবিতা, ১৯৭৯), 'ভালুকে দুই বন্ধু' (ছন্দোবদ্ধ আচারে লেখন, ১৯৮৪)। তাঁর সাহিত্য রচনা অব্যাহত আছে। র. হা.

অরুণোদয়—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ। কাদম্বিনী বুড়িকে পাড়ার সবাই মাসি বলে ডাকে। কলকাতায় বুড়ির একটিমাত্র বাড়ি ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই। বীরেন্দ্র, নারায়ণী এবং তাদের শিশুপুত্র দেবেন্দ্র—এই তিনজন বুড়ির বাড়ির নীচের তলায় তিনটি ঘর ভাড়া করে থাকে। কাদম্বিনী দেবেন্দ্র ওরফে দেবুকে খুব ভালোবাসে। দেবুও তাকে 'মা', 'মা' বলে অস্থির করে তোলে। বীরেন্দ্র মদ্যপ এবং স্বার্থপর। ভাড়া নিয়ে কাদম্বিনীর সঙ্গে একদিন গন্ডগোল হওয়ায় তাদের কাছ থেকে একটি ঘর নিয়ে কাদম্বিনী

www.pathagar.com

নতুন ভাড়াটিয়া বসায়। এরাও তিনজন,—মাধব, বীণা এবং তাদের কন্যা পিন্টুলী। পিন্টুলীও কাদম্বিনীর খুব প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে। এদিকে কাদম্বিনী, নারায়ণী ও বীণা বলাবলি করে দেবেন্দ্রের সঙ্গে পিন্টুলীর বিয়ে হলে বড়ো ভালো হয়। দুটিতে বেশ মানায়। কিন্তু বীরেণ একদিন স্ত্রী-পুত্রসহ কাদম্বিনীর বাসা ছেড়ে যায়। এদিকে মাধবও একদিন পিন্টুলীকে রেখে বীণাকে নিয়ে কাদম্বিনীর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অগত্যা কাদম্বিনীকে পিন্টুলীর দায়িত্ব নিতে হয়। কয়েক বছর পর পিন্টুলীদের স্কুলের এক পুরস্কার-বিতরণী সভায় পিন্টুলী ওরফে প্রতিমাদেবীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ে উভয়কে চিনতে পেরে দারুণ খুশি হয়। তারপর দেবেন্দ্রের বোন পুষ্পকে গান শেখানোর অজুহাতে প্রতিমা একদিন দেবেন্দ্রদের বাড়ি আসে। দেবেন্দ্রের মা নারায়ণী তখন প্রতিমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এতদিনে তার ছেলের বৌ ঘরে আনবার সুযোগ হয়। আ. ন. ম. ব. র.

অরুন্ধতী : পৌরাণিক চরিত্র। মহামুনি বশিষ্ঠের পত্নী, কর্দম মুনির ঔরসে দেবহুতির গর্ভে তাঁর জন্ম। পৃথিবীতে পতিভক্তি ও পতিসেবার এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন তিনি। পতিব্রত্যের এক উচ্চতম আদর্শ স্থাপনের পুণ্যফলে তিনি স্বামীর সঙ্গে নক্ষত্রলোকে গমন করেন। সেইজন্য সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে অরুন্ধতীর উদয় হয়। হিন্দুদের মধ্যে এরূপ সংস্কার বিদ্যমান, যার পরমায়ু শেষ সে ঐ নক্ষত্র দেখতে পায় না। এজন্য হিন্দুদের বিবাহকালে নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো হয়। অরুন্ধতীর পতিব্রত্যের আদর্শে পুণ্যবতী হওয়ার অভিলাষে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আ.ই.

অরূপরতন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই রচনাটিকে 'নাট্য-রূপক' বলে অভিহিত করেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন : 'এই নাট্য-রূপটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নতুন করিয়া পুনর্লিখিত/মাঘ ১৩২৬।' অরূপরতন ১৩২৬ সালে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। ১৩৪২ সালে এই নাটকের পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীতে এই সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হয়। অরূপরতনের রূপকধর্মিতা ভালো এবং মন্দের চিহ্নিতকরণ। নাটকের নায়িকা সুদর্শনা হৃদয়ের রাজাকে বাইরে খুঁজেছিলো। রাজার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সুরঙ্গনা তাকে বলেছিল, 'অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাইরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না, নইলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে।' সুদর্শনা এই ভুলই করেছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক দুঃখকষ্ট সংঘাতের পর সে প্রাসাদ ছেড়ে পথে নেমে আসে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, 'সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করেন। যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।' সে. হো.

অর্কব্রত : মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে পালনীয় ব্রতবিশেষ। সূর্যদেবতার সন্তুষ্টির জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। এটি ছিল একসময় রাজাদের ব্রত। শা. আ.

অর্কেস্ট্রা :—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বইটি কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সাল। এ গ্রন্থে মোট ২৫টি কবিতা আছে ; প্রায় সবগুলোই প্রেমের কবিতা। প্রেমের নায়ক ভোগসর্বস্বতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে ক্লান্তি বোধ করছেন। কবি আত্মকথনের মাধ্যমে নায়কের মানসিক বেদনার কথা বলেছেন। অর্কেস্ট্রার কবিতাগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে—'হৈমন্তী', 'পণ্ডশ্রম', 'কস্মৈ দেবায়', 'সঞ্চয়', 'মহাসত্য', 'দ্বন্দ্ব', 'ভবিতব্য', 'মহাশ্বেতা', 'অপচয়', 'শাশ্বতী', 'বিস্মরণী', 'অর্কেস্ট্রা' ইত্যাদি। 'হৈমন্তী' কবিতাটি অর্কেস্ট্রার মূল ভাবটি ব্যঞ্জিত করেছে। হেমন্তের শূন্য বনবীথি কবির মনলোকে যেমন মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়েছে, তেমনি বেদনার রেশও এনেছে। ভোগশ্রান্ত নায়কের মনে হয়েছে

www.pathagar.com

প্রেম ক্ষণবিলাসের বস্তু ; তাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সে ছলনাও বটে। তাই কবির উক্তি—'অসংগত চিরপ্রেম ; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায় ;/বদ্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ/সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্ত বন্যায়॥' (মহাসত্য)। অর্কেস্ট্রার নায়ক তাই প্রেমের অবসানে স্মৃতি-ভারাতুর। নায়িকার অনুপস্থিতিতে স্মৃতিভারাতুর নায়ক কেবল স্মৃতির বিষাদ-বেদনা উদ্বেল। দেহজ মিলনে যে তৃপ্তি, তারও এক সময় অবসান ঘটে, কিন্তু স্মৃতি বড় নির্মম ! কিছুতেই মন থেকে বিগত মিলনের আনন্দের স্মরণিকা শেষ হয়ে যায় না। নায়িকার চতুরালির কথা স্মরণ করে কবি তাই বলেছেন—'ক্ষণিক ইন্দ্রত্ব লভি অনায়াস তপস্যার ফল,/ তোমার উরসস্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর ; /যে-হস্ত নিবন্ধ এবে মোর ভুজে প্রাণপণ বলে,/রচিবে বয়ণমাল্য বারংবার সে-নিষ্কম্প্র কর॥' (ভবিতব্য)। আসলে 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের সর্বত্রই সুধীন দত্তের এই স্মৃতি-রোমন্থন দেখা যায়। বেদনা আর নৈরাশ্যের মধ্য দিয়েই কবি বিগত দিনের অনেক কথা স্মরণ করছেন।

আ. ই

অর্ঘ্য : পূজার সামগ্রীবিশেষ। পূজার রীতি অনুসারে যে কোনো পূজায় দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয়। এই অর্ঘ্যের মধ্যে থাকে জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, আতপতণ্ডুল, যব ও শ্বেতসর্ষপ—এই আট প্রকার দ্রব্য। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এই দ্রব্যগুলো মাঙ্গল্যসূচক। তাই এগুলো পূজায় ব্যবহৃত হয়।

ড. শা. আ.

অর্ঘ্য : গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী। গীতিকাব্য। বইটির প্রকাশকাল ১৯০২। অর্ঘ্যের অধিকাংশ কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যের অনুভবে হৃদয়ে যে শান্ত, বিষণ্ণ আত্মনিবেদনের সুরে বাঁধা পড়ে তারই নিদর্শন রয়েছে 'অর্ঘ্যে'র কবিতাগুচ্ছে। গিরীন্দ্র মোহিনীর ভাষা সাদাসিধে, আড়ম্বর নেই এবং বিষয়ের বর্ণনাও সরল। তবে কবির হৃদয়বেদনার প্রকাশ প্রায় সর্বত্রই অকৃত্রিম। 'অর্ঘ্যে'র কোনো কোনো কবিতায় নিতান্ত সাধারণ বিষয়ের উপর কাব্যভাবনার প্রকাশ সুন্দর হয়েছে। এই প্রসঙ্গের কবিতা 'বর্ষামঙ্গল'—কলকাতা শহরের বর্ষণসিক্ত দিনের কদর্যতার ছবি। বাস্তবতার চমৎকার অভিব্যক্তি —'ফুটো ছাত, ভিজে কোঠা জল পড়ে ফোঁটা ফোঁটা। 'অথবা 'হেথা গায়ে গায়ে ঠাসা কোঠা, টিনের পাইপ আঁটা। নিঃশব্দে পড়ে জল ঝরি'।

মু.আ.জ.

অর্ঘ্য : সরলাবালা সরকার। কবিতা সংকলন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১২৯৭ সনে অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে', 'লজ্জাবতী' নামক একটি কবিতা নিয়ে সরলাবালা সরকার আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর দীর্ঘ ৬০ বছর কাল তিনি লিখেছেন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। 'চিত্রপট' (গল্প), 'নিবেদিতা' (জীবনী), 'কুমুদনাথ' জীবনী—এই তিনখানি গদ্যগ্রন্থ প্রবাদ' নামক একটি লোককাব্য (১৩১১) প্রকাশ করেন। সরলাবালা প্রচুর কবিতা লিখেছেন। নানা পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে একটি সংগ্রহ ও সংকলন এই 'অর্ঘ্য'। সূচিপত্রে অর্ঘ্য শিরোনামের নিচে ৬২টি ও জাগরণীতে ১৭টি কবিতা আছে। তাঁর মৃত্যু হয় ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ সন। প্রকাশক অশোককুমার সরকার, শ্রীগৌরঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ১৭৫, মূল্য ৩.০০ রুপি।

বি. ব.

অর্চট : প্রখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। নামান্তরে ধর্মাকর দত্ত। অনুমান করা হয় তিনি কাশ্মীরের লোক ছিলেন। জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। বৌদ্ধ ন্যায়ের অন্যতম বিখ্যাত টীকাকার ধর্মোত্তর অর্চটের ছাত্র ছিলেন। ধর্মকীর্তি-রচিত 'হেতুবিন্দু' গ্রন্থের তিনি টীকা লেখেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি' ও 'প্রমাণ দ্বৈতসিদ্ধি'। অর্চটের দর্শনসংক্রান্ত ব্যাখ্যা যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ। তাঁর টীকাতে প্রধানত বৌদ্ধ সম্মত অনুমান, প্রমাণ আলোচিত হয়েছে। তাঁর সময়কাল আনুমানিক ৯০০ সাল।

অ.ন.

www.pathagar.com

অর্জুন : তৃতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে তাঁর জন্ম। হিন্দু পুরাণে উক্ত হয়েছে তাঁর মতো ধনুর্বিদ্যাবিশারদ সেকালে বিরল ছিলো। কৃপাচার্য এবং দ্রোণাচার্যের কাছে তিনি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। গুরু- দক্ষিণাস্বরূপ তিনি দ্রুপদরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দি করে দ্রোণের নিকট এনে দেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তিনি প্রতিশ্রুত লক্ষ্য বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং মাতার নির্দেশক্রমে পঞ্চভ্রাতা তাঁর পাণি-গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে অর্জুনকে একদা দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করতে হয়। সে সময় তিনি নাগকন্যা উলুপী ও মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেন। উলুপীর গর্ভে ইরাবান এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। পরে তিনি সুভদ্রাকে হরণ করে তাকে বিবাহ করেন। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। একদা কিরাত বেশধারী মহাদেবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়, পরে মহাদেবের প্রকৃত পরিচয় জেনে তিনি তাঁকে পূজায় সন্তুষ্ট করেন। ভারত-যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষে প্রধান সেনাপতিরূপে মহাবীর ভীষ্ম, কর্ণ এবং অধিকাংশ কুরু সৈন্যকে নিধন করেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি। পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার অর্পণ করে অর্জুন, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থান করেন। হিমালয় পার হয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যেতে দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতন হলে অর্জুনের মৃত্যু হয়। ম. চৌ.

অর্জুন মিশ্র : মহাভারতের টীকাকার। রাজশাহী জেলার গঙ্গাতীরস্থ চারঘাট থানার অন্তর্গত পাঁচপাড়া গ্রামে বঙ্গদেশীয় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগোত্রের চম্পাহিটীয় কুলে অর্জুন মিশ্রের জন্ম। তিনি সম্ভবত খ্রিস্টীয় তেরো শতকের শেষ অথবা চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। কারও কারও মতে তিনি পনেরো শতকের লোক। তাঁর পিতা ছিলেন ভারতাচার্য পাঠক ঈশান মিশ্র। মহাভারতের প্রধান টীকাকারদের মধ্যে অর্জুন মিশ্র অন্যতম ছিলেন। তাঁর টীকার নাম 'মহাভারতার্থসংগ্রহপ্রদীপিকা'। এটিকে সংক্ষেপে 'মহাভারতার্থদীপিকা' কিংবা 'ভারতার্থদীপিকা' বলা হয়। তিনি হরিবংশকে মহাভারতের অংশবিশেষ মনে করতেন বলে ঐ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। এছাড়া তিনি পুরুষসূক্তেরও টীকাকার ছিলেন। অর্জুন মিশ্র শ্রীমান্‌দত্ত সত্যবান নামক এক ব্যক্তির আশ্রয়ে থেকে গৌড়েন্দ্র মহামন্ত্রী শ্রীমদ্বিশ্বাস রায়ের আদেশে 'মোক্ষধর্মার্থদীপিকা' রচনা করেছিলেন। কুলপঞ্জিকা মতে তিনি ভট্টনারায়ণের ২৫তম অধস্তন পুরুষ। সংহিতা উপনিষদ্‌ শাস্ত্রে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। মু. আ. জ.

অর্জুনের অজ্ঞাতবাস : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচতি উপন্যাস। প্রকাশকাল : বাংলা ১৩৬৭ সন। প্রথম সংস্করণে উপন্যাসটি 'বৃহন্নলা' নামে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বাঙালি নিম্নবিত্ত যৌথ পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার পটভূমিতে শহরজীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করা যায় 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে। মানুষের নৈতিক ও আত্মিক অবসাদ এবং অবক্ষয়ের করুণ পরিণতি এতে ফুটে উঠেছে। অস্থির, আত্মহননকারী একজন নায়কের গ্লানি নাগরিক জীবনের শূন্যতা ও হতাশায় স্থিত হয়। অন্যদিকে সমস্যা-সংকুল কুমারী মেয়েদের বেড়ে ওঠা এবং সংসারের পড়ন্ত অবস্থায় মায়েদের করুণ অসহায়ত্ব সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি ব্যক্তি ও সমাজের অন্তর্মুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ উপন্যাসে গভীর তাৎপর্য ও নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ড. শা. আ.

অর্থ : স্থূলভাবে অর্থ বলতে ঐহিক ধনজনিত সৌভাগ্যকে বোঝায়। আবার রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়কেও অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। যেমন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। এছাড়া অর্থ শব্দের দ্বারা মুদ্রা বা টাকাকড়িকে বোঝায়। ব্যাকরণগত দিক থেকে অর্থ বলতে উচ্চারিত অথবা লিখিত শব্দ বা পদের তাৎপর্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। পৃথিবীর নানাদেশের ভাষার অন্তর্গত শব্দসম্পদের অর্থও নির্ধারিত হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি উপায়ে

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ পরিস্ফুট হয়। উচ্চারিত শব্দ যখন ব্যুৎপত্তিগতভাবে তাৎপর্যবহ হয়। এর নাম বাচ্যার্থ। যেমন, 'জলদ' শব্দের বাচ্যার্থ হলো 'যে জল দান করে।' বাচ্যার্থে সব সময় শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয় না। শব্দ প্রয়োগকারী ব্যক্তির অভিপ্রায় বোঝানোর জন্য অন্য যে একটি উপায় ব্যবহার করা হয়, তার নাম লক্ষ্যার্থ। যেমন, জলদ বলতে জলদানকারী ব্যক্তিকে না বুঝিয়ে 'মেঘ'কেও বোঝানো হয়ে থাকে। শব্দার্থ প্রকাশের তৃতীয় উপায়টির নাম ব্যঞ্জনা বা ব্যঙ্গার্থ। সাহিত্যে ব্যঙ্গ্যার্থের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন, 'বেলা গেল' বাক্যটির বাচ্যার্থ হলো 'দিন শেষ হয়ে গেল।' কিন্তু বাক্যটি ব্যাঙ্গ্যার্থে প্রকাশ করতে গেলে তার অর্থ হয় 'জীবনের আয়ু শেষ হয়ে গেল।' ম. আ. জ.

অর্থশাস্ত্র : কৌটিল্য বিরচিত রাজনীতি বিষয়ে প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ অব্দ—খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮ অব্দ) মন্ত্রী বিষ্ণুগুপ্তই কৌটিল্য বা চাণক্য নামে পরিচিত ছিলেন। দণ্ডী, বাণভট্ট, পঞ্চতন্ত্র, কামন্দক প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় যে কৌটিল্য; বিষ্ণুগুপ্ত ও চাণক্য একই ব্যক্তির নাম এবং তিনিই 'অর্থশাস্ত্র'-এর রচয়িতা। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকেই অর্থশাস্ত্র বলা হতো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র 'অধিকরণ' নামক ১৫টি ভাগে বিভক্ত এবং প্রতিটি অধিকরণকে কয়েকটি প্রকরণে ভাগ করা হয়েছে। এতে সর্বমোট ১৮০টি প্রকরণ রয়েছে। গ্রন্থটি সূত্র এবং ভাষ্যের আকারে রচিত। মাঝে মাঝে শ্লোক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে কতকগুলি শ্লোকে অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সার লিপিবদ্ধ রয়েছে। মোট শ্লোক সংখ্যা ৬০০০। সংক্ষেপে অধিকরণগুলির আলোচ্য বিষয়—রাজকুমারদের শিক্ষা, মন্ত্রীর যোগ্যতা, রাজার দৈনিক কর্তব্য ; বিভাগ, নগর ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির শাসনপ্রণালী ; দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন ; রাজকোষ ; রাজ্যের দৈবদুর্বিপাক ; সামরিক অভিযান ; পৌর প্রতিষ্ঠান ; যুদ্ধজয় ও বিজিত জাতির প্রীতি অর্জন পদ্ধতি ইত্যাদি। অর্থশাস্ত্রের ভাষা সাধারণত সহজ বোধ্য হলেও স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এতে কিছু অপাণিনীয় শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো আধুনিক পণ্ডিত নানা কারণে গ্রন্থটিকে কৌটিল্যের রচনা বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, এটি সম্ভবত কৌটিল্যের পরম্পরালব্ধ উপদেশাবলী অবলম্বনে ৩০০ সালের কাছাকাছি সময়ে রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। আ. খা.

অর্থান্তরন্যাস : সাধারণ বিষয় যখন বিশেষ বিষয়ের দ্বারা অথবা বিশেষ বিষয় যখন সাধারণ বিষয়ের দ্বারা সমর্থিত হয় তখন সাহিত্যে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যেমন—(ক) 'এ জগতে হায়! সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' (রবীন্দ্রনাথ)। প্রথম চরণে একটি সাধারণ বিষয়ের উপস্থাপনা হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে একটি বিশেষ বিষয়ের উপস্থিতি ঘটেছে। প্রথম চরণের সাধারণ বিষয়টি দ্বিতীয় চরণের বিশেষ বিষয়ের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়েছে। এরূপ উদাহরণকে সাধারণার্থক অর্থান্তরন্যাস বলা হয়। (খ) 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,/উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?' (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)। এখানে প্রথম চরণে পান্থ সম্পর্কে একটি বিশেষ উক্তি করা হয়েছে, দ্বিতীয় চরণে একটি সাধারণ উক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত বিশেষকে সমর্থন করা হয়েছে। 'বিশেষ' এখানে প্রাধান্য পাওয়ায় এটি বিশেষার্থক অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। কাজের দ্বারা কারণ অথবা কারণের দ্বারা কাজ সমর্থিত হলেও অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যেমন—(ক) 'দীন্ দুনিয়ার মালিক যেজন তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার!/মমতাজ্ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার!' (মোহিতলাল)। দীন্ দুনিয়ার মালিকের ন্যায়ের অভাবরূপ কারণটিকে সমর্থন করা হয়েছে মমতাজ আর নূরজাহানের উপর বৈষম্যপূর্ণ আচরণ রূপ কাজের দ্বারা। (খ) 'নারিনু মা চিনিতে তোমারে/ শৈশবে, অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে,/(যদিও অধম পুত্র—মা

www.pathagar.com

কি ভুলে তারে?)।' —মধুসূদন। শৈশবে অবোধ কবি মাতৃভাষাকে ভুলেছিলেন, কিন্তু জননীর স্নেহ সব কিছু ঊর্ধ্বে। তাই সন্তান কর্তৃক মাতৃভাষার ভোলার কাজটি সমর্থিত হয়েছে জননীর অগাধ স্নেহের কারণে। আ. ই

অর্থাপত্তি : বিশেষ ন্যায় ধর্ম অনুসারে যদি এক অর্থের সামর্থ্য-সূত্রে অপর অর্থের বোধ জন্মায়, তবে সেখানে অর্থাপত্তি অলঙ্কার হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে একে 'দণ্ডাপূপিকান্যায়' অর্থবোধ বলা হয়। দণ্ড অর্থাৎ শলাকা এবং অপূপ অর্থাৎ পুলিপিঠা। যদি বলা হয়—'মূষিক দণ্ড ভক্ষণ করেছে', তাহলে এর অর্থ হবে,—মূষিক দণ্ডস্থিত পিষ্টকাদি ভক্ষণ করেছে। অর্থাৎ দণ্ড ভক্ষণের দ্বারা দণ্ডস্থিত পিঠে খাওয়ার বিষয়টিও পরিস্ফুট হয়। এতে এক বিষয়ের উল্লেখে সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়টি সম্পর্কেও একটা ধারণা জন্মায়। সাহিত্যে অর্থাপত্তি অলঙ্কারের উদাহরণ—(ক) 'তুমিও জননী যদি খড়গ উঠাইলে,/মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!' (রবীন্দ্রনাথ)। অসীম স্নেহময়ী জগন্মাতাই যদি হিংসাবশে লোলুপ রসনা মেলে ধরে, তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি সাধারণ মানুষের পক্ষে তার প্রকাশ সহজেই সম্ভব হয়। পূর্বোক্ত বাক্যের অর্থ-সামর্থ্যসূত্রে পরবর্তী বাক্যের অর্থোৎপত্তি হয়েছে। (খ) 'ওই হার লুটাইছে সুন্দরীর স্তনের উপর,/এই যদি মুক্তাচার, আমরা তো কামের কিঙ্কর।' (শ্যামপদ চক্রবর্তী)। মুক্তাহার নিষ্কাম হলেও তার আচরণে তা প্রকাশ পায় নি, সুতরাং সকাম মানুষের পক্ষে অনুরূপ আচরণ সহজেই সম্ভব। প্রথমটির অর্থবোধে দ্বিতীয়টির অর্থোৎপত্তি হয়েছে। আ. ই

অর্থালঙ্কার : বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্যে কবি-সাহিত্যিকরা সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, প্রতীক বা ইঙ্গিতমূলক তুলনার আশ্রয় নেন। এগুলো সাধারণভাবে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, শ্লেষ, ব্যাজোস্তুতি লক্ষণ অনুসারে প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। বাক্যের অর্থের প্রসার ও সংকোচন ঘটায় বলে এগুলোকে অর্থালঙ্কার বলে। এই জাতীয় অলঙ্কারের স্রষ্টা শব্দ বা শব্দাবলীর পরিবর্তন করে তার স্থলে সমার্থক অন্য কোনো শব্দ প্রয়োগ করলেও অর্থালঙ্কারের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। যেমন,—'উধাও ছুটিছে মানস-তুরগ। লঙঘিয়া মায়ারণ্য' (করুণানিধান)। এখানে 'মানস-তুরগে'র স্থলে সমার্থক 'মানস-ঘোটক' লিখলেও অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, অথচ অলঙ্কারের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। শব্দের পরিবর্তন সহ্য করার শক্তি অর্থালঙ্কারের আছে। অর্থালঙ্কার সংখ্যায় বহু হলেও প্রধানত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন—সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক ও গূঢ়ার্থমূলক। প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অলঙ্কার, যেমন—সাদৃশ্য--উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উল্লেখ ইত্যাদি। বিরোধ--বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি ইত্যাদি। শৃঙখলা—কারণ-মালা, একাবলী, মালাদীপক ইত্যাদি। ন্যায়--অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান ইত্যাদি। গূঢ়ার্থ-প্রতীতি—অর্থান্তরন্যাস, আক্ষেপ, ব্যাজোস্তুতি, স্বভাবোক্তি, উদাত্ত ইত্যাদি। আ. ই

অর্ধ তৎসম : সংস্কৃত ভাষার যেসব শব্দ অবিকৃতভাবে বাঙলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে তৎসম (=সংস্কৃত সম) শব্দ বলে। এবং ঈষৎবিকৃত সংস্কৃত শব্দকে অর্ধতৎসম এবং পুরো বিকৃত সংস্কৃত শব্দকে তদ্ভব [তৎ(সংস্কৃত)ভব (জাত)] শব্দ বলে। অতএব যে মূল সংস্কৃতভাষার শব্দ বিকৃত উচ্চারণে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে বাঙলায় ব্যবহৃত হয় তাকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। যেমন—বাংলায় 'চাঁদ' শব্দটি তদ্ভব (চন্দ্র › চন্দ › চাঁদ), কিন্তু বাংলায় তন্দ্রের অর্ধতৎসম রূপ হলো—চান্দ। সেইরকম কৃষ্ণ › কেষ্ট অর্ধ-তৎসম শব্দ। নীচে কতকগুলো অর্ধ-তৎসম শব্দ দেওয়া হলো :

তৎসম	অর্ধ-তৎসম
বৈষ্ণব	বোষ্টম
নূতন	নতুন
গ্রাম	গেরাম
গৃহিণী	গিন্নী

শি. প্র. লা.

www.pathagar.com

অর্ধনারীশ্বর : শিব ও শক্তির সমন্বয়সূচক মূর্তি বিশেষ। এই মূর্তির দক্ষিণার্ধ মহাদেবের দেহের অর্ধাংশ নিয়ে এবং বামার্ধ উমার দেহের অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। শিব ও শক্তির এই সমন্বয়ধর্মী মূর্তিটি শিব-শক্তির যুক্তরূপকে প্রকাশ করে। ভারতের নানা জায়গায় এবং ভারতের বাইরেও অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম শতকের প্রথম দিকে উৎকীর্ণ এলিফান্টা গুহার অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তিটি প্রাচীনতম ও সৌম্য। বাইরের দিক থেকে অর্ধ-নারীশ্বরের স্বরূপ নিয়ে গঠিত না হলেও এর ভাবধারার প্রকাশে কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। এই মূর্তির বামের মুখ ও দেহের অর্ধাংশ দেবতার সৌম্যরূপকে প্রকটিত করেছে, দক্ষিণ দিকের মুখটি ভয়ঙ্করের প্রতীক এবং তা রৌদ্ররসের প্রকাশ ঘটিয়েছে। মূর্তির বাম দিকটি পেলব উমার লজ্জানম্র শান্তরূপের প্রকাশ ঘটিয়েছে। বাদামীর নারীশ্বর মূর্তিটিও শিব-শক্তির যুক্তিরূপের প্রকাশ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজশাহী সংগ্রহশালায় আর একটি উল্লেখযোগ্য অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি আছে। মু.আ.জ.

অর্ধ মাগধী (প্রাকৃত) : অর্ধ মাগধী বলতে বিশেষ ধরনের প্রাকৃত ভাষার নমুনা বোঝানো হয়ে থাকে। জৈন ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ এ ভাষায় লেখা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। সুকুমার সেন অর্ধ মাগধীর কতকগুলো লক্ষণের কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে : ১. পদান্ত-অস › ও – এ, ২. র › ল (অনিয়মিত), ৩. স্বর মধ্যবর্তী লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থানে য় (অর্থাৎ য়-শ্রুতি), ৪. আত্মনেপদী ক্রিয়া পদের অল্পস্বল্প ব্যবহার। ম. মু.

অর্ধমাগধী প্রাকৃত : মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরের ভাষার উল্লেখ করতে গিয়ে প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ পূর্বী প্রাচ্যকে বলেছেন মাগধী আর পশ্চিমা প্রাচ্যকে অভিহিত করেছেন অর্ধ-মাগধী নামে। এই নামকরণ অনুসারে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের নাম হয় যথাক্রমে প্রাচীন মাগধী ও প্রাচীন অর্ধমাগধী। কোশল অঞ্চলে (উত্তর বিহার) প্রচলিত প্রাচীন অর্ধমাগধী বুদ্ধের ভাষা ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই ভাষাতেই বুদ্ধ ও মহাবীর ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। আর্যভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রচলিত ভাষাসমূহ এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে মধ্য দেশের (মথুরা-শূরসেন) ভাষা প্রাধান্য বিস্তার করার ফলে বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে অর্ধ-মাগধী নির্বাসিত হয়। কিন্তু মহাবীরের ভাষা হিসেবে জৈনরা তাদের ধর্মসাহিত্যে একে রক্ষা করে। পুরাতন জৈনগ্রন্থ অর্ধ-মাগধীতে রচিত হয়েছে। ম. মু.

অর্ধযতি : অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় উপযতি, লঘুযতি ও অর্ধযতিকে একার্থক মনে করেন। কিন্তু ছন্দের ক্ষেত্রে অর্ধযতির ভিন্ন পারিভাষিক পরিচয় আছে। একথা ঠিক যে অর্ধযতি পূর্ণ নয়, অর্ধই ; সুতরাং কাব্যপংক্তির যেখানে ক্ষণিক বিরতি ঘটছে এবং সেখানে যে যতি পড়ছে, তাকে অর্ধযতি বলবার কথা। কিন্তু একে পর্বযতি বলাই বোধ হয় সংগত। অর্ধযতি পর্বযতির মতো লঘু নয়, তার একটা স্পষ্ট রূপ আছে এবং পয়ার জাতীয় ছন্দে অর্ধযতির পরিচয় সর্বাধিক স্পষ্ট। কারণ পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি ছন্দোবন্ধের কবিতা পদভিত্তিক, আর পদ হচ্ছে অর্ধযতির বিভাগ। সে জন্যে অর্ধযতিকে 'পদযতি'ও বলা হয়। কেউ কেউ এ যতিকে 'মধ্য যতি'ও বলেছেন। যাহোক, যে যতি পর্ব যতির মতো ক্ষীণ নয়, আবার পূর্ণ যতির মতো দীর্ঘ বিরাম সম্পন্নও নয়, অথচ যার একটা স্পষ্ট রূপ রয়েছে, তাকে অর্ধযতি বলা হয়। সাধারণত কবিতার পংক্তির মাঝামাঝি পর্যায়ে অর্ধযতি পড়ে।

> স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই,॥ কী-যে দেব তাই ভাবনা,
>
> যত দিতে সাধ করি মনে মনে॥ খুঁজে-পেতে সে তো পাব না।

উপরোদ্ধৃত উদাহরণে অর্ধযতির অবস্থান (দুই দণ্ড চিহ্নিত) সুস্পষ্ট। পয়ার ও মহাপয়ার দ্বিপদী—এই দুই ছন্দোবন্ধের কবিতায় আট মাত্রার পরে অর্ধযতি পড়ে এবং যথাক্রমে চৌদ্দ ও আঠার

www.pathagar.com

মাত্রার পর পূর্ণ যতি পড়ে। ত্রিপদী ও চৌপদীর পদগুলিও অর্ধ যতিদ্বারা নির্দিষ্ট। দৃষ্টান্ত :

পয়ার : গুরু বাক্যে পার্থ বীর॥ টানে ধনুর্গুণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি॥ রহিলা অর্জ্জুন॥
[কাশীরাম দাস]

ত্রিপদী : মাটীতে নিকানো ঘর॥ দাওয়াগুলি মনোহর,॥
সমুখেতে মাটির উঠান ;
খড়ো চালখানি ছাঁটা,॥ লতিয়া করলা-লতা॥
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
[গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]

চৌপদী : কোথা গেল সেই মহান শান্ত॥
নব নির্মল শ্যামল কান্ত॥
উজ্জ্বল নীল বসন প্রান্ত॥
সুন্দর শুভ ধরণী।
[রবীন্দ্রনাথ]

দুই দন্ড (।।) চিহ্ন অর্ধযতি নির্দেশক॥

আ. ক.

অর্ধেক রয়েছি জলে অর্ধেক জালে—ময়ুখ চৌধুরী : রচনাকাল : ১৯৭৪-৯৮, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, প্রকাশক : এ্যার্ডণ পাবলিকেশন, ৪০/২ বি নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল, স্কেচ : মশিউর মহসিন, মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। ময়ুখ চৌধুরীর দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ এটি, পঞ্চাশটি কবিতার গ্রন্থনা। সৃষ্টির জল আর জীবনের জালে আটকে যাওয়া কবি বুকের সুতোয় বুনেন কবিতার শরীর—মাকড়সার মতো। জল আর জলের মৌরানির ছলে আটকে যাওয়া মৎসকুমার কবি একালে চণ্ডীদাস হয়ে প্রতিশোধ নিতে চান। মীমাংসা চান কবিতার আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের। কাদামাটির এ প্রেমিক পুরুষ নিয়ত আটকে যান মাছ, মাছের আঁশটে গন্ধে। স্মৃতি ও বিস্মৃতির বালিশে মাথা রেখে, আঁধারে দু'টো হাতে ঢেউ গোনেন বন্যা বন্দরের। বাঙালির হাজার বছরের পুরাণ, জীবন ইতিহাস, জীবন চর্যা একাব্য গ্রন্থে উঠে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। জলের আয়োজনে মৎসকুমার কবি এক ভাগে মাথা রেখে তিনভাগ দোচোয়ানি জলে/ডুবে থাকা যুবতী পৃথিবীর প্রণামের অপেক্ষায় থাকেন। নিজেকে নিবেদন করেন 'মৃত্তিকার শেষ নীরবতার' কাছে গ্রহণের জন্য।

মা. জা.

অর্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : চিত্রকলা ও সঙ্গীত-সমালোচক। ১৮৮১ সালের ১ আগস্ট কলকাতার বড়বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অর্ঘ্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটস্থ রামপ্রসাদ পণ্ডিতের পাঠশালায়। ১৮৯৬ সালে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বড়বাজার শাখা থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ, পরে গ্রেগরী জোন্সের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রযুক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইন পাশ করে আইন ব্যবসা শুরু করলেও শিল্পের প্রতি তাঁর মোহ ছিল নিবিড়। মাতামহ মূর্তিকার শ্রীনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর শিল্পপ্রেরণার উৎস। শিল্পাচার্য যামিনী রায়, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টল আর্টে'র সচিব পদে থাকাকালীন সোসাইটির মুখপত্রিকা 'রূপমে'র মাধ্যমে তিনি অতুলনীয় খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন তাঁকে এ্যাটর্নির পেশা ত্যাগ করতে হয়। চীন, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় তিনি ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ললিতকলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করে। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'Ragas and Raginis' ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'ভারতের শিল্পকলা ও আমার জীবন' তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থ : 'ভারতের ভাস্কর্য', 'রূপশিক্ষা' এবং 'Vedic painting', 'Mithuna in Indian Art', 'South Indian Bronze', 'Modern Indian Painters', 'Masterpieces of Rajput paintings' প্রভৃতি। তিনি ১৯৭৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. জ. ভূ.

www.pathagar.com

অর্ধেন্দু শেখর মুস্তোফী : নাট ও নাট্যশিক্ষক। ১৮৫০ সালে কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। পাথুরিয়া ঘাটার রাজবাড়ির নাট্যমঞ্চে আত্মীয়তা সূত্রে তিনি তাঁর নাট্যজীবন শুরু করেন। ১৮৬৭ সালের ২ নভেম্বর তারিখে 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসনে প্রথম অংশগ্রহণ করেন। অল্প কয়েকদিন পর নটরাজ গিরিশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকে অভিনয় করেন। দীনবন্ধু স্বয়ং অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে দারুণভাবে মুগ্ধ হন। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সমকালীন সাহেবদের ভূমিকায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এ ছাড়া হাস্যরসাত্মক ও গুরুগম্ভীর চরিত্রেও তিনি অভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিভিন্ন নাটকে তিনি যে সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—দুর্গেশনন্দিনীতে 'বিদ্যাদিগগজ', নীলদর্পণে 'উড সাহেব', প্রফুল্লতে 'রমেশ' ও রিজিয়ায় 'ঘাতক' চরিত্রে। অর্ধেন্দু শেখরের অভিনয়কে গিরিশচন্দ্র বলেছেন 'অনুকরণীয়' এবং অমৃতলাল বসুর মতে তিনি ছিলেন 'বিধাতার হাতে গড়া actor ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক'। মু. আ. জ.

অর্ফিয়াস : গ্রিক পুরাণোক্ত থ্রেসীয় চারণ। ইনি গায়ক-কবি হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। অ্যাপলো বা ঈয়াগ্রাসের ঔরসে এবং ক্যাপাইওপীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর সুমধুর বীণার ঝঙ্কারে গাছপালা, এমনকি শিলাস্তূপ পর্যন্ত বিমোহিত হত। আরগোনট অভিযানের পর ইনি বনদেবী ইউরিডাইসকে বিবাহ করেন। স্ত্রীকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসতেন। কিন্তু সর্পাঘাতে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। এতে অর্ফিয়াস শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার আশায় তিনি হেডীয় বা যমপুরীতে গমন করেন। সেখানে তিনি দেবতাদেরকে তাঁর বীণার সঙ্গীতে মুগ্ধ করে একটি শর্তে ইউরিডাইসকে ফিরে পাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। শর্তটি হলো—ইউরিডাইস অর্ফিয়াসকে অনুসরণ করবেন ; তবে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত অর্ফিয়াস পেছনে ফিরে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারবেন না। এই শর্তে রাজি হলেও তিনি তা রাখতে পারেন নি। প্রবল ঔৎসুক্য বশে অর্ফিয়াস পৃথিবীতে পৌঁছার আগেই পেছনে ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে ইউরিডাইস অন্তর্হিতা হন। স্ত্রীহারা অর্ফিয়াসের বাকি জীবন শোকাকুল ও উন্মাদ অবস্থায় কাটে। কথিত আছে, একদল মহিলা কর্তৃক তিনি নিহত হন। তাঁর কর্তিত মস্তক নদীতে নিক্ষিপ্ত হলে তা ইউরিডাইসের নামোচ্চারণ করতে করতে নদীতে তলিয়ে যায়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় লিখেছেন : আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি, মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম্‌ঘুম্‌।' বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের রচনায় অর্ফিয়াস নানা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। মু. আ. রা.

অর্হৎ : শব্দটির আভিধানিক অর্থ যোগ্য, সম্মানীয় বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত। বিশেষ অর্থে নির্বাণপ্রাপ্ত বা নির্বাণের অধিকারী বৌদ্ধ কিংবা জৈন সন্ন্যাসীবিশেষ। ত্রিপিটকের সর্বত্র অর্হৎ শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে যাঁরা তৃষ্ণামুক্ত হয়ে ধর্মজীবনের পরম লক্ষ্য নির্বাণকে উপলব্ধি করেছেন, কেবল তাঁরাই অর্হৎ বলে গণ্য। অর্হৎ মাত্রই রাগ-দ্বেষ-মোহ ও কামনা-বাসনাদি যাবতীয় জাগতিক ভাব থেকে মুক্ত এবং পরামর্শ প্রাপ্ত ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত। ধ্যান ও প্রজ্ঞার দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে নির্বাণ লাভের যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের বর্ণনা বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়, তার সর্বশেষ স্তর হলো অর্হৎ। নারীপুরুষ নির্বিশেষে যে কোন বয়সেই অর্হত্ব লাভ সম্ভব। বুদ্ধের সঙ্গে একজন অর্হৎ-এর পার্থক্য এই যে, বুদ্ধ এমন কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও সর্বজ্ঞ, যা একজন অর্হৎ-এর আয়ত্তের বাইরে। মু.আ.জ.

অলকা : রামায়ণোক্ত ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী। এটি কৈলাস পর্বতের ওপর অলকানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে যক্ষরা বাস করে। মু.আ.জ.

www.pathagar.com

অলকানন্দা : ভারতের অন্তর্গত গঙ্গার উপনদী ; বিষ্ণুগঙ্গা ও সরস্বতী নদীর মিলিত ধারা। সংগমে মিলিত হওয়ার পূর্বে অলকানন্দা বিষ্ণুগঙ্গা নামেও প্রচলিত। নদীটি বদ্রিনাথ থেকে কিছু দূরে বসুধারা নামক জলপ্রপাত থেকে উদ্ভূত এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর এই নদীর ওপর অবস্থিত। মু.আ.জ.

অল কোয়ায়েট্ অন্ দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট-- এরিখা মারিয়া রেমার্ক : উপন্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ঘটনা নিয়ে এরিখা মারিয়া রেমার্কের বিখ্যাত উপন্যাস। সমস্ত কিছুই শেষ হয়, তাই যুদ্ধও একদিন থামে। আর সেই বিরতির নাম বোধ হয় শান্তি। কিন্তু সেই শান্তি শ্মশানের, অবসানের, ধ্বংসের। আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে শান্তি যদি কোনো দিন আসেও, সে আসবে স্তব্ধতার মূর্তি নিয়ে। জয় হবে ব্যর্থ, হার মনে হবে অসঙ্গত। এই ব্যর্থতা ও অসঙ্গতির ভয়ঙ্কর কাহিনী এই 'অল্ কোয়ায়েট্ অন্ দিন ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট'। বেদনার বিশ্বজনীনতা আছে বলেই এই বইয়ের আবেদন কখনো কোনো দেশে নিষ্প্রভ হবার নয়। এই উপন্যাস শেষ হয় পাউল্-এর মৃত্যু দিয়ে। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে একদিন সারা ফ্রন্ট লাইন এত নিস্তব্ধ, এত শান্ত যে, সেদিনকার যুদ্ধের রিপোর্টে কেবল এই কটি কথা লেখা আছে- পশ্চিম সীমান্তে আর নতুন কিছু নেই। ঠিক সেই দিন সে ধাশায়ী হলো। লেখক মারিয়া রেমার্ক জার্মান ঔপন্যাসিক। বইটি অনুবাদ করেছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩। প্রথম সচিত্র দশম সংস্করণ ১৩৮৮। পৃষ্ঠা ১৬৭, মূল্য ১০.০০ রুপি। বি. ব.

অলক্ত সাহিত্য পত্রিকা : বাংলা ১৩৭৯ সালের ১ বৈশাখ 'অলক্ত' সাহিত্য পত্রিকা কুমিল্লা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক বিশিষ্ট লেখকের লেখা এতে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সাহিত্য সাময়িকীর ইতিহাসে 'অলক্ত' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিতাশ চৌধুরী এই পত্রিকার সম্পাদক। 'অলক্ত'-পত্রিকায় শুধুমাত্র সাহিত্য বিষয়ক রচনা নয়, ইতিহাস-ঐতিহ্য, খেলাধুলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কিত রচনাও প্রকাশিত হয়। অলক্ত-র উজ্জ্বলতার দিক হলো এর 'বিশ্ব সাহিত্য' অংশ। কা. রো.

অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার : এই পুরস্কারটি অলক্ত সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে যাঁরা অবদান রাখছেন তাঁদেরকে ১৯৮১ সাল থেকে 'অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, যেমন : প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও সাহিত্য বিষয়ক অনুবাদ এই পুরস্কারের আওতাভুক্ত। প্রতি বছর দুটি বিষয়ের উপর পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে। অলক্ত পুরস্কার হলো স্বর্ণপদক, অর্থ সম্মানী ও পরিষদ প্রদত্ত সনদ। দেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব এ পর্যন্ত অনেকগুলো শাখায় পুরস্কার পেয়েছেন। কুমিল্লা থেকে প্রদত্ত পুরস্কারটি মানের কারণে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কা. রো.

অলক্ষ্মী : হিন্দু পুরাণোক্ত দুর্ভাগের দেবী বিশেষ। তিনি লক্ষ্মীর বড় বোন। সমুদ্র মন্থনকালে তিনি রক্তমাল্য ও রক্তকমলে ভূষিতা হয়ে সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হন। দেবাসুরের মধ্যে কেউ তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হননি। লিঙ্গপুরাণ মতে, অবশেষে দুঃসহ নামে একজন মহাতপা মুনি অলক্ষ্মীকে বিয়ে করেন ; কিন্তু পরে তাঁকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি দ্বিভুজা, গর্দভারূঢ়া, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা ও লৌহ অলঙ্কারে বিভূষিতা। কাঁকরের চন্দনে তাঁর সর্বাঙ্গলিপ্ত এবং তাঁর এক হাতে সম্মার্জনী। পদ্মাপুরাণ (উত্তরখণ্ড) মতে, ধর্মজ্ঞ উদ্দালক মুনি স্থূলবদনা, শুভ্রদর্শনা, রক্তনয়না ও রূক্ষপিঙ্গ-কেশা অলক্ষ্মীকে বিয়ে করেন। কিন্তু অলক্ষ্মী মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ না করে বলেন যে, যেখানে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয় সেখানে তিনি থাকেন না, যেখানে সর্বদা পাপানুষ্ঠান হয় সেখানেই তিনি থাকেন। মহর্ষি উদ্দালক তাঁর কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁকে

www.pathagar.com

ত্যাগ করে চলে গেলে তিনি রোদন করতে শুরু করেন। তখন লক্ষ্মীর অনুরোধে বিষ্ণু এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং অশ্বত্থ বৃক্ষে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেন। ম. চৌ.

অলক্ষ্মী বিদায় : হিন্দু সমাজের একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। অলক্ষ্মী অমঙ্গল ও অশুভের প্রতীক। তাই তাকে বিদায় দিয়ে লক্ষ্মীকে বরণ করাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দীপাবলী বা দেওয়ালীর দিন সন্ধ্যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু রমণীরা এই আচার পালন করেন। গোবর দিয়ে অলক্ষ্মীর এবং পিটুলি দিয়ে লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণের মূর্তি নির্মাণ করা হয়। তারপর কলার ডোঙ্গার উপর অলক্ষ্মীর মূর্তি স্থাপন করে উঠোনের এক কোণে রেখে তার পূজা করা হয়। পূজা শেষে মূর্তিটি রাস্তার তেমাথায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছোট ছোট মেয়েরা কুলা পিটাতে পিটাতে বড়দের সঙ্গে যায়। তেমাথার উপর অলক্ষ্মীর মূর্তিটি ফেলার সময় সবাই মিলে ধ্বনি তোলে—'লক্ষ্মী আয়, অলক্ষ্মী যা।' এ পর্ব শেষ করে ঘরে ফিরে এসে গৃহিণীরা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেন। ড. শা. আ.

অলঙ্ক গুর্জরী : দিবা গেয় রাগ। এই রাগে কোমল ও শুদ্ধ উভয় ঋষভ, কোমল গানধার, শুদ্ধ ও কোমল উভয় মধ্যম, কোমল ধৈবত, কোমল ও শুদ্ধ উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। ষাড়ব জাতি। আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমে ছয় স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই রাগে পঞ্চম বর্জিত। বাদীস্বর কোমল ধৈবত, সংবাদী স্বর কোমল গান্ধার। ঠাট টোড়ী। আরোহ : স ঋ জ্ঞ র ম দ ণ দ ন র্স। অবরোহ: র্স ন দ ণ দ ম্ধ জ্ঞ ম জ্ঞ র জ্ঞ র স। ক. গো.

অলঙ্কার : অলঙ্কার শব্দটি 'গহনা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। নারী দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সোনা, রূপা ইত্যাদি ধাতব পদার্থ দ্বারা তৈরি মূল্যবান গহনা ব্যবহৃত হয়। কাব্য বা সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও কবি-সাহিত্যিকগণ অলঙ্কার ব্যবহার করেন। সাহিত্যে সুচিত শব্দের ও ধ্বনির সুবিন্যাসই হচ্ছে শব্দালঙ্কার এবং বিভিন্ন ব্যঞ্জনায়, তাৎপর্যে, লক্ষ্যার্থে ও ব্যাঙ্গ্যার্থে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমষ্টিই রূপক, উপমা প্রভৃতি নামে অর্থালঙ্কার রূপে প্রযুক্ত হয়। [সাহিত্যে] ভাষায় দু'প্রকার অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, যথা : শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। (ক) শব্দালঙ্কার : এ জাতীয় অলঙ্কারের অবস্থানে এক বা একাধিক ধ্বনির সহায়তায় বাক্য শ্রুতিসুখকর হয় এবং ভাবদ্যোতনায় কোন উক্তিকে সাধারণ উক্তি অপেক্ষা একটু বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে। উদাহরণ : "জোর যার মুলুক তার" অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক ইত্যাদি এ শ্রেণীর অলঙ্কার। উদাহরণ : চল চপলার চকিত চরণে, করি তুই আপন আপণ, হারালি তোর যা ছিল আপণ, এবার তোর ভরা আপন বিলিয়ে দেয় তুই যারে তারে। (খ) অর্থালঙ্কার : এ জাতীয় অলঙ্কার ভাষার অর্থের সৌন্দর্য সাধন করে থাকে। উদাহরণ : "সীমার মাঝে, অসীম ! তুমি বাজাও আপন সুর।" উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, অপহ্নুতি, বক্রোক্তি, বাক্য বিস্তার ইত্যাদি এ শ্রেণীর অলঙ্কার। অলঙ্কার শাস্ত্রে এর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। আ. জ. ভূ.

অলঙ্কার অন্বেষা : নরেন বিশ্বাস। বইটি প্রকাশ করেছে কালিকলম প্রকাশনা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৬। সাহিত্য সমালোচনার ভিত্তিস্বরূপ সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন রূপ প্রকরণ, রচনাশৈলী, রীতি বা পরিচর্যার প্রকারভেদ, অলঙ্কার বিশ্লেষণ—এই সমস্ত বিষয়কে অঙ্গীভূত করে রচিত এ বই। বইটি বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস-কবিতা তথা ব্যাপক সাহিত্য সৃষ্টির সমালোচনায় সহায়ক। বইটির বিষয়বস্তু তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে অলঙ্কারের উৎস ও ক্রমবিকাশ আলোচনায় অলঙ্কার কী, সাহিত্যে অলঙ্কারের স্থান ও গুরুত্ব, সাহিত্যের আদিপর্ব থেকে কোন পর্যায়ে অলঙ্কারের উৎপত্তি, এর ক্রমবিকাশ বিস্তারিত কলেবরে বিবৃত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অলঙ্কারের শ্রেণীবিন্যাসে ব্যাপকভাবে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিভাজন নির্দেশপূর্বক

www.pathagar.com

শব্দালঙ্কারের বিভিন্ন শ্রেণী, শাখা-প্রশাখার ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ বিশ্লেষণ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থালঙ্কারের বিভিন্ন শ্রেণী ও শাখার ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। এ অধ্যায়ে অর্থালঙ্কারের আওতাভুক্ত সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার, বিরোধমূলক অলঙ্কার, শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার, ন্যায়মূলক অলঙ্কার ও গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দেশপূর্বক এগুলোর অন্তর্ভুক্ত শাখাসমূহের বিশদ বিশ্লেষণ ও উদাহরণসহ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বইটিতে রয়েছে একটি সুলিখিত অলঙ্কার ও সাহিত্য সমালোচনার রীতি-পদ্ধতি বিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকা। সাহিত্য রসাস্বাদনে বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অতিপ্রয়োজনীয় সহায়ক বই। র. আ. ক.

অলঙ্কার-চন্দ্রিকা : শ্যামাপদ চক্রবর্তী। বাংলা অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। এ গ্রন্থে লেখক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে বিবিধ অলঙ্কারের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'পূর্বধারা'য় সাহিত্যের সঙ্গে অলঙ্কারের সম্পর্ক সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরে সুবিধা মতো বিবিধ অলঙ্কারকে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন--শব্দালঙ্কার ; এই পর্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে অনুপ্রাস, শব্দশ্লেষ, পুনরুক্তবদাভাস ; যমক ও বক্রোক্তি। অর্থালঙ্কারকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—(ক) সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার—উপমা, রূপক, উল্লেখ, সন্দেহ, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ও প্রতীপ। (খ) বিরোধমূলক অলঙ্কার : বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি ও বিষম। (গ) শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার : কারণমালা, একাবলী ও সার। (ঘ) ন্যায়মূলক অলঙ্কার : কাব্যলিঙ্গ, অর্থাপত্তি। (ঙ) গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলঙ্কার : অপ্রস্তুত প্রশংসা, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজোস্তুতি, স্বভাবোক্তি ও আক্ষেপ। এ ছাড়া কয়েকটি অপ্রধান অলঙ্কারেরও ব্যাখ্যা আছে, যেমন—তুল্যযোগিতা, দীপক, সহোক্তি, অনন্বয়, শ্লেষ, পরিবৃত্ত, সমাধি, ভাবিক, পর্যায়, সামান্য, অনুকূল, মালাদীপক, তদ্‌গুণ, সূক্ষ্ম, ব্যাজোক্তি, রশনোপমা, উপমেয়োপমা, অধিক, অনুমান, অন্যোন্য, বিচিত্র, পরিসংখ্যা, ব্যাখাত, সমুচ্চ ও বিশেষ। বাংলা উদাহরণসহ কয়েকটি পাশ্চাত্য অলঙ্কারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে ; যেমন—Asyndeton বা অত্যযুক্ত, Polysyndeton বা অতিযুক্ত, Allusion বা উল্লিখিন, Innuendo বা বক্র ভাষণ, Irony বা বক্রাঘাত ইত্যাদি। 'উত্তরধারা'র আলোচ্য বিষয় : বক্রোক্তি ও অলঙ্কার, শব্দ ও অর্থ—অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি এবং রসধ্বনি, গুণীভূত ব্যঙ্গ, লক্ষণা পরিচয়, অলঙ্কারের ইতিকথা ইত্যাদি। বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক সংস্কৃত, মৈথিলী, ব্রজবুলি ইত্যাদিতে লিখিত উদাহরণের কতকগুলো বাংলায় (কবিতাকারে) অনুবাদ করে দিয়েছেন। এগুলো মর্মানুবাদ বা ছায়ানুবাদ মাত্র। আ. ই

অলীক মানুষ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। বইটি প্রকাশ করেছে দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৯৪। উনিশ-বিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে এক ওহাবপন্থী ফরাজি পীর পরিবারের বিকাশ তাদের লৌকিক আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তর-বাহির আর এরই মধ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেরিয়ে আসা একজন স্বদেশী বিপ্লবীর জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে লেখা উপন্যাস। ফরাজি পীর বদিউজ্জামানের কনিষ্ঠ পুত্র শফিউজ্জামান, যিনি শেষ জীবনে ইংরেজ শাসনাধীন ঔপনিবেশিক সরকারের বিচারে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন—তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বহুবর্ণ অভিজ্ঞতার জগত ও জীবনসত্য উন্মোচিত এতে। মীর সাহেবের ভক্ত পরিবেষ্টিত আবহের মধ্যে আয়েশে, যত্নে, অযাচিত সন্ধানে লালিত শফির জীবনে প্রথম বাঁক পরিবর্তন ঘটে

www.pathagar.com

হরিণমারা হাই স্কুলে পড়তে গিয়ে। তৎকালীন নবাব বাহাদুরের দেওয়ান চৌধুরী আবদুল বারি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন শফিকে। সেখানে সহপাঠি রবি তাকে উঠতি তারুণ্যের অনেক গোপন রহস্য আর নিষিদ্ধ তথ্যাবলী জ্ঞাত করে। এরপর একটি ছোট্ট পারিবারিক বঞ্চনায় আকস্মিক ভাবেই তার তরুণ জীবন আবর্তিত হতে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আবহে। হরিণমারার বড়োগাজি, বারুমিয়া, নবাব-এস্টেটের ম্যানেজারের পারিবারিক সান্নিধ্য তাকে নিজ পরিবার ও গাঁয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কপালীতলার জমিদারের ছোট তরফ বাবু দেব নারায়ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর ব্রাহ্ম সমাজ পত্তনে জড়িত হয় শফি, সেখানেই স্বদেশী আন্দোলন কর্মী যামিনী মজুমদারের সাথে পরিচয়, ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া। শফির শৈশব থেকে শুরু করে তার মৃত্যু-পরবর্তী তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় একশো বছরের এ কাহিনীতে ধর্ম, নারী, কাম, রোমাঞ্চ, অলৌকিক মাহাত্ম্য সর্বোপরি নিয়তি এক আশ্চর্য মিথষ্ক্রিয়ায় ভাস্বর। ঘটনা পরম্পরায় জীবনের বিচিত্র আলো-আঁধারী বাঁকপূর্ণ অমসৃণ পথে চলতে চলতে নিয়তি তাড়িত শফি শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদী বলে পরিচিত হয়েছিল। আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এই তরুণ একসময় হয়ে উঠেছিলো নিষ্ঠুর ঘাতক। ক্রমশ অধ্যাত্ম-মার্গে ধাবমান ধর্মগুরু পিতা ও সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের স্বদেশী বিপ্লবী সন্তানের পরস্পর বিরোধী ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে কুশলী লেখক প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে এনেছেন সমসাময়িক, বাঙালি হিন্দু-মুসলিম জীবনের এক অনাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সত্যকে। র. আ. ক.

অলুক্ তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে বিভক্তির লোপ না হয়ে যে সব তৎপুরুষসমাসবদ্ধ পদ পাওয়া যায় সেগুলোকে অলুক্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা—

(ক) অলুক্ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস —
পোকায় কাটা = পোকায়-কাটা।
তেলে ভাজা = তেলেভাজা।
কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা
তাঁতে বোনা = তাঁতে-বোনা।

এইরূপ : মায়ে-খেদানো, হাতে-কাটা ইত্যাদি।

[পোকা দ্বারা কাটা ইত্যাদি অর্থে বুঝতে হবে]

(খ) অলুক্ চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস —
বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়ে-পাগলা।

(গ) অলুক্ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস —
বাঘের ভয় = বাঘের-ভয়।

(ঘ) অলুক্ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস —
চোখের বালি = চোখের-বালি।
টাকার কুমির = টাকার-কুমির।

(ঙ) অলুক্ সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস —
গায়ে পড়া =গায়ে-পড়া।
যুধি স্থির = যুধিষ্ঠির (সংস্কৃত)।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসে এ ধরনের উদাহরণ বিশেষ দেখা যায় না। শি. প্র. লা.

অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস : সমাসঘটিত পদসমূহের প্রাধান্য রক্ষিত হয়ে, সমস্যমান অবস্থায় যে বিভক্তি যুক্ত হয় তা লোপ না পেয়ে যদি সমাস হয় তবে তাকে অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। সংক্ষেপে, দ্বন্দ্বসমাসে সমাসবদ্ধ অবস্থায় সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ না পেয়ে যে সমাস হয় তাকে অলুক্ দ্বন্দ্ব বলে। সমস্যমান পদগুলোতে প্রযুক্ত সপ্তমী বিভক্তিই সাধারণত লোপ না হতে দেখা যায়। যথা—

দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে।
হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে।

এইরূপ— দুধে-ভাতে, মায়ে-ঝিয়ে, জলে-স্থলে, ঘরে-বাইরে, জলে-কাদায়, পথে-ঘাটে, মাঠে-ঘাটে, ঝোপে-ঝাড়ে ইত্যাদি। শি. প্র. লা.

অলুক্ বহুব্রীহি সমাস : সমস্যমান পদসমূহের কোনটির অর্থ প্রধান না হয়ে সমাসবদ্ধ পদটি যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় এবং পূর্বপদে যদি বিভক্তির লোপ না হয় তবে তাকে অলুক্ বহুব্রীহি সমাস বলে। অর্থাৎ, পূর্বপদে বিভক্তির লোপ না হয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে অলুক্ বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা—

www.pathagar.com

মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়-পাগড়ি।
কানে খাট যে = কানে-খাট।
হাতে ছড়ি যার = হাতে-ছড়ি।
এইরূপ—কানে-কলম, পায়ে-বেড়ি, মুখে-ভাত, মাথায়-ছাতা, যাচ্ছে -তাই, গায়ে-পড়া ইত্যাদি। এই পূর্বপদের কখনও কখনও পরনিপাত ঘটে। যথা—পাঞ্জাবি-গায়ে, ছড়ি-হাতে, ছাতা-মাথায় ইত্যাদি। **শি. প্র. লা.**

অলুক্ সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদসমূহের যে কোন একটির বা সবগুলোর বিভক্তি সমাসবদ্ধ অবস্থায় লুপ্ত না হয়ে অবস্থান করে তাকে অলুক্ সমাস বলে। সাধারণত তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ বা উত্তরপদ অথবা উভয়পদে বিভক্তি লোপ না হয়েই সমাসবদ্ধ হতে দেখা যায়। (১) অলুক্ তৎপুরুষ সমাস, অলুক্ দ্বন্দ্ব ও অলুক বহুব্রীহি সমাস দ্রষ্টব্য। **শি. প্র. লা.**

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : কবি। ১৯৩৩ সালের ৬ অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপনা তাঁর পেশা। ১৯৪৭ সালে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'তিন সুর' ছাপা হয়। কবি মাত্রই তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। প্রিয় বিদেশি কবি রিল্‌কে। তিনি মনে করেন, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথপ্রদর্শক হচ্ছেন কবি। কিন্তু তাতে কবির ভূমিকা ফল্গুর মতো অন্তরপ্রবাহী। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'আধুনিক কবিতা বাংলা সাহিত্যের পবিত্রতম অহংকার।' ঈশ্বরকে মূল উপাদান করে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত হন। অন্যকথায়, গভীর অর্থে তিনি মানবিক, মানব জীবনের চিরায়ত সত্যকে ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগকুশলতায় রূপদান করেছেন। সংলাপের পটুতা এবং ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতার বই :যৌবন বাউল (১৯৫৯), নিষিদ্ধ কোজাগরী (১৯৬৮), রক্তাক্ত ঝরোখা (১৯৬৯)। তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে বারোটি কাব্যগ্রন্থ। 'আমাদের শান্তিনিকেতন'-এর একটি উল্লখযোগ্য গ্রন্থ। 'মরমীক রাত' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৯২ সালে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্যোয়েটে পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৫ সালে। রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৭ সালে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাবসু পুরস্কার ১৯৮৩ সালে ও আনন্দ পুরস্কার পান ১৯৮৫ সালে। খা. বি. জ. উ.

অলৌকিক ইস্টিমার—হুমায়ুন আজাদ। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৩, প্রকাশক : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১। ষাটের কবিতা মানে যৌনতা ও শ্লোগানের শিল্পকলা। কখনো উত্তীর্ণ কখনো বা না। হুমায়ুন আজাদ এর ব্যতিক্রম নন। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অলৌকিক ইস্টিমার' স্মার্ট গদ্য ভাষ্যে ও উপলব্ধিতে উপস্থাপিত। কবির দৃষ্টি যেমন আর্ট গ্যালারির সুন্দরীদের জন্য মুগ্ধতা ছুঁয়ে যায় তেমনি খোকনের সানগ্লাসও উপজীব্য হয়ে ওঠে। বিবস্ত্র চাঁদ যেমনি কবিতায় রমণীয় হয়ে উঠে রোদ ও জ্যোৎস্নায় অত্যাচারও ফালি ফালি করে তেতে উঠে আমাদের জীবনে চৌকাঠে। এ কাব্যে অলৌকিক ইস্টিমারে করে আসে দুঃখ, প্রেম, জ্যোৎস্না, রোদ, ব্যর্থতা, রোদন। দুঃখগুলো ব্লাড ব্যাংক থেকে রোদের স্মৃতি নিয়ে কাঁপছে সাদা হিম হয়ে অক্টোবরের সন্ধ্যায় কুয়াশার ক্রিমে। এখানে প্রেম রোদনের থেকে সুখ নিয়ে লবণাক্ত সবুজ মাটিকে বলে—মোমের আলো সর্বাত্মক দৃঢ় অর্থময়। এখানে সব জ্যোৎস্না কানে কানে বলে যায় সবচেয়ে যে আকাশটি নীল, তার নাম ৬৮ সালের ৭ এপ্রিল। কবি এখানে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন—এসভা প্রস্তাব করছে বাঙলার শাসনতন্ত্র রচনা করবে কবিরা/কেননা কবিতাই বাঙলার একমাত্র অবিনশ্বর তন্ত্র। কবিতা ছাড়া বাঙলাদেশ আর কোনো তন্ত্রমন্ত্র জানে না। তাই কবি বলে ফেলেন—সব প্লানার্থীরা জড়ো হবে ছাদে/আজ রাত্রে চিলেকোঠা থেকে নদী বয়ে যাবে। এ নদী জ্যোৎস্না আলোকিত, রোদেলা ছোঁয়া, স্নিগ্ধতায় অন্যরকম। **মা.জা.**

www.pathagar.com

অলৌকিক এক পাখি—আফলাতুন : গল্প-গ্রন্থ। অফসেট কাগজে জ্যাকেট বাঁধাই, মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। সাধারণ কাগজ জ্যাকেট বিহীন, পঁয়ত্রিশ টাকা। বিদেশে মার্কিন ডলার-৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮০, প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক। সুবর্ণ, ১৫০ ঢাকা স্টেডিয়াম, দোতলা, ঢাকা-১০০০, প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। এগারোটি গল্পের সংকলন অলৌকিক এক পাখি। গল্পগুলো যথাক্রমে : ধোঁয়া, সুখ, চিঠি, কান্না, অকূল কন্যা, কাকাতুয়া হাউস, পিউরাম, জলসিঁড়ি, ভাঙরি, সুন্দর দিদি, অলৌকিক এক পাখি। গ্রন্থের সবকটি গল্পই কলকাতার সাপ্তাহিক দেশ, মাসিক মুখপত্র এবং ঢাকার মাসিক সমকাল, সাপ্তাহিক বিচিত্রা ও কয়েকটি দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। অলৌকিক এক পাখি ১৯৭০ সালের ভয়াল জলোচ্ছ্বাসের পর লেখা। গল্পটি তখন ঢাকার প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় মানুষ, মাটি, সমুদ্র নামে ছাপা হয়েছিল। অলৌকিক পাখির গল্পগুলি চমৎকার ছোট ছোট বাক্য বিন্যাসে রচিত। সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র লেখক নিপুণভাবে প্রতিটি গল্পে তুলে ধরেছেন। ফলে প্রতিটি গল্পই হয়ে উঠেছে জীবনঘনিষ্ঠ। নাম গল্পটি জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত দুই নরনারীর গল্প। যাদের অলৌকিক এক পাখি এসে উদ্ধার করেছে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে। পা. র.

অলৌকিক নাটক : জীবনের অলৌকিক ঘটনা নিয়ে লিখিত নাটককে অলৌকিক নাটক বা Miracle play বলে। সাধারণত সাধু ও মহা-পুরুষদের জীবনের অংশবিশেষকে অলৌকিকতা-মণ্ডিত করে এই জাতীয় নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে তোলা হয়। এরূপ অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে ধর্মীয়ভাবের মিশ্রণও থাকে। ইউরোপে মধ্যযুগের সাহিত্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের অসাধারণ জীবনকাহিনী নিয়ে অনেক Miracle নাটক রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে অনেক পৌরাণিক নাটক Miracle play-র আদর্শবাহী। অনেক যাত্রাও অলৌকিকতার লক্ষণযুক্ত থাকে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, রামকৃষ্ণ, রামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ প্রমুখ ব্যক্তির অলৌকিক জীবনকাহিনী নিয়ে যেসব নাটক রচিত হয়েছে সেগুলো Miracle play-র উদাহরণ। মু. আ. জ.

অশনি সংকেত : উপন্যাস। রচয়িতা বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বই আকারে প্রকাশের আগে ১৯৪৪-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৫৯। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে সম্মানিত হয়। সত্যজিৎ রায় উপন্যাসটিকে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রাম-বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তারই নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বাঙালি কৃষিজীবীরা কেমন হন্যে হয়ে উঠেছিল তারও জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'অশনি সংকেতে'র পটভূমি হচ্ছে বিভূতিভূষণের স্বগ্রাম বারাকপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও বনগ্রাম মহকুমা শহর। উপন্যাসের চরিত্রসমূহ যথেষ্ট বাস্তবতাসমৃদ্ধ। অনঙ্গবৌয়ের চরিত্রটি বাঙালির প্রতিদিনের সুখ-দুঃখময় সংসারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। গঙ্গাচরণ কিংবা গঙ্গাচরণের সংসারের ছবিও বাঙালির চিরপরিচিত জীবন-যাত্রায় সুলভ। লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র হরিহরের মতো গঙ্গাচরণ সংসারী মানুষ। পূজা-অর্চনা এবং গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা করে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। কিন্তু হরিহরের মতো গঙ্গাচরণ ভাববিলাসী নয়। তার বৈষয়িক বুদ্ধি ও ধূর্ততা তাকে কূটকৌশলের দ্বারা অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করবার সাহস যোগায়। মতি মুচিনী, কাপালী বৌ প্রমুখও গ্রাম বাংলার জীবন্ত ও বাস্তবানুগ চরিত্র। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় মানুষের চরম দুঃখ-দুর্দশাকে এসব চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আ. গ.

অশোক : মগধের মৌর্য রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত তাঁর

www.pathagar.com

পিতামহ, দ্বিতীয় মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার তাঁর পিতা। বিন্দুসারের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮–২৭৩ অব্দ) অশোক তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক ও তাঁর ৯৯ জন ভাইয়ের মধ্যে সিংহাসনের দখল নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সহায়তায় অশোক তাঁর ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত ও কোনো কোনো জনকে নিহত করে খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তবে কলিঙ্গ রাজ্য (উড়িষ্যা ও গঞ্জাম অঞ্চল) তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য। সিংহাসন আরোহণের আট বছর পর অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। কলিঙ্গ বিজিত হলো ; কিন্তু এ যুদ্ধে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এক লাখ লোক নিহত, দেড় লাখ লোক আহত ও বন্দি হয়, আরো বহু গুণ লোক যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা যায়। যুদ্ধের এই সর্বনাশা পরিণাম বিজয়ী সম্রাট অশোকের মনে গভীর শোক, দুঃখ ও অনুশোচনার সঞ্চার করে। তাঁর অন্তরে এক নতুন ভাবের উদয় হয়। যুদ্ধ–বিগ্রহ পরিহার করে তিনি শান্তির পথ অনুসরণ করেন। উপগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর জীবনের ব্রত হয় বৌদ্ধধর্মের অহিংসবাদ এবং নৈতিক সূত্রগুলোর প্রচার ও প্রসার সাধন করা। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র পর্বত ও স্তম্ভসমূহের গাত্রে নৈতিক শিক্ষামূলক উপদেশাবলী উৎকীর্ণ করেন। তাতে জীবহত্যা পরিহার, মাতাপিতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং ব্রাহ্মণ–শ্রমণদের প্রতি ভদ্র ও সশ্রদ্ধ ব্যবহার করার কথা খোদিত আছে। অশোক তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য অতি যোগ্যতার সঙ্গে শাসন করে প্রজামণ্ডলীর নৈতিক, মানসিক ও জাগতিক উন্নতিসাধন করেন। তাঁর ধর্মমহামাত্র নামক কর্মচারীরা ধর্ম ও নীতি প্রচার এবং রাজুক নামক কর্মচারীরা প্রজার মঙ্গলবিধান করতেন। তিনি বড় বড় রাজপথ নির্মাণ এবং রাস্তার উভয় পাড়ে ছায়া ও খাদ্যের জন্য নানা প্রকার ফলবান গাছ রোপা, পথিকদের সুবিধার জন্য পথের ধারে স্থানে স্থানে পান্থনিবাস তৈরি, পুকুর ও কূপ খনন এবং বহু জায়গায় পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যের বাইরেও (শ্রীলংকা, বার্মা) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। ধার্মিক, উদার, দাতা, দয়ালু, শাসনপটু, ন্যায়বিচারক, মানবহিতৈষী, সুখভোগ–ত্যাগী ও কর্মবীর নৃপতি হিসেবে অশোক ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'অশোকে' (১৯১১) সম্রাট অশোকের ধর্মভাব রূপায়িত করেছেন। **নূ. ই.**

অশোক : বৃক্ষ। অশোকপত্র দুর্গাপূজাদি কার্যে ব্যবহৃত কলা–বৌ বা নবপত্রিকার অন্যতম উপকরণ। তপস্যার স্থান হিসেবে পঞ্চবটী নির্মাণে বেদির পূর্ব–দক্ষিণ কোণে অশোক স্থাপনের বিধান আছে। বৃহৎ পঞ্চবটী নির্মাণ করতে হলে বেদির চারপাশে বর্তুলাকারে পঁচিশটি অশোক গাছ রোপণ করতে হয়। অশোক ফুল লক্ষ্মী, বিষ্ণু ও দেবীর পূজায় প্রশস্ত। এই ফুল কামদেবের পঞ্চবাণের অন্যতম। অশোক ফুল যুবতীদের পদাঘাতে বিকশিত হয় এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি আছে। তা থেকে তৈরি ঔষধ স্ত্রীরোগে বহুল ব্যবহৃত। চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী ও অষ্টমী যথাক্রমে অশোকষষ্ঠী ও অশোকাষ্টমী নামে পরিচিত। অশোকাষ্টমীতে মায়েরা অশোকফুল ভক্ষণ করেন। আর অশোকাষ্টমীতে শোকমুক্তি কামনায় স্ত্রী–পুরুষ সকলেরই আটটি করে অশোককলিকা পানের বিধান আছে। **ম. চৌ.**

অশোক : গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইতিহাস–আশ্রিত নাটক। প্রকাশকাল ১৯১১ সাল। ইতিহাসের বিশ্বস্ততা রক্ষা করেও গিরিশচন্দ্র এ নাটকে নিজের মৌলিক প্রতিভার নিদর্শন রেখেছেন। ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখক এতে ধর্মভাবের প্রাধান্য দিয়েছেন। অশোক সম্পর্কে প্রায় সমস্ত ঘটনাই নাটকের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। নাটকে ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা, হত্যা ইত্যাদি পাপলীলার

www.pathagar.com

সবিস্তার বর্ণনা আছে। তবে ঘটনার ঐক্য রক্ষা করতে নাট্যকার সব সময় সফলকাম হননি। চণ্ডাশোক ও ধর্মাশোক অশোকচরিত্রের এই দ্বিবিধ রূপ নাট্যকারকে অনুপ্রাণিত করেছে। নাটকীয় কাহিনীতে অশোকের অনেক নৃশংস নিষ্ঠুরতার পরিচয় আছে, এমনকি ধর্মত্ব লাভ করেও তিনি জৈন ধর্মাবলম্বীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছেন। এ ছাড়া অশোকের বেশ্যাসক্তির বর্ণনাও আছে। নাটকের শেষ দৃশ্যে অশোকের পরিপূর্ণ ধর্ম লাভের মাধ্যমে তাঁর চরিত্রের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক ও শ্রদ্ধেয় দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বীতশোক উল্লেখযোগ্য। আকালকে প্রভু ভক্ত হাস্যরসিক রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মু. আ. জ.

অশোক কুমার সেনগুপ্ত : কথাশিল্পী। ১৯৪১ সালে বিহারের হাজারীবাগ জেলার চাতরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করে, হাওড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সনদ প্রাপ্ত হন। অধুনালুপ্ত 'জনসেবক' দৈনিক পত্রিকায় কর্মজীবনের আরম্ভ, তারপর শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। শিক্ষাকতার পাশাপাশি 'যুগান্তর', 'আজকাল' ও 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় মুক্ত সাংবাদিকতা করেন। তাঁর 'যে কোন নিশীথে', 'সামনে নদী', 'অশোককুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প' এবং 'প্রণয় পদ্মের পাপড়ি' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া 'বেস্পতির ভাতভিটে', 'ধর্মনদী' ও 'অহল্যাভূমি' উপন্যাস প্রকাশিত হলে লেখক মহলে আলোচিত হয়েছেন। এসব লেখার মাঝে ছোটদের উপন্যাস 'টিয়া যখন পাখি', 'জীবন হাড়' এবং গল্পগ্রন্থ 'মজার নাম গল্প' প্রকাশিত হয়। অশোককুমার সেনগুপ্তের 'ধর্মনদী' ও 'অহল্যাভূমি' উপন্যাস দুটি বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর লেখায় গ্রামের মানুষের বহুমাত্রিক দিকের স্ফুরণ ঘটেছে। গৌ. ম.

অশোকগুচ্ছ : দেবেন্দ্রনাথ সেন। গীতিকাব্য। প্রথম প্রকাশ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ বা ১৯০০-০১ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ। পরিণত শিল্পবোধ ও প্রকাশদক্ষতায় 'অশোকগুচ্ছর কবিতাগুলি বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি করে। এসব কবিতায় মাইকেলের ক্লাসিক রীতির সঙ্গে বিহারীলালের রোমান্টিক শিল্পচেতনার মিল রয়েছে। প্রেম ও প্রকৃতিই দেবেন্দ্রনাথের কবিতার মুখ্য অবলম্বন। 'অশোকগুচ্ছে' কিছু সংখ্যক উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা আছে, এবং কবি শারীর প্রেমে আসক্ত। যেমন— 'ঘুমটা খুলিবে নাক? তবে বসি।/ আমি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া।/একি! একি চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি?/খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া'। এবং 'যাও-যাও-সে কি কথা? ধরি দুটি কর।/আমিও রাঙিয়া লই আপন অধর'। 'লাজ ভাঙান', দাও দাও একটি চুম্বন' ইত্যাদি কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের শিল্পী-মানস ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের (১৮৫৫-১৯১৮) শিল্পচেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। নারীর দেহ-সৌন্দর্যের সকাম বর্ণনাই দেবেন্দ্রনাথের এই জাতীয় কবিতায় মুখ্য। কবি দেহবাদী বা দেহাত্মবাদী প্রেমিক। বিশুদ্ধ নারী প্রেমের কবিতাও আছে। নারী স্তবই সেখানে প্রধান। এ প্রসঙ্গে 'নারী মঙ্গল' কবিতাটি স্মরণ করা যায়। মু. আ. জ.

অশোক মিত্র : উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯২৮ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডের স্কুল অফ ইকনমিকস-এ। অর্থনীতিতে ডক্টরেট। মার্কসবাদে প্রবল বিশ্বাসী অশোক মিত্র একজন খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক। ইংরেজি ও বাংলায় তিনি প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও আলোচনা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে অকথা-কুকথা, অচেনাকে চিনে চিনে, কবিতা থেকে মিছিলে ও নাস্তিকতার বাইরে বইগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'তাল বেতাল' গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার। খা.বি. জ. উ.

অশোকামিত্রিরণ : তামিল ভাষার ঔপন্যাসিক এবং সাহিত্য সমালোচক। বাংলা ভাষায় তাঁর

www.pathagar.com

রচনা অনুবাদের কারণে তিনি বাংলাভাষী পাঠকের কাছে নন্দিত। তিনি ১৯৩১ সালে সেকেন্দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখালেখি সূচনা হয় ১৯৬৬ সালে। অনেকগুলো উপন্যাস এবং অসংখ্য গল্প রচনা করেছেন। প্রথম উপন্যাস 'নিশ্চিহ্ন ছায়া'র রচনাকাল ১৯৬৬। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় জল (১৯৭৩) ; আঠারো অক্ষরেখা (১৯৭৭) ; আকাশকুসুম (১৯৮০) ; আজ (১৯৮৪) ইত্যাদি। সমালোচকের মতে "তীক্ষ্ণ, নির্মোহ, অনেক সময় নির্মম দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন অশোকামিত্রিরণ তাঁর উপন্যাসে, ছোটগল্পে। তামিল ভাষায় লিখলেও আসলে তা সারা দেশে স্বাধীনতার আগে-পরে কয়েক প্রজন্মে বেড়ে ওঠা উচ্চাশা, লোভ, ভোগবাসনা, ক্ষমতা-লিপ্সা, শিক্ষা, মূল্যবোধ, ধর্মভীরুতা, মায়ামমতায় জটিল মানসিকতার মধ্যবিত্ত মানুষের কাহিনী'।" তিনি সাহিত্য অকাদমী পুরস্কারে ভূষিত হন। সে. হো.

অশোক লিপি : মগধের মৌর্য সম্রাট অশোক (২৭২-২৩২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম অনুশাসন উৎকীর্ণ করে রেখেছিলেন। এগুলো পর্বত গাত্রে, শিলালিপি আকারে বা স্তম্ভলিপি আকারে ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গেছে। অশোকের অনুশাসন তিনটি পৃথক লিপিতে রচিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে প্রাকৃত, গ্রিক ও আরমাইক। আবামাইক ও গ্রিক লিপি ব্যবহৃত হয়েছে আফগানিস্থানে, খরোষ্টি লিপি মানসেরাফ শাহবাজ গড়ী সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে। অন্যত্র সব জায়গায় ব্রাহ্মী লিপি। সাধারণত ব্রাহ্মী লিপির যে রূপ অশোক অনুশাসনে পাওয়া যায় তাকেই অশোক লিপি বলা হয়। ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া কঠিন। মনে করা হয়, সিন্ধু উপত্যকার অর্ধ চিত্রলিপি ধরনের কোন লিপি থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে। ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে এ লিপি প্রচলিত ছিল। অশোক লিপিকে ভারতের ও বাইরের লিপির আদি উৎস বলে চিহ্নিত করা হয়। সংস্কৃত কিংবা দ্রাবিড় ভাষা যে এ লিপিতে রচিত হয় তাই নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার আরো বহু লিপি, যেমন—তিব্বতি, সিংহলি, বর্মী, সিয়ামী ও জাভানী এ লিপি থেকে উদ্ভূত বর্ণমালায় লিখিত হয়। বলা হয়ে থাকে প্রাকৃত ভাষার প্রথম স্তরের নিদর্শন হিসেবে অশোক লিপি তাৎপর্যপূর্ণ। ম. মু.

অশোকষষ্ঠী : এটি একটি মেয়েলী ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন এই ব্রত পালন করা হয় সন্তানের মঙ্গল কামনায়। সারাদিন উপোস থেকে সন্তানের মা ছ'টি অশোক ফুলের কুঁড়ি মুগ ও দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতে না লাগিয়ে গিলে ফেলেন। অশোক ফুল গাঢ় লাল রঙের এবং মাঙ্গল্যের প্রতীক। তাই প্রচলিত বিশ্বাস যে, এই ব্রত পালন করলে সন্তানের মঙ্গল হয়। ড. শা. আ.

অশোকস্তম্ভ : ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত পাথরের স্তম্ভসমূহ। মুক্তস্থানে দণ্ডায়মান এসব অশোকস্তম্ভের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ ফুট। বেশির ভাগ স্তম্ভেই বৌদ্ধধর্মের উপদেশাবলী খোদিত আছে। স্তম্ভগুলিতে পুষ্পাদি ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত রয়েছে এবং এগুলোর শীর্ষদেশে ঘণ্টাসহ ষাঁড়, সিংহ বা হাতির মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। সারনাথে অবস্থিত চার-সিংহ শীর্ষ সুবিখ্যাত স্তম্ভটি মৌর্য ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন এবং বর্তমানে তা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক। সুলতান ফীরূয শাহ্ তুঘলক আনুমানিক ১৩৫৪ সালে আম্বালার নিকটস্থ তোপরা থেকে একটি এবং মীরাট থেকে অপর একটি স্তম্ভ অক্ষত অবস্থায় দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। প্রথম স্তম্ভটি কোটলা ফীরূয শাহের জামি মসজিদের প্রাঙ্গণে 'মিনার-ই-জরীন' নামে এবং দ্বিতীয়টি 'ফুস্‌ক্‌-ই-শিকার' নামক প্রাসাদের প্রাঙ্গণে স্থাপন করেন। স্তম্ভ দু'টি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। এলাহাবাদ, সাঁচী, মানসেরা (হায়ারা জেলা), রামপূর্ব (চম্পারণ জেলা), কালসি (দেরাদুন), নিগালী সাগর ও রুম্মিনদেঈ (নেপালের তরাই) এবং অন্যান্য স্থানে আরো স্তম্ভ বিদ্যমান। অশোক স্তম্ভ নির্মাণে ইরানের একীমেনীয় ভাস্কর্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়। আ. খা.

www.pathagar.com

অশোকাষ্টমী : চৈত্র মাসের শুক্লাঅষ্টমী। হিন্দুদের একটি পুণ্য তিথি। এই তিথিতে বাংলাদেশের হিন্দু নরনারী ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করে থাকে। এই পুণ্য স্নানে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। এটাকে অষ্টমী স্নানও বলা হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লাঙ্গলবন্দ গ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে প্রতি বছর অশোকাষ্টমী তিথিতে বিরাট মেলা বসে এবং সেখানেই হিন্দুরা স্নান করে। অশোকাষ্টমীতে অশোক কলিকা দ্বারা রুদ্র অর্চনার বিধান আছে। তাছাড়া এই তিথিতে শোকমুক্তি কামনায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আটটি করে অশোককলিকা পানেরও বিধান আছে। ম. চৌ.

অশৌচ : সাময়িক অপবিত্রতা। অশৌচকালে ধর্মকর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ। রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বে অশৌচসংক্রান্ত বিধিনিষেধের বিবরণ আছে। আত্মীয়তার ধরন অনুসারে এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে অশৌচকাল একমাস, এগারো দিন, দশদিন, তিনদিন কিংবা মাত্র একদিনও হয়ে থাকে। মৃত্যুজনিত অশৌচে ক্ষৌরকর্ম ও মাছ-মাংস আহার নিষিদ্ধ। অন্য কারণে যার অশৌচ হয়েছে, তার সৃষ্ট অন্ন গ্রহণযোগ্য নয়। মাতা-পিতা কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত পুত্র কিংবা স্ত্রীর অশৌচকাল ; এ জাতীয় অশৌচকে কালাশৌচ বলে। কালাশৌচে বিবাহ, পাদুকা, ছাতা, পালক, কাষ্ঠাসন, মালা ও মৈথুন বর্জনীয়। দেহের কোন অংশে রক্তপাত হলে একদিনের ক্ষতাশৌচ পালনের বিধান আছে। স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাবকে রজস্বলাশৌচ বলে। এক্ষেত্রে তিন থেকে চারদিন মৈথুন, ধর্মীয় কিংবা বিশেষ বিশেষ কাজ নিষিদ্ধ। ম. চৌ.

অশ্রুকণা—গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী : গীতিকাব্য। প্রকাশকাল ১৮৮৭ সাল। গিরীন্দ্র মোহিনীর কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দ সহজ ও সরল। ১৮৮৪ সালে গিরীন্দ্র মোহিনীর স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হয়। ব্যক্তিগত জীবনের এই ব্যথা আর বেদনার বাণী 'অশ্রুকণা'র অনেক কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন—প্রিয়তম কবিতায় 'অস্ফুট মুকুল কত গন্ধ ভার নিয়া। শুকাইয়া গেছে ঝড়ে নিদাঘ দহনে। বিফল সাধের ছায়া পরানে লুকিয়া। বিরলেতে মুছে অশ্রু, কাঁদিয়া কাঁদিয়া।' প্রিয়তমের বিচ্ছেদ বেদনায় কবিচিত্ত বিহ্বল। 'অশ্রু' কবিতায় তারই প্রকাশ 'স্বর্গের দেবতা প্রেম গেছেন যথায়। সুকোমল কত হৃদি পূজিতেছে তাঁয়' ; সেই স্মৃতি কবির কাছে কতইনা বেদনাদায়ক। – 'প্রেম যবে, মূর্তিমান ছিলেন আমার। পূজেছি তাঁহায় দিয়ে প্রীতি ফুল-হার।' এই বেদনার প্রকাশ ছাড়া 'অশ্রুকণার' কোনো কোনো কবিতায় বাল্যস্মৃতি বিজড়িত গ্রাম্য বহিঃপ্রকৃতির চিত্ররূপময় বর্ণনা আছে। যেমন, 'গ্রাম্য ছবি' কবিতায় : 'পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীরদল, হাঁস দুটি করে সন্তরন, পুকুরের পাড়ে বাঁশবন।' এবং 'পড়িছে মনেতে, শীতের সকালে ভোরে, মাঠে ছুটে খেলা। মনে পড়িতেছে, শেফালি বিছানো, শিউলি গাছের তলা।' রবীন্দ্র কাব্যের কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব গিরীন্দ্র মোহিনীর কবিতায় লক্ষ্যগোচর হয়। মু. আ. জ.

অশ্রুকুমার সিকদার : বাংলা সাহিত্য-সমালোচক, প্রাবন্ধিক। জন্ম দার্জিলিংয়ের তরাই অঞ্চলের চা বাগানে ১৯৩২ সালে। পিতা হৃষিকেশ সিকদার, মাতা যোগমায়া দেবী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ., উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি। গবেষণার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের নাটক। শিলিগুড়ি কলেজে প্রায় সতেরো বছর (১৯৫৫-৭২) অধ্যাপনার পর অশ্রুকুমার সিকদার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন এবং অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন সমাপ্ত করার পর বর্তমানে শিলিগুড়িতে অবসর জীবনযাপন করেছেন। লেখক জীবনের শুরুতেই সমকালীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনার সূত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র আধুনিক বাংলা কবিতা ও উপন্যাস, তুলনামূলক সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ। বাংলা কবিতা ও উপন্যাস সম্পর্কিত তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে :

www.pathagar.com

আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় (১৩৮১) এবং আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস (১৯৮৮)। বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধেও অশ্রুকুমার সিকদারের আগ্রহ অনিঃশেষ। চোখের দুটি তারা (২০০০) শীর্ষক বইতে সেই ঔৎসুক্যের দিকটি উৎকীর্ণ হয়ে আছে। এই গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার আধুনিক বাংলা কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য (১৩৭৪), রবীন্দ্রনাথ ও রোদেন্‌ষ্টাইন (১৯৭১), বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ (১৯৮১), নবীন যদুর বংশ (১৯৯১)। ড. মা. জা.

অশ্রুনদীর ওপারে : জুবাইদা গুলশান আরা। বইটি প্রকাশ করেছে সরদার প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিস্তৃতির কাল থেকে শুরু করে আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপ, যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মূল্যবোধের পরিবর্তমান সত্যকে মূর্ত করে লেখা উপন্যাস। ষাটের দশকে যখন ঢাকা শহরের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে, পুরনো ঘরবাড়ি ভেঙে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, রাস্তাঘাট নির্মিত হচ্ছে, আর সেই সাথে বদলে যাচ্ছে এ শহরটির হৃদয় অর্থাৎ সংস্কৃতি—মানুষের চিন্তাচেতনা, ধ্যান-ধারণা, রাজনৈতিক সচেতনতা ; তখনকার ক্রমবিবর্তনের চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে উপন্যাসে। এ সময়কার দু'টি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়ে নিলু ও রিফাত। তাদের নিভৃত ভালবাসা শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে রূপ লাভ করেনি। বরং রিফাতের বিয়ের পর তার স্বামী মনজুরের সাথে নিলুর গড়ে উঠেছিলো চমৎকার বন্ধুত্ব। রিফাত-নিলুর পরস্পরের প্রতি হার্দ্যিক অনুভূতির গভীরতা ছিলো প্রবল। আর তাই মুক্তিযুদ্ধের সময় নিলু তার স্বপ্নের বাংলাদেশের নতুন পতাকা গচ্ছিত রাখার জন্য আর কারো কথা ভাবেনি, ছুটে এসেছে রিফাতের কাছে। রিফাত-মনজুরের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা নিলুর উপস্থিতি টের পেয়ে মনজুরকে ধরে নিয়ে যায় মিলিটারি। এখবর জানতে পেরে নিলু মনজুরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় গিয়ে ধরা পড়ে এবং নিজের জীবন দিয়ে মনজুরকে বাঁচায়। মনজুর-রিফাত নিলুর এ আত্মত্যাগের কথা কখনো ভোলেনি। কিন্তু এ প্রজন্মের তরুণ নোটন সমস্ত ব্যাপারটিকে ভুল বোঝে, তার কাছে মা রিফাত ও নিলুর সম্পর্ক, বাবার ভূমিকা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে লাগে। তার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের তীব্র প্রকাশ ঘটে একদিন। কিন্তু অত্যন্ত সংযমী মনজুর ঠিক সময়ে ঘুচিয়ে দেন সন্তানের ভ্রান্তি, ফিরিয়ে দেন মায়ের প্রতি সন্তানের আস্থা, একজন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা। আজকের এই ঝকঝকে শাণিত তরুণের মধ্যে ফুটে ওঠে বহুকাল আগের দৃঢ় দীপ্ত নিলুরই প্রতিচ্ছবি। ঘটনাবহুল এ উপন্যাসে উঠে এসেছে সমকালের অনেক ইতিহাস-সমর্থিত ঘটনা ও চরিত্রাবলী। র. আ. ক.

অশ্রুমতী : জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। ঐতিহাসিক নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে। এ-নাটকে রাজপুত জাতির বীর গাথাকে বিয়োগান্তক পরিণতিতে রূপদান করা হয়েছে। বীর প্রতাপসিংহের সঙ্গে মোঘলের অনুগত মানসিংহের বিরোধকে কেন্দ্র করে অশ্রুমতীর কাহিনী গড়ে উঠেছে। চিতোর-রাজ প্রতাপের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতাপ-দুহিতা অশ্রুমতীকে কৌশলে মানসিংহ হরণ করে নিয়ে ফরিদ নামে একজন মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যুবরাজ সেলিম বাধ সাধেন। ক্রমে অশ্রুমতী ও সেলিমের প্রণয় জন্মে। ফরিদের চক্রান্তে পরে অশ্রুমতীর উপর সেলিমের সন্দেহ জাগে। পৃথ্বিরাজকে হত্যা করে অশ্রুমতীকে সেলিম আঘাত করে ফিরে যান। শক্তসিং নামে জনৈক যুবক তখন অশ্রুমতীকে চিতোর ফিরিয়ে নেন। রানা প্রতাপের আদেশে অশ্রুমতী সারাজীবন যোগব্রতে অতিবাহিত করেন। চিতোরের এই জনপ্রিয় কাহিনীটি তৎকালে বেঙ্গল থিয়েটারে উপর্যুপরি অভিনীত হয়। মু. আ. জ.

অশ্রুমালা : কায়কোবাদ। গীতিকাব্য। প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫ সাল। কাব্যের মূল সুর প্রেম, বিরহ

www.pathagar.com

ও প্রকৃতিচেতনা। 'হতাশের আক্ষেপ', 'কে তুমি', 'উদাসীন প্রেমিক' ইত্যাদি কবিতায় কবির বিচ্ছেদপীড়িত হৃদয়ের মর্মবেদনার প্রকাশ ঘটেছে। কবির প্রেয়সী কবিকে ধরা দেয় না বলে তাঁর হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। তাই কবির সন্দেহ,—'সে বুঝি আমারে ভালবাসেনা!/ আমারে দেখিলে পরে, ছুটিয়া পলায় ঘরে,/ আঁচল ধরিলে তবু ফিরিয়া দাঁড়ায় না।' (হতাশের আক্ষেপ)। প্রেয়সীর প্রতি নিবিড় ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে 'অশ্রুমালা'র কোনো কোনো কবিতায় কায়কোবাদের প্রকৃতিচেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন— 'কে তুমি?–/ তুমি কি চম্পক কলি? গোলাপ মতিয়া বেলী?/ তুমি কি মল্লিকা যূথী ফুল্ল কুমুদিনী?' (কে তুমি)। কায়কোবাদের কবিতার বিষয়বস্তু গীতিরসের ধারায় উচ্ছ্বলিত। অশ্রুমালায় গীতিরসই প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রেম এবং প্রেমের বিচ্ছেদকে অবলম্বন করে এই গীতিরসের প্রকাশ সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। আ. ই

অশ্বঘোষ : সংস্কৃত সাহিত্যের কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক। তিনি বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের শেষ কিংবা দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে অযোধ্যার সাকেত নামক স্থানে তঁর জন্ম। ব্রাহ্মণ বংশের এই কৃতী সন্তান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং বুদ্ধের বাণী প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। প্রথমে তিনি সর্বাস্তবাদী ছিলেন। মৈত্রী, করুণা ও বুদ্ধভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিশেষ মতবাদের ভিত্তিতেই প্রধানত মহাযানের সূত্রপাত হয়। তাঁর তিব্বতী জীবনীকারের মতে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার। সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি জগৎ ও জীবনের অসারতা বর্ণনা করতেন। তিনি কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের সভাকবি নিযুক্ত হয়েছিলেন। অশ্বঘোষ বিরচিত কাব্য, নাটক ও দর্শনগ্রন্থ, ভারতীয় সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বুদ্ধচরিত' নামক মহাকাব্য। ১৭ সর্গে সমাপ্ত এই গ্রন্থে অলংকার শাস্ত্রে নির্দেশিত যাবতীয় লক্ষণ বিদ্যমান। মহাকবি কালিদাসের ওপর এ গ্রন্থের প্রভাব একটি স্বীকৃত সত্য। কবি অশ্বঘোষের পূর্ণ পরিচয় এ মহাকাব্যে পাওয়া যায়। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সৌন্দরানন্দ' বুদ্ধ-জীবনের কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে রচিত। বুদ্ধের এক ভ্রাতা নন্দের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ এবং রূপবতী যুবতী স্ত্রী সুন্দরের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ– এ দু'য়ের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত নন্দের শেষ পর্যন্ত বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশের প্রভাবে 'অর্হত্ব' লাভ এ গ্রন্থের মূল বক্তব্য বিষয়। কাব্যটি ১৮ সর্গে সমাপ্ত। অন্য গ্রন্থ 'শারিপুত্র প্রকরণ' একটি নাটক। এর উপজীব্য বিষয় : বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গে বর্ণিত শারিপুত্র ও মৌদ্ গল্যায়নের বৌদ্ধ ধর্ম ও সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী। অন্য যেসব গ্রন্থ অশ্বঘোষের রচনা বলে অনুমিত হয় সেগুলি হল : 'বজ্রসূচী', 'সূত্রালংকার', 'গণ্ডীস্তোত্র গাথা', 'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ' ইত্যাদি। 'বজ্রসূচী' ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদ প্রথার ওপর তীব্র আক্রমণাত্মক রচনা। 'গণ্ডীস্তোত্র গাথা' গীতিকাব্য এবং 'মহাযান' শ্রদ্ধোৎপাদ' দার্শনিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর গ্রন্থগুলি চীনা, তিব্বতি, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় বহুবার অনূদিত হয়েছে ম. চৌ.

অশ্বত্থ : বৃক্ষ। অশ্বত্থ হিন্দুদের নিকট পবিত্র বৃক্ষ বলে অভিহিত। এই বৃক্ষ থেকে কাঠ করা নিষেধ, এমনকি এর পাতা ছিঁড়লেও অকল্যাণ হতে পারে বলে লোকের বিশ্বাস। অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল বাঁধিয়ে দিলে এবং বৈশাখ মাসে তাতে পানি ঢাললে মহাফল লাভ হয়। হিন্দু পুরাণ মতে, অশ্বত্থ বৃক্ষ বিষ্ণুর প্রতিরূপ। পার্বতীর শাপে একবার কয়েকজন দেবতা বৃক্ষে পরিণত হন। এ নিয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। তা হল, জলন্ধর নামক জনৈক রাক্ষস স্বর্গরাজ্য অধিকার করবার আশায় ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে ইন্দ্র পরাস্ত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন জলন্ধরের পত্নী বিন্দা স্বামীর জীবন রক্ষার্থে বিষ্ণুর তপস্যা করলে রাক্ষসকে বধ করা ইন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। এতে দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বিন্দার তপোভঙ্গ

www.pathagar.com

করেন। ফলে জলন্ধরের পতন হয়। বিন্দা সবকিছু জানতে পেরে বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন বিষ্ণু এই বলে তাকে সান্ত্বনা দিলেন—'তুমি তোমার পতির অনুগামিনী হও ; তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, সেই বৃক্ষের পূজা করিলে আমি পরিতৃপ্ত হইব।' এভাবে বিন্দার ভস্মে অশ্বত্থ, তুলসী, ধাত্রী ও পলাশ—এই চারটি বৃক্ষের জন্ম হয়। ভগবদগীতায় উল্লেখ রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—'সকল বৃক্ষের মধ্যে আমাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া জানিবে।' অশ্বত্থ বৃক্ষকে নিয়ে এ ধরনের নানাবিধ কাহিনী লোকসমাজে প্রচলিত। এসব কারণে অশ্বত্থ বৃক্ষকে সবাই পবিত্র বৃক্ষ বলে মানে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে ও বিপদে-আপদে এ বৃক্ষকে পূজা করা হয় মানুষের মঙ্গল কামনায়। ড. শা. আ.

অশ্বত্থামা : মহাভারতীয় ও পৌরাণিক চরিত্র। দ্রোণাচার্যের পুত্র। জন্মেই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় রব করায় তার ঐ নাম হয়। পিতার কাছ থেকে ব্রহ্মর্ষির অস্ত্র লাভ করে তিনি যুদ্ধে অজেয় হওয়ার মানসে দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই অস্ত্রের বিনিময়ে সুদর্শন চক্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু সুদর্শন অস্ত্র উত্তোলন করতে ব্যর্থ হয়ে নতশিরে ফিরে আসেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতাপুত্র দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে সংহার করলে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা পাণ্ডবনিধনের জন্য নারায়ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর পাণ্ডবদের বিনাশ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি কৌরবপক্ষের সেনাপতি হন। মাতুল কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে সঙ্গে করে তিনি রাত্রে গুপ্তভাবে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অগণিত পাণ্ডব সৈন্য এবং হস্তী, অশ্ব নিধন করেন। পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি তখন সেখানে অনুপস্থিত থাকায় গুপ্তহত্যার হাত থেকে রক্ষা পান। দ্রৌপদীর প্রভাবে ভীম অশ্বত্থামার বধার্থে যাত্রা করেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরও তাঁর সঙ্গে যান। অশ্বত্থামা তাঁদের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন। অর্জুন তা মোচন করেন। তখন প্রলয়ের আশঙ্কায় নারদ ও ব্যাসদেব উভয়কে অস্ত্র প্রত্যাহার করতে বলেন। অর্জুন প্রত্যাহার করলেও অশ্বত্থামা তাঁর অস্ত্র সংবরণে ব্যর্থ হয়ে অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভে তা নিক্ষেপ করেন। ফলে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হয়, কিন্তু যোগবলে কৃষ্ণ শিশুকে জীবিত করেন। অশ্বত্থামা পরাজয় বরণ করে পাণ্ডবদের মণি দান করেন। দ্রৌপদী সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে পরিয়ে দেন। পাণ্ডবপক্ষের মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হস্তীর নাম অশ্বত্থামা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহাবীর দ্রোণাচার্য কর্তৃক বহু পাণ্ডবসৈন্য নিহত হলে কৃষ্ণ দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র ও যুদ্ধে বিরত করবার কথা চিন্তা করেন। অর্জুনকে তিনি 'দ্রৌণ-পুত্র অশ্বত্থামা হত' বলে ঘোষণা করবার উপদেশ দেন। পাণ্ডবগণ এই কৌশল অবলম্বন করলেও দ্রোণ তাঁদের বিশ্বাস করলেননা। তবে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে 'অশ্বত্থামা হত' রব ঘোষিত হলে তিনি তা বিশ্বাস করবেন বলে জানান। কিন্তু চির সত্যবাদী যুধিষ্ঠির মিথ্যা ভাষণে সম্মত হলেন না। তখন কৌশল করে ভীম পদাঘাতে ইন্দ্রবর্মার হস্তীটি নিধন করেন। যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে বলেন, 'অশ্বত্থামা হত' এবং অনুচ্চস্বরে বলেন, 'ইতি গজঃ' যুধিষ্ঠিরের মুখের বাক্য শোনার পর দ্রোণ অস্ত্র সংবরণ করেন। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন খড়গাঘাতে দ্রোণের শিরচ্ছেদ করেন। এই মিথ্যা ভাষণের জন্য মহাপ্রস্থানের পর যুধিষ্ঠিরকে নরকদর্শন করতে হয়। আ. ই

অশ্বপতি : মহাভারতোক্ত মদ্রদেশের রাজা। অশ্বপতি একজন পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি সন্তান কামনায় সূর্যাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর তপস্যা করেন। সাবিত্রী দেবীর বরে তিনি এক তেজস্বিনী কন্যারত্ন লাভ করেন। সাবিত্রী দেবীর দান বলে তাঁর নাম রাখা হয় সাবিত্রী। রাজ্যহারা অবস্থায় অরণ্যে বসবাসরত অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিয়ে হয়। সত্যবান অকালে প্রাণত্যাগ

www.pathagar.com

করলে সাবিত্রী তাঁর সতীত্বের মহিমায় মৃত পতিকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং যমের বরে তাঁর শ্বশুরের অন্ধত্ব দূরীভূত করেন। ম. চৌ.

অশ্বমেধ : প্রাচীন ভারতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিশেষ। এতে ঘোড়া বলির দ্বারা হোম করা হতো। পুত্র কামনায় অথবা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজারা এই যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে — নিরানব্বইটি যজ্ঞ করার পর একটি সর্ব সুলক্ষণযুক্ত অশ্বের ললাটে জয়পত্র বেঁধে তাকে পৃথিবীর চারদিকে যথেচ্ছ ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হতো। অশ্বের পেছনে সৈন্যসামন্তও অনুগমন করতো। কোনো বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজা অশ্বের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে প্রমাণ হতো তিনি অশ্বাধিকারীর সাবভৌমত্ব স্বীকার করেন না। তখন যুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা হতো। স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করলে কোনো বিরোধ বাধতো না। এইরূপে অশ্বটি বৎসরান্তে অন্যান্য রাজ্যের রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে ফিরে এলে অশ্বাধিকারী রাজচক্রবর্তী উপাধি লাভে সমর্থ হতেন। তখন যজ্ঞের অশ্বটি বধ করে তার বক্ষস্থলের মেদ অগ্নিদগ্ধ করে দীক্ষিত রাজা দগ্ধাবসার ধূম আঘ্রাণ করতেন। এরূপ সংস্কার ছিলো যে এই যজ্ঞের ফলে সর্বপ্রকার পাপক্ষয় এবং স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হতো। শত অশ্বমেধকারী রাজা ইন্দ্রত্ব লাভ করতেন। আরো আগে বৈদিক যুগে বন্ধ্যারানীর সন্তান লাভ মানসে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হতো। বলীকৃত অশ্ব সঙ্গমে রানী সন্তানবর্তী হয় বলে বিশ্বাস করা হতো। মু.আ.রা.

অশ্বসেন : মহাভারতোক্ত নাগ বিশেষ। তক্ষকের পুত্র। খাণ্ডবদাহের সময় তক্ষক অন্যত্র ছিলেন। তক্ষক-পত্নী অশ্বসেনকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে গলাধঃকরণ করে অগ্নিকুণ্ডের বাইরে আগমনের চেষ্টা করলে অর্জুন তাঁর শিরচ্ছেদ করেন। তখন ইন্দ্র অশ্বসেনকে মুক্ত করার জন্য বায়ু বর্ষণ করে অর্জুনকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেন। সেই সুযোগে অশ্বসেন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। অশ্বসেন তাঁর মাতৃহন্তা অর্জুনকে বধ করার জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সর্পবাণরূপে কর্ণের অজ্ঞাতে তাঁর তূণে প্রবেশ করে। কর্ণ ঐ বাণ অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এ ঘটনার কথা অবগত হয়ে তাঁর পায়ের চাপে অর্জুনের রথ এক হাত পরিমাণ নীচু করেন ; এর ফলে কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সর্পবর্ণ অর্জুনের স্বর্ণকিরীট ছেদন করে চলে যায় এবং অর্জুন প্রাণে বেঁচে যান। তবে তাঁর স্বর্ণকিরীট দগ্ধ হয়। এভাবে অশ্বসেন বিফল মনোরথ হয়ে কর্ণের কাছে গিয়ে আত্মপরিচয় দেয় এবং পুনর্বার বাণরূপে ব্যবহৃত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু মহাবীর কর্ণ এক বাণ দু'বার নিক্ষেপ করতে এবং অন্যের সাহায্যে জয়ী হতে অসম্মত হওয়ায় অশ্বসেন নিজেই অর্জুনকে হত্যা করার জন্য ধাবিত হয়। তখন কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন তাকে হত্যা করেন। ম. চৌ.

অশ্বিনী : পৌরাণিক চরিত্র। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের পত্নী। অশ্ব মস্তকের ন্যায় বলে এই নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী। এর অবস্থান শরতের দ্বিতীয় মাসের পূর্ণিমাতে হওয়ায় এই মাসের নাম আশ্বিন। চন্দ্রের সাতাশ স্ত্রীর মধ্যে অশ্বিনী প্রথমা। এই নক্ষত্রে জন্মলাভ করলে সর্বপ্রকার সুখসম্পদের অধিকারী হওয়া যায় এরূপ সংস্কার প্রচলিত। আ. ই

অশ্বিনীকুমার : সূর্যপত্নী সংজ্ঞা। সূর্যের তাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজের শরীর থেকে ছায়া নামক এক নারীকে নির্গত করে স্বামীর কাছে নিজের প্রতিনিধিরূপে রেখে পিত্রালয়ে পলায়ন করেন। এতে তাঁর পিতা বিশ্বকর্মা কোপাবিষ্ট হন। অভিমান বশে কন্যা তখন অশ্বিনী রূপ ধারণ করে উত্তর কুরুবর্ষে ভ্রমণ করতে থাকেন। সূর্য যোগবলে সমস্ত কথা জানতে পারেন। তিনি তখন উত্তর কুরুবর্ষে গিয়ে অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনীরূপী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। এতে সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনী ও রেবন্ত নামে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরাই অশ্বিনীকুমার নামে খ্যাত। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁরা স্বর্গবৈদ্য উপাধিপ্রাপ্ত হন। চিকিৎসা-সার-তন্ত্র নামে তাঁরা একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

www.pathagar.com

অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় পরম রূপের অধিকারী ছিলেন। তাঁরাই মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেবের জনক। মু. আ. জ.

অশ্বিনীকুমার দত্ত : রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রাম। সাব জজ পিতা ব্রজমোহন দত্তের কর্মস্থল পটুয়াখালিতে ২৫ জানুয়ারি ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭০ সালে রংপুর থেকে প্রবেশিকা, ১৮৭৮ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৭৯ সালে এম. এ. ও পরে বি. এল. পাস করে শ্রীরামপুর চাতরা ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে কিছুকাল বরিশালে ওকালতি করেন। কলকাতায় রাজনারায়ণের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। ১৮৮২ সালে বরিশালে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৮৮৪ সালে পিতার নামে বরিশালে ব্রজমোহন স্কুল স্থাপন করেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা : ১৮৮৫ সালে বরিশাল মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কমিশনার, ১৮৮৬ সালে পিপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন, ১৮৮৭ সালে বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাপন, ঐ বছরই বাখরগঞ্জ হিতৈষণী সভা ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, ১৮৮৮ সালে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান, ১৮৮৯ সালে পিতার নামে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন, ১৮৯৭ সালে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশ বান্ধব সমিতি গঠন, ১৯০৮ সালে রাজনৈতিক নেতা রূপে লক্ষ্ণৌ জেলে আটক, ১৯১৩ সালে ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের সভাপতি, ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান, ১৯২০ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ইত্যাদি। চারণকবি মুকুন্দ দাস ও স্বভাব কবি হেমচন্দ্রকে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের রচিত গ্রন্থ : ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, প্রেম, দুর্গোৎসবতত্ত্ব, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ভারতগীতি। তিনি ১৯২৩ সালের ৭ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। সা. আ.

অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়, স্মৃতিপটে শেখ মুজিব ও অন্যান্য : সৈয়দ নিজামুদ্দিন হাশেম রচিত প্রবন্ধ সংকলন। এই বইয়ে ১০টি প্রবন্ধ আছে। প্রতিটি প্রবন্ধ একজন বরণীয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ, মূল্যায়ণ এবং গতানুগতিকতার বাইরে এক নির্মোহ, গভীর তলদেশব্যাপী বিবেচনার অপূর্ব বিচার। এই প্রবন্ধগুলো একজন সমসাময়িক মানুষকে লেখকের আপনদৃষ্টিতে দেখাই শুধু নয়, লেখকের এই লেখা সেই ব্যক্তিটিকে স্থাপিত করে ইতিহাসের সবুজ পাতায় একটি অপূর্ব সুন্দর হৃদয়গ্রাহী পোকার মতো, যে পোকা না থাকলে প্রকৃতির সৌন্দর্য অর্থহীন। তিনি লিখেছেন কথা শিল্পী সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহকে নিয়ে প্রবন্ধ। নাম—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও কিছু খণ্ডচিত্র। তিনি লিখেছেন দু'জন অসাধারণ সাংবাদিককে নিয়ে প্রবন্ধ। নাম-আমার দুই বন্ধু : জহুর নূর উদ্দিন। তিনি লিখেছেন কবি সানাউল হককে নিয়ে প্রবন্ধ। নাম—নদী ও মানুষের কবি : সানাউল হক। আছে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমানকে নিয়ে স্মৃতিচারণ। প্রবন্ধের নাম বন্ধুবর আখলাক। প্রখ্যাত শিল্পী এস.এম. সুলতানকে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন যে নিবন্ধ তার নাম—সুলতানের আদম সুরাত। আসলে এ লেখাটি হাসনাত আবদুল হাই রচিত সুলতান উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তাঁর উপস্থাপনার গুণে এ লেখা অন্যরকম হয়ে যায়। আছে একটি ভিন্নধর্মী লেখা—যে লেখাটি একটি বইকে কেন্দ্র করে রচিত সে প্রবন্ধের নাম—ফেলে আসা দিনগুলি। আর বইটির নাম 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'। পরের প্রবন্ধ 'ফ্রম প্লাউ টু পেন' তাঁর বন্ধু মোঃ আবদুল বাতেনকে নিয়ে লেখা। তিনি লিখেছেন শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে প্রবন্ধ। নাম—শহীদ ধীরেন দা। এই প্রবন্ধের শেষ করেছেন এভাবে : 'অতিবড় শত্রুরা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্বদেশ প্রেম ও কর্তব্য নিষ্ঠার সম্পর্কে কখনো প্রশ্ন তুলতে পারেননি। কিন্তু জল্লাদ বাহিনীর সেসব ন্যায়নীতি বোধের কোনো বালাই ছিলো না। আর তাই বাঙালি জাতি আজ স্বজনহারা, অভিভাবকহীন। পরের প্রবন্ধ 'কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তমিজ্জউদ্দীন খান'। এটি

www.pathagar.com

একটি অন্যরকম প্রবন্ধ। তমিজউদ্দীন খানের জীবন স্মৃতি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে যা বলেছিলেন তাকেই সম্প্রসারিত করে এই প্রবন্ধটি তৈরি করেন। এই বইয়ের শেষ লেখার শিরোনাম 'শেখের সমসাময়িক'। এই প্রবন্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে রচিত। এ বইয়ের সবচেয়ে বড় পরিসরে লেখা এটি। তিনি শেষে লিখেছেন : 'যেহেতু মুজিব ছাড়া বাংলাদেশ হওয়া অসম্ভব ছিলো, যেহেতু তাঁর অকৃপণ দানের স্বীকৃতি ছাড়া বাঙালির ইতিহাস অসম্পূর্ণ তা তাঁর জীবন, তাঁর কার্যকলাপ, কৃতী নিয়ে ততোদিন আলোচনা হবে, যতোদিন বাঙালি জাতি এই পৃথিবীর মঞ্চে জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়।' এইসব প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক যে মূল্যায়ন করেছেন তা ইতিহাসের অংশ। এদের বাদ দিয়ে এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা হবে না। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রকাশ করেছে সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। প্রচ্ছদ শিল্পী অশোক কর্মকার, মূল্য : ৮০.০০ টাকা। সে. হো

অষ্টক : পৌরাণিক চরিত্র। মহাভারতোক্ত মহারাজ যযাতির দৌহিত্র। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভে অষ্টকের জন্ম হয়। অষ্টক একজন পুণ্যবান রাজা ছিলেন। নহুষ-তনয় যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কিছুকাল সেখানে বাস করার পর স্বর্গবাসী হন। একদিন ইন্দ্র যযাতিকে জিজ্ঞেস করেন যে, কিরূপ তপস্যার বলে তিনি স্বর্গে আগমন করতে সমর্থ হয়েছেন। যযাতি এর জবাবে বলেন যে, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব ও মহর্ষিদের কেউ অদ্যাবধি তাঁর সমকক্ষ তপানুষ্ঠান করতে সমর্থ হননি। রাজার এই জবাব অত্যন্ত অহমিকাপূর্ণ ও অন্য সকলের পক্ষে অবমাননাকর মনে করে ইন্দ্র যযাতিকে স্বর্গভ্রষ্ট করেন। এরূপে ইন্দ্রাদেশে স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি নিম্নাভিমুখে পতিত হওয়ার সময় অন্তরীক্ষ পথে নিজের দৌহিত্র অষ্টক ও তাঁর সহগামী বন্ধু প্রতর্দন, বসুমান ও শিবির সাক্ষাৎ পান। তাঁদের সঙ্গে যযাতির পরিচয় হওয়ার পর অষ্টকসহ তাঁরা সকলেই তাঁকে বলেন যে, অন্তরীক্ষ, দিব্য বা স্বর্গে যদি তাঁদের জন্য কোনো স্থান থেকে থাকে, তবে তাঁরা সেই স্থান তাঁকে প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন। যযাতি এর জবাবে বলেন যে, তিনি তাঁদের ছেড়ে একা স্বর্গে যাবেন না ; কারণ তাঁরা সকলেই কর্মফলে স্বর্গ জয় করেছেন। অতএব তাঁদের সকলের একত্রে স্বর্গে যাওয়া উচিত। একথা বলে অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান ও শিবিকে সঙ্গে নিয়ে যযাতি পুনরায় স্বর্গলোকে প্রবেশ করেন। ম. চৌ.

অষ্টক গান : এক প্রকার লোকসঙ্গীত। সাধারণত 'অষ্টক' বলতে আট সংখ্যার যে কোন বিষয়কে বোঝানো হয়। কোন রচনার আটটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদকে বলা হয় অষ্টক। কিন্তু অষ্টক গানের সঙ্গে আট সংখ্যার কোনো মিল নেই। চৈত্র-সংক্রান্তির সময় নীল গাজন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানে শিল্পীরা বিভিন্ন শ্রেণীর গান পরিবেশন করেন। এর এক শ্রেণীর গানকে অভিহিত করা হয় অষ্টক গান বা অষ্ট গান নামে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এই গান প্রচলিত আছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে এই গানের প্রচলন বেশি। এই গান পরিবেশিত হয় সমবেত কণ্ঠে। প্রথমে একজন গানের কিছুটা অংশ গেয়ে শুরু করেন। তারপর সবাই মিলে সেই একই অংশ গাইতে থাকেন। অষ্টক গানের বিষয় একদিকে শিবের বন্দনা, অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। বিশেষ করে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ও শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসকে কেন্দ্র করে এই গান রচিত হয়। এ ছাড়া লৌকিক প্রেমসঙ্গীতও অষ্টক গানের বিষয় হয়ে থাকে। বিষয়গত দিক থেকে এই গানের সঙ্গে গাজন গানের কিছুটা মিল থাকলেও সুর, পদবিন্যাস ও গায়কিতে গাজনের অন্যান্য গানের চেয়ে অষ্টক গান স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত একটি অষ্টক গানের নমুনা :

www.pathagar.com

সচীরানী কেন্দে বলে নৈদেবাসী
দেখবি আয়,
আমার নিমাই আমায় ছেড়ে যায়।
আর বুঝি মা বলে
নিমাই আমার, ডাকবে না আমায়।
এই নদীয়া আঁধার হলো নিমাই চান্দ
ছেড়ে গেল,
আমার ভাগ্যে এই ছিল
বাঁচার চেয়ে, ওরে নিমাই,
মরণ আমার ভাল।
(মুর্শিদাবাদ) ড. শা. আ.

অষ্টবসু : হিন্দু পুরাণোক্ত আটজন গণদেবতা বিশেষ। ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে তাঁদের জন্ম। তরা হলেন—ধ্রুব, ধর, সোম, অনল, অনিল, প্রত্যুষ, প্রভাস ও দ্যু। তাঁরা সকলেই ইন্দ্রের অনুচর ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে এঁদের নাম—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু। মহাভারতে তাঁদের নাম ভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন—বহুরূপ, এ্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, পিনাকী, অপরাজিত ও দ্যু। বসুগণ বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীকে হরণ করায় তাঁর অভিশাপে গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। কেবল দ্যু নামক বসুই ভীষ্মরূপে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হন। বাকি সাতজন জন্মের পরই জলে নিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবী থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ম. চৌ.

অষ্টমঙ্গলা : হিন্দুসমাজে বিয়ে উপলক্ষে পালনীয় লোকাচার। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার সাতদিন পরে অর্থাৎ অষ্টম দিনে কনের পিতার গৃহে এই আচারটি পালিত হয়। একটি থালায় দুধ, পানি ও আলতা মেশানো হয়। সেই মিশ্রণে বর-কনের হাত রেখে এয়োস্ত্রী বা সধবা মহিলারা তাদের 'মঙ্গল সূত্রের' বাঁধন খুলে দেন এবং গাঁটছড়া ফেলেন। এটি একটি মাঙ্গল্যসূচক লোকাচার। বিয়ের অষ্টম দিনে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর-কনের মঙ্গলসূত্রের বন্ধন মোচন করা হয় বলে লোকাচারটির নাম অষ্টমঙ্গলা বা অশটাহার। ড. শা. আ.

অষ্টমী স্নান : চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে হাজার হাজার নারী-পুরুষ গঙ্গাজলে স্নান করে পবিত্র হয়। এই স্নানকে বলে অষ্টমী স্নান। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় একই দিনে অষ্টমী স্নান করা হয়। বাংলাদেশে গঙ্গার শাখা পদ্মা। তবে সাধারণত ব্রহ্মপুত্র নদেই এই অষ্টমী স্নান সম্পন্ন হয়। এ উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্তী বাজিতপুর, গৌরীপুর ও শম্ভুগঞ্জে অষ্টমীর মেলা বসে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে এই মেলায়। ড. শা. আ.

অষ্টাঙ্গিক মার্গ : আট অঙ্গের সমন্বয়ে বুদ্ধ প্রদর্শিত দুঃখমুক্তির একমাত্র উপায়ই অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই আট অঙ্গ (১) সম্যক্ দৃষ্টি : চার আর্যসত্য ও দ্বাদশ নিদানযুক্ত প্রতীচ্য-সমুৎপাদ্ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান। (২) সম্যক্ সংকল্প : কাম, হিংসা ও প্রতিহিংসাবিহীন নিষ্কাম, মৈত্রী ও করুণার সংকল্প। (৩) সম্যক্ বাক্য : মিথ্যা, কুৎসা, কটু ও বৃথা বাক্য থেকে বিরত হয়ে সত্য, প্রিয়, মিষ্ট ও অর্থপূর্ণ বাক্য কথন। (৪) সম্যক্ কর্ম : প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মাদক সেবনে বিরত হয়ে জীবে দয়া ও বদান্যতা প্রদর্শন এবং চরিত্রবান থাকার কর্ম। (৫) সম্যক্ জীবিকা : মিথ্যা জীবিকা পরিহার করে সৎ জীবিকা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। (৬) সম্যক্ উদ্যম : ইন্দ্রিয়সংযম, কু-চিন্তা পরিত্যাগ ও সু-চিন্তা উৎপাদন এবং এর স্থিতি ও বৃদ্ধির চেষ্টা। (৭) সম্যক্ স্মৃতি : কায়, বেদনা, চিত্ত ও মানসিক ভাবসমূহের প্রকৃত স্মৃতি ; এসবের মালিন্য, ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতির প্রতি সর্বদা সতর্ক থাকা। (৮) সম্যক্ সমাধি : কাম ও অকুশল চিন্তা থেকে বিরত হয়ে চিত্তের একাগ্রতাসাধন। সম্যক্ সমাধি দ্বারা মনের বিক্ষেপ দূরীভূত হয়। আ. খ.

অষ্টাদশ পুরাণ : এই সমস্ত হিন্দু পুরাণের নাম হচ্ছে যথাক্রমে—ব্রহ্মা, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্ম বৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্ধ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড। মো. জ.ভূ.

www.pathagar.com

অষ্টাবক্র : পৌরাণিক চরিত্র। সুবিখ্যাত মহর্ষি ও সংহিতাকার। উদ্দালক-তনয়া সুজাতার গর্ভে কাহোড় মুনির ঔরসে তাঁর জন্ম। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তিনি বেদ, বেদাঙ্গ ও শাস্ত্র আয়ত্ত করেছিলেন। একদা গর্ভস্থ অবস্থায় তিনি পিতা কাহোড়ের বেদপাঠ অশুদ্ধ নির্দেশ করলে ক্রুদ্ধ পিতা পুত্রকে অভিশাপ দেন যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর দেহের অষ্ট স্থল বক্র হবে। গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মালে তাঁর নাম হয় অষ্টাবক্র। একদা অষ্টাবক্র ভগীরথ রাজার কাছে গেলে রাজা গাত্রোত্থান করতে বিলম্ব করলে তিনি কোপাবিষ্ট হয়ে ভগীরথের উদ্দেশ্যে শাপ দেন যে, যদি ভগীরথ তাঁকে বিদ্রূপ করে থাকেন তবে তিনি তাঁর মতো বিকলাঙ্গ হবেন, অথবা উত্তমাঙ্গ হবেন। ভগীরথ উত্তমাঙ্গই হন। একদা কাহোড় মুনি জনকরাজার সভায় তর্কযুদ্ধে বন্দী নামক জনৈক তার্কিকের কাছে পরাজিত হয়ে পণ অনুযায়ী জলমগ্ন হন। অষ্টাবক্র বন্দীকে পরাস্ত করে পিতাকে উদ্ধার করেন। পিতার উপদেশে সমঙ্গা নদীতে অবগাহন করে অষ্টাবক্র অতঃপর বিকলাঙ্গতা-মুক্ত হন। অষ্টাবক্র বদান্য-ঋষির কন্যা সুপ্রভার পাণিপ্রার্থী হলে কঠোর সংযম পরীক্ষার পর সুপ্রভাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। অষ্টাবক্র-সংহিতা নামক তিনি একটি যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। **আ.জ.ভূ.**

অসঙ্গ : মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন দার্শনিক ও সাধক। আচার্য অসঙ্গ ছিলেন বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁরা দু'ভাই খ্রীস্টীয় চার-পাঁচ শতক মহাযানী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান শাখা যোগাচারের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন করেন। পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁদের জন্ম হয়। আচার্য অসঙ্গ ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক। অবশ্য তাঁর অনুজ বসুবন্ধু ছিলেন তাঁর চাইতেও অধিক খ্যাতিমান। বসুবন্ধু অগ্রজের চেষ্টাতেই মহাযানী মতবাদের অনুরাগী হয়ে ওঠেছিলেন। অসঙ্গের আবির্ভাবের পূর্বেই যোগাচার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় বলে অনুমান করা হয়। আচার্য অসঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সাধকের। পারমার্থিক সত্য সম্পর্কে তাঁর আলোচনা কেবল দার্শনিকই নয় ; তা সাধন মার্গেরও কথা। অসঙ্গের দু'টি রচনার নাম 'মহাযান সূত্রালংকার' ও 'মহাযান সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র'। চীনা ও তিব্বতী ঐতিহাসিকেরা অসঙ্গের আরো কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করে থাকেন। তন্মধ্যে 'যোগাচার ভূমিশাস্ত্র', 'মহাযানাভিধর্ম-সঙ্গীতিশাস্ত্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্য রচনা 'বজ্রচ্ছেদিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র টীকার চৈনিক অনুবাদও পাওয়া যায়। তবে এ সবের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। **আ. খা.**

অসঙ্গতি : কার্য এবং কারণের ঘটনাস্থান যদি ভিন্ন হয় অর্থাৎ এক জায়গায় কারণ ঘটলে এবং অপর জায়গায় কার্যোৎপত্তি হলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। কাব্যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করাই এই জাতীয় অলঙ্কারের উদ্দেশ্য। যেমন—শিবের কপাল রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে/না জানে বাড়িল কিবা গুণ !/একের কপাল রহে আরের কপাল দহে/আগুনের কপালে আগুন॥ (ভারতচন্দ্র)। শিবের ললাটবহ্নিতে মদন ভস্মের পর রতির বিলাপ—একের অর্থাৎ শিবের কপালের আগুন ঠিকই রয়েছে, কিন্তু অন্যের কপাল পুড়েছে অর্থাৎ রতির সর্বনাশ হয়েছে। এখানে কারণ এবং কার্যের ঘটনাস্থল ভিন্ন হওয়ায় অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়েছে। এরূপ—(ক) কাঙাল তুমি দাদাঠাকুর, তাই কি কাঙাল মোরা ?/আগুন তোমার কপালে, তাই কি মোদের কপাল পোড়া? (কালিদাস রায়)। কারণ 'আগুন' এক স্থানে অর্থাৎ দাদাঠাকুরের কপালে, কিন্তু কার্য অন্য স্থানে অর্থাৎ মোদের কপালে। (খ) বারেক তাকাই যদি তব মুখপানে/পৃথিবী টলিয়া ওঠে। (বুদ্ধদেব বসু)। কারণ 'তাকানো' তব মুখপানে অর্থাৎ এক স্থানে কারণ, অন্য স্থানে কার্য—পৃথিবী টলে ওঠে। কিন্তু পরস্পরবিরোধী দু'টি বিষয় যদি একই আশ্রয়ে থাকে তবে অসঙ্গতি অলঙ্কার হবে না। যেমন—যদি বলা হয় 'পদে সর্পাঘাতের ফলে চোখে তন্দ্রা আসে', তাহলে পদ এবং চোখ দুটি ভিন্ন বস্তু হলেও যেহেতু দু'টি

www.pathagar.com

বিষয়ই একই দেহের অঙ্গ, সুতরাং কার্য-কারণ ভিন্ন স্থানে ঘটলেও এখানে অসঙ্গতি অলঙ্কার হবে না। আ. ই

অসমঞ্জস : পৌরাণিক চরিত্র। মহাভারত ও হরিবংশ মতে, তিনি সূর্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা ও অযোধ্যাপতি সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তাঁর অপর নাম অংশুধর। রাজা সগরের দুই মহিষী ছিল। জ্যেষ্ঠা মহিষী ছিলেন বিদর্ভ রাজের কন্যা কেশিনী ও কনিষ্ঠা মহিষী ছিলেন মহর্ষি কশ্যপের কন্যা ও গরুড়ের বোন সুমতি। পুত্র কামনায় সগর উভয় পত্নীকে নিয়ে হিমালয়ে শতবর্ষব্যাপী তপস্যা করলে মহর্ষি ভৃগুর বরে কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জস নামে একপুত্র এবং সুমতির গর্ভে ষাট হাজার পুত্র জন্মে। যৌবনে পদার্পণ করে অসমঞ্জস অতিশয় পাপাচারী, প্রজাপীড়ক ও দুরাত্মা হয়ে উঠলে সগর তাঁকে রাজধানী থেকে নির্বাসিত করেন। বিখ্যাত অংশুমান ছিলেন অসমঞ্জসের পুত্র। সগর রাজার যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে গিয়ে তাঁর ষাট হাজার পুত্র যখন কপিলমুনির ক্রোধে ভস্মীভূত হয়, তখন অংশুমান উক্ত মুনিকে সন্তুষ্ট করে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে আনেন। এই অংশুমানের পুত্রের নাম দিলীপ এবং দিলীপের পুত্রের নাম ভগীরথ। ম. চৌ.

অসম বৃক্ষ—রশীদ হায়দার : উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭। অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা। প্রচ্ছদ হাশেম খান। পৃষ্ঠা ৯৬। মূল্য ৩৫.০০। উপন্যাসটি সামাজিক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। এক পিতার ঘৃণ্য লোভের কাছে একটি তরুণীর জীবন কিভাবে নষ্ট হয়ে যায় ; অপরদিকে যুদ্ধ মানুষের জীবনকে কেমন অনিশ্চিত করে তোলে এবং তার পরিণতি এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। অর্থগৃধ্নু বাপ আবদুল করিম বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলো সতীনের সংসারে ; যে সংসারে ছিলো জমিজমা, টাকাপয়সা ও তার মালিকের প্রতিপত্তি। একইভাবে যে দ্বিতীয় মেয়ে রেবুকে বিয়ে দেয়। রেবু ফয়েজুর রহমান নামে শহরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় পিতা-মাতার গঞ্জনার শিকারই শুধু হয় না ; বাপ-মা তাকে বাধ্য করে ফয়েজুর রহমানের ঘরে যেতে। রেবু তখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী, বয়স পনেরো। ফয়েজুর রহমান চল্লিশোর্ধ। রেবু স্কুলে অন্যান্য মেয়েকে ভাষা আন্দোলনে মিটিং মিছিল করতে দেখেছে, তারও ইচ্ছে করে সেও অংশ নেয়। কিন্তু লোভী বাপমায়ের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় রেবু। সমাজ জানে ফয়েজুর রহমান রেবুকে বিয়ে করেছে, কিন্তু বাস্তবতা বিপরীত। তার চাইতেও কঠিন বাস্তব, রেবুর পেটে সন্তান আসে ; ফয়েজুর রহমানের আসাযাওয়া কমে আসে, এক পর্যায়ে বন্ধই হয়ে যায়। লেখক রশীদ হায়দার সমাজে বিদ্যমান এই শ্রেণীর মানুষের চরিত্র তথা সামাজিক চিত্র রূপায়িত করেছেন 'অসমবৃক্ষ' উপন্যাসে। 'অসম বৃক্ষ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বটিও অসম। রেবুর পুত্র সন্তান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুবক। সে যুদ্ধে যায়, যায় তার বন্ধু মানিক। যুদ্ধ শেষে মানিক ফিরে আসে, আসেনা রেবুর ছেলে। রেবুর অবলম্বন তখন শূন্য। এই সময়ই সে লোকমুখে শোনে যুদ্ধে পুরুষের মৃত্যুই অধিক ; তার প্রায় বিগত যৌবন তখন আরেক শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়—তার ভবিষ্যৎ কি? এখানেও আরেক অসম সম্পর্ক। যুদ্ধ মানুষকে অজস্র অসম ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করায়। রেবু মানিকের হাত ধরে কোন গন্তব্যে রওনা দেয় তা সে নিজেও জানে না। সে. হো.

অসমাপিকা :—অন্নদাশঙ্কর রায়। উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ সাল। সুচারু তার প্রণয়িনী সুরুচির গর্ভে নিজের মানস-কন্যার আবির্ভাব-কল্পনায় বিভোর ছিল। কিন্তু একদিন সে প্রত্যক্ষ করে সুরুচি ইতিপূর্বেই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের প্রতি তার কঠোর মনোভাব শেষ পর্যন্ত তার দাম্পত্য সুষমার উপর রূঢ় আঘাত হানে। সুচারু দাম্পত্য প্রণয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে সুরুচির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত করে। ক্রমবর্ধমান চিত্তবিক্ষোভ পরিশেষে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। নিরুপায় সুরুচি তার শিশুকন্যাসহ পিতৃগৃহে চলে যায়। বিষয় এবং ভাবের সংহত রূপের অভাব থাকলেও

www.pathagar.com

ভাষার শৈলী ও সৌষ্ঠব গুণে উপন্যাসটি আকর্ষণীয়। আ. ই.

অসমাপিকা ক্রিয়া : বাক্যে ব্যবহৃত যে ক্রিয়াপদে পুরুষ ও কালসূচক চিহ্ন থাকে না এবং সে কারণে বাক্য অসমাপ্ত থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা—তুমি **গেলে**......, সে **খেতে** ......, আমি **শুয়ে**......ধাতুর সাথে '-ইলে', '-ইতে' এবং '-ইয়া' বিভক্তিসমূহ যোগ করে সাধু ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াসমূহ গঠিত হয়। চলিত বা কথ্য ভাষায় '-ইলে' স্থানে '-লে', '-ইতে' স্থানে '-তে', এবং '-ইয়া' স্থানে '-এ' বিভক্তিগুলো ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়। এবং বিভিন্ন বিশেষভাব প্রকাশক যৌগিক বা মিশ্র ক্রিয়াপদের প্রথম ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে বাক্যে বসে। যথা—সে খেয়ে আসল, উঠে বসল, গিয়া পানি আনিবে। খাইয়া ঘুমাইবে, তাহার যাইতে হইল। আমি বাড়িতে গেলাম। শি. প্র. লা.

অসমাপ্ত মুক্তিসংগ্রাম ও অন্যান্য : কবীর চৌধুরী রচিত প্রবন্ধের বই। প্রকাশক : লালন প্রকাশনী, ৩৬ পুরানা পল্টন, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৭, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১। প্রচ্ছদ : রণজিৎ দাস, মূল্য : সত্তর টাকা। অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য একটি পাঁচমিশালি প্রবন্ধের বই। প্রবন্ধগুলোর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। ষোলটি প্রবন্ধের মধ্যে চার-পাঁচটি রচনায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের রাজা : তার নাট্যকর্মের আলোকে' প্রবন্ধটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। গ্রন্থভুক্ত প্রায়সবগুলো রচনাই পূর্বে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থটির শুরুতেই রয়েছে একটি ভূমিকা। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন : 'গ্রন্থভুক্ত ষোলটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত। সূচিপত্রের দিকে তাকালেই বিষয়-বৈচিত্র্যের পরিচয় ধরা পড়বে।' একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এখনো অসমাপ্ত।' গ্রন্থটির সংকলিত প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম হলো : মানবকল্যাণ, সুস্থ সাংবাদিকতা, বঙ্গবন্ধু মূল্যায়নের সমস্যা, প্রসঙ্গ : আমাদের ভাষা-সাহিত্যের জাতীয়তা, অসমাপ্ত মুক্তি সংগ্রাম, গীতিকবিতা ও গানের ভুবনে নজরুল, রবীন্দ্রনাথের রাজা : তাঁর নাট্যকর্মের আলোকে, জেমস জয়েস, সিঙ্গ : সাগর পাড়ের ঘোড়সওয়ার, টেম্পেস্ট প্রসঙ্গে, ফ্রাঞ্জ কাফকা হ্যারমান হেস, আর্তুর র‍্যাবো, টমাস-পেইন, রবীন্দ্রনাথ ও বুলগেরিয়া এবং ১ বৈশাখ ১৩৯৫। বঙ্গবন্ধু : মূল্যায়নের সমস্যা প্রবন্ধটি ১৯৮২ সালে লেখা। লেখাটি এখন পড়লে মূল্যায়নের সমস্যায় পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। খা. বি. জ. উ.

অসমীয়া : ভাষা। ভারতের আসাম রাষ্ট্রের ব্যাপক জনগণের ভাষাকে অসমীয়া, অহমিয়া বা আসামী ভাষা বলা হয়। এটা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার একটি আঞ্চলিক রূপ। বাঙলা, আসামী ও ওড়িয়া ভাষাকে সহোদরা ভাষাও বলা হয়। এ তিন ভাষায় শব্দসম্ভারগত এবং ব্যাকরণগত মিল বহুল পরিমাণে লক্ষ্যযোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর পরে অসমীয়া ভাষা লেখ্যরূপ পেয়ে বাঙলা ভাষা থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন বাঙলা ও আসামী একটি সাধারণ ভাষান্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি মনে করেন যে, সে সাধারণ ভাষান্তর হচ্ছে বঙ্গ-কামরূপী। সুকুমার সেন বলেছেন যে, চট্টগ্রামী ভাষার সঙ্গে বাঙলা সাধুভাষায় যে সম্বন্ধ অসমীয়ার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিকটতর। পারস্পরিক বোধগম্যতার আলোকে বিচার করলে উপরোক্ত মতকে উপেক্ষা করা যায় না। তবু জাতীয় বিশ্বাসের ভিত্তি বিচার করলে দেখা যায় অসমীয়া একটি পৃথক ভাষা। কারণ এ ভাষাভাষী জনগণের ঐতিহ্য, মর্যাদাবোধ ও সৃজনশীলতা এ ভাষাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। ম. মু.

অসমীয়া : জাতি। অতি প্রাচীনকালে বহিরাগত বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক নানাসময়ে বিভিন্ন পথে আসামে প্রবেশ করে এক সম্মিলিত অসমীয়া জাতি গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, আসাম অনেক জাতি ও উপজাতির বাসভূমি। ভাষা বিশ্লেষণে মনে হয় অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকই সর্বপ্রথম আসামে প্রবেশ করে। বাসস্থান অনুযায়ী

www.pathagar.com

উপজাতিগুলি দু'ভাগে বিভক্ত—পাহাড়ি উপজাতি এবং সমভূমি অঞ্চলের উপজাতি। গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, মিজো, নাগা, মিকির প্রভৃতি পাহাড়ে যথাক্রমে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, মিজো, নাগা, মিকির প্রভৃতি উপজাতি বাস করে। এছাড়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও অনেক উপজাতির বাস। পৃথিবীর প্রধান মানব গোষ্ঠী (race) হলো তিনটি—ককেসীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো। তন্মধ্যে ককেসীয় ও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক আসামে দেখা যায়। আসামের উপজাতিরা প্রধানত মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিব্বত, দক্ষিণ-চীন ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন সময়ে মঙ্গোলীয় জাতির বিভিন্ন শাখা আসামে প্রবেশ করে। যেমন—ভোটবর্মী, প্যারিওইয়ন, আহোম ইত্যাদি। সবশেষে আসে টাই ভাষাভাষী ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খাময়াং, আইটন, ফাকিয়াল, তুরুং প্রভৃতি মঙ্গোলীয় শাখাভুক্ত উপজাতি। আসামের উপত্যকা অঞ্চলের অসমীয়রা ককেসীয় (ইন্দো-আর্য) জাতির অন্তর্ভুক্ত। এরা পশ্চিম ভারত থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দিয়ে আসামে প্রবেশ করে। ব্রাহ্মণ, কলিতা, কায়স্থ প্রভৃতি নানা বর্ণের লোক এ শাখার অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, দ্রাবিড় এবং ভেদ্দীদ্ (প্রাক-দ্রাবিড়) গোষ্ঠীর লোকও অতি প্রাচীনকালে আসামে প্রবেশ করে। পরে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণ ঘটে। আবার খাসিয়া, কুকী, মিকির ও কাছাড়ীদের মধ্যে ভেদ্দীদ্ লক্ষণ দেখা যায়। মোট কথা, অসমীয়া জাতি মঙ্গোলীয়, ককেসীয়, ভেদ্দীদ্ ও দ্রাবিড়ীয় উপাদানে গঠিত। আ.খা.

অসমীয়া একাঙ্কগুচ্ছ ও পিয়লি ফুকন : আসামি বা অসমীয় ভাষায় রচিত একাঙ্কগুচ্ছের সংকলনের সম্পাদনা করেছেন ড. প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী। অসমীয়া ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন গুরুদাস ভট্টাচার্য। আসামে একাঙ্ক নাটকের সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালের পরে। লক্ষ্মীনাম বেজবরুয়ার 'গদাধর রাজা'র অনেক আগে ১৯১৮ সালে রচিত হয়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীরামচন্দ্র বরুয়ার কাব্যিক নাটক 'মনালিছা' (মোনালিসা)। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য একাঙ্কিকা শ্রী অনিল চৌধুরীর 'চিরন্তন'। এর আগে বীণা দেবীর 'এবেলার নাট' ছাপা হয় ১৯৫৫ সালে। 'চিরন্তন' হয় ১৯৬২ সালে। তারপর 'বিভ্রাট' লেখেন ভোলা ফটকী, 'চক্র' প্রবীণ ফুকন, 'পুতুলনাচ' ভবেন্দ্রনাথ শাইকীয়া, 'ভাস্বতী' সত্যপ্রসাদ বরুয়া, 'দ্বীপ' হিমেন্দ্রকুমার বরঠাকুর, 'দৈনন্দিন' দুর্গেশ্বর বরঠাকুর এবং 'পিয়লি ফুকন' নওগাঁও নাট্যসমাজ। সংকলনের অসমীয়া একাঙ্কিকা 'বিভ্রাট' চরিত্র, সংলাপ, ইত্যাদির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। নওগাঁও নাট্য সমাজ প্রকাশিত (১৯৪৮) পিয়লি ফুকন প্রকৃত অর্থে একাঙ্ক নাটক নয়, যদিও এতে অঙ্ক-বিভাজন নেই, দৃশ্যই অঙ্ক-র কাজ করেছে। ১৮৩০ সালে ইংরেজ বিতাড়ণের একটি প্রয়াসকে আশ্রয় করে রচিত এই নাটক অসমীয়া নাট্যজগতে আলোড়ন আনতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতা-প্রয়াসী অভিজাত শ্রেণীর যুবক পিয়লি ফুকন। তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। এই প্রেরণাদায়ক অথচ শোকাবহ ঘটনার নাটকীয় রূপ, পিয়লি ফুকনের বীরোচিত চরিত্র-চিত্রণ ইত্যাদি গুণের জন্য নাটকটি উল্লেখযোগ্য। প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী। বাংলায় প্রকাশ ১৯৮১ সালে। পৃষ্ঠা ভূমিকাসহ ২৩৬, মূল্য ১৩.৫০ রুপি। বি. ব.

অসম্পূর্ণ ধাতু : সমস্ত কালে ও তাদের উপবিভাগে যে সকল ধাতুর রূপ পাওয়া যায় না, সেগুলোকে অসম্পূর্ণ ধাতু বলে। বাংলা ভাষায় গম, আছ্, থাক 'হ' বট্, আস্, ধাতুগুলোর সবকালে একই রূপ মেলে না, এগুলোকে তাই অসম্পূর্ণ ধাতু বলে ।

(ক) √আ(আস্) এল (আইল), এলেন (আইলেন), এলে (আইলে), এলি (আইলি), এলাম (আইলাম), আয়।

(খ) √আছ্—আছে, আছেন, আছ, আছিস্, আছি, ছিল, ছিলে, ছিগেন, ছিলি, ছিলাম।

(গ) √হ (negative-এ)—নয় (নহে), নন (নহেন), নও (নহ), নস্ (নহিস্), নই (নহি)।

www.pathagar.com

(ঘ) √থাক্—আছ্ ধাতু ভবিষ্যৎ কালে 'থাক্' ধাতুর রূপ গ্রহণ করে এবং থাক্ ধাতু অতীতকালে আছ ধাতুর রূপ পায়।

(ঙ) √বট্—বটে, বট, বটেন, বটিস্, বটি।

শি.প্র.লা.

অসহযোগ আন্দোলন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক আন্দোলন। ঐ যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে শাসনকার্যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত যেসকল প্রতিশ্রুতি দেয়, যুদ্ধাবসানে তা রক্ষা করেনি। অধিকন্তু রাওলাট অ্যাক্ট (১৯১৯ সাল), জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৯১৯ সাল), পাঞ্জাবে দমননীতি ইত্যাদির প্রতিবাদে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কলকাতা (সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সাল) ও নাগপুর (ডিসেম্বর, ১৯২০ সাল) অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১ সাল), ইতালি কর্তৃক ত্রিপলী দখল (১৯১১ সাল), প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তি, বিশেষত ব্রিটিশ সরকারের নীতি, এক কথায় ব্রিটিশ সরকারের মুসলিম-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমানেরাও খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। এমতাবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নীতি অবলম্বন করে। অর্থাৎ খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হয় এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। অসহযোগ আন্দোলনের বিশিষ্ট দিকগুলি হলো—(১) ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত খেতাব, পদক ইত্যাদি বর্জন ;(২) স্কুল-কলেজ বর্জন ; (৩) আদালত বর্জন ; (৪) বিলেতী বস্ত্রের স্থলে দেশী বস্ত্র (চরকা-খদ্দর) ব্যবহার ; (৫) মাদক দ্রব্যাদি বর্জন ; (৬) অস্পৃশ্যতা পরিহার ; (৭) শান্তিপূর্ণ পিকেটিং এবং (৮) অভিযুক্ত হলে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে কারাবরণ। অপরপক্ষে তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল—হাতে তৈরি বস্ত্রশিল্পের প্রসার, জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন এবং গ্রামের সংস্কার ও সংগঠনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন। ১৯২১ সালে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হলে প্রায় ত্রিশ হাজার হিন্দু-মুসলমান নেতা ও কর্মী কারাবরণ করেন। গণ-আন্দোলন পরিচালনার জন্য কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত করে। অচিরেই আন্দোলন ব্যাপকতর রূপ ধারণ করে এবং ভারতবাসীর মধ্যে অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হয়। ১৯২২ সালের প্রথম দিকে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আইন অমান্য এবং করদান বন্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এর ফলে ভারতের প্রায় ৬০টি স্থানে শৃঙ্খলাহীন জনতা হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নেয়। ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এক ক্রুদ্ধ জনতা যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে। এর ফলে থানার কয়েকজন পুলিশ ও কর্মচারী ঘরের মধ্যে অগ্নি-দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। আন্দোলনটি হিংস্ররূপ পরিগ্রহ করছে বুঝতে পেরে মহাত্মা গান্ধী তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ সাল) তা অনুমোদিত হয়। ফলে আন্দোলনের উদ্যম ও গতি কমে আসে এবং সঙ্কুচিত হতে হতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তা চালু থাকে। **আ.খা.**

অসহযোগ আন্দোলন : ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন কেবল বাংলাদেশেই নয়—বরং বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসেও দিক-নির্দেশকারী, তাৎপর্যমণ্ডিত এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আন্দোলন ব্যাপকতায়, প্রকরণগত এবং গুণগত দিক থেকে স্বদেশে যেমন মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি সামরিক সরকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অহেতুক কালক্ষেপণ শুরু করে। অবশেষে প্রচণ্ড গণআন্দোলনের মুখে সামরিক

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু এই ঘোষণার পর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকার কথা ঘোষণা করেন। কেবল তাই নয়—তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদেরও হুমকি প্রদর্শন করেন। এরপরও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন দলের ৩৩ জন সাংসদ ঢাকা এসে পৌঁছান। সমগ্র দেশ যখন জাতীয় সংসদের অধিবেশনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে-ঠিক সেই মুহূর্তে ১ মার্চ দুপুরে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক বেতার ঘোষণায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্টের এই বেতার ঘোষণার পরপরই ঢাকাসহ সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মিছিলে শ্লোগানে সভা সমাবেশে রাজপথ জনপদ প্রকম্পিত করে তোলে ছাত্র-জনতা। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে এসে ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাৎক্ষণিকভাবে আহূত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।' অনির্দিষ্ট-কালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। শেখ মুজিব ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভা থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ঐ সভা থেকে ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সময় বাংলাদেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। মানুষ তাঁর ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মহাসমাবেশ থেকে বঙ্গবন্ধু ৪-দফা দাবি উত্থাপন করেন। তা হলো : (১) সামরিক আইন প্রত্যাহার, (২) জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, (৩) গণ-হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও (৪) আহত-নিহতদের ক্ষতপূরণ প্রদান। দ্বিতীয় পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলনেরও ডাক দেন। পাকিস্তানি সামরিকজান্তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে পথে নামে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, বস্তিবাসী, শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, আতাউর রহমান খান প্রমুখ রাজনীতিকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও শেখ মুজিবের দাবির প্রতি সমর্থন জানালো। আন্দোলনে এগিয়ে আসে চারু ও কারু শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, রেডিও ও টেলিভিশনের শিল্পী, কলা কুশলী, সাংবাদিক, অবসরপ্রাপ্ত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্য, সি এস পি-ও ই পি সি এস বাঙালি অফিসার, ডাক্তার-নার্স-প্রকৌশলী, প্রেস কর্মচারী, সাংবাদিক কর্মচারী, পত্রিকা হকার্স, বিভিন্ন অফিসের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন, নৌপরিবহন শ্রমিক-কর্মচারী, রিকসা শ্রমিক, ঠেলাগাড়ি শ্রমিক, কচি-কাঁচার শিশু-কিশোর, খেলোয়াড় ও নারী সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, রেল, বিমান, বাস-ট্রাক শ্রমিক-কর্মচারীসহ সকল স্তরের মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে কলকারখানা, রেল-বিমান, বাস-ট্রাক, সচিবালয়, হাইকোর্ট জজকোর্ট, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি অফিস, ব্যাংক-বীমা, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ কারফিউ অগ্রাহ্য করে পথে নামে। পাকিস্তানি সেনা শাসক দিনের পর দিন গুলি চালিয়ে অগণিত নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিকল্প প্রশাসন গড়ে তোলেন। শাসন পরিচালনার জন্য তিনি ৩৫টি বিধি জারি করেন। বস্তুত সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এমন কি অর্থ আদান-প্রদান, ব্যাংক লেন-দেনও চলে তাঁর নির্দেশে। ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত এ আন্দোলন ছিলো অভাবনীয় সর্বব্যাপী।

জো. না.

www.pathagar.com

অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : সুকুমার বিশ্বাস রচিত প্রামাণ্য রাজনৈতিক গ্রন্থ। বইটি প্রকাশ করেছে আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬। মূল্য : ২১০.০০ টাকা। এ গ্রন্থে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয় থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি, বিশালতা ও ব্যাপকতর রূপটিকে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই—কিন্তু ঘটনার প্রামাণ্য বিবরণ আছে যা বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ গ্রন্থের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আলোকচিত্র। সমকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে আহরিত এসব আলোকচিত্র ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ প্রামাণিক উপাত্ত বা উপকরণ হিসাবে গবেষকদের কাছে বিবেচিত হবে। গ্রন্থে 'পরিশিষ্ট' অংশ এবং 'উল্লেখপঞ্জি' সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থের গুণগত মানকে আরো সমৃদ্ধ করেছে—এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। জো. না.

অসহযোগ আন্দোলন : একাত্তর। রশীদ হায়দার। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫, পৃষ্ঠা : ১০৪, মূল্য : ১৫.০০ টাকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মাস নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের পরিমাণ বেশ কম। এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত বইগুলো হচ্ছে : অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব—সুকুমার বিশ্বাস ; একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলো—নাজিমুদ্দিন মানিক ; এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম—সিকদার আবুল বাশার ; বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস—ড. মোহাম্মদ হাননান ; বিক্ষুব্ধ মার্চ '৭১—স্বদেশ রায় ; অসহযোগের দিনগুলি—ড. আতিউর রহমান ইত্যাদি। ১৯৭১ সালের মার্চ সম্পর্কিত প্রথম উল্লেখযোগ্য বই 'অসহযোগ আন্দোলন : একাত্তর'। লেখক রশীদ হায়দার। পয়লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত, দিন ও তারিখ অনুসরণ করে ঘটনাবলীর প্রামাণ্য ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়ে গেছেন। রশীদ হায়দারের উপস্থাপনা কথা-সাহিত্যের আঙ্গিকে। ফলে, তথ্যপূর্ণ হয়েও তত্ত্ব ভারাক্রান্ত হয়নি। বইটিতে ৪টি পরিশিষ্ট রয়েছে। ১. ঐতিহাসিক ছয় দফা ; ২. ৩ মার্চে পল্টনের জনসভায় পঠিত ইশতেহার ; ৩. ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও ৪. গণআন্দোলন পরিচালনার জন্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। এই পরিশিষ্টসমূহ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। জো. না.

অসম্ভবের পায়ে—রফিক আজাদ : কাব্যগ্রন্থ। বইটির মূল্য ৫.০০ মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। প্রকাশক খান মুহম্মদ ফারুক খান। খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ৬৭ প্যারীদাস রোড (বাংলাবাজার) ঢাকা-১, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭৩, প্রচ্ছদ রফিকুন নবী। 'অসম্ভবের পায়ে' কাব্যগ্রন্থ কবিতার সংখ্যা ৩৫। কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৬৪-৭২। গ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতা রূপকধর্মী। কবি তার নিজস্ব মনোভূমিকে রূপকের আড়ালে রাখতেই ভালোবাসেন বলে বোধ হয়। ফলে একেবারেই অন্য ধরনের আভিজাত্যে কবিতাগুলি ঋদ্ধ। কবির তীব্র মৃত্যুচিন্তা, বিষণ্নতা, স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা, বন্ধু বাৎসল্য ইত্যাদি সবই মোড়কে আবৃত্ত বলেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। অবশ্য কিছু কিছু কবিতা অনাবৃত হয়েও সচল ভঙ্গিতে স্পষ্ট। এবং নষ্টালজিয়া আক্রান্ত কবি বলে ওঠেন : 'অসুখে পড়ে একাকী এই হাসপাতালে/আপা তোকে খুব পড়ছে মনে/ বারোটি বছর তোদের বাড়ি যাতিনি আমি/ বছর বারো তোকে দেখিনি/বিশাল ভারি সংসারে তোর এখন নাকি/আট ছেলে মে' আমার মতো আদর কাড়ে/(আপা) মধ্যরাতের অন্ধকারের কবি মৃত্যুর সত্যতা অনুধাবন করে উচ্চারণ করেন : মূর্খের মতন শুধু অযথা বিদ্রোহ/ প্রতিটি মুহূর্তে তুমি অগ্রসরমান মহান মৃত্যুর দিকে/সময় গড়ায়, হায়, মুমূর্ষের পানে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে (সূর্যের মতন শুধু) বেশির ভাগ মৃত্যু ভাবনা সম্বলিত

www.pathagar.com

কবিতা দিয়েই কবি অসম্ভবের পায়ে শৃঙ্খল পরিয়েছেন। পা. র.

অসাধু সিদ্ধার্থ :–জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত। রূপকধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথম প্রকাশের তারিখ নেই, তবে অনুমান করা হয় এর প্রকাশ কাল ভাদ্র, ১৩৩৬ সন। প্রথম প্রকাশক রাখহরি শ্রীমানী এন্ড সন্স, কলকাতা। কাঠামো পরিকল্পনায় প্রভাতকুমারের 'রত্নদ্বীপে'র ছায়াপাত আছে। কথাসাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির ছাপ। এ ছাপ মূলত তাঁর জীবন বোধের গভীরতার ফল। জীবনের গূঢ় রহস্যকে তিনি তাঁর নিজস্ব শিল্পচেতনায় পর্যবেক্ষণ করেছেন। অসাধু–সিদ্ধার্থ, জগদীশগুপ্তের শিল্পী-মানসের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যেই বিচার্য। মৃত সিদ্ধার্থের সকল পরিচয় সম্বল করে তারই ছদ্মবেশে সুন্দরী অজয়ার হৃদয় হরণের চেষ্টা করেছে নটবর নামের এক প্রতারক ব্যক্তি। যখন সরল স্বভাবা অজয়ার সঙ্গে প্রতারক নটবরের বিয়ে ঘনিয়ে এসেছে ঠিক তখনি নিয়তির বিধানে সব ফাঁস হয়ে যায়। নটবরের জীবন-ইতিহাস কলঙ্কিত। সে ছিলো বৈষ্ণবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত জারজ সন্তান। মুদির দোকানের চাকর থেকে সখের থিয়েটারে যোগ দেয়, সেখানে অর্থের লোভে এক বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যাসঙ্গী হয়, কিন্তু এই দুশ্চরিত্র ব্যক্তিটি ভালবাসার ছদ্মবেশে অজয়াকে যথার্থই ভালোবেসেছিল, যা ছিল তার অবচেতন মনের এক পবিত্র স্বপ্ন। 'নটবর-সিদ্ধার্থে'র এই সংঘাতটুকুই হচ্ছে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। রূপকের স্পর্শ থাকলেও নটবরের জীবন সমস্যাকে বিশ্বজীবনের মূল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য নির্মাণে জগদীশ গুপ্তের কৃতিত্বের পরিচয় আছে। আ. জ. ভূ.

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক। জন্ম ১৯২০ সালের ৩ জুন, চব্বিশ পরগনা জেলার বকফুল গ্রামে। পিতা অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (বাংলা) ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও শরৎচন্দ্র অধ্যাপক ছিলেন। সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় পুরাতন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা তাঁর গবেষণার একটি উজ্জ্বল দিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাচীন বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড ১৯৫৯, ২য় খণ্ড ১৯৬২, ৩য় খণ্ড ১৯৬৬, ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৩, ৫ম খণ্ড ১৯৮৫), বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ, সমালোচনার কথা, দুই নারী ও তিন নায়িকা, উনিশ-বিশ। গবেষণা কর্মের সারস্বত স্বীকৃতি হিসেবে এশিয়াটিক সোসাইটির (কলকাতা) স্যার উইলিয়াম জোন্স স্বর্ণপদক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণ পদক লাভ করেন। নূ. ই

অসীম সাহা : কবি, প্রাবন্ধিক। তিনি ১৯৪৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নেত্রকোণায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি নিবাস মানিকগঞ্জ জেলার তেওতা গ্রামে। পিতার নাম অখিলবন্ধু সাহা। তিনি মাদারীপুর ইউনাইটেড ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, মাদারীপুর নাজিমুদ্দীন মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। অসীম সাহার পেশা সাংবাদিকতা। 'ঘরে বাইরে' নামক একটি পত্রিকার তিনি নির্বাহী সম্পাদক। তিনি মূলত কবি, তবে তাঁর দুটি প্রবন্ধ-গবেষণাগ্রন্থও রয়েছে। গ্রন্থ দুটি হচ্ছে প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা (১৯৭৬) ও ডিরোজিও (১৯৯০)। ৬টি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে কবি অসীম সাহার। এগুলো হচ্ছে : পূর্ব পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায় (১৯৮২), ভালোবাসার কবিতা (১৯৮৩), কালো পালকের নিচে (১৯৮৬), পুনরুদ্ধার (১৯৯২), উদ্বাস্তু (১৯৯৪) ও প্রেমের কবিতা (১৯৯৫)। ১৯৯৩ সালে কবি অসীম সাহা আলাওল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। অসীম

www.pathagar.com

সাহা ষাটের দশকের কবি হলেও তাঁর বিকাশ সত্তরের দশকের শুরুতে। তাঁর কবিতার মৌলিক প্রবণতাকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় দেশজ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, সামাজিক সংকট ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় প্রেম প্রধান উপজীব্য হলেও ব্যক্তির আত্মিক সংকট ও হাহাকার তাঁর কবিতাকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা দান করেছে। বর্তমানে ঐতিহ্য ও মীথকে অবলম্বন করে কবিতা রচনার প্রয়াস অসীম সাহার কবিতায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। র. হা.

অসীমান্তিক : গল্প সংকলন। প্রধান সম্পাদক : হাসান আজিজুল হক। সম্পা. : : সাধন চট্টোপাধ্যায়, হারুণ হাবীব ও দুলাল ঘোষ। প্রকাশক : অক্ষর পাবলিকেশন্স, আগরতলা, ত্রিপুরা। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯৮। প্রচ্ছদ : ইমামুল হক। মূল্য : শোভন ১৭৫ টাকা, সুলভ ১৬০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫১৬। এই বইয়ে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতের মোট একষট্টিটি গল্প আছে। বইয়ের শুরুতে বলা হয়েছে 'বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত—তিন ধারার এক উৎস।' এই গ্রন্থে তিন জায়গার ছোটগল্পের সাম্প্রতিককালের একটি পরিচিতি পাওয়া যায়। পাঠক জানতে পারেন কোথায় কি লেখা হচ্ছে। প্রধান সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন : 'মাত্র একশ বছরের মধ্যে বাংলা ছোট গল্প যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তা অকল্পনীয়। ছোট গল্প মাথা উঁচু করে, বিশাল পতাকা উড়িয়ে রাজপথে হেঁটেছে যেমন, তেমনই বাঁধা পথ থেকে নেমে এসে ঢুকেছে জনজীবনের নির্মম বাস্তবের সমস্ত কুঠুরিতে—সেইজন্য তৈরি করে নিয়েছে নতুন পথ, সরল, সিধে, আঁকাবাঁকা বা স্বপ্নিল সব পথ। আবছা গলি খুঁজি বা দীপ্তিমান তীর্যক সড়ক। ভাষার শৈলীতে নির্মাণ কৌশলে বাংলার ছোট গল্প তুলনারহিত কিংবা বলা যায় পৃথিবীর যে কোনো ভাষার সাফল্য উজ্জ্বল গল্পের সঙ্গে তুলনীয়।' এই গ্রন্থে প্রকাশিত গল্প থেকে উঠে আসে তিনটি অঞ্চলের জীবনের পরিপূর্ণ দিক, যা পাঠকের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন-উৎস। এই অর্থে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। সে. হো.

অসীমের স্পন্দ রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা : আনিসুর রহমান রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধের বই। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ১৯৯৫ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'বোধ' এবং 'সাধনা' শীর্ষক দুটি খণ্ডে বিভক্ত। 'বোধ' খণ্ডে চারটি অধ্যায় স্থান পেয়েছে। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণী-জীবন দর্শন, রবীন্দ্রদর্শনে সঙ্গীত ; কথা ও সুরের মিলন—রবীন্দ্র-সঙ্গীতচেতনার দ্বান্দ্বিক বিকাশ, বাঙালির আত্মপ্রকাশ এবং বাণী ও সুরের পরিণয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী'। এই অংশে অনির্বচনীয়ের হিল্লোল, গড়ানে করে গাওয়া, সুরের প্রবাহ ও রসের যমুনা সঙ্গম উপ-শিরোনামে গায়কীর ধরন উপস্থাপিত হয়েছে। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্ন' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে স্বরলিপির সীমাবদ্ধতা, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রকাশ ও মাপকাঠি, কয়েকটি উদাহরণ, কমলমুকুলদল কীভাবে খোলে. উপসংহার, পরিশিষ্ট : রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির প্রামাণিকতা এবং 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল ও তবলা' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে তালের মুক্তি, তবলা, রক্তের দোলা ও তবলার সাথি-ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। 'সাধনা' খণ্ডের চারটি অধ্যায় হলো—'গায়ন-কণ্ঠবিজ্ঞান', 'কণ্ঠ-সাধনা-১', 'কণ্ঠ-সাধনা-২' এবং 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রকাশের চ্যালেঞ্জ'। চারটি অধ্যায়ে যথাক্রমে—দম ছাড়বার নীতি, স্বরবর্ণ উচ্চারণ, রেজিস্টার তত্ত্ব, falsetto সুরের তত্ত্ব, ভয়েস প্লেসমেন্ট ; রসসাধনা, সুর বরণ, সুরের আবীর, সুর বিলীন করা, সুরের হিল্লোল, সুরের উচ্ছ্বাস ও প্লাবন, সুরের ঘূর্ণিনৃত্য ; গড়ানে করে গাওয়া, গলার রেঞ্জ বাড়ানো, কলি থেকে ফুল, ফুলের ঘুমিয়ে পড়া, সুরে-সুরে মিতালি, স্বরবর্ণ সাধনা, রং সাধনা, উপসংহার, মুক্তকণ্ঠ, সুরের সৌন্দর্যনৃত্য এবং

www.pathagar.com

প্রতিলিপিতত্ত্ব, রূপসৃষ্টি ইত্যাদি পরিচ্ছেদ রয়েছে। 'সারমর্ম অংশে পুরো বইয়ের সারাংশ ; 'পরিশিষ্ট' অংশে ক. বেল কান্তোর মূল আদর্শ ও তত্ত্ব, স্বরবর্ণের বিশুদ্ধতা ও মুক্তকণ্ঠ, গায়কের সুন্দরতম কাঠ, দুই রেজিস্টারের সমন্বয়, রেজিস্টার সমন্বয় ও ডাইনামিকস কন্ট্রোল, দীর্ঘকালীন সাধনা, খ. সঙ্গীতের তাও, গ. রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল ও তবলা প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা এবং 'গ্রন্থ নির্দেশিকা' অংশে নির্ঘন্ট—বিষয়সূচি, ব্যক্তিসূচি ও সঙ্গীতসূচির উল্লেখ গ্রন্থটির উজ্জ্বল যোজনা। মূলত এই বইতে অধ্যাপক আনিসুর রহমান রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৌন্দর্য বিশ্লেষণে তাঁর অবদান রেখেছেন এবং এই সৌন্দর্য গায়কীতে প্রকাশ করার জন্য যুগপৎ কণ্ঠ ও মানস প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আলোচনা করেছেন।'
শা. আ.

অসুখের পর :—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৫। উপন্যাসটির স্বল্প-পরিসর ক্যানভাসে চিত্রিত হয়েছে একটি জেলা শহরের ঘটনাপ্রবাহ, যার একদিকে দেখা যায় প্রায় দেড়শো বছরের ঐতিহ্যবাহী এক জমিদার পরিবারের ভাঙনের খণ্ড খণ্ড দৃশ্য, আর অন্যদিকে ফুটে উঠেছে রাজনীতির জটিল ও কূটিল চালচিত্র। বোমাবাজি আর খুনজখমের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই এ শহরের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, যা জনজীবনের অভ্যস্ততায় পরিণত। উপন্যাসের দুই মুখ্য চরিত্র-–বন্দনা ও অতীশ। এই দু'জনকে ঘিরেই অনেক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। উভয়ের স্মৃতিচারণ আর অন্তর্লীন ভাবনার ভিতর দিয়েই কাহিনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গড়িয়েছে। একটি বিত্তশালী সামন্ত পরিবার কিভাবে ভাঙনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, তার দৃষ্টান্ত বন্দনাদের পরিবার। বন্দনার স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে তার শৈশবের সুন্দর স্মৃতি। কিন্তু বাস্তবতা তাকে কঠোর বৈপরীত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। অন্যদিকে অতীশের মনোজাগতিক টানাপোড়েন-এর রূপ ভিন্নতর। যজমান বামুনের ছেলে সে। তার বাবা রাখাল ভট্টাচার্য পঁচিশ বছর ধরে পালপার্বণে পূজো করে আসছেন। একসময় তিনি বন্দনাদের বাড়িতে পুরোহিতের কাজ করতেন। পূজো উপলক্ষে বাবার সঙ্গে অতীশ বন্দনাদের বাড়িতে আসে। সেই ছোটবেলা থেকেই বন্দনার সঙ্গে তার পরিচয় এই সূত্রে। এ বাড়িটাকে তার মনে হতো রূপকথার জগৎ। চারপাশের দরিদ্র পটভূমিতে এ বাড়ি যেন উষর মরুভূমির মধ্যে এক মরুদ্যান। সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াত। বন্দনার পুতুল বিয়ের নেমন্তন্নের অতিথি হতো। বন্দনার দাদা প্রদীপের সঙ্গে ছায়ার মতো থেকেছে ছোটবেলা থেকে। অতীশ ও বন্দনার স্মৃতিচারণে জেগে ওঠে প্রদীপের কথা, যে পার্টি পলিটিক্সের শিকার হয়ে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রদীপের ধারণা ততটা স্পষ্ট ছিল না। একজন সৎ কর্মী হিসেবে সে আন্তরিকভাবেই তার দায়িত্ব পালন করত। কিন্তু রাজনীতির জটিল আবর্ত থেকে সে রেহাই পায় নি। গভীর রাতে দেওয়াল লিখন নিয়ে দু'পক্ষে সংঘর্ষ বাধলে অন্যরা সরে পড়ে। কিন্তু প্রদীপ পালাতে পারে নি। শেষ মুহূর্তেও অতীশ তার সঙ্গে ছিল। বন্দনা অতীশকে পছন্দ করে। কিন্তু অতীশ তার শ্রেণী অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। তাই আবেগকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। উপন্যাসের মূল কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে আরও কয়েকটি চরিত্র। কম্যুনিস্ট বাবু ও মাস্তান ল্যাংড়ার সংঘাত গোটা শহরের মানুষকে প্রভাবিত করে। বন্দনার পিসতুতো বোন বিধবা দীপ্তিদি কলকাতা থেকে এসে এক নতুন সঙ্কটের জন্ম দেয়। এতসব টানাপোড়েনের মধ্যেও আছে ভালবাসার অনেকগুলি প্রতিমা। অতীশের প্রতি বন্দনার গভীর অনুরাগ, মাস্তান ল্যাংড়ার জন্য এম.এ.বি.টি শিক্ষিকা অপরূপাদি-র ভালবাসা—এসবের মূল্যও কম নয়। তাই শেষ দৃশ্যে দেখা যায়—অতীশ আর বন্দনার হয়ে কখন কথা বলে ওঠে রাতের জ্যোৎস্না, কুয়াশা আর পুরনো বাড়ির প্রাচীন হাওয়া? কথা উঠে আসে মাটির গভীর থেকে, ঝরে পড়ে আকাশ থেকে? কখন, কীভাবে? সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয় এই আশ্চর্য উপন্যাস।
ড. শা. আ.

www.pathagar.com

অসুর : বৈদিক ও ইরানি আর্যরা যখন বিচ্ছিন্ন হবার আগে একই স্থানে বাস করত, তখন 'অসুর'ও ছিল দেবতা। দুই দলের মধ্যে সম্ভবত বিবাদ বাধলে ইরানিরা অসুর (আহরমাজদা) পূজক এবং ভারতীয়রা দেইবো-দেব-দেও পূজক হয়। এবং সেই থেকে একে অপরের পূজনীয়কে ঘৃণা করে। বেদেরও প্রাচীনতম অংশে তাই অসুর অর্থে দেবতাকে বোঝানো হয়েছে। ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণকে এইরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পরে এই অর্থ পরিবর্তিত হয়ে 'অসুর' সম্বন্ধে নতুন কাহিনী তৈরি হয়েছে। সুরবিরোধী দৈত্য, দানব যারা সমুদ্রমন্থনে উত্থিত সুধাবারি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বেদের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ ঋকবেদের শেষে এবং অথর্ববেদে এই অর্থ ব্যবহৃত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছে প্রাণবন্ত প্রজাপতির নিঃশ্বাস থেকে অসুরদের সৃষ্টি। শতপথ ব্রাহ্মণেও এরূপ বলা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মার জঙ্ঘা থেকে অসুরদের উৎপত্তি। এরা দেবতাদের চরম শত্রু এবং তাঁদের পূজা ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ধ্বংস করতো। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যেসব অসুর দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হয় তারা পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে অনেক অনাসৃষ্টির কারণ হয়। অসুরদের উৎপত্তি সম্পর্কে ভগবত পুরাণে বলা হয়েছে—ব্রহ্মা অম্ভো নামক বিখ্যাত চতুর্বিধ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হলে পূর্বসংস্কারবশত তমোগুণ তাঁকে আশ্রয় করে, সেই সময়ে তাঁর জঙ্ঘা থেকে অসুরগণ উৎপন্ন হয়। সুরা অর্থাৎ বরুনীকে তারা অগ্রাহ্য করায় তাদের নাম হয় অসুর আ. ই.

অসূয়া/ঈর্ষা : 'অসূয়া' শব্দটি সাধারণত ঈর্ষার সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে 'ঈর্ষা' সচরাচর ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে নরনারীর যৌনগত ব্যাপারের একটা সাধারণ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে কোনো ভালোবাসার পাত্রী অথবা পাত্রকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে ঈর্ষার সূচনা হতে পারে। কিন্তু 'অসূয়া' ঈর্ষার চেয়ে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো ব্যক্তির ধন, সম্পত্তি, যশ, বিদ্যা ইত্যাদির কারণে সেই ব্যক্তির মধ্যে যে সৌভাগ্য গড়ে ওঠে তা যখন অন্য কোনো ব্যক্তির মনে হিংসার ভাব আনে তখন তাকে 'অসূয়া' বলা যায়। এই জাতীয় মনোভাবের কারণে অনেকের মনে স্বভাবতই ক্রোধ বা বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে। ইংরেজিতে মানুষের মনের এই ভাবটিকে 'Malice' বলা হয় এবং এই malice ও 'অসূয়া' রূপে গণ্য হতে পারে। যেসব ব্যক্তি অসূয়ায় আক্রান্ত, তাদেরকে অসূয়ক বলা হয়। অনেকে ইংরেজি 'সিনিক'কে বাংলায় অসূয়ক রূপে মনে করেন। আ. জ. ভূ.

অসূর্যম্পশ্যা :—বুদ্ধদেব বসু। কাব্যমধুর উপন্যাস। রচনাকাল ও প্রকাশকাল ১৯৩৩ সাল। প্রকাশক সুখেন্দুবিকাশ মজুমদার। প্রথম যৌবনে লিখিত এই উপন্যাসের কিছু কিছু রোমান্টিক অংশ বুদ্ধদেব বসু পরবর্তীকালে বহুলাংশে পরিবর্তন করেছেন। ব্রীফহীন ব্যারিস্টার এবং তাঁর বিলেতী ও অতি আধুনিক পত্নী ভানুমতীর সংশয়াপন্ন ও মানসিক দ্বন্দ্বসংকুল জীবন এবং তাদের কন্যা সরমার মর্মন্তুদ পরিণতির বিষয় নিয়েই উপন্যাসের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে। দার্জিলিঙের কুয়াশাঘেরা নির্জনতায় সরমার প্রথম প্রেমের আবির্ভাবটি লেখক এক ভয়াবহ রহস্যের ভিতর দিয়ে উন্মোচিত করেছেন। সরমার অন্ধকার হৃদয়-মন্দিরে যেন এক দেবতার অতর্কিত আবির্ভাব ঘটেছে এবং তখন 'অন্তরের নতুন বাস্তব-চেতনা নিয়ে সরমা পান্নালালকে আরো বেশি ভালোবাসলো।' কিন্তু তার পরিণতি তীক্ষ্ণ তীরক্ষেপণে অন্তর্ভেদী, স্বভাবতই 'সরমা এক-এক রাত্রে আর ঘুমোতে পারে না।' এই চিরন্তন ভাববোধের কাহিনীটি বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্বভাবজ ভাষার ইন্দ্রজাল বিস্তার করে কথাশিল্পের স্বচ্ছদর্পণে প্রতিফলিত করেছেন। আ. জ. ভূ.

অস্কার ওয়াইল্ড : কথাশিল্পী, নাট্যকার, কবি ও সমালোচক। ১৮৫৪ সালে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসক পিতা স্বীয় খ্যাতির জন্য নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ; মা ছিলেন কবি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

পড়াশোনা করার সময় তাঁর ব্যক্তিত্ব সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওয়াল্টার পিটারের (Walter Peter) বিখ্যাত বই 'রেনেসাঁ' দ্বারা তিনি বিপুলভাবে প্রভাবিত হন। ১৮৭৮ সালে তিনি লন্ডনে আসেন এবং সর্বত্র নন্দনতত্ত্বের একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিত হন। ওয়াইল্ডের প্রথম নামকরা রূপকথা-ভিত্তিক গল্প-গ্রন্থ 'হ্যাপী প্রিন্স এন্ড আদার টেল্‌স' (Happy Prince and other tales)। কবিতা, নাটক, সমাচেলাচনা ও উপন্যাস—সর্বক্ষেত্রে তাঁকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিচরণ করতে দেখা যায়। এই লেখকের জীবনের পরিণাম ছিল অত্যন্ত করুণ। সমকামিতার অপরাধে দোষী প্রমাণিত হয়ে ওয়াইল্ডকে (Wilde)দু'বছর কারাবাস করতে হয়। ওয়াইল্ডের প্রধান রচনা 'দি পিক্‌চার অব দি ডোরিয়ান গ্রে' (The Picture of the Dorian Gray), ইন্টেন্‌শানস্ (Intentions), 'ক্রিটিক অ্যাজ আর্টিস্ট' (Critic as Artist), 'লেডী উইল্ডার মেয়ারস্ ক্যান', 'এ উমেন অব নো ইম্পোর্টেনস্' (A Woman of no Importance), 'এ্যান আইডিয়াল হাজব্যান্ড' (An ideal husband), 'দি ইম্পোর্টেনস অব বিইং আর্নেস্ট' (The importance of being earnest), 'দি ব্যালাড অব রীডিং গেওল' (The Ballad of Reading gaol) এবং আত্মজীবনী 'ডি প্রোফাউন্ডেস' (De Profundes)। কারাবাসের পর ওয়াইল্ড ফ্রান্সে চলে আসেন। মনোবেদনা ও কষ্টের মধ্যে শেষ হয় তাঁর জীবন। উঁচুদরের নাট্যকার হিসেবেই ওয়াইল্ড সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর রচনা বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়। ম. ই

অস্ট্রিক : নৃতাত্ত্বিকদের মতে বাঙলার তথা ভারতের আদিম অধিবাসী হচ্ছে অস্ট্রিকরা বা আদি-অস্ট্রিক (Proto-Australoid) অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে এদের অবয়বের ও রক্তের মিল রয়েছে। তাই এদেরও 'অস্ট্রিক' নামে অভিহিত করা হয়। বিদ্বানেরা মনে করেন আনুমানিক ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বছর আগে উত্তর ভারত থেকে এদের জ্ঞাতিরা প্রশান্তমহাসাগরের ঈস্টারদ্বীপ অবধি ছড়িয়ে পড়ে। বিশুদ্ধ অস্ট্রিকদের দেহ খর্ব, মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কাল এবং চুল কোঁকড়া বা ঢেউ খেলানো। বাঙলার আদিম অধিবাসীরাও অস্ট্রিক। কোলগোষ্ঠীর মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাঁও প্রভৃতি বাঙালির নিকট-জ্ঞাতি। আধুনিক বাঙালির রক্তে দ্রাবিড়, মঙ্গোল, নিগ্রো, আর্য প্রভৃতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। বাঙলা ভাষায় দেশী শব্দ নামে পরিচিত শব্দাবলী এবং বাঙলা ভাষার বাক্যে ও ব্যাকরণে রক্ষিত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য কড়ি, প্রাণ প্রভৃতি গণনারীতি এখনো অস্ট্রিক ভাষার প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। মুণ্ডারী ভাষার সঙ্গে এগুলোর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, জুয়াঙ, কোরবু প্রভৃতি ভাষা অস্ট্রিক। বাঙলার 'তফসিলী জাতি'সমূহ বিশেষভাবে অস্ট্রিক বর্গভুক্ত। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলোকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ দুটি শাখায় ভাগ করেছেন ; একটি এশিয়াটিক ও অন্যটি অস্ট্রোনেলিক। পাক-ভারত-বাংলাদেশে যে সব অস্ট্রিক ভাষা প্রচলিত আছে, সেগুলো অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার অন্তর্গত। এই শাখার ভাষাগুলো হচ্ছে মালয়, জাভা, বালিদ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যান্ড, সামোয়া-বাহিতি-হাওয়াই-ফিজি প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মাদাগাস্কারে প্রচলিত। অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার দুটি উপশাখা আছে, মুণ্ডা বা কোল ভাষা গোষ্ঠী ও মোনক্মের ভাষা- গোষ্ঠী। বিহারে ছোট নাগপুরে, উড়িষ্যা এবং মধ্য প্রদেশে মুন্ডা বা কোল গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত। এদের মধ্যে সাঁওতালী মুন্ডারী, ভূমিজ, হোকোরওয়া প্রভৃতি ভাষার সাদৃশ্য খুবই বেশি। মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার মধ্যে খড়িয়া, জুয়াং, শবর ও কুরকুর নাম করা যায়। হিমালয় অঞ্চলে ভোটধর্মী ভাষাগোষ্ঠীর কতগুলো ভাষা ও উপভাষা আছে। এদের উপর মুণ্ডা বা কোল ভাষার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে : (১) অবরুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণ, (২) তিনটি বচন, (৩) উত্তম পুরুষের বিদ্বান। শি. প্র. লা.

www.pathagar.com

অস্টেন, জেন : কথাসাহিত্যিক। ১৭৭৫ সালে ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটনে জন্মগ্রহণ করেন। জেনের শিক্ষা নিজ পরিবারে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি তৎকালীন মহিলাদের মধ্যে বিদ্যাবত্তায় অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হত। কিশোর বয়স থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস 'লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ' (Love and Friendship)-এর মধ্যেই তাঁর সম্ভাবনা দেদীপ্যমান হয়ে উঠে। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'প্রাইড এণ্ড প্রিজুডীস' (Pride and Prejudice), 'সেন্স এণ্ড সেনসিবিলিটি' (Sense and sensibility), 'নর্দাঙ্গার এ্যাবী' (Northanger Abbey), 'এম্মা' (Emma), 'ম্যানস্‌ফীল্ড পার্ক' (Mansfield Park) ও 'পারসুয়েশন' (Persuasion) প্রধান। তাঁর রচনা বাস্তবধর্মী ও নারীসুলভ ভাবাবেগরহিত। তাঁর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি সত্য থেকে মিথ্যাকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে। সমন্বিত বিন্যাস, সুস্থ মনোভাব ও রসবোধ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। সীমিত তাঁর জগৎ রৌদ্রকরোজ্জ্বল, সুদৃঢ় নৈতিকতা তাঁর চরিত্রগুলোকে পরিচালিত করে। সমালোচকগণ 'পারসুয়েশন' কে টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' (War and Peace)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। জেন অস্টেন একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। ম. ই.

অস্তিত্ববাদ : আধুনিক দার্শনিক তত্ত্ব বা চেতনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই এ তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। অস্তিত্ববাদের মূল কথা হচ্ছে মানব জাতির চিন্তা, ভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে অস্তিত্ববাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জার্মান দার্শনিক Jasper ও Heideggar এবং রুশ দার্শনিক Shestov ও Berdyaev আর ফরাসি লেখক-দার্শনিক জাঁপল সার্ত অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে নিজেদের ধ্যানধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন। Franz Kafka, Dostoyevsty প্রমুখ সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের সত্তা স্বাধীন। স্বতন্ত্রভাবে মানুষ যা নির্মাণ করে, মানুষের সেই কর্মকাণ্ড তথা জীবনচর্যা যেন নিয়ন্ত্রিত না হয়, অস্তিত্ববাদী সাহিত্যে এই চেতনার প্রকাশই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব কোনো না কোনো দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত হবেই। কেননা মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা ও সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমাজের দেওয়া যান্ত্রিক পীড়ন থেকে মানুষকে রক্ষা করার ইচ্ছাই ব্যক্ত হয় অস্তিত্ববাদী সাহিত্যে। মানুষ নিজেও এই নির্যাতিত অবস্থার অবসান ঘটাতে চায় অর্থাৎ বাঁচবার প্রেরণায় পীড়িত অবস্থা থেকে সে চায় পালাতে। মানুষের অস্তিত্বরক্ষার এই পলায়ন-প্রবৃত্তিকেই দার্শনিকগণ অস্তিত্ববাদ বা Existentialism নামে অভিহিত করেছেন। অস্তিত্ববাদী সাহিত্যে তাই জীবনের প্রতি মানুষের যে আকুতি এবং জীবনবিন্যাসের প্রতি যে আনুগত্য তাকেই বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। আ. ই.

অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই : শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। প্রকাশক : বিউটি বুক হাউস, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : কুড়ি টাকা। উৎসর্গ : শ্রদ্ধেয় কবি ও ছন্দশাস্ত্রী আবুদল কাদিরের স্মৃতির উদ্দেশে। ৩২টি কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসনের রুদ্ধশ্বাস দিনগুলোর পটভূমিতে গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো লিখিত। এমতপরিস্থিতিতে আহত ব্যক্তিসত্তার ক্রন্দন, হাহাকার, এবং অক্ষমতার আর্তনাদ কবিতাগুলোতে ধ্বনিত। বেশিরভাগ কবিতাই গদ্যে লেখা। অকস্মাৎ কবির স্ব-স্বভাবী সনেটেরও উপস্থিত আছে, উপস্থিত প্রেমিক সত্তাও। তবে এ প্রেমিক যে একজন পরিণত মানুষ এবং ভালোবাসার বিভিন্নমাত্রিক অনুভূতি যে অভূতপূর্ব নয় তার ইঙ্গিতও এখানে রয়েছে। পিতা ও পুত্র উভয়ের সঙ্গেই তুলিত কবির ব্যক্তিসত্তা রূপ পেয়েছে কখনো কখনো। মুক্তিযুদ্ধের উৎকণ্ঠ স্মৃতিও উপস্থিত আছে 'অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই'-এর কবিতার। আ. মা.

www.pathagar.com

অহল্যা : রামায়ণোক্ত চরিত্র বিশেষ। ব্রহ্মার মানসী কন্যা, গৌতম ঋষির স্ত্রী এবং রাজা জনকের পুরোহিত শতানন্দ ঋষির জননী। 'হল' শব্দের অন্যতম অর্থ 'কদর্যতা'। যাবতীয় হল্য বা বিরূপতাশূন্যা অদ্বিতীয়া সুন্দরী বলে সত্যযুগে ব্রহ্মা তাঁকে 'অহল্যা' নাম দেন। ইন্দ্র এই অপূর্ব সুন্দরীকে কামনা করেছিলেন। গৌতমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ায় তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। ইন্দ্র একদিন গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর রূপ ধারণ করে অহল্যার আশ্রমে উপস্থিত হন এবং তাঁর মঙ্গল কামনা করেন। অহল্যা তখন কামার্ত ছিলেন বলে তিনি দেবরাজকে চিনতে পেরেও তাঁকে দেহদান করেন। ইত্যবসরে গৌতম সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং ইন্দ্রকে এই মর্মে অভিশাপ দেন যে তিনি (ইন্দ্র) নপুংসক হবেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের অণ্ড খসে পড়ে। ইন্দ্রের প্রার্থনাক্রমে পিতৃদেবগণ মেষাণ্ড উৎপাটিত করে তাঁর দেহে সংযুক্ত করে দেন। অতঃপর ইন্দ্রের অভিশাপে অহল্যা হাজার বছর অদৃশ্য অবস্থায় বায়ুভুক হয়ে অনাহারে জীবনযাপন করেন। বহুদিন পর অযোধ্যার রামচন্দ্র ঐ অরণ্যে এসে গৌতম ও অহল্যার আতিথ্য গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র দর্শনে অহল্যার শাপমুক্তি ঘটে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, অহল্যা গৌতমের শাপে পাষাণে পরিণত হন এবং রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে উদ্ধার লাভ করেন। বেদের ভাষ্যকার কুমারিলভট্টের মতে উল্লিখিত উপাখ্যান একটি রূপক মাত্র। ইন্দ্র সূর্যের এবং অহল্যা রাত্রির রূপক। সূর্যোদয়ে রাত্রি অদৃশ্য হয়। মতান্তরে অহল্যা ঊষার রূপক। দিনে ইন্দ্ররূপী সূর্যের উদয়ে ঊষা অসূর্যস্পশ্যা হয়। মু. আ. জা.

অহল্যা বাঈ : দক্ষিণ ভারতের ইন্দোর রাজ্যের ধর্মপরায়ণা ও দানশীলা রাণী। ইন্দোরের হোলকার বংশের রাজা মলহর রাও হোলকারের পুত্রবধূ। ১৭৫৪ সালে অহল্যা বাঈয়ের স্বামী খণ্ডেরাওয়ের মৃত্যু হলে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। ১৭৬৬ সালে মলহর রাওয়ের মৃত্যু হলে অহল্যার একমাত্র পুত্র মালে রাও ইন্দোরের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অযোগ্য মালে রাও এক বছরের মধ্যে উন্মত্ত অবস্থায় মারা গেলে অহল্যাবাঈ নিজেই ইন্দোরের শাসনভার গ্রহণ করেন। এতে রাজ্যের উচ্চপদস্থ কোন কোন কর্মচারী সন্তুষ্ট হননি। অহল্যাবাঈ এ অবস্থা বুঝতে পেরে তুকোজি হোলকার নামে একজন যোগ্য সৈনিককে প্রধান সেনানায়কের পদে নিয়োগ এবং তাঁকেই ইন্দোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সুনিপুণ শাসন প্রাণালী ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ফলে অহল্যা বাঈ ইন্দোরের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার জন মাল্‌কল্‌ম অহল্যা বাঈয়ের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তাঁর সরল জীবনযাত্রা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎকৃষ্ট শাসন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। অহল্যার দয়া ও দাক্ষিণ্যের কথা সর্বজনবিদিত। তবে রাজ্য শাসনের জন্য প্রয়োজন হলে তিনি কঠোরও হতে পারতেন। শান্তিরক্ষার জন্য একবার তিনি বহু ভীল সর্দারকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। মালব দেশে অসংখ্য মন্দির, ধর্মশালা ও রাজপথ তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল। নর্মদা তীরে তাঁর প্রিয়স্থান মহেশ্বরে তিনি মন্দির, প্রাসাদ ও প্রশস্ত সোপানাবলী নির্মাণ করেন। তাঁর রাজ্যের বাইরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতেও তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। বারানসী ও গয়ায় তাঁর দানশীলতার বহু নিদর্শন বিদ্যমান। ১৭৯৫ সালে প্রায় ৭০ বছর বয়সে অহল্যা বাঈয়ের মৃত্যু হয়। আ. খা.

অহি : মানুষের উদ্দেশ্যে নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণীর আরবি নাম 'অহি'। এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাদেশ। ইসলাম ধর্মে মহানবী মুহম্মদ (দঃ)–এর উপর অবতীর্ণ অহি সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, 'এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ তথা আমার নির্দেশ ; তুমি তো জানিতেনা কিতাব কি এবং ইমান কি ! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা

www.pathagar.com

পথনির্দেশ করি ; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ—(৪২:৫২)।' অহি দু'প্রকার হয়। যেমন, অহিয়ে মাতলু যা জিবরাইল (আঃ) মাধ্যমে শব্দসহ নাজিল হয়েছে এবং অহিয়ে গায়র মাতলু যা শব্দ যোগ ব্যতীত অন্যবিধভাবে সরাসরি নবী, রসুল বা সৎ ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় বিদ্যুৎ চমকের মত অন্তরে প্রদীপ্ত হয়। গায়র মাতলু অহি অনেক হাদিসে কুদসিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বলে জানা যায়। কুরআনে উল্লেখ আছে, "আল-কুরআন জগত সমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ। জিবরাইল ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছে তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার—২৬:১৯২-১৯৪।" আল্লাহ্‌র নিকট হতে নবী করিম (দঃ)-এর নিকট তিন ভাবে বাণী আসতো : স্বপ্নযোগে, জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে, এবং সরাসরি হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়ে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রূহুল কুদ্‌স্‌ জিবরাইল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে, যাহারা মুমিন তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়েত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য (১৬:১০২)'। আ. সৈ. গো.দ.

অহিংসা :—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। প্রকাশকাল শ্রাবণ, ১৩৪৮ সন। প্রকাশক ডি-এম, লাইব্রেরী। তার আগে 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতির সঙ্গে যে এর কোনো সংশ্রম নেই অথবা যে কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে উপন্যাসের বিষয় যে সম্পর্করহিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিতর্কের প্রতিবাদে একথা বলেছেন। সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে অথবা হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস। উপন্যাসটি মূলত এক আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনী। অর্থলোভী বিপিন সদানন্দ প্রভুকে লোভের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু মহীগড়ের রাজার দানে এ বিরাট আশ্রম। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চলে না। এমন কি বাগবাদা গাঁয়ের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মহেশ চৌধুরীরও আশ্রমে ঢুকা নিষেধ। তিনি কিন্তু নাছোড়বান্দা। সদানন্দের দর্শনহেতু ঝড়জলের রাতেও আশ্রমে পড়ে থাকেন। মহেশের রাগ নেই, অভিমানও নেই। এমন কি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতেও তিনি রাজী নন। তার প্রতি ক্ষুব্ধ বিপিন কিন্তু আশ্রম পরিচালনার ভার একদিন তার হাতেই দিয়ে দেয়। এখানেই অহিংসার জয়। এতে লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত প্রয়াস নেই। মাধবী আশ্রমের এক হতভাগিনী বাসিন্দা। আশ্রমের ভণ্ডামী, ধর্মান্ধতা এবং উৎকট যৌনলালসার চিত্র উদঘাটন ও লেখকের অবচেতন মনে দানা বেঁধেছে। তবে এই আখ্যানে তাঁর লক্ষ্য বস্তুর স্থির গতিপথ নেই, দুর্বোধ্যতার অন্তরালে তা অনেকটা ঢাকা। আ. জ. ভূ.

অহীন্দ্র চৌধুরী : নাট্যাভিনেতা, লেখক। ১৮৯৫ সালের ৬ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম চন্দ্রভূষণ চৌধুরী। বাল্যকালে লন্ডনে যান এবং লন্ডন মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা করেন। শৈশবেই থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে। একটি অপেশাদার দলের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ 'সাজাহান' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে শিল্পী জীবন শুরু করেন। ১৯১৮ সালে ভবানীপুর বান্ধব সমাজে যোগ দেন এবং 'অভিমন্যুবধ' নাটকে অভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরী আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২৩ সালে। এসময় তিনি আরুট থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' নাটকে অভিনয় করেন। সেই থেকে ত্রিশ বৎসর একটানা অভিনয় জীবনে তিনি স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন—অশোক, মিশরকুমারী, সাজাহান, চাঁদ সদাগর, চন্দ্রগুপ্ত, বিজয়া, সিরাজদৌল্লা, প্রফুল্ল, তটিনীর বিচার, চিরকুমার সভা প্রভৃতি নাটকে। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রে তিনি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ১৯৩০

www.pathagar.com

সালে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে ম্যাডানের নির্বাচিত কয়েকটি নাটকে তিনি অংশ নেন। ১৯৫৭ সালে 'সাজাহান' নাটকে নাম-ভূমিকায় জীবনের শেষ অভিনয় করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 'সঙ্গীত আকাদেমি'র আচার্য হিসেবে এবং পরে ডীন পদে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশ অধ্যাপক হিসেবেও তিনি বক্তৃতা দেন। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৭২ সালে নাট্যশত বার্ষিকী উপলক্ষে স্টার থিয়েটার প্রদত্ত পদক লাভ করেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর ভক্তবৃন্দ কর্তৃক তিনি 'নটসূর্য' রূপে নন্দিত হন। অহীন্দ্র চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি তাঁর বিশাল আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'। তাঁর এই গ্রন্থটি নাট্যশিক্ষার্থী ও গবেষকদের অনেক মূল্যবান তথ্যের নির্দেশ দেয়। আ. জ. ভু.

অহীরা গান : গরু-মহিষকে নিয়ে গাওয়া এক প্রকার গানের নাম অহীরা। বাংলাদেশের কোনো লৌকিক উৎসব বা পর্ব উপলক্ষে এই গান গাইতে দেখা যায়। অহীরা গানের বিষয়বস্তু গরু ও মহিষের গুণকীর্তন। গরু বা মহিষকে ফুল, মালা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তাকে ঘিরে সবাই নাচ-গান করে। মাঝে মাঝে পশুগুলোকে খোঁচা দেওয়া হয়। আমাদের চাষাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত এই পরব। লৌকিক এই অনুষ্ঠানটি বাঁধন পরব নামেও পরিচিত। ড. শা. আ.

অহুর-মাজ্‌দা : আর্য দেবদেবীর নাম বিশেষ, বিশেষত ইরানীয় দেবদেবী। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কতকগুলি নৈসর্গিক দেবদেবী মানার রীতি প্রচলিত ছিল। ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় তাঁদেরকে বলা হত 'দইব' daeva (আবেস্তা)। তা থেকেই সংস্কৃতে 'দেব' শব্দটি এসেছে। ইরানে এসব দেবদেবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রধান হিসেবে 'অহুর' প্রতিষ্ঠিত হন। জরথুস্ত্র যখন ইরানে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তখন তাঁর প্রচারের ফলে 'অহুর' কিংবা 'অহুর-মাজ্‌দা' একমাত্র সৃষ্টিকর্তারূপে পরিগণিত হন। 'অহুর-মাজ্‌দা'-র অর্থ জ্ঞানময় পরমেশ্বর (আধুনিক ফারসীতে 'হোরমাজ্‌দ্' Hormard)। তিনি ছিলেন পুণ্যের দেবতাদের নেতা। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আর কোন দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। তবে তাঁর বিপরীত শক্তি হিসেবে 'অংগ্র-মৈন্যু' Angra mainyu (আধুনিক ফারসিতে 'অহরিমন' Ahriman) অসত্যের ও অন্ধকারের প্রতীক পাপী দেবতাদের একজন নেতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। এ দুটি শক্তির সংঘর্ষই হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালক শক্তি এবং এর পরিণামে পুণ্যের জয় হয়। কালক্রমে 'দেব' গণ ('দএব' daeva)অপদেবতা বা ঈশ্বরবিদ্বেষী দানবরূপে অবনমিত হন। আধুনিক ফারসিতে রাক্ষস অর্থে 'দত্ত' বা 'দীব' শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। ম. চৌ.

অ্যানাল্‌স অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিজ অব রাজস্থান/Annals and Antiquities of Rajasthan : কর্নেল জেম্‌স টড (১৭৮২-১৮৩৮) প্রণীত রাজপুতনার ইতিবৃত্ত (১৮২৯-১৮৩২)। গ্রন্থখানি দু'খণ্ডে সমাপ্ত। কেবল ইতিহাসই নয়, ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোল এবং প্রত্নতত্ত্বও এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করেছে। এতে রাজপুত জাতির ইতিহাস তথা রাজপুতনার শাসনব্যবস্থা এবং মেবার, বিকানীর জয়সলমীর, অম্বর ইত্যাদি রাজ্যের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কাহিনী বিস্তারিত-ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের কাহিনী, তাদের উৎসব অনুষ্ঠানাদির বিবরণ এবং রাজপুত রমনীদের সর্বজনবিদিত বীরত্ব ও সতীত্বের ইতিহাসকে লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। প্রতি খণ্ডের শেষে লেখকের ব্যক্তিগত ভ্রমণবৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। এ গ্রন্থ রচনায় টড ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন ; তবে যেসব ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের

www.pathagar.com

অভাব অনুভূত হয়েছে সেখানে তিনি পুরাণ, রাজবংশের উপাখ্যান, চারণদের বীরগাথা, মন্দিরের পুরোহিতগণের বিবরণ এবং লোকগাথা ও লোককথাকে অনুসরণ করেছেন। ভারতের ইতিহাসের উপর লেখা জেম্‌স টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থখানি ইংরেজি ক্লাসিকের মর্যাদায় অভিষিক্ত। সু.মু.

অ্যান্ড্রুজ, চার্লস ফিয়র : লেখক। ১৮৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের নিউক্যাসেলে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যাম্ব্রিজে লেখাপড়া করার পর 'ক্যাম্ব্রিজ ব্রাদার হুডের' সদস্য হিসাবে ১৯০৪ সালে ভারতের দিল্লীতে আসেন। তাঁর জীবনের বাকী দিনগুলি উপমহাদেশেই কাটে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক রূপে বহু বছর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তিনি 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' ও অন্যান্য সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ছিলেন। ভারতের ধর্ম ও সামাজিক সমস্যা, ভারতে খ্রীস্টধর্ম ও তৎসম্পর্কিত তাঁর বহু লেখা ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'মহাত্মা গান্ধীর আইডিয়াস', 'মহাত্মা গান্ধী হিজ ওউন স্টোরি' (Mahatma Gandi—His own story) মহাত্মা গান্ধী এ্যাট ওয়ার্ক' তাঁর প্রধান রচনা। তাঁর ভারতপ্রীতি পূর্বসূরী ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তুলনীয়। অ্যান্ড্রুজ ১৯৪০ সালের ৫ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। ম.ই

অ্যাবারক্রমবি : কবি ও সমালোচক। ১৮৮১ সালের ৯ জানুয়ারি ইংল্যাণ্ডের অ্যাশটন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যানচেষ্টারের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত তিনি 'দি লিভারপুল ডেইলী কুরিয়ার' পত্রিকায় বেতনভুক্ত সংবাদ দাতা হিসেবে কাজ করেন। এই সময়ই তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যতম প্রধান কবিরূপে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অ্যাবারক্রমবি লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি ব্রিটিশ একাডেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত হন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে অ্যাবারক্রমবির প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি সমধিক। তাঁর লেখার সারবত্তা ও গাম্ভীর্য, পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই 'ইন্টারলিউড এন্ড পোয়েমস্' (Interlude and Poems) ছাড়া তাঁর সমালোচনামূলক পুস্তকগুলির মধ্যে 'টমাস হার্ডি' (Thomas Hardy), 'এ্যা ক্রিটিক্যাল স্টাডী' (A Critical study), 'দি থিউরি অব পোয়েট্রী' (The theory of Poetry) ও 'পোয়েট্রী : ইট্স মিউজিক এন্ড মীনিং' (Poetry : Its music and meaning) প্রধান। ১৯৩৮ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি লন্ডনে পরলোকগমন করেন। তাঁর রচনা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। ম. ই

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন--ভাবানুবাদ মোহাম্মদ নাসির আলী : এই জীবনী বইটির মূল নাম 'দ্য লাইফ অব আইনস্টাইন' এবং লেখক এম. ব্ল্যাকার ফ্রিম্যান। এই বইটির অবলম্বনে মোহাম্মদ নাসির আলী এই জীবনী গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কিশোরদের উপযোগী করে বইটি রচিত। আইনস্টানের ছেলেবেলার কাহিনী বিশদভাবে বলা হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানির উল্‌ম্ শহরে, ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ। ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেন মিউনিক শহরে। গণিতে ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, কিন্তু ক্লাসের বাঁধাধরা লেখাপড়ায় আইনস্টাইন তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব 'আপেক্ষিকতাবাদ'। জার্মানিতে ইহুদিদের উপর অত্যাচার শুরু হবার পর, ১৯৩৩ সালে গোপনে জার্মানি ছেড়ে চলে যান। তারপর বিভিন্ন দেশ ঘুরে আমেরিকায় আসেন। ১৯৫৫ সালে ৭৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এই

www.pathagar.com

বইটির প্রকাশক মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা–১১০০। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ১১১, মূল্য ৮.০০ টাকা। বি.ব.

অ্যালেন গীন্সবার্গ : কবি। ১৯২৬ সালের ৩ জুন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গ–রাজ্যের নেওয়ার্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইস গীন্সবার্গও কবি ছিলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ দশকে গড়ে উঠেছিলো 'বীট জেনারেশন' নামে একটি গোষ্ঠী। তিনি ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কবি। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর এপিক কাব্য 'Howl'। এই গ্রন্থে তিনি আমেরিকার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার মতামত ব্যক্ত করেন। মূলত বীট জেনারেশনের কবিরা এমন একটি মূল্যবোধ তৈরিতে আগ্রহী ছিলেন যেটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর রচিত হবে। এ কারণে তাঁরা নিজেদের অগোছালো, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সাহিত্যকে তার বিপরীতে সৃষ্টি করেন। তারা সমাজের এবং রাষ্ট্র–নীতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের শিল্পকে করেছিলেন হাতিয়ার। গীন্সবার্গ পশ্চিমা বেণীয়াসভ্যতার বিরুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নীতির বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সমালোচনামুখর ছিলেন। তাঁর জীবনযাপনের নিয়ন্ত্রণহীনতা ছিলো একদিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশ্বাস এবং অন্যদিকে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের সৃষ্ট অন্যায়ের প্রতিবাদ। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'Empty Mirror' এবং ১৯৬৮ সালে 'Angkor wat' গ্রন্থ। 'Angkor wat 'কম্বোডিয়ার প্রথম রাজধানী ছিলো। এখানে তৈরি প্রাচীন মন্দিরগুলো হিন্দু পুরাণের মোটিফ দিয়ে নির্মিত। এইসব প্রাচীন কীর্তি নিয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থ প্রমাণ করে যে তিনি ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তাঁর উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন ১৯৭১ সালের সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে। এ সময়ে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা করেছিলেন এবং অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে নিজের ভূমিকাকে গৌরবময় করে তুলেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শরণার্থী শিবিরগুলোতে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের দুর্দশার কথা শোনেন। এই সময়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি রচনা করেন একটি স্মরণীয় কবিতা : 'September on Jessore Road'। তিনি বেশ কয়েকটি পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে রয়েছে : 'ন্যাশনাল বুক আওয়ার' (১৯৭৩) ; 'দি রবার্ট ফ্রস্ট মেডেল' (১৯৮৬) ; এ্যান আমেরিকান বুক আওয়ার ফর কন্ট্রিবিউশন টু লিটারেরি এক্সেলেন্স (১৯৯০)। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে : প্লানেট নিউজ (১৯৬৮) ; মাইন্ড ব্রেকস : পোয়েম্‌স ১৯৭২–৭৭ (১৯৭৮) ; কালেক্টেড পোয়েম্‌স (১৯৮৭)। তাঁর গদ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : অ্যালেন ভারবাটিং (১৯৭৪) ; জার্নালস্ (১৯৭৭)। তিনি ১৯৯৭ সালের ৫ এপ্রিল নিউইয়ক গ্রিনউইচ শহরে মৃত্যুবরণ করেন। সে. হো.

আইখান : বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের উৎসবের নাম আইখান। এ দিনটিতে সবাই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির চরাপাশের আবর্জনা পরিষ্কার করে। তারপর কিছু মাঙ্গলিক আচার পালন করে। যেমন : বাঁশের ঝাড়ে মাটি দেওয়া, গরুকে স্নান করিয়ে শিঙে তেল মাখানো, ধান ক্ষেতে গোবর সার দিয়ে হলকর্ষণ প্রভৃতি। নাপিতের দেওয়া কাঁসার চকচকে আয়নায় সবাই মুখ দেখে। একটি দু'সেরী মাটির ভাঁড় ছিদ্র করে তা দিয়ে অশ্বত্থ, চট, বেল, তুলসী, মনসা প্রভৃতি দেব–দেবীকল্পিত বৃক্ষের গায়ে পানি ঢালা হয়। ভাঁড়ের ছিদ্রে একটি দূর্বাঘাস গোঁজা থাকে। ধীরে ধীরে পানি পড়ে। আইখানের দিন থেকে ঘরে ঘরে নববর্ষ উৎসবের সূচনা হয়। চিড়ে, মুড়ি, মিঠা, পায়েস দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করে। আনন্দ–উৎসবের মধ্য দিয়ে সবাই পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। ড.শা. আ.

www.pathagar.com

আইন-ই-আকবরী : মুঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ, সচিব ও প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। এটিকে সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের আকবর গ্রন্থও বলা চলে। এতে আবুল ফজল আকবরের শাসন-কালীন ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমনি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থারও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দান করেছেন। পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আবুল ফজল রাজপ্রাসাদ ও রাজসভা, রাজকোষ ও টাঁকশাল, নানা মণিরত্ন ও মুদ্রার বর্ণনা ছাড়াও হস্তলিপি, চিত্রকলা, সুগন্ধি দ্রব্য ও নানাবিধ খাদ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাসনকার্যে নিয়োজিত নানা শ্রেণীর কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর বিবরণ ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন উৎসব, মৃগয়া ও আমোদ-প্রমোদের বর্ণনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুঘল-সাম্রাজ্যের ভূমি জরিপ ও রাজস্ব ব্যবস্থার কথা, বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ এবং আকবর-প্রবর্তিত ইলাহী সনের কথা বিবৃত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে একদিকে হিন্দু-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতার বিবরণ যেমন রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে বহু মুসলিম পীর-দরবেশ ফকিরের জীবনী। পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে আকবরের বর্ণাঢ্য জীবনী। আবুল ফজল প্রতিটি বিষয়েই তথ্যনির্ভর ও সুশৃঙ্খল বিবরণ দান করেছেন। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে গ্রন্থকার রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সম্পর্কেও মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। গ্রন্থটিতে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান স্বরূপ রাজ্যের বিভিন্ন অংশের লোকের বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া ও বিবাহ অনুষ্ঠানের বিবরণও স্থান পেয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক অবস্থার কথাও এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। সাধুসন্ত, পীর-দরবেশ, কবি, চিত্রকর, গায়ক ও রাষ্ট্রীয় নানা কাজে নিয়োজিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনসম্পর্কিত তথ্য এ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। সর্বোপরি 'আকবরের কথাসংগ্রহ' অংশ থেকে আকবরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। মোটকথা আইন-ই-আকবরী আকবরের সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অতি প্রামাণ্য আকরিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ ফারসিতে রচিত। এ গ্রন্থের সঠীক অনুবাদ রয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষায়। সু.মু.

আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান রচিত প্রবন্ধের বই। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে আইনের শাসনের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিষয়ক এগারোটি প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে। 'আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মহিলা বিচারক' এটি গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে লেখক যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশে বহু শতাব্দী ব্যাপী গড়িমসির পর মহিলা বিচারক নিয়োগের যে আইনী স্বীকৃতি দেয়া হয় সেই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভাবলে ব্যাপারটি কিছুটা অবাক হওয়ার মতো বটে। অতীতে পাশ্চাত্য দেশে নারী রানী-সম্রাজ্ঞী হয়েছেন, কিন্তু লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনের কারণে যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ১৮৭৩ সালে শিকাগোর এক আইনজীবীর সহধর্মীনিকে বার কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ বিচারপতি একমত হয়ে যে রায় দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, স্বভাব নম্রতা ও প্রকৃতিগতভাবে নারীর কর্মকাণ্ড হবে গৃহ অভ্যন্তরে। স্বামী ছাড়া একজন নারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, নারীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো হওয়া উচিত বধূর ভূমিকায় মাতার বৃত্তি পালন করা। বিংশ শতাব্দী শেষ পাদে এই বাধা অপসারিত হয়েছে। লেখকের মতে কোনো ধর্মের কারণে নয় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে মানবাধিকার আন্দোলনের ফলে। এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'আইনের সমাবেশ ক্ষমতা'। উক্ত প্রবন্ধে লেখক ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত লেখক মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে এখনো আইনের

www.pathagar.com

শাসন আছে এটি শেষ হয়ে গেলে দিন দুপুরে অন্ধকার নেমে আসবে। এর পাশাপাশি লেখক এই মন্তব্যও করেছেন যে, এটা এমন দেশ যেখানে যানবাহন আটক করে রাস্তার ওপর জনসভা করা হয়, এবং সম্বর্ধনা পেতে তারামন বিবির মতো বীর প্রতীককে বিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে, পারমাণবিক প্রশ্ন এখন আন্তর্জাতিক আদালতে, আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার, জুরির বিচার, বিচারকর্মে নাগরিক শরিকানার অবসান, মানবাধিকার ও সহিষ্ণুতা, নেপালের গণতন্ত্র দিবস, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, পাবলিক, অধিকার ও সংবিধান। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে মওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : সত্তর টাকা। মা.আ.

আইভান হো--স্যার ওয়াল্টার স্কট : উপন্যাস। স্যার ওয়াল্টার স্কটের ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম হিসেবে পরিচিত। ইংরেজরা তখন পরাধীন। উপন্যাসের নায়ক বীর আইভান হো। উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র রাজা রিচার্ড। সে সময় ইংল্যান্ডে দাসপ্রথা ছিলো তাও জানা যায়। স্যার ওয়াল্টার স্কট রোম্যান্টিক যুগের অন্যতম সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। স্কট তাঁর জীবদ্দশাতেই বর্ণনামূলক কবিতা ও ঐতিহাসিক কাহিনীনির্ভর রচনাকর্মের জন্য নজিরবিহীন জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। লেখক হিসেবে তাঁর বড় কৃতিত্ব ছিলো নিখুঁত বর্ণনা সহযোগে কোনো ঐতিহাসিক সময় বা কালপর্বকে পুনশ্চ সৃষ্টি করা। 'আইভান হো' তেমন একটি উপন্যাস। স্কট ১৭৭১ সালের ১৫ আগস্ট স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম উপন্যাস 'ওয়েভার্লি' যদিও ছদ্মনামে প্রকাশিত, তবু তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো : 'গাই ম্যানারিং' (১৮১৫), ওল্ড মর্টালিটি' (১৮১৬), 'রব রয়' (১৮১৭), আইভান হো (১৮২০), 'কুয়েন্টিন্ ডারওয়ার্ড' (১৮২১), 'দ্য টালিসম্যান' (১৮২৫) এবং 'অ্যাল্ অব গেইয়ার্সটেইন' (১৮২৯)। অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত কারণে ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে স্যার ওয়াল্টার স্কট ১৮৩২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিরায়ত কিশোর গ্রন্থমালা সিরিজের বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত এই বইটি সংক্ষেপণ করেন বিপ্লব দাশ। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৭৮, মূল্য ২৫.০০ টাকা। বি.ব.

আউল : একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে আউল বলা হয়। প্রকৃতিসাধন বিষয়ে এই সম্প্রদায় যথেষ্ট উদার মনোভাব পোষণ করেন। প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে এরা বারাঙ্গনা অথবা গৃহাঙ্গনা সবাইকে এদের সাধন সম্পাদনে নিয়োজিত করে। পরামার্থ সাধনে তাদের তাই বাঁধাধরা কোনো নিয়ম নেই, সর্বত্রই এরা সহজ সাধারণ উদার মতবাদকে অনুসরণ করে। এমনও শোনা যায় আপন প্রকৃতি বা সাধন সঙ্গিনীকে এদের কেউ অন্যের সংসর্গে অনুরক্ত দেখলে ঈর্ষান্বিত বা অসন্তোষ প্রকাশ করে না। বাউল অথবা নেড়াদের মতো এরা দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন থাকে না, সব সময় ক্ষৌরী থাকে। আজকাল এ সম্প্রদায়ের লোকের সাক্ষাৎ বড় একটা পাওয়া যায় না। মু.আ.জ.

আউলচাঁদ : ১৬৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আউলচাঁদ সম্পর্কে এমন উক্তি আছে যে নদীয়া জেলার উলাগ্রামবাসী মহাদেব দাস একদা এক পানের বরজ থেকে শিশু আউল চাঁদকে উদ্ধার করেন। তখন তাঁর নাম হয় পূর্ণচন্দ্র। এক সময় মহাদেবের গৃহ ছেড়ে পূর্ণচন্দ্র হরিহর নামক জনৈক বিষ্ণুভক্তের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব বলরাম দাসের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আউলচাঁদ নাম পরিগ্রহ করেন। পারসি আউলিয়া থেকে সম্ভবত আউল চাঁদের উৎপত্তি। আউল চাঁদ বাংলাদেশের কর্তভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। একদা তীর্থভ্রমণে বের হয়ে তিনি ভারতের নানা জায়গা ঘুরে বজরা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। মানুষের সংগে তাঁর ব্যবহার ছিলো মধুর। এমন বলা হয়, সাধনাবলে তিনি অনেক লোককে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে

www.pathagar.com

মুক্ত করেন। আউল চাঁদ বাইশ জন শিষ্য কর্তৃক সর্বক্ষণ পরিব্যাপ্ত থাকতেন। আউল চাঁদ সকলকে সদুপদেশ দিতেন। যেমন—পরপীড়ন, পরস্ত্রীগমন পরদ্রব্যহরণ এবং মিথ্যা ভাষণ ও কটূক্তি নিষিদ্ধ। তাঁর ধর্মে ভগবান চৈতন্যস্বরূপ। পরধর্মে সহিষ্ণু হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতিভেদ দোষণীয় এবং আমিষান্ন নিষিদ্ধ। তাঁর প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের গুরু মহাশয়, শিষ্য বরাতি। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বলা হয়, ১৭৬৯ সালের বৈশাখ মাসে বোয়ালিয়া গ্রামে আউল চাঁদ জ্বররোগে হরিনাম জপতে জপতে প্রাণত্যাগ করেন। মু.আ.জ.

আওধী : ভারতের অযোধ্যা অঞ্চলের ভাষার নাম। শব্দটি অবধী, আওয়াধী ও আওধী এই তিন বানানে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে আওধী লিখিতভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। আধুনিক হিন্দিভাষা এই আওধীভিত্তিক। ম.মু.

আওনি বাওনি/আউনি বাউনি/আওরি বাওরি : বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত লৌকিক অনুষ্ঠান। এই উৎসব উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন কয়েক গোছা ধানগাছ তেল সিঁদুর মাখিয়ে পূজা করে ঘরে তোলা হয়। পূজার ঐ ধানের শীষ ঘরের চাল, বাস্তুখুঁটি, লক্ষ্মীর থান, ধানের গোলা, বাক্স-সিন্দুক ইত্যাদিতে বেঁধে রাখা হয়। লোকবিশ্বাস মতে এই অনুষ্ঠান বা ব্রত পালনে শস্যদেবতা বা কৃষিলক্ষ্মীর ঘরে আগমন ঘটে ; অর্থাৎ কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে গৃহে ধরে রাখাই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠান পালন উপলক্ষে গীত একটি ছড়া—'আওনি বাওনি/দূর দেশে যাওনি/তিন দিন ঘরে বসে/পিঠা পায়েস খাও॥' বাংলার লোকসমাজে এই উৎসব পৌষ পার্বনের কৃষি-জাদু-বিশ্বাসমূলক অনুষ্ঠান রূপে পরিচিত। ড.শা.আ.

আওরঙ্গজেব : ভারতবর্ষের মুঘল সম্রাট। ১৬১৮ সালে দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সম্রাট শাহজাহান, মাতা মমতাজ মহল। সমরবিদ্যাসহ ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৬৩৬ ও ১৬৫৩ সালে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৫৭ সালে সম্রাট শহজাহান অসুখে পড়লে তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আওরঙ্গজেব ভাইদের পরাজিত ও হত্যা করেন। বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করে তিনি ১৬৫৮ সালের ২১ জুলাই আলমগীর নাম গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। শাসন কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের সুন্নি আইন গ্রহণ করেন। মদ্যপান, মহরমের মিছিল, সভাকবির পদ, নওরোজ উৎসব, দরবারের সঙ্গীতানুষ্ঠান, সম্রাটের কপালে চন্দনের রাজটীকা দেওয়ার প্রথা, বার্ষিক জন্মোৎসব ও রাজ্যাভিষেক উৎসব, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র ইসলাম বিরোধী বলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন। আওরঙ্গজেবের সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে মারাঠা , জাঠ, শিখ, রাজপুতরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সম্রাট তাদের বিদ্রোহ দমন করে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের আরো বিস্তৃতি ঘটান। আওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। কোরানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। সাহসীযোদ্ধা, দক্ষ শাসনকর্তা, ন্যায়বিচারক ও প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। প্রজাদের কল্যাণের জন্য আশি প্রকারের কর ও শুল্ক প্রত্যাহার করেন। তাঁর পত্রাবলী ইতিহাস সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বহু বিশিষ্ট বাঙালি নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক তাঁদের লেখায় আওরঙ্গজেব-চরিত্রের অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব, পাশাপাশি দুর্বলতাকে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলমগীর' (১৯২১) নাটকটির নাম উল্লেখ করা যায়। ১৭০৭ সালের ৩ মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন। নূ. ই.

আংলা হৃদয় জাদুকর—বিপ্লব দাশ : উত্তম পুরুষে লেখা শিশুতোষ উপন্যাস। 'আমি'র সঙ্গে পড়ত হৃদয়। সেই হৃদয়কে স্কুলে সবাই

www.pathagar.com

ডাকত বুড়ো আংলা, অবনর্ষ ঠাকুরের বুড়ো আংলা। সেই আংলা লণ্ডনে গিয়ে, দুনিয়া ঘুরে হয়ে গেল জাদুকর। তারই অদ্ভুত কাহিনী আংলা হৃদয় জাদুকর। আরো প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। পৃষ্ঠা ৭২, মূল্য ৫০.০০ টাকা। বি.ব.

আকবর : ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট। ১৫৪২ সালের ২৩ নভেম্বর অমরকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সম্রাট হুমায়ুন, মাতা হামিদা বানু, পিতা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় আকবরের বাল্যকাল নানা দুঃখে-কষ্টে অতিবাহিত হয়। ফলে তিনি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান নি। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর সমরবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁ। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরাম খাঁ ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবে বালক আকবরকে দিল্লির সম্রাট বলে ঘোষণা দেন। এদিকে মুঘল শিবিরের বিশৃঙ্খলার সুযোগে সুলতান আদিল শাহ শূরের সেনাপতি হিমু দিল্লি দখল করে নেন। ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর দিল্লির অদূরে পানিপথ প্রান্তরে দ্বিতীয় বারের মত মুঘল ও পাঠান সৈন্যদের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। হিমুকে পরাজিত ও নিহত করে আকবর দিল্লি ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। বৈরাম খাঁ আকবরের অভিভাবক হয়ে সাম্রাজ্যের শাসন কাজ পরিচালনা করেন। ১৮ বছর বয়সে আকবর বৈরাম খাঁর কাছ থেকে শাসনক্ষমতার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ভারত উপমহাদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উত্তম শাসন ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কয়েকজন প্রধান রাজকর্মচারী তাঁকে শাসন কাজে সহায়তা করতেন। আকবর তাঁর সাম্রাজ্য ১৮টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সুবার জন্য একজন সুবাদার নিযুক্ত করেন। সকল মানুষের ঐক্য ও স্বাধীনতা ও এক জাতি গঠন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে তিনি সমন্বয়ধর্মী নীতি গ্রহণ করেন। তাতে তিনি সফলও হন। তাঁর প্রজাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল খুব বেশি এবং হিন্দুদের ভেতর রাজপুতরা ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়ী ও দৃঢ় করার অভিপ্রায়ে ভালবাসা ও উদার শাসন নীতির দ্বারা তাদের মন জয় করার কৌশল গ্রহণ করেন। রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও হিন্দুদের জিজিয়া কর রহিত করেন। রাজপুত ও হিন্দুদের উচ্চপদে চাকরি দেন। ১৫৬২ সালে অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমল্ল মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিজ কন্যা যোদাবাঈকে আকবরের সঙ্গে বিবাহ দেন। বিহারীমল্ল, তাঁর পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র মানসিংহ আকবরের সেনাবাহিনীতে উচ্চ কর্মচারীর পদ লাভ করেন। তাঁরা মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। চাষীর উপর অত্যাচার না করে যাতে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় সেজন্য ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করেন। জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও ফসলের প্রকার ভেদে রাজস্ব নির্ধারিত হতো। ফসল আশানুরূপ পরিমাণে না হলে রাজস্ব মাফ বা হ্রাস করা হতো। আকবরের যুগ ছিল সাহিত্য ও শিল্পের স্বর্ণযুগ। তাঁর রাজসভায় বহু শিল্পী-সাহিত্যিক ছিলেন। আকবর নিজে লিখতে বা পড়তে পারতেন না ; কিন্তু তাঁর ছিল আশ্চর্য জ্ঞানপিপাসা ও স্মৃতিশক্তি। তিনি অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন এবং বহু সঙ্গীত শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ধর্মবিষয়ে আকবর খুব উদার ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের সার গ্রহণ করে দীন-ই-ইলাহী নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের মধ্যে আকবর একজন। তিনি ছিলেন সাহসী ও তেজস্বী যোদ্ধা, সুদক্ষ সমর নায়ক, নির্ভীক, বুদ্ধিমান ও যোগ্য শাসক। সর্ব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ছিল তাঁর চরিত্রের এক মহৎ গুণ। সিদ্ধান্তে তিনি ছিলেন অটল। মিত্রদের প্রতি ছিলেন উদার, অমায়িক, স্নেহপরায়ণ ও দয়াবান আর শত্রুর প্রতি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। শাসন প্রণালী, ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নতির জন্য আকবরের শাসনকাল ইতিহাসে অমর হয়ে

www.pathagar.com

রয়েছে। তিনিই বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ চালু করেন। অনেক বাঙালি কবি-সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় এ মহান সম্রাটের মহত্ত্ব তুলে ধরেছেন। ১৬০৫ সালের ১৭ অক্টোবর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নূ. ই

আকবরউদ্দীন : নাট্যকার। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ জয়নাল আবেদিন ছিলেন ঠিকাদার ব্যবসায়ী। সিলেট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯১১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ থেকে ১৯১৩ সালে বৃত্তিলাভসহ আই.এ. এবং কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর এম.এ. ও এল.এল.বি. ক্লাসে পড়েন। কিছুকাল কৃষ্ণনগর সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষকতা এবং হাওড়ার স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি করেন। ১৯১৮ সালে কৃষ্ণনগর জজ আদালতের অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে এই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কলকাতায় সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। ১৯৪৫-১৯৪৭ সালে দৈনিক আজাদের সহকারী সম্পাদক ও ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে দৈনিক পশ্চিমবঙ্গের ম্যানেজিং এডিটর ছিলেন। ১৯২৪-১৯২৮ ও ১৯৩৩-১৯৪২ সালে কৃষ্ণনগর পৌরসভার নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্তি লাভ করেন। পরে উপ-রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। ১৯৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। নাটক তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রধান ক্ষেত্র। সময় ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই নাট্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। সমকালীন অধঃপতিত বাঙালি মুসলমান সমাজকে নবজাগরণের পথে ধাবিত করার অভিপ্রায়ে মুসলিম ইতিহাসের বিজয়ী পুরুষদের শৌর্য ও বীরত্বের নাট্যরূপ দিয়েছেন। মোহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে 'সিন্ধু বিজয়' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) নাটক রচনা করেন। মুসলমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জীবনচরিত রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ—নাটক : সিন্ধু বিজয় (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), নাদির শাহ (১৯৩২), আজান (১৯৪৩), সুলতান মাহমুদ (১৯৫৪), মুজাহিদ (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) ; জীবনী : শহীদ লিয়াকত (১৯৬৪), কায়েদে আযম (১৯৬৯) ; উপন্যাস : মাটির মানুষ (১৯৩০) ; গল্পগ্রন্থ : অসমাপ্ত কাহিনী ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৭)। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬৩ সালে 'তমঘায়ে ইমতিয়াজ' খেতাব প্রদান করে। ১৯৬৪ সালে নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। একই বছর 'শহীদ লিয়াকত' গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার পান। ১৯৭৮ সালের ৬ অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। নূ.ই

আকসে পিঠে/আসকে পিঠে : এক প্রকার পিঠা। বিভিন্ন পরব বা সংক্রান্তির সময় এ পিঠা তৈরি হয়। চালের গুঁড়ো, নারকেল কোরা ও অল্প লবণ মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি মাটির সরা বা পেতলের সরায় তেল মেখে তাতে ঢেলে দিয়ে ঢাকা দিতে হয়। এরপর তা উনুনে বসিয়ে উপর থেকে অল্প অল্প পানির ছিটা দেওয়া হয়। ড. শা. আ.

আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর : ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতার বই। প্রকাশকাল : ১ আশ্বিন ১৩৭৬। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১। মুদ্রণে : তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ৪২/এ কাজী আবদুর রউফ রোড, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। উৎসর্গ : আম্মা ও আব্বাকে। কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশ কবিতাই ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে লেখা। ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি, প্রকৃতিস্নিগ্ধ বাংলাদেশ, শোষিতের অনুবেদনা ইত্যাদির প্ররোচনা এই বইয়ের কবিতায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেই সঙ্গে বেঙ্গলেয়রীর অমঙ্গলবোধের তাড়না ও শরীরী কামচেতনার অনুষঙ্গেও কিছু কিছু কবিতা

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এলায়িত গদ্যে লেখা কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে সংহতিপ্রবণ সনেট। ষাটের দশকের বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাল জীবন-স্পন্দনের স্পর্শও কি কোনো কোনো কবিতায় পাওয়া যায়। আ. মা.

আকাশ অনেক বড় : আবদুল্লাহ আল-মুতী রচিত শিশু-কিশোর উপযোগী বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থের মূল বিষয় আকাশ। আসলে আকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় বিষয়ের সামগ্রিক পরিচিতি নিয়ে এই গ্রন্থ। আকাশ, চাঁদ, সূর্য, মাস—বছর গণনা, মহাকাশ অভিযান, চাঁদের বুকে মানুষ, রকেটযান, ভিন গ্রহের অতিথি, উড়ন্ত চাকির রহস্য, আকাশ যুদ্ধ, তারকাযুদ্ধ, ছায়াপথ, তারাদের পাশে অন্য গ্রহ—কিছুই বাদ পড়েনি আলোচনা থেকে। গ্রন্থের বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে চৌদ্দটি শিরোনামে। শিরোনামগুলোও দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন—চোখ খোল : সামনেই আকাশ, বাঁধ ভাঙা চাঁদের হাসি, সূয্যি মামা অতি আপন, চাঁদ-সূর্য থেকে মাস-বছর, ঘরে ঘরে অঢেল তেজ, চাঁদের বুকে মানুষ, আকাশে কাটে দিন, চালু হলো আকাশফেরি, চাঁদে কবে পাতবো ঘর, প্রাণের দেখা যদি মেলে, ভিন গ্রহের অতিথি, আকাশ থেকে লড়াই, তারার রাজ্যে বিশ্বযুদ্ধ, তারাদের পাশে গ্রহজগৎ। আবদুল্লাহ আল-মুতীর প্রাঞ্জল ভাষা ও আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গির কারণে বিজ্ঞানের এই অসীম রহস্যময় বিষয়গুলো হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। বইটির প্রকাশনামানও চমৎকার। প্রাসঙ্গিক অনেক সাদাকালো ছবির পাশাপাশি কয়েকটি বহুরঙ ছবির ব্যবহার বইটির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের দায়িত্ব পালন করেছেন সৈয়দ ইকবাল। প্রকাশক অনুপম প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। ডবল ক্রাউন $\frac{১}{৮}$ সাইজে ৭২ পৃষ্ঠার এই বইটির মূল্য ৯০.০০ টাকা। সু.ব.

আকাশপ্রদীপ : বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি লোকাচার। বছরের বিশেষ একটি সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেবতাদের বা মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে আকাশে প্রদীপ জ্বালানোর রীতি আকাশপ্রদীপ বা আকাশবাতি নামে অভিহিত। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে কার্তিকের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় বাঁশ বা কাঠের লম্বা খুঁটির মাথায় এই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। লোকবিশ্বাস অনুসারে এই আকশপ্রদীপ সকল প্রকার অমঙ্গল ও অতিপ্রাকৃত দুষ্ট শক্তির রোষ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। ড. শা. আ.

আকাশ-ভরা সূর্য-তারা : তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী এ এম হারুন অর রশীদ রচিত এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের একটি পংক্তির অংশ এ বইটির নামকরণে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও বইটি মূলত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে রচিত। বইটির বিষয়বস্তু মহাশূন্যে পৃথিবী, দৃশ্যমান মহাকাশ, সৌরজগৎ, বিশ্বের আধেয়, জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের উষালগ্ন, এবং তারকার বিবর্তন—এই ছ'টি অংশে বিভক্ত। এই ছ'টি অংশে লেখক আকাশের তারা সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে মানুষের ধারণা, পৃথিবী ও সৌরজগৎ, তারকার জন্মকাহিনী, তারকার মৃত্যু, রক্তিম দানব, শ্বেত-বামন, নিউট্রন তারা বা কৃষ্ণবিবর ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন সাধারণ মানুষজনের পক্ষে বোধগম্য সহজ ভাষায়। বইটিতে সাম্প্রতিক কালের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান চর্চার নানা বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে ; তবে তা উপস্থাপিত হয়েছে সাহিত্যরসে অভিষিক্ত হয়ে। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আধুনিক মানুষের বহু জিজ্ঞাসার উত্তর যেমন এতে মিলবে, তেমনি পাওয়া যাবে নক্ষত্রমণ্ডলী ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা-অজানা অনেক তথ্য। লেখক রচনার প্রসাদগুণে বিজ্ঞানের নিরেট বিষয়ও কৌতূহলী পাঠকের জন্য এতে হয়ে উঠেছে স্বাদু ও উপভোগ্য। *সু. ব.

আকাশে অনেক ঘুড়ি : সুচরিত চৌধুরী। ছোটগল্পের সংকলন। জলসীমা প্রকাশনী,

www.pathagar.com

বাটালি হিল, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৬৮ অক্টোবর ১৯৬১। মূল্য : তিন টাকা। এ গ্রন্থে সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো হলো : আকাশে অনেক ঘুড়ি, স্বাতীর চিঠি, কিছুক্ষণ, হাসি, চুড়ি, সুরতারা ও টুল-বেঞ্চের দিনগুলি। স্বপ্ন বাস্তবতার মিশেলে এইসব গল্প শিল্প হয়েছে। কঠিন রূঢ় বাস্তবতা এইসব গল্পে নেই, নেই অলৌকিক রোমান্টিকতাও। দুয়ের মিশ্রণে তৈরি আলোছায়ার জগত এইসব গল্পের প্রাণ। কখনো মানুষের স্বপ্নের ওপর আঘাত এসেছে, কখনো স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে। তারপরও দুয়ের সঙ্গে সেতুবন্ধনে জীবনের হাহাকার এবং আশ্বাসের মাঝে জেগে থাকে লেখকের মানবিক আশার মিথ। সে. হো.

আকাশের রং : রাশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশের নোদার দুম্বাদজে রচিত উপন্যাস। নোদারের জন্ম ১৯২২ সালে, মৃত্যু ১৯৮৪ সালে। উপন্যাসের নায়িকা খাতিয়ার মাথায় মোগলী বেণীর মুকুট ও মুখশ্রী সুশ্রী। কিন্তু তার নীল চোখদুটি আকাশ দেখতে পায় না। সেগুলো দেখতে পায় কেবল সূর্য। আরও খাতিয়া সব সময়ই দেখতে পায় সোসোয়াকে—আর তা সোসোয়ার মতে, প্রায় সূর্য দেখতে পাওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ...। নোদার দুম্বাদজের আকাশের রং উপন্যাসে আছে তারুণ্যের কথা, ভালবাসা আর বন্ধুত্বের কথা। সুদূর জর্জিয়ার গ্রাম থেকে আসা এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অনেক কিছুই বলার আছে পাঠককে। তারা জানে তাদের ওপর এসে পড়া দুঃখের দিনের তিক্ততার স্বাদ। আবার জানে জয়ের আনন্দও। সূর্য দেখতে পাওয়ার সুখ তাদের কাছে স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারারই সামিল। উপন্যাসের শেষে খাতিয়া সত্যিই সূর্য দেখতে পেয়েছিলো। নোদার প্রথম জীবনে কবিতা, তারপর গল্প-সংকলন ও শেষে উপন্যাস 'আমি, ঠাকুমা, ইনিকো ও ইল্লরিওন' প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত উপন্যাসটি তরুণ লেখকের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আকাশের রং লেখকের দ্বিতীয় বড় উপন্যাস। অল্প সময়ের মধ্যেই মস্কো ও তবিলিসির কয়েকটি প্রকাশনকেন্দ্র থেকে বইটি বিরাট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বইটি অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায়, তার মধ্যে ইংরেজি, ফরাসি, আরবি, ফার্সি ইত্যাদি। এই উপন্যাস ভিত্তি করে তোলা ফিল্ম দর্শকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। লেখকের সর্বশেষ উপন্যাস 'শাশ্বত আইন'-এর জন্য লেখক তাঁর দেশে সর্বোচ্চ লেনিন পুরস্কারে ভূষিত হন। বইটির বাংলা অনুবাদক পূর্ণিমা মিত্র। প্রকাশক : রাদুগা প্রকাশন, তাশখন্দ। প্রকাশকাল : ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৬৮। মূল্য লেখা নেই। বি.ব.

আক্রান্ত : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস। প্রকাশ করেছেন দেশ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৮৫, মূল্য : ১৫.০০ টাকা। এই উপন্যাসের নায়ক 'ডিফেন্সের খেলোয়াড়' রবি। সে উপন্যাস জুড়ে নিজের সঙ্গে রসিকতা করেছে। এই রসিকতার অন্তরালে আছে প্রচণ্ড ব্যঙ্গ। এ ব্যঙ্গ ব্যক্তি জীবন এবং সমাজকে নিয়ে—যেখানে নিজের স্বার্থের প্রশ্নে নৈতিকতা দ্রুত উপেক্ষিত হয় এবং সমাজ কল্যাণের নামে চলে প্রচণ্ড ভণ্ডামি। উপন্যাসের একটি চরিত্র লাটু বাবু। সে 'মর‍্যালিস্ট মানুষ' কিন্তু এই মানুষের কাছে ঘুষ খাওয়া কোনো অপরাধ নয়। অন্য একটি চরিত্র রুদ্রাক্ষ, এর পেটে হুইস্কি না থাকলে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব জেগে উঠে না। অন্য একটি চরিত্র নীলা, যে 'বেনাভোলেন্ট ম্যারিজ' করে। সে ভেঙে পড়া হতাশাগ্রস্ত মানুষদের বিয়ে করে তাদের চাঙ্গা করে তোলে। তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করলে সে তাদের ডিভোর্স করে দেয়। এইসব মানুষই উঁচু তলার দক্ষ মানুষ। এদের পাশাপাশি সরল ভালো মানুষ রবি একদমই অপদার্থ। হালকা ঢঙে লেখা এই উপন্যাস, কিন্তু অর্থবহ। অনেক মতামত অসত্য এবং স্বার্থ প্রোণোদিত জেনেও রবি এমন

www.pathagar.com

নির্বিকার ভাবে গ্রহণ করে যে মনে হয় এর চাইতে সত্য বুঝি আর হয় না। এটি এ উপন্যাসের কৌশল। জীবনের সমগ্রতা এখানে নেই, কোনো মহৎ প্রকাশ নেই, আছে খণ্ড চিত্র, যে চিত্র একটি সমাজকে এবং সময়কে বুঝতে সহায়তা করে। সে. হো.

আক্রান্ত গজল : আবু হেনা মোস্তফা কামালের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। ঢাকার অনিন্দ্য প্রকাশন থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। ৪১টি কবিতা নিয়ে সঙ্কলিত এ-গ্রন্থে আবু হেনা মোস্তফা কামালের রোমান্টিক কবিচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। এগ্রন্থে কবির পরিণত শিল্পচেতনার পরিচয় সুপরিস্ফুট। প্রথম কাব্যগ্রন্থ আপন যৌবন বৈরীর মতো এখানেও আছে কবিচেতনার নিঃসঙ্গতার সংক্রাম, তবে তা এখন দর্শন-পরিস্রুত ও অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ। বোঝা যায়, রোমান্টিক উচ্ছ্বাস পেরিয়ে কবি উপনীত হয়েছেন নিরাসক্ত শিল্পের ভুবনে। এ কাব্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সহজাত বিদ্রূপপ্রিয়তা। কোনো কোনো কবিতায় দেহ-কামনার আর্তি, কোথাওবা পরমার্থচেতনা প্রকাশিত। বি.ঘো.

আক্ষেপ : কাব্যালঙ্কার। যে কথাটি বলা হয়ে গেছে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বক্তা যখন তার উপর নিষেধাভাস আরোপিত করেন, তখন তাকে আক্ষেপ অলঙ্কার বলা হয়। বক্তার আরোপিত এই নিষেধাভাস প্রকৃত নিষেধ নয়, নিষেধের আভাস মানে কবি কর্তৃক সুকৌশলে বিন্যস্ত নিষেধের মায়াজাল যার দ্বারা বক্তার নেতিবাচক বিবৃতির অন্তরালে তার ইতিবাচক বক্তব্য আরো জোরালো হয়। আক্ষেপ অলঙ্কার দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়। (ক) যা বলা হয়ে গেছে তার উপর নিষেধাভাস সূচিত হলে 'উক্ত বিষয়ক আক্ষেপ অলঙ্কার' হয়, যেমন--'নিজ গৃহ পথ, তাত, দেখাও তস্করে?/চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?/কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি/পিতৃ-তুল্য।' (মধুসূদন)। ইন্দ্রজিৎ প্রথমে বিভীষণকে গঞ্জনা দিচ্ছে এই বলে যে সে তস্করকে পথ দেখিয়েছে, চণ্ডালকে রাজার আলয়ে এনে বসিয়েছে, কিন্তু পরে 'নাহি গঞ্জি তোমা' এই বলে গঞ্জনা বাক্যের উপর নিষেধাভাস আরোপ করে প্রকৃতপক্ষে গঞ্জনার তীব্রতা আরো বাড়িয়ে তোলে। (খ) যা বলা হয়নি অথচ বলার ইচ্ছা জাগে, তার উপর নিষেধাভাস আরোপিত হলে তাকে 'বক্ষ্যমাণ বিষয়ক আক্ষেপ' বলে। যেমন—'ক্ষুব্ধ এ হিয়া শান্ত করিয়া/ একটি বেদনা জানাইতে শুধু চাই, ওগো ফিরে চাও ক্ষণেক দাঁড়াও/ না, না চ'লে যাও, পাষাণের কাছে জানাবার কিছু নাই।' (শ্যামাপদ চক্রবর্তী)। শেষ বাক্যে নায়িকার দুর্বার অভিমানের প্রকাশ ঘটেছে, কেননা তার মনে হয়েছে নায়ক হয়তো তার হৃদয়ের বেদনাকে সহজে বুঝতে পারবে না। তাই তাকে অপেক্ষা করতে বলেও নায়িকা নিজের অন্তরের ব্যথা তার কাছে প্রকাশ করতে পারলো না। আ.ই.

আখড়াই : এক প্রকার গান। সতেরো শতকের শেষ ভাগে নবদ্বীপ অঞ্চলে এই গান প্রবর্তিত হয়। মহড়া বা আখড়া থেকে আখড়াই নামটি এসেছে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এই গানে দীর্ঘ আখড়ার আবশ্যক হয়। গেউড় ও প্রভাতী এই দুই অংশে গোড়ার দিকে আখড়াই গান রচিত হয়। পরে খেউড়ের পূর্বে ভবানী বিষয়ক বা দেবীবিষয়ক অংশ যোজিত হয়। অশ্লীলতায় দুষ্ট হয়ে পুরাতনী আখড়াই গান খুবই ম্লান হয়ে পড়লে কলকাতার কলুই চন্দ্র সেন এই গানের বিশেষ সংস্কার করেন। ফলে আখড়াই গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তবে এই গানের পরিণত রূপটি দান করেন নিধু বাবু। তাঁর হাতে আখড়াই গানের কাব্যাংশ ও সঙ্গীতাংশ উভয়ই আমূল সম্মানিত হয়। নিধু বাবুর পর কোনো উল্লেখযোগ্য গীতিকার আখড়াই গানের প্রতি মনোনিবেশ না করায় তা পুনরায় ম্লান হয়ে পড়ে। শ্রীদাম দাস, রামঠাকুর, নসিরাম স্যাকরা, গোকুল চন্দ্র সেন প্রমুখ গীতিকার আখড়াই গান রচনা করেন। ক.গো.

আখড়াইয়ের দীঘি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোট গল্প। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা

www.pathagar.com

'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পুস্তকাকারে 'ছলনাময়ী' (বৈশাখ ১৩৪৩ ব.) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। নায়ক কালী বাগদীর দুর্ধর্ষ কাহিনী ও তার করুণ পরিণতি গল্পের উপজীব্য। হিংস্রতা এবং নিষ্ঠুরতায় এককালে বাগদী জাতির তুলনা ছিলো না। গভর্ণমেন্টের ন্যায়-নীতিকে এড়িয়ে নিজেদের জাত-হিংস্রতাকে তারা অক্ষুণ্ন রেখেছিলো। কালী বাগদী বংশানুক্রমে ঠ্যাংগুাড়ে ডাকাত। রাতের অন্ধকারে দুর্গম পথের পাশে শিকারের আশায় ওৎ পেতে থাকে। একদিকে তাড়ির নেশা, অন্যদিকে নিষ্ঠুর লোলুপতা, কালী পথিকের সাড়া পেলেই লাফিয়ে ওঠে। অব্যর্থ লক্ষ্যে তার হাতের লাঠি পথচারীর মস্তকে আঘাত হানে। নিমেষে পথিক লুটিয়ে পড়ে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই ছিলো কালী বাগদীর চার পুরুষের জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। অবশেষে একদিন কালীর নিজের উপরই নিয়তি তার নিষ্ঠুর রথচক্র চালিয়ে যায়। সেদিন ঝড়ের রাতে ভুল করে সে নিজের সন্তান তারাচরণকেই অপরিচিত পথিক ভেবে হত্যা করে। দণ্ডভোগ করে কালী। অনেক দিন পরে সে এসেছে দীঘির পারে যেখানে সে নিজের হাতে ছেলের লাশ পুতে রেখেছিলো। অন্ধকারে কালী পাগলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলের নাম ধরে ডাকতে থাকে। অকস্মাৎ দীঘির গভীর খাদে সে পড়ে যায়। অসংখ্য মানুষকে যেভাবে সে হত্যা করেছে সেভাবেই ঘাড় ভেঙে হলো তার মৃত্যু। জীবনের বীভৎস দিকটিকে তারাশঙ্কর এক ভয়ঙ্কর হিংস্র রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পে এবং তারই রূপায়ণে কর্ম ও কর্মফলের নিষ্ঠুর লীলারহস্য উন্মোচন করেছেন। কালীর অভিশপ্ত জীবনের কাহিনীকে লেখক আইনের কষ্টিপাথরে বিচার না করে সর্বব্যাপী সহানুভূতির দৃষ্টিতেই বিশ্লেষণ করেছেন। আ.ন.ম.ব.র.

আখতার হুসেন : শিশু সাহিত্যিক। ১৯৪৫ সালের ১ নভেম্বর চাঁপাই নবাবগঞ্জে তাঁর জন্ম। পিতা টি.আই.এম. সিকান্দার। ১৯৬৩ সালে আখতার হুসেন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ও বিদেশে জীবন সংগ্রামে তিনি কঠিন পরিশ্রম করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি না হলেও জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁকে ঋদ্ধ করেছে ; ফলে তাঁর সাহিত্য এক পরিণত সৃষ্টি বলেই পাঠকের নিকট সমাদৃত। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ : 'সমুদ্র অনেক বড়', 'রামধনুকের সাঁকো', 'দি টাইগার ও অন্যান্য গল্প', 'হৈ হৈ রৈ রৈ', 'প্রজাপতি ও প্রজাপতি', 'খেলাঘরের পুতুলগুলো', 'চাপা পড়া মানুষ', 'আয় আয়', 'ফ্রিডম ফাইটার', ইত্যাদি। এইসব সৃজনশীল সাহিত্য ছাড়াও তিনি জীবনী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গল্প, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা গল্প সম্পাদনা করেছেন, মার্ক টোয়েন, ম্যাক্সিম গোর্কির গল্পও অনুবাদ করেছেন, জার্মান ভাষায় প্রকাশিত আখতার হুসেনের বই skelet der Roten। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ আখতার হুসেন লাভ করেছেন আলাওল সাহিত্য পুরস্কার। র. হা.

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : কথাসাহিত্যিক। গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মতারিখ ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। পৈতৃক নিবাস বগুড়া। পিতা বদিউজ্জামান ছিলেন পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৩)। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে আই.এ. পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে বাংলায় বি.এ. অনার্স ও পরের বছর (১৯৬৪) একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপনা ছিলো তাঁর পেশা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও ঢাকা কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাসসচেতন একজন শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক। অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে সে সব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বল-

www.pathagar.com

ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস--চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬) ; গল্প—অন্যঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধেভাতে উৎপাত (১৯৮৫) ও দোজখের ওম (১৯৮৯)। আখতারুজ্জামানের শ্রেষ্ঠ রচনা মহাকাব্যোচিত উপন্যাস 'খোয়াবনামা'য় (১৯৯৬) গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্তশ্রমজীবী মানুষের জীবনব্যবস্থাসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৮২-তে বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৯৬-তে কলকাতার আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় তিনি মারা যান। নূ.ই

আখবারে এসলামিয়া : মাসিক পত্রিকা। টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশকাল ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ। এর সম্পাদক ছিলেন টাঙ্গাইল নিবাসী বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদক মৌলভী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন। হানাফি সম্প্রদায়ের ধর্মান্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'আখবারে এসলামিয়া' (এ বিশুদ্ধ উচ্চারণ) পত্রিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। করটিয়ার জমিদার খানপন্নী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত 'মাহমুদীয়া যন্ত্র' নামক প্রেস থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক জীবন-চেতনার উন্মেষ পর্বে এ পত্রিকার দান উপেক্ষণীয় নয়। আ.র.

আখেরাত : অর্ত শেষ। এই শব্দটি পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে। দুনিয়া বা বর্তমান জীবনের বিপরীতে আখেরাত, ইহকালের বিপরীতে পরকাল। ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিপরীতে চিরস্থায়ী জীবন। মুসলমানগণ দোয়া করার সময় দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করতেন যাতে ইহকালের সকল পাপ মোচন হয়ে শেষ বিচার দিবসের পর চিরস্থায়ী জীবন জান্নাতে সুখময় ও শান্তিময় হয়। আ.সৈ.গো.দ.

আখেরি চাহার শম্বা : আরবি সফর মাসের শেষ বুধবারকে বলা হয় আখেরি চাহার শম্বা। মুসলমানদের মধ্যে মদিনা শরীফে দুঃখ ভারাক্রান্ত মানসিক অবস্থা বিরাজ করছিল কারণ নবী করিম (দঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নবী করিম (দঃ) এ দিনে তাঁর অসুস্থতার কিছু উপশম লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সকল সাহাবী ও পরিবারবর্গের মধ্যে আনন্দ ও স্বস্তি বিরাজ করেছিল। উক্ত শেষ বুধবারের পরে তিনি গোসল করেননি। এ দিনে মুসলিম সমাজে পবিত্রতা ও পুণ্য অর্জনের গোসল করার রেওয়াজ আছে। নবী করিম (দঃ) রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশে এ দিনটি অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো পালিত হয়। আ. সৈ. গো দ.

আখ্যানমঞ্জরী (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ) : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ। পরে সংশোধনকল্পে পূর্ববর্তী ছয়টি আখ্যান ও কিছু নতুন আখ্যান নিয়ে ১৮৬৮ সালে আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগ ও পূর্বপ্রচারিত পুস্তকটি দ্বিতীয় ভাগ রূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকটি তৃতীয় ভাগ রূপে পরিগণিত হয়। প্রথম ভাগে তেইশটি, দ্বিতীয় ভাগে চৌত্রিশটি এবং তৃতীয় ভাগে একুশটি, তিন খণ্ডে সর্বমোট আটাত্তরটি আখ্যান সংযোজিত হয়েছে। পারিবারিক পবিত্রতা বজায় রাখা ও আদর্শ চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে আখ্যানসমূহ রচিত হয়। প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়—মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, অপত্যস্নেহ, পিতৃবৎসলতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়--সৌভ্রাতৃত্ব, পিতৃভক্তি, পতিপরায়ণতা, অপত্যস্নেহ ইত্যাদি। এই সমস্ত আখ্যানে পাশ্চাত্য জীবনের মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। দুই একটি গল্পে আরবদের আতিথেয়তার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত 'দয়া ও সদ্বিবেচনা'

www.pathagar.com

গল্পটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। 'উপকারের স্মরণ' গল্পে আমেরিকার আদিম জাতির উপর সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির অত্যাচারের কাহিনী, 'বর্বর জাতির সৌজন্য' গল্পে আদিম জাতির চারিত্রিক মাহাত্ম্যের কথা বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত 'দস্যু ও দিগ্বিজয়', 'স্বপ্নসঞ্চরণ', 'অকুতভয়তা' ইত্যাদি আখ্যানে নীতি ও চরিত্রাদর্শের ইঙ্গিত আছে, ছোটগল্পের আমেজও আছে। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়স্ক কিশোররা তার রস আস্বাদনে সমর্থ। আখ্যানমঞ্জরী তিন খণ্ডের ভাষাই বেশ প্রাঞ্জল ও শিশুমন তোষিণী। এতে সমাস, সন্ধির ঘনঘটা ও উৎকট শব্দ প্রয়োগের বাড়াবাড়ি নেই। ক্লাসিক সাধু গদ্যরীতি শিখবার জন্য এ ভাষা অত্যন্ত উপযোগী। বিদ্যাসাগর শিশুশিক্ষার উপযোগী করতে গিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে ভাষা ও শৈলীকে কমনীয় করে গড়ে তুলেছেন। বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকাদের দিকে নজর রেখে তিনি আখ্যানসমূহ তিন খণ্ডে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম দুইখণ্ডে গল্পচ্ছলে কোমলমতি বালক-বালিকাদের চরিত্র গঠনোপযোগী নীতিকথা প্রচার করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড পরিণত বয়স্ক কিশোরদের জন্য রচিত হওয়ায় এর কাহিনী সুগঠিত এবং এতে নীতিউপদেশের বাহুল্য নেই। কিছু কিছু আখ্যানে জীবনের নির্মমতা ও বীভৎসতার চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি প্রেম-প্রণয়ের ইঙ্গিত আছে। সু.মু.

আখ্যান রূপক : কাহিনীমূলক কোনো রচনায় যদি গূঢ় অর্থের ব্যঞ্জনা থাকে, তবে তাকে আখ্যান রূপক বলা হয়। আখ্যান রূপকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে অনেকগুলো রূপকধর্মী উপদেশ-বাণী পারস্পরিক সম্পর্কে বিযুক্ত থাকে এবং একটি মাত্র কাহিনীর ধারাবাহিকতায় গূঢ় অর্থের ধারাগুলো সমান্তরাল রেখায় বয়ে যায়। অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্নদর্শন', বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বাজার, লোকরহস্য প্রভৃতি আখ্যানরূপকের নিদর্শন। সু.মু.

আখ্যায়িকা : প্রাচীন কাব্যের একটি বিশেষ বিভাগ। সংস্কৃত আলঙ্কারিক ভামহ আখ্যায়িকতা প্রসঙ্গে বলেছেন, আখ্যায়িকায় নায়ক ধারবাহিক-ভাবে নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী বিবৃত করেন। তবে পরবর্তীকালে আখ্যায়িকা বলতে আখ্যানমূলক কাব্য মাত্রকেই বোঝানো হয়েছে। আজকাল পদ্যে ও গদ্যে আখ্যায়িকা রচিত হয়। সংস্কৃতে আখ্যায়িকা বর্ণনার মাঝে মাঝে ছন্দোময় শ্লোক থাকে। নায়ক বা নায়িকার অন্তরের বিচিত্র ভাবকে কবিগণ উচ্ছ্বাসসহকারে ব্যক্ত করেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে আখ্যায়িকায় কন্যাহরণ, যুদ্ধ এবং বিরহের মধ্য দিয়ে নায়ককে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে হয়। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' একটি উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা। উনিশ শতকের বাংলা আখ্যান কাব্যের ধারায় গল্পের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক, কাল্পনিক অথবা রোমান্টিক কাহিনী বিবৃতির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ইংরেজিতে যাকে Narrative Verse বলা হত তাকেই বাঙলায় আখ্যায়িকা বলা হয়। আখ্যায়িকার মধ্যে কাহিনীর বা ঘটনার বর্ণনা, বর্ণনাকারীর বক্তব্য বা মন্তব্যসহ বর্ণিত হয়। কিন্তু তার মধ্যে মহাকাব্যের পরিসর কিংবা জটিলতা থাকে না, আখ্যায়িকা ঋজু ঘটনার সরল বর্ণনামাত্র। গদ্যেও আখ্যায়িকা রচিত হয়। Narrative বা Descriptive রচনার সঙ্গে Ballad-এর বা লোকগাথার পার্থক্য ভাষিক ও শৈল্পিক—ঘটনাগত নয়। বাংলা আখ্যায়িকার মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চীকাবেরী'তে উড়িষ্যার ইতিহাসের এক রোমান্টিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' পৌরাণিক এবং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' রোমান্টিক প্রেমমূলক আখ্যায়িকার নিদর্শন। সু.মু.

আগবাড়ানি (আগলওয়া) : প্রথম ধান কাটার লৌকিক অনুষ্ঠানের নাম আগবাড়ানি। বাংলাদেশে ধানের মৌসুমে মাঠে ধান পাকলে একটি শুভ দিন দেখে চাষীরা প্রথম পাকা ধান কাটতে মাঠে যায়। এ উপলক্ষে সবাই মিলে ছোটখাট অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠান অঞ্চলভেদে হেলাধরা, ধানকাটা পূজা, মুঠপূজা প্রভৃতি নামেও অভিহিত। ড. শা. আ.

www.pathagar.com

আগম ও জ্ঞানসাগর : আলী রজা ওরফে কানু ফকির রচিত 'আগম ও জ্ঞানসাগর' (একই গ্রন্থের দুই পর্ব) সুফি-পন্থাবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ। এতে সৃষ্টিপত্তন, নূরতত্ত্ব, আল্লাহতত্ত্ব, চারমঞ্জিল (শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারফত), প্রভুর লীলা ও জল-বায়ু-মন মাহাত্ম্য, ধন-সম্পদের কুফল, ক্ষমা-সংযম-অদৃষ্ট, তন-সাধন তত্ত্ব, প্রেম ও ভক্তি, দেহতত্ত্ব,যোগমার্গ ইত্যাদি জটিল ও সূক্ষ্ম দরবেশী তত্ত্বকথা বর্ণিত হয়েছে। 'জ্ঞানসাগর' আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেছেন (১৩২৪)। ড. আহমদ শরীফ 'আগম ও জ্ঞানসাগর' সম্পাদনা করে 'বাঙলার সূফি সাহিত্য' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশ করেছেন। নূ. ই

আগমনী : দুর্গা পূজা উপলক্ষে রচিত এক প্রকার গান। দেবী দুর্গার মর্তে আগমন এই গানের বিষয়বস্তু। তবে আগমনী গানে কৈলাসের পতিগৃহ থেকে হিমালয় কন্যার পিতৃগৃহে আগমনের ঘটনায় দৈবী ভাবের পরিবর্তে গৃহস্থ বাঙালির আদরিণীকন্যার বৎসরান্তে পিতৃগৃহে আগমন ও তার ব্যাপারে মায়ের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার অনুষঙ্গটি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। এই গানে দেখা যাচ্ছে যে কোথাও মা মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে উমাকে আনার জন্য অনুরোধ করছেন বা আগতা উমাকে দীর্ঘদিন পরে আসার জন্য মৃদু তিরস্কার করছেন বা জামাতা শিবের উদ্দেশ্যে আক্ষেপ ও ক্রোধ প্রকাশ করছেন বা লোক মুখে শিবগৃহে উমার দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনে বিলাপ করছেন বা কোথাও কন্যার সঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখে আক্ষেপ করছেন। বাৎসল্য রসই আগমনী গানের প্রধান রস। তবে করুণ রসও রূপায়িত হয়েছে কোনো কোনো গানে। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দাশরথি রায় প্রমুখ আগমনী গান রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। বর্তমান কালে কাজী নজরুল ইসলাম কয়েকটি চমৎকার আগমনী গান রচনা করেন। শাক্ত পদাবলী কবিগানের অন্যতম বিষয় বলে কবিগানের ধারায়ও প্রচুর উল্লেখযোগ্য আগমনী গান রচিত হতে দেখা যায়। বৈষ্ণবপদাবলীতে যেমন মধুররস (রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়রস) প্রধান, তেমনি আগমনীগানে (জগজ্জননী-স্বরূপা দুর্গা-কালী-সঙ্গীতে) বাৎসল্যরসই প্রধান। ক.গো.

আগম শাস্ত্র : আগমশাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রেরই নামান্তর বা প্রকারভেদ। আগম শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন আগত, গত ও মত এই তিনটি শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে 'আগম' শব্দটি গঠিত। এ মতানুসারে যা শিবমুখ থেকে আগত, পার্বতীর মুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত তাই আগম। অর্থাৎ আগম শিব-পার্বতী সংবাদরূপে নিবদ্ধ। এর বক্তা স্বয়ং শিব এবং শ্রোত্রী স্বয়ং পার্বতী। এই রূপ নিগম বলতে বুঝায়, যা পার্বতীর মুখ থেকে নির্গত বা নিঃসৃত, মহাদেব বা শিবের কর্ণে গত এবং বাসুদেবের অভিমত। পিঙ্গলামত নামক তন্ত্রমতে আগম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, সেই শাস্ত্র যা থেকে চতুর্দিকের বস্তুসকল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। আগমের আলোচ্য বিষয় সাতটি : সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের অর্চনা, সাধনা, পুরশ্চরণ (অর্থাৎ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইষ্টদেবতার পূজার্চনা ইত্যাদি)। ষটকর্মসাধন (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ এ ছয় কর্ম মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদির ছয় তান্ত্রিক ক্রিয়া) এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ। সু.মু.

'আগরতলা মামলা' শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ : ফয়েজ আহমদ রচিত ধারাবাহিক-ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন-সমূহ এই গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে মামলাটি চলাকালে জনাব ফয়েজ আহমদ ছিলেন দৈনিক আজাদের চীফ রিপোর্টার। সেই সময় তিনি 'আজাদে ট্রাইবুনাল কক্ষ' নামে যে বিশেষ প্রতিবেদন লিখতেন, সেই প্রতিবেদনগুলো এবং একই সঙ্গে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সাজানো

www.pathagar.com

এই মামলার ওপর লেখকের দীর্ঘ বক্তব্যও রয়েছে। এই বক্তব্য পাঠ করে জানা যায়, বিশেষ ট্রাইবুনালে উত্থাপিত মামলাটির প্রকৃত নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। ...'ভারত বিরোধী সাধারণ মানুষের উষ্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে এই প্রত্যাশা তাঁদের মধ্যে ছিল। সেই কারণে সুকৌশলে মামলাটির প্রকৃত নাম উড়িয়ে দিয়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামটি ব্যাপকভাবে প্রচার ও উল্লেখ শুরু হয়।' সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করলে আজকের প্রজন্ম জানতে পারবেন এই মামলাটি কি গভীর দূরভি সন্ধিমূলক ছিল। শুধু নতুন প্রজন্ম কেন? পুরনো প্রজন্মও গ্রন্থটি পাঠ করলে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের স্মৃতিকে পুনর্বার ঝালাই করে নিতে পারবেন। গ্রন্থকার শেখ মুজিব প্রসঙ্গে লিখেছেন, ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রবেশ করলেন—রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত এক নম্বর ব্যক্তি, দেশের সর্ব বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। ...মৃদু হাসি, বলিষ্ঠ মনোভাব ও অকুতোভয় মানুষটিকে দেখার সাথে দর্শক ও আইনজীবীদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল। তিনি যেনো ভুলেই গেছেন যে ফাঁসি দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের কোনো মামলায় তাঁকে আনা হয়েছে। ...মনের মতো জাঁদরেল কালো গাউন পরিহিত তিনজন বিচারপতি...কোণ দৃষ্টিতে শেখ সাহেবের দিকে চেয়েছেন।...প্রধান বিচারপতি একবার ডান দিকে ঘাড় বাঁকা করে শেখ মুজিব ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকালেন। শেখ মুজিব এমন কারাগার, ভয়ভীতি, শঙ্কা ও ট্রাইবুনালের বিচারের মধ্যেও শেখ মুজিব রয়ে গেলেন।' এ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'তখন তিনি জানতেন না যে, শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্যে নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলনের বাণীস্বরূপ।' ফয়েজ আহমদ রচিত 'আগরতলা মামলা শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ' নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে সাহিত্য প্রকাশ, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। প্রচ্ছদ এঁকেছেন রফিকুন নবী। মূল্য : পঁচাত্তর টাকা। **মা. আ.**

আগস্ট ১৯৪২ : মনোজ বসু রচিত উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯৪৭ সাল। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন যে ক'টি উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে, 'আগস্ট ১৯৪২' তার মধ্যে অন্যতম। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসে ঘটনাপ্রবাহ একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনী ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক মহীনের বাবা উগ্র সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে মহীন সেই মতবাদকে ভুল বলে জানে। সে গান্ধীবাদী। তার দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদীরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। বস্তুত, অহিংস রাজনীতির জয়গান এবং অহিংসাকেই একমাত্র আদর্শ হিসেব তুলে ধরার প্রয়াস এ কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। লেখকের বিবেচনাবোধ অহিংসার শক্তিকে 'এটমবোমার চেয়ে ভীষণতর অস্ত্র' বলে গণ্য করে। উপন্যাসের কাহিনীতে কংগ্রেস জনগণ, বিরোধী দল—সবার মধ্যেই উদার সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। একজন যথার্থ ভাল মানুষ মহীনের দৃষ্টিভঙ্গিও উদার মানবতা-সন্ধানী। এই মানবিক চেতনাবলেই মিলিটারি ছাউনিতে আগুন লাগিয়ে নিজে পুড়ে গিয়েও ঠিকাদার শশিশেখরকে বাঁচাতে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহীন। আগুন লাগানোর অভিযোগে তার জেল হয়। তবে সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে সে সহজেই ছাড়া পেয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মহীন শশিশেখরের মেয়ে যুথীকে বিয়ে করে। পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। **ড. শা. আ.**

আগামী : শিশু-কিশোর পাঠ্য সাহিত্য পত্রিকা। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে (১৯৫২ খ্রিঃ) প্রসূন বসুর সম্পাদনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'আগামী' প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে পাঠকসমাজে খ্যাতি লাভ করে। পত্রিকার আয়ু ছিলো ছয় বৎসর। চার বৎসরে চারটি 'পূজা বার্ষিক' প্রকাশিত হয়। পত্রিকার লেখকদের মধ্যে অধ্যক্ষ অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিভূষণ চাকী, কবি

www.pathagar.com

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মিহির সেন, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়,কৃষ্ণ দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কিছু তরুণ লেখক-লেখিকার রচনাও এতে প্রকাশিত হতো। 'আগামী'র একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিলো— 'যাদের কথা কেউ ভাবে না'। অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ লোকের জীবন সম্পর্কে তরুণ পাঠক সমাজকে সচেতন করে তোলাই ছিলো এই বিভাগের উদ্দেশ্য। আ.ই

আগামী : সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এ, কে, মকবুল আহমদ ও আবুল হাসান। আবুল হাসান কর্তৃক কথাকলি প্রকাশনী, করোনেশন রোড, ময়মনসিংহ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত। কাজী শামসুল হক কর্তৃক হক প্রেস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত। ১৩৬৭ সালের কার্তিক মাসে আগামীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৭ (যুগ্ম সংখ্যারূপে)। এ সংখ্যার মূল্য ছিলো .৬২ পয়সা। বার্ষিক ৬ টাকা, ষান্মাসিক ৩॥, অন্যান্য সংখ্যার মূল্য .৫০। পত্রিকাটিতে কবিতা, রম্য সাহিত্য, চরিত্র চিত্রন, প্রাচীন কথা, সমালোচনা, গ্রন্থপরিচয়, চিত্রকথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ স্থান পেতো। সচিত্র এ পত্রিকার অঙ্গ-সজ্জা ও প্রচ্ছদ শিল্পী সুধীর দাস ও ইমাম-মেহেদী। পত্রিকাটি বেশ মানসম্পন্ন ছিলো। আবুল ফজল, সিরাজউদ্দীন কাসিমপুরী, আশরাফ সিদ্দিকী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক আগামী পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন। প্রথম বর্ষের ৩য় সংখ্যা থেকে কাজী শামসুল হক মুদ্রক ছিলেন। প্রথম বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যার মুদ্রক ছিলেন কে, এ, খান, জামান প্রিন্টার্স, কাচারী রোড, ময়মনসিংহ। প্রথম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা আগামীর সাইজ ছিলো ৮´´ × ৫´´ ইঞ্চি। কথাকলি প্রকাশনী, গাঙ্গিনার পাড়, ময়মনসিংহ। মুদ্রণ : মঞ্জুরুল হক, রহমানিয়া প্রেস, (স্বদেশী বাজার) মোমেনশাহী। পৃষ্ঠপোষক : কাজী শামসুল হক, আর্থিক সংস্থানে, বেগম সাহারা আহমদ, দপ্তর : এ, কে, এম, জহুরুল হক, প্রচার বিভাগ : গোলাম মোস্তফা খান। সংখ্যাটি ঈদ ও পাকিস্তান দিবস সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো। শা. আ.

আগামীকাল : প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি পাঠকনন্দিত উপন্যাস। প্রকাশক : কাত্যায়ণী বুকস্টল, ২০৩ কর্নোওয়ালিস স্ট্রীট কলকাতা। প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৪১, মূল্য : পাঁচসিকা। একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটির কাহিনী বিধৃত। একটি গ্রাম কিভাবে শহরে রূপ নেয় এবং শহরের লোকগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ভিটেপাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় তার বর্ণনাও রয়েছে এই উপন্যাসে। শহর সীমান্তের বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে আগামীকাল পূর্ণতা পেয়েছে। এই উপন্যাসটির বির্নাস, বিপিন, লীলা, হরি, সাধু ময়রা, অনিল, শিবু, লক্ষ্মীকান্ত, পঞ্চানন, রাখাল, শ্রিনাথ, হিরোকৃষ্ণ, নারায়ণ, নন্দ, গোবিন্দ, অমল, সুবোধবাবু, দুলাল ও ভৈয়ব চরিত্রগুলো স্বমহিমায় উজ্জ্বল। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে মানযোতা মাঠের মেলা বসার মধ্যদিয়ে। মূলত গ্রামের সাধারণ মানুষের চিত্রের পাশাপাশি ভবিষ্যত জীবনের ইঙ্গিত এবং জীবন ও পরিবেশ পরিবর্জনের একটি নিখুঁত চিত্র আঁকা হয়েছে এই গ্রন্থে। বিস্তৃত জীবনের ব্যখা আগমীকাল। উপন্যাসটির কাহিনীবিন্যাসে কোন জটিলতা নেই। চরিত্র বিশ্লেষণে সংবেদনশীল। বর্ণনা অপূর্ব। যেমন : মানবোতার মাঠে খুব বড় মেলা বসেছে। রাতারাতি কে যেন বসিয়েছে কপড়ের ছোটখাট সহর। তার আর দরমার ঘর মাঠ জুড়ে। চারিধারে টিনের দেয়াল। 'আগামীকাল' একটি উজ্জ্বল কথাকাহিনীর গ৫ন্থ্। বাস্তব অনুষঙ্গে মিশে আছে চিত্র-চরিত্র। খা. বি. জ. উ.

আগুন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে রচিত একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। বই আকারে প্রকাশের আগে 'কালপুরুষ' নামে ১৩৪৩ শ্রাবণ-কার্তিক 'দেশ'

www.pathagar.com

পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। যশ ও কামনার অগ্নিতে দগ্ধীভূত এবং ধর্মের অগ্নিতে উদ্ভাসিতপ্রবৃত্তির এই ত্রিবিধ তাড়নায় তাড়িত তিনটি চরিত্রই 'আগুন' উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসটি স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে লেখা। বক্তা নরুর পুরোনাম নরেশ মুখোপাধ্যায়। নরুর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে চন্দ্রনাথ ও হীরু দুই সহপাঠী এবং চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথ প্রবৃত্তিতাড়িত এই তিন ব্যক্তির চরিত্রগত নানা দিকের উপস্থাপনা 'আগুন' উপন্যাসের মূল বক্তব্য। ধনীর দুলাল হীরুকে অন্যায়ভাবে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান দেওয়া হয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী চন্দ্রনাথ অন্যায়ের প্রতিবাদে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে। চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথের সঙ্গে এ ব্যাপারে মতান্তর হওয়ায় চন্দ্রনাথ বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে অজানার পথে চলে যায়। গৃহী নিশানাথ ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগবশত একসময় সন্ন্যাসী হয়ে শ্মশানে কুড়ে বাঁধেন। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করে নিশানাথ তাঁর শ্মশান-আশ্রমকে সাধনার পীঠ স্থান রূপে গড়ে তোলেন। বিপুল বিত্তের অধিকারী হীরু ভোগবিলাসে জীবনযাপনই পরম মোক্ষ বলে মনে করে। দেশী-বিদেশী রূপসী নারীর রূপসুধা পান করে সে কামনার বহ্নিতে দগ্ধীভূত হয়। হীরুর সন্তান পেটে ধারণ করে যাযাবরী একদিন পালিয়ে যায় অবাঞ্ছিত সন্তানকে ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হীরুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। অন্য নায়ক চন্দ্রনাথ মনে করে যশ-বিত্তমান এসব বিষয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই এবং তার এই মনোভাবের অন্তরালে বাস করতো এক সর্বত্যাগী বৈরাগী বাউল। ভারতের নানাপ্রান্তে ঘুরে একদিন পাঞ্জাবে এসে সে খুঁজে পায় মীরাকে যার সান্নিধ্যে তার বাউল-মন পুনরায় সংসারের মায়া অনুভব করে। মীরাকে সে বিয়ে করে এবং তাদের একটি পুত্রসন্তান হয়। মীরা ছেলের নাম রাখে কুমার কিশোর, চন্দ্রনাথের আদরের জিঞ্জির। তারপর চন্দ্রনাথ হয় ব্যবসায়ী, কীর্তি তার অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। 'আগুনে' অবশ্য নিরঙ্কুশ বাস্তবতার চেয়ে কল্পনার ভাবসত্যই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। মু.আ.জ.

আগুনের অক্ষর (সোমেন চন্দ স্মারক-গ্রন্থ) : সম্পাদক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও পবিত্র সরকার। বইটি প্রকাশ করেছে সোমেন চন্দ ৭০-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন সমিতি, কলকাতা। প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯২। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরবর্তী আশুলিয়া গ্রামে ১৯২০ সালে জন্ম নেয়া এবং মাত্র একুশ বছর নয় মাস বয়সে নিহত চল্লিশ দশকের প্রতিভাবান তরুণ লেখক সোমেন চন্দের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন-সম্বলিত স্মারকগ্রন্থ।। এটি সোমেন চন্দর ৭০-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গঠিত সমিতির কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অবদান। এ স্মারকগ্রন্থে সোমেন চন্দ সম্পর্কিত লেখার বিষয় এবং লেখক তালিকা দীর্ঘ। এতে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনার মূল্যায়ণ, তাঁর লেখক সত্তার স্ফূরণ ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত, তাঁর ব্যতিক্রমী পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত শিল্পদর্শন ও অভিজ্ঞতার প্রসার সম্পর্কে আলোকপাত। দেশবিভাগের পরবর্তীকালে পঞ্চাশ দশকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যধারার মধ্যেকার তারতম্য এবং অবরুদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ লেখক-ছাত্রসমাজের বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে সোমেনের লেখার দূরপ্রসারী প্রভাবের কথাও এতে আলোচিত। শক্তিমান লেখক সোমেন ছিলেন দক্ষ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠকও। তিরিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্বদেশ ও বিশ্বের যুগান্তকারী ঘটনাবলীর আবর্তে দিকভ্রান্ত না হয়ে সোমেন এ উপমহাদেশের দেশ প্রেমিকগণ ও বাম গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী বিপ্লববাদীদের কর্মকাণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখেই স্বকীয় চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে ছিলেন সুবিন্যস্ত, ছিলেন শিল্প সাহিত্যের কর্মকাণ্ডে নিরলস। বিভিন্ন গুণীজনের বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লেখা মূল্যায়ণধর্মী প্রবন্ধগুলো সোমেনের লেখক-সংগঠক-সংস্কৃতিসেবী জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছে। বইটির প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি

সোমেন চন্দ ও তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সতীশ পাকড়াশি, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, জ্ঞান চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরী, ক্ষুদিরাম দাস, নেপাল মজুমদার, সরদার ফজলুল করিম, রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায় ও সুমিতা চক্রবর্তী। এরপর মুদ্রিত হয়েছে সোমেন চন্দের চারটি গল্প—একটি রাত, সংকেত, দাঙ্গা, ইঁদুর। তাঁর গল্প সম্পর্কে আরো দু'টি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পর মুদ্রিত হয়েছে সোমেন চন্দ স্মরণে লেখা বিভিন্ন প্রথিতযশা কবির কবিতা। এ পর্যায়ে প্রথম পর্বে কবি অমিয় চক্রবর্তীর ভূমিকাসহ মোট দশটি কবিতা। দ্বিতীয় পর্বে মুদ্রিত সোমেন চন্দকে নিবেদিত মোট একচল্লিশটি কবিতা। এরপর আবার স্মৃতিচারণমূলক ও মূল্যায়নধর্মী কিছু আলোচনা রয়েছে। সোমেন চন্দর জীবনপঞ্জি ও বংশলতিকার সংযোজন বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে এ বইতে সোমেন চন্দর রচনার একটি ক্রমপঞ্জি অত্যাবশ্যক ছিলো। একজন অকাল প্রয়াত কালজয়ী তরুণ প্রতিভার মূল্যায়নে এ বই এক অনুসরণীয় প্রয়াস। র.আ.ক.

আগুনের পরশমণি : হুমায়ুন আহমেদ। প্রকাশক : বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৬। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী, মূল্য : ৪০.০০। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। বদিউল আলম নামে এক গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা মতিন সাহেব নামে জনৈক ভদ্রলোকের বাসায় আশ্রয় নেয় ; মতিন সাহেব আলমকে চেনেন না, কিন্তু পরম যত্নে আশ্রয় দেন ; কারণ তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করেন স্বাধীনতা যুদ্ধকে। বেগম মতিন ওরফে সুরমা প্রথমে আলমকে স্বাভাবিকভাবে নিতে না পারলেও ধীরে ধীরে মমতাময়ী হন। মতিন সাহেব ও সুরমার বড় মেয়ে রাত্রি আলমের প্রতি নির্লিপ্ত থাকলেও এক পর্যায়ে দেখা যায় সেই নেপথ্যে আলমের প্রেরণা ও শক্তি হয়ে ওঠে। 'আগুনের পরশমণি'তে ঢাকায় গেরিলা অপারেশনের দুঃসাহসিক বিবরণ আছে, আছে গেরিলাদের গোপন তৎপরতা। আরও আছে স্বাধীনতা সমর্থনকারী ও বিরুদ্ধবাদী কিছু চরিত্র, সাধারণ মানুষের গোপন ও সক্রিয় সমর্থনের চিত্র। হুমায়ুন আহমদের গদ্য শৈলীর কারণে, সাধারণভাবে কথিত মুক্তিযুদ্ধের এই কাহিনী অসাধারণ হয়ে প্রতিভাত হয় পাঠকের কাছে। র. হা.

আঙট : মেয়েদের পায়ের আঙ্গুলে পরার রূপার আঙটি বা অলঙ্কার। এটিকে চুটকিও বলা হয়। একসময় এই আঙট কনিষ্ঠা ব্যতীত পায়ের অন্য সব আঙ্গুলে পরা হতো। বৃদ্ধাঙ্গুলির আঙটে ছোট্ট ঘুঙুরও থাকত। ধীরে ধীরে এই রীতি বদলে গিয়ে কেবল দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির পরের দুটি আঙ্গুলেই আঙট পরার রীতি চালু হয়। মূলত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের মেয়েদের পায়ের আঙট পরতে দেখা যায়। ড. শা. আ.

আঙুর : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত সচিত্র শিশু মাসিক। 'আঙুর' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩২৭ সনে, ইংরেজি নভেম্বর ১৯২০ সালে। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো কলকাতা-৫, কলেজ স্কোয়ার থেকে। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু। 'আঙুর'-এর প্রতি সংখ্যায় থাকতো ছড়া, গল্প, ব্যঙ্গ ও কৌতুক রচনা, ঐতিহাসিক কাহিনী, অনুবাদ ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের লেখাও 'আঙুর'-এ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর লেখার নাম ছিল 'রথযাত্রা'। 'আঙুর'-এর পাঁচটি সংখ্যায় একাধিক বিষয়ে স্বয়ং সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর তেরটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'আঙুর' প্রকাশিত হওয়ার পর ড. দীনেশচন্দ্র সেন এক চিঠিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে লিখেছিলেন, "আপনার মত এত বড় পণ্ডিত, যাঁহার বিদ্যার পরিধি আয়ত্ত করিবার সাধ্য আমাদের নাই, যিনি বেদ-বেদান্তের অধ্যাপক, ফারসি ও আরবি যাঁহার নখদর্পণে, যিনি জার্মান ব্যাকরণের জটিল ব্যূহ ভেদ করিয়া অবসর রঞ্জন করেন, তিনি একটি 'আঙুর' হাতে করিয়া

www.pathagar.com

উপস্থিত।" উদ্ধৃত চিঠিটি 'আঙুর-এর পঞ্চম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। 'আঙুর'-এর পুরনো কপি এখন দুষ্প্রাপ্য। 'বাংলা একাডেমী শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষে' 'আঙুর-এর এগারটি সংখ্যা সংরক্ষিত আছে। বাঁধাই করা এ সংখ্যাগুলোর একটিতে প্রথমদিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা নেই, ফলে এটি কোন সংখ্যা তা নির্ণয় করা কঠিন। অন্য সংখ্যাগুলো হচ্ছে : ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৭। ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭। ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৭। ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৭। ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৭। ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৭। ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২৭। ১ম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৭। ১ম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৭। উল্লেখ্য এক বছরের মাথায় 'আঙুর'-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ক্রমশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে মাসিক 'আঙুর'-আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি। 'আঙুর' সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ও শিশু সাহিত্যিক আতোয়ার রহমান মন্তব্য করেছেন, "নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়, 'আঙুর'-ই-মুসলমানদের দ্বারা সর্বতোভাবে সম্পাদিত এবং প্রকাশিত প্রথম বাংলা শিশু পত্রিকা, —অন্তত প্রথম শিশুতোষ সাহিত্য মাসিক।" মা. আ.

আচার প্রবন্ধ : ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল নির্দেশক প্রবন্ধ পুস্তক। প্রকাশকাল ১৮৯৫ খ্রিঃ। পুস্তকের উপক্রমণিকায় সদাচারের গুণ কীর্তন ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। পাঁচটি অধ্যায়ের প্রথমে প্রাতঃকৃত্য, দ্বিতীয় অধ্যায় পূর্বাহ্ণকৃত, তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্যাহ্নকৃত, চতুর্থ অধ্যায়ে অপরাহ্ণ সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সেসব বিষয়ের উপসংহার টানা হয়েছে। পরবর্তী সাতটি অধ্যায়ে নৈমিত্তিক আচার, যেমন—গর্ভ সংস্কার, শৈশব সংস্কার, কৈশোর সংস্কার, যৌবনসংস্কার এবং শ্রাদ্ধকৃত ও ব্রতপূজা পার্বণাদির কথা ব্যক্ত হয়েছে। আচার প্রবন্ধের মূল বৈশিষ্ট্য মানুষের পারিবারিক ও নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের ধারায় পবিত্রভাব সঞ্চার প্রয়াস। ভূদেবের ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। মু.আ.জ.

আজ কোথায় যাবেন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : গল্পগ্রন্থ। মূল্য ৩৫.০০ মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৯৮০ ও ১৯৯২, প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য। গল্প গ্রন্থটিতে এগারটি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলো : সোনালি দিন, আম কাঁঠালের ছুটি, দুই শিশু, লেডিজ ঘড়ি, আরসোলা, গোধূলি, ভাল ছেলে খারাপ ছেলে, চশমখোর, জিয়ন কাঠি, মরণ কাঠি, আজ কোথায় যাবেন ও গোপন গন্ধ। প্রকৃতি এবং নারী, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, ভালোলোক আর মন্দলোক, নিয়তি নির্ধারিত এবং নিরুদ্দেশ দিন যাপন, প্রবৃত্তি এবং আবেগ, আলো এবং অন্ধকার তাঁর গল্পের উপজীব্য। লেখার গুণে তাঁর রচিত জগত এবং পাঠকের পরিচিত জগত মিলে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তৃতীয় একটি আয়তন। লেখক গল্পগুলো লিখেছেন পাঠকের অতিচেনা ও সরল শব্দাবলীতে। বইয়ের নাম গল্পটি বৃদ্ধদের প্রাত্যহিক জীবনাচরাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বসন্তদিন শেষে, ঝরাপাতার ক্রন্দন শুনতে শুনতে পিছু ফিরে তারুণ্যকে দেখার চেষ্টায় কজন বৃদ্ধ, যাঁরা উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে রত এবং ভুল করে ফিরে পেতে চাইছেন নিজেদের ফেলে আসা যৌবন। এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই জীবন নির্ভর। সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। প্রগতিশীল, মানবকল্যাণকামী লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে সত্যিকার অর্থেই গল্পের কারবারি তা এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্পেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পা.র.

আজৎ : গারোদের একটি সামাজিক প্রথা গারো উপজাতির মধ্যে বিবাহ উৎসব উপলক্ষে নবদম্পতিকে আশীর্বাদের যে রীতি প্রচলিত, তার নাম 'আজৎ'। 'আজৎ' উপলক্ষে নবদম্পতিকে

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। এসব উপহারের মধ্যে থাকে—চাল, গম, লবণ, মরিচ, তেল, হলুদ, পেঁয়াজ, মসলা, চা, বিস্কিট, দই, মিষ্টি, চিনি, পান, সুপারি ইত্যাদি এবং একটা করে মোরগ, মুরগি, খাসী ও শূকর। বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলেই এসব দ্রব্য আশীর্বাদের নিদর্শন হিসেবে বর-কনের জন্য নিয়ে যেতে হয়। এটাই তাদের নিয়ম। এই নিয়ম পালন না করলে সমাজে নিন্দনীয় হতে হয়। যে যত বেশি 'আজৎ' বিয়েতে উপহার দেবে, সে তত বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। যে একবার কারও বিয়েতে 'আজৎ' প্রদান করবে, তার বাড়িতে বিয়ে হলে সে একই ধরনের 'আজৎ' পাবে। এই রীতি 'গান্দাবারা' নামে পরিচিত। বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে গারো সমাজে 'আজৎ' প্রথা মেনে চলতে হয়। ড. শা. আ.

আজন্ম জনমেজয় : সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৮৬। প্রচ্ছদ প্রবীর সেন। অলংকরণ নির্মলেন্দু মণ্ডল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফনিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত। 'আজন্ম জনমেজয়' কাব্যটি তিনটি অংশে বিভাজিত হয়েছে। রাজা, উপাধি ও প্রত্নতত্ত্ব। মহাভারতীয় ইঙ্গিত নিয়ে কবি কবিতাগুলো রচনা করেছেন। 'রাজা' অংশে ভারতরাজার আত্মার চিরমুক্তি কিভাবে ঘটেছিলো তার সমস্ত কাহিনীর বর্ণনা নেই--মানুষী ভালোবাসার সঙ্গে ঈশ্বর-প্রেমের ব্যবধান সম্বন্ধের সূত্রটুকু শুধু অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ছয়টি দীর্ঘ কবিতায় রাজা অংশটি সমাপ্ত হয়েছে। 'উপাধি' অংশে মহাভারতের সবচেয়ে মহান অথচ সর্বাধিক অবহেলিত চরিত্র বিদুর যিনি ঋষি ব্যাসদেবের ঔরসে, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্মের পরে অম্বিকার শূদ্রাদাসীর গর্ভে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন এর আভাসমাত্র দীর্ঘ কবিতায় সমাপ্ত হয়েছে। 'প্রত্নতত্ত্ব' অংশটিও একটি দীর্ঘ কবিতা। পৌরাণিক কাহিনীকে কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কবিতায় বিধৃত করেছেন এবং কবির নিজেরই স্বীকারোক্তি : 'লুপ্ত সভ্যতার কাছে ফিরে আসি/আমাকে আপন করে ভূগর্ভ খনন/আমি দেখি উষ্ণীষ হারানো রাজা উঠে আসছেন/প্রত্ন বাদশাহী কুর্তায় কোনো রত্ন নেই/নর্তকীর পায়ে আর বাজছে না হংসক/তাদের খ্রিস্টাব্দ শেষ তাই/দুর্বল দুঃখের মতো, অদেখা হাওয়ার মতো/ফিসফিস করে একদা অধীপ, ওই বাদশা রাজারা/মাটির ওপরে উঠতে উঠতে বললেন 'সমরেন্দ্র'/আমাদের সাম্রাজ্য বোধহয় খারাপ ছিলনা ততটা !' পা. র.

আজব দেশ : মন্মথ রায় রচিত নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ। নাট্যকারের কল্পনার সৃষ্টি একটি আজব দেশের কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। হবুচন্দ্র রাজা এবং গবুচন্দ্র মন্ত্রীর সেই আজবদেশের অধিবাসীবৃন্দ পরম সুখে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে কালাতিপাত করছিলো। কেবল একটি লোককে নিয়ে গোল বাঁধলো। পাড়ায় পাড়ায় সে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, আলো চাই। রাজা হতবাক, মন্ত্রী প্রমাদ গুণেন। অনেক চিন্তাভাবনা করে সাব্যস্ত হলো, লোকটির প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক। তারপর লোকটিকে রাজ্যময় খোঁজ করা শুরু হলো। তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো মন্ত্রীর নিপুণ হাতে-গড়া সারা রাজ্যে দুর্নীতির ছড়াছড়ি। দুর্নীতির কালো আঁধারে ঢাকা রাজ্যময় জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া হলো। অজ্ঞানতার অন্ধকার অপসারিত হয়ে সেখানে তখন দেখা দিলো বিজ্ঞানের আলো। এই হলো নাটকের কাহিনী। ব্যঙ্গাত্মক আঙ্গিকে গড়া এই নাটকের রূপক কাহিনীর অন্তরালে মানবজীবনের বেদনাদায়ক দিকটির উন্মোচন হয়েছে। শ্লেষাত্মক বাণীবিবৃতিতে নাট্যকার রূপকছলে সেই অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের কাহিনী শুনিয়েছেন। ম.চৌ.

আজরাইল : আল্লাহর নিকটস্থ ফেরেস্তাদের মধ্যে আজরাইল একজন যার দায়িত্ব মৃত্যু ঘটানো বা প্রাণ হরণ করা। পবিত্র কুরআনে এ নামে তাঁকে উল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে, আপনি বলুন, মৃত্যুর ফেরেস্তাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে তোমাদের প্রাণ হরণ করার জন্য। অবশেষে তোমরা তোমাদিগের

www.pathagar.com

প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হইবে (৩২:১১)। অবশ্য রেওয়ায়েতে তাঁকে আজরাইল বলে জানানো হয়েছে এবং বর্ণিত হয়েছে তার অস্তিত্ব বিশ্বব্যাপী এবং তাঁর অসংখ্য চোখ এবং পা আছে। আ.সৈ.গো.দ.

আজাদ : প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মওলানা মহম্মদ আকরম খাঁ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর কলকাতা থেকে। এ প্রসঙ্গে বে-নজীর আহমদ লিখেছেন, "মুসলিম বাংলা সচকিত হয়ে উঠবে। এর জন্মের প্রথম দিন থেকেই এর লেখার ওজস্বিতা, আঙ্গিকের সৌকর্য এবং সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবশেনের কলাকৌশল স্থানীয় অভিজ্ঞ ও বিত্তশালী অন্য সম্প্রদায়ের দৈনিকগুলির সঙ্গে সম পদক্ষেপে চলার শক্তি ও সমর্থনের পরিচয় ছিল। ১৯৬১ সালে দৈনিক আজাদ তার পঁচিশ বছর উপলক্ষে রজত জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের বাণীতে তিনি উল্লেখ করেন : 'আজাদের ২৫ বৎসর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে বাণী লেখার সময় আমার আজ কত কথাই না মনে হইতেছে। বাংলার মুছলমানদের মূক মুখে ভাষার সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে একটা জীবন্ত জাতি হিসেবে গড়িয়া তোলার জন্য "আজাদে'র যে অতুলনীয় অবদান রহিয়াছে, তাহা আজ তর্কাতীত সত্য।" স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে এর প্রকাশনা বন্ধ। সে. হো.

আজাদী : বন্দরনগর চট্টগ্রামের অন্যতম মুখপত্র হিসেবে ১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। মোহাম্মদ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন 'আজাদী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে মোহাম্মদ আবদুল খালেক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এ পত্রিকার তৎকালীন মূল্য ছিল দুই আনা। ১৯৭১ সালে 'আজাদী'র সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ছিলেন নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে চলে যান। ফলে পাক হানাদার কবলিত বাংলাদেশে কিছুদিনের জন্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলেও অচিরে ১৮ জুন ১৯৭১ থেকে পুনঃপ্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রকাশের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত 'আজাদী'র প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। জেলা শহর থেকে প্রকাশিত হলেও এ কাগজটি বর্তমান জাতীয় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের গুণে একটি উন্নতমানের দৈনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া সাহিত্য, অর্থনীতি ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ক ফিচার ও নিবন্ধাদি প্রকাশের কারণেও পত্রিকাটি সুধীমহল কর্তৃক সমাদৃত হয়ে উঠেছে। বর্তমান 'আজাদী'র সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ। মা.আ.

আজিজ মেহের : নাট্যকার। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কালনা গ্রামে ১৯৩২ সালের ১৪ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমি ছেড়ে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা মুগবেলাই, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ। পিতা মিজানুর রহমান। তাঁর লেখাপড়া নওগাঁর কে. ডি. হাই স্কুল ও সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে। তাঁর পেশা প্রকাশনা। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনাদি রয়েছে। তার মধ্যে নাটক : টিপু সুলতান (১৯৬২), তারাবাঈ (১৯৬৩), ঝড়ের পাখি (১৯৬৫), বাজিছে দামাম নিরক্ষর বৃত্তে (১৯৬৭) ও ম্যাক্সিম গোর্কির মা (১৯৭২) ; চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ : ছবি চলে কথা বলে (১৯৮৬) ; রোজনামচা নিষিদ্ধ কথাকতা (১৯৮৯), আমি বিজয় দেখতে চাই (১৯৯২) ; অনিন্দ্য বিজয় ছিনিয়ে আন (১৯৯৩) ; ভ্রমণ কাহিনী : প্রভাত শান্তির দেশে (১৯৯০) ; সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক : দর্পণে আত্মপ্রতিকৃতি (১৯৯০)। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর কাগজের বাঘ নামে একটি গ্রন্থও রয়েছে। র.হা.

আজিজুর রহমান : গীতিকার ও কবি। কুষ্টিয়া জেলার হাটস্ হরিপুর গ্রামে ১৯১৪ সালের ১৮ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মীর মোহাম্মদ বশিরউদ্দীন, মাতা সবুরন্নেসা, স্ত্রী ফজিলতুন্নেসা। জমিদার পরিবারে জন্ম। বারো বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে (১৯২৭)। কুষ্টিয়া হাই স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস করেন।

www.pathagar.com

কৈশোর ও যৌবনে নাট্যাভিনয়ে, খেলাধুলায়, ক্লাব, সমিতি ও সংঘ পরিচালনায় সুনাম অর্জন করেন। মুসলিম লীগের একজন কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪-তে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় আসেন। একই বছর ঢাকা রেডিওর গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৬০-এ কিশোর মাসিক আলাপনীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও ১৯৬৪-তে দৈনিক পয়গামে সাহিত্য সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৭০ পর্যন্ত পয়গামে চাকরি করেন। ১৯৭২-এর ১ আগস্ট ঢাকা বেতারের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট গীতিকার ও কবি। দুই হাজারের অধিক গান রচনা করেছেন। প্রেম, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধ, মন্বন্তর, নাগরিক জীবনের সমস্যা ও সঙ্কট, শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, ইসলামি ঐতিহ্য, সাম্যবাদী আদর্শ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় তিনি তাঁর গান ও কবিতায় মনোরমভাবে রূপ দিয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছুটির দিনে (কাব্যনাটিকা, ১৩৭০), এই মাটি এই মন (গানের সংকলন, ১৯৭০) ও উপলক্ষের গান (গানের সংকলন, ১৯৭১)। সাহিত্যে মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন (১৯৭৯)। ১৯৭৮-এর ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পি.জি. হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। নূ.ই

আজিজুর রহমান আজিজ : কথাসাহিত্যিক ও কবি। ১৯৪৪ সালের ১০ জানুয়ারি মাদারিপুর জেলার ইটখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এটি তার লেখক নাম। প্রকৃত নাম মুহাম্মদ আজিজুর রহমান। তাঁর পিতার নাম আবদুল মান্নান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাস করার পর তৎকালীন প্রাদেশিক সুপিরিয়র সার্ভিসে যোগ দেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস. ডিগ্রি লাভ করেন। আজিজুর রহমান আজিজ উপন্যাস, কবিতা ও ছোটগল্প লেখক। তাঁর উপন্যাস মোট বারটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্য সুন্দর আনন্দ, কারাগার কারাবাস, দূর থেকে দূরে, সুদূরের রংধনু, যখন আমি আন্দামানে ইত্যাদি। ৭টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষণ্ণ সংলাপ, তবুও বেঁচে আছি, হেড লাইনের সংবাদ, নিরন্তর অন্তরে ইত্যাদি এবং গল্পগ্রন্থ অরণ্যে পাপ। তাঁর দরবেশ পাখি নামে একটি শিশুতোষ উপন্যাসও রয়েছে। তিনি রেনেসাঁ সাহিত্য পুরস্কার, এবিআই অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি পুরস্কার পেয়েছেন। র.হা.

আজীজন নেহার : মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪ সাল। উনিশ শতকের সপ্তম দশকে যুগসচেতন সাহিত্য-স্রষ্টা মীর মশাররফ হোসেন মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার জন্য পত্রিকা প্রকাশ ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধির ফলস্বরূপ 'আজীজন নেহার' পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু এতে তিনি ততোখানি সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। কেননা হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান ছাত্রের সহযোগিতা সত্ত্বেও পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি। সম্পাদকের এই অসাফল্যের পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। প্রথমত মুসলমান পরিচালিত পত্রিকার লেখক ও পাঠকের অভাব, দ্বিতীয়ত নতুন শিক্ষিত মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রতি ঔদাসীন্য, তৃতীয়ত পত্রিকা পরিচালকের ব্যক্তিগত অশান্তি অথবা সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ইত্যাদি। আ.ই

আজীজুল হক : কবি। মাগুরা জেলার আরাউল গ্রামে ১৯৩০ সালের ২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জোবেদ আলী। আজীজুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। চাকরি জীবনে সরকারি কলেজে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে (১৯৬৯), বিনষ্টের চিৎকার (১৯৭৬), ঘুস ও সোনালি ঈগল (১৯৮৯)ও আজীজুল হকের কবিতা (১৯৯৪)।

www.pathagar.com

'অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা' (১৯৮৫) আজীজুল হকের প্রবন্ধ সংকলন। তিনি সুহৃদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৪), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮৯), মাইকেল একাডেমী পুরস্কার (১৯৮৯) ইত্যাদি পুরস্কারে ভূষিত হন। মানবতাবাদী, গণতন্ত্রী, আধুনিকমনস্ক, প্রগতিতে আস্থাশীল, জীবনঘনিষ্ঠ ইতিহাস ও ঐতিহ্যসচেতন ধারার অনুসারী পঞ্চাশের দশকের প্রতিনিধিত্বশীল কবিকর্মী আজীজুল হক। সামরিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার বিষয়টি তাঁর কবিতায় মোটা দাগে চিহ্নিত। আজীজুল হক কবিতায় শব্দ-ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন। শব্দের কুশলী ব্যবহার ও ভাষার গতিময় স্নিগ্ধতা তাঁর কবিতার শরীরকে দিয়েছে স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্য। তিনি ২০০১ সালের ২৭ আগস্ট যশোরে মৃত্যুবরণ করেন। সা.আ.

আজুগোঁসাই : আঠারোশতকের একজন স্বভাব কবি। জন্ম চব্বিশ পরগনা জেলার অর্ন্তগত হালিশহরে। তিনি কবি ও সংগীত রচয়িতা ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সাধক কবি রামপ্রসাদের জন্মও হালিশহরে। আজুগোঁসাইয়ের অধিকাংশ কবিতা রামপ্রসাদের গানকে কটাক্ষ করে লেখা। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই গানের লড়াই হতো। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয় কবিকে ডেকে এনে তাঁদের সংগীত যুদ্ধ উপভোগ করতেন। আজু ছিলেন বৈষ্ণব আর রামপ্রসাদ ছিলেন শাক্ত। মু.আ.জ.

আজের বাইজানের গল্প-সংগ্রহ : রুশ ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন পূর্ণিমা মিত্র। রুশ দেশের আজের বাইজান অঙ্গরাজ্যের লেখকরা হলেন—মাসেদকুলিজাদে, মিরজা ইব্রাহিম, হুসেন আবাসজাদে, আনোয়ার মাসেদহানলি, আবুল হাসান, চিঙ্গিজ হুসেনভ, সুলেমান ভেলিয়েভ, মেহতি হুসেন, ইমরান কাসুমভ, ইলিয়াস আফানদিয়েভ, সুলেমান রহিমভ, ইসা হুসেনভ, সাবির আহমেদভ, ইসি মালিকজাদে, আনার মাকসুদ ইব্রাহিমবেকভ, রুস্তাম ইব্রাহিমবেকভ, আক্রাম আইনিসলি, সাবির আজেরী, এলাচিন এবং সাদাই বুদাগলি। ভূমিকায় লেখা হয়েছে, 'মানুষের জীবন... তার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দেয় আজেরবাইজানের সমসায়িক গল্পের এই সংকলনটি। সংকলনটি থেকে জানা যায় মানুষের জীবন আসলে কি, কেমন করে তা অতিবাহিত হয়। কেমন করে গড়ে ওঠে, আর যেন হঠাৎ তার বহু দিনের পথ পরিবর্তন করে নতুন পথে চলতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন একটা ঘটনা ঘটে মোটেই "হঠাৎ" নয়... মানুষের ভাগ্য যে, নদীরই মতন। প্রায়ই সে আঁকাবাঁকা খামখেয়ালি, কিন্তু তার গতি আর নদীগর্ভ নির্ধারিত হয় প্রধান এক নিয়ম অনুসারে যা আমাদের সবার ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। ভূমিকা থেকে প্রত্যেকটি গল্প সম্পর্কে মন্তব্য পাওয়া যায়। মোট গল্প একুশটি, গল্পকারও একুশ জন। প্রকাশিত হয়েছে রাদুগা প্রকাশন তাশখন্দ থেকে। বাংলা অনুবাদের প্রকাশকাল ১৯৮৮ সাল, মূল্য লেখা নেই। ব.ব.

আঞ্চলিক ছড়া : কেবলমাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক ছড়ার নাম আঞ্চলিক ছড়া। অঞ্চল বিশেষের ভাষাভঙ্গি, সমাজচিত্র অভ্যাস, আচার-আচরণের পরিচয় এতে বিধৃত হয়। খেলাধুলা, ঘুম, ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা, নীতিকথা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ ও আঞ্চলিক ছড়ায় থাকে। অঞ্চল বিশেষের ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস নির্ণয়ে এজাতীয় ছড়া সাহায্য করতে পারে। আঞ্চলিক ছড়াগুলি কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের একবারেই নিজস্ব ও মৌলিক সৃষ্টি। আ.জ.

আঞ্চলিক ভাষা : ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে প্রতি উচ্চারণেই শব্দের ধ্বনি পরিবর্তিত হয়—এবং কালিক ও স্থানিক ব্যবধানে তা স্পষ্ট ও শ্রুতিগোচর হয়। ব্যক্তির শারীরিক সামর্থ্যভেদে, স্থানভেদে, কালভেদে এবং অজ্ঞতার কারণে এরূপ বিকৃতি বা বিবর্তন ঘটে থাকে। ফলে একটি ভাষা ভৌগোলিক অবস্থানভেদে ও কালিক ব্যবধানভেদে বিভিন্ন স্থানিক ও কালিক রূপ পায়। তখন ঐ স্থানিক ও কালিক রূপকে বলে

www.pathagar.com

বুলি (Dilect) রূপ। অঞ্চলে অঞ্চলে চালু এই বুলি বা ভাষারূপকে বলে আঞ্চলিক ভাষা। এর সমার্থক শব্দ বা পরিভাষা হচ্ছে উপভাষা। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ সংগৃহীত হয়েছে। দুনিয়ার সব ভাষারই--ইংরেজি, ফারসি, চীনা, আরবি প্রভৃতিরও উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা আছে। ম.মু.

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান : দুই খণ্ডে বাংলার আঞ্চলিক ভাষার শব্দসমূহের অভিধান। বাংলা একাডেমী থেকে এটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৫৮ সালে এই অভিধানের সংকলনের কাজ শুরু হয়। সংগ্রাহকদের পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা ও করাচি মিলে মোট সংখ্যা ৪৫৩ জন। আঞ্চলিক শব্দসমূহের সংগ্রহ ও সংশোধনের পর ১৯৬০ সালে সংকলনের কাজ আরম্ভ হয় এবং প্রথম সংস্করণ স্বরবর্ণের অংশবিশেষ নমুনা হিসেবে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর প্রধান সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এছাড়া উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্যরা ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী ও ড. কাজী দীন মুহম্মদ। প্রকাশক বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম মুদ্রণ হয় প্রথম খণ্ড ১৯৭৩, ২য় খণ্ড ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৪৬৮+৫৯০, মূল্য ১ম খণ্ড ৪৫.০০, ২য় খণ্ড ৫৫.০০ টাকা। বইটির অখণ্ড দ্বিতীয় মুদ্রণও প্রকাশিত হয়েছে। বি.ব.

আটকড়াই/আটকলাই : বাংলার একটি লোকাচার। সন্তান জন্মের পরে অষ্টম দিনে এ আচার পালন করা হয়। এদিন ছোট ছেলেমেয়েরা কুলা পিটিয়ে অশুভ শক্তিকে তাড়ায়। এ উপলক্ষে তারা ছড়া কেটে নবজাতক শিশুর মঙ্গল কামনা করে। নবজাতকের পরিবার থেকে এই ছেলেমেয়েদের আট প্রকারের খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। এর মধ্যে থাকে মুড়ি, চিড়া,খই, ছোলা, মুগ, কলাই, খেসারি ও মটরভাজা। শিশুর ভবিষ্যৎ যাতে মঙ্গলময় ও নিরাপদ হয় সে কামনাই এ লোকাচারের উদ্দেশ্য। ড. শা. আ.

আট বছর আগের একদিন : কবি জীবনানন্দ দাশের এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায়। এই কবিতাটি 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। এই কবিতাটিকে ঘিরে রচিত হয়েছে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ-গ্রন্থ। দুই বাংলার বরেণ্য লেখকদের লেখার সমাহারে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি শুরু হয়েছে নাটকীয়ভাবে একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার সমাচারের মধ্যে দিয়ে। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে জীবনে সুখে থাকবার মতো সব উপকরণ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তবু কেন সে আত্মহত্যা করল? এই কবিতায় কবি এক বিপন্ন বিস্ময়ের কথা বলেছেন। 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/ আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে/ আমাদের ক্লান্ত করে/ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;/ লাশকাটা ঘরে/ সেই ক্লান্তি নাই)। জীবনের হিসাব বড় গোলমেলে। এমন হতে পারে জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে যাবার ফলেও মানুষের মধ্যে হতাশা আসতে পারে। আর ফাল্গুনের রাতের পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যাবার মুহূর্তও কম বিপদজনক নয়। চুরাশি পংক্তি সংবলিত এই দীর্ঘ কবিতায় কবি বিভিন্ন বিস্ময়ের পাশাপাশি অপার জীবনবাধ্যের উদাহরণও দিয়েছেন। কবিতার শেষে এক গভীর জীবনবোধের প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয় : 'আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।' সৈ, আ. হা.

আড় খেমটা : বার মাত্রায় গঠিত তালের নাম। এই তালের তালাঙ্ক সংখ্যা চার। প্রতি তালাঙ্কে তিনটি করে মাত্রা। মাত্রা বিন্যাস দাঁড়ায় : ১২৩ ।৪৫৬ ।৭৮৯ ।১০১১১২। তিনটি তালি ও একটি খালি বা ফাঁক। সম, দ্বিতীয় তাল, ফাঁক, তৃতীয় তাল এই ক্রমে তালাঙ্ক-সমূহ বিন্যস্ত হয়। প্রচলিত অন্যতম বোল হচ্ছে :

১	২	৩		৪	৫	৬		৭	৮	৯	
ধা	তেটে	ধিন	।	ধা	ধা	ধিন	।	তা	তেটে	তিন	।

www.pathagar.com

১০ ১১ ১২
তা তা তিন। এই তালের চলনে ঈষৎ চক্রত্ব আছে। ক.গো.

আড়ঙ/আরং : বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে বা হাটে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান স্থান। দেশীয় শিল্পজাত সামগ্রীই সাধারণত আড়ঙে কেনা-বেচা হয়। বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলাও আড়ঙ বা আরং নামে পরিচিত। ড. শা. আ.

আড়াচৌতাল : চৌদ্দমাত্রায় গঠিত তালের নাম। এই তালের দুই প্রকার প্রকারভেদ প্রচলিত। এক রূপে এই তাল দ্বিমাত্রিক ছন্দে বিভক্ত। তালাঙ্ক সংখ্যা সাত এবং প্রতি অঙ্কে দুটি করে মাত্রা। মাত্রা বিন্যাস হচ্ছে : ১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ | ১১ ১২ | ১৩ ১৪। চারটি তালি ও তিনটি খালি। সম, দ্বিতীয় তাল, ফাঁক, তৃতীয় তাল, ফাঁক, চতুর্থ তাল, ফাঁক—এই ক্রমে তালাঙ্ক বিন্যাস ঘটে। তবলায় বাদনীয় অন্যতম প্রচলিত বোল হচ্ছে :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
ধিন তেরেকেটে। ধিন না। থুন্ না। কৎ তা। তেরেকেটে ধিন। না ধিন। ধিন না

এর পাখোয়াজে বাদনীয় বোল হচ্ছে :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
ধা গে। ধা গে। দেন তা। কৎ তাগে। দেন তা। তেটে কতা। গদি ঘেনে।

আড়া চৌতালের অপর রূপটি হচ্ছে চার তালাঙ্কযুক্ত। প্রথম তালাঙ্ক দুই মাত্রা এবং পরবর্তী তিনটি তালাঙ্কের প্রত্যেকটিতে চারটি করে মাত্রা। মাত্রা বিন্যাস : ১ ২ উ ৩ ৪ ৫ ৬ উ ৭ ৮ ৯ ১০ উ ১১ ১২ ১৩ ১৪ উ এর সবগুলো তালি, খালি বা ফাঁক নেই। সম, দ্বিতীয় তাল তৃতীয় তাল, চতুর্থ তাল—এই ক্রমে তালাঙ্ক বিন্যাসিত হয়। মুখ্যত পাখোয়াজে বাদনীয় এই তালরূপের বোল হচ্ছে : ধা গে উ ধা গে দেন তা উ কৎ তাগে দেন তা উ তেটে কতা গদি ঘেনে উ ধা গে দে তা উ কৎ তাগে দেন তা উ তেটে কতা গদি ঘেনে। ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গ গানে এই তাল প্রযুক্ত হয়। ক.গো.

আড়া ঠেকা : ষোল মাত্রায় গঠিত তালের নাম। এই তালের তালাঙ্ক সংখ্যা চার। প্রতি তালাঙ্ক চার মাত্রায় গঠিত। মাত্রা বিন্যাস দাঁড়ায় : ১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ | তিনটি তালি ও একটি খালি। সম, দ্বিতীয় তাল, ফাঁক, তৃতীয় তাল—এই ক্রমে আড়া ঠেকায় তালাঙ্কসমূহ বিন্যাসিত হয়। আড় বা বক্রগতি সম্পন্ন এই তালের প্রচলিত বোল সমূহের অন্যতম হচ্ছে :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধা ৷ ধা গি। ৷ ঘি তা ৷। কি ৷ তা গি। ৷ ঘি ধা ৷।

অথবা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধা ৷ ক্রেধিন ধা। ৷ ধি ধি না। তা ৷ ক্রেতিন তা। ৷ না ধি না।

টপ্পা ও টপ্পা অঙ্গের গানে এই তাল বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। ক.গো.

আড়ানা : রাত্রি তৃতীয় প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত, শুদ্ধ ও কোমল উভয় নিষাদ প্রযুক্ত হয়। বাকি স্বর শুদ্ধি। আরোহে কোমল গান্ধার বর্জিত। ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। আরোহে ছয় স্বর ও অবরোহে সাত স্বর প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বাকি স্বর পঞ্চম, সংবাদী স্বর তার ষড়জ। কেউ কেউ তার ষড়জকে বাদী মনে করেন। ঠাট আশাবরী। আরোহ : স র ম প দ ন র্স। অবরোহ : র্সন র্সদণ প ম প গ্ম ম র স। ক.গো.

আড়ি : শিশুদের জন্য ফজল-এ-খোদা রচিত ছড়ার বই। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : হাশেম খান। মূল্য : পনের টাকা। একুশটি ছড়া আর হাশেম খানের মনকাড়া ছবি নিয়ে আড়ির প্রকাশ। 'ভাষা' শিরোনামের ছড়াটি ছাড়া বাকি সবগুলো শিশুতোষ। অন্য ছড়াগুলোর শিরোনাম : সবুজ সোনা পিচ্চি মিয়া, কোল বাদুরে ছা, মা মণি, গুলিখেলা, ছত্তর, কুপোকাত, হারুবারুথারু, খেলবে এসো, বাঘের মাথায় ঘড়া, ফ্যাকরা, আড় আড়ি আড়ি, সিধে, শোলক, গাঁ ভূত, আকারি পাকারি, ভাইবোন সমাচার, হলদে পাখির ছা ও ক্ষ্যাপা। সবগুলো ছড়াই শিশু-কিশোরদের মন ভোলানোর জন্য। সবুজ-সোনা কিভাবে ছবি

www.pathagar.com

আঁকে, কোল বাদুর গাছের ডালে কিভাবে ঝুলে থাকে, মামণি খোকনকে কেমন ভালোবাসেন, গ্রামবাংলার পিঠে, মর্জিনার চোর ধরার কাহিনী, ভাইবোনদের কাণ্ড, হলদে পাখির কথা ও ভূতের কাল্পনিক চিত্র এসব ছড়ায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গাঁ নামের একটি ছড়ায় আছে গ্রামের চমৎকার বর্ণনা। হাশেম খানের পাতাভর্তি ছবি আড়ির অঙ্গসৌষ্ঠব সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। প্রচ্ছদপটও সুন্দর। আড়ির উৎসর্গপত্রটিতে রয়েছে একান্নটি নাম। এরা গ্রন্থটি প্রকাশের সময় ছিলো শিশু-কিশোর। উৎসর্গপত্রটির শেষ দুটি লাইন এরকম : তোমরা যারা বিশ্ব করিবে ধন্য বইটি তোমাদের জন্য। খা.বি.জ.উ.

আততায়ীর সূর্যাস্ত : পঞ্চাশের দশকের কবি ফজল শাহাবুদ্দীনের ষষ্ঠ কবিতার বই। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল বাংলা শ্রাবণ ১৩৮২ এবং ইংরেজি জুলাই ১৯৭৫। প্রকাশক গাজি শাহাবুদ্দিন আহমদ, সন্ধানী প্রকাশনী ৪১ নয়াপল্টন ঢাকা-২। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী, মূল্য : সাত টাকা। অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৭০ থেক ১৯৭৩ সাল। উৎসর্গ একাত্তরের বাংলাদেশ। মোট ৪৮টি কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত। একাত্তরের অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ছবি উঠে এসেছে অধিকাংশ কবিতার চিত্রকল্পে। মূর্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্বস্ত মনস্তত্ত্ব। যুদ্ধজয়ের প্রত্যাশা আর শত্রুর অত্যাচারের বীভৎসতা এই দুই অনুভবে আততায়ীর সূর্যাস্ত বইয়ের কবিতাগুলো সিক্ত। প্রেম, শরীরী নারীপ্রেমও উপস্থিত হয়েছে মাঝে মধ্যে। এক কথায় বলতে হয় দেশ, মানুষ, পারিপার্শ্বিকতা, রাজনীতি, সমকালীন মানুষের অন্তর্জ্বালা, তান্ত্রিকতা এবং জগত ও জীবন সম্পর্কে কবির নিজস্ব আশা ও নৈরাশ্য প্রকীর্ণ হয়ে আছে এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলিতে। আ. মা.

আতাউর রহমান : কবি ও গবেষক। বগুড়া জেলার আক্কেলপুর গ্রামে ১৯২৫ সালের ৮ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আলাউদ্দীন সরদার। তিনি বগুড়ার সোনামুখী হাই স্কুল থেকে ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক, বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে আই. এ., কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৯ সালে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। আজীবন অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে ১৯৮৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কবিকণ্ঠ। শোষণহীন সমাজব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কবিতাকে সমকালীন কবিদের কবিতা থেকে ভিন্নতা প্রদান করেছে। আতাউর রহমানের গবেষণার প্রধান বিষয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা। তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলসাহিত্য মূল্যায়ন করেছেন। ফলে ভাবাবেগের আতিশয্য ও তথ্য পরিবেশনার চেয়ে তাঁর সাহিত্যেরই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া উপমহাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নজরুলের সাহিত্যের ভূমিকার বিষয়টিও যথাযথভাবে আতাউর রহমানের গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ—গবেষণা : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৬৩) ; কবি নজরুল (১৯৬৮) ; নজরুল কাব্য সমীক্ষা (১৯৭২) ; নজরুল : ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি (১৯৯৭)। কবিতা : দুই ঋতু (১৯৫৬) ; একদিন প্রতিদিন (১৯৬৫) ; নিষাদ নগরে আছি (১৯৭৭) ; ভালোবাসা চিরশত্রু (১৯৮১) ; ইদানীং রঙ্গমঞ্চ (১৯৯২) ; ভালোবাসা এবং তারপর (১৯৯৩) ; সারাটা জীবন ধরে (১৯৯৪)। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭০) ; নজরুল ইনস্টিটিউট প্রদত্ত নজরুল স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৫) ; শেরেবাংলা জাতীয় পুরস্কার (১৯৮৯) ; নজরুল পুরস্কার (চুরুলিয়া) ইত্যাদি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ১৯৯৯ সালের ২৬ জুন ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। সা. আ.

আতাউর রহমান খান : রজনীতিবিদ ও লেখক। ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের বালিয়া

www.pathagar.com

গ্রামে ১৯০৭ সালের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে বি.এ. অনার্স (অর্থনীতি) ও ১৯৩৬ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন ঢাকায় আওয়ামী লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি (১৯৪৯–১৯৬৪), সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের (৩০ জানুয়ারি ১৯৫২) সদস্য, পুনর্গঠিত রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের (মার্চ ১৯৫২) আহবায়ক, যুক্তফ্রন্টের (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩) যুগ্ম-আহবায়ক (১৯৫৩–১৯৫৫), পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য (১৯৫৪–১৯৫৮), পূর্ববঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী (৩ এপ্রিল–৩০ মে ১৯৫৪), পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য (১৯৫৫–১৯৫৮), পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী দলের নেতা (১৯৫৫–১৯৫৬), পাকিস্তান গণ-পরিষদের বিরোধী দলের উপ-নেতা (১৯৫৫–১৯৫৬), পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬–৭ অক্টোবর ১৯৫৮), ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (এন.ডি.এফ.) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (১৯৬২–১৯৬৯), জাতীয় লীগের (২০ জুলাই ১৯৬৯) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৬৯–১৯৭৫), জাতীয় সংসদের সদস্য (১৯৭৩–১৯৭৫), কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (জুন–আগস্ট ১৯৭৫), পুনর্গঠিত জাতীয় লীগের (১৯৭৬) সভাপতি (১৯৭৬–১৯৮৫), জাতীয় সংসদের সদস্য (১৯৭৯–১৯৮১) ও লেঃ জেঃ হুসেন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী (৩০ মার্চ ১৯৮৪–১ জানুয়ারি ১৯৮৫)। তিনি একজন বিশিষ্ট গদ্য লেখকও। সমকালীন রাজনীতি ও ইতিহাস সেই সঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনায়। ওজারতির দুই বছর (১৯৬৩), স্বৈরাচারের দশ বছর (১৯৬৯), প্রধানমন্ত্রিত্বের নয় মাস (১৯৮৭) ও অবরুদ্ধ নয় মাস (১৯৯০) তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী। ১৯৯১ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় পরলোক গমন করেন। নূ.ই.

আতাহার খান : কবি। তিনি ১৯৫০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম আমজাদ হোসেন খান ও মা আমেনা বেগম। আতাহার খান ফরিদপুর হাই স্কুল থেকে ১৯৬৮ সালে মাধ্যমিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র সরকারি কলেজ থেকে ১৯৭০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ১৯৭৪ সালে স্নাতক এবং ১৯৭৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি 'সাপ্তাহিক পূর্ণিমা' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ —কবিতা : নিহত সূর্যের আকাঙ্ক্ষায় (১৯৭২) শিরস্ত্রাণ খোলো যুবরাজ (১৯৯৭), খোলা দরোজায় (১৯৯৭), এই জলকণা নাও নদী (২০০০)। আতাহার খান সত্তর দশকের কবি। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় প্রেম এবং দেশকাল। ছন্দ-নিপুণ লিরিক কবিতা রচনায় সুদক্ষ। তিনি স্বল্পপ্রজ কবি। সা. আ.

আতোয়ার রহমান : শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও অনুবাদক। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার নওদা ক্ষেমিরদিয়াড় গ্রামে ১৯২৭ সালের ১৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোজাফফর আলী, মা জাছিরুন্নেসা। তিনি ভেড়ামারা-চণ্ডীপুর জে. কে. ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৪৩ সালে ম্যাট্রিক, সিরাজগঞ্জ কলেজ থেকে ১৯৪৫ সালে আই. এ., কলকাতা সিটি কলেজ থেকে ১৯৪৮ সালে বি. কম. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে এম. কম. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের উপপরিচালক পদে চাকরি করেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। লেখক হিসেবে চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকেই তিনি চিন্তাশীল পাঠক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিরামহীনভাবে প্রায় ছয় দশক ধরে সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন। সমাজবাদী লেখক

www.pathagar.com

আতোয়ার রহমান প্রাবন্ধিক ও গবেষক। শিশুসাহিত্যি, গল্প রচনা ও অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্মের মাধ্যমে তিনি তাঁর আলোচিত বিষয়গুলোর ওপর নতুন আলোকপাতের এবং নিজস্ব ও মৌলিক সিদ্ধান্ত দেয়ার চেষ্টা করেছন। শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে শিশুদের আনন্দদানের পাশাপাশি তাদের মানস গঠনের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান লক্ষ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ধ্রুপদী রচনার সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মৌলিক রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা সব মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৭০টি। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : সাহিত্য-সংলাপ (প্রবন্ধ, ১৯৭৫) ; সাহিত্য ও বিবিধ ভাবনা (প্রবন্ধ, ১৯৮১) ; মেলা (প্রবন্ধ, ১৯৮৮) ; নজরুল বর্ণালী (প্রবন্ধ, ১৯৯৪) ; লোককৃতি কথাগুচ্ছ (প্রবন্ধ, ১৯৯৭) ; ক্যান্টারবেরি উপাখ্যান (অনুবাদ, ১৯৯৩), মানুষ চলে সাগরতলে (প্রবন্ধ, ১৯৮১)। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য এ যাবৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারসমূহ : ইউনাইটেড ব্যাংক পুরস্কার (১৯৬৮), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭০), অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৯৭১), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৬), শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১) ও অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৪০২)। সা. আ.

আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী রচিত অত্ম-জীবনীমূলক গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬ সাল। এ পুস্তকে প্রমথ চৌধুরী তাঁর শৈশব জীবন থেকে ইংল্যাণ্ড যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত যশোর, কৃষ্ণনগর ও কলকাতায় অবস্থানকালীন বাল্য ও যৌবনে সংঘটিত কৌতুক-মধুর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থ প্রথম শ্রেণীর আত্মজীবনীর সমগোত্রীয় না হলেও এতে লেখকের বাচন-ভঙ্গির মৌলিকতা এবং মার্জিত পরিহাস-রসিকতা ও শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট। আ.জ.

আত্মকথা (১ম ও ২য় খণ্ড) : অবিভক্ত ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ও পরে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির কমরেড আবদুশ শহীদ এই গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর জন্ম ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, ওই সময়ে রাশিয়ায় সংঘটিত হয় অক্টোবর বিপ্লব। ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম, দেশ-বিভাগ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির চিন্তা ও ভুলভ্রান্তি এবং পরবর্তীকালেও কম্যুনিস্ট পার্টির ভুলগুলো তিনি নিজের কলমে বিস্তারিত লিখেছেন। সাম্প্রদায়িকতা, দেশ-বিভাগের কুফল, নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শীতা সবই অকপটে বলেছেন। তিনি ছিলেন কৃষক ফ্রন্টের কর্মী, পরে তিনি ভাসানীর দলে (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ) চলে যান। তিনি অকপটে বলেছেন আওয়ামী লীগ থেকে ন্যাপের জন্ম হওয়া ছিল ভুল। দুই খণ্ডের আত্মকথায় ইতিহাসের অনেক না-জানা কথা জানা যায়। একজন কমরেডের দৃষ্টিতে দেশ ও পার্টিকে দেখা, বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে কম্যুনিস্ট পার্টির বিবর্তন জানা কৌতূহলোদ্দীপক। লেখক শেষ জীবনে পার্টি ত্যাগ করেন। আত্মকথা প্রথম খণ্ড ১৯১৭-১৯৪৮ পৃষ্ঠা ১৫২, ২য় খণ্ড ১৯৫৫-১৯৭১ পৃষ্ঠা ২৩২। প্রকাশক ১ম খণ্ড : মেঘনা বুকস এন্ড ম্যাগাজিন. ৯/১ রোকনপুর থার্ড লেন, ঢাকা ১০০০। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, মূল্য ৩০.০০ টাকা। ২য় খণ্ডের প্রকাশক বর্ণধারা ১/১ শ্রীশ দাস লেন, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, মূল্য ৬০.০০ টাকা। বি.ব.

আত্মঘাতী বাঙালি : নীরদচন্দ্র চৌধুরী। ইতিহাসধর্মী রচনা। তিনখণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ। নব্বই বছর বয়সে ১৯৮৮ সালে তিনি বইটি লিখতে শুরু করেন। বাঙালির সত্যিকার ইতিহাস লিখেছেন বলে লেখক নিবেদন করেছেন : 'এই বই-এ যাহা লিখিয়াছি, তাহা বানানো ছেঁদো কথা নয়। ইহাতে সত্যকার ইতিহাসের উপর কোন দার্শনিক তত্ত্ব চাপাই

www.pathagar.com

নাই।' ইংরেজ শাসন আমলে ইংরেজের সংশ্রব, ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য চর্চা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭)--বাঙালি মনের নতুন রূপ প্রকাশে কিভাবে প্রভূত প্রভাব ফেলেছে ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বাঙালি জীবনের এই 'রিনেসেস' কে তিনি বলেছেন 'মানসিক রিভল্যুশ্যন।' তিনি বাংলাসাহিত্যের আলোচনা করে দেখিয়েছেন 'এই নতুন জীবনধারা সম্বন্ধে লিবারেল বাঙালি ও কন্‌সারভেটিভ বাঙালির মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ও সমন্বয়ের কথা সেসময় বাঙালির লেখায়/কথায় প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলের সাহিত্য আলোচনা করে লেখক বাঙালির নবজাগরণ, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন ও প্রেম, বিয়ের নতুন বয়স, কিশোরীর প্রেম, সম্বন্ধের বিয়ে ও উত্তররাগ, অসতীত্ব : পুরাতন ও নতুন, নারীর সন্ধানে, ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ে বলেছেন। তাঁর লেখায় তিনি দেখাতে চেয়েছেন বাংলার মানবজীবন ও সভ্যতার ক্ষয় কিভাবে হয়েছে। তিনি আশা করেছেন তাঁর বই বাঙালি জীবনে শুদ্ধি আনবে ও নতুন প্রয়াসের ইচ্ছা জাগবে। তিনি বলেছেন 'বাঙালীর ইতিহাস থাকবে. বাঙালী আবার যদি উন্নত নাও হয়, তাহা লইলেও তাহার সৃষ্ট যে কীর্তি তাহার ঐতিহাসিক সার্থকতা থাকিবে।' ১৮৯৭ সালে ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম। ১৯৭০ সাল থেকে জীবন অবসান পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা করেছেন, অবসর জীবন যাপন করেছেন। তাঁর স্ত্রী অমিয়া চৌধুরানী বইটির পাণ্ডুলিপি স্বহস্তে কপি করে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, কর্তৃক বইটি প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ ২৩ নভেম্বর ১৯৮৮। চতুর্থ মুদ্রণ হয়েছে ১৯৯০ সালে। মা.বে.

আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আত্মজীবনাশ্রিত প্রবন্ধ পুস্তক। প্রকাশকাল ১৯১৮ সাল। তাঁর দীর্ঘ একষট্টি বৎসরের কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র ঘটনা এর বর্ণিত বিষয়। তৎকালীন বাংলার এক গৌরবময় যুগের স্বরূপ বিশ্লেষণে গ্রন্থখানি যথার্থ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর অনাড়ম্বর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার বর্ণনায় তিনি বিন্দুমাত্র সত্যগোপন করেন নি। শিবনাথের আলোচনায় সেকালের বঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলেখ্য মেলে। আ.জ.

আত্মচরিত ও অন্যান্য গল্প : সুব্রত বড়ুয়া। গল্পগ্রন্থ। মূল্য সাদা ৩০.০০ টাকা। লেখক কাগজ ২২.০০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৯৪. প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা। মুক্তধারা ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০। প্রথম প্রকাশ-চৈত্র ১৩৯৪। প্রচ্ছদ হাশেম খান। ষাট দশকের শক্তিশালী কথাশিল্পী সুব্রত বড়ুয়ার মোট সাতটি গল্প এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলো : আত্মচরিত, আলোহাওয়ার রাজ্যে, খোলস, অন্তরাল, বিলয়, ফেরা ও নান্দনিক। মনস্তত্ত্বের চিন্তাজাল বিস্তার তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য। লেখক সাতটি গল্পের প্রায় প্রতিটিতেই মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে উন্মোচিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে প্রতিটি গল্পই নিজস্ব দ্যোতনা নিয়ে পাঠকের মনশ্চক্ষুকে খুলে দিয়েছে। বইয়ের নাম গল্পটি স্বপ্নভঙ্গের যাতনা বিদ্ধ এক মানবের আত্মলাপ। লেখকের রিয়েলিষ্টিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি যাদের জীবনের কোনো আশাই কোনদিন পূর্ণ হয় না। এ গল্পে বিবৃত হয়েছে তেমনি এক মানুষের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। লেখাপড়া শেষ করে জীবন বদলে ফেলার স্বপ্ন যা কোনদিনই পূর্ণতা পেলনা। 'আলো হাওয়ার রাজ্যে' গল্পটি মানুষের অন্তর্গত বেদনা, উপলব্ধি, আশাভঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে এক মনজাগতিক চৈতন্যোদয় চিত্র। 'খোলস' গল্পটিতে পরিবেশ পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় মানুষের চিন্তা, ধ্যান, ধারণা এমনকি

www.pathagar.com

ভালোলাগা পর্যন্ত। লেখক দেখিয়েছেন মানুষ মাত্রই খোলসে আবৃত থাকে আর সুযোগ পেলেই তা বদলে ফেলে। এমন বাস্তব ও পরিমিত বোধসম্পন্ন গল্প পাঠককে ভাবায় এবং শেষাবধি অভিভূত করে। অন্তরাল গল্পটি মনস্তত্ব বিশ্লেষণধর্মী। মানুষের মনের রহস্য যেন অনন্ত। তাই শাহ্‌জাদের মনের রহস্যও অনির্বচনীয়। কিন্তু তারও কোন ইচ্ছাই পূর্ণতা পায়না। দেশপ্রেমের তীব্রতায় সে শেষাবধি অসুখী হয় না। কারাগারে অন্তরীণ সীমার পছন্দের মানুষটির একথা জানার পর সীমার প্রতি তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। ফলে সীমার বুকে গাঁথা কালো ফিতের টুকরোটি অহঙ্কারের প্রকাশ হয়ে ওঠে। 'বিলয়' গল্পের যুবকটি যে কিছুতেই নিজেকে সস্তা করে তুলতে পারে না। কারণ তার ভেতরে আজন্মের সংস্কার জেঁকে বসে আছে। অথচ তার বন্ধুরা কি সহজে শরীরের চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করে! 'ফেরা' গল্পের নিঃসঙ্গ নায়িকা আত্মআবিষ্কার করে নিজেতেই একসময় ফিরে আসে। আর নান্দনিক যে কোনো কিছুই মানুষকে আকর্ষণ করে। যেমন আকর্ষণ করেছেন মিসেস চৌধুরী। মানুষ সুন্দরের পূজারী–-এমন ইঙ্গিত–ময়তার ভেতরে শেষ হয় 'নান্দনিক' গল্পটি। সুব্রত বড়ুয়ার গল্পের ভুবন আমাদের অতিচেনা চারপাশের মধ্যবিত্ত জীবন। এই জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণেই গ্রন্থটি স্বতন্ত্র। পা. র.

আত্মজা ও একটি করবী গাছ : হাসান আজিজুল হকের আটটি গল্পের স্বনির্বাচিত সংকলন। প্রথম প্রকাশ : রাজশাহী, ১৯৬৭ (মিত্রসংঘ)। গল্পগুলোর নাম যথাক্রমে : আত্মজা ও একটি করবী গাছ, পরবাসী, সারাদুপুর, অন্তর্গত নিষাদ, মারী উটপাখি, সুখের সন্ধানে, আমৃত্যু আজীবন। গল্পগুলোর মূল সুর দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের নৈতিক স্খলন, সাম্প্রদায়িকতা, এবং সংশ্লিষ্ট কারণে সৃষ্ট চরম হতাশা ও দারিদ্র্য–পরিস্থিতি। একটি গল্পে মৃত্যুবোধ আক্রান্ত একটি চরিত্রকেও অনুরূপ ঘটনার কার্যকারণে গ্রথিত বলে মনে হয়। কয়েকটি গল্পে সৃষ্ট প্রতীকী ব্যঞ্জনা লেখকের সচেতন দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে করবী গাছটি বিষবৃক্ষের প্রতীক, লেখক যাকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ফসলের সঙ্গে তুলনা করেন। এ গল্পে দেশত্যাগী পিতা কর্তৃক আপন কন্যাকে বারবনিতার পেশায় নামানো, সর্বোপরি তার কন্যার জন্য তথাকথিত ভিন্ন জাতির খদ্দের নির্বাচনের বিষয়টি দ্বিজাতিতত্ত্বের মুখে প্রবল চপেটাঘাতের শামিল। 'পরবাসী' গল্পের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মৃত্যুর টেনায়, 'মারী' গল্পে শরণার্থীদের গণ–বরির চিত্রে, এবং 'আমৃত্যু আজীবন' গল্পের সাপ ও দরিদ্র কৃষকের বজ্রাহত হওয়ার কাহিনীর মধ্যে দেশবিভাগজনিত সংকটের প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে হয়। এছাড়া 'সারাদুপুর' গল্পে এক কিশোরের আত্মহত্যা, 'অন্তর্গত নিষাদ'–এ এক ব্যক্তির আত্মহনন, 'উটপাখি' গল্পে মৃত্যুবোধ আক্রান্ত লেখকের কাহিনী, এবং 'সুখের সন্ধানে গল্পে বেঁচে থাকার ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন নরনারী যে–আবহ সৃষ্টি করে, উক্ত সমাজবাস্তবতায় সেগুলোও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। স্ব. স.

আত্মজীবন চরিত : কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় রচিত একটি আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথামূলক বাংলা পুস্তক। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণ নগরের রাজবংশের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। কৃষ্ণনগর রাজের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্ররায় তাঁর রচিত জীবনচরিতে প্রায় দেড়শতাধিক বৎসর আগের সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিবৃতপ্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরের রাজ–বংশের ইতিকথা বর্ণনা করেছেন। রাজবংশ ও তৎকালীন সমাজ জীবনের নানা দিকের উদঘাটনে কার্তিকেয় চন্দ্রের 'আত্মজীবন চরিত' একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। যেমন ১৮৪৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হলেও রাজপরিবারের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বিধা–সঙ্কোচ ছিল। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র ক্ষিতীশবংশাবলী নামে কৃষ্ণনগর

www.pathagar.com

রাজবংশের ইতিহাসও রচনা করেন, তাঁর অন্য গ্রন্থ হচ্ছে 'গীতমঞ্জরী। মু.আ.জ.

আত্মজীবনী/আত্মচরিত : কোনো ব্যক্তি যখন নিজের ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী লিখিতভাবে প্রকাশ করেন তখন সেই রচনাকে আত্মজীবনী বা আত্মচরিত বলা হয়। আত্মজীবনী কেবল চরিতাকারের বহির্জীবনের প্রতিফলনই নয়, তাঁর অন্তর্জীবনের সত্যও তাতে যথাসম্ভব প্রতিফলিত হয়। জীবনীকার একই সঙ্গে দ্রষ্টা এবং স্রষ্টার ভূমিকা এতে পালন করে থাকেন। তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিবলে নিজের জীবনের পূর্বকথা যথাযথ বিবৃত করাই আত্মজীবনীকারের দায়িত্ব। আত্মচরিতে জীবনের বলার মতো ঘটনাই কেবল মন্তব্য বর্ণিত হয়। জীবনের সত্যকে পরিবর্তিত বা বিকৃত রূপে বিবৃত করলে আত্মজীবনীকারের গ্রন্থ আকর্ষণ ও গুরুত্ব হারায়। প্রকৃত জীবনীতে আত্মজীবনীকারকে তাঁর নিজের মর্যাদাহানিকর ঘটনাবলীকেও নিরঙ্কুশভাবে তুলে ধরতে হয়। তবে সব ক্ষেত্রেই পরিমিতিবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়। যথার্থ আত্মজীবনীতে জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্য পরিপূর্ণ প্রাণরসে উচ্ছলিত হয়ে বাণীরূপ লাভ করে। ইংরেজিতে St. Augustine-এর Confessions, Rousseau-এর Confessions, Edward Gibbon-এর Autobiography, Davies-এর Autobiography of a Super-Tramp ও Mahatma Gandhi-এর My Experiments with Truth এবং বাংলায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনী', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' এবং সজনীকান্ত দাসের 'আত্মচরিত' আত্মজীবনীমূলক রচনা হিসেবে আদৃত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত কিংবা প্রমথ চৌধুরীর আত্মচরিত বহুলাংশে স্মৃতিকথার টুকরো ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আ.ই.

আত্মতত্ত্ববিদ্যা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দর্শন সংক্রান্ত প্রবন্ধ পুস্তক। প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় : শঙ্কর বেদান্ত দর্শনজাত মতবাদ খণ্ডন এবং জড় পদার্থ ও জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকার করেও পরমাত্মার পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে মতবাদ প্রতিষ্ঠা। দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা প্রাঞ্জল ও গদ্য শিল্পকলামণ্ডিত। নিরস তত্ত্ববিচারেও তিনি সাহিত্যরসের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। নিছক ভাবাবেগের দ্বারাও তিনি পরিচালিত হননি। আ. জ.

আত্মপ্রকাশ—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : প্রকাশকাল ১৯৬৬। বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে বিশ্বের সামগ্রিক রূপান্তরের পটভূমিতে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শুরু হয় রূপান্তরের প্রক্রিয়া। তদুপরি ইংরেজ সরকারের শোষণ, স্বাধীনতা আন্দোলন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, বেকার সমস্যা প্রভৃতি উপসর্গ সমাজ জীবনে ভাঙনের পটভূমি তৈরি করে। স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আরও বহুমুখী সমস্যায় সামাজিক বিপর্যয় ক্রমাগত বাড়তে থাকে। সামাজিক জীবনের অবক্ষয় ব্যক্তিজীবনকে করে তোলে হতাশাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত ও নেতিবাদী। এক অবক্ষয়িত সমাজের বিভ্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত ও সমাজবিচ্ছিন্ন কয়েকজন তরুণের উদ্ভট, খাপছাড়া আর সামঞ্জস্যহীন জীবনযাপনের চিত্র আত্মপ্রকাশ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। সুনীল, শেখর, তাপস, অবিনাশ, সুবিমল, পরীক্ষিৎ—এরা সবাই আধুনিক যুগের সন্তান। সুবিমল ছাড়া বাকিরা কোনো না কোনো চাকরি করে। তবু তারা পরিবার বা সমাজের কোথাও স্থিত হতে পারে না। সমাজের নিয়মনীতিকে পরোয়া করে না। এদের জীবনে গতি আছে, কিন্তু গন্তব্য নেই। এরা হতাশাগ্রস্ত ও লক্ষ্যহীন। চালচলন খাপছাড়া। জীবনের একঘেয়েমী কাটানোর জন্য এই তরুণেরা নিয়ম ভেঙে চলে। জীবনকে জানার ও চেনার জন্য তারা সারারাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকতে পারে, কলকাতার ভদ্র এলাকা থেকে বস্তি পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। বৌবাজারের নিচু পাড়া, জুয়ার আড্ডা, গাঁজার আখড়া, এমনকি নিমতলা শ্মশানে

www.pathagar.com

ভিখিরিদের সঙ্গে কাটাতেও এদের বাধে না। শেখর কেন বাড়ির কাউকে না জানিয়ে অন্য জায়গায় রাত কাটায়, তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মদের পয়সা জোটাবার জন্য ছয় বন্ধু ভিখিরি সেজে এসপ্ল্যানেডের ট্রাফিক মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্যাক্‌সি যাত্রীদের কাছে হাত পাততে পারে। এতে তাদের কোনো সংকোচ হয় না। এ উপন্যাসের নায়ক সুনীল ছন্নছাড়া কলকাতা শহরের পার্ক স্ট্রীট থেকে শুরু করে হাওড়া ব্রীজের নিচে জুয়ার আড্ডা পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করে। অথচ তার মধ্যেও ছিল জীবনের সুস্থতার বোধ। সেও চেয়েছিল একটা সুস্থ, সুন্দর জীবন। একবার এক বিয়ে বাড়িতে একটি কিশোরী মেয়েকে দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়। মেয়েটির মধ্যে সে লক্ষ করেছে 'সরল বিস্ময়ভরা জীনের পবিত্র রং'। জীবনের প্রতি ইতিবাচক বোধ থেকে সে বন্ধুদের এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। অতিক্রম করতে চেয়েছে অতীত জীবনের গ্লানিকে। মনীষাকে ভালবেসে সুনীল সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মনীষা তাকে সে সুযোগ দেয় নি। একটি সুন্দর নারীর মধ্যে সে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল এক সর্বজনীন নারীরূপকে। কিন্তু দু'বারই সে ব্যর্থ হয়। একদিন সে মা-বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিল। অনেকদিন পর তাদের জন্য তার কষ্ট হয়। রাতের অন্ধকারে পাশের খাটে শুয়ে থাকা বাবাকে খুব নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত ও অসহায় মনে হয়। এতদিন পর সে বাবার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক অনুভব করে। বাবার অসুস্থতার সময় পরিচর্যার জন্য তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেও সে কাছে যেতে পারে না। কারণ শৈশব থেকে যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে, তা আর অতিক্রম করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসের যেসব তরুণ এক নেশা থেকে অন্য নেশায় মেতে উঠে জীবনকে বদলাতে চেয়েছে, তাদের প্রত্যেকের ভিতরে অন্য একটি মানুষ লুকিয়ে ছিল। সে মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাশী। বেকার সুবিমল সারাদিনের মধ্যে একটি ভাল কাজ করবার জন্য নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কলকাতার রাস্তায় মিছিল ও ভীড়ের মধ্যে একটি অন্ধলোককে রাস্তা পার হতে সাহায্য করে সে আত্মপ্রতিশ্রুতি পালন করে। অথচ তবু এই তরুণেরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না। চারপাশের জীবন ও সমাজ থেকে তারা এতটাই দূরে সরে গেছে যে, নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট চেতনাও তাদের মধ্যে আর জেগে ওঠে না। ঘুণে ধরা সমাজকে বদলাবার শক্তি ও সাহস ওরা আর ফিরে পায় না। ফলে সমাজজীবনে ওরা 'আগন্তুক' হয়েই বেঁচে থাকে এবং ক্রমশ আরও বেশি আত্মকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ড. শা. আ.

আত্মশক্তি : ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক। শুক্রবার ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩, ৪ঠা মার্চ ১৯২৭, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। মূল্য : এক আনা। পত্র সংখ্যা ২০, উল্লেখযোগ্য রচনা—(১) চলতি পথে সরকারের কর্তব্যপ্রিয়তা (২) ভূত ও সরিষা-শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) যৌবন ও ভবিষ্যৎ জাতি-গঠন। (৪) বর্তমান জগৎ-শ্রী প্রমোদকুমার সেন (৫) কৃষি ও বাণিজ্য—শ্রী শরৎচন্দ্র বসু (৬) বেকার সমস্যা-শ্রী হৃষীকেশ সেন। সমকালীন বাঙলার রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এ পত্রিকার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাই ছিলেন সাধারণত এ পত্রিকার লেখক। আ. জ.

আত্মস্মৃতি : আবু জাফর শামসুদ্দীনের আত্মজীবনী। প্রথম খণ্ডের প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৮৯ (আহমেদ পারভেয শামসুদ্দীন)। চার শতাধিক পৃষ্ঠার বইটি ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে লেখক তাঁর শৈশব থেকে ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গ এতে অন্তর্ভুক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে অঙ্কিত হয়েছে জন্মস্থান গাজীপুরের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজ, পাশাপাশি তৎকালীন ঢাকা শহরের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা। "বৃহত্তর ভারত" শীর্ষক ২য় পরিচ্ছেদে কর্মজীবন ও

www.pathagar.com

ভ্রমণসূত্রে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গ্রন্থকারের চাক্ষুষ পরিচয়ের প্রতিফলন ঘটে। সমকালীন রাজনীতি এ পরিচ্ছদের বিশেষ আলোচ্য। সমকালীন রাজনীতিতে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উত্থান, বিকাশ ও পরিণতি এবং একই সঙ্গে বাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সম্পর্কিত বহু খবর ও ভাষ্য সন্নিবেশিত আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং আসামের "বাঙাল-খেদা" আন্দোলনের বিষয় প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়। ৩য় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ভাসানীর কাগমারি সম্মেলন প্রভৃতি। নৈরাশ্যবাদী চোখে অবলোকন করেছেন ষাটের দশকের সামরিক শাসনকে। তাতে আলোচিত হয়েছে আইউবের উত্থান, সোহরাওয়ার্দীর বিদায়, মৌলিক গণতন্ত্র, চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাসানীর পথবদল, পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, স্বৈরাচারী আইউবের পতন-লক্ষণ প্রভৃতি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রসঙ্গ শুরু হতে না হতেই বইটির প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে। মওলানা আকরাম খাঁ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ সম্পর্কে নেতিবাচক ও তির্যক মন্তব্য লেখকের মনোলোককে বুঝতে সাহায্য করে। নিজের ব্যাপারেও লেখককে যথেষ্ট কঠোর মন্তব্য করতে দেখা যায়। প্রী. মি.

আত্মহত্যার অধিকার : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' গল্পগ্রন্থের অন্যতম বিখ্যাত গল্প। একটি দরিদ্র পরিবারের লাঞ্ছিত জীবনকাহিনী এই গল্পের উপজীব্য। মানুষ ও বিধাতার প্রতি নিস্ফল আক্রোশ গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবধারায় তির্যক রেখায় ফুটে উঠেছে। নীলমণির ঘরের ফুটো চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি অবিরত ঝরে পড়ছে। সেই ভাঙা ঘরে যখন মাথা বাঁচাবার উপায় আর থাকছে না, তখন তার অসুস্থ স্ত্রী-পুত্র, কন্যার পানে তাকিয়ে সে ভাবছে এ বৈষম্যের জগতে বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা এবং অনাবশ্যকও বটে। বাড়ি থেকে সে বেড়িয়ে পড়ে, তবু তাকে এতটুকু আশ্রয়ের আশায় সরকার-বাড়ির বন্ধ দরজায় ঘা মারতে হয়। সেখানেও সে দেখতে পায় রোগযন্ত্রণা ও মৃত্যুকামনায় অস্থির সরকার বাড়ির ধনী এক বৃদ্ধ আত্মীয়। এদিকে নীলমণির উদ্ভিন্ন যৌবনা মেয়ে শ্যামার পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন, তার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। পেটের ক্ষুধায় তার কান্না পায়, অথচ জীবনের রস আস্বাদন থেকে সেও বঞ্চিত হতে চায় না। লেখকের ভাব পরিকল্পনায় এই অসমবিন্যস্ত জগৎ ও জীবনে সকলেই অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত। এ জগতে কেউ সুখী ও সুস্থ নয়। বিধাতার সৃষ্টির অসমতার প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানী দৃষ্টি এখানে বক্র ও ব্যঙ্গাত্মক শিল্পরীতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। আ. ই.

আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিত-মালা : প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রচিত শিশু ও কিশোরপাঠ্য পুস্তক। প্রকাশকাল ১৮৮৩ সাল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখককে এ পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন। দেশী আধুনিক মহৎ ব্যক্তির অভাবে সে সময় জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে লেখকগণ ইউরোপের বিশেষ করে ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনকে অবলম্বন করতেন। 'পাঠক, চল একবার শ্বেত দ্বীপে যাই।' (জন হ্যামডেন)—এইভাবে পাঠককে সম্বোধন করে লেখার রীতিও সেকালে অভিনব এবং এই রীতি-সৃষ্টি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের একান্তই নিজস্ব। আ. ই.

আদব : অর্থ শিষ্টাচার, অপরের সাথে বিবেচনার সহিত আচরণ করা, এবং নৈতিকতা। নবী করিম (দঃ) বলেছেন, 'ভাল আচরণ ইমানের অঙ্গ'। সকল অবস্থায় সঠিক ও সুন্দরভাবে সুরুচির সাথে পার্থিব ও ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনাকে আদব বলা হয়। সুশিক্ষা পারিবারিকভাবে

www.pathagar.com

ও সামাজিক দিক থেকে মুসলমানদের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও মহৎ চরিত্রের প্রেরণা দান করে ও শৃঙখলার সাথে মহৎ ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্ম দেয়। নবী করিম (দঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যাঁদেরকে ভালবাসেন তাঁদের লক্ষণ এই যে তাঁরা আদব পালন করেন।' আ.সৈ.গো.দ.

আদবনের নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ : আদবন তামিল ভাষার লেখক। সংকলক ইন্দিরা পার্থসারথী। তিনি বইয়ের গল্প ও লেখক সম্পর্কে একটি ভূমিকা লিখেছেন। অনুবাদ করেছেন কে. এস. কৃষ্ণমূর্তি। আদবন তাঁর 'আগে রাত আসে' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ক্ষণগুলোকে ভালভাবে উপভোগ করতে চাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, চাই একাকিত্ব। জীবন প্রবাহের কোলাহল ও গতিময়তার মধ্যে গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্ভব নয়। সেই জন্যই এই শিবিরগুলি। এগুলিতে বসে বসে আমরা শান্ত মনে ঢিমে তালে জীবনের সূক্ষ্ম অংশগুলিকে উপভোগ করতে পারি, জীবনের আনন্দ ও আয়াসের সমন্বয় ঘটিয়ে তার মধ্যে এক রকম সঙ্গীতের আমেজ অনুভব করতে পারি ...।' ছোটগল্পকে তিনি শিবির বলেছেন। আদবন ছেলেবেলা থেকে দিল্লিবাসী, তবুও তিনি নিজের ভাষায় গল্প লেখেন। এই বইয়ের গল্পগুলো হল—'আগে রাত আসে', 'তৃতীয় জন', 'গর্ভাশয়', 'ছায়া', 'রবিবার, বড় শহর ও ঘরের মধ্যে একটি যুবক', 'ফরসা, লম্বা, গোফ নেই...', 'পায়ের ব্যাথা', 'একজন প্রাচীন বৃদ্ধ এবং একটি নতুন পৃথিবী', 'আপার বার্থ', 'একটি আত্মহত্যা', 'ইন্টারভিউ', 'মরা মানুষ'। 'আদবনের সব গল্পেই এক রকম হতাশার ফল্গুধারা দেখা যায়। ... তবে আদবনের প্রত্যেকটি গল্প মানুষের মনের গভীরে যাত্রা। এই যাত্রার ফলে যে মূল্যবোধের জন্ম নেয় সে যুগের নিরিখে বহির্জগতের ঘটনাগুলোকে যাচাই করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আদবন রায় দেন না। তিনি কোমলভাবে সম্পূর্ণ হালকা শৈলীতে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপন করেন। এটাই তাঁর রচনার কৃতিত্ব।' প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি। প্রকাশকাল : ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৩২, মূল্য : ২৮ রুপি। বি. ব.

আদম : মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ) আল্লাহর প্রথম সৃষ্ট মানুষ। পৃথিবীতে তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি , যাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে আল্লাহ নিজ হাতে তাঁর মাঝে রুহ বা আত্মা ফুঁকে দেন। এ মর্যাদা দেওয়ার পর আল্লাহ শয়তানকে আদেশ করেন আদম (আঃ) কে সেজদা করতে। শয়তান আগুনের সৃষ্ট বলে অহঙ্কার করে মাটির সৃষ্ট আদম (আঃ) কে সেজদা করতে অস্বীকার করে জান্নাত হতে বিতাড়িত হয়। আদম (আঃ) প্রথমে তাঁর সঙ্গিনী হাওয়া (আঃ)-এর সাথে জান্নাতে বসবাস করতেন। শয়তানের প্ররোচনায় তাঁরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন। এরপর শাস্তিস্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরিত হন। আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছিলেন যা ফেরেস্তারাও জানত না। তাঁরা উভয়ে তওবা করেন ও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। আল্লাহর একমাত্র উপাস্য হওয়ার সাক্ষী দিয়ে তাঁরা আল্লাহর নিকট মার্জনা লাভ করেন। আ.সৈ.গো.দ.

আদর সিংহাসন : বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের নববধূদের একটি ব্রত। শ্বশুর বাড়িতে আদরিণী হওয়ার জন্য এই ব্রত তারা পালন করে। এ উপলক্ষে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে একজন সুভগা নারী ও একজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে ভাল খাবার দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হয়। ব্রতচারিণী বধূর সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের নতুন বস্ত্রও উপহার দেওয়া হয়। এই ব্রত তিন বছর ধরে পালন করার পর চতুর্থ বছরের বৈশাখ সংক্রান্তিতে তা সম্পূর্ণ হয়। ড. শা. আ.

আদরিণী : মহস্থবির জাতক খ্যাত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী রচিত গল্প। লেখকের 'বাজীকর' (১৯২২) গল্পগ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অসাধারণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

www.pathagar.com

এ গল্পের কাহিনী পরিকল্পনা করেছেন। পিতৃমাতৃহীন আদরিণী নিজের ভাইকে মানুষ করার জন্য উপায়ন্তর না দেখে বারবণিতার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ভাই কিন্তু মানুষ হলো না। বাড়িওয়ালী নিস্তারিণীর নির্দয় অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এরূপ নিম্নস্তরের কুৎসিত জীবন ব্রাহ্মণকন্যা আদরিণী মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য! সেই জীবনের পথই তাকে বেছে নিতে হয়। শেষ পর্যন্ত হাড়ীদের ছেলে হেমাকে বিয়ে করে সে মেথরানীর কাজ নিয়ে চলে যায়। বাস্তবজীবনে একজন দেহোপজীবিনী হলেও আদরিণীর মধ্যে লেখক এক মহীয়সী নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। বাস্তবজীবনে সে নিঃস্ব, অথচ মানসজীবনে তার স্নেহমমতা ও দান-ধ্যানের সীমা নেই। দুঃখীর প্রতি সে পরম করুণাময়ী নারী। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত সে দেহ বিক্রি করে জীবিকার উপায় করে, কিন্তু মনের জগতে সে সীতা-সাবিত্রীর মতোই পবিত্র। মানবিক দৃষ্টিশক্তি বলে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর গল্পে আশ্চর্য জীবন্ত চরিত্র অঙ্কন করার কলাকৌশল দেখিয়েছেন। ম. চৌ.

আদর্শ হিন্দু হোটেল : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অন্যতম উপন্যাস। পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে হেমেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় মাঘ ১৩৪৫-ভাদ্র-১৩৪৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ আশ্বিন-১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। রানাঘাটে হোটেল পরিচালনার কাহিনীকে এ উপন্যাসে রূপ দেয়া হয়েছে। আদর্শ হিন্দু হোটেলের প্রধান চরিত্র হাজারি ঠাকুর বিভূতিভূষণের বাস্তব-অভিজ্ঞতার মানুষ। হাজারির অপূর্ণ স্বাদ ও আকাঙ্ক্ষাকেই উপন্যাসে রূপদানের প্রয়াস আছে। তার অদৃষ্টে অপ্রত্যাশিতভাবে দৈবের প্রসাদ লাভ সম্ভব হয়েছে। একটানা সেই ভাগ্যের স্রোতে তার জীবনতরী একদিন সাফল্যের বন্দরে নোঙর করে। নিজের রন্ধন পটুতা ও সততার জোরেই সে জীবনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু হাজারি হোটেল-ব্যবসায়ে নিজের সাফল্যকে গর্বোদ্ধত অহমিকায় গ্রহণ করেনি। তার এই ভাগ্যকে সে যেন অন্যের সঙ্গে বন্টন করে নিতে উৎসুক। পদ্মঝির মতো দুর্দান্ত ও দজ্জাল মেয়েলোককেও সে সহানুভূতি ও সমমর্মিতাগুণে জয় করতে পেরেছে। সারাজীবন যে হাজারিকে মিথ্যা দোষারূপ করেছে, কটুভাষণ করেছে, চোর-ছ্যাঁচোড় বলতেও বাদ রাখেনি, সেও শেষ পর্যন্ত হাজারির উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তার পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করে। অথচ এমন একদিন গেছে যখন চূনী নদীর ধারে চোখ মেলে বসে থেকে হাজারি দৈনন্দিন জীবনের শ্রম ও অপমান থেকে মুক্ত হতো। কুসুম হাজারির কন্যাস্থানীয় হয়ে তার অনেক মমতা ও ভালোবাসা পেয়েছে। নতুন পাড়ার গোয়ালা বউটিও পিতৃপ্রতিম হাজারি ঠাকুরকে গোপনে নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বিশ্বাস করেছে। এড়াশোলা গ্রামের জমিদার হরিচরণ বাবুর বাড়ির বর্ণনা উপন্যাসের কাহিনী-বহির্ভূত হলেও তাতে পল্লীজীবনের একটি নিঁখুত চিত্র পাওয়া যায়। আ. জ.

আদায়ের ইতিহাস : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অস্থির মতি, বিকারগ্রস্ত এক যুবকের কাহিনী। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭ সাল। ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক ত্রিষ্টুপের একদিন মনে হলো জীবনে তার উচ্চাশা থাকলেও সেই উচ্চাশা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। পাড়ার মনীশদা এবং তার বোন রমলা ও রমলার স্বামী ধীরেনকে দেখে তার মনে হয় তারা বড়ো সুখী। চারদিকে মানুষের দুঃখ ও জীবনের অপচয় দেখে ত্রিষ্টুপ জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানি ধীরেন ও রমলার সুখের সংসার দেখে তার চিন্তাধারায় সন্দেহ আসে। রমলার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ত্রিষ্টুপ বুঝতে পারে জীবনকে রমলা শ্রদ্ধা করে। জীবনের প্রতীক মানুষকে সে সম্মানের চোখে দেখে। দেহবেচা এক মেয়ে-মানুষের বাড়িতে রাত কাটিয়ে এসে ত্রিষ্টুপের ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা হয়। এই ধরনের ফূর্তিকে তার মনে

www.pathagar.com

হলো মানুষের বিকৃত রুচির সখ। ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখময় করবার মানসে এরপর সে মনীশের কাছে কুন্তলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু মনীশ কিংবা কুন্তলা কেউ তাতে রাজি হয় না। ত্রিষ্টুপ ক্রুদ্ধ হয়ে কুন্তলাকে নষ্ট করতে চায়। স্বাধীনতার জন্য যে জীবনাদর্শ, কুন্তলা তাকে ভালোবাসে। ত্রিষ্টুপের মধ্যে তার একান্ত অভাব। সুতরাং কুন্তলা আর তার জীবনের ছক এক নয়। শেষ পর্যন্ত ত্রিষ্টুপ বুঝতে পারে সে বিকারগ্রস্ত এক অস্বাভাবিক যুবক। কুন্তলা এবং ত্রিষ্টুপ পরস্পরের ব্যবধানের স্বীকৃতি আদায় করে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটায়। আ. ই

আদা-হলুদ : হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের সধবা অবস্থায় দীর্ঘ সময় জীবনযাপনের কামনায় এ আচারটি পালন করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস ধরে একজন সুভগা বা সৌভাগ্যবতী সধবা নারীকে প্রতিদিন পাঁচ টুকরো আদা, পাঁচ টুকরো হলুদ, এক মুঠো ধানে, মিষ্টি ও একটি পয়সা দিতে হয়। এক নাগাড়ে চার বছর এই আচার পালন করার পর আদা-হলুদ অনুষ্ঠান শেষ হয়। ড. শা. আ.

আদিগন্ত : সরদার জয়েনউদ্দীন রচিত উপন্যাস। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। এতে সরলা (সারদা ও নরোত্তম বোরেগীর পালিতা কন্যা) ও মেহের বয়াতীর প্রেমের কাহিনী বর্ণনার ভেতর দিয়ে পল্লী সমাজের জটগুলো অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামের প্রেসিডেন্ট পীর খোরশেদ আলী তাদের প্রেম সার্থকতা লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমান যুবার সঙ্গে বৈষ্ণব-কন্যার প্রেম ধর্ম ও সমাজ বিধির পরিপন্থী,--এদোহাই দিয়ে সে নরোত্তমকে জ্বালাতন এবং সরলা ও মেহেরের বিরুদ্ধে কুৎসিত কুৎসা রটনা করে। অথচ সে নিজেই প্রলোভন দেখিয়ে সরলার দেহ ভোগ করতে চায় এবং মেহের ও সরলার সর্বনাশসাধন করতে ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করে। তার চাপের মুখে নরোত্তম কুন্ডুল বোরেগীর সঙ্গে কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিয়ের রাতে পীর খোরশেদ আলী বরকে কৌশলে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের সকল রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। মেহের জেল থেকে মুক্তি লাভ করে। মিথ্যা মামলায় মেহেরের জেল হয়, পরে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পায় এবং মেহের মুক্তি পায়। নূ. ই

আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি : শামসুর রাহমানের নবম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৪। প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী। ৪১, নয়া পল্টন, ঢাকা ২। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : সাত টাকা। ৪৬টি কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর মতো এই সংকলনের কবিতাগুলোতেও আছে স্বপ্নলোক, প্রতিবেশ ও সমকালের অন্তর্গত নানা অনুষঙ্গ ; নিঃসঙ্গতা, ব্যর্থতা, যুদ্ধোত্তর হতাশা, ক্লান্তি ইত্যাদি ঘুরেফিরে এসেছে। নিজের কবিতা বিষয়েও আছে চারটি কবিতা। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থে তিনি যে স্বকীয় কাব্য আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এ গ্রন্থের কবিতাগুলা সে আবহেরই সম্প্রসারণ। নতুন কোনো বাঁকবদলের ইঙ্গিত এখানে নেই। শামসুর রাহমান ছন্দ সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোতে। এই বইও ব্যতিক্রম নয়। টানা গদ্যে লেখা কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের নিপুণ ব্যবহার। বাংলার জনজীবনে পূর্ববর্তী বছরগুলোর ঘটনাবলি নানাভাবে প্রাণিত করেছে তাঁকে। সে পরিচয়ও এতে আছে। আ. মা.

আদিগন্ত রোদের তিমির : মাহবুব সাদিক রচিত কাব্যগ্রন্থ। রোমান্টিক ভাবুলতা, সামাজিক বৈপরীত্য, স্মৃতিকাতরতা, কখনো কখনো প্রেম, প্রণয় এবং জীবন ও যৌবনের অতিক্রান্ত মায়া হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার বিষয়। কোনো কোনো কবিতায় আবেগের অতিরেক চোখে পড়লেও প্রায় কবিতায় রূপময় শিল্প সৌকর্য প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ধরা পড়ে। যেমন— '...হয়তো কোনো ফাগুন দিনে/উড়বে আমার বায়ুতরীর ধবল ডানা—/সঙ্গে যাবে হলুদ নারী, হলুদ শাড়ি/নকশি পাড়ে প্রকৃত এক হলুদ

www.pathagar.com

নারী/সেও তো ভারি প্রাণ কেড়ে নেয়—আমারই প্রাণ, বরং থাকি মধ্যখানে যুগলে মুখে/তাঁতীর পাড়ে এবং দূরের শিল্পভাষায় (জেনাস)। আদিগন্ত রোদের তিমির কাব্যগ্রন্থে রয়েছে ৩৬টি কবিতা। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে : দিব্য প্রকাশ। প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৫। কাব্যগ্রন্থটি বর্তমান কবির 'কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। মা. আ.

আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য : আবদুস্ সাত্তার রচিত দুই পর্বে বিভক্ত একটি অখণ্ড গ্রন্থ। প্রথম পর্বে আদিবাসী জীবন প্রণালী, ধর্মীয় বিশ্বাস, পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা, নারী পুরুষের বিবাহ পূর্ব ও বিবাহত্তোর যৌন সম্পর্ক, বিবাহিত ও কুমারী মেয়েদের গর্ভসঞ্চার, গর্ভবতী নারীকেন্দ্রীক উৎসব, লিঙ্গ পূজা, এরকম একশত ছেচল্লিশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে লেখক আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংজ্ঞা, ভাষা, তত্ত্ব কাহিনী, পুরাকাহিনী, রূপকথা, উপকথা, সংগীত, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধাঁ, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেব-দেবী রহস্য অপশক্তিতে বিশ্বাসসহ মোট সাতাত্তরটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখকের গভীর অধ্যয়ন এবং সেই সাথে নিজের দীর্ঘ দিনের পর্যবেক্ষণকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে যুক্ত করায় গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া বাংলাদেশের আদিবাসী নয়, লেখক পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের সামাজিক প্রথা ও জীবনাচরণের উদাহরণ দিয়ে গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যগুলো সমৃদ্ধ করেছেন। চারশত ষোল পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি কলেবরে কিছুটা বৃহৎ হলেও তথ্য, তত্ত্ব ও সহজ ভাষায় বিশ্লেষণের কারণে কৌতূহলী পাঠক ও গবেষক উভয়ের কাছে এটি একটি সহায়ক গ্রন্থ হওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে জুন ১৯৭৮ সালে। প্রকাশক বাংলা একাডেমী। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বীরেন সান্যাল। মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা। মা. আ.

আদি-বুদ্ধ—ড. কানাইলাল হাজারা : আদি-বুদ্ধের পরিচয় দেয়াই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলেও মহাযানী দেব-দেবীদের উৎপত্তি এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মে তাঁদের প্রভাব নিয়ে এতে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ধ্যানী বুদ্ধগণ, ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ এবং মানুষী-বুদ্ধগণের মধ্যে পরস্পরের কী সম্পর্ক তা এতে পরিস্ফুট হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যাঁদের বিশেষ জানা নেই, তাঁরা বুদ্ধ বলতে শুধু গৌতম বুদ্ধকেই জানেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ ছাড়াও আরও যে অনেক বুদ্ধ অতীতে বিভিন্ন কল্পে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতেও যে 'মৈত্রেয়' নামক বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন—এসব বিষয় অনেকের জানা নেই। এই গ্রন্থ পাঠে তা জানা যাবে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ পাঠক ও গবেষক সকলেই এই বই-পড়ে উপকৃত হবেন। বি. বি.

আদিম অরণ্যে এক রাত্রি : হুমায়ুন কাদির। বইটি প্রকাশ করেছেন হেনা কবির। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭০। মানুষের অবচেতন মনের নানা অচেনা প্রবৃত্তি ও তার বিচিত্র প্রকাশ, মনোজাগতিক বিভিন্ন বিষয়, সামাজিক জটিলতা, প্রেম, বাৎসল্য ইত্যাদিকে বিষয়বস্তু করে লেখা ছোটগল্পের বই। এতে মোট পনেরোটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো হচ্ছে : রঙমহল, আশ্চর্য প্রতিমা, আদিম অরণ্যে একরাত্রি, কানামাছি, মায়ামৃগ, শামুক, রূপসী, ঝরাপালক, তারার তিমির, ওরে বিহঙ্গ, দেয়াল, রোগ, সৈকত, শেষ অঙ্কে নায়িকা, সবাই যেমন বাঁচে। প্রথম গল্প 'রঙমহল'-এ এক ক্ষয়িষ্ণু নবাব পরিবারের ক'জন সদস্যের বর্তমান জীবনের দীনতা, অতীত সুখের স্বপ্নচারিতা, মোহ ও অহংসর্বস্ব বিলাসচিন্তার পাশাপাশি জীর্ণ বাস্তবতার চিত্র রয়েছে—কিন্তু সমস্ত দৈন্যের পরেও পারিবারিক 'ইজ্জত' বা আত্মসম্মানের তীব্রবোধ যা মৃত্যুর বিনিময়েও পরাভূত নয়, তাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'আশ্চর্য প্রতিমা' গল্পে বঞ্চিত মানবমনের

www.pathagar.com

কাছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফিরে পাওয়া পূর্বপ্রেমের মূল্যহীনতা ও সারশূন্যতা প্রতিভাত, এমনকি সেই আস্থাহীনতা এক পর্যায়ে প্রেমিককে হন্তারকে পরিণত করেছে। নামগল্প 'আদিম অরণ্যে একরাত্রি'-তে মানুষের অবদমিত অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও তা বহিঃপ্রকাশের ফলে উদ্ভূত অনিবার্য বাস্তবতার শিকার মূলচরিত্র করিমউল্লাহ। কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র ফুলবানু বা ফুলি ও মিন্নাত দর্জির গোপন প্রেম, কয়েকটি দোকান নিয়ে গড়ে ওঠা ক'জন পেশাজীবীর জীবন-বৈচিত্র্য এ গল্পে সার্থকভাবে চিত্রায়িত। 'কানামাছি' ও 'মায়ামৃগ' গল্প দু'টোর মূল বিষয় প্রেম, তবে মায়ামৃগ গল্পে মিলনান্তক প্রেমের সংকীর্ণতার কাছে উদার বাৎসল্য কতোটা অসহায় সে চিত্র উৎকীর্ণ। শামুক গল্পের অবচেতন মনের দুর্বলতায় সামান্য ঘটনার দূরপ্রসারী প্রভাব, তার ফলে দাম্পত্য বিশ্বাসের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদ বিধৃত। 'রূপসী' পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যে একজন তরুণীর আত্ম আবিষ্কারের গল্প। প্রায় প্রতিটি গল্পেই বহির্বাস্তব চিত্রায়ণের পাশাপাশি চরিত্রাবলীর অবচেতন অন্তর্লোকের উন্মোচন লেখকের বিশেষ প্রবণতাকে তুলে ধরে। সাবলীল ভাষা ও আন্তরিক বর্ণনায় লেখক গল্পের গভীরে যুক্ত করে নেন পাঠককে। **র. আ. ক.**

আদিম লতাগুল্মময় : শঙ্খ ঘোষ-এর কবিতার বই। প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৭২। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। পঞ্চাশটি কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত। কবিতাগুলো তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। পর্বগুলোর নাম যথাক্রমে পাথর, দল, চতা। কবিতাগুলো তীব্র আবেগস্পৃষ্ট হয়েও সংহতিপ্রবণ। অনেক কবিতাতেই দূরগত ইঙ্গিত ব্যবহার করে এখানে তিনি সৃষ্টি করেছেন কাব্যের ব্যঞ্জনা। নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় মানুষের তৈরি সভ্যতা প্রতিনিয়ত কেড়ে নিচ্ছে তাদের নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকার। আধুনিক আত্মসচেতন মানুষ এই জটিল আবর্তে পড়ে কেবলই অনুভব করছে যে সে আসলে নাচের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে বাঙময় হয়ে উঠেছে স্বসভাব অর্জুনের জন্য অস্তিত্ববাদী মানুষের সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কিভাবে সমগ্র জীবনযাপন ভেঙেচুরে যায় মিথ্যার নানা চাপে এর ছবি এখানে প্রকাশিত। প্রেম ও রাজনীতি নিয়ে কবির দার্শনিক উপলব্ধিসমূহ এখানে ভাষা পেয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গের ইঙ্গিতও এসেছে কয়েকটি কবিতায়। **আ. মা.**

আদিম সমাজ : লুইস হেনরি মর্গান কর্তৃক রচিত সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক যুগান্তকারী গ্রন্থ 'এ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি' 'আদিম সমাজ' নামে বাংলা অনুবাদ করেছেন বুলবন ওসমান। ১৯৭৫ সালে অনূদিত গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে। মর্গান গ্রন্থটি লেখার পূর্বে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, মালয়, নেপাল, চীন এবং হাওয়াই দ্বীপ পর্যন্ত ঘুরেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিদগ্ধজন সমাজে আলোড়ন তুললেও পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানীরা এই গ্রন্থের মধ্যে সাম্যবাদী দর্শনের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়ায় যথাযথ মূল্যায়নের পরিবর্তে খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তি খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অথচ মর্গান মানব মুক্তির জন্যে পুঁজিবাদকে সর্বোত্তম ব্যবস্থা মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্র ও খ্রিস্টান ধর্মই হচ্ছে একমাত্র সত্য। এ ছাড়াও 'এ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি' লেখার পেছনে মর্গানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বুর্জোয়া সমাজের অর্থ লিপ্সা, স্বার্থপরতা, মূল্যবোধহীনতা এবং যুব সমাজকে নৈতিক অধঃপতন থেকে উদ্ধার করে আমরিকাকে সুস্থ সমাজ হিসেবে গড়ে তোলা। বাংলা একাডেমী থেকে অনূদিত এই

www.pathagar.com

গ্রন্থের 'পূর্বাভাষ'-এ বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী নাজমুল আলম মর্গান সম্পর্কে লিখেছেন, তথ্যপূর্ণ, বস্তুনির্ভর, সরেজমিন গবেষণার জন্যে শুধু নয় বস্তুত উনবিংশ শতকের সমাজবিষয়ক গবেষকদের ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যেতে পারে। 'এ্যানসিয়েন্ট সোসাইটিকে বিখ্যাত করার ক্ষেত্রে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। এঙ্গেলস তাঁর 'অরজিন অফদি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এ্যান্ড দ্য স্টেটে' ব্যাপক প্রশংসা করে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, মর্গানের রচনা হচ্ছে আমাদের কালের যুগান্তকারী অল্প কয়েকটি রচনার অন্যতম। এমনকি স্বয়ং কার্ল মার্কস নিজেও এ্যানসিয়েন্ট সোসাইটিকে কেন্দ্র করে একটি বই লেখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন কিন্তু মৃত্যুর জন্যে তা সম্ভব হয় নি। বুলবন ওসমান অনূদিত এবং বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'আদিম সমাজ' পাঠক সমাদৃত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন, কাইয়ুম চৌধুরী। মা. আ.

আদিল শাহ্ সূর : প্রকৃত নাম মুবারিয খান। সম্রাট শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সূর বংশীয় শেষ সুলতান। আদিল শাহের চাচাতো ভাই ও ভগ্নীপতি সুলতান ইসলাম শাহ্ (জালাল খান) সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি বায়ানার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে ইসলাম শাহ্কে বন্দি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে মেওয়াটের শাসক খাবাস খানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। খাবাস খানের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে তিনি পুনরায় ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। ইসলাম শাহের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফীরূযকে হত্যা করে মুবারিয খান মুহম্মদ আদিল শাহ্ সূর নাম ধারণ করে ১৫৫৪ সালে সিংহাসনে আরোহণ এবং চূণারে আবাসিক রাজধানী স্থাপন করেন। হিমু নামে জনৈক হিন্দু ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি। আদিলের অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার সুযোগে হিমুই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেছিলেন। ফলে রাজ্যের মুসলমান আমীরগণ রুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হিমু সাফল্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুঘল সেনাপতি বৈরাম খানের নিকট হিমু পরাজিত ও নিহত হন, ঐ বছরই বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে আদিল শাহ্ও নিহত হন। ইয়াদগারের মতে আদিলের রাজ্য আগ্রা, মালব ও জৌনপুরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। সম্রাট আকবরের দরবারের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন ছিলেন তাঁর শিষ্য। তিনি ১৫৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আ. খা.

আদ্ধা : ষোল মাত্রায় গঠিত তাল। এই তালের আট মাত্রায় গঠিত রূপও প্রচলিত। ষোল মাত্রায় গঠিত আদ্ধা চার তালাঙ্ক বিভক্ত। প্রতি তালাঙ্কে চারটি করে মাত্রা। মাত্রা বিন্যাস দাঁড়ায় : ১ ২ ৩ ৪। ৫ ৬ ৭ ৮। ৯ ১০ ১১ ১২। ১৩ ১৪ ১৫ ১৬। তিনটি তালি ও একটি খালি বা ফাঁক। সম দ্বিতীয় তাল, ফাঁক তৃতীয় তাল—এই ক্রমে তালাঙ্ক সমূহ বিন্যাসিত হয়। এই তাল, বক্রগতি সম্পন্ন। এর অন্যতম প্রচলিত বোল হচ্ছে : ধা ধিন। ধা। ধা ধিন। ধা। ধা তিন। তা। তা ধিন। ধা। আট মাত্রায় গঠিত আদ্ধার তালাঙ্ক সংখ্যা চার। প্রতি তালাঙ্কে দুটি করে মাত্রা। মাত্রা বিন্যাস দাঁড়ায় : ১ ২। ৩ ৪। ৫ ৬। ৭ ৮। তিনটি তালি ও একটি খালি বা ফাঁক। সম, দ্বিতীয় তাল, ফাঁক, তৃতীয় তাল—এই ক্রমে তালাঙ্কসমূহ বিন্যাসিত হয়। প্রচলিত বোল হচ্ছে : ধাধিন-ধা। ধাধিন-ধা। ধাতিন-ত। তাধিন-ধা। ক. গো.

আদ্যাশক্তি : অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর ধারণা সৃষ্টির উৎস নারী। অস্ট্রিক-মঙ্গোল প্রভাবিত হিন্দু তন্ত্র ও পুরাণ মতে আদ্যাশক্তি বলতে বুঝায় জগৎসৃষ্টির আদিকারণ নারীস্বরূপাতে যিনি মহামায়া, দুর্গা, চণ্ডী ; তারা কালীও বটেন। তিনি পরমাপ্রকৃতি রূপেও পরিচিতা। তিনি অনন্ত শক্তিস্বরূপা, দেবাদিদেব মহাদেবের

www.pathagar.com

লীলাসহচরী স্ত্রী পার্বতী। তিনি মহাবিদ্যা-স্বরূপিনীও বটেন। 'দশমহাবিদ্যা' তাঁর অনন্ত বিভূতিরই কিছু পরিচয় বহন করে। ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী প্রভৃতি দশম রূপে তিনি পরিকল্পিতা। সু. মু.

আঁদ্রেজিদ : বিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব (Andre Gide)। ১৮৬৯ সালের ২২ নভেম্বর প্যারিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এগারো বছর বয়সে জিদ তাঁর পিতাকে হারান। ছেলেবেলায় তাঁকে তাই বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হয়। প্যারিসের এক প্রোটেস্টান্ট বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষার সূচনা হয়। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন জিদ সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে জীবনী, সমালোচনা, নাটক এবং উপন্যাস রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে। তাঁর লেখার সর্বত্র সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট। জিদের পিতামাতা ছিলেন গোঁড়া ক্যালভিনিস্ট। কিন্তু পুত্রের মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল একদিকে ক্যাথলিক ও নর্মান জাতির ধারা, অন্যদিকে প্রোটেস্টান্ট ও ফরাসি জাতির ধারা। জিদের রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ The Cainers (জালিয়াত)। এই উপন্যাস ছাড়াও তাঁর অন্যান্য রচনা হচ্ছে Strait is the gate, If it's die ইত্যাদি। এছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও অন্যান্য কয়েকটি গীতিকাব্য ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। জিদ ১৯৪৭ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। সু. মু.

আঁধারে আলো : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সমাজ অসমর্থিত প্রেমের গল্প। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পুস্তকাকারে 'মেজদিদি' (১৯১৫) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। পারিবারিক ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে এ গল্পের শুরু। এর আখ্যানভাগ কতকটা উপন্যাসধর্মী। বিজলীর প্রতি সত্যেন্দ্র চৌধুরীর প্রেমের উন্মেষ হয়েছে ধীরগতি সঞ্চালনে। বিজলী প্রথমে সত্যেন্দ্রকে নিয়ে প্রেমের ছলাকলা করে এবং পরে নিজের পরিচয় দিয়ে সত্যেন্দ্রের নির্বুদ্ধিতার প্রতি কটাক্ষপাত করে। বিজলী যদিও কৌতুক বশে এই আচরণ করেছে ; সত্যেন্দ্রের সুপ্ত চরিত্রগৌরব তাতে জেগে ওঠে। সত্যেন্দ্র বাড়ি ফিরে বিয়ে করে এবং একদা তার নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশনে পাল্টা আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজলীকে দিয়ে নাচগান করায়। বিজলী সত্যেনের চরিত্রগৌরবে মুগ্ধ হয়ে পরে তারই ধ্যানে আত্মমগ্ন হয়। সত্যেন্দ্রের স্ত্রী রাধারানীর সঙ্গেও তার পরিচয় হয়। বিষের তীব্র দহনে বিজলী জর্জরিত হলেও রাধারানী তারই সংস্পর্শে অমৃতের আস্বাদন পায় এবং তার ফলে সত্যেন-রাধারানীর দাম্পত্য প্রেম নির্মল পবিত্রতায় ভরে ওঠে। আ. ই.

আধার অধিকরণ : ক্রিয়া কোথায় ঘটে? প্রশ্নের উত্তরে বাক্যে যে পদ পাওয়া যায়, তা-ই' আধারাধিকরণ কারক। অর্থাৎ যে স্থানে বা আধারে ক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকে আধার অধিকরণ কারক বলে। উদাহরণ : আগ্রা শহরে তাজমহল আছে। তিলে তৈল থাকে। আধারাধিকরণ কারক তিন প্রকার : (ক) ঐকদেশিক বা উপশ্লেষিক—অর্থ স্থানের একাংশ ব্যাপী। যেমন--আকাশে চাঁদ উঠে—(চাঁদ বিপুলকায় আকাশের কোন এক অংশে বা স্থানে মাত্র শোভা পায়)। বনে বাঘ আছে—(বিরাট বনের কোন কোন স্থানে মাত্র বাঘ বসে বা দাঁড়িয়ে বা ভ্রাম্যমান রয়েছে, গোটা বন জুড়ে নেই)। এরূপ রাস্তায় গাড়ি চলে। পুকুরে মাছ আছে ইত্যাদি। (খ) বৈষয়িক — কোন বিষয়ে অধিকার বা ব্যুৎপত্তি বুঝালে বৈষয়িক আধারাধিকরণ কারক হয়। যথা—ছেলেটি অঙ্কে পাকা (অঙ্ক বিষয়ে বাৎপন্ন) ; করিম রণ কৌশলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। (গ) অভিব্যাপক অধিকরণ কারক--সর্বস্থান জুড়ে থাকলে অভিব্যাপক অধিকরণ হয়—যথা নদীতে পানি আছে (নদীর সর্বত্র)। ঘরে ছাদ আছে (ঘরের পুরো পরিমাপে)। শি. প্র. লা.

www.pathagar.com

আধার ও আধেয় : হুমায়ুন আজাদ। প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯, মে ১৯৯২। প্রচ্ছদ : রাগীব আহসান। মূল্য : একশ টাকা। বইটি তেইশটি প্রবন্ধের সংকলন। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন এগুলো তাঁর তরুণ বয়সে লেখা। যেখানে আবেগের প্রাবল্য আছে, ষাটদশকি ভঙ্গি আছে। আবার সত্তর দশকে লেখা দু'টো প্রবন্ধের সাথে লেখক যে বর্তমানে একমত পোষণ করেন না তা জানিয়ে দিয়েছেন। বৈচিত্র্যে ভরা এ প্রবন্ধ গ্রন্থে আলোচ্য হয়ে উঠেছে কবি, কবিতা, সমাজ, সাম্প্রতিকতা, আধুনিকতা, শব্দশৈলী, বাংলাদেশের সমালোচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের পূরবীর চারটি কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা একুশের চেতনা ও তিন দশকের উপন্যাস, স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ মিনার, বাংলা ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, চমস্কীয় সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার, বানানরীতি, সংবাদপত্রের ভাষা, বাংলা ভাষায় শত্রুগণ ইত্যাদি। বাংলাদেশের মননচর্চার সীমিত পরিসরে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হুমায়ুন আজাদ। প্রতিটি প্রবন্ধ আলো ফেলে যায় আমাদের চেতনার গভীরে। বিশেষ করে কবিতা ব্যক্তিত্ব, কবিতা এবং ভাষাতত্ত্বে আলোচনাগুলো এতো প্রগাঢ় সজীবতায় উপস্থিত যে পাঠক মাত্রেই আলোড়িত হন। পাঠকের সম্মুখে উন্মোচিত হয় দরজার পর দরজা ব্যক্ত বিষয়ের মুগ্ধতার এবং সীমাবদ্ধতা। পাঠক প্রতারিত না হয়ে, হয়ে উঠেন চক্ষুষ্মান জাতিস্মর। তার গদ্য কবিতার মতো নিটোল। সম্মোহনে নিয়ে যায় আলোচনার উপান্তে। **মা. জা.**

আধাল : বাংলাদেশের মাছ ধরার এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ। এটি বাঁশের সরু সলা দিয়ে তৈরি করা হয়। এর বুনন বেশ সূক্ষ্ম। ফলে ছোট বড় সব ধরনের মাছই এতে ধরা পড়ে। এই আধাল যে কোনো পুকুর, খালবিল বা জলাশয়ের স্রোতের মুখে পাতা হয়। মাছ প্রবেশের জন্য একটি মাত্র প্রবেশ পথ থাকে। একবার মাছ আধালের ভিতরে ঢুকলে আর বের হতে পারে না। আধালের উচ্চতা এক ফুট থেকে দুই ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পরিধি হয় চার ফুট থেকে ছয় ফুট। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের কৃষকরাই মাছ ধরার জন্য আধাল ব্যবহার করে। **ড. শা. আ.**

আধুনিক কবি ও কবিতা : হাসান হাফিজুর রহমান রচিত কবিতা বিষয়ক গ্রন্থ। মূল্য ১২৫.০০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮০। প্রকাশকাল ১৩৭২ ও ১৩৭৯ (বাংলা)। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০। প্রচ্ছদ রফিকুন্নবী। হাসান হাফিজুর রহমানের প্রবন্ধগ্রন্থ আধুনিক কবি ও কবিতা যা ঠিক মধ্য-ষাটে প্রকাশিত হয়ে যেন একটি বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করেছে। আধুনিক কবি ও কবিতাগ্রন্থে তিনি ঐতিহ্য ও দেশজ ভাবনাকে মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু কবিতার নান্দনিকতাকে উপেক্ষা করেন নি। এই বইয়ে তার কাব্য বিবেচনার মূল কথা হলো— '... আদতে সামাজিক প্রণোদনাই কাব্যসৃষ্টি আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত করছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।' এই গ্রন্থে লেখক সমালোচনার একটি ভিত্তি পাথর নির্মাণ করেছেন। এবং এই সমালোচনার ভেতর দিয়ে তিনি শাশ্বত কবিতার মর্মে গিয়ে পৌঁছেছেন। বাংলাদেশের কবিতা এবং সামগ্রিক বাংলা কবিতার মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান রয়েছে--তা তিনি স্পষ্ট তুলে ধরেছেন। আধুনিক কবিতার প্রথম গ্রহণযোগ্য ইতিহাস তিনি এ গ্রন্থে বিন্যস্ত করেছেন। সমকালীন কবিতা সম্পর্কে সদাজাগ্রত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করেছেন। বৃহদর্থে রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা তার আলোচনার বিষয়— আবার তারও একাংশে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন বাঙালি মুসলমান বাহিত যে বাংলা কবিতা তার প্রতি। কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর আধুনিক কবিতার পরিপ্রেক্ষিত তিনি ভোলেননি। এই ইতিহাস দৃষ্টির ফলেই 'আধুনিক কবি ও কবিতায়' তার অবলোকন এত নিবিষ্ট ও গভীর হতে পেরেছে। এ গ্রন্থে তাই তার আলোচনার ভিতর থেকে কবিতার চিরকালীন সত্যই বেরিয়ে এসেছে। **পা. র.**

www.pathagar.com

আধুনিক কবিতা : রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত কবিতা সংকলন। বাংলা একাডেমী পরিকল্পিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত আধুনিক কাব্য-সংগ্রহের এটি দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯৪৭-এর পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলায় যেসব কবির রচনা গ্রন্থাকারে কিংবা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কেবল তাদের কবিতাই এ খণ্ডে নেওয়া হয়েছে। 'আধুনিক কবিতা' সংকলনে সৈয়দ নুরুদ্দিন থেকে শুরু করে হুমায়ুন কবির পর্যন্ত মোট ৫৫ জন কবির ২০৫ টি কবিতা রয়েছে। দশকের হিসেবে এঁরা মূলত পঞ্চাশ ও ষাটের কবি। ষাটের দশকে লিটল ম্যাগজিনকে কেন্দ্র করে এক ঝাঁক তরুণ কবির উত্থান ঘটে। কবিতা নিয়ে এই তরুণরা নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আজকের দিনে এই কথা তো বলাই যায় তাদের সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের কাব্য-জগতকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক এই তরুণদের সম্পর্কে তাঁর প্রসঙ্গ-কথায় জানিয়েছেন : 'তিনি (সম্পাদক) সংগ্রহটিতে অত্যাধুনিক কবিদের কবিতা ও স্থান দিয়ে তাকে একখানি আধুনিক কবিতার পূর্ণাঙ্গ সংকলনের রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।' 'আধুনিক কবিতা'য় অন্তর্ভুক্ত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিতাই বাংলাদেশের কবিতার প্রতিনিধিত্ব করছে এবং করবে আরো অনেক দিন। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রচ্ছদ : এ. মুক্তাদির। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬+১২০+৩১৬। মূল্য : দশ টাকা। **সা. আ**

আধুনিক কাব্য-সংগ্রহ : কবিতা সংকলন। গ্রন্থটির প্রকাশক বাংলা একাডেমী। প্রকাশকাল কার্তিক ১৩৭০ (১৯৬৩)। প্রচ্ছদ কামরুল হাসান। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২+২৪০। মূল্য তিন টাকা। বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগ-উত্তর পূর্ব-বাংলার নবীন ও প্রবীণ কবিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে কাব্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার একটি সামগ্রিক রূপ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমী আধুনিক কাব্য-সংগ্রহ ২ খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। 'আধুনিক কাব্য-সংগ্রহে'র ১ম খণ্ডে উনিশ শতক থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের ৪৭ সাল পর্যন্ত যে সব মুসলমান কবি পরিচিত হয়েছেন এবং বিশেষ সামাজিক পরিসরের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদেরই কবিতা সংকলিত হয়েছে। ৬ সদস্যের একটি উপসংঘ এই কাব্য-সংগ্রহের সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উপসংঘের সদস্যরা ছিলেন : সৈয়দ আলী আহসান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুল কাদির, ফররুখ আহমদ ও মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। 'আধুনিক কাব্য-সংগ্রহে' ৪৩ জন কবির ৮৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। সংকলনটিতে প্রায় একশ' বছরের বাঙালি মুসলমান কবিদের কাব্য-ভাবনার পরিচয় বিধৃত রয়েছে। **সা. আ.**

আধুনিক জাপানের গল্প : অনুবাদ গ্রন্থ। বাংলায় অনুবাদ করেছেন কান্তি চট্টোপাধ্যায়। জাপানি লেখকগণ হচ্ছেন—মোরি ওগাট,, শিগা নাওইয়া, তানিজাকি জুনিচিরো, হায়ায়মা ইয়োশিকো, ইয়োকোসিৎসু রিইচি, হিরাবায়াশি তাইকো, নাকাজিমা তন এবং মিশিমা ইয়ুকিও। জাপানের প্রথম উপন্যাস 'গেনজি কাহিনী' রচিত হয়েছিল একাদশ শতাব্দীতে। লেডি সুরাশাকির এই বইটির ইংরেজি অনুবাদে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৩৫। আর আধুনিক গদ্যের বয়ান ধরা হয় এক শ বছরাধিক। জাপানের সেইজি পুনরুদ্ধারের সূচনা ১৮৬৭ সালে। ১৮৮০ সালে ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয় নব্য জাপানের সাহিত্যস্রষ্টা ওস্যুবাউকি শেইয়োর। সেইজি সাহিত্যের অন্য দিকপাল মোরি ওগান্ট। তাঁর 'ভাঙাগড়া' গল্প দিয়ে এই সংকলন শুরু। এসময় জাপানে 'শি-শোসেৎসু' বা 'আমি উপন্যাস' রচনা শুরু হয়। উত্তম পুরুষে রচিত উপন্যাসে লেখকের নিজের অনুভবের বাস্তবানুগ বিবরণের প্রতিফলন ঘটে। বাঙালি পাঠকরা তানিজাকি জুনিচিরো ও মিশিমা ইয়ুকিওর সঙ্গে পরিচিত। তাঁদের গল্পও এই সংকলনে আছে। এই সংকলনের আটটি গল্প

www.pathagar.com

সম্প্রতিকালের যুগকে স্পর্শ করে নি। সমাজ জীবনে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়ে আজ জাপানের পরিবার প্রায় শেকড়বিহীন, নিরালম্ব। এ সময়ে সাহিত্যে যৌনতা বেশি প্রকট। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আরো এক নতুন আন্দোলন যুক্ত হয়েছে জাপানি সাহিত্যের, সেই গল্পও এখানে নেই। অনুবাদটির প্রকাশক : মনীষা ভট্টাচার্য, অন্বেষা, ৮৯৭ এন. কে. ঘোষাল রোড, কলকাতা ৭০০০৪৮। প্রকাশকাল : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ১৪২, মূল্য : ২০ রুপি। বি. বি.

আধুনিকতা : শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বহুল ব্যবহৃত দুটি সমার্থক শব্দ 'আধুনিক' বা 'আধুনিকতা'। ইংরেজি modern বা modernity-র পারিভাষিক শব্দ হিসেবে আধুনিকতা বিশেষ সময়-ধারণা, আন্দোলন, মনোভঙ্গি ও প্রবণতাকে নির্দেশ করে। Modern শব্দের বুৎপত্তিগত উৎস লাতিন modo, যার অর্থ 'ঠিক এই মুহূর্তে'। আধুনিক কালকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কালগত দিক থেকে ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আধুনিকতার সূত্রপাত ; কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এর প্রভাব অনুভূত হতে থাকে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে। বিভিন্ন দেশে এর উদ্ভব ও বিকাশের সময়সীমা এ রকম : ফ্রান্সে ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ ; রাশিয়ায় বিপ্লবপূর্ব কাল থেকে ১৯২০ ; জার্মানিতে ১৮৯০ থেকে ১৯২০ ; ইংল্যান্ডে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ১৯৩০ ; আমেরিকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে। আধুনিকতার প্রেক্ষাপট তাই দুটি : দৈশিক ও বৈশ্বিক। বহুমাত্রিকতা, পরিবর্তনশীলতা আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ। তাই অনেকেই একে দুটি সময় পর্বে বিভক্ত করেছেন : প্রত্ন-আধুনিকতা ও নব্য-আধুনিকতা। শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত বৌদ্ধিক-নান্দনিক অন্দোলন হিসেবে। বহুবিচিত্র জীবনদৃষ্টি, কূটাভাস, ব্যাপক শৈল্পিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। নৈর্ব্যক্তিকতা, আত্মবিরোধ, আত্মরতি, নির্বেদ, অবসাদ, ক্লান্তি, বিশ্বাসহীনতা, নৈরাশ্য, অনিকেত চেতনা, অমঙ্গল বোধ যেমন আধুনিক শিল্পসাহিত্যে উপজীব্য হয়েছে ; তেমনি আত্মসচেতনতা, ঐতিহ্য বোধ, দ্রোহ, মানবিকতা, আশাবাদ, স্বপ্নচারিতা, মুক্তির এষণায় আধুনিক সাহিত্য উজ্জ্বল। আধুনিকতাকে ঘিরে যেসব প্রভাবসঞ্চারী আন্দোলন হয়েছে সে-সবের কয়েকটি হচ্ছে : প্রতীকবাদ (Symbolism), ভবিষ্যবাদ (Futurism), দাদাবাদ (Dadaism), অভিব্যক্তিবাদ (Expressionism), প্রভাববাদ (Impressionism), আকরণবাদ (Formalism), পরাবাস্তববাদ (Surrealism), চিত্রকল্পবাদ (Imagism), অস্তিত্ববাদ (Existentialism) ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে ১৮৫২ নাগাদ রঙ্গলাল সেন প্রথম আধুনিক শব্দটি প্রয়োগ করেন। বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় এই আধুনিকতার দুটি আরম্ভক্ষণ : ১. ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শুরুতে প্রত্ন-আধুনিকতার সূত্রপাত ; আর ২. নব্য-আধুনিকতার সূচনা ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে। উল্লিখিত দুই আধুনিকতায় ইউরোপীয়তার প্রভাব লক্ষ করা গেলেও প্রথম আধুনিকতার মতাদর্শিক প্রস্থানভূমি ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস ; আর দ্বিতীয় আধুনিকতা আলোড়িত হয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রবণ ইউরোপীয় নব-আধুনিকতার দ্বারা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় যে আধুনিকতার সূচনা, এলিয়ট-পাউন্ড-বোদলেয়ারের প্রভাবে গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেনের মাধ্যমে সেই কবিতা হয়ে ওঠে সর্বত্রসঞ্চারী। পূর্ববঙ্গে আবুল হোসেন, আহসান হাবীবের কবিতায় এর অভিঘাত এসে পৌঁছয় বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। ভিক্টরীয় ঘরানার আদলে উনবিংশ শতাব্দীর

www.pathagar.com

মাঝামাঝি সময়ে বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তবে আধুনিক ভাষাভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন আত্মসচেতন ব্যক্তিচরিত্রনির্ভর উপন্যাস। পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, সমরেশ বসু, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখের হাতে এই উপন্যাস পেয়েছে বহুমাত্রিকতা। আধুনিক চিত্রকলারও শুরু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এঁকেছেন ইউরোপীয়তার দ্বারা বিভাবিত ভারতীয় ঘরানার আধুনিক ছবি। ভাস্কর্যে এই আধুনিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় রামকিংকরের সৃজনীতে। বাংলা সাহিত্য ও চিত্রশিল্পে এখনো অব্যাহত রয়েছে আধুনিকতার এই অভিযাত্রা। মা. জা.

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ : আবু সয়ীদ আইয়ুব। এপ্রিল ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত এই বইটি রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার ইতিহাসে এক নতুনতর সংযোজন। নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় গভীর দার্শনিক যুক্তি ও উপলব্ধির প্রয়োগ সার্বিকভাবে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। মূলত, রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের নেতিবাচক সমালোচনার একটি প্রামাণিক জবাব হিসাবে বইটি লেখা হলেও আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) এতে আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য, তার অমঙ্গলচিন্তার অত্যাধিক্য এবং সাহিত্যে ন্যায়, কল্যাণ তথা শ্রেয়োবোধের আদর্শ বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসার উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রানুসারী এই নন্দনতাত্ত্বিক দার্শনিকের উপলব্ধি ও তাঁর ব্যাখ্যা রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে পাঠককে নতুন চিন্তার প্রেরণা দিয়েছে—শুধুমাত্র তা-ই নয়, সাহিত্যের পঠন-পাঠনের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও সামনে নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্র কবি-মানসের ক্রমবিবর্তনের এক ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিলে পরিণত হয়েছে এই বইটি। একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যভাবনার একটি সামান্য পরিচয়ও সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে তাঁর আলোচনায়। ভাষার সারল্য ও মাধুর্য আবু সয়ীদ আইয়ুবের আলোচ্য বিষয়কে করেছে আরও প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। অবাঙালি উর্দুভাষী পরিবারে জন্মেও তাঁর পক্ষে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নন্দন-তাত্ত্বিক প্রাবন্ধিক হয়ে ওঠা এবং বাংলা ভাষায় একটি বিশিষ্ট গদ্যশৈলীর প্রবর্তনা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। মোঃ. শা.

আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ গবেষণা গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিরিশের দশকে যে কয়জন কবি বিশেষভাবে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন, এ গ্রন্থে তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনার প্রয়াস রয়েছে। গ্রন্থটিতে আটটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো হল—আধুনিক কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত, জীবনানন্দ দাশ : তিমির হননে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে, বিষ্ণু দে : নব জগতের নির্মাণে, অমিয় চক্রবর্তী : ঘরে ফেরা, প্রেমেন্দ্র মিত্র : একটি আছে ফুলকি, বুদ্ধদেব বসু : যৌবন, জীবন এবং উপসংহার। গবেষণা গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য এরকম—প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ের ইংরেজি সাহিত্যতত্ত্ব বাংলা কবিতায় প্রবলভাবে আলোড়ন তোলে। আমাদের তিরিশ দশকের প্রধান কবিকুল এ তত্ত্ব দ্বারা কম বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে অনূদিত হয়েছেন। এই কবিকুল ইউরোপমনস্কতা নিয়ে কতদূর স্বাদেশিক, কতদূর আন্তর্জাতিক ; কতদূর তাঁরা গেছেন কবির বিত্তহীনতা থেকে পেশাগত পরিচয়ের জটিলতায় ; কি অর্থে তাঁরা প্রাসঙ্গিক সমকালের ও উত্তরসূরির চোখে-এসব দ্বিধা ও সংশয়যুক্ত প্রশ্নাবলীর বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লেখকের সযত্ন প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। 'আধুনিক

www.pathagar.com

বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' বিচারের দণ্ড হাতে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তিমির হননের মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন তিরিশের অন্যতম কবিতাকর্মী জীবনানন্দ দাশকে। পরবর্তী অধ্যায়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হয়েছেন আধুনিক চৈতন্যের ধারক। প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে অনুধাবনযোগ্য এবং উত্তরকালেও দেশকালের এবং ব্যক্তি-মনীষার নিকটে পুনর্বিবেচনাযোগ্য কক্ষচ্যুত নক্ষত্র। প্রথম জীবনে বিশ্ববীক্ষা বিষ্ণু দের কাব্যভাবনার ক্ষেত্র হলেও পরিণত বয়সে মার্কসবাদে অগাধ আস্থা তাঁর সৃজন পরিধি সীমিত করে তুলেছে। কবিতাকে করেছে রাজনীতির বাহন-সমাজ বদলের হাতিয়ার। মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুর প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্বও লেখক বিস্মৃত হন নি। আধুনিক কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত বিচারে ব্রতী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান স্পষ্টতই বলেন, কবিরও আছে দেশকালের সীমাবদ্ধতা। প্রোথিতমূল তিনি সমকালে। তবু তারই মধ্যে তিনি সমাপ্ত নন। বর্তমানে দাঁড়িয়ে তিনি রচনা করেন অতীত ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ। তিনি প্রগতির স্বপক্ষে, মানুষের স্বপক্ষে। তিনি মূলত স্বাদেশিক কিন্তু ফলত বিশ্ব নাগরিক। গ্রন্থটিতে মতীয়র রহমমান বক্তৃতামালা : ১৯৮০-এর প্রতিবেদন সংযোজন কলেবর বাড়িয়েছে—মান বাড়ায় নি। গ্রন্থটি শিক্ষার্থী পাঠকের বিশেষ করে সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীর সংগ্রহে রাখার উপযোগী। শা. আ.

আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুসঙ্গে : সৈয়দ আলী আহসান রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা থেকে এটি নভেম্বর ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতার শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য পরীক্ষা করার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যায় এ গ্রন্থে। কারণ শব্দ কবিতার অন্যতম অনুষঙ্গ। শব্দের মাধ্যমে কবিতায় কখনও কখনও বক্তব্য স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, ঋজু ; কখনও তা আবেগ ও স্বপ্নে আচ্ছাদিত ; কখনও তা চিন্তা ও চৈতন্যে গুরুভার বয়ে আনে। শব্দই নির্মাণ করে ভাবনার সেতু—গ্রন্থিত করে রহস্যময়তার জগৎ। শব্দ জাগ্রত করে তোলে কৌতূহল, ঐতিহ্য সন্ধান—শিল্পকলার আকাঙ্ক্ষা। লেখক সৈয়দ আলী আহসান তাঁর পর্যালোচনা নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের পরে কবিতায় কলা-কৌশল এবং অনুষঙ্গ সচেতন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ তিরিশ দশকের তিনজন প্রধান কবির রচনাবলী অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিকতা এবং সে ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন রয়েছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে' গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এ অধ্যায়গুলো হলো—ভূমিকা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে এবং পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা। পরিশিষ্ট অংশে 'আধুনিক কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ' ও 'আধুনিক সাহিত্য' শীর্ষক দুটি পৃথক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কবি তাঁর চৈতন্যে একটি বিশেষ মুহূর্তে যে অনুভূতিকে ধারণ করেছেন সেই অনুভূতি শব্দের ধ্বনিরূপে এবং বিন্যাসের বিশেষ পদ্ধতিতে কতটা উন্মোচিত তা আবিষ্কারের নিরন্তর প্রচেষ্টা গ্রন্থটিতে বর্তমান। উপরন্তু, এ গ্রন্থ থেকে সাহিত্যের যুগ বিভাজনের বিশেষ প্রকৃতি বা লক্ষণসমূহ, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্ভব এবং এর বৈশিষ্ট্য, বাংলা কবিতার গতির প্রকৃতি নিরূপণের একটি দিক নির্দেশনারও সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। শা.আ.

আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় : ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠী প্রণীত কাব্য সমালোচনামূলক পুস্তক। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ সাল। আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রকৃতি ও পটভূমি আলোচনা শেষে এ গ্রন্থে পাঁচজন খ্যাতনামা আধুনিক বাঙালি কবির শিল্পমানস ও কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঁচজন কবি হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,

www.pathagar.com

বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী। লেখিকার মতে আধুনিক বাংলা কাব্য মূলত মিশ্র সংস্কৃতির শিল্পরূপ। মিশ্র সংস্কৃতি বলতে তিনি প্রাচ্যের বাংলা কবিতার উপর পাশ্চাত্যের অভিনব কাব্যরীতির প্রভাবকে বুঝিয়েছেন। যদিও সংশয় ও সন্ধানের মধ্যে আধুনিক কবিতার জন্ম, তবু এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে শক্তি আর সাফল্যের সম্ভাবনা। সৃষ্টির দিক থেকে তাই আধুনিক কবিতা হচ্ছে নবতম সুরের সাধক। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতেই এর সৃষ্টি ; তার ফলে এতে এসেছে জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, আত্মবিরোধ ও অহংপ্রসূত মনোভাব, ফয়েডী মনোবিজ্ঞান ও মার্ক্সীয় দর্শন, স্রষ্টা ও প্রথাগত নীতিতে অবিশ্বাস এবং দেহজ কামনা ও প্রেমের শরীরী রূপের সাধনা। আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যের প্রতি সচেতন থেকেই উক্ত পাঁচ কবির কাব্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্পমানসের বিভিন্নতার জন্য তাঁদের কাব্যধারাও বিভিন্ন। বুদ্ধদেব প্রেমের দেহী রূপ মর্মে মর্মে অনুভব করলেও দেহবাদ ও ভোগসর্বস্বতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর বিদগ্ধ রুচি তার অনুকূলও নয়। তবে তাঁর কবিতায় গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে। ইন্দ্রিয় ঘনত্ব ও চিত্রধর্মিতা জীবনানন্দের কবিতাকে অবয়বময় করে তুলেছে। তাঁর কবিতা 'চিত্ররূপময়' বলেই তিনি ইমপ্রেশনিস্ট কবিদের সঙ্গে তুলনীয়। কবিতা-রচনায় সুধীন দত্ত একান্তভাবেই ক্ল্যাসিকপন্থী ও ধ্রুপদী শিল্পরীতির প্রতি নিষ্ঠাবান। ফলে তাঁর কাব্যে ইন্দ্রিয়শীলতার সঙ্গে মননশীলতার মিশ্রণ ও বুদ্ধিনির্ভর প্রতীক-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুদের কবিতায় এলিয়ট ও মার্ক্সবাদের প্রভাব জোরালোভাবে ক্রিয়াশীল। সংগীতধর্মিতা বিষ্ণুদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। জনতার মিছিলের ধ্বনিকে তিনি যেভাবে ধরে রেখেছেন, গাজনের ঢাকের শব্দ কিংবা মেঘের মন্দ্ররবও তাঁর কবিতায় তেমনি ধ্বনিরস সৃষ্টি করেছে। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য রচনার কেন্দ্রে বিরাজমান রয়েছে একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগত। প্রজ্ঞা, মেধা ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থটিতে উপরোক্ত পাঁচ কবির কাব্যধারার গবেষণাধর্মী মূল্যায়ন করেছেন। আ.ন.ম.ব.র.

আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : কবি-গবেষক-অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের গবেষণা-গ্রন্থ। বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' লেখকের পিএইচ.ডি. গবেষণা-অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রতিফলন অত্যন্ত প্রাণস্পন্দময়। সমাজজীবনে এ সম্পর্ক যেমন দ্বিধায় ও দ্বন্দ্বে, সৌহার্দ্যে ও সন্দেহে চিহ্নিত, সাহিত্যেও তেমনি তা ঘৃণায়, বিদ্বেষে, প্রীতিতে ও প্রত্যাখ্যানে সুচিহ্নিত। ১৮৫৭ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ—দীর্ঘ এই কাল-পরিসরে রচিত বাংলা কাব্যে এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের স্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থে সন্ধান করা হয়েছে। 'হিন্দু কবিদের কাহিনী-কাব্যে মুসলিম-প্রসঙ্গ', 'হিন্দু কবিদের খণ্ড-কবিতায় মুসলিম-প্রসঙ্গ', 'মুসলমান কবিদের কাহিনী-কাব্যে হিন্দু-প্রসঙ্গ' এবং 'মুসলমান কবিদের খণ্ড-কবিতায় হিন্দু-প্রসঙ্গ'—প্রধানত এই চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে লেখক তাঁর অন্বিষ্ট বিষয় উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের দুই বৃহৎ ধর্ম-সম্প্রদায়ের সম্পর্কের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে লেখক তাঁর প্রগত চেতনার স্পর্শে একটি সমন্বিত মানবিকবোধই এখানে আবিষ্কার করেছেন। এ দৃষ্টিকোণে আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম গবেষণা। পরবর্তীকালে অনেক গবেষকই এ গ্রন্থের মডেলে বেশ কিছু গবেষণা-কর্ম সমাধা করেছেন। বাংলাদেশে সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বি. ঘো.

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : মোহিত লাল মজুমদার। প্রকাশকাল : ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৪৩ বাংলা। বাংলায় যথার্থ প্রতীচ্যরীতির সাহিত্য সমালোচনা প্রবর্তন করেন শশাঙ্ক মোহন সেন এবং মোহিত লাল মজুমদার। মোহিত লালের

www.pathagar.com

আলোচ্য গ্রন্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই বাঙালি জাতির চিত্ত চেতনার পরিচিতি ভাস্বর হয়ে উঠে। জীবনী শক্তি ও প্রাণশক্তির কথাও পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষভাগ অর্থাৎ মধুসূদন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নির্মিত সাহিত্যই আধুনিক সাহিত্য বলে বিবেচ্য। এ সময়ের ধারাক্রম অনুসরণ করেই নির্মিত হয়েছে মোহিত লাল মজুমদারের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থটি। এতে বঙ্কিম চন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, শরৎচন্দ্র সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত ছাড়াও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্যের ভাষা ও আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এর পরিশিষ্ট অংশটুকুও মূল্যবান। আলোচ্য গ্রন্থে কবি-সাহিত্যিক প্রতিভা, কবি-মানস ও কবিদের কাব্যকীর্তি আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি একটি যুগ বিশেষের রচনা হলেও যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। এবং প্রায় পথিকৃতের আলোচিত গ্রন্থ হিসেবেই এটি মূল্যবান। কারণ মোহিত লালের সমালোচনা গ্রন্থগুলোতে মতের ও মূল্যায়নের ভিন্নতা লক্ষণীয়। অ.ন.

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ রচিত ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালে। সর্বমোট দশটি অধ্যায় মিলে রচিত হয়েছে ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ। গ্রন্থভুক্ত অধ্যায়গুলো হচ্ছে—ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ভাষার শ্রেণীবিন্যাস, উপভাষাতত্ত্ব, লিখনরীতি, ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূলতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং বাগর্থতত্ত্ব। অধ্যায়গুলোর নামকরণ দেখেই সাধারণ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকারের অন্বিষ্ট ও অভীপ্সা উপলব্ধি করা যায়। ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত হয়েছে আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিকদের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে। তিনি ঐতিহাসিক, তুলনামূলক, গঠনমূলক ও রূপান্তরমূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বি. ঘো.

আধুনিক সমাজ ও বাংলাদেশের নারী : খালেদা সালাহউদ্দিন। প্রবন্ধের বই। প্রকাশক : পালক পাবলিশার্স, ২৯ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার। মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা। বইটিতে সংকলিত হয়েছে চারটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম হলো : ঢাকার মহিলা সমাজ, নারী ও কাজ : বাংলাদেশে, বন্যা ১৯৮৮ ও বাংলাদেশের নারী এবং আধুনিক সমাজ ও বাংলাদেশের নারী। ঢাকার মহিলা সমাজ শিরোনামের প্রবন্ধটি এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ঢাকার নারী সমাজের নানাবিধ তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা পর্যালোচনা করেছেন। এটিতে তিনি ঢাকা মহানগরীর নারী সমাজের স্বরূপ, বিবাহ ও তালাক, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মহিলা, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ঢাকার নারী-শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, পেশাজীবী মহিলা, নারী সংগঠন-আন্দোলন ও উপসংহারে নারীর অধিকার ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'আধুনিক সমাজ ও বাংলাদেশের নারী' প্রবন্ধটিও এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়--বাংলাদেশের নারী, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিতভাবে অলোচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলো উপস্থাপনা এবং ভাষা সহজ-সরল। খা.বি.জ.উ.

আধুনিক সাহিত্য : সমকালীন সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নসমৃদ্ধ প্রবন্ধ সমষ্টি, ১৩১৪ সনে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত

এবং 'ভারতী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি এ সংকলনে গৃহীত হয়েছে : বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, বিদ্যাপতির রাধিকা, কৃষ্ণচরিত্র, রাজাসিংহ, ফুলজানি, যুগান্তর, আর্যগাথা, আষাঢ়ে, মন্দ্র, শুভবিবাহ, মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, সিরাজদ্দৌলা, ঐতিহাসিক চিত্র, সাকার ও নিরাকার, জুবেয়ার, শোকসভা, নিরাকার উপাসনা, ডি-প্রোকান্ডিস। এই প্রবন্ধগুলি থেকে মোটামুটি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলিতে যেমন আছে কয়েকজন আধুনিক সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা (বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, তেমনি আছে কয়েকটি সমকালীন উপন্যাস (ফুলজানি, যুগান্তর, রাজসিংহ, শুভবিবাহ) ও কবিতা সংকলনের (আর্যগাথা, আষাঢ়ে, মন্দ্র) রসগ্রাহী সমালোচনা ; কৃষ্ণচরিত্র, মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, সাকার ও নিরাকার, সিরাজদ্দৌলা––এগুলিও গ্রন্থসমালোচনামূলক প্রবন্ধ। 'বিদ্যাপতির রাধিকা'য় মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবির সৃষ্টি সম্পর্কে রসসমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। ডি-প্রোফান্ডিস টেনিসনের একটি বিখ্যাত কবিতা, এই কবিতার তাৎপর্যের সঙ্গে কবি একাত্মতা অনুভব করেছেন। ফারসি সাহিত্যিক জুবেয়ার-এর ডায়েরির কোনো কোনো উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের মানসিকতার সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন। 'সাধনা' ও নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকালে প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে কবি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখান থেকে এগারটি প্রবন্ধ নির্বাচন করে আলোচ্য সংকলনে স্থান দিয়েছেন। এ গ্রন্থে সমকালীন সাহিত্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের নিস্পৃহ, আবেগমুক্ত ও যুক্তিভিত্তিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। **আ. হা. শা.**

আধুনিক সাহিত্য : মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : রাধাকান্ত শী ও হৃষীকেশ ভাদুড়ী। রাধাকান্ত শী কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২ ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা ৪ থেকে মুদ্রিত ও 'আধুনিক সাহিত্য' কার্যালয়, ৫৫ সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪ থেকে প্রকাশিত। মূল্য প্রতিসংখ্যা–চার আনা। প্রথম বর্ষ : দ্বাদশ সংখ্যায় 'আমাদের কথা অংশে' সম্পাদকদ্বয় বলেন : 'আধুনিক সাহিত্য'র প্রথম বর্ষ-পরিক্রমা শেষ হলো। এই এক বছরে 'আধুনিক সাহিত্য' বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রের-সর্বসাধারণের যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছে, তা যে কোনও সাহিত্যপত্রের ঈর্ষার বস্তু। এই অভূতপূর্ব অভিনন্দনের কারণ বোধ হয় এই যে, বর্তমানে বাংলাদেশে সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্য-সচেতন পাঠকের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ; আর সেই তুলনায় অকৃত্রিম সাহিত্যপত্রের সংখ্যালঘুতা। যাই হোক, 'সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য'-'আধুনিক সাহিত্য'র এই সুস্থ আদর্শ সাধারণ বাঙালি পাঠকসমাজ যে সংবর্ধিত করেছেন, এতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রই আনন্দিত হয়ে উঠবেন, আশা করি। কারণ, বিগত কয়েক বৎসর ধরে বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের নামে রাজনীতি ও বিশেষ মতবাদের যে অবাধ সংমিশ্রণ চলছিলো (এখনও কিছু কিছু চলছে), তাতে আর যাই হোক, সুসাহিত্য যে সৃষ্টি হয় না—প্রাত্যহিক মলিনতার ঊর্ধ্বে সার্থক কলা-উপভোগের নিরাকার আনন্দলোকে পৌঁছানো যায় না—এ সত্য দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগক্ষুব্ধ সাধারণের কাছে উপলব্ধ হওয়া যে কোনও বিপথগামী সাহিত্যের কাছেই নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। ... 'আধুনিক সাহিত্য'র বর্ষপূর্তির দিনও তাই শুধু আমাদের কাছেই নয়, বাংলা সাহিত্যের শুভ কামনা করেন, এরকম প্রত্যেকের কাছেই আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। আধুনিক সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ : ১ম সংখ্যা, 'বই-বই-বই' নামে নতুন বিভাগ খোলা হয়েছিলো। প্রসঙ্গত বলা হয়েছে 'এই বিভাগটি এবার নতুন খোলা হলো। উদ্দেশ্য : 'আধুনিক সাহিত্য'র পাঠক-পাঠিকাদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সম্প্রতি-প্রকাশিত সাহিত্য গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করা।' ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা আধুনিক সাহিত্য

www.pathagar.com

মাঘ-১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্নদা শংকর রায়, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশরাফ সিদ্দিকী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদাস পাঠক, নারায়ণ চৌধুরী, পার্বতী সাহা, মুহাম্মদ কায়সুল হক, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, হরপ্রসাদ মিত্র, পূর্ণেন্দু বিকাশ ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত শী ও হৃষীকেশ ভাদুড়ী আলোচ্য পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন। পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত ছিল। **আ. জ.**

আধুনিক সাহিত্য চর্চা : আবদুল হাফিজের লেখা ১৫টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রকাশকাল : ১৯৭৫, প্রকাশক : চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০। প্রচ্ছদ : বীরেন সান্যাল। বইয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধই স্বাধীনতা পূর্ব কালে লেখা। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য, কবি এজরা পাউন্ড, সাম্প্রতিক কবিতার আময়, আল মাহমুদের কবিতা,জিভাগোর কবিতা, একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষা প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র বিরোধিতা, বই পড়া, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সুকান্ত ইত্যাদি সাহিত্য নির্ভর রচনার পাশাপাশি সমকালীন আধুনিকতা ও রাজনীতি অনুষঙ্গী বিষয়, যেমন বীট জেনারেশন, অ্যালেন গীনসবার্গ, ইয়ুঙ ও প্রতীক, লোক ঐতিহ্য চর্চা, একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি প্রসঙ্গে আবদুল হাফিজের মননশীলতার পরিচয় প্রবন্ধগুলোর মধ্যে মূর্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্যে আধুনিকতার চেতনা যেসব পাশ্চাত্য ও স্বদেশীয় চিন্তানুষঙ্গ দ্বারা তরঙ্গিত হয়েছে তার সূত্র সন্ধান করেছেন আবদুল হাফিজ তাঁর এই বইয়ে। **আ. মা.**

আধুনিক সাহিত্য-বিবেচনা সমূহ : আবদুল হাফিজের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৮২। প্রকাশক : বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১ আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা-৩। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। মূল্য : ছত্রিশ টাকা। নানা সময়ে লেখা চৌদ্দটি প্রবন্ধের সংকলন। বাংলাদেশের সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতার বিবেচনা সংকলিত প্রবন্ধগুলোর কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। বাঙালির চিরকালীন সংস্কৃতি-চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধ ভাবনাও কয়েকটি প্রবন্ধের পার্শ্ববিষয়। প্রধানত বাংলাদেশের পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কবিতায় আধুনিকতা কীভাবে ক্রিয়াশীল তার পরিচয় সংকলনভুক্ত প্রবন্ধে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে জীবনানন্দ বিষয়ে লিখিত প্রথম সমালোচনা প্রবন্ধ জীবনানন্দ দাশ : একটি ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধও এতে অন্তর্ভুক্ত। সিকান্দার আবু জাফর, মযহারুল ইসলাম. আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হকের কবিতাকে এ বইয়ে বেশ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত কবিদের কবিসত্তার চারিত্র্য শনাক্ত করণে প্রবন্ধগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লোক সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত আধুনিক চিন্তার পরিচয় এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনগণের সাহিত্য-শিল্প বিষয়ে একটি চেতনা উজ্জীবক প্রবন্ধও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। **আ. মা.**

আধুনিকী : ঋষি দাস কর্তৃক সংকলিত আধুনিক বাংলা ভাষার সরল অভিধান। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার প্রাচীন ও আধুনিক, প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের সংকলন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত। প্রকাশক ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২ থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৮৬৬। পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৬৭। সংকলনের ভূমিকায় জানা যায়, প্রায় ছয় বছর আগে এই অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। **বি. বি.**

আধ্যাত্মিকা : প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত ধর্মবিষয়ক বাংলা পুস্তক। প্রকাশকাল ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ প্রাকৃত জীবন বহির্ভূত ঘটনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এর নায়িকার নাম আধ্যাত্মিকা। তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একটানা আধ্যাত্মতত্ত্বের প্রবাহ বয়ে গেছে। ব্রাহ্মণকন্যা আধ্যাত্মিকাকে উপলক্ষ করে

www.pathagar.com

রূপক ছলে লেখক আত্মজ্ঞান ও পরমাশান্তি লাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। বিষয়ী লোকদের মতিগতি সম্পর্কেও বিবিধ প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। গ্রন্থের মূলবিষয় আধ্যাত্মিকভাবে পরিকীর্ণ হলেও প্যারীচাঁদ এর কোথাও কোথাও তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—'ওরে মিন্সে। ভাত যে কড়কড়া হল, আটকুড়ীর বেড়াল পাত থেকে মাছটা নিয়ে গেল, এখন কি দিয়ে গিল্‌বি?' (একাদশ পরিচ্ছেদ)। **আ. জ.**

আনন্দ কুসুম : নির্মলেন্দু গুণ রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক : মুক্তধারা ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১১৫ রবীন্দ্রবর্ষ, প্রচ্ছদ : মৈত্রেয় রায়, মূল্য : আট টাকা মাত্র। এই কাব্যগ্রন্থটিতে রয়েছে সাঁইত্রিশটি কবিতা। অধিকাংশ কবিতা কাব্যসৃষ্টি বিষয়ক। ব্যক্তিগত অনুভূতি, বিরহ বেদনা এবং না পাওয়ার প্রচণ্ড ক্ষোভ কোনো কোনো কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই গ্রন্থটির মূল সুর সৃষ্টির প্রকাশ। প্রেমাংসুর রক্তচাই নিয়ে নির্মলেন্দু গুণের যাত্রা। আনন্দ কুসুম পড়ে পাঠক আলোকোজ্জ্বল প্রীতিময় জগতের নির্দেশন খুঁজে পাবেন। নির্মলেন্দু গুণের কাব্য ভাষা সহজ-সরল। তিনি কবিতাকে সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্য করেছেন। এই গ্রন্থের কাব্যভাবনার সঙ্গে ভাষা তথা শব্দ নির্মাণ কৌশল অপূর্ব। আবেগ প্রকাশে যথেষ্ট সাবধানী কিন্তু স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। নিজের নামের শেষ বিরচিত শব্দটি ব্যবহার করে কবিতার ঐতিহ্য ও পূর্বসূরিদের মর্যাদা প্রদান করেছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কবিতা সেই উলুধ্বনি, তোমার আত্মপ্রকাশ, তোমার মানুষ, বন্ধু, সেই প্রজাপতি, সেই চৈত্রের সূর্য, শর শয্যা, পাঠিকাদের প্রতিও নাম রেখেছি দেবী এই গ্রন্থে সংকলিত। আনন্দ কুসুম কবিতায় গ্রন্থকার কাব্যসৃষ্টির অমিয় কাহিনী বিধৃত করেছেন এভাবে : এতেক লিখিয়া বঙ্গদেশীয় কবি/নিজনির্মিত খৈনী পুরিল ঠোঁটে/ভাবের তরল গরলে মিশিয়া যদি/একটি সহজ সরল কবিতা ফোটে/রাত্রির কাছে কাগজের কাছে তবে/অন্তত তার কিছুটা গর্ব রবে।/কালো রাত্রির প্রতিটি উজান ঠেলে/বুকের পাঁজরে শব্দের দীপ জ্বেলে/ এইপ্রার্থনা কার কাছে যার জানি/ইঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলি/দয়া চাই দেবী, দয়া কর বীণাপাণি। 'নাম রেখেছি দেবী' কবিতাটির মূল বক্তব্যটুকুও অনুরূপ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট সুন্দর। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন নীরাকে। **খা. বি.জ. উ.**

আনন্দচন্দ্র মিত্র : কবি, গীতিকার ও সমাজকর্মী। ১৮৫৪ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বঙ্গচন্দ্র মিত্র। দীর্ঘ দিন ময়মনসিংহে শিক্ষকতা করেন ও পরে কলকাতা কর্পোরেশনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ও বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমী ছিলেন। 'মিত্রকাব্য', 'হেলেনা কাব্য', 'ভারতমঙ্গল' প্রভৃতি তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা এগারোটি। তিনি বহু গান রচনা করেন। দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম তাঁর কবিতার যেমন তাঁর গানেরও তেমনি মুখ্য বিষয়। বালবিধবার যন্ত্রণা সম্পর্কে তাঁর গান 'ভারত-শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবা বালা/ বিষের মুরতি করি বিধি আমায় পাঠাইলা' এককালে বিপুল খ্যাতি লাভ করেছিল। কিছু ভক্তিগীতিও রচনা করেন। তাঁর গান প্রধানত রাগ গীতি। তিনি কবিতা ও গানের ভণিতায় 'পথিক' নাম ব্যবহার করতেন। তিনি ১৯০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন **ক. গো.**

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি : সুপণ্ডিত, পাঁচালিকার ও গীত রচয়িতা। চব্বিশ পরগনায় জন্ম। জীবন কাল ১৮০৭-১৮৭৯ সাল পর্যন্ত। পিতা কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। তাঁর রচিত 'সুবল সংবাদ', 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্ক ভঞ্জন' প্রভৃতি পালা জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি বহু গান রচনা করেন। অধিকাংশ গানই অসঙ্কলিত অবস্থায় লুপ্ত হয়ে গেছে। টপ্পা ঢঙে রচিত তাঁর বেশ কিছু গান পাওয়া যায়। পালার মতোই তাঁর গানগুলোর অধিকাংশই কৃষ্ণলীলার পটভূমিতে রচিত। **ক. গো.**

www.pathagar.com

আনন্দনগর : দোমিনিক লাপিয়ের রচিত 'দ্য সিটি অফ জয়' গ্রন্থের অনুবাদ। বইটি অনুবাদ করেছেন রবিশেখর সেনগুপ্ত। প্রকাশ করেছে এস.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪ বঙ্কিম স্ট্রীট , কলকাতা। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৭। মূল্য : ৪০.০০ টাকা। দোমিনিক ফরাসি সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ। ১৯৪৮ সালে ১৭ বছর বয়সে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয়। বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবন তাঁর। ১৯৮১ সালে তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি সেবা কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় কুষ্ঠ গ্রস্থদের কেন্দ্রে কাজ করার সময় তিনি এই বইয়ের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। বইয়ের সূচনায় তিনি হাসারি নামক একজন লোকের বর্ণনা দিয়েছেন, যাকে 'মোঘল যোদ্ধাদের মতন দেখায়, তার মাথায় শক্ত ঘন কুচকানো চুল, তার জুলফি এসে মিশেছে পুরোগোফের সঙ্গে ; তাঁর চেহারা বলিষ্ঠ, আকারে খাটো, হাত দু'টো পেশী বহুল, পা দু'টো ধনুকের মতো বাঁকানো'। তিনি আরো বলেছেন : তবে দেখতে যেমনই হ'ক না কেন, বত্রিশ বছর বয়সের হাসারি পাল নেহাতই একজন নিরীহ চাষী। পঞ্চাশ কোটি ভারতবাসীর একজন, জীবন ধারণের জন্যে যাদের মাতা ধরিত্রীর কাছে কৃপা-করুণা চাইতে হয়। লেখক হারিস পালের যে দৈহিক বর্ণনা দিয়ে বইটির সূচনা করেছেন এমন মানুষ পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র দেখা যায় বলে মনে হয় না। এ বর্ণনা যেন কল্পনার মানুষের। তবু যে ঘড়ের ছাউনি আর মাটির দেয়াল লেপে হাসারী তার দু'ঘরের কুঁড়ে বানিয়েছিল বাকুলী গ্রামের প্রান্তে—এইসব নীরস্ত্র মানুষই এ বইয়ের পাত্র-পাত্রী। তিনটি অধ্যায়ের সমাপ্তিসহ ৭২টি পরিচ্ছেদে বইটি রচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম : 'তুমিই জগতের জ্যোতি' ; দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম : 'মানুষ নামক ঘোড়া/আগুন রথে জোড়া' ; তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম : 'প্রিয়তমা কলকাতা'। এই তিনটি অধ্যায়ের লেখক আনন্দনগর নামে অভিহিত কলকাতার বস্তি জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, সঙ্গে গল্প আছে, খ্রিস্টান ধর্মের কথা আছে, দুঃখ-বেদনা, দুর্দশার ভেতর দিয়ে মানুষের জীবনযাপনের অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে। এদের জীবনবোধ নিয়ে যখন নায়ক ম্যাকস বলে 'পোড় খাওয়া এই মানুষগুলো যেনো কিছুতেই ভেঙ্গে পড়ে না। কী দুর্বার জীবনী শক্তি এদের। দুঃখের চাবুক খেয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, কিন্তু আশা ছাড়েনি।' এইসব মানুষেরা দেশের সরকার প্রধানের মুখ থেকে আশার বাণী শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয় ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি এটাও বুঝতে পারে যে, তাদের জননী ইন্দিরা গান্ধী আণবিক বোমাও ফাটায়, তারা জানে এই বোমা মানব জীবনের কোনো কল্যাণের উপাদান নয়। এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ঘটে এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। লেখক গবেষণা করে এই বই লিখেছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু গবেষণার সংগ্রহ এতই নীরেট যে তিনি বাঙালি-বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে নোবেল পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছেন ! ! সে. হো.

আনন্দ বাগচী : কবি। জন্মস্থান স্বাগতা গ্রাম, পাবনা। জন্ম সাল ১৯৩৩। বর্তমান নিবাস বাকুঁড়া। অধ্যাপনা তাঁর পেশা ছিল। বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনি উদ্বুদ্ধ হন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা। বিদেশী কবিদের মধ্যে প্রিয় কবি টি. এস. এলিয়ট। তিনি মনে করেন সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে কবিতা। কবিতার মধ্যে জীবন অথবা নৈসর্গিক বিষয়ের রসপ্রবাহ যতখানি বিদ্যমান অন্য যে কোনো শিল্পে তা সুলভ নয়। অতএব কবিতাই সাহিত্যের স্বরাট ও সম্রাট। সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করে কবিতা এক সময় স্থিত হবেই। তাঁর কথায় "সমস্ত সাহিত্যের সোনারূপা তামার তলায় সে কষ্টিপাথর হয়েই থাকবে।" আনন্দ বাগচীর কবিতার অনুভব যেমন হৃদয়গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন। তাঁর কবিতায় আবেগ আছে, কিন্তু আবেগের মাত্রাবাহুল্য নেই। চোখের দৃষ্টিতে তিনি আকাশ দেখলেও মাটিতে

www.pathagar.com

তাঁর পা থাকে স্থিত। অতিরিক্ত সমাজ সচেতন কবি তিনি। ছন্দ পারিপাট্য ও অনায়াস ছবিঅঙ্কন প্রবণতা তাঁর শিল্পমানসের বৈশিষ্ট্য। যুগযন্ত্রণার অভিব্যক্তিকল্পে তাঁর কবিতার ভাষা কখনো শাণিত ইস্পাতের মতো ঝলসে ওঠে। আনন্দ বাগচীর কবিতার বই—তিনটি স্বগত সন্ধ্যা (১৯৫৪), তেপান্তর (১৯৫৯), স্বকাল পুরুষ (১৯৬৪) ইত্যাদি। সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা--সেতু, কৃত্তিবাস, পারাবত। মৃত্যু সাল অজ্ঞাত। আ. জ. ভূ.

আনন্দ ভৈরব : দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে ঋষভ কোমল হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। সম্পূর্ণ জাতি। আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমেই সাত স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাদী স্বর পঞ্চম, সংবাদী স্বর ষড়জ। ঠাট ভৈরব। আরোহ : স ঋ গ ম প ধ ন র্স। অবরোহ : র্স ন ধ প ম গ ঋ স। ক. গো.

আনন্দ ভৈরবী : দিবা গেয় রাগ। এই রাগে কোমল গানধার, কোমল নিষাদ এবং কোমল শুদ্ধ উভয় ধৈবত ব্যবহৃত হয়। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ছয় স্বর এবং অবরোহে সাত স্বর প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আরোহে নিষাদ বর্জিত। বাদী স্বর পঞ্চম, সংবাদী স্বর ষড়জ। ঠাট আশাবরী। আরোহ : স র জ্ঞ খ প ধ র্স। অবরোহ : স ণ দ প স জ্ঞ র স। ক. গো.

আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাস। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। তবে, এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এই উপন্যাসের সকল পাত্র-পাত্রী ও ঘটনার সন্নিবেশ বঙ্কিমের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। 'আনন্দমঠ' বাস্তবানুগ রোমান্সধর্মী উপন্যাস। গভীর অরণ্যমধ্যে উপস্থিত আনন্দমঠ নামক মন্দিরকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী প্রসার লাভ করেছে। মহাপুরুষ বা চিকিৎসক এই উপন্যাসের কাহিনীর ব্যাখ্যাতা। তিনি নায়ক সত্যানন্দকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন ; কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষভাবে কোনো কাজে ব্রতী হননি। স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতি 'আনন্দমঠের' মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই উপন্যাসে বঙ্কিম স্বদেশ বলতে বঙ্গভূমিকে এবং জাতি ও ধর্ম বলতে বাঙালি হিন্দু ও হিন্দু ধর্মকে বুঝিয়েছেন। দেশ সন্তানগণের জননী এবং তাঁরা দেশমাতৃকার আরাধনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই ভাব অভিনব। সন্তান সম্প্রদায় মুসলমান (আসলে মুঘলরাজশক্তি) বিদ্বেষী বিদ্রোহী। তাঁরা যুদ্ধ করে মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজসেনা পরাজিত হয়েছে। সত্যানন্দ হিন্দু রাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মতের পোষকতা করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'সমাজবিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র এবং বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাংলাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।' সন্তান সম্প্রদায় দেশের লোকের ধন ও প্রাণ অপহরণ করে যে সমাজ বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন, তা আত্মহত্যার নামান্তর। তাই, মহাপুরুষ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, "প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, ইংরেজরা বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। ...যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান ও গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ অক্ষয় থাকবে।" তাই, বিসর্জন এসে প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে গেল। শান্তি ও জীবনানন্দ দেবার্চনায় জীবন কাটাবার জন্য হিমালয় চলে গেলেন, মহেন্দ্র ও কল্যাণী কন্যা সুকুমারীকে নিয়ে পদচিহ্ন গ্রামে গৃহকর্মে প্রত্যাবর্তন করলেন, সত্যানন্দ মহাপুরুষের হাত ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভবানন্দের কল্যাণীর প্রতি আকর্ষণ, জীবনানন্দের শান্তির প্রতি মোহ এবং পুরুষবেশী শান্তির সঙ্গে স্ত্রী কল্যাণীকে দেখে মহেন্দ্র যে ভাবে রুষ্ট হয়েছেন তাতে তাঁদের ইন্দ্রিয় জয়ের কোন মহিমা বর্তমান থাকেনি। তাই, এই চরিত্র-গুলো ভাবের প্রতীক না হয়ে কিছুটা রক্ত মাংসের মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম' গান ইংরেজ-

www.pathagar.com

বিরোধী আন্দোলনে দীক্ষা মন্ত্রের কাজ করেছিল এবং এই উপন্যাস জাতীয় জাগরণে বাংলা তথা ভারতীয় জনমানসের চিত্তকে উদ্দীপিত করেছিল। ন্‌. ই

আনন্দময় মৈত্র : গীতিরচনার জন্য খ্যাত। নদীয়ায় জন্ম। জীবনকাল ১৮২৯-১৯০৪ সাল পর্যন্ত। পিতা কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্র। কর্মজীবনে নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। শ্যামা ও শ্যাম উভয়েই তাঁর ভক্তিমূলক গানের বিষয়। 'আনন্দসঙ্গীত' তাঁর গীতি সঙ্কলন গ্রন্থ। ক. গো

আনন্দময়ী দর্শন : কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হাস্যরসের গল্প। 'কবুলতি' (১৯২৮) গল্পগ্রন্থের অন্যতম গল্প। কৌতুকের সঙ্গে জীবনরসের কিছু পরিচয় আছে এ গল্পে। এতে লেখকের সমকালীন জীবনের উজ্জ্বল নকশা অঙ্কিত হয়েছে। লেখক একে 'লিপিচিত্র' হিসেবে অভিহিত করেছেন। গল্পের চরিত্র সতীশ, সুলতান, গার্ড, স্টেশনমাস্টার সকলের মধ্যেই আনন্দময়ী দর্শনের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। এদের মধ্যে মহত্ত্বের পরিচয়ও আছে। এই মহত্ত্বের আসরে সকলেই ভাবাবেগে আর্দ্র হয়েছে। দেবীদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলও তাই। বৈঁচির স্টেশনমাস্টারের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে মধুর ও হাস্যরসের ধারাটি সহজেই উপভোগ করা যায়। গল্পের উদ্দেশ্য সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে। 'আনন্দময়ী দর্শনে' ব্যক্তিজীবন এবং ঘটনা বিশেষের যে সরস বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে লেখকের নির্মল হাস্যরসের ভাণ্ডারটি যেন উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। এতে সমাজসমালোচনার প্রয়াস নেই, ব্যক্তিজীবনের মহত্তম দিকের নির্দেশে সহজ জীবনলীলা কৌতুকের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। আ. ন. ম. ব. র.

আনন্দলহরী : এক প্রকার লোকবাদ্য। ক্ষুদ্রাকার ঢোলের একপাশ চর্মাচ্ছাদিত থাকে, আরেক পাশ থাকে খোলা। আচ্ছাদিত দিকের মধ্যভাগ দিয়ে ছোট্ট কাঠের টুকরোর সঙ্গে যুক্ত একগাছি তাঁত বের করে এনে অনাচ্ছাদিত দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কাঠের খোলটি বাম কক্ষে চেপে খোলামুখ দিয়ে বের হয়ে আসা তাঁতটি বাঁ হাতে টেনে ধরে তাতে ডান হাতে কাঠের বা নারকেলের মালার ছোট্ট টুকরোর সাহায্যে আঘাত করে একপ্রকার ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। তাঁতের টান শক্ত বা ঢিলে করলে ধ্বনির উচ্চতার তারতম্য হয়। বাউলশ্রেণীর গানে আনন্দলহরীর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। একে গুবগুবি, খমক প্রভৃতি নামেও আখ্যায়িত করা হয়। ক. গো.

আনন্দের মৃত্যু : সৈয়দ শামসুল হক। গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৪ আগস্ট, ১৯৬৭। প্রকাশক সাইনিং বুক এজেন্সী, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য চার টাকা। এই গল্পগ্রন্থে গল্পসংখ্যা মোট তেরটি। গল্পগুলো হচ্ছে : কবি, নাম,. আনন্দের মৃত্যু, ফিরে আসে, বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যে ও শেষ বাস, পরাজয়ের পর, কালামাঝির চড়নদার, নাটক সে এবং যা হয় না, রুটি ও গোলাপ, ঘরে ফেরা, তৃষ্ণা, যদি জানতে চান এবং শিকার। ষাটের দশকে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের এই গল্পসমূহ নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের চিত্র প্রকাশ করেছে এক অনবদ্য শিল্প বৈশিষ্ট্যে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গল্প 'কবি' ; যে-গল্পের ভেতর আইয়ুবের সামরিক শাসনে বাক স্বাধীনতা হরণের এক অসাধারণ প্রতীকী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি সমসাময়িক কালের একটি বিশ্বস্ত সাহিত্য দলিল। র.হা.

আনন্দের মৃত্যু নেই : কবি মহাদেব সাহা'র প্রবন্ধের বই। বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে এটি যে ১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটিতে মোট তিনটি অধ্যায় রয়েছে। এগুলো হলো--প্রাণের মাঝে সুধা আছে, কবিতার মুক্তি এবং আনন্দের মৃত্যু নেই। এছাড়া রয়েছে 'ভূমিকা' ও 'পরিশিষ্ট' শীর্ষক দুটি দীর্ঘ আলোচনা। 'আনন্দের মৃত্যু নেই' মহাদেব

www.pathagar.com

সাহা'র প্রথম গদ্যের বই এবং এটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে জীবনানন্দ দাশের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। সমালোচক, প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে বহু বিদগ্ধজনের মূল্যবান মতামত ও মনোজ্ঞ আলোচনা অপ্রতুল নয়। তারপরও এ ধরনের আলোচনার আর প্রয়োজনই বা কোথায়? এ সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর লেখক এভাবে দিয়েছেন—'আমার আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতা নয়, বলা যায় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ; রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের আলোকেই আধুনিক কবিতার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ। ...রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা কবিতার ঋণের শেষ নেই, তিরিশের ঋণও তাঁর কাছে অশেষ। আধুনিক বাংলা কবিতা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের শিকড় সামান্য নয়। তিরিশের প্রধান পাঁচজন কবির বিরাট সাফল্য ও স্মরণীয় কৃতিত্বও তাই রবীন্দ্রনাথের এই ঐতিহ্যের আলোকেই বিশ্লেষণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে কিংবা তাঁকে পাশ কাটিয়ে তিরিশের কবিতার সাফল্য প্রমাণ করতে গেলে তাতে তিরিশের কবিতাকেই বরং খণ্ডিত করা হবে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই তিরিশের কবিতার সাফল্য এবং যতো সীমিতভাবেই হোক তিরিশকে নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ণতা'। উন্নত সংস্কৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়েছিলেন। সেখানে ক্ষুদ্রতা ও মিথ্যার অবকাশ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যেমন মহৎ কবি তেমনি পরিপূর্ণ মানুষও। গ্রন্থটিতে এ সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয়। শা. আ.

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ : সাহিত্যিক। ফরিদপুর শহরে ১৯১১ সালের ৮ মে জন্ম। পূর্ণ নাম আবু নঈম মুহম্মদ বজলুর রশীদ। পিতা হারুনুর রশীদ ছিলেন ফরিদপুর জেলা আদালতের একজন আইনজীবী। মাতা নছিমুননেসা, স্ত্রী হাশমত বেগম। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯২৮ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে আই. এ., একই কলেজ থেকে ১৯৩৩ সালে বি. এ. ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ সালে প্রথম বিভাগে বি. টি. পাস করেন। বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. (১৯৫৪) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে সরকারি স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঢাকা মুসলিম গভর্নমেন্ট স্কুল, জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল ও ঢাকা আরমানিটোলা গভর্নমেন্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের লেকচারার পদে যোগ দেন। ১৯৬৪ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ধ্বনিবিজ্ঞানের খণ্ডকালীন অধ্যাপক (১৯৭৩-১৯৭৫) ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ধ্বনিবিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯৭৫-১৯৮০) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কবিতা, নাটক,. ভ্রমণকাহিনী ও সমালোচনা সাহিত্যের তিনি একজন বিশিষ্ট স্রষ্টা। জীবনের প্রতি ভালবাসা, দেশাত্মবোধ ও নিসর্গপ্রীতি তাঁর সাহিত্যকর্মে মনোরমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নাটকের সংলাপ মধুর ও মার্জিত। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের উপর তাঁর সরস আলোচনা রয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য —পান্থবীণা (১৯৪৭), রঙ ও রেখা (১৯৬৮), এক ঝাঁক পাখি (১৯৬৯), নাটক—উত্তর-ফাল্গুনী (১৯৬৪), শিলা ও শৈলী (১৯৬৭), সুর ও ছন্দ (১৯৬৭), রূপান্তর (১৯৭০) ; সমালোচনা : রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮), জীবনবাদী রবীন্দ্রনাথ (১৯৭২), ভ্রমণকাহিনী—দুই সাগরের দেশে (১৯৬৩), পথ ও পৃথিবী (১৯৬৪)। সাহিত্যকৃতির জন্য তমঘায়ে ইমতিয়াজ (১৩৭৬) ও নাটক বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭) লাভ করেন। ১৯৮৬ সালের ৮

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। নূ. ই

আনসার : 'আনসার' শব্দটির (বাঙলা) অর্থ সাহায্যকারী। ইসলামের ইতিহাসে 'আনসার' বলতে হযরত মুহম্মদ (দঃ)-কে মদীনায় সাহায্যকারী মুসলমানদেরকে বোঝায়। মক্কায় ইসলাম প্রচার যখন হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পক্ষে বিপজ্জনক হলো, দীক্ষিত মুসলমানদের উপর মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার যখন দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো, তখন একদিন নবী (দঃ) তাঁর অনুচরগণসহ মক্কা ত্যাগ করে মদীনা গমন করলেন। তখন মদীনার কিছু নতুন মুসলমান হযরত ও তার সহচরদেরকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করলেন এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এদেরকে ইতিহাসে 'আনসার' বা সাহায্যকারী বলা হয়ে থাকে। আ. জ.

আনসারী (খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের শেষ দশক) **:** এঁর আসল নাম হাসান বিন আহমদ। 'কুনিয়াত' আবুল কাসিম এবং কবিনাম আনসারী। পৈতৃক নিবাস বলখ রাজ্য। প্রথম জীবনে জীবিকার উপায় হিসেবে পৈতৃক পেশা সওদাগরি শুরু করেন। পরে ব্যবসা ছেড়ে তিনি পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন। বিদ্যা অর্জনকালেই তিনি কাব্য-সাধনায় ঝুঁকে পড়েন। কাব্যচর্চা উপলক্ষে কবি আনসারী সুলতান মাহমুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নসর বিন সুবক্তগীনের দরবারে সমাদৃত হন। ক্রমে কবি সুলতান মাহমুদের দরবারে রাজ কবির আসন লাভ করেন। রাজসভার অন্যান্য কবির কাব্য ও আনসারীর অনুমোদন সাপেক্ষে পঠিত হতো। সুলতান মাহমুদের অনুগ্রহে কবি আনসারীর ধনসম্পদও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। আনসারীর সমসাময়িক কবিদের বর্ণনা থেকে একথা বোঝা যায়। সুলতান মাহমুদের দরবারের চারশ' পারস্য কবির মধ্যে ফররোখী, আসজাদী, আনসারী ও মুনচেহরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাঁদের মধ্যে কবি আনসারীর রচনায় সুলতান মাহমুদের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কবি আনসারীর কবিতার সংখ্যা ত্রিশ হাজার বলে উল্লিখিত হয়েছে ; কিন্তু বর্তমানে মাত্র তিন হাজার অবশিষ্ট আছে। কাসিদা ছাড়া তিনি তিনটি মসনবীও রচনা করেছেন। আনসারীর সমকক্ষ কবি সে যুগে কেউ ছিলেন না। তিনি একজন প্রত্যুৎপন্নমতি কবি ছিলেন। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে ৪৩১ হিজরীতে কবি আনসারী পরলোকগমন করেন। সু. মু.

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা (১-১৭ খণ্ড) : রাশিয়ার বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক নিকোলাই নোসভের লেখা শিশুতোষ সচিত্র বই। এর চরিত্ররা সবাই ছোট বা টুকুনরা। এর একটি প্রধান চরিত্র আনড়ি অর্থাৎ যে সত্যিকার অর্থেই আনাড়ি অথচ সবকিছু জানার ভান করে। এই বইয়ের চরিত্রগুলোর নামও অদ্ভুত—বটিকা-ডাক্তার টুকুনদের সব রোগের চিকিৎসা করত। নাট নামে এক মিস্ত্রী, সাকরেদ বল্টু, ছিল মিস্টার স্যাকারিন সিরাপ, শিকারি টোটারাম এবং তার ছিল তুতুরাম নামে একটা ছোট্ট কুকুর, সুরতান নামে এক বাজিয়ে, পরকলা নামে জ্যোতির্বিদ, সব সময় বক বক করা বক্কেশ্বর, সদা ব্যস্ত ব্যস্তবাগীশ, মৌনেশ্বর, পিঠেপুলি, কেবনাকাণ্ড, হয়ত ও নয়ত নামে দুই ভাই—এরকম সব খোকন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা যেমন ওই আনাড়ি, আবার সবজান্তা ছিল চৌকশ। এই অসাধারণ সিরিজ বইয়ের লেখক নিকোলাই নোসভ। মোট ১৭টি খণ্ড আমাদের শিশুদের জন্য অনুবাদ হয়েছে রাদুগা প্রকাশন, মস্কো থেকে। কিন্তু সিরিজটিতে আরো কয়েকটি খণ্ড আছে এবং তা শেষ পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ হয় নি। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ সালে এই ১৭টি খণ্ড অনূদিত হয়। প্রতিটি খণ্ড ১৬ পৃষ্ঠা। অনুবাদ করেছেন অরুণ সোম, চার রঙে পাতায় পাতায় ছবি এঁকেছেন বরিস কানাউতশিন। বি.ব.

www.pathagar.com

আনাতোল ফ্রাঁস : ফরাসি কথাসাহিতিক। ১৮৪৪ সালের ১৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান প্যারিস শহর। মৃত্যু ১৯২৪ সালের ১২ অক্টোবর। আসল নাম আনাতোল থিবো। আনাতোল ফ্রাঁস ফরাসি সাহিত্যের একজন ঔপন্যাসিক ও সমালোচক। পিতা ছিলেন পুস্তক ব্যবসায়ী। পিতার সেই দোকানে বসে আনাতোল ফ্রাঁস দেশবিদেশের সাহিত্যের সংগে পরিচিত হন। এছাড়া দোকানে আগত বহু জ্ঞানীগুণীর সংস্পর্শে আসেন তিনি। কবিতা দিয়েই আনাতোল ফ্রাঁস সাহিত্য জীবন শুরু করেন, নাটকও লিখতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে ছোট গল্পে ও উপন্যাসে। তাঁর সেরা সৃষ্টি হচ্ছে 'দি ক্রাইম ডি সাইলভাস্টার বোনোয়ার্ড' (ইংরেজি অনুবাদ 'দি ক্রাইম অফ সাইলভাস্টার বোনোয়ার্ড') 'পাপপুণ্য' উপন্যাসটি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই উপন্যাসটির জন্য আনাতোল ফ্রাঁস ফ্রেঞ্চ একাডেমী কর্তৃক পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৮৯৬ সালে তিনি ফ্রেঞ্চ একাডেমীর সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালে সাহিত্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। আনাতোল ফ্রাঁসের অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'Thais', 'The life of Joan of Arc' (Vice de Jeanned Arc), Peuguin Island (The des penguins). বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আনাতোল ফ্রাঁসের প্রভাব যথেষ্ট। সু.মু.

আনারসের হাসি : বশীর আলহেলাল রচিত শিশু-কিশোরদের জন্য গল্পের বই। প্রথম প্রকাশ : মাঘ-১৩৮০, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাতটি গল্প নিয়ে আনারসের হাসি বইটি লেখা। এই বইয়ের দ্বিতীয় গল্পটির নাম আনারসের হাসি। গল্পটি ছোটদের জন্য রচিত হলেও গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বেশ চিন্তা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে। যে চোখ দিয়ে আনারস হাসতো, কেটে ফেলার পর সেই আনারসের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। উবে গেছে চোখের হাসি। এটি একটি চমৎকার গল্প। আনারসের হাসি ছাড়া এই গল্প গ্রন্থটিতে রয়েছে : প্রাণ ভোমরা, নিষ্ঠুর, ভাগ্যবান শেয়ালের গল্প, মোড়ল মোরগ, কান্ডারী ও শক্ত ফুফা শিরোনামের আরো ছটি গল্প। এসব গল্পের মানুষগুলো আমাদের চারপাশের। সহজ-সরল ভাষায় প্রত্যেকটি গল্পের বর্ণনা। গল্পকার শক্তফুক গল্পে লিখেছেন : সৈয়দ শাহ শওকত আলী মিয়া এক বিরাট জমিদার পরিবারের ছেলে। খুব বনেদি বংশ তাদের। কিন্তু সেই জমিদারি ক্রমে ক্ষয় হতে থাকে। নানা অন্যায় আর অবিচারে এবং আত্মকলহে শেষ পর্যন্ত তা লয় পায়। এমনি করে প্রত্যেকটি গল্পের কাহিনী বুনন করা হয়েছে। খা.বি.উ.জ.

আনিস চৌধুরী : নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক। কলকাতার তালতলা লেনে ১৯২৯ সালের ১৫ এপ্রিল মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস গোপিনাথপুর, কসবা-কুমিল্লা। পিতা নূরুল হুদা চৌধুরী বি.এ., মাতা আসেমা খাতুন, স্ত্রী রাজিয়া চৌধুরী। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ১৯৪৪ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে প্রথম বিভাগে আই. এসসি. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে বি. এসসি. পাস করেন। পেশাগত জীবনে রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক, বাংলাদেশ বেতারের বার্তা পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব বিভাগের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। নাটক ও কথাসাহিত্য উভয় ধারার তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। মানচিত্র (১৯৬৩) ও এ্যালবাম (১৯৬৫) তাঁর দু'টি সাড়াজাগানো নাটক। কাল-সচেতনতা, প্রাণবন্ত চরিত্র, তীক্ষ্ণ ও সজীব সংলাপ তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ-দৈন্য ও লাঞ্ছনার করুণ চিত্র এবং অস্তিত্ব

www.pathagar.com

রক্ষার সংগ্রামের আলেখ্য এঁকেছেন তাঁর নাটক, উপন্যাস ও গল্পে। প্রকাশিত গ্রন্থ—নাটক : মানচিত্র (১৯৬৩), এ্যালবাম (১৯৬৫), চেহারা (১৯৭৯); উপন্যাস : সৌরভ (১৯৬৮), মধুগড় (১৯৭৪), ঐ রকম একজন (১৯৮৬); গল্প সংকলন : সুদর্শন ডাকছে (১৯৭৮)। ১৯৬৮ সালে নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯০ সালের ২ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। নূ.ই.

আনিসুজ্জামান : গবেষক, প্রাবন্ধিক। ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার প্রিয়নাথ হাইস্কুল থেকে ১৯৫১ সালে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিষয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালি মুসলমানের চিন্তাধারা' (১৭৫৭–১৯১৮)। ১৯৬৪–১৯৬৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য ডিগ্রি : কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলো, স্কুল অব অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪–৭৫)। তিনি ঢাকা বিশ্বদিব্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ–গবেষণা : মুসলিম–মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪) ; মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৯৬৯) ; মুনীর চৌধুরী (১৯৭৫) ; স্বরূপের সন্ধানে (১৯৭৬); Social Aspects of Endogenous Intellectual Creativity (১৯৭৯); Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records (১৯৮১); আঠারো শতকের বাংলা চিঠি (১৯৮৩) ; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৮৩) ; পুরোনো বাংলা গদ্য (১৯৮৪); মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯৮৮) ; Creativity, Reality and Identity (১৯৯৩); Cultural pluralism (১৯৯৩) ; Identity, Religion and Recent History (১৯৯৫) ; আমার একাত্তর (১৯৯৭); সম্পাদনা : রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮) ; মুনীর চৌধুরী-রচনাবলী, ১–৪ খণ্ড (১৯৮২–১৯৮৬); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (অন্যদের সহযোগে, ১৯৮৭); অজিত গুহ স্মারকগ্রন্থ (১৯৯০); স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন (১৯৯২); শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থ (১৯৯৩); নজরুল রচনাবলী, ১–৪ খণ্ড (অন্যদের সহযোগে, ১৯৯৩); SAARC : a People's Perspective (১৯৯৩); শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা (১৯৯৫); মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-রচনাবলী (১–২ খণ্ড, ১৯৯৪–১৯৯৫); পুরস্কার : নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬); স্ট্যানিলি ম্যারন পুরস্কার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৮); দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫); বাংলা একাডেমী পুরস্কার (প্রবন্ধ–গবেষণা, ১৯৭০); অলক্ত পুরস্কার (১৯৮৩); একুশে পদক (শিক্ষা, ১৯৮৫); আলাওল–সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬); বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৬); বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার (১৯৯০); দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা স্মৃতিপদক (১৯৯৩); অশোককুমার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪)। আনিসুজ্জামান দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত। তাঁর গবেষণা ও প্রবন্ধের বিষয় বিচিত্র। তিনি বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং পুরোনো বাংলা গদ্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। এসব গবেষণা কাজে নিজস্ব ব্যাখ্যা ও মৌলিক চিন্তার ছাপ আছে। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়ও বিচিত্র। যেমন,—নারী, সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধ, সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি। বাঙালি মুসলমান–সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রের (১৮৩১–১৯৩০) বিস্তৃত তথ্য উপস্থাপন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান লেখকদের অবদান ও তাঁদের

www.pathagar.com

সাহিত্য-মানস বিশ্লেষণ আনিসুজ্জামানের দু'টি উল্লেখযোগ্য কাজ। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের রচনাবলী সম্পাদনা করেছেন। বেশ কিছু ইংরেজি নাটক অনুবাদ করেছেন। তিনি প্রখর মুক্তবুদ্ধি চেতনাসম্পন্ন লেখক। র.হা.

আনোয়ার পাশা : লেখক। মুর্শিদাবাদ জেলার ডাবকাই গ্রামে ১৯২৮ সালের ১৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (বাংলা) পাস করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে জুনিয়র লেকচারার নিযুক্ত হন এবং ১৯৭০ সালে সিনিয়র লেকচারার পদে উন্নীত হন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানপন্থী আল-বদরের হাতে নিহত হন। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য—নদী নিঃশেষিত হ'ল (১৩৭০); উপন্যাস—নীড়-সন্ধানী (১৯৬৮), রাইফেল-রোটি-আওরত (১৯৭২); গল্পগ্রন্থ—নিরুপায় হরিণী (১৯৭০); সমালোচনা—রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (১ম খণ্ড ১৯৬৯, ২য় খণ্ড ১৯৭৮); জীবনী—সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল (১৯৬৭)। সাহিত্য কৃতির জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন (১৯৭১)। নূ.ই.

আনোয়ারা : মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন লিখিত একটি পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে 'আনোয়ারা' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ। প্রকাশক ছিলেন মখদুমী লাইব্রেরীর পক্ষে মোবারক আলী। মুসলিম সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশের পরই মুসলিম সমাজে ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করে। অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ এই উপন্যাসটি গ্রাম বাংলার অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নরনারীর সাহিত্যিক রসবারি সিঞ্চিত করেছে। 'আনোয়ারা' উপন্যাস জনপ্রিয়তার বিচারে একমাত্র 'বিষাদ-সিন্ধু'র সঙ্গেই তুলনীয়। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাস অবধি এর অষ্টবিংশ মুদ্রণ সেই জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রমাণ। লেখক বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই লেখনী ধারণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যতম সমাজ সংস্কারক। ইসলাম নির্দেশিত সমাজ ব্যবস্থাকেই তিনি ব্যক্তির, পারিবারিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনায়নে রূপায়িত করেছেন। এই উদ্দেশ্য ও অদর্শকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তাঁর রচিত 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', 'গরিবের মেয়ে' উপন্যাসগুলির মৌলিক মূল্য ব্যহত হয়েছে। 'আনোয়ারা' উপন্যাসের ঘটনা-প্রবাহ সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের গ্রাম্য জীবন কেন্দ্রীক। উপন্যাসের ঘটনা চার পর্বে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পর্ব দশটি, দ্বিতীয় পর্ব আটটি, তৃতীয় পর্ব বাইশটি এবং চতুর্থ পর্ব পঁচিশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মের, ন্যায়ের, পুণ্যের বিজয় ঘোষণা করা। সত্য, ন্যায় ও পুণ্যের আদর্শায়িত চরিত্র নূরুল ইসলাম, আনোয়ারা তাই লেখকের হাতে টাইপ চরিত্রে রূপায়িত। পক্ষান্তরে শৈত্রেন খোরসেদ, প্রতিহিংসাপরায়ণা গোলাপজান এবং অর্থগৃধ্নু গণেশ প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রগুলো রক্ত মাংসে গড়া সমাজের বাস্তব মানুষ রূপে অধিক জীবন্ত। কাহিনী বর্ণনা, চরিত্র চিত্রনে লেখকের শৈল্পিক মূল্যবোধের অভাব সুস্পষ্ট। আর এই কারণেই মননশীল সাহিত্য-রস-পিপাসুদের দৃষ্টিতে আনোয়ারার ঔপন্যাসিক মূল্য উপেক্ষিত। শৈল্পিক মূল্যবোধে আনোয়ারার স্থান যেখানেই হোক না কেন, লেখক সমকালীন মুসলিম সমাজচিত্র অঙ্কনে এবং ভাষা ব্যবহারে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। মু.আ.জ.

আনোয়ারুল করিম : লোকসাহিত্য-গবেষক ও শিক্ষাবিদ। পিতার নাম মোঃ করিম বখশ। যশোর জেলার লাউড়িতে জন্মগ্রহণ করেন ১৩৪৩ সনের ৮ কার্তিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

থেকে ১৯৬২ সালে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। 'বাউল একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা' এই বিষয়ের ওপর পিএইচ.ডি. করেছেন ১৯৭৭ সালে। দীর্ঘদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যক্ষ ছিলেন অবসরের পূর্বে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের। লোকসাহিত্যের ওপর গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রকাশিত হয়েছে এ জাতীয় বেশ কিছু গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : বাউল কবি লালন শাহ। এটি ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর সমাদৃত গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। লালন গীতি ১৯৬৬ সালে। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক ১৯৬৯, ফকির লালন শাহ ১৯৭৬ সালে। লালনের গান ১৯৮৪ সালে। কবিতার কথা ১৯৯১ এবং খান সাহেব আবদুল ওয়ালী ১৯৯৬ সালে। তাঁর ইংরেজিতে লেখা তিনটি গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো হলো : The Bauls of Bangladesh (1980) ; The Aborigin of Kushtia (1979) ; ও The myths of Bangladesh (1988)। সাহিত্যকীর্তির জন্য পেয়েছেন বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, সম্মাননা, সনদপত্র ও পুরস্কার। এসব সংগঠন ও সংস্থা হলো : ফিলিপাইনের মিনদানাও স্টেট ইউনিভার্সিটি, আশরাফ সিদ্দিকী ফাউণ্ডেশন, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কবি আজিজুর রহমান স্মৃতি সংসদ, কুষ্টিয়া সমিতি, ঢাকা-কুষ্টিয়া উন্নয়ন পরিষদ ও কলকাতার ধ্রুপদী সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ। খা. বি.জ.উ.

আন্তন চেখভ (বা শেখভ) : রুশদেশীয় নাট্যকার ও ছোটগল্প লেখক। জীবনকাল ১৮৬০-১৯০৪ সাল পর্যন্ত। চেখভের পিতা ছিলেন ছোট দোকানদার। কিশোর বয়স থেকেই চেখভ লিখতে শুরু করেন। ছাত্রাবস্থায় গল্প লিখে তিনি বেশ উপার্জন করতেন ও তা দিয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করতে সক্ষম হন। চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রি লাভ করে ২৪ বছর বয়সে তিনি হাসপাতালে চাকুরি নেন। কিছুকাল পরেই চেখভ সাহিত্যে 'পুশকিন পুরস্কার' লাভ করেন। এই সময় থেকে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নাটকে তিনি যে সাফল্য লাভ করেন, তা তাঁকে রুশ-সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। "সীগাল" (Seagull) তাঁর জীবনের প্রথম সার্থক নাট্যপ্রয়াস এবং চেরী অর্চাড (Cherry Orchard) তাঁর জীবনের শেষ নাটক। মধ্যবর্তী সময়ে মঞ্চ-সফল ও সাহিত্যগুণযুক্ত বহু নাটক তিনি রচনা করেন। তন্মধ্যে "আঙ্কল ভানিয়া" (Uncle Vanya) "থ্রী সিস্টার" (Three Sistars) অন্যতম। চেখভ ছিলেন মানবতাবাদী লেখক। তাঁর নাটকগুলিতে হাস্যরস মুখ্য হয়ে দেখা দিলেও, করুণার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে। চেখভের সমসাময়িক রুশসাহিত্যিকদের মধ্যেও মানবতাবাদী মনোভাব প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। গল্প ও নাটক রচনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আজ তাঁর রচনা সারা দুনিয়ায় জনপ্রিয়। পৃথিবীর বহুভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে ও হচ্ছে। ম.ই.

আন্তন চেখভ গল্প ও ছোট উপন্যাস : প্রগতি প্রকাশন মস্কো থেকে প্রকাশিত। বাংলায় অনুবাদের সাল, মূল্য ও অনুবাদকের নাম কোথাও নেই। সূচীপত্র হলো—কেরানির মৃত্যু, বহুরূপী, মুখোশ, লোক, শত্রু, বিরস কাহিনী, প্রজাপতি, ৬ নং ওয়ার্ড, বনেদী বাড়ি, ইয়োনিচ, খোনসের লেকে, গুজবেরি, কুকুরসঙ্গী মহিলা, নালায় এবং কনে। চেখভ রুশ ছোটগল্প লেখক ও নাট্যকার। আজফ্ সাগরের বন্দর তাগান্‌রোগ্-এ জন্ম, ১৮৬০ সালের ১৭ জানুয়ারিতে। দোকানদারের মুদির ছেলে, পিতামহ ছিলেন চাষী। টিউশনি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি পড়ার খরচ সংগ্রহ করতেন। পরে সাহিত্যচর্চাকে পেশা হিসাবে নেন। বহু ছোট গল্পের জনক। পাঁচটি নাটক লিখেছেন। প্রায় সারা জীবন যক্ষ্মা রোগে

www.pathagar.com

ভুগেছেন এবং এ রোগেই মৃত্যু ঘটে। তবে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ যক্ষ্মা ছিল না। ১৯০৪ সালের জুন মাসের শেষ দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২ জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন। বি.ব.

আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের গল্পসংগ্রহ : বইটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়। জার্মানি, প্যালেস্টাইন, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, পাকিস্তান, কিউবা, ভারত, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ত্রিনিদাদ, ভিয়েতনাম, আলবেনিয়া, লাওসের ২১টি গল্প আছে। লেখকগণ হচ্ছেন সূচি অনুযায়ী বেরটোল্ট ব্রেশ্ট্, আবু রায়েদ, লেভ তলস্তয়, এলিন পেলিন, বি ট্রাভেন, এজকেল মেফাহেলি, লুই আরগঁ, সিগফ্রিড লেনৎস, হাওয়ার্ড ফাস্ট, রশীদ জাহান, আলেহো কার্পেন্তিয়ার, জাঁ পল সার্ত্র, প্রেমচন্দ, হাসান আজিজুল হক, অ্যালান মার্শাল, রিচার্ড রাইভ, চেন ওয়ান-লভ, মাইকেল অ্যান্টনি, আন দাক, মিগজেনি এবং শিয়াংফেই। একমাত্র বাংলাদেশের গল্পটিই বাংলা ভাষায় রচিত, বাকিগুলো, বলা বাহুল্য, অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদকগণ হচ্ছেন--আশিস সেন, সরোজকুমার দত্ত, পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য, মিহির আচার্য, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, সৌদামিনী দাস, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় বড়ুয়া, সদাশিব দ্বিবেদী, অশোক বর্মন, শংকর ভট্টাচার্য, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী ঘোষ, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু সাহা। গল্পগুলো ফ্যাসিবাদ-বিরোধী। বিশ্ব সাহিত্যের নামজাদা এই লেখকদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখকও আছেন। প্রকাশক : বুক্‌স অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যালস, ১/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রকাশকাল : মাঘ ১৩৮৪। পৃষ্ঠা : ২৪০, মূল্য : ১৫ রুপি। বি.ব.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অমর দিন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশনে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। প্রতি বছর সকল সদস্য রাষ্ট্র ও ইউনেস্কো সদর দফতরে উদ্‌যাপন করার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, পৃথিবী জুড়ে প্রায় চার হাজারের মতো মাতৃভাষা আছে। প্রতিটি মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদাদানের জন্য একটি দিবস থাকা প্রয়োজন। ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ কানাডায় বসবাসরত 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার অফ দি ওয়ার্লড' নামে একটি বহুভাষী ও বহুজাতিক ভাষাপ্রেমী গ্রুপ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। এই পত্রে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অসংখ্য জাতি গোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার না করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে, কাউকে মাতৃভাষা ভুলে যেতে বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে। সেসব ভাষাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে না। এক সময়ে বাংলা ভাষাকেও এই সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিলো বলে তাদের আবেদনে তারা ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। বাঙালি ভাষার জন্য যে জীবন দিয়েছিলো সেটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা। সেজন্য ২১ ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা দিলে প্রতিটি মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হবে। এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন দশজন ব্যক্তি। এঁরা হলেন : আলবার্ট ভিনজন ও কার্মেন ক্রিস্টোবাল ; মাতৃভাষা ফিলিপেনো, জেসন মরিন ও সুসান হজিনস—মাতৃভাষা ইংরেজি ; ড. কেলভিন চাও--মাতৃভাষা ক্যান্টনিস ; নাসরিন ইসলাম—মাতৃভাষা কাচ্চি ; রিনাতে মার্টিনস—মাতৃভাষা জর্মন ;

অরুণা জোশী—মাতৃভাষা হিন্দি ; রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম—মাতৃভাষা বাংলা। মোট সাতটি ভাষার দশজন ব্যক্তি এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাঁদের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মহাসচিবের দফতর থেকে জানানো হয় যে, বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোতে যোগাযোগ করতে হবে। ইউনেস্কোতে যোগাযোগ করলে তারা উক্ত গ্রুপটিকে জানায় যে, এ ধরনের প্রস্তাব ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের যে কোনো জাতীয় কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত হতে হবে। ভাষাপ্রেমী গ্রুপের পক্ষে রফিকুল ইসলাম কানাডার ভ্যাঙ্কুবার থেকে টেলিফোনে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শিক্ষা সচিব বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মহাসচিবকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটি ইউনেস্কো সদর দফতরে পেশ করেন। ইউনেস্কোর ২৮টি সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রস্তাব লিখিতভাবে সমর্থন করেন। দেশগুলো হলো : বেনিন, বাহামা, বেলারুশ, কমোরুশ, চিলি, ডোমিনিকান, রিপাবলিক, মিশর, গাম্বিয়া, হন্ডুরাস, ইটালি, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, আইভরি কোসট, লিথুনিয়া, মালয়েশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, ওমান, ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউগিনি, পাকিস্তান, প্যারাগুয়ে, রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, সুরিনাম, শ্লোভাকিয়া ও ভানুয়াতু। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, যে দু'জন বাঙালি বিদেশে বসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের নামও সালাম ও রফিক। অমর একুশের ভাষা-শহীদ রফিক এবং সালামের সঙ্গে তাঁদের নামের এই যে সংযোগসাধন ঘটেছে তা সময়ের ব্যবধানে এক অদৃশ্য বন্ধন। এই বন্ধনকে বাস্তব ভিত্তি দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবি রাখে। সে. হো.

আন্দালুসিয়া : হাসনাত আবদুল হাই রচিত ভ্রমণকাহিনী। প্রথম প্রকাশ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। লেখকের অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীর মতো এ বইয়েও শুধু ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হয়নি, একই সঙ্গে সেই দেশের এবং সেই স্থানের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও অত্যন্ত সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। যেন একটি জনপদের অতীত এবং বর্তমান এক হয়ে আসে পাঠকের সামনে। আন্দালুসিয়া স্পেনের একটি অংশ। লেখক পরিশিষ্টসহ বত্রিশটি ছোট বড় অধ্যায়ে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদসহ আন্দালুসিয়ার একটি শহরকে এই বইয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্রিত করেছেন। পড়তে গেলে গভীরটানে বইয়ের পাতা উল্টে যেতে হয়। লেখক ভূমিকায় বলেছেন : "আন্দালুসিয়া বলতেই রোমান্টিক এক ছবির উদ্ভাসন হয়। যেখানে জলপাই কুঞ্জের পাশে গাছের ছায়ায় বাঁশি হাতে মেষ পালক, ফ্রামেঙ্কো নৃত্যে বিভোর জিপসী রমণী, ষাড়ের সঙ্গে মৃত্যুর দ্বৈরথে সোনালি পোষাক পরা মাতাদোর, অশ্ব-খুরাকৃতি আর্চের অলঙ্করণ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুর মুসলিমদের প্রাসাদ এবং ক্যাথলিক কিংস ও তাদের উত্তরসুরিদের সময়ে নির্মিত পথিক-ব্যারেকে গির্জার গগনস্পর্শী চূড়া অর্ন্তগত। আন্দালুসিয়া এসব নিয়েই কিন্তু তারও বেশি কিছু। এ কেবল রাজ কাহিনী, পাথর-মার্বেল তৈরি ভবনের ইতিহাস অথবা ছোট বড় জনপদের চিত্রাবলী নয়। অনেক কিছু দেখা আর জানার পরও আন্দালুসিয়ার যা অবশিষ্ট থাকে সেটা কল্পনার জগৎ।" এ বই পড়ার পর মনে হয় লেখক পাঠকের কল্পনার জগতে ধাক্কা দিয়েছেন। যে কেউ চোখ বুঁজে তাঁর মতো করে একবার ঘুরে আসতে পারেন। সে. হো.

আন্না কারেনিনা : লেভ তলস্তয় রচিত আট অংশে সম্পূর্ণ, দুই খণ্ডে বাংলায় প্রকাশিত উপন্যাস। মূল রুশ থেকে বাংলায় অনুবাদ

www.pathagar.com

করেছেন ননী ভৌমিক। ১৮৭৩ সালে এই উপন্যাস রচনা শুরু করে তলস্তয় লিখেছেন, 'এ উপন্যাস ঠিক উপন্যাসই, আমার জীবনের যা প্রথম, আমার তা খুবই মনে লেগেছে, পুরোপুরি ডুবে গেছি তাতে।' 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের পরে তলস্তয়ের এই রচনা সমকালীনদের বিস্মিত করেছিল তার প্রসঙ্গের 'প্রাত্যহিকতায়'। কাহিনীর অবাধ কথন এখানে মিলেছে তাঁর জীবনদৃষ্টির শিল্পীয় সমগ্রতায়। ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি এ উপন্যাসে দেখেছিলেন 'মানবপ্রাণের বিপুল মনস্তাত্ত্বিক চর্চা' এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তির অভূতপূর্ব বাস্তবতা। বিশ্ববিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক ও গল্পকার তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তিতে পরিণত হন। বলা হত রাশিয়ায় দু' জন জার (অর্থাৎ সম্রাট), একজন যিনি রুশ সাম্রাজ্য শাসন করেন, আরেক জন হলেন লেভ তলস্তয় বা নিকলাইয়েভিচ্ লিয়েফ্ তল্স্তোয়। এঁদের মধ্যে কে শক্তিশালী বলা কঠিন। জন্ম ১৮২৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। অভিজাত পরিবারে জন্ম, নিজেও জমিদার ছিলেন এবং শেষ জীবনে সব ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পথিমধ্যে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হয় এক রেল স্টেশনে ২০ নভেম্বর ১৯১০ সালে। তাঁর রচনার পরিমাণ বিশাল। ছোটগল্প, বড় গল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, ডায়েরি–চিঠিপত্র, নীতিমূলক গল্প সব মিলিয়ে রচনাসমগ্র প্রায় ৯০ খণ্ডে সম্পূর্ণ। তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি' (১৮৬২–৬৮), 'আন্না কারেনিনা' (১৮৭৮), 'পুনরুত্থান (১৮৯৯) বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বড়গল্প 'ইভান ইলিচের মৃত্যু' (১৮৮৬) ও 'ফাদার থিয়েগি' (১৮৯৮) বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর অন্যতম। আন্না কারেনিনার বাংলা অনুবাদের প্রকাশক রাদুগা প্রকাশন, মস্কো। প্রকাশকাল ১৯৮৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা দুই খণ্ডে ৫৭৬ + ৫৪৮। মূল্য লেখা নেই। বি.ব.

আন্নেসা (মাসিক সাময়িকপত্র) : সম্পাদিকা বেগম সফিয়া খাতুন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোনো মুসলিম মহিলার সম্পাদনায় এটিই প্রথম পত্রিকা। বাংলার মুসলিম নারীসমাজের প্রথম মুখপত্রও এটি। মুসলিম নারী–জাগরণের সূচনালগ্নে নারীর অধিকার, মর্যাদা, শিক্ষা, পরিবার ও সমাজে তার অবস্থান ও স্বতন্ত্র ভূমিকার স্বরূপ চিহ্নিতকরণ, নারীর নিজস্ব সমস্যাবলী ও তার সমাধান এবং সর্বোপরি নারীসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের আধুনিক–মনস্ক করে তোলার একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস এই পত্রিকার বিভিন্ন লেখায় পরিদৃষ্ট হয়। 'আন্নেসা' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল : এপ্রিল, ১৯২১ সাল। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সিদ্দিকী কর্তৃক সাধনা কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত (চন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক সরস্বতী প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ; প্রতি সংখ্যা বারো পৃষ্ঠা, মূল্য : বার্ষিক আড়াই টাকা) ও পরবর্তীকালে পঞ্চম সংখ্যা থেকে ৫, ডোগরা গলি, কলুটোলা, কলকাতা (মুদ্রক কে.এম. হেলাল, ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯ আন্টনী বাগান লেন, কলকাতা) থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি দুই বছরের বেশি সময় ধরে চালু ছিল। নিয়মিত লেখকদের বেশির ভাগ ছিলেন নারী। এতে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের পাশাপাশি বিদেশি পত্রিকা থেকে নারী–বিষয়ক এমন রচনা সংকলন করা হতো যাতে নারীর আত্মশক্তি, অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে। পত্রিকাটিতে নিয়মিত সংবাদও পরিবেশন করা হতো। প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায়—নারীর ভোটাধিকার দেয়া হবে কিনা এই প্রশ্নে এক ভোটাভুটিতে তৎকালীন ৯৩ জন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ৩৭ জন পক্ষে এবং ৫৬ জন বিপক্ষে ভোট প্রদান করেছিলেন। নারীর অধিকার, সমমর্যাদা ও ক্ষমতায়ন প্রশ্নে এখনও জোরালো আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে বটে, তবে বর্তমান সময়ে নারীসমাজের যতটুকু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তার পেছনে ৮০ বছর আগে প্রকাশিত বেগম সফিয়া খাতুন সম্পাদিত

www.pathagar.com

'আন্নেসা'-র প্রত্যক্ষ অবদান অস্বীকার করা অসম্ভব। মো. শা.

আপন আধারে একদিন : কবি মাকিদ হায়দারের কবিতার সংকলন। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৪। প্রকাশক : প্রগতি প্রকাশনী, ১৪৪, নিউ মার্কেট, ঢাকা-৫। কাজী হাসান হাবিবের আঁকা প্রচ্ছদের চৌষট্টি পৃষ্ঠার এই বইটির দাম কুড়ি টাকা। এতে মোট ৪২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থটির প্রতিটি কবিতাতেই আছে জীবনের নানামুখী সংঘাতের আবেগময় বর্ণনা। অবশ্য এ আবেগ শুধু আবেগের ছড়াছড়ি নয়, কবির শিল্প সাধনার নন্দিত প্রকাশ। গ্রন্থের কবিতাসমূহে অহেতুক জটিলতার বেড়াজাল তৈরি করা হয় নি। ফলে পাঠক অতি সহজেই কবিতার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এই কবিতা গ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতাই শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রতিটি কবিতাই উৎসর্গকৃত এটাও ভিন্নমাত্রার দাবিদার। মাকিদ হায়দারের কবিতাকে পাঠক নিজের অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করে তৃপ্ত হয়। শা. আ.

আপন কথা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) রচিত পারিবারিক স্মৃতিকথামূলক পুস্তক। প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৫৩। প্রকাশ করেন সিগনেট প্রেস। অবন ঠাকুরের অন্য দু'টি এ জাতীয় গ্রন্থ 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র পরে প্রকাশিত হলেও পুস্তকের বিষয় তাঁর অনেক আগের রচনা। পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে 'আপনকথা'র রচনাসমূহ বঙ্গবাণী (ফাল্গুন ১৩৩৩-ভাদ্র ১৩৩৪) এবং চিত্রা (পৌষ ১৩৩৫-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) এ দু'টি সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়। 'আপনকথা' লেখকের শৈশব স্মৃতির নানাকথার রূপগন্ধময় বাণীরূপ, চিত্ররূপময়ও বটে। রচনার বিশেষ গুণ তার মনোহারিত্ব। ঘরের বিষয়কে অবনীন্দ্রনাথ কল্পনার রস ও চিত্রের সুষমায় রঞ্জিত করে তাঁর এই অপরূপ সাহিত্যকর্ম পাঠককে উপহার দিয়েছেন। পুস্তকের কয়েকটি বিষয়-পদ্মাদাসী, উত্তরের ঘর, এ-আমল ও-আমল, এ-বাড়ি ও-বাড়ি, বার বাড়িতে ইত্যাদি। রচনাসমূহ কেবল চিত্ররূপময়ই নয়, শৈশবের দূর-স্মৃতিকে অত্যন্ত আপন করে প্রকাশের ক্ষমতাও অপরিসীম। পারিবারিক জীবন স্মৃতিকে বাস্তবতার এক মধুময় সুরে পরিবেশন করার ক্ষমতাটি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমানসের এক জন্মগত বৈশিষ্ট্য। 'আপন কথা' তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আ.জ.

আপন ভুবনে : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্-এর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। মুরাদ প্রেস, ঢাকা থেকে এটি জুলাই ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাব্য সংকলনে মোট ৫১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতার বিষয়বস্তু প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষ। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় ছন্দ-প্রকরণ ও অলঙ্কারের সযত্ন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কবির নান্দনিক উপস্থাপনা কবিতাকে নির্মেদ করে তুলেছে। কবি এখানে আরও পরিশীলিত, শিল্পিত সত্তার রূপকার। 'আপন ভুবনে' ক্রমাগত সম্পন্ন-আধার, থরে থরে বেদনা ও বিষণ্নতা, দুঃখ-শোক, স্বপ্নের ভিতরে আশা ও হতাশা, বিস্মৃতির ভয়াবহতা রোপিত হয়ে আছে উন্মূল সত্তায়। তবুও খরায় বিনষ্ট হওয়া শস্যক্ষেত সবুজ বিপ্লব আকাঙ্ক্ষী। কবি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ দেশ ও দেশের মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসেন। এই ভালবাসার কাছে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়—ক্রুদ্ধ আজদাহার আক্রোশ ভেদ করে জাগর হয় পঞ্চাশ বছর ধরে শুনে আসা নদীর কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বরই কবিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। শা. আ.

আপন যৌবন বৈরী : আবু হেনা মোস্তফা কামালের (১৯৩৬-১৯৮৯) প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ঢাকার বর্ণমিছিল থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। ৪৩টি কবিতা নিয়ে সঙ্কলিত এ গ্রন্থে আবু হেনা মোস্তফা কামালের রোমন্টিক কবিমানসের প্রকাশ ঘটেছে। গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতায় কবির

নৈঃসঙ্গ্যচেতনা এবং বেদনাবিলাসের ছবি ফুটে উঠেছে। কয়েকটি কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে কৈশোরক দেহ-কামনার আর্তি। দেহ-কামনার এই আর্তিই কবিচৈতন্যে জন্ম দিয়েছে নিঃসঙ্গতার উপলব্ধি। বি.ঘো.

আপেক্ষিক অব্যয় : যে অব্যয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একের আপেক্ষিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ণয় করে তাকে আপেক্ষিক অব্যয় বলে। যেমন—সোনা রূপা অপেক্ষা মূল্যবান। ঘোড়া গরুর থেকে দ্রুতগামী। বাঁশের চেয়ে কাঠের খুঁটি বেশি মজবুত। হংস মধ্যে বক যথা। পশুদের মধ্যে হাতি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণী। সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষা বলবান। শি.প্র.লা.

আফলাতুন : কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। ১৯৩৪ সালের ১ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপের রহমতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল লতিফ। পড়াশোনা শেষ করে তিনি স্থলশুল্ক বিভাগে চাকরি করেন। দু'বছর পর শুরু করেন সাংবাদিকতা। লেখালেখির শুরুটাও ঐ সময় থেকেই। মাসিক সমকালের সহকারী সম্পাদক এবং দীর্ঘকাল দৈনিক পাকিস্তান (স্বাধীনতার পরে দৈনিক বাংলা)-এর ফিচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক পাকিস্তানের (দৈনিক বাংলা) শিশু কিশোরদের বিভাগ 'সাত ভাই চম্পা' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তিনি প্রচুর নিবন্ধ-প্রবন্ধ ও শিশুতোষ রচনা লিখেছেন। ছোট-গল্প লিখেছেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে। তাঁর ছোট গল্পের ভাষা ও বর্ণনা যাদুকরী। শিশুতোষ রচনায় সমান পারদর্শী। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত ছোটদের জন্য লেখা 'ধূসর বরণ পাখি' গল্পটি দীর্ঘদিন স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাঁর বড়দের জন্য লেখা একমাত্র ছোটগল্পের বই 'অলৌকিক পাখি'। খা. বি. জ. উ.

আফ্রিকার কবিতা : অনুবাদ করুণাময় গোস্বামী। এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত কবিতায় প্রধানত কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রাণস্পন্দন ধরা পড়েছে। এতে সেনেগাল, মাদাগাস্কার, নাইজেরিয়া, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, কঙ্গো ব্রাজাভিল, কেনিয়া, কেমেরুন, সাওতোমে, কেপভার্ডে ও এ্যাংগোলার কবিতা স্থান পেছে। মোট ২১ জন কবির ৩৭টি কবিতা আছে। প্রকাশক : শিপ্রা গোস্বামী, জামতলা, নারায়ণগঞ্জ। প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৯৬, মূল্য ১২.০০ টাকা। বি.ব.

আফ্রিকার গল্প : করুণাময় গোস্বামী। আফ্রিকার দশটি গল্পের অনুবাদ সংকলন। এতে আফ্রিকার গল্প সম্পর্কে ষোল পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ আছে। আফ্রিকা মহাদেশের সাই প্রিয়েন একওয়েনসি (নাইজেরিয়া), লুইস এনকোসি (দক্ষিণ আফ্রিকা), গ্রেস অগোট (কেনিয়া) কুলদীপ সোন্ধী (কেনিয়া), যোসেফ যোবেল (সেনেগাল), জাঁ প্লিয়া (ডাহোমী), সিলডেন বেম্বা (কঙ্গো), অবিত্তসেহ নিকল (সিয়েরালিঁও), লুই বারনাডো হনওয়ানা (মোজাম্বিক), শরীফ ইয়াসমন (সিয়েরালিঁও) প্রমুখ সাহিত্যিকের গল্প অনুবাদ করা হয়। এতে আফ্রিকার গল্প রচনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। উপনিবেশকারীদের অত্যাচার, যন্ত্রণা, পরাধীনতার গ্লানি, কালো মানুষের দ্রোহ, জিঘাংসা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা, স্বদেশপ্রেম গল্পগুলোর মধ্যে তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পগুলো অনুবাদ করেছেন করুণাময় গোস্বামী। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ১২৫, মূল্য ৯.০০ টাকা। বি.ব.

আফ্রিকার রূপকথা : শাহ্জাহান কিবরিয়া। শিশু-কিশোরদের জন্য আফ্রিকার রূপকথার অনুবাদ সংকলন। ঘানা, কঙ্গো, সেনেগাল, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মধ্য-আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, নায়াসাল্যান্ড,

www.pathagar.com

গাম্বিয়া, উগান্ডা, মিসর, লিবিয়া, জিম্বাবুই, লাইবেরিয়া, ইথিওপিয়া ও মাদাগাস্কারের ৪০টি রূপকথা আছে। সবচেয়ে বেশি নাইজেরিয়ার ১৪টি রূপকথা স্থান পেয়েছে। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ২১৯, মূল্য ৬০.০০ টাকা। বি.ব.

আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প : ভাষান্তর দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আফ্রিকা মহাদেশের পঁচিশটি গল্পের অনুবাদ সংকলন। এতে দক্ষিণ আফ্রিকার ৮টি, ঘানার ২টি, মিশরের ২টি, নাইজেরিয়ার ২টি, উগান্ডার ২টি এবং সেনেগাল, সুদান, কেনিয়া, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, তিউনেসিয়া, আলজেরিয়া, জিম্বাবুয়ে ও মালাউইয়ের ১টি করে গল্প রয়েছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিশরের নাগিব মাহফুজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার নাডিন গার্ডিমারের দু'টি গল্প আছে। আফ্রিকার যেসব লেখকের জন্ম ১৮৫৫-১৯৫৫ সালের মধ্যে তাঁদের গল্প নেওয়া হয়েছে। আফ্রিকার কালো মানুষদের অন্তর্জ্বালা ও অস্তিত্ব ঘোষণা গল্পগুলোতে তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। প্রকাশক : নাথ পাবলিশিং, ২৬বি পণ্ডিতিয়া প্রেস, কলকাতা ৭০০০২৯। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২৩২, মূল্য ৪০.০০ রুপি। বি.ব.

আব-ই-রওয়ান : বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও অতি সূক্ষ্ম মসলিনের নাম। ফার্সি শব্দ আব (পানি) এবং রওয়ান (প্রবাহিত) থেকে আব-ই-রওয়ান নামের উৎপত্তি। এই মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম ও পাতলা বুননের ছিল যে ঢাকার তাঁতিরা এর সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষ প্রমাণের জন্য 'আর-ই-রওয়ান' বা 'প্রবাহিত পানি' নামে এটিকে অভিহিত করে। বিদেশেও আব-ই-রওয়ান মসলিনের বিশেষ কদর ছিল। এই মসলিন প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হতো। আব-ই-রওয়ান সাদা জমিনে নকশাবিহীন মসলিন। এই কাপড় দিয়ে পরিধেয় পোশাক তৈরি হতো। এটি লম্বায় ২০ গজ (১৮০০ মিটার) এবং চওড়ায় ১ গজ (৯০ মিটার) ছিল। এর সুতার সংখ্যা ৭০০ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত উঠানামা করত। এ মসলিনের ওজন ছিল প্রায় ২০ তোলা। ১৭৭০ সালে উইলিয়াম বোল্ট তাঁর Consideration on Indian Affairs গ্রন্থে লিখেছেন যে, আব-ই-রওয়ান সম্পর্কে ঢাকার লোকেরা মুখরোচক গল্প বলতেন। একদিন একটি আব-ই-রওয়ান মসলিন ঘাসের উপর শুকাতে দেওয়া হয়। কোনো এক কৃষকের গরু মাঠে ঘাস খেতে এসে ঘাসের সঙ্গে সেই বহুমূল্যবান আব-ই-রওয়ান কাপড়টি খেয়ে ফেলে। এ অপরাধে রুষ্ট হয়ে নবাব আলীবর্দি খাঁ কৃষককে ঢাকা থেকে বের করে দেন। আব-ই-রওয়ান দিয়ে সাধারণত সৌখিন জামাকাপড় তৈরি হতো। ড.শা.আ.

আবদুর রহমান : লেখক। ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানত নাটক ও শিশুসাহিত্য রচয়িতা। মননশীল প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর হাত আছে। 'ত্রিকাল আন্তর্জাতিক হোটেল' (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), ও 'দৃষ্টি' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) আবদুর রহমানের ছোটগল্পগ্রন্থ। হাসির নাটক সৃষ্টিতেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। লেখকের এ জাতীয় রচনার মধ্যে 'বনভোজন' উল্লেখযোগ্য। কবিতা ও ছড়ার বই লিখেও তিনি শিশুদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন। এ জাতীয় গ্রন্থ হচ্ছে 'ঝড়ের দেশ' (১৯৬৩)', টুটুর হাওয়াই সফর (১৯৬৭) ও 'রাত নিঝঝুম' (১৯৬৩) ইত্যাদি। এতে তাঁর মননশীলতা, অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মজীবনদৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। মো.আ.

আবদুর রাজ্জাক : কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। বগুড়া জেলার রাজাবাজার গ্রামে ১৯২৬ সালের ১ জানুয়ারি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃনিবাস ঈশ্বরদী, পাবনা। পিতার নাম আবদুল জব্বার চৌধুরী (রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার), মাতা মেহের নিগার মমতাজ মহল, স্ত্রী অনিলা চক্রবর্তী (বিবাহোত্তর নাম লায়লা চৌধুরী)। লালমনিরহাট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪১) পাস করেন। কলকাতা রিপন কলেজে আই.এ. পাঠকালে পিতার জীবনাবসান হলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-জীবনের

www.pathagar.com

পরিসমাপ্তি ঘটে (১৯৪৩)। কলকাতায় কলেজ জীবনে বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদও লাভ করেন। কলকাতার দৈনিক নবযুগ (১৯৪১) ও দৈনিক কৃষক (১৯৩৮)-এর সহ-সম্পাদক ও সাপ্তাহিক মিল্লাত (১৯৪৬)-এর যুগ্ম-সম্পাদক ও ঢাকার দৈনিক সংবাদ (১৯৫১)-এর চিফ রিপোর্টার পদে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা টেলিভিশনের (২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪) প্রতিষ্ঠাতা বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করায় চাকরি হারান (১৯৬৫)। ১৯৬৯ সালে দৈনিক পূর্বদেশে (১৯৬৯)-এর সিনিয়র সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। এ পত্রিকায় 'সবিনয় নিবেদন' শিরোনামায় উপ-সম্পাদকীয় কলাম লিখতেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তিনি সপরিবারে মুজিব নগরে যান এবং সাপ্তাহিক জয় বাংলা (১৯৭১) পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে কর্মসম্পাদন করেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পূর্বদেশ ও রাজশাহীর দৈনিক বার্তা (১৯৭৬)-র যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে চাকরি করেন। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় নাগরিক জীবন চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস রচনার তিনি অন্যতম পথিকৃত। কন্যাকুমারী (১৯৬০) তাঁর একটি শিল্প-সার্থক উপন্যাস। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস (১৯৬১-১৯৬২) হিসেবে এ'টি আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২) লাভ করে। মৃত্যু : পি.জি. হাসাপাতাল, ঢাকা, ২৫ মার্চ ১৯৮১। নূ.ই

আবদুল আউয়াল : বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। তিনি ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ২৬ বছর বয়সে শহীদ হন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ হাশিম। আবদুল আউয়াল ছিলেন একজন রিকশাচালক। তাঁর বাড়ির ঠিকানা ছিল ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড, ঢাকা। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে গুলিবিদ্ধ হয়ে আবদুল আউয়াল শহীদ হন। তাঁর এবং অপরাপর ভাষা শহীদের জীবনবিসর্জনের ফলেই বাংলা উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে (১৯৫৬)। তাঁর শহীদ স্মৃতি ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেগবান করে তোলার ক্ষেত্রে দিশারি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিই ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। আবদুল আউয়ালসহ অন্যান্য ভাষা শহীদের পবিত্র রক্তের বিনিময়েই ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ করে। আবদুল আউয়ালের আত্মত্যাগের মহিমা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা নানাবর্ণে চিত্রিত করেছেন। নূ.ই

আবদুল আলীম : প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মতারিখ ১৯৩১-এর ২৭ জুলাই। পিতার নাম মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। তালিবপুর হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। স্কুলে পাঠকালে নিজে নিজেই গান গাইতে শেখেন। তালিবপুর গ্রামের অধিবাসী ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা একদিন বালক আবদুল আলীমের কণ্ঠে গান শুনে মুগ্ধ হন। তিনি আলীমকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। সেখানে সৈয়দ গোলাম আলীর কাছে আলীম গানের তালিম গ্রহণ করেন। লোকসঙ্গীত গেয়ে আলীম সেই কিশোর বয়সেই কলকাতায় সুনাম অর্জন করেন। কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানি 'হিজ মাস্টার ভয়েস' থেকে তাঁর গাওয়া লোকগীতির প্রথম রেকর্ড (উজান গাঙের নাইয়া) প্রকাশিত হয়। সে সময়ে তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর ১৯৪৮-এ কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস

www.pathagar.com

করেন। ঢাকা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের লোকসঙ্গীত বিভাগের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। আবদুল আলীম বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পী। ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, মারফতি ও বাউল গানের গায়ক হিসেবে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর লোকগীতির অসংখ্য রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। 'দুয়ারে আইসাছে পাল্কী', 'নাইয়ারে নায়ের বাদাম তুইল্যা', 'বন্ধুর বাড়ি মধুপুর', 'এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া' ইত্যাদি তাঁর হৃদয়গ্রাহী লোকগীতির রেকর্ড। ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬)–সহ প্রায় ৫০টি চলচ্চিত্রের তিনি নেপথ্য গায়ক। ১৯৭৪–এর ৫ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকায় পরলোক গমন করেন। লোকসঙ্গীতে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশে পদক' (মরণোত্তর) প্রদন করে (১৯৭৭)। **নূ. ই**

আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ স্মরণে : সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থ। এই গ্রন্থে কৃতী শিক্ষাবিদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক প্রফেসর আবদুল ওয়াহাব মাহমুদের জীবন ও কর্মের ওপর চৌত্রিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্মৃতিচারণ করেছেন। প্রফেসর আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ ১৯১০ সালে ১৫ আগস্ট কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও ১৯৩২ সালে রেকর্ড নাম্বার পেয়ে এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে অক্সফোর্ড থেকে ডি.লিট. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, মৌথালা আজাদ কলেজসহ প্রেসিডেন্সি কলেজে একটানা দশ বছর অধ্যাপনা করেন। শিক্ষকতা ছাড়া তিনি ১৯৬৯-৭০ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বার ও মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রফেসর মাহমুদ ১৯৭৩-৭৫ সালে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ আর্মির ইমারজেন্সি কমিশন নিয়ে বার্মা রণাঙ্গণে যুদ্ধও করেছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রফেসর মাহমুদ বাঙালি শরণার্থী ও পশ্চিমবঙ্গের আশ্রয়গ্রহণকারী শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও সহানুভূতিশীল ভূমিকা পালন করেছেন। এসময় তিনি নিজের ফ্ল্যাটে অনেক শিক্ষককে থাকার জায়গা করে দিয়েছিলেন। প্রফেসর আবুদল ওয়াহাব মাহমুদের ন্যায়পরায়ণ ও আদর্শ শিক্ষকের সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তিনি গোঁড়ামীমুক্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন ও মৌলবাদকে দানবীয় মতবাদ মনে করতেন। শিক্ষকতা ও মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রফেসর আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ ১২ মার্চ ১৯৯৬ সালে কলকাতায় এম.এস.কে. এম.হাসপাতালে ক্যান্সার রোগে মৃত্যুবরণ করেন। 'আবুদল ওয়াহাব মাহমুদ স্মরণে' স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করেছে বুলবুল পাবলিশিং হাউস। প্রকাশকাল : ১২ মার্চ ১৯৯৯। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী। মূল্য : একশ টাকা। **মা. আ.**

আবদুল কাদির : কবি ও ছান্দসিক। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আড়াইসিদ্ধা গ্রামে ১৯০৬ স্যালের ১ জুন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাজী আফসার উদ্দিন (পাটের ব্যবসায়ী), মাতা আরজউন্নিসা। শৈশবে মাতৃহারা হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা মডেল হাই স্কুল থেকে ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯২৫ সালে আই.এসসি. পাস করেন। ১৯২৭-১৯২৯ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. ক্লাশে পড়াশুনা করেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)–এর নেতৃত্বে ঢাকায় যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রধান কর্ণধার এবং সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকার প্রকাশক ও লেখক। ১৯২৯ সালে কলকাতায় মাসিক

'সওগাত' (১৯১৯) পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। একই বছর 'জয়তী' (১৯৩০) নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৫ সালে কমরেড মোজাফফর আহমদের কন্যা আফিয়া খাতুনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪১ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত দৈনিক 'নবযুগ' (১৯৪০) পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি নেন। বাংলা সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'বাংলার কথা'র উপ-সম্পাদক পদেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন। একই বছর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'মাহে-নও' (১৯৪৯)-এর সম্পাদক পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ পর্যন্ত এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পাবলিকেশন অফিসার পদে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন। তিনি কবি, গবেষক ও ছান্দসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। সনেট রচনায় তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী। 'দিলরুবা' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) ও 'উত্তর বসন্ত' (১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) তাঁর দু'টি সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ। নজরুল সাহিত্যে তিনি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ব্যক্তিগত জীবনেও নজরুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ৫ খণ্ডে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী' (১ম খণ্ড ১৯৬৬, ২য় খণ্ড ১৯৬৭, ৩য় খণ্ড ১৯৭০, ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৭ ও ৫ম খণ্ড ১৯৮৪) তাঁর এক বিশিষ্ট কীর্তি। তাঁর গবেষণা কর্মের ফলস্বরূপ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া, রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাঃ লুৎফর রহমান, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ বিশ শতকের প্রথমার্ধের বিস্মৃত প্রায় মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকের জীবনী ও রচনাবলী উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ও গবেষণা পণ্ডিত মহলে প্রশংসিত হয়েছে। 'ছন্দ সমীক্ষণ' (১৯৭৯) ও 'বাংলা ছন্দের ইতিবৃত্ত' (১৯৮৫) আবদুল কাদিরের ছন্দবিষয়ক মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। সাহিত্যে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদক প্রদান করে (১৯৭৬)। ১৯৮৪ সালে ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। নূ.ই.

আবদুল কাদির জিলানী : ধর্মবেত্তা। ইরানের জিলান নামক জনপদে হিজরি ৪৭০ সনের পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিবসে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম আবু সালেহ মুসা, মাতা ফাতিমা। তাঁর পিতৃমাতৃ উভয় কুলই মহানবী হযরত মুহম্মদের (সা.) বংশধর ছিল। জিলানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদে যান এবং বিখ্যাত নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে সাত বছর কাল ইসলামিক জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর দীর্ঘ পনের বছর খোদা-তা'লার ধ্যান-ধারণায় নির্জন-নিবাস করেন। বাকি জীবন লোক-সাধারণের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি বিবাহিত এবং দশ পুত্র এবং এক কন্যার জনক ছিলেন। আবদুল কাদির জিলানী সুফী-সমাজের শিরোভূষণ এবং জনসাধারণের পরম ভক্তিভাজন তাপস ছিলেন। তিনি গাওসুল আজম বা বড় পীর নামে সুপরিচিত। তাঁর সাধুতা, তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মসাধনাকে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। মৃত্যু. ১১ রবিউস সানি, ৫৬১ হিজরি। নূ. ই.

আবদুল গনি হাজারী : কবি ও সাংবাদিক। পাবনা জেলার সুজানগর গ্রামে ১৯২১ সালের ১২ জানুয়ারি এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইজ্জতউল্লাহ হাজারী, মাতা জাগিরন, স্ত্রী হাসনা। অষ্টম শ্রেণীতে পাঠকালে পিতাকে ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে পাঠকালে মাতাকে হারান। হারাণপুর (ফরিদপুর) স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

www.pathagar.com

বি.এ. অনার্স (দর্শন) পাস করেন। সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ঢাকার দৈনিক সংবাদের (১৯৫১) সাহিত্য-পাতার সম্পাদক (১৯৫১-১৯৫৪), অবজার্ভার গ্রুপ পত্রিকার (১৯৪৯) ম্যানেজিং এডিটর (১৯৫৬-১৯৬৭), দৈনিক আজাদের (১৯৩৬) প্রশাসক (১৯৭২) ও বাংলাদেশ সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা বোর্ডের (১৯৭২) চেয়ারম্যান (১৯৭৪-১৯৭৬) পদে দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এম.এন. রায়ের (১৮৮৭-১৯৫৪) র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং তখন থেকে বাকি জীবন প্রগতিশীল সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। আবদুল গনি হাজারীর সাহিত্যকর্ম শৈল্পিক কুশলতা ও সমাজসচেতনতায় সমৃদ্ধ। তাঁর কবি-মানস বুদ্ধিদীপ্ত। নাগরিক জীবনের বিকার ও অসঙ্গতিকে তিনি তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গ রসের ঝাঁজে রূপায়িত করেছেন। সামান্যধন (১৯৫৯), সূর্যের সিঁড়ি (১৯৬৫) ও জাগ্রত প্রদীপ (১৯৭০) তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। গদ্যগ্রন্থ 'কালো পেঁচার ডায়েরী' (১৯৭৬) একটি উচ্চমানের ব্যঙ্গরচনা। 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতার জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৪) এবং কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭২) লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। নূ.ই

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : প্রাবন্ধিক, গল্পকার, গীতিকার। তিনি ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশালের উলানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজি ওয়াহেদ চৌধুরী। তিনি জমিদার ছিলেন। মায়ের নাম জোহরা খাতুন। শিক্ষা জীবনের শুরুতে তাঁর পিতা তাঁকে প্রথমে উলানিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করার পরে তিনি উলানিয়া করোনেসন হাই ইংলিশ স্কুল ও বরিশাল এ.কে. স্কুলে পড়াশুনা করেন। এ.কে. স্কুল থেকেই ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নি। ম্যাট্রিক পাস করার পর পিতার মৃত্যুর ফলে পারিবারিক আর্থিক অনটনের কারণে তিনি ১৯৫০ সালে 'দৈনিক ইনসাফ' পত্রিকায় প্রথম চাকুরি শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর দু'টি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। একটির নাম 'কৃষ্ণ পক্ষ', অন্যটির নাম 'সম্রাটের ছবি'। ১৯৬০ সালে তাঁর ১ম উপন্যাস 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়। এরপর বের হয় 'নাম না জানা ভোর' (১৯৬২), 'নীল যমুনা' (১৯৬৪), 'শেষ রজনীর চাঁদ' (১৯৬৭)। ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন 'ডান পিটে শওকত' (১৯৫৩), 'আঁধার কুটির ছেলেটি' (১৯৫৪), ভয়ঙ্করের হাতছানি (১৯৬৯)। সম্প্রতিকালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দু'টি প্রবন্ধের বই 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' ও 'আমরা বাংলাদেশী না বাঙ্গালী'। তিনি বেশ কতগুলো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে : বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কার। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি দু'বার কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে বরিশালে স্কুলের ছাত্র থাকার সময় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করায় গ্রেফতার হন। ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময় তাঁকেসহ ১৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময়ে তিনি এক মাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথমে আগরতলায় ও পরে কলকাতায় ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতারের স্ক্রিপট রাইটার ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম বিদেশ সফর করেন আলজিরিয়ায়। ১৯৭৪ সাল থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। তাঁর পেশা সাংবাদিকতা। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ

www.pathagar.com

করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গল্প-উপন্যাস রচনায় তাঁর শৈলী ও নির্মাণ কৌশল চমৎকার। বর্তমান সময়ে তিনি ব্যাপকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতির দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে কলাম লিখছেন। এ কলামগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর বিশ্লেষণ মননশীল। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে তাঁর রচিত 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' বাঙালির অমর একুশের গান। এ গান বাঙালির জাতিসত্তায় নিবিড়ভাবে প্রোথিত এক গভীর সংযোজন। সে.হো.

আবদুল জব্বার : ভাষা শহীদ। ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার পাঁচুয়া গ্রামে ১৩২৬ সনের ২৬ আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ হাসেন আলী ও মাতার নাম সাফাতুন্নেসা। স্থানীয় ধোপাঘাট কৃষ্ট বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। একদা কৈশোরে বাড়ি থেকে পালিয়ে ট্রেনে চেপে নারায়ণগঞ্জ আসেন। সেখানে জাহাজঘাটে এক ইংরেজ সাহেবের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সাহেব তাঁকে একটি চাকরি দেন। তাঁর চাকরির কর্মস্থল ছিল বার্মায়। সেখানে তিনি ইংরেজি ভাষা শেখেন। দশ/বার বছর বার্মায় কাটাবার পর তিনি পৈতৃক ভিটা পাঁচুয়ায় ফিরে আসেন। অতঃপর ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ১৯৪৯ সালে পাঁচুয়া গ্রামের আমেনা খাতুনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহে আবদুল জব্বার তাঁর অসুস্থ শাশুড়ি উলফতজানকে চিকিৎসার জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আবদুল জব্বার রোগাক্রান্ত শাশুড়ির দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে শত শত ছাত্র ও সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আবদুল জব্বারও সেই বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদান করেন। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। বুলেটবিদ্ধ হয়ে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ দিন রাতে (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) হাসপাতালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁকে আজিমপুর গোরস্তানে কবর দেয়া হয়। আবদুল জব্বার ১৯৫২ সালের গৌরবদীপ্ত ভাষা আন্দোলনের একজন অমর শহীদ। তাঁর ও অন্যান্য ভাষা শহীদের জীবনদানের ফলেই বাংলা ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর শহীদ স্মৃতি পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় বাঙালির জাতীয় চেতনা বিকাশের ধারায় দিশারি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই চেতনার ভিত্তিতেই বাঙালিরা ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভের পেছনেও রয়েছে আবদুল জব্বারসহ ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ। বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা তাঁর আত্মদানের মহিমা বর্ণনা করে প্রচুর লেখা লিখেছেন। বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে আবদুল জব্বারকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে। নূ.ই.

আবদুল মতিন : ভাষা সৈনিক ও লেখক। সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালীর ধুনুলিয়া গ্রামে ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবদুল জলিল। স্কুল জীবন কাটান পিতার কর্মক্ষেত্র দার্জিলিংয়ে। দার্জিলিং সরকারি স্কুল থেকে ১৯৪৩ সালে ম্যাট্রিক, রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে ১৯৪৫ সালে আই.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে বি.এ. এবং ১৯৫১ সালে এম.এ. (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) পাস করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

www.pathagar.com

১৯৪৮ সালের ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করলে আবদুল মতিন সভাস্থলে দাঁড়িয়ে জিন্নাহর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে তিন বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে। ১৯৫০ সালে তাঁর নেতৃত্বে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয় এবং তিনি কমিটির আহ্বায়ক হন। বায়ান্নর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয়ার দায়ে ৭ মার্চ (১৯৫২) গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। ভাষা আন্দোলনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন বলে তিনি 'ভাষা মতিন' নামে আখ্যায়িত হন। ১৯৫৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কৃষক সমিতির সভাপতি। ভাষা আন্দোলন ও রাজনীতি তাঁর লেখার বিষয়। 'ভাষা ও একুশের আন্দোলন' (১৯৮৬) ও 'ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য' (আহমদ রফিকের সাথে যৌথভাবে, ১৯৯১) তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদক (২০০১) প্রদান করে। নূ.ই.

আবদুল মান্নান সৈয়দ : লেখক। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাটের জালালপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯৪৩ সালের ৩ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ এ.এম. বদরুদ্দোজা, মাতা কাজী আনোয়ারা মজিদ। তিনি নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক (১৯৫৮) ; ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৬০) ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে স্নাতক (সম্মান বাংলা, ১৯৬৩) ও স্নাতকোত্তর (বাংলা, ১৯৬৪) ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পেশা অধ্যাপনা ও লেখালেখি। ষাটের দশকে সাহিত্যচর্চার শুরু। সেই থেকে তিনি নিরলস-ভাবে একই সঙ্গে সাহিত্যের নানা মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের কবিতা ও কথাসাহিত্যে তাঁর অবদান বিশিষ্ট। কবিতায় পরাবাস্তবতা এবং কথাসাহিত্যে চেতনা-প্রবাহ রীতির প্রয়োগ তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। সাহিত্য-সমালোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক কাজ করেছেন। বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত কাজ রয়েছে। এ ছাড়াও এদেশের গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রয়াত লেখকের রচনাবলী তিনি সম্পাদনা করেছেন। কাব্যভাষা ও গদ্যভাষায় নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি একটি নিজস্ব ভাষা-শৈলী নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা শতাধিক। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (কবিতা, ১৯৬৭) ; সত্যের মতো বদমাশ (গল্প, ১৯৬৮) ; শুদ্ধতম কবি (প্রবন্ধ, ১৯৭২) ; নজরুল ইসলাম কালজ ও কালোত্তর (প্রবন্ধ, ১৯৮৭) ; রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ, ২০০১) ; অ-তে অজগর (উপন্যাস, ১৯৮২)। সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮১), আলাওল পুরস্কার (১৯৮১), নজরুল পুরস্কার (চুরুলিয়া, ১৯৯৮) ও নজরুল একাডেমী পুরস্কার (২০০০) ইত্যাদি লাভ করেছেন। সা.আ.

আবদুল হক : লেখক। নওয়াবগঞ্জ জেলার উদয়নগর গ্রামে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সহিমুদ্দিন বিশ্বাস, মাতা সায়েমা খাতুন। রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে বি.এ. অনার্স (ইংরেজি) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ সালে এম.এ. (ইংরেজি) পাস করেন। তিনি বাংলা একাডেমীর পাঠ্য পুস্তক বিভাগের পরিচালক ছিলেন। ১৯৭৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। আবদুল হক একজন মননশীল প্রাবন্ধিক। সমাজ ও সংস্কৃতির তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। পরিমিত ও আবেগবর্জিত বক্তব্য ও ভাষার প্রবাহমানতা

www.pathagar.com

তাঁর গদ্য রচনাকে সমৃদ্ধি দিয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ :—প্রবন্ধ : ক্রান্তিকাল (১৯৬২), সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ (১৯৮৬), বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), সাহিত্য ও স্বাধীনতা (১৯৭৪), ভাষা আন্দোলন : আদিপর্ব (১৯৭৬), নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮৪) ; ছোটগল্প : রোকেয়ার নিজের বাড়ি (১৯৬৭), ছিন্ন পত্রিকার কাহিনী (১৯৮১) ; নাটক : অদ্বিতীয়া (১৯৫৬), ফেরদৌসী (১৩৭১), সোনার ডিম (১৯৭৬)। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পরলোক গমন করেন। আ.মা.

আবদুল হক চৌধুরী : লেখক। চট্টগ্রাম জেলার রাউজানের নোয়াজিশপুর গ্রামে ১৯২২ সালের ২৪ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। রাউজান স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করেন। কিছুদিন নোয়জিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ব্যবসা ও জ্ঞানার্জন জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে রাউজান অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করেছেন। তথ্যের প্রাচুর্যে, সত্যনিষ্ঠা ও ভাষার প্রাঞ্জলতায় তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ। চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ (১৯৭৫), চট্টগ্রামের চরিতাভিধান (১৯৭৯), চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৮০), সিলেটের ইতিহাস প্রসঙ্গ (১৯৮১), শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা (১৯৮৪), চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা (১৯৮৮), চট্টগ্রাম-আরাকান (১৯৮৯), চট্টগ্রামের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ (১৯৯২), প্রাচীন আরাকান রোহাইংগা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ আদিবাসী (১৯৯৪), বন্দর শহর চট্টগ্রাম (১৯৯৪)। চট্টগ্রামের উপর গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় চট্টলতত্ত্ববিদ আখ্যা লাভ করেন। ১৯৯৪ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি মারা যান। নূ. ই.

আবদুল হাই মাশরেকী : কবি। ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ কাঁকনহাটি গ্রামে ১৯১৯ সালের ১ এপ্রিল মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস দত্তপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। পিতার নাম ওসমান গনি সরকার, মাতা রহিমা খাতুন, স্ত্রী সালেহা খাতুন। এক নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। স্থানীয় জাটিয়া হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৩৯)। কিছুকাল ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে আই.এ. পড়েন। আর্থিক অনটনের কারণে কলেজের পাঠ ত্যাগ করেন। ১৯৫২-তে মাসিক কৃষিকথায় (সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত) প্রুফ-রিডার পদে যোগ দেন।। ১৯৬২-তে এর উপ-সম্পাদক ও ১৯৬৫-তে সহকারী সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ১৯৭৬-এ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কবিতা, গান, গল্প ও নাটক রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গ্রামীণ জীবনচিত্র ও লোক-ঐতিহ্য তিনি তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ঝিলাম নদীর পানি' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গান। প্রকাশিত গ্রন্থ : কুলসুম (গল্প-সংকলন, ১৯৫৪। তৃতীয় সংস্করণে নামকরণ করা হয় বাউল মনের নকশা, ১৯৭২), দুখু মিয়ার জারী (কবিতা-সংকলন, ১৩৬১), মাঠের কবিতা মাঠের গান (গান ও কবিতার সংকলন, ১৯৭০), সাঁকো (নাটক, ১৯৬০), নতুন গায়ের কাহিনী (নাটক, ১৯৭০)। সাহিত্যকৃতির জন্য ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব পদক লাভ (১৯৭৮)। মৃত্যু : দত্তপাড়া, ময়মনসিংহ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৮। নূ.ই

আবদুল হাকিম : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর সময়কালকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে : 'আমরা তাঁহার আবির্ভাব কালকে ১৬২০ হইতে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ বলিয়া ধরিয়া লইলাম।' তিনি তৎকালীন নোয়াখালি জেলার সন্দ্বীপ মহকুমার সুধারাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আটটি কাব্য গ্রন্থের সন্ধান

www.pathagar.com

পাওয়া গেছে। যেমন : ইউসুফ-জুলেখা, লালমতী ছয়ফুলমুলক, সিহাবউদ্দিন নামা, নূরনামা, নছিয়ত নামা, চারি মোকাম ভেদ, কারবালা ও শহরনামা। ত্রিপুরা থেকে বরিশাল পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় বলে অনুমান করা যায় যে, তাঁর সময়ে এবং পরবর্তীকালে তিনি জনপ্রিয় কবি ছিলেন। 'লালমতী ছয়ফুলমুলক' কাব্যগ্রন্থটি কলকাতা থেকে উনিশ শতকের শেষ ভাগে মুদ্রিত হয় এবং বইটি সারা বাংলাদেশে প্রচারিত হয়ে থাকে। তাঁর বিখ্যাত দু'টি অমর পংক্তি অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছে। পংক্তি দু'টি হলো :

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণএ না জানি'

এই পংক্তি দু'টি বাংলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই অসাধারণ পংক্তি দু'টি তাঁর যে কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় তার নাম 'নূরনামা'। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলা ভাষায় ধর্মগ্রন্থ লিখিত হবে কিনা এ নিয়ে মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিলো। সে সময়কার কবি সৈয়দ সুলতানের রচনায় উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সে সময়ের এক শ্রেণীর লোক বাংলা ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁরা এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বিরুদ্ধকারীদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কবি আবদুল হাকিমের 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম 'বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনার কারণ।' নূরনামা কাব্যগ্রন্থে আবদুল হাকিম হজরত মুহম্মদ (দঃ)-ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। এই অধ্যায়ের শুরুতে তিনি উল্লেখ করেছেন, যে ভাষায় নবীর কাহিনী ভালোভাবে বোঝা না যায় সে ভাষায় লিখে লাভ কি। মনের সুখে বুঝতে হলে নিজের মাতৃভাষায় লিখতে হবে। সেজন্য তিনি বিরুদ্ধকারীদের উদ্দেশ্যে এমন কঠিন বাণী উচ্চারণ করেছেন, তা হলো—

দেশী ভাষা বিদ্যা জার মনে না জুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যাএ'।
নূরনামা ৮৫-৮৮ পংক্তি।

তিনি ১৬৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বেঁচে আছেন আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণশক্তি হয়ে। সে. হো.

আবদুল হাকিম : সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ। ১৮৮৭ সালে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার মুকসুদপুর থানার সুন্দরদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশিয়ানী স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তী সময়ে নগরকান্দা জুনিয়র মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন। কিছুকাল শিক্ষা করার পর তিনি কলকাতা গমন করেন এবং সেখানে সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত হন। ১৯১৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ইসলাম-দর্শন, মোসলেম হিতেষী, হানাফী, বঙ্গনূর, মোসলেম ইত্যাদি বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে 'বাঙলার মুসলিম সাংবাদিক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলা ভাষায় কোরআনের পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু অনুবাদের প্রচেষ্টা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সুদীর্ঘ পনেরো বছরব্যাপী বহু শ্রম ও সাধনায় তিনি তাঁর অনুবাদ ও তাফ্সিরের কাজ সম্পন্ন করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি ১৯২৮ সালে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙলা' ১৯৩০ সালে 'নিখিল বঙ্গ কৃষক সমিতি', ১৯৪০ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, ইত্যাদি সংগঠনের অন্যতম কর্তা হিসেবে জড়িত থেকে আজীবন জাতির একনিষ্ঠ সেবা করে গেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মধুমিলন', 'প্রতিদান', 'ভারত বিজয় কাব্য', 'এশ্কে গুলজার', 'আছারুচ্ছালাত' ও 'শরিয়তুল মোসলেমিন' উল্লেখযোগ্য। মো. আ. জা.

আবদুল হাকিম, খান বাহাদুর : শিক্ষাবিদ ও লেখক। মানিকগঞ্জ জেলার হাজীগঞ্জ গ্রামে ১৯০৫

www.pathagar.com

সালের ২ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স (অঙ্ক) ও এম.এ. (অঙ্ক) পাস করেন। উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে অঙ্কে বি.এ. অনার্স ও ১৯৩৪ সালে এম.এ. (অঙ্ক) ডিগ্রি লাভ করেন। করটিয়া সাদত কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। অতঃপর সরকারের শিক্ষা বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন। সাবডিভিশনাল ও ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল, স্পেশাল অফিসার অব প্রাইমারি এডুকেশন, ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুল, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রাইমারি এডুকেশন ইন বেঙ্গল, সহকারী ডিরেক্টর অব জেনারেল এডুকেশন ইন ইস্টবেঙ্গল, ডিরেক্টর অব এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান ইত্যাদি উচ্চপদে চাকুরি করেন। ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষ' (১ম খণ্ড ১৯৭২, ২য় খণ্ড ১৯৭৫, ৩য় খণ্ড ১৯৭৩, ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৬) সম্পাদনা করে তিনি যশস্বী হয়েছেন। এছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত ও স্কুলপাঠ্য বহু গ্রন্থেরও রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : আধুনিক শিক্ষক (১৯৩৯), গ্রামের উন্নতি (১৯৪০), শিশুর মন ও শিক্ষা (১৯৪৮), ভূগোল শিক্ষক (১৯৪৮), ইতিহাস শিক্ষক (১৯৪৮), সার্থক শিক্ষক (১৯৬০), পড়া ও লেখা শিখানো (১৯৬২), শিক্ষার সমন্বয় (১৯৬৩) ও বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র উপাখ্যান (১৯৬৩)। ভারতের বৃটিশ সরকার ১৯৪৪ সালে তাঁকে খান বাহাদুর উপাধি এবং বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে একুশে পদক প্রদান করে। ১৯৮৫ সালের ১৪ জুন ঢাকায় প্রাণত্যাগ করেন। নূ. ই

আবদুল হাফিজ : প্রাবন্ধিক, ফোকলোর গবেষক। নিলফামারী জেলার ব্রাহ্মোত্তর গ্রামে ১৯৩৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আইনুদ্দিনউ আহমেদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. এবং ১৯৫৮ সালে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি তাঁর পেশা। ১৯৯১—১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। আবদুল হাফিজ একজন ফোকলোরবিদ। ফোকলোরের বিভিন্ন শাখায় তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত। তবে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সংগ্রহ ও গবেষণায় তিনি বিশেষ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। ফোক বিষয়গুলোকে তিনি তাত্ত্বিক প্রয়োগের মাধ্যমে এর দৈশিক মূল্য ও গুরুত্ব বর্ণনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আবেদন তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্য রচনায়ও তিনি পারঙ্গম। আধুনিক বাঙালি কবিদের সৃষ্টিকর্মের বিচার-বিশ্লেষণে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ-গবেষণা— লোককাহিনীর দিগদিগন্ত (১৯৬৮), আধুনিক সাহিত্যচর্চা (১৯৭৫), বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য (১৯৭৫), লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ (১৯৭৫), বাংলা রোমান্স কাব্য পরিচয় (১৯৭৬), আধুনিক সাহিত্য : বিবেচনাসমূহ (১৯৮২)। নূ. ই

আবদুল হালিম : গবেষক ও সমাজতাত্ত্বিক। তিনি ১৯৩৭ সালের ১৪ জানুয়ারি কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল আজিজ। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৬০ সালে গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর রচিত সবগুলো গ্রন্থই গবেষণাধর্মী এবং শ্রেণীবৈষম্য বিশ্লেষণে বিধৃত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ইতিহাসের রূপরেখা ১৩৭৬ সনে প্রকাশিত হয় এবং সুধীসমাজের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। ডায়ালেটিক বস্তুবাদ পরিচিতি (১৩৭৯), সমাজতন্ত্রের পরিচয় (১৩৭৯), বিশ্বজগতের পরিচয় (১৯৭৫) ও মানুষের ইতিহাস-প্রাচীন যুগ (১৯৭৭) বহুলালোচিত গ্রন্থ। তাঁর রচিত চিলি জনগণের অব্যহত জয়যাত্রা (১৯৭৪), শরৎচন্দ্র ও মানবতাবাদ (১৯৮০), পৃথিবীর ইতিহাস (১৯৮২), অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিস্টোরি ইন এ নিউ লাইট (১৯৭৮), ইনট্রোডাকটিং এ নিউ থিয়োরি অফ হিস্টোরি (১৯৮৫), বাংলাদেশে মার্কসবাদ চর্চা

www.pathagar.com

(১৯৮৭) ও মায়া আজটেক ও ইনকা সভ্যতা (১৯৮৬) গ্রন্থগুলো বিশেষ উল্লেখ্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন তিনি। এ গ্রন্থটির নাম : বঙ্গবন্ধু : আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ। এ গ্রন্থটি ১৯৮৬-এ প্রকাশিত হয়। খা.বি.জ.উ.

আবদুল্লাহ্ : কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২—১৯২৬) বিখ্যাত উপন্যাস। আবদুল্লাহ্ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে, কিন্তু এটি লেখা হয় ১৯১৮ সালে। মোসলেম ভারত (১৯২০) পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে আবদুল্লাহ্ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা অবধি উপন্যাসটির ৩০ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। কাজী ইমাদুল হকের মৃত্যুর পর অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদীর ইমদাদুল হকের খসড়া অবলম্বনে উপন্যাসটির বাকি ১১টি পরিচ্ছেদ রচনা করেন। কাজী আনোয়ারুল কাদীর-রচিত পরিচ্ছেদগুলো কবি শাহাদৎ হোসেন কর্তৃক পরিমার্জিত হয়ে ১৯৩৩ সালে কলকাতার 'দি মুসলমান প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়। আবদুল্লাহ্ উপন্যাস বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের সময়সীমায় প্রবাহিত মুসলিম জীবনবিশ্বাস ও সত্তাসন্ধানের শিল্পভাষ্য। এখানে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের পীরভক্তি, ধর্মীয় কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা, আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য, হীন স্বার্থপরতা, সম্প্রদায়বিদ্বেষ-- ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানবতাবাদী প্রতিবাদ। উপন্যাসের নায়ক আবদুল্লাহ্ মুসলিম মধ্যবিত্ত-মানসের প্রথম শিল্পসন্তান। তবে, সমাজচিত্র হিসেবে আবদুল্লাহ্ যতটা সার্থক, উপন্যাস হিসেবে ততটা নয়। এ-উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আবদুল্লাহ্ বইটি পড়ে আমি খুশি হয়েছি—বিশেষ কারণে, এই বই থেকে মুসলমানের ঘরের কথা জানা গেল। ...লেখকের লেখনীর উদারতা বইটিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে।' শিল্পসিদ্ধিতে কালজয়ী মহিমা দাবি না করলেও, সমাজবিকাশের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে আবদুল্লাহ্ উল্লেখযোগ্য রচনা। বি. ঘো.

আবদুল্লাহ-আল-মামুন : নাট্যকার ও অভিনেতা। ১৯৪৩ সালের ১২ জুলাই জামালপুর জেলার আমলা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে কিশোরগঞ্জের আজিমুদ্দিন হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। এর আগে ঢাকা টেলিভিশনে প্রোগ্রাম অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই নাটক : শপথ (১৯৬৪), সুবচন নির্বাসনে (১৯৭৪), এখন দুঃসময় (১৯৭৫), এবার ধরা দাও (১৯৭৭), শাহজাদীর কালো নেকাব (১৯৭৮), সেনাপতি (১৯৮০), অরক্ষিত মতিঝিল (১৯৮০), ক্রসরোডে ক্রসফায়ার (১৯৮১), চারদিকে যুদ্ধ (১৯৮৩), আয়নায় বন্ধুর মুখ (১৯৮৩), এখনও ক্রীতদাস (১৯৮৪), তোমরাই (১৯৮৮), দূরপাল্লা (১৯৮৮), তৃতীয় পুরুষ (১৯৮৮), আমাদের সন্তানেরা (১৯৮৮), কোকিলারা (১৯৯০), তিনটি পথনাটক (১৯৯১), দ্যাশের মানুষ (১৯৯৩), মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র (১৯৯৩), স্পর্ধা (১৯৯৬), মেরাজ ফকিরের মা (নাট্যরূপ, ১৯৯৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯৯৭)। উপন্যাস : মানব তোমার সারাজীবন (১৯৮৮), আহ্ দেবদাস (১৯৮৯), তাহাদের যৌবনকাল (১৯৯১), হায় পার্বতী (১৯৯১), এই চুনীলাল (১৯৯৩), গুণ্ডাপাণ্ডার বাবা (১৯৯৩), খলনায়ক (১৯৯৭)। অন্যান্য : অভিনয় (১৯৯১), আন্দু ও অভিষেক (১৯৯১), আমার আমি (আত্মচরিত, ১৯৯৬)। তিনি যেসব উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পান তার মধ্যে আছে : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (নাটক), দু'বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (পরিচালনা), বাচসাস পুরস্কার (চিত্রনাট্য), জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (নাটক প্রযোজনা), ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার (নাটক), মুনীর চৌধুরী সম্মাননা,

www.pathagar.com

অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। সমাজ বাস্তবতা তাঁর নাটকের অন্যতম বিষয়। সমাজের বিচিত্র ধরনের মানুষের সমাবেশ ঘটে তাঁর নাটকগুলোর চরিত্রে। তিনি সমাজকে দেখেন অত্যন্ত রূঢ় ভঙ্গিতে, কখনো ব্যঙ্গের চাবুকে। তাই সমসাময়িক জীবন এবং সে জীবনের নানা প্রকার অসঙ্গতি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকে এবং এ দেশের মঞ্চ নাটকের শুরু থেকেই তিনি নিয়মিতভাবে নাটক রচনা, পরিচালনা এবং অভিনয় করে চলেছেন। র. হা.

আবদুল্লাহ আল-মুতী : বিজ্ঞান-লেখক। ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের ফুলবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন ও মাতা হালিমা শরফুদ্দীন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসায়। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান, ১৯৪৭ সালে আই. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে একাদশ স্থান অধিকার করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি. সম্মান (পদার্থ বিজ্ঞান) ও ১৯৫৩ সালে এম. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করেন। এম. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বিষয়ে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। আবদুল্লাহ আল-মুতী ১৯৫৩ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। পরবর্তী কালে শিক্ষা প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব হিসেবে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ আল-মুতী ছাত্র জীবনেই লেখালেখি শুরু করেন। সারা জীবন অনুপম ভাষায় বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বিষয়ে অবিরাম লিখে গেছেন তিনি। বিশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের নিবিড় পরিচয় ঘটানোই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেয়ে সহজ সরল উপস্থাপনার কৌশলকেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি, যাতে নবীন প্রজন্মসহ সকল শ্রেণীর মানুষকে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার ও অগ্রগতি সম্পর্কে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলা যায়। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল পরিবর্তনকে ধারণ করার মতো উদার ও অগ্রসর মানসিকতা। যুক্তিবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জনপ্রিয় বিজ্ঞান (পপুলার সায়েন্স) রচনার পাশাপাশি শিক্ষাপ্রশাসন ও শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন কয়েকটি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো : এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে (১৯৫৫), আবিষ্কারের নেশায় (১৯৬৯), রহস্যের শেষ নেই (১৯৬৯), শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৫), জানা অজানার দেশে (১৯৭৬), সাগরের রহস্যপুরী (১৯৬৯), মেঘ বৃষ্টি রোদ (১৯৮১), তারার দেশের হাতছানি (১৯৮৪), আমাদের শিক্ষা কোন পথে (১৯৯৬), আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ (১৯৯৬), মহাকাশে কী ঘটছে (১৯৯৭) ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সংগঠনের সঙ্গেও আবদুল্লাহ আল-মুতী যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৮-৯০ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইউনেস্কো ক্যুরিয়ার-এর বাংলা সংস্করণ 'ইউনেস্কো বাতায়ন'-এর নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত শিশু-বিশ্বকোষ-এর অন্যতম সম্পাদক এবং বাংলা একাডেমী 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ' ১ম খণ্ডের প্রধান সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য আবদুল্লাহ আল-মুতী দেশে বিদেশে নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। লোকশিক্ষা বিষয়ক সাহিত্য কর্মের জন্য ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার, ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ বিষয়ে অবদানের জন্য ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার,

www.pathagar.com

১৯৮৫ সালে একুশে পদক, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার ও ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ আল-মুতী ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। সু. ব.

আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল : আঠারো শতকে এতিম আলম বিরচিত প্রশ্নোত্তরে লোকশিক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ফার্সি গ্রন্থের ভাবানুবাদ। নবুয়ত প্রাপ্তির পর হজরত মুহম্মদ (সঃ) খৈর্বদেশের ইহুদীরাজ আবদুল্লাহকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে এক পত্র লেখেন। পত্র পেয়ে আবদুল্লাহ মুহম্মদের নবুয়তের সত্যতা যাচাই করবার জন্য সপ্রজা ও সসৈন্যে মদিনা আগমন করেন। হজরতকে এক হাজার প্রশ্ন করে ও তার সদুত্তর পেয়ে আবদুল্লাহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ওই সওয়াল-জওয়াবগুলোই এতিম আলম তাঁর কাব্যে পয়ারে প্রকাশ করেছেন। বলাবাহুল্য কাব্যটি একেবারে কবির স্বকপোলকল্পিত। প্রশ্নোত্তর-গুলোর ভেতর দিয়ে কবির ঐহিক, পারত্রিক ও জীবনসম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা বিমূর্ত হয়েছে। কাব্যটিতে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের সঙ্গে দেশজ-বিশ্বাস-সংস্কার প্রতিফলিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল' ড. আহমদ শরীফ সম্পাদনা করে 'সওয়াল-সাহিত্য' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশ করেছেন। নু. ই

আবদুশ শাকুর : কথাসাহিত্যিক। ১৯৪১ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালি জেলার রামেশ্বরপুর ইউনিয়নের সুধারামগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৪ সালে একই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮০ সালে হল্যান্ডের আই, এস, এস, থেকে উন্নয়ন বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। সচিব হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গল্পগ্রন্থ 'ক্ষীয়মান'। এপিটাফ (১৯৭৬), ধঙ্গ (১৯৮২), বিচলিত প্রার্থনা (১৯৮৩)। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'ক্রাইসেস', সহেনা চেতনা (১৯৮৩), উত্তর দক্ষিণ সংলাপ (১৯৮২), নিভৃতে যতনে (১৯৮০)। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ মহামহিম রবীন্দ্রনাথ, গোলাপ বিংসংবাদ (১৯৯৭), সংগীত সংবিৎ (১৯৯৭)। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। আবদুশ শাকুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা লিখে খ্যাতিমান হন। তাঁর গল্প, উপন্যাসে আবেগের চেয়ে মননের ধার বেশি। তিনি প্রবন্ধ এবং রম্যরচনা বিষয়ে বেশি মনোযোগী। গোলাপ তাঁর একটি প্রিয় বিষয়। গোলাপ বিষয়ে প্রবন্ধের বই আছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, যা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর রম্যরচনায় ব্যঙ্গ এবং কৌতুকের মিশেলে ভিন্নরকম। সা. আ.

আবদুস সাত্তার : কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও অনুবাদক। টাঙ্গাইল জেলার গোলরা গ্রামে ১৯২৭ সালের ২০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুস সোবহান। ১৯৫১ সালে করটিয়া (টাঙ্গাইল) সাদত কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেন। বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দফতরের সম্পাদক ছিলেন। আবদুস সাত্তার একজন বিশিষ্ট গবেষক ও অনুবাদক। বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার উপর তাঁর মৌলিক গবেষণা প্রশংসিত হয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, সিলেটের মণিপুরী ও খাসিয়া, ময়মনসিংহের গারো ও হাজং, রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী-বগুড়ার ওঁরাও, সাঁওতাল, রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসীর ভাষা ও সাহিত্য, তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ ও ব্রত-অনুষ্ঠান, সঙ্গীত-নৃত্য-শিল্পকলা ইত্যাদির সুবিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক আরবি-ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া মূল আরবি ও

www.pathagar.com

ফারসি গল্প ও কবিতা বঙ্গানুবাদ করে এর বিষয়বস্তু, গঠনকৌশল ও রচনাশৈলীর সঙ্গে বাঙালি পাঠকসমাজের পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ-গবেষণা—আরণ্য জনপদে (১৯৬৬), আধুনিক আরবি সাহিত্য (১৯৭৪), আরবি লোকসাহিত্য (১৯৭৪), Tribal Culture in Bangladesh (1975), আরণ্য সংস্কৃতি (১৯৭৭), আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য (১৯৭৮), আরবি সাহিত্যের মৌলিক উপাদান (১৯৭৮), ফারসি সাহিত্যের কালক্রম (১৯৭৯), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯৭৯), ফারসি সাহিত্যে মৌলিক উপাদান (১৯৮০) ; কবিতা—বৃষ্টিমুখর (১৯৫৯), অন্তরঙ্গ ধ্বনি (১৯৭০), আমার বনবাস (১৯৮২), বিম্বিত স্বরূপ (১৯৮৫), আবদুস সাত্তার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯০) ; অনুবাদ—আরবি কবিতা (১৯৬৫), আধুনিক আরবি গল্প (১৯৭৫), আধুনিক আরবি কবিতা (১৯৭৬), ফারসি কবিতা (১৯৭৬), নির্বাচিত আরবি গল্প (১৯৭৭), শ্রেষ্ঠ আরবি গল্প (১৯৭৮), আরবি ফারসি তুর্কি কবিতা (১৯৯০)। সাহিত্যকৃতির জন্য ১৯৬৬ সালে দাউদ পুরস্কার এবং ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ২০০০ সালের ১ মার্চ ঢাকায় তিনি পরলোক গমন করেন। নূ. ই

আবদুস সালাম : ভাষা শহীদ। ফেনী জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। দাগন ভূঁইয়া কামাল আতাতুর্ক হাই স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টর অব ইনডাস্ট্রিজ বিভাগ, ইডেন বিল্ডিং-এ পিয়নের চাকরি করতেন। ঢাকায় ৩৬ বি, নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে ছাত্র-জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আবদুস সালাম সে বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। পুলিশ মিছিলকারীদের উপর গুলি চালালে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসাপাতালে দেড় মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ৭ এপ্রিল (১৯৫২) তিনি মারা যান। আবদুস সালাম ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের একজন অমর শহীদ। তিনি এবং অন্যান্য ভাষা শহীদ প্রাণবিসর্জন দিয়েছেন বলেই ১৯৫৬ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়। ভাষা শহীদদের স্মৃতি ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় বাঙালির জাতিসত্তা শাণিত করে তোলার ক্ষেত্রে দিশারির ভূমিকা পালন করে। এই জাতীয় চেতনার বলেই বাঙালিরা ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ অক্টোবর একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পেছনেও রয়েছে আবদুস সালামসহ ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে (২০০০)। বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর আত্মত্যাগের মহিমা। নূ.ই

আবহমান বাংলা : আশরাফ সিদ্দিকী রচিত ভ্রমণোপখ্যান। বইটির প্রকাশক বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ৬৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩৯৩/ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম খান। মূল্য বাঁধাই ৩০.০০ টাকা ও সাধারণ ২৫.০০ টাকা। লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও লোকঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং এ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আশরাফ সিদ্দিকী নানা সময়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। 'আবহমান বাংলা' সেসব ভ্রমণ-অভিজ্ঞতারই স্মারকগ্রন্থ। সহজ-সরল ভাষায় আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বক্তব্য উপস্থাপন এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলো ১৯৮৫-৮৭ সালে ঢাকা বেতারের দর্পণ ম্যাগাজিনে প্রচারিত হয়। সু. বু.

www.pathagar.com

আবার আসিব : শহীদ আখন্দ রচিত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। প্রকাশক অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা। প্রচ্ছদ খালিদ আহসান। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২, মূল্য : চল্লিশ টাকা। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির যুদ্ধ চিরকালের। এই যুদ্ধ কখনও হয় প্রকাশ্যে, আর কখনও হয় গোপনে, মানসলোকে। শেষোক্ত প্রকৃতির যুদ্ধের সংবাদ ইতিহাসে থাকে না, কিন্তু প্রায়শ সেগুলো ইতিহাসেরই ফসল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ ছিল এমনি একটি ঘটনা। তখন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী মরিয়া হয়ে উঠেছিল যেমন করে হোক, এমন কি সমস্ত বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে হলেও বাংলাদেশে তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য। এদের মদদ দিয়েছিল এদেশেরই বিকৃতমনা অশুভ শক্তি : রাজাকার, স্বার্থান্বেষী, কুচক্রী, লোভী মানুষ। আর অন্যপক্ষে ছিল স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধা। তারা জীবন দিয়ে হলেও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেয়েছিল। জীবন দিয়েছিল এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয় নি। সেই সত্যই আবার আসিব উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সে একটা স্কুল দিতে চেয়েছিল যেখানে ভাল ছাত্র নয়, ভাল মানুষ তৈরি করা হবে। লেখাপড়া নয় ডিসিপ্লিন, কথা নয় কাজ। আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ ছাত্র নিয়ে আদর্শ স্কুল। কিন্তু মুশতাক পারে নি। মুক্তিযোদ্ধা মুশতাক তার বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা সমসেরের স্ত্রী নাজনীনকে রক্ষা করতে চেয়েছিল দুর্জন ওমরের হাত থেকে। তার জন্য তাকে প্রাণ দিতে হলো। শহীদ আখন্দ উপসংহারে বলেছেন শুভশক্তির কখনো কখনো সংহার হলেও সেটা তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নয়। এরা বিশাল তরঙ্গের মতো, একটা আসে, ভাঙে, আরেকটা আসে। 'এমনি করে অনন্তকাল রচিত হয়'। শা. আ.

আবিদ আনোয়ার : কবি। তিনি ১৯৫০ সালের ২৪ জুন কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আজিম উদ্দিন। তিনি কটিয়াদী হাই স্কুল থেকে ১৯৬৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭১ সালে রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতক/সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭২ সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার্থে ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে তিনি মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে উর্ধ্বতন প্রকাশনা কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর কবিতাগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : প্রতিবিম্বের মমি (১৯৮৫), মরাজোছনায় মধুচন্দ্রিমা (১৯৯২), স্বৈরিণীর ঘরসংসার (১৯৯৬)। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ : বাংলা কবিতার আধুনিকায়ন (১৯৯৭)। তিনি যে সমস্ত পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরি প্রকাশনার জন্য রাষ্ট্রপতি পদক (১৯৭৯), সাহিত্যকর্মের জন্য রাইটার্স-এর স্মারক পদক ও সংবর্ধনা (১৯৯৬), স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারক পুরস্কার [সৈয়দ নজরুল ইসলাম পদক] (১৯৯৭) লাভ করেন। তিনি সাংবাদিকতা বিষয়ক গবেষণার জন্য National Journalism Scholarship Society of America (Kappa–Tau-Alpha)-এর সম্মানসূচক সদস্যপদ (১৯৮৭) লাভ করেন। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ মননশীল এবং আধুনিকমনস্ক চিন্তার ফসল। আবিদ আনোয়ারের কবিতা ও অন্যান্য রচনা সমকালীন সাহিত্যমোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৈ. আ. জা.

আবিস্কারের নেশায় : আবদুল্লাহ আল-মুতী রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন আবুল বারক আলভী। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮। 'আবিষ্কারের নেশায়' বিশ্বখ্যাত ১৬ জন বিজ্ঞানীর জীবন ও আবিষ্কারের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ। বিজ্ঞানীরা হলেন : থেলিস (আনু. ৬২৫-৫৪৬ খ্রি. পূ.), আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রি. পূ.), গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রি.),

www.pathagar.com

আন্টন ভ্যান লেভনহুক (১৬৩২-১৭২৩), আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭), বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন (১৭০৬-১৭৯০), লুইজি গ্যালভানি (১৭৩৭-১৭৯৮), তালেসান্দ্রো ভোল্টা (১৭৪৫-১৮২৭), চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫), উইলহেল্ম রন্টগেন (১৮৪৫-১৯২৩), ক্রিশ্চিয়ান আইকম্যান (১৮৫৮-১৯৩০), পিয়ের কুরি (১৮৫৯-১৯০৬), মারি কুরি (১৮৬৭-১৯৩৪), আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫), রবার্ট উইলিয়ামস (১৮৮৬-১৯৬৫)। আবদুল্লাহ আল-মুতীর সহজ সরল রচনা বৈশিষ্ট্য এই বইতেও উজ্জ্বল। বিজ্ঞানের জটিল তথ্য অনুসন্ধান ও গূঢ় আবিষ্কার উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছে এই বইতে। বিজ্ঞানের ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় বই। এই বই রচনার জন্য আবদুল্লাহ আল-মুতী ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কো পুরস্কারে সম্মানিত হন। সু. ব.

আবু কায়সার : কবি, গল্পকার ও শিশু সাহিত্যিক। ১৯৪৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ১৯৬২ সালে টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ আলী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৬৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : কবিতা : আমি খুব লাল একটি গাড়িকে (১৯৭২), জোছনায় মাতাল জেব্রাগুলো (১৯৮৫), জাদুঘরে প্রজাপতি (১৯৮৫), লজ্জার দেরাজ (১৯৯৭)। উপন্যাস : রায়হানের রাজহাঁস (১৯৭৩), সব পাখি আসে (১৯৮৮), দিব্য রাজহাঁস (১৯৯৭)। অনুবাদ : সম্পাদনা : বুলগেরিয়ার ছোটগল্প (১৯৭০), কুমায়ুনের মানুষ খেকো (১৯৮৯)। ছড়া : কাকতাড়ুয়া (১৯৮৫), দোয়েলের দেশ (১৯৮৮), কিশোর জীবনী : মহাকবি গেটে (১৯৯২), ইবনে সিনা (১৯৯২), যাদু সম্রাট পিসি সরকার (১৯৮৭)। অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ : প্রেত পাহাড়ের যাত্রী (১৯৯৬), ইনকা রাজার গুপ্তধন (১৯৯৬), দুঃস্বপ্নের দ্বীপে (১৯৯৭), কাফ্রির কাটাহাত (১৯৯৭)। পুরস্কার : অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬, ১৯৯৬)। আবু কায়সার সাহিত্যের ৩টি শাখাকে সফলভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্মের ছাপ এঁকেছেন। ছাত্র বয়সেই তিনি লিখেছিলেন কিশোর উপন্যাস, 'রায়হানের রাজহাঁস'। এই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কিশোর পাঠকের কাছে বিপুলভাবে গ্রহণযোগ্য হন। এই বইয়ের চিত্রিত মফস্বলী জীবন তিনি যেভাবে অঙ্কন করেছেন তা কিশোর পাঠকদের তৃষ্ণা মেটায়। না দেখা ছবি যেন ফুটে উঠে তাদের চোখের সামনে। সৈ.আ.জা.

আবু জাফর : সাহিত্য-সমালোচক। পশ্চিম-বঙ্গের মুর্শিদাবাদে ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে বি.এ অনার্স (বাংলা) ও ১৯৬০ সালে এম. এ. (বাংলা) পাস করেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন তাঁর সমালোচনার একটি বড় দিক। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের মানস-প্রবণতা এবং তাঁর গল্পের সামাজিক প্রেক্ষিত ও শিল্পরূপ বিশ্লেষণ আবু জাফরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা (১৯৮৫), গল্পকার হাসান আজিজুল হক (১৯৮৮), সাহিত্য সমাজ ভাবনা (১৯৯৫), হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজ বাস্তবতা (১৯৯৬)। ১৯৯৯ সালে ঢাকায় তিনি লোকান্তরিত হন। সা. আ.

আবু জাফর : গীতিকার ও কবি। কুষ্টিয়া জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে ১৯৪২ সালের ১৫ মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোহাম্মদ তয়বুদ্দিন মিয়া। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি. এ. অনার্স এবং

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালে এম. এ. (বাংলা) পাস করেন। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। নদী-নারী, প্রকৃতি ও প্রেম, স্বদেশ ও স্বাধীনতা তাঁর গান ও কবিতার বিষয় ও ভাববস্তু। আবু জাফরের গদ্য রচনায় বাংলা গানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং ইসলামের মূলনীতি বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা—নতুন রাত্রি পুরনো দিন (১৯৭৩), বাজারে দুর্নাম তবু তুমিই সর্বস্ব (১৯৭৪), হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল (১৯৮০) ; প্রবন্ধ—বাংলা গানের সুখদুঃখ (১৯৮৪), আমার নিকৃষ্ট গান (১৯৮৯), তুমি পথ প্রিয়তম নবী তুমিই পাথেয় (১৯৯৬)। সৈ. আ. জা.

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ : কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৩৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল জব্বার খান এবং মাতা সালেহা খাতুন। আবদুল জব্বার খান ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার ছিলেন। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ভাই সাদেক খান, এনায়েতুল্লাহ খান, রাশেদ খান মেনন, শহীদুল্লাহ খান বাদল প্রমুখ বাংলাদেশের রাজনীতি-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতার জগতে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তিনি ১৯৪৮ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ১৯৫০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৫৪ সালে অভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক-প্রশাসন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি বহু উচ্চপদে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সরকারের সচিব, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, বিশ্ব ব্যাংকের উপদেষ্টা—এসব পদে তিনি তাঁর মেধা ও কর্মনিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রশাসক হিসেবে তাঁর দক্ষতা কিংবদন্তিতুল্য। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ মূলত কবি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : সাতনরী হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (১৯৮১), সহিষ্ণু প্রতীক্ষা (১৯৮২), প্রেমের কবিতা (১৯৮২), বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা (১৯৮৩), আমার সময় (১৯৮৭), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯১), আমার সকল কথা (১৯৯৩) ইত্যাদি। তাঁর কবিতায় স্বদেশ আর সমকাল বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় শিল্পিত হয়েছে। সময়ের প্রবহমানতায় অতীতের গৌরব গায়ে মেখে তিনি পৌঁছুতে চান ভবিষ্যতের অমরাবতীতে। তাঁর কবিতা এই রোমান্টিক সদর্থকচেতনায় অভিষিক্ত। সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে একুশে পদকসহ নানা পদক/পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০০১ সালের ১৯ মার্চ দীর্ঘ অসুস্থার পর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। বি.ঘো.

আবু জাফর শামসুদ্দীন : কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। গাজীপুর জেলার দক্ষিণবাগ গ্রামে ১৯১১-র ১২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আক্কাস আলী ভূঁইঞা, মাতা আলীফা খাতুন, স্ত্রী আয়েশা আখতার। স্থানীয় একডালা মাদ্রাসা থেকে ১৯২৪-এ জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় ও ঢাকা সরকারি মাদ্রাসা থেকে ১৯২৯-এ হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর চাকরির সন্ধানে কলকাতায় যান। প্রথমে সরকারের সেচ বিভাগে কেরানির ও পরে কটক বিমান বন্দরে হেডক্লার্ক পদে চাকরি পান। ১৯৪২-এ সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় দৈনিক আজাদ (১৯৩৭) পত্রিকার সাব-এডিটর পদে যোগদান করেন। ১৯৪৮-এ আজাদ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে এর সহকারী সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ১৯৫০-এ আজাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। ঢাকার বাংলা বাজারে কিতাবিস্তান নামে একটি বইয়ের

www.pathagar.com

দোকান খোলেন। ১৯৫০-১৯৫১-তে সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের (১৯৪৯) সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের (১৯৫৭) সম্পাদক, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (১৯৫৭) প্রথম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সদস্য ও এ দলের ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১-তে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৭২-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর দৈনিক পূর্বদেশের (১৯৬৯) সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯৭৫-এ দৈনিক সংবাদে (১৯৫১) চাকরি গ্রহণ করেন। এ পত্রিকায় অল্পদর্শী ছদ্মনামে বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা শীর্ষক কলাম লিখতেন। এ সময়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের ও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতিও ছিলেন। তিনি একজন সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। দেশ ও সমাজের নানা সমস্যা, দারিদ্র্য ও অবক্ষয় এবং আশাবাদ তাঁর লেখায় বলিষ্ঠভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। মুক্তবুদ্ধি ও অগ্রসর চিন্তার ধ্যান-ধারণায় তাঁর রচনা ঋদ্ধ। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ও লেখনী ছিল সতত প্রতিবাদমুখর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নেও তিনি ছিলেন আপোষহীন। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস-- পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৪৭), মুক্তি (১৯৪৮), ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), প্রপঞ্চ (১৯৮০) ও দেয়াল (১৯৮৫) ; গল্পগ্রন্থ—জীবন (১৯৪৮), শেষ রাত্রির তারা (১৯৬৬), রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা (১৯৭৮) ও ল্যাংড়ী (১৯৮৪) ; প্রবন্ধগ্রন্থ—সোচ্চার উচ্চারণ (১৯৭৭), সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস (১৯৭৯), লোকায়ত সমাজ ও বাঙালি সংস্কৃতি (১৯৮৮) ও বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা (১৯৮৯)। উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮) লাভ করেন। সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদক (১৯৮৩) প্রদান করে। ১৯৮৮-র ২৪ আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ন. ই

আবু বকর (রাঃ) : ইসলামের প্রথম খলিফা। ৫৭৩ সালে মক্কার কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওসমান, মাতা সালমা। শিক্ষা শেষ করে তিনি গোত্রীয় পেশা ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল। হযরত মুহম্মদের (দঃ) সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। মুহম্মদের (দঃ) নবুয়ত লাভের পর তিনিই বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে নবীর সঙ্গে ছায়ার মত থাকতেন। তাবুক যুদ্ধের সময় আবু বকর (রাঃ) তাঁর সকল ধন-সম্পদ নবীর (দঃ) সামনে হাজির করেন। তিনি তাঁর সাত বছর বয়স্কা কন্যা আয়েশাকে (রাঃ) নবীর (দঃ) সঙ্গে বিবাহ দেন। মুহম্মদের (দঃ) ওফাতের পর ৬৩২ সালে আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হন। সে সময় মুসলিম জাহানে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কিছু লোক মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, আবার কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে। আবু বকর কঠোরভাবে সব বিশৃঙ্খলা দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে (৬৩৩ সাল) অনেক হাফিজ সাহাবি শহীদ হন। এতে কোরআন বিপন্ন ও বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে আবু বকর (রাঃ) সমগ্র কোরআন গ্রন্থাকারে একত্র করেন। এসব মহৎ কাজের জন্য তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁকে সিদ্দিক (বিশ্বাসী) উপাধি দান করেন। আবু বকরের ইসলামের সেবা, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, দান-দক্ষিণা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, চরিত্রের মাধুর্য ও দৃঢ়তা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনায় উপস্থাপন করেছেন। ৬৩৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। নূ. ই

www.pathagar.com

আবু বকর সিদ্দিক : কবি ও কথাসাহিত্যিক। তিনি ১৯৩৬ সালের ২৯ আগস্ট বাগেরহাট জেলার গোটাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৫৪ সালে বাগেরহাট সরকারি পি. সি. কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৫৬ সালে একই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ১৯৯৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর কবিতা গ্রন্থ 'ধবল দুধের স্বরগ্রাম' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কবিতার বই : বিনিদ্র কালের খেলা (১৯৭৬), হে লোক সভ্যতা (১৯৮৪), মানুষ তোমার বিখ্যাত দিন (১৯৮৬), হেমন্তের সোনামাত (১৯৮৮), কালো কালো মেহনতী পাখি (১৯৯৫), কঙ্ক কালে অলঙ্কার দিয়ে (১৯৯৬), শ্যামল যাযাবর (১৯৯৭)। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জলরাক্ষস' ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর ক্ষরাদাহ (১৯৮৭), বারুদ পোড়া প্রহর (১৯৯৬), একাত্তরের হৃদয় ভাষ্য (১৯৯৭)। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ 'ভূমিহীন দেশ', চরবিনাসকলি (১৯৮৭), মরাবাঁচার স্বাধীনতা (১৯৮৭)। তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। আবুবকর সিদ্দিক কবিতা দিয়ে তাঁর লেখালেখির সূচনা করেন। তাঁর কবিতার চেয়ে তাঁর গল্প ও উপন্যাস পাঠকের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করেছে। গ্রাম বাংলার মানুষের বিচিত্র দ্বন্দ্বমুখর জীবন তাঁর গল্প-উপন্যাসের অন্যতম দিক। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। খরা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীর ভাঙন ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের মোকাবেলা জীবনকে ধরে রাখার ভিন্ন মানে। এই মানে তিনি খুঁজেছেন মানুষের অমিত সত্তার মাঝে। তাই তাঁর গল্পে বাংলাদেশের গ্রামগুলো নানা মাত্রা অর্জন করে। সৈ. আ. জা.

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : গবেষক ও অনুবাদক। ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের বর্ধমান জেলার বামুনিয়া গ্রামে ১৯১১-র ৩০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল লতিফ ছিলেন বর্ধমান বিভাগের স্কুল পরিদর্শক। ১৯২৬-এ হুগলী মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে হাই মাদ্রাসা, ১৯২৮-এ ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ, ১৯৩১-এ হুগলী কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. অনার্স ও ১৯৩৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করেন। ১৯৩৪-এ লিটন বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড যান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকে ১৯৩৬-এ পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। 'ভারতের মুসলিম আমলের ইতিহাস' ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯৩৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত হন। পরের বছর (১৯৪০) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার পদে যোগ দেন। ১৯৫০-এ রিডার পদে উন্নীত হন। ১৯৫২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৭৬-১৯৭৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ও ১৯৮০-১৯৮৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এমেরিটাস প্রফেসর ছিলেন। ইতিহাসের গবেষক ও অনুবাদক হিসেবে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাধনা সর্বজননন্দিত। তাঁর বহুল আলোচিত গবেষণা গ্রন্থ 'The Foundation of Muslim Rule in India' (1946)-তে তের শতকে ভারতে মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সবিস্তারে বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত আল-বেরুনীর জ্ঞানগর্ভ আরবি গ্রন্থ 'কিতাব ফি তাহকিকে মা লিলহিন্দে মিন মাকুলাতুন মাকবুলাতুন ফিল

www.pathagar.com

আকলে আও মারজুলাতুন' (১৩০১ খ্রি.)-এর বঙ্গানুবাদ 'আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব' (১৯৭৪) আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর এক অমরকীর্তি। 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' (১৯৭৪) তাঁর প্রবন্ধের সংকলন। ১৯৮০-তে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যু ঢাকা, ৩ জুন ১৯৮৪। নূ. ই

আবু যোহা নূর আহমদ : লেখক। ফেনী জেলার রুহিতা গ্রামে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন। লেখক অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে নাটক, উপন্যাস, জীবনীমূলক গ্রন্থ ইত্যাদি। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে তামাসা, আনারকলি, জাহাঙ্গীরের বিচার, একদিনের বাদশাহী, গাজী সালাহুদ্দিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জীবনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে আল্লামা ইকবাল, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, লিয়াকত আলী খান, স্যার সৈয়দ আহাম্মদ, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, জামালুদ্দীন আফগানী, মুসলিম বিজেতা, খোলাফায়ে রাশেদীন ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া, তিনি উপন্যাস রচনা ও অনুবাদ কাজেও হাত দিয়েছিলেন। 'যে যারে ভালবাসে', 'আলেয়া' (১৯৫৫), 'নানা মন নানা রঙ' (১৯৬৭) ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি দিল্লির মীর আম্মানের অনুবাদ করেন। এ অনূদিত গ্রন্থটির নাম 'কিরাতে বাগ ও বাহার'। 'উনিশ শতকে ঢাকার সমাজ জীবন' তাঁর আর একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম হচ্ছে কোরআনের আলো (১৯৬২), ছুটির দিনের গল্প (১৯৬২), নয়া জামানা (১৯৫৪), ঈদ (১৯৫৩), পাণ্ডুলিপি (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। ১৯৬৬ সালে শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মো. আ. জা.

আবু রুশদ : কথাশিল্পী। পিতা আবদুল করীম। ১৯১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৪০ সালে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন কলকাতা বিশ্ববিদালয় হতে ১৯৪২ সালে। ১৯৫৩ সালে ইংরেজি বিষয়েই আবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। জনশিক্ষা পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে : গল্প : রাজধানীতে ঝড় (১৯৩৯), প্রথম যৌবন (১৯৪৮), ডোবা হলো দীঘি (১৯৬০), শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি (১৯৬১), স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৮১), মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার (১৯৮২), দিন অমলিন (১৯৮৫), বিয়োগ ব্যথা (১৯৯৬)। উপন্যাস : এলোমেলো (১৯৪৬), সামনে নূতন দিন (১৯৫১), নোঙর (১৯৬৩), অনিশ্চিত রাগিণী (১৯৬৯), স্থগিত দ্বীপ (১৯৭৪)। সমালোচনামূলক গ্রন্থ : শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস (১৯৮৫), নজরুল বিচিত্রা (১৯৯৭)। আত্মজীবনী : জীবন ক্রমশ (১ম খণ্ড ১৯৮৬), ঠিকানা পথে (২য় খণ্ড ১৯৯০), এখন বর্তমান (৩য় খণ্ড ১৯৯৭)। আরবি কাব্যতত্ত্ব (১৯৬৪)। অনুবাদ : Songs of Lalon Shaha (১৯৬৬), Four Poet from Bangladesh (১৯৬৮), The Aram Adjusted tune (১৯৭৮), The Aborted Island, Selected Short Stories of Abu Rushd, Selected Songs of Nazrul Islam (১৯৯৪), Selected Songs of Rabindranath (১৯৯২), Selected Poems of Tagore (১৯৯৬) ও শেক্সপিয়ার (১৯৯১)। তিনি অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পুরস্কার লাভ করেন। তার মধ্যে রয়েছে : তঘমা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৩), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৬) ; হাবিব ব্যাংক পুরস্কার (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৮১), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯২), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯২) ইত্যাদি। আবু রশদের রচনা বিচিত্রধর্মী। তিনি গল্প-উপন্যাস লেখার পাশাপাশি সমালোচনা সাহিত্যও লিখেছেন। তাঁর নির্মোহ দৃষ্টি নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

মূল্যায়ন বাংলাদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্য অনুবাদ করে তিনি বিদেশী পাঠকের সঙ্গে এ সাহিত্যের পরিচয় করানোর দায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছেন। সৈ.আ.জা.

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : ভাষাবিজ্ঞানী, ছোটগাল্পিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক। তিনি ১৯৩৮ সালের ২৫শে মে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম এরফান গনী এবং মাতা আয়েষা খাতুন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। 'Relativization in Bengal' বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৮২ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। নাগরিক মধ্যবিত্তজীবনই তাঁর গল্পসাহিত্যের প্রধান উপাদান। শিশুসাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষাতত্ত্ব চর্চায় বাংলাদেশে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষার সারল্য তাঁর রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ অনেক গ্রন্থের লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে— ছোটগল্প : 'প্রহেলিকা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫৯), 'সম্রাজ্ঞীর নাম' (১৯৮৭); প্রবন্ধ–গবেষণা : 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব' (১৯৭৪), 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৮৫), 'সম্বন্ধবাচক সর্বনাম : গঠন ও প্রকৃতি' (১৯৮৬), 'A study of standard Bengali and the Noakhali Dialect' (1985) 'Relativization in Bengali' (1986) ; শিশু–সাহিত্য : 'জ্যোৎস্না রাতের রূপকথা' (১৯৫৮), 'রাজপুত্র ও কোটালপুত্র' (১৯৬৩), 'রূপকথার রাজ্যে' (১৯৮০), 'মিন্টু ও পিন্টুর গল্প' (১৯৮৫), 'গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী' (১৯৮১), 'সোনালী রাজহাঁস' (১৯৮৯) ইত্যাদি। ১৯৬১ সালে শিক্ষাসপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তিনি শ্রেষ্ঠ ছোটগাল্পিকের পুরস্কার লাভ করেন। বি. ঘো.

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : লেখক ও সাংবাদিক। ময়মনসিংহ জেলার ধানীখোলা গ্রামে ১৮৯৭ সালের ৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ শাহেদুল্লাহ, মাতা জয়নাব খাতুন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯১৭–তে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক ও ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯–এ দ্বিতীয় বিভাগে আই. এ. পাস করেন। অতঃপর কলকাতা রিপন কলেজে বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০–১৯২২) প্রতি সাড়া দিয়ে স্নাতক পরীক্ষা বর্জন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে (১৮৮৫) যোগদান করেন। ১৯২১–এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতায় সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান করেন। দৈনিক মোহাম্মদী (১৯২১) ও সাপ্তাহিক মোসলেম জগৎ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং মাসিক মোহাম্মদীর (১৯২৭) সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত দৈনিক আজাদ (১৯৩৬)–এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন ১৯৩৭–এ। ১৯৪০–এ এর সম্পাদক হন। ১৯৪২–এ কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনাসাঁ সোসাইটি গঠন এবং এর সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৪৬–এ মুসলিম লীগের (১৯০৬) মনোনয়নে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর আজাদ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত (১৯৪৮) হলে নব পর্যায়ে এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণ ও ছাত্র–হত্যার প্রতিবাদে ১৯৫২–র ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য পদ ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে

www.pathagar.com

পদত্যাগ করেন। ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনার তিনি উদ্বোধন করেন ১৯৫২-র ২৩ ফেব্রুয়ারি। পরের দিন মিনারটি পুলিশ গুড়িয়ে দেয়। ১৯৬২-তে আজাদের সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। ১৯৬৪-তে প্রেসট্রাস্ট অব পাকিস্তান পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্র দৈনিক পাকিস্তান (৬ নভেম্বর ১৯৬৪)-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলন চলাকালে (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬৯) ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সিতারা-এ-খিদমত (১৯৬১) ও সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৭) খেতাব বর্জন করেন। ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসে দৈনিক বাংলার (দৈনিক পাকিস্তানের স্বাধীনতা-উত্তর নাম) সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তিনি বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্য-সমালোচক ও ধ্রুপদী সাহিত্যের দক্ষ অনুবাদক। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও ঋজু প্রকাশভঙ্গি ছিল তাঁর সাহিত্যসমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা বিশেষভাবে নজরুল কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণে ও নব মূল্যায়নে সূক্ষ্ম সাহিত্যজ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। তিনিই প্রথম নজরুলকে যুগ-প্রবর্তক কবি বলে মূল্যায়ন করেন। সৃষ্টিশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সর্বজনস্বীকৃত। অনুবাদে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭০) ও সাংবাদিকতায় একুশে পদক (১৯৭৬) লাভ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : কচিপাতা (শিশুতোষ গ্রন্থ, ১৯৩২), অনাবাদী জমি (তুর্গেনিভের ভার্জিন সয়েল-এর অনুবাদ, ১৩৩৮), ত্রিস্রোতা (তুর্গেনিভের তিনটি গল্পের অনুবাদ, ১৯৩৯), খরতরঙ্গ (তুর্গেনিভের টরেন্টস অব স্প্রে-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত, ১৯৫৩), দৃষ্টিকোণ (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬১), ইলিয়ড (হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ডের অনুবাদ, ১৯৬৭), পলাশী থেকে পাকিস্তান (ইতিহাস, ১৯৬৮), অতীত দিনের স্মৃতি (আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা, ১৯৬৮)। বাঙালি মুসলমান সমাজের সাংবাদিকতার তিনি অন্যতম পথিকৃত। দৈনিক আজাদ (১৯৩৬) সম্পাদনা তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের এক অনন্যসাধারণ কীর্তি। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমান সমাজের নবজাগরণের তিনি একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। মৃত্যু. ঢাকা, ৪ মার্চ ১৯৭৮। নূ. ই

আবুল কাশেম চৌধুরী : নওগাঁ জেলার চক-আতিথা গ্রামে ১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কিয়ামত আলী চৌধুরী ও মাতা সুফিয়া খাতুন চৌধুরী। তিনি রাজশাহী লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক, রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে ১৯৫৮ সালে আই. এ. এবং ১৯৬০ সালে বি. এ. অনার্স (বাংলা), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে এম. এ. (বাংলা) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা' (১৮২০-১৮৪৮) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৮০ সালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৯৩ সাল থেকে অবসর জীবনযাপন করছেন। আবুল কাশেম চৌধুরী প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য। তিনি সাহিত্যের আলোচনার পাশাপাশি সেকালের বাংলার সমাজ, রাজনীতি ও নৃতত্ত্বের বিশ্লেষণেও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য-বিচারে আগ্রহী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : গবেষণা—বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা (১৯৮৩) ও মূল্যবোধের অবক্ষয় : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে (১৯৮৭)। সা. আ.

আবুল কাসেম ফজলুল হক : লেখক ও চিন্তাবিদ। তিনি ১৯৪৪ সালের ৩১ জুলাই তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) পাকুন্দিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ আবদুল হাকিম এবং

www.pathagar.com

মাতা মুসাম্মাৎ জাহানারা খাতুন। তিনি ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে উক্ত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে আবুল কাসেম ফজলুল হক সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। মানবিক মূল্যচেতনা জাগ্রত করা এবং শ্রেয়োনীতির সাধনাই তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। আবুল কাসেম ফজলুল হক অনেক গ্রন্থের লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে— 'মুক্তিসংগ্রাম' (১৯৭২), 'কালের যাত্রার ধ্বনি' (১৯৭৩), 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন' (১৯৭৬), 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য' (১৯৭৯), নৈতিকতা : শ্রেয়োনীতি ও দুর্নীতি', 'মানুষ ও তার পরিবেশ' (১৯৮৪), 'মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব' (১৯৮৭), 'রাজনীতি ও দর্শন' (১৯৮৮), 'সাহিত্যচিন্তা' (১৯৯২) ইত্যাদি। প্রবন্ধসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আবুল কাসেম ফজলুল হক ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ লেখক শিবির পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে অর্জন করেন হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার। সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৯ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। বি. ঘো.

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ : গীতিকার ও লেখক। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপের সারিকাইত গ্রামে ১৯৪৪ সালের ১ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নূর আহমদ। সাউথ সন্দ্বীপ হাইস্কুল থেকে ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক, চট্টগ্রাম সরকারি আই. আই. কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে আই.এ., চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে বি.এ. অনার্স (বাংলা) ও ১৯৬৯ সালে এম.এ. (বাংলা) পাস করেন। ১৯৬৩ সালে ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে চট্টগ্রাম সরকারি আই.আই. কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম বেতারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এর কথিকা লেখক ও গীতিকার হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। কালুরঘাট (চট্টগ্রাম) স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি একজন। তাঁর কণ্ঠ থেকে প্রথম ঘোষিত হয় এই বেতার কেন্দ্রের নাম : 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি' (সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিট, ২৬ মার্চ ১৯৭১)। আবুল কাসেম সন্দ্বীপই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ডিক্লারেশন অব ওয়ার অব ইন্ডিপেনডেন্স' প্রথম সংবাদাকারে প্রচার করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে (মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১) মুজিবনগর সরকার কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম নীতিনির্ধারকের দায়িত্ব পালন করেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ঢাকা বেতারে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে বেতারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের গণশিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক পদে যোগদান করেন। নিরক্ষরতা দূর, স্বাস্থ্যবিধি ও সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাঁর অনেক গান, কবিতা, ছড়া অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রকাশিত বই : ছন্দে ছন্দে শরীরের যত্ন, শুনতে শুনতে গুণতে শেখা, নয় আনা থেকে নয় লাখ। স্বাধীনতা যুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখায় মুজিব সরকার ১৯৭৫ সালে তাঁকে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক প্রদান করে। ১৯৯৯ সালে মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৯৫ সালের ১০ ডিসেম্বর সাভারে (ঢাকা) পরলোক গমন করেন। নূ. ই.

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন : শিশু সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। ১৯৩৪ সালের ২০ এপ্রিল কুমিল্লার লাকসামে জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

তার পিতার নাম আবদুল আউয়াল। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন পুলিশ বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। অতিরিক্ত ডি.আই.জি. (পুলিশ) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। দীর্ঘদিন বিরতির পর তাঁর প্রথম গ্রন্থ চিরকুট প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। শিশুতোষ রচনায় তিনি পারদর্শী। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটকের বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : শালবনের রাজা (১৯৮৩), ফুলবানুর হাসি (১৯৮৪), কমরেড প্রীতিলতা (১৯৮৭), নির্যাচিত প্রেমের গল্প (১৯৮৮), মুক্তিযুদ্ধের গল্প (১৯৯৬), কালো কফিন (১৯৯৫) এবং শিশুতোষ গ্রন্থ : হরেক রকম (১৯৭৯), টাকডুমাডুম (১৯৭৯), রাজপুত্তুর (১৯৭৯), নীলগিরির ডায়নোসর (১৯৮২), ফুস মন্তর (১৯৯০) ও সোনালী দিনের কাহিনী (১৯৯৩)। শিশুতোষ গ্রন্থগুলোর ভাষা সহজ-সরল, প্রচ্ছদপর্ব সুন্দর, অঙ্গসজ্জা মনকাড়া। তিনি অনেকগুলো সাহিত্যপুরস্কার লাভ করেছেন। এরমধ্যে আসফতদ্দৌলা রেজা স্মৃতি সাহিত্যপুরস্কার (১৯৮২), আবুল হাসান স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮), শেরে বাংলা স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮), জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৬) ও ফরিদপুর পৌরসভা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৬) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। খা. বি.জ.উ.

আবুল বরকত : ভাষা শহীদ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার বাবলা গ্রামে ১৯২৭ সালের ১৬ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শামসুজ্জোহা, মাতা হাসিনা বেগম। স্থানীয় তালিবপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে আই. এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি. এ. অনার্স পাস করেন। অতঃপর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ছাত্র-জনতা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলি চালালে উক্ত হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আবুল বরকত আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। ঐ দিন (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) রাত আটটায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঐ রাতেই পুলিশ প্রহরায় আজিমপুর গোরস্তানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তিনি একজন অমর শহীদ। তাঁর এবং অন্যান্য ভাষা শহীদের জীবন উৎসর্গের ফলেই ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে পূর্ব বাংলায় বাঙালির জাতীয় চেতনা বেগবান করার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করে। এই চেতনার উপর ভিত্তি করেই ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভের বেলায়ও রয়েছে বরকতসহ ভাষা শহীদদের অবিনশ্বর আত্মত্যাগ। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে (২০০০)। তাঁর জীবনদানের মহিমাকে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কন করেছেন বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা। নূ. ই.

আবুল বাশার : কথাসাহিতিক ও কবি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার নূতন হাসানপুর গ্রামে ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. কম. সহ হিন্দিতে ডিপ্লোমা লাভ করেন। এগার/বার বছর তিনি স্কুলে চাকরি করেন। বর্তমানে কলকাতার 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জড় উপড়ানো ডালপালা ভাঙা আর এক ঋতু' প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে। এরপর দীর্ঘ সময়

www.pathagar.com

নীরবতা পালন করে শেষে স্ফুলিঙ্গের মতো বিস্ফোরিত হন। ১৯৮৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তাঁর এগারটি গল্পগ্রন্থ ও সতেরটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগ্রন্থ : 'সীমার' (১৯৮৮), 'ফুলবউ' (১৯৮৮), 'মরুস্বর্গ' (১৯৯১), 'অগ্নিবলাকা' (১৯৯৩), 'স্পর্শের বাইরে' (১৯৯৫), উপন্যাস 'চতুষ্টয়' বাঙলাভাষী পাঠকের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে। প্রথমে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছাড়া ১৯৯১ সালে 'স্লোগান থেকে শ্লোকে' প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'যদিও স্বপ্ন স্বপ্নহীন' (১৯৮৯) এবং 'ইমরানের শতরান' (১৯৯৫) নামে দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ পেলে প্রাবন্ধিক হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর ছোটদের বই 'হালুম করলেই বাঘ হয় না' (১৯৯৫) একটি চমৎকার গ্রন্থ। তাঁর লেখায় মুসলিম সমাজের ভেতরের কথা বেরিয়ে এসেছে। পশ্চিম বাংলায় সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের পরই মুসলিম সমাজ নিয়ে লিখে তিনি যথার্থ পরিমিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। 'ফুল বউ' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৮ সালে আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া ১৯৯৪ সালে সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৮ সালে সোপান সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৯৯ সালে কবি কৃত্তিবাস পুরস্কার পেয়েছেন। গৌ. ম.

আবুল মনসুর আহমদ : লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। ময়মনসিংহ জেলার ধানীখোলা গ্রামে ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুর রহিম ফরাযী, মাতা মীরজাহান খাতুন, স্ত্রী আকিকুন্নেসা। নাসিরাবাদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় থেকে ১৯১৭-তে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯১৯-এ প্রথম বিভাগে আই. এ, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯২১-এ বি. এ. এবং কলকাতা রিপন কলেজ থেকে ১৯২৬-এ প্রথম শ্রেণীতে ল. পাস করেন। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী (১৯০৮) ও সাপ্তাহিক ছোলতান (১৯২৩)-এর সহসম্পাদক এবং দৈনিক কৃষক (১৯৩৮) ও দৈনিক ইত্তেহাদ (১৯৪৬)-এর সম্পাদক পদে কাজ করেন। কিছুকাল কলকাতা আলীপুর জজকোর্টে ওকালতি করেন। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২) ও স্বরাজ্য দলের স্বরাজ আন্দোলনে (১৯২৩-১৯২৫) অংশ নেন। ১৯৩০-এ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির (১৯২৯) ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সম্পাদক, ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ও ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০-এ কলকাতা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং ময়মনসিংহ জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। অতঃপর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে অংশ নেন। ১৯৫৩-১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি ২১ দফার তিনি অন্যতম প্রণেতা। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) পরিষদের এবং ১৯৫৫-তে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪-তে পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ১৯৫৬-তে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এবং ১৯৫৬-১৯৫৭-তে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৮-র ১০ অক্টোবর সামরিক সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯৫৯-এর ২৯ জুন কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৬২-র ৬ জুন নিরাপত্তা আইনে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। কয়েক মাস জেলভোগের পর মুক্তি লাভ করেন। এরপর রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ষাট ও সত্তরের দশকে অবজার্ভার (১৯৪৯), ইত্তেফাক (১৯৫৩) ও দি পিপল (১৯৭০) পত্রিকার কলাম লেখক ছিলেন। আবুল মনসুর আহমদের সৃজনশীল ও মননশীল রচনাবলী বিষয় বৈচিত্র্যে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি গদ্য শৈলীর বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। তাঁর সাহিত্যকর্ম মুসলমান-জীবন ও মুসলমান-সমাজ চেতনায় সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের জীবনভিত্তিক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর লেখায় পরিলক্ষিত হয়। তিনি একজন অসাধারণ ব্যঙ্গরসাত্মক গদ্য লেখকও। আত্মপ্রতারণা ও হীনমন্যতাকে শাণিত বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ--উপন্যাস : সত্যমিথ্যা

www.pathagar.com

(১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮) ; ব্যঙ্গরচনা : আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪) ; প্রবন্ধ : পাক-বাংলার কালচার (১৯৬৪) ; রাজনীতিমূলক গ্রন্থ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বৎসর (১৯৬৯), শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২) ; স্মৃতিকথা : আত্মকথা (১৯৭৮)। ১৯৬০-এ বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৭৯-তে স্বাধীনতা দিবস পদক লাভ করেন। মৃত্যু. ঢাকা, ১৮ মার্চ, ১৯৭৯। নূ. ই

আবুল মাল আবদুল মুহিত : প্রাবন্ধিক ও অর্থনীতিবিদ। ১৯৩৪ সালের ২৫ জানুয়ারি সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু আহমদ আবদুল আজিজ। ১৯৪৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। এম পি এ করেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে। তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও সাবেক অর্থমন্ত্রী (১৯৮২-১৯৮৬)। রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে তিনি একজন নামজাদা ব্যক্তিত্ব। জন্ম, প্রশাসন, উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক বিষয়াদির উপর নিবন্ধ লিখে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে লেখা তাঁর 'স্মৃতি অম্লান' গ্রন্থটি পাঠকনন্দিত। এই গ্রন্থটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন বেশ কটি বই। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য (১৯৯১), দি ডেপুটি কমিশনার ইন ইস্ট পাকিস্তান (১৯৬৮), বাংলাদেশ ইমার্জেন্স অব এ নেশান (১৯৭৮), থটস অন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (১৯৮১) ও প্রোবলেম্বস অব বাংলাদেশ এ্যান এ্যাটেমপ্ট এ্যাট সার্ভিস (১৯৮৩)। খা. বি. জ. উ.

আবুল মোমেন : কবি ও প্রাবন্ধিক। ১৯৪৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ আবুল ফজল। ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর লেখালেখির সূচনা ঘটে। আবুল মোমেনের সাহিত্য পরিমণ্ডল মনস্বীচেতনা সমৃদ্ধ। কবিতায় তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সচেতন, ভাবুক ও বিনম্র। জীবনের নানাবিধ স্পর্শকাতর ও মেদুর অনুষঙ্গের নান্দনিক প্রকাশই তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে প্রগতিশীল ধারার সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতির নানা বিষয়ের মননশীল পরিবেশনা লক্ষ করা যায়। বয়স্কজন পাঠ্য সাহিত্য রচনার পাশাপাশি শিশুসাহিত্য রচনায়ও তিনি সক্রিয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কবিতা—চার ভুবনের চারণ (১৯৭৯), চড়াই উৎরাই (১৯৮৯), অর্থাৎ পৌরুষের (১৯৯৪), ভেঙে পড়ার সময় (১৯৯৮), প্রবন্ধ : কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী (১৯৯৪), বাংলা ও বাঙালির কথা (১৯৯২), সংস্কৃতির সঙ্কট ও সাম্প্রদায়িকতা (১৯৯৬), শিশুসাহিত্য—বিজ্ঞানী মামা ও অপারেশন ফিউচার (১৯৯৩), আরো এক বধ্যভূমি (১৯৯৬), সূর্য ও শিউলি (১৯৯৭)। আবুল মোমেন ১৯৯২ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সাংবাদিক। সু. ব.

আবুল হাসনাত : গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক। সাহিত্যের একাধিক শাখায় বিচরণ করলেও আবুল হাসনাত ছোট গল্প রচনায় অধিক স্বতঃস্ফূর্ততার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে মানব মনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বিচ্যুতি এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য, জীবন ও মূল্যবোধের অসংগতি, কষ্ট ও শব্দে এবং নিঃশব্দে মানুষের জাগরণ ও উত্তরণের প্রয়াস, বারবার তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। লেখকের প্রথম উপন্যাস 'বিহঙ্গমন' ও প্রথম ছোট গল্প গ্রন্থ 'স্বর্গের সিঁড়ি' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও শিশু-সাহিত্যসহ ইতোমধ্যে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা উনিশটি। প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ দুটির নাম : 'মুসলিম রচিত উপন্যাস', 'মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা।' আবুল হাসনাত ১০ নভেম্বর ১৯৩৬ সালে মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

থেকে ১৯৬০ সালে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পেশাগত জীবনে বাংলা একাডেমীর পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। মা. আ.

আবুল হাসান : কবি। গোপালগঞ্জ জেলার বর্নি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ ৪ আগস্ট ১৯৪৭। পৈতৃক নিবাস পিরোজপুর জেলার ঝনঝনিয়া গ্রাম। পিতা পুলিশ অফিসার মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, মাতা মোসাম্মৎ সালেহা বেগম। প্রকৃত নাম আবুল হোসেন মিয়া, আবুল হাসান তাঁর সাহিত্যিক নাম। ঢাকা আরমানিটোলা সরকারি স্কুল থেকে ১৯৬৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এস. এস. সি. ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ. এস. সি. পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর ইংরেজি অনার্স ক্লাসে অধ্যয়ন করেন (১৯৬৫–১৯৬৭)। গণবাংলার (১৯৭২) সহকারী সাহিত্য সম্পাদক (১৯৭২–১৯৭৩), জনপদের (১৯৭৩) সহকারী সম্পাদক (১৯৭৩–১৯৭৪) ও গনকণ্ঠের (১৯৭২) সহ-সম্পাদক (১৯৭৪) পদে চাকরি করেন। একজন সৃষ্টিশীল কবি। আত্মগত দুঃখবোধ, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও মৃত্যুচেতনা শৈল্পিক রূপ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও এতে পরিস্ফুটিত হয়েছে। অলঙ্কারমণ্ডিত ব্যঞ্জনাময় ভাষায় তিনি নির্মাণ করেছেন এক স্বতন্ত্র প্রকরণশৈলী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : রাজা যায় রাজা আসে (১৯৭২), যে তুমি হরণ করো (১৯৭৪) ও পৃথক পালঙ্ক (১৯৭৫)। কাব্যনাট্য : ওরা কয়েকজন (১৯৮৮)। ছোটগল্প : আবুল হাসান গল্পসংগ্রহ (১৯৯০)। এশীয় কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৯৭০)। মরণোত্তর বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৫) ও মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৮২) লাভ করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকা পি. জি. হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। নূ. ই

আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা : এ গ্রন্থটি মুহম্মদ নূরুল হুদা, ফখরুল ইসলাম রচি ও জাফর ওয়াজেদের সম্পাদনায় কবির মৃত্যুর পর তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতা নিয়ে নসাস থেকে ১৯৮৫ সনের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকায় বাংলা কবিতার প্রেক্ষিতে আবুল হাসানের কবিতার মৌল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে ১২৮টি কবিতা সংকলিত হয়ে বইটির শুধু কলেবরই বৃদ্ধি করেনি ; কবির চেতনার সামগ্রিকতা ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এ বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো : 'শুধু ক্ষয় শুধু বলিদান আজ ভিতরে বাহিরে'। এখানে মানব সভ্যতা যে আজ ধ্বংসের সম্মুখীন তার ইঙ্গিত রয়েছে। কবির লেখায় : 'মাথার ভিতরে আজ মানুষের মন বড় ছোট হয়ে আসিতেছে/ অস্ত্র ফলিতেছে, বৃক্ষে, বিষফল মনুষ্য ডানায় আজ দুলিতেছে/কানায় কানায়'! এছাড়া 'যাই', 'আমার হবে না, আমি বুঝে গেছি', 'হায় বৃক্ষ, হায় অন্ধকার', 'যা কিছু জন্মায় আমি ঘৃণা করি তোমাকেও', 'কবিদের এমনি হয়' এ কবিতাগুলোতে কবির স্বরচিত বৈশিষ্ট্যের বহুমাত্রিক দিকগুলো ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে কবি স্বনির্মিত ভাষাভঙ্গি আবিষ্কার করেছেন যা প্রতিটি কবিতাতেই ঝিলিক দিয়ে যায়। 'চিত্ররূপবর্ণময়' রূপক ব্যবহারের তিনি সিদ্ধহস্ত। এরপরও আবুল হাসানের প্রধান কৃতিত্ব প্রতিটি কবিতাকেই হাসানীয় ঘরানার কবিতা করে তোলা। 'তোমার মৃত্যুর জন্য', 'শেষ বিচ্ছেদের শব্দ', 'পাখি প্রবাহ ও অন্যান্য প্রত্যাশা' এবং 'ভাঙ্গনের শব্দ শুনি' কবিতাতেও হাসানের নিজস্ব দর্শন, সংস্কার আলোর প্রতিফলন রয়েছে। নন্দনের চিরায়ত ঔজ্জ্বল্যই কবিতাকে অমরত্ব দান করে। তাই জীবৎকালে প্রকাশিত আবুল হাসানের প্রকাশিত 'রাজা যায় রাজা আসে', 'পৃথক পালঙ্ক' ও 'যে তুমি হরণ করো' কাব্যগ্রন্থগুলোর থেকেও এ গ্রন্থের কবিতার শেকড় আরও শক্ত মাটিতে প্রোথিত। গৌ. ম.

www.pathagar.com

আবুল হুসেন : লেখক ও চিন্তাবিদ। যশোর জেলার পানিসারা গ্রামে ১৮৯৬ সালের ৬ জানুয়ারি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস কাউনিয়া, যশোর। পিতার নাম হাজী মুহম্মদ মুসা, মাতা আছিরুন্নেসা, স্ত্রী মৌলুদা খাতুন। যশোর জেলা স্কুল থেকে ১৯১৪-তে ম্যাট্রিক, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৬-তে আই. এ. ও ১৯১৮-তে বি. এ. পাস করেন। সব পরীক্ষায়ই বৃত্তি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২০-এ অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২২-এ বি.এল. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১-এ এম. এল. পাস করেন। তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমান যিনি মাস্টার অব ল. ডিগ্রি লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৯২০-এ কলকাতা হেয়ার স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১) বাণিজ্য বিভাগের সহকারী লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯২৭-এ অধ্যাপনার কর্ম ইস্তফা দিয়ে ঢাকা জজকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৩১-এ কলকাতা হাইকোর্ট বারে যোগ দেন। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)-এর তিনি প্রধান স্থপতি। 'মুক্ত বুদ্ধির চর্চা' সাহিত্য সমাজ তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজের বক্তব্য ছিল : "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" সমাজের সভ্যরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন। আবুল হুসেন ছিলেন এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। আন্দোলনের ফলে মুসলমান যুব সমাজের মধ্যে উদার জ্ঞানচর্চা ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। সমাজের বার্ষিক মুখপত্র ছিল 'শিখা' (১৯২৬-১৯৩১)। আবুল হুসেন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক। তিনি একজন মননশীল, যুক্তিনিষ্ঠ ও মানবকল্যাণমুখী গদ্য লেখক। মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিস্তার এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের পথ নির্দেশই ছিল তাঁর সাহিত্যসাধনার মূল লক্ষ্য। 'বাংলার বলশী' (১৯২৫), 'বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা' (১৯২৮) ও 'মুসলিম কালচার' (১৯২৮) তাঁর বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ। বাংলার দরিদ্র কৃষকদের প্রতি ছিলেন সংবেদনশীল। তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অনগ্রসরতার হেতু এবং তা থেকে মুক্তির দিকনির্দেশনা দান করে রচনা করেন 'বাংলার বলশী'। তাঁর রচনায় রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। মুক্তবুদ্ধি ও উদার চিন্তার অধিকারী আবুল হুসেন ছিলেন তাঁর কালের একজন প্রখ্যাত মনীষী। বাঙালি মুসলমান সমাজে অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে তিনি পথিকৃতের কাজ করেছেন। মৃত্যু. কলকাতা, ১৫ অক্টোবর ১৯৩৮। নূ. ই

আবুল হোসেন : কবি। তিনি ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এস. এম. ইসমাইল হোসেন। তিনি ১৯৪২ সালে অর্থনীতি বিষয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। আবুল হোসেন পেশাগত জীবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ : কবিতা : নব বসন্ত (১৯৪০), বিরস সংলাপ (১৯৬৯), হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস (১৯৮২), দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে (১৯৮৫), Selected Poems of Abul Hussain (১৯৮৬), এখনও সময় আছে (১৯৯৬), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৭), রাজ রাজড়া (১৯৯৭)। অনুবাদ কবিতা : ইকবালের কবিতা (১৯৫২), আমার জন্মভূমি (১৯৭৮), অন্য ক্ষেতের ফসল (১৯৯০)। অনুবাদ উপন্যাস : অরণ্যের ডাক (১৯৫৪)। ভ্রমণকাহিনী : পার্বত্য পথে (১৯৪৬)। তিনি যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক, পদাবলী পুরস্কার, জাতীয় কবিতা পুরস্কার, নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক, জনবার্তা স্বর্ণপদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার ইত্যাদি। একজন আধুনিক কবির পূর্ণ

www.pathagar.com

অবয়বে আবুল হোসেন স্নাত। তিনি যে সময়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন সে সময়ে বাঙালি মুসলমান কবির সংখ্যা ছিল হাতে গোনার মতো। কবিতায় তাঁর নতুন আঙ্গিক ব্যবহার, মোড়–ফেরানো দৃষ্টিভঙ্গি এবং কবিতার শিল্পরূপ সমকালীন মানুষকে বিস্মিত করেছিল। সৈ. আ. জা.

আবু সয়ীদ আইয়ুব : দার্শনিক, রবীন্দ্র-সমালোচক, গবেষক। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের কলকাতায় এক অবাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দু তাঁর মাতৃভাষা। উর্দু ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ পড়ে তিনি এতই অভিভূত হন যে মূল বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ পড়ার আগ্রহে বাংলা শেখেন। এরপর তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে তিনটি বই লেখেন সে বইগুলো বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত হয়। বইগুলো হলো : 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৮), পান্থজনের সখা' (১৯৭৩), 'পথের শেষ কোথায়' (১৯৭৭)। ইংরেজিতে লেখেন 'Tagore's Quest' (১৯৮০)। আবু সয়ীদ আইয়ুবের জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল অপরিসীম। বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য তাঁর মননচর্চার মূল বিষয় ছিল। পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। পরবর্তী কালে স্বাস্থ্যগত কারণে এম. এস. সি. পরীক্ষা না দিয়ে দর্শন শাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী সি, ভি. রামনের সঙ্গে 'রামন এফেক্ট' নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি প্রখ্যাত দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণননের সঙ্গে গবেষণা কাজে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষকতা ছিল তাঁর পেশা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের অন্যান্য গ্রন্থ : 'Poetry And Truth' (১৯৭০), 'Varieties of Experience' (১৯৯০), ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক (১৩৯৮)। গালীবের গজল থেকে (১৯৭৬), মীরের গজল থেকে (১৯৮৭) এই বই দু'টি তিনি উর্দু ভাষা থেকে অনুবাদ করেন এবং অসাধারণ অনুবাদ গ্রন্থ হিসেবে পাঠক মহলে স্বীকৃত হয়। তিনি বাংলা কবিতার দুটি অসামান্য সংকলন প্রকাশ করেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহযোগে প্রকাশিত হয় আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৪০) এবং ২৫ বছরের প্রেমের কবিতা (১৩৬৩)। তিনি ১৯৫৭-৬৭ পর্যন্ত 'Quest' পত্রিকার সম্পাদনা করেন অম্লান দত্তের সঙ্গে যৌথভাবে। তিনি যেসব সম্মানে ভূষিত হয়েছেন সেগুলো হলো : রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৬৯), সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার (১৯৭০), আনন্দ পুরস্কার (১৯৭৬), দেশীকোওম (১৯৮০, বিশ্বভারতী), রবীন্দ্রতত্ত্ব (Tagore Research Institute)। ১৯৫৬ সালের ১০ জুন প্রখ্যাত সাহিত্যিক গৌরী দত্তের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ১৯৮২ সালের ২১ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিশিষ্ট লেখক শিব নারায়ণ রায় ১লা মাঘ ১৩৮৯ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথ বিগত হবার পরেও যে অল্প কয়েকজন মনীষীর সান্নিধ্য বাংলার রেনেসাঁসকে আমার চেতনায় প্রত্যক্ষ করে তুলেছিল আবু সয়ীদ আয়ুব তাঁদের একজন। তাঁর দেহের কান্তি এবং আচরণের শালীনতা, তাঁর অনাক্রম্য যুক্তিনিষ্ঠা এবং অনুভবের সৌকুমার্য, তাঁর জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি এবং সরস বৈদগ্ধ্য তাঁর নৈতিক দার্ঢ্য এবং সুবেদী রূপবোধ, তাঁর বিশ্বনাগরিকতা এবং ঐতিহ্য চেতনা সব মিলিয়ে তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব আমাকে নিয়ত ভরসা যোগাত যে বাংলার রেনেসাঁস কোনো কেতাবী বিতণ্ডার বিষয় অথবা বিগত সমৃদ্ধির স্মৃতি মাত্র নয়, আমার সমকালেও তা জীবন্ত জাগ্রত ও ফলপ্রসূ।' আবু সয়ীদ আইয়ুব মননের যে ব্যাপ্তি ও দার্ঢ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে এক বিরল দৃষ্টান্ত। সে. হো.

আবু হানিফা (রা.) : ইসলামিক শাস্ত্রবেত্তা। হিজরি ৮০ সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

তফসির, হাদিস, আরবি ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কোরআন-হাদিস সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জন্য একটি আইন শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, যা ফিকাহ শাস্ত্র নামে পরিচিত। এ শাস্ত্রে নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এটি ছিল তাঁর এক মহৎ উদ্যোগ। এ উদ্যোগ সফল করার জন্য বড় বড় আলেমদের নিয়ে তাঁর নেতৃত্বে একটি পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদ দীর্ঘ ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফিকাহ শাস্ত্র সংকলন করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা নামে সুপরিচিত। তিনি হানাফি মাযহাবের প্রবক্তা। মৃত্যু. ১৫০ হিজরি। নূ. ই.

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : কবি ও গীতিকার। ১৯৩৬ সালের ১৩ মার্চ পাবনা শহরের উপকণ্ঠে গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এম. শাহজাহান আলী আর মাতা খালেকুননেসা। আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ১৯৫২ সালে পাবনা জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করে মানবিক শাখায় ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে The Bengali Press and Literary Writings (1818-1831) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। একাধিক কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। তিনি ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রফেসর পদে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (১৯৮৪-১৯৮৬) এবং বাংলা একাডেমীর (১৯৮৬-১৯৮৯) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কবি হিসেবেই আবু হেনা মোস্তফা কামাল সমধিক পরিচিত। তবে কবিতা ছাড়াও তিনি গান, প্রবন্ধ ও গবেষণাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কৃতির স্বাক্ষর রেখেছেন। রোম্যান্টিক চেতনায় নাগরিক মধ্যবিত্তমানসের বহুমাত্রিক অসঙ্গতি, নৈঃসঙ্গ্য এবং অতলান্ত বেদনার কথা তাঁর কবিতা ও গানে শিল্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের গদ্যচর্চার ধারায়ও তিনি সংযোজন করেছেন স্বকীয় মাত্রা। আবু হেনা মোস্তফা কামাল অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর গ্রন্থসমূহ হচ্ছে—কবিতা : আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮) ; প্রবন্ধ : শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫), কথা ও কবিতা (১৯৮১) ; জর্নাল ও ব্যক্তিগত রচনা : কথাসমগ্র--১ (২০০০) ; গান : আমি সাগরের নীল (১৯৯৫) ; গবেষণা : The Bengali Press And Literary Writing (1977) ; সম্পাদনা : পূর্ব বাংলার কবিতা (১৯৫৪), কলিকাতা কমলালয় (১৯৭৫) ইত্যাদি। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি একুশে পদক (১৯৮৭), আলাওল পুরস্কার (১৯৭৫), সুহৃদ সাহিত্য পদক (১৯৮৬) ইত্যাদি পুরস্কারে/পদকে ভূষিত হন। আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৮৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। বি.ঘো.

আবেস্তার ভাষা : ইরানি ও আর্যভাষা। ধর্মপ্রবর্তক জোরাস্ট্রারের বাণীগ্রন্থের নাম জেন্দ আবেস্তা। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের ইন্দো-ইরানিয় শাখার ইরানি ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে আবেস্তায়। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে

www.pathagar.com

এভাষা পণ্ডিতদের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। পণ্ডিতদের ধারণা মূল আবেস্তার ভাষা নানা সময়ে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে কারণে আবেস্তার মূল ভাষার সঠিক ব্যাকরণ নির্মাণ দুঃসাধ্য। যাহোক তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিকের প্রচেষ্টায় আবেস্তার ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার সম্পর্ক ও মিল নানাভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ম.মু.

আবোল তাবোল : শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের প্রথম বই। শিশুতোষ কবিতার বই এটি। এই বইতে রয়েছে মোট ৪৭টি কবিতা। কবিতাগুলোর উপজীব্য হলো আজগুবি, উদ্ভট ও অসম্ভব সব বিষয়। কবির ভাষায় এটি 'খেয়াল রসের বই।' 'আবোল তাবোল'-এর কবিতাগুলোর ছন্দ মিল ও মাত্রা পুরোপুরি ঠিক, কিন্তু এগুলোর ভাব-অনুষঙ্গ বেতাল-বেঠিক। এখানে হাঁস হয়ে যায় হাঁসজারু, বক আর কচ্ছপ মিলে ধারণ করে কচ্ছপ মূর্তি, কারো আবার ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গা ব্যথা হয়ে যায়, কারো যায় গোঁফ চুরি, কেউ করে গন্ধের বিচার। এমনি সব হাস্যরসসমৃদ্ধ মজার মজার বিষয় নিয়েই 'আবোল তাবোল'-এর ৪৭টি কবিতা। 'আবোল তাবোল' বাংলা সাহিত্যে, ছোটদের জন্য হাস্যরস প্রধান কাব্যধারার মাইলফলক। এই বই পরবর্তীকালের কবিদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। সুকুমার রায়ের জীবদ্দশায় তাঁর কোনো বই প্রকাশিত হয় নি। 'আবোল তাবোল'-এর লেখা নির্বাচন, প্রকাশনা পরিকল্পনা, প্রুফ সংশোধন, প্রচ্ছদ অংকন সব শেষ করে ছিলেন তিনি। কিন্তু বইটির প্রকাশনা দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বইটি প্রকাশিত হয়। 'আবোল তাবোল' বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ কবিতাগুলোর সঙ্গে সংযোজিত ছবি। এ ছবিগুলোও সুকুমার রায়ের নিজের আঁকা। বই আকারে প্রকাশের আগে কবিতা ও ছবিগুলো সন্দেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সু.ব.

আব্বাসউদ্দীন আহমদ : পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারের অন্তর্গত বলরামপুর গ্রামে ১৯০১-এর ২৭ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জাফর আলী আহমদ ছিলেন তুফানগঞ্জ আদালতের একজন উকিল। তুফানগঞ্জ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। কুচবিহার কলেজে আই.এ. এবং বি.এ. পড়েন। বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। কলকাতায় বঙ্গীয় সরকারের রেকর্ডিং অ্যাক্সপার্ট এবং পরে অতিরিক্ত সং পাবলিসিটি অফিসার পদে দায়িত্ব পালন করেন। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর ঢাকায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে এডিশনাল সং অর্গানাইজার পদে চাকরি করেন। একজন সহজাত সঙ্গীত শিল্পী। কোনো ওস্তাদের কাছে গানের তালিম গ্রহণ করেন নি। বাল্যকাল থেকে সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর ঝোঁক। অদ্ভুত সুন্দর ছিল তাঁর গলা। কোনো গান দু'একবার শুনলেই তার সুর আয়ত্ত করতে পারতেন। নিজের সাধনায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে নিখুঁতভাবে গান গাইতে শেখেন। সরকারি চাকরিতে যোগদানের পরপরই কলকাতায় সঙ্গীতজগতে প্রবেশ করেন। তিনি একজন যুগস্রষ্টা পল্লীগীতির কণ্ঠশিল্পী। বিশুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গি, অনুপম সুরেলা কণ্ঠ, তাল-লয় ও মাত্রাজ্ঞান সমন্বিত হয়ে তাঁর কণ্ঠে পল্লীগীতি এক নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করে। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মুর্শিদী, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদী ইত্যাদি লোকগীতির তিনি অনবদ্য গায়ক। আধুনিক গান, কীর্তন আর রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত সেনের গানের যুগে মর্মস্পর্শী সুরে পল্লীগীতি গেয়ে তা অভিজাত সমাজে জনপ্রিয় করে তোলেন। 'ওকি গাড়িয়াল ভাই', 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' ইত্যাদি ভাওয়াইয়া গান এবং 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া', 'নদীর কূল নাই কিনারা নাই' ইত্যাদি ভাটিয়ালি গান তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডিং হলে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি করানোর ব্যাপারে

www.pathagar.com

তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের গানেরও তিনি একজন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী। 'ও মন রমজানের রোজার শেষে, এলো খুশীর ঈদ', 'ত্রিভুবনে প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়', 'তোরা দেখে যা আমিনা কোলে' নজরুলের এ-সব গান আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে গীতি হলে বাংলার মুসলমান সমাজে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। তিনি সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছিলেন গণ-মানুষের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সামাজিক সমস্যামূলক, জাতিগঠনমূলক ও দেশাত্মবোধক গান গেয়ে মানুষের মধ্যে জাগরণ আনেন। লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক' (মরণোত্তর, ১৯৮১)-এ ভূষিত করে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' (১৯৬০)। ১৯৫৯-এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। নূ.ই

আব্বুকে মনে পড়ে : হুমায়ুন আজাদ রচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। বইটির প্রকাশক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। প্রকাশকাল জুন ১৯৮৯। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সৈয়দ ইকবাল। মূল্য ২০.০০ টাকা। 'আববুকে মনে পড়ে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক শিশু—১৯৭১ সালে যার বয়স ছিলো চার বছর। আব্বু সম্পর্কে তার স্মৃতি অস্পষ্ট—কখনো তার আব্বুকে মনে পড়ে, কখনো পড়ে না। সে জেনেছে তার আব্বু যুদ্ধে গেছে দেশ স্বাধীন করতে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু তার আব্বু ফিরে আসে নি। আববুর জন্য নিরন্তর ব্যাকুল অপেক্ষার মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে উপন্যাসটি। উপন্যাসটির কাহিনী বিবৃত হয়েছে ফ্ল্যাশব্যাকে। ১৯৭১ সালের মার্চের উত্তাল ও থমথমে দিনগুলো এবং সন্ত্রস্ত ঢাকা শহরের জনজীবন হুমায়ুন আজাদের সপ্রতিভ ভাষায় বাঙময় হয়ে উঠেছে উপন্যাসটিতে। এই উপন্যাস শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক অবিস্মরণীয় ভালোবাসার স্মারক। সু.ব.

আব্বুর জন্যে যুদ্ধ : মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। লেখক সিরু বাঙালী। প্রকাশক : শৈলী প্রকাশন, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল : মার্চ ২০০০। প্রচ্ছদ শিল্পী : উত্তম সেন, অলঙ্করণ : সৈয়দ ইকবাল। মূল্য : ৪০.০০ টাকা। উপন্যাসের নায়ক আদনান শাহেদী পনের বছরের কিশোর। তার বাবা আনোয়ার শাহেদী পাকিস্তান নেভীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। চাকরি সূত্রে তিনি সপরিবারে করাচিতে অবস্থান করছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ সরকারি নির্দেশে তিনি করাচি থেকে চট্টগ্রাম আসেন, কিন্তু আর ফিরে যাননি। পরে আদনান শাহেদী করাচিতে জানতে পারেন তাঁর বাবা আনোয়ার শাহেদীকে ২৫ মার্চ চট্টগ্রাম শহরের নেভাল বেস মেসে অন্যান্য বাঙালি নেভী অফিসারের সঙ্গে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয়। আদনান তাঁর মা ও ছোট বোনকে নিয়ে লাহোর হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আসার জন্য যাত্রা শুরু করে। কিন্তু সে স্বজন সর্বস্ব হারিয়ে আহত অবস্থায় ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে পড়ে যায়। সুস্থ হয়ে সে নেভাল কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার আব্বুর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। সে লিম্পেট মাইন বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে কাপ্তাই হ্রদে পাকিস্তান নেভীর পূর্ব পাকিস্তান কমান্ডারের বিলাসবহুল প্রমোদতরী ধ্বংস করে। সর্বস্ব হারানো এক কিশোরের মুক্তিযোদ্ধার করুণ ও গৌরবময় শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে আব্বুর জন্যে যুদ্ধ। পাকিস্তানে আটকা পড়া কোনো বাঙালি কিশোরের সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরল বাস্তবচিত্র এটি। সু. ব.

আভীর/আহির সম্প্রদায় : আভীর বা আহিরগণ প্রাচীন ভারতে বহিরাগত নানা উপজাতির অন্যতম। এরা সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্য থেকে শকজাতির সঙ্গে ভারতে আগমন করে। প্রথমে পাঞ্জাব, রাজপুতনা ও নিম্নসিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। এককালে নিম্নসিন্ধু এলাকা তাদের নাম অনুসারে আভীর

রাজ্য বলে অভিহিত হত। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমি এই রাজ্যকেই 'আবিরিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন। কালক্রমে আভীরগণ দক্ষিণাঞ্চলে তাপ্তী নদীর মোহনা থেকে কোঙ্কণ উপকূল পর্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মালহদেশের পূর্বাঞ্চলের একটি আঞ্চলিক নাম 'আহিরওয়ার' আজও আভীরদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পশুপালক আভীররা প্রথমে যাযাবর ছিলো। কালক্রমে তারা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে। শাস্ত্রকাররা আভীরদের ম্লেচ্ছ বা দস্যুরূপে বর্ণনা করলেও, মহাভারতে এদের ক্ষত্রিয়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। গোচারণ ও গোপালন আভীরদের প্রধান পেশা ছিলো। কালে তারা কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করেছিলো। সাতবাহকদের পরে দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আভীরেরা এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিলো বলে জানা যায়। বিভিন্ন শিলালিপিতে আভীর রাজা মাঠরিপুত্র ঈশ্বরসেন, ঈশ্বর দত্ত ইত্যাদি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের সংস্কৃতিতে আভীবা বা আহিরদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের লীলা কল্পনায় আভীরদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে আহেরিয়া রাগিনীর উল্লেখ আভীরদের অবদানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সু.মু.

আভীরী : দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে কোমল গানধার, কোমল ধৈবত, কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহ পাঁচস্বর ও অবরোহে সাত স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরোহে ঋষভ ও ধৈবতবর্জিত।. বাদী স্বর পঞ্চম, সংবাদী স্বর ষড়জ। ঠাট আশাবরী। আরোহ : স জ্ঞ ম প ণ র্স। অবরোহ : র্স ণ দ প ম জ্ঞ র স। ক.গো.

আভোগী : রাত্রি গেয় রাগ। এই রাগে কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। জাতি ঔড়ব। আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমেই এই রাগে পাঁচ স্বর ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম ও নিষাদ বর্জিত। বাদী স্বর ষড়জ, সংবাদী স্বর মধ্যম। ঠাট কাফি।

আরোহ : স র জ্ঞ ম ধ র্স।

অবরোহ : র্স ধ ম জ্ঞ র স। ক. গো.

আমজাদ হোসেন : বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। তিনি জামালপুর শহরের ইকবাল রোডে ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ নূরউদ্দিন সরকার, মাতার নাম করিমাতুননেসা। জামালপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে ১৯৫৬ সালে মাধ্যমিক পাস করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন ১৯৫৮ সালে জামালপুরের আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে। স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন সিটি কলেজ, ঢাকা থেকে। তিনি 'শুক্লা ফিল্ম' নামক চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অবেলায় অসময়'। প্রথম উপন্যাসই তাঁকে লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি ও পাঠকপ্রিয়তা এনে দেয়। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসসমূহ হচ্ছে নিরক্ষর স্বর্গে (১৯৭৮), অস্থির পাখিরা (১৯৮৩), উঠান (১৯৮৩), আমি এবং কয়েকটি পোস্টার (১৯৮৩), আগুন লাগা সন্ধ্যা (১৯৮৮), শেষ রজনী (১৯৮৯), মাধবী সংবাদ (১৯৮৯), মাধবীর মাধব (১৯৮৯), মাধবী ও হিমানী (১৯৯০), মাধবী সমগ্র (১৯৯০), কেউ কোনোদিন (১৯৯০), গোলাপী এখন ট্রেনে (১৯৯১)। তাঁর একাধিক উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ ও নাট্যরূপ দেয়া হয়েছে। উঠান, আগুন লাগা সন্ধ্যা এবং গোলাপী এখন ট্রেনে সেসবের মধ্যে অন্যতম। তাঁর নির্মিত 'গোলাপী এখন ট্রেনে' ছবিটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হিসেবে বিবেচ্য। এ ছবিটি একাধিক জাতীয় পুরস্কার পায়। এই লেখকের ছোটগল্পের বই 'কাল সকালে' প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে, এরপর দীর্ঘ-বিরতির শেষে ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'দ্বিখণ্ডিতা' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত

www.pathagar.com

কিশোরগল্প'। সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র ও নাট্যকলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নাট্যকার পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৫ সালে, অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ১৯৮৬ সালে, শেরে বাংলা জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৮৭ সালে এবং কালচক্র সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ১৯৯০ সালে। আবাল্য সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে যুক্ত এই লেখক-চলচ্চিত্র নির্মাতা বর্তমানেও লেখালেখি এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। র.আ.ক.

আমরা অপেক্ষা করছি : হাসান আজিজুল হকের ৭টি গল্পের স্বনির্বাচিত সংকলন। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৮৯ (মুক্তধারা)। গল্পগুলো হলো : আমরা অপেক্ষা করছি, মিনি মাগনার চুমকুড়ি, হাওয়া নেই, মাটির তলার মাটি, সমুখে শান্তি পারাবার, পাব্লিক সার্ভেন্ট, অচিন পাখি। বিশ শতকের সত্তর দশকের শেষ ও আশির দশকের সূচনায় গল্পগুলো রচিত। গল্পগুলোর বিষয়ে বৈচিত্র্য আছে। সমকালীন চেতনায় আলোড়িত উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ গল্পগুলোর প্লট। 'আমরা অপেক্ষা করছি' গল্পে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি লেখকের আস্থার বিষয়টি পরিস্ফুট। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে এ গল্পের একাধিক চরিত্র নিবেদিতপ্রাণ। 'হাওয়া নেই' এবং 'মাটির তলার মাটি' গল্প দুটিতেও সমাজতন্ত্রের প্রতি লেখকের দুর্বলতা দুর্লক্ষ্য নয়। সমকালের রাজনীতিকে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করে রচিত গল্প 'সমুখে শান্তি পারাবার' এবং 'পাব্লিক সার্ভেন্ট'। প্রথম গল্পে খালকাটা বিপ্লবের যুগে একজন গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক পরিবারের দুর্গত জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় গল্পে বর্ণিত হয়েছে ক্ষমতালিপ্সু ও চতুর এক আমলার কাহিনী, যারা নিজেদের স্বার্থেই সামরিক শাসককে টিকিয়ে রাখে, যদিও তার খেসারতও তাদের দিতে হয়। 'মিনি মাগনার চুমকুড়ি' এবং 'অচিন পাখি' গল্পদুটো সমকালীন নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছে। প্রথমটিতে চিত্রিত হয়েছে দারিদ্র্যের কশাঘাতে বিবর্ণ নরনারীর প্রেমহীনতা, আর দ্বিতীয়টিতে পাওয়া যায় অসুস্থ রাজনীতির ছোবলে সন্তানহারা এক পিতার শোকার্ত হৃদয়। হাসান আজিজুল হকের অন্যান্য গল্পের মতো এ গ্রন্থের গল্পগুলোতেও ব্যাপক কাব্যধর্মিতা লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে সংকেত ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। স্ব.স.

আমরা কি একাত্তরে ফিরে যাচ্ছি : পান্না কায়সার। বইটি প্রকাশ করেছে দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ক্রম, জনমানসে এই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ও সমকালীন সঙ্কটকে উপজীব্য করে লেখা এ বইটি। ষোলটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের কথা, মহান ভাষা আন্দোলনের কথা, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাকামী লাখো মানুষের আত্মদান ও ত্যাগের কথা। সেই সাথে বিবেকবান মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি আস্থা ও আশাবাদ পোষণ করে তাঁদেরকে সচেতন করে দেয়া হয়েছে যুদ্ধকালীন স্বাধীনতাবিরোধী নরপিশাচদের সাম্প্রতিক পুনরুত্থান সম্পর্কে। গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলো হচ্ছে ১. আমরা কি একাত্তরে ফিরে যাচ্ছি ২. জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা প্রসঙ্গে ৩. গোড়ায় গলদ ৪. এতো লাশ রাখবো কোথায় ৫. তৃতীয় শক্তি বনাম ঐক্য ৬. রাজনীতির মাঠ এখন সরগরম ৭. এ যুদ্ধের অস্ত্র চেতনা ৮. ইস্যু—নন ইস্যু ৯. ভাঙ্গন নয়, ঐক্য ১০. শতাব্দী—তুমি কি শোনাবে গান? ১১. বছরের প্রতিটি মাস যদি ফেব্রুয়ারি হতো! ১২. একুশের চেতনা থেকে শুরু করতে হবে ১৩. স্মরণীয় সন্ধ্যা ১৪. মৃত্যুর পথ ধরে ১৫. আমার দুর্ভাগ্য এদেশে জন্মেছি ১৬. বিরল অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলাম। উল্লেখিত শিরোনামের প্রবন্ধের সবগুলোর মেজাজ অভিন্ন নয়, কিন্তু সব

www.pathagar.com

মিলিয়ে রচনাগুলোর অন্তর্গত সুর ও চেতনা একই। অভিন্ন গৌরব ও বেদনার পাশাপাশি বিরাজমান সমকালীন পরিস্থিতি, অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির নির্লজ্জ দাপটের কারণে শঙ্কা ও ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে বইটিতে। কখনো তীব্র বাক্যবাণে কখনো হৃদয়ভেদী বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় তুলে ধরে মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায় এতে। এ গ্রন্থে লেখিকা নিজে দেশের প্রগতিশীল শক্তির পক্ষের সক্রিয় সংগ্রামী মানুষ, স্বাধীনতার জন্যে সবচাইতে অন্তরঙ্গ আপনজনকে হারানো মানুষ—অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি অবস্থানে দাঁড়িয়ে নিজস্ব নিরপেক্ষ মূল্যায়নে এদেশের বহুমাত্রিক দোলাচলকে চিত্রায়িত করেছেন এ বইয়ে। র.আ.ক.

আমরা তামাটে জাতি : কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার কাব্যগ্রন্থ। ঢাকার দ্রাবিড় প্রকাশনা সংস্থা থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। মুহম্মদ নূরুল হুদা তামাটে বাঙালি জাতির শেকড়-সন্ধানী কবি। ইতিহাসচেতনার আলোকে আলোচ্য কাব্যে তিনি বাঙালির জাতির অতীত গৌরব সন্ধান করেছেন এবং প্রবহমান জীবনচেতনায় বপন করেছেন ভবিষ্যৎ স্বপ্নের বীজ। আলোচ্য কাব্যে দ্রাবিড় জাতিসত্তা, পৌরাণিক চরিত্র, লোকসংস্কৃতি, মাতৃ-ইমেজ প্রভৃতি বিষয়ে কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং বর্তমান কাল—উভয় সময়ই আলোচ্য কাব্যে অখণ্ড সমগ্রতায় একীভূত হয়েছে। বৃহত্তর জাতিসত্তার কথা থাকলেও, কবির আমিত্বচেতনাও এখানে সরব। জাতিসত্তার সঙ্গে আত্মসত্তার এই গভীর সংযুক্তিবোধ মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিচৈতন্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'আমরা তামাটে জাতি' কাব্যগ্রন্থেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। জাতিসত্তার আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে মুহম্মদ নূরুল হুদা অন্ধ কিংবা স্থূল জাতীয়তাবোধ দ্বারা মোহগ্রস্ত হন নি, বরং খুঁজে পেয়েছেন অনিবার্য সত্য ও গন্তব্য। বি. ঘো.

আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি : আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত প্রবন্ধের বই। লেখকের ভাষায়, সাম্প্রতিক বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় মুছে ফেলার চক্রান্তকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। লেখক তাঁর দীর্ঘ দিনের পঠন-পাঠন এবং বিভিন্ন সময়ে বাঙালি জাতির যেসব আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থে সংশয়হীনভাবে ঘোষণা করেছেন, একমাত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদই হচ্ছে বাঙালি জাতিসত্তার আদি ও অকৃত্রিম পরিচয়। লেখকের মতে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়, যেমন ইচ্ছে করলে একজন ইংরেজ আইরিশ বলে পরিচয় দিতে পারেন কিন্তু ইচ্ছে করলে একজন ইংরেজ আইরিশ বা স্কটিশ জাতীয়তা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ জাতীয়তা অর্জন কিংবা পরিবর্তন করা যায় না, জাতীয়তা জন্ম, বংশ এবং আবহমান ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও ঐতিহ্যসূত্রে গ্রথিত। আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি? এই প্রসঙ্গে লেখক স্পষ্ট ভাষায় নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, 'বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস খুঁজলেও বাংলাদেশী নামে কোনো জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু বাঙালি জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে।' প্রসঙ্গটি আরো খোলামেলাভাবে বলেছেন এভাবে, 'আমরা আগে বাঙালি না মুসলমান, আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী, প্রভৃতি প্রশ্ন ও সংশয় সৃষ্টি দ্বারা বাঙালির জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও স্বাধীকারকেই ধ্বংস করার অপচেষ্টা হয়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এই অপচেষ্টারই সাম্প্রতিকতম অধ্যায়। পুরনো ও পরিত্যক্ত ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বেরই এটা ছদ্মাবরণ মাত্র।' এই গ্রন্থের আরেক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রথমটি যতই বঙ্কিম এবং বিতর্কিত হোক না কেন, অতিমাত্রায় তাত্ত্বিক আলোচনায় লেখক কোথাও তাঁর বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি। তার বিষয়টি নিয়ে নানা সময়ে বিখ্যাত গুণীজনদের সাথে যে আলোচনা হয়েছে সেইসব আলোচনা প্রাসঙ্গিক অংশটুকু কথোপকথনসহ এই গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া

www.pathagar.com

এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে যেসব দেশী-বিদেশী ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামক অদ্ভুত আবিষ্কারকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে প্ররোচিত করেছেন লেখক তাঁদের বক্তব্যের ওপরও আলোচনা করেছেন। 'আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি?' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে অক্ষরবৃত্ত প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র। মা. আ.

আমলকির মৌ : দিলারা হাশেমের উপন্যাস। মূল্য : ২০৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯। প্রকাশক : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। ১১৪ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ : মুক্তধারা ১৯৭৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ ইউ.পি.এল ১৯৯৯। প্রচ্ছদ : কামরুল হাসান। 'আমলকির মৌ' মনঃসমীক্ষণের উল্লেখযোগ্য দলিল। লেখিকার উপস্থাপন নৈপুণ্যে পাঠকের বোধের কেন্দ্রবিন্দুতে সরাসরি আলোকপাত ঘটে। এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় অঙ্কিত মানুষের কান্না হাসির নাগর দোলার চিত্র। আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, ক্রোধ, বাস্তবতা, নিঃসঙ্গতা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির জটিল আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া অগণিত চরিত্র। যে সমাজে দ্বৈত মানদণ্ডে নারীর মূল্যায়ন হয় তার প্রতি অমোঘ বজ্রপাত নায়িকা সারা। প্রতিবাদে প্রদীপ্ত সারা। নারীদের মানুষের মর্যাদা দেয়ার লক্ষ্যে যার নিরন্তর সংগ্রাম। অথচ পরিশেষ তার জানা নাই। তবুও একদিন জীবন বঞ্চনাকে দুপায়ে দলে সে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সংগ্রামে হয় ঋজু। আত্মপ্রত্যয়ে হয় অনমনীয়। প্রতিবাদে প্রখর আর মমতায় মহিয়সী। সমাজে নির্যাতিত, অবহেলিত, প্রতারিত হাজার নারীকে মাথা তুলে দাঁড়াবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে যে একজন যোদ্ধার প্রয়োজন সারা তেমনি এক আপোসহীন যোদ্ধা। যে ভেঙে পড়ে তবু মচকায় না। মতিন—আশাভঙ্গের বেদনা যাকে তাড়িত করে মহাজীবনের পথে। জীবনের বাস্তব পাঠশালার একনিষ্ঠ ছাত্র হয়ে যে পরিমাপ করে ভুলশুদ্ধের বোঝা। মাজেদা—যার ঐকান্তিক ত্যাগে তিল তিল করে গড়ে ওঠে আশ্রয় সৌধ তার অন্তর্ধানের রূঢ় বাস্তবতায় এ উপন্যাস গভীর পরিণতির ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। সালেহা—প্রবঞ্চনা আর প্রতারণাকে মেনে না নিতে পেরে আত্মহত্যাকেই বেছে নেয়। আর সকিনা—নির্যাতিতা নিপীড়িতা হয়ে ধুকে ধুকে মরে। এ উপন্যাসে সারাই ধ্রুব। সারাই কংক্রিট। সমাজ সংসারের বৈষম্যের প্রতি তার প্রতিবাদ, ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য, মাতৃরূপের স্নিগ্ধতা, ভালোবাসার উদ্ভ্রান্তি নিয়ে উপন্যাসে সেই একমাত্র ধ্রুবতারা। সমস্ত বৈষম্যকে অস্বীকার করে যে বহতা হয়। গুঁড়িয়ে দেয় নারীপুরুষের দ্বৈত মানদণ্ডের নিক্তিকে। যেমন করে ঋতু পরিবর্তন হয়, মুকুল ধরে, ফুল ফোটে, চন্দ্র, সূর্য, তারা ওঠে আপন নিয়মে তেমনি এ উপন্যাস স্বকীয়তায় সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পা. র.

আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে : কবি ফরহাদ মজহারের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৯৮৩। রচনাকাল : ১৯৬৮-১৯৮৩। প্রকাশক : প্রতিপক্ষ প্রকাশনা : ৪৪ আই এ ইন্দিরা রোড, ঢাকা। মূল্য : পনের টাকা মত্র। মোট কুড়িটি কবিতার সংকলন। সবগুলো কবিতাই রাজনীতি অনুষঙ্গী। কবিতাগুলোর বক্তব্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নারীবাদ, প্রেম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলিত ; তবে সবকিছু ছাপিয়ে সামগ্রিকভাবে প্রতিবাদী সত্তাই প্রধান। বেশির ভাগ কবিতা টানা গদ্যে লেখা। এ ছাড়া আছে পাঁচটি সনেট। সনেটগুলো অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা। আ. মা.

আমাদের একাত্তর : কাইজার চৌধুরী রচিত কিশের-গল্পগ্রন্থ। প্রকাশক : দি মিডিয়া, ঢাকা। প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৪০৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭। বইটির প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন সৈয়দ ইকবাল, সাইজ $\frac{১}{১৬}$, ডবল ডিমাই, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০, মূল্য ৫০.০০ টাকা। এই বইতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ৬টি কিশোর গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলো হলো—টুটুল গেল যুদ্ধে, নূরুলের বড় মামা, চুরি যাওয়া হাসি, এক ভালো মানুষের

www.pathagar.com

গল্প, শিহাবের বন্ধু, ডিসেম্বর একাত্তর। একাত্তরের যুদ্ধদিনের ভয়াবহতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও সাহসিকতার চিত্র গল্পগুলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই কাহিনীগুলোর মধ্য দিয়ে গল্পকার কেবল সাহিত্যরস পরিবেশন করেন নি বরং অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি শিশু-কিশোর পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন এমন সব নতুন নতুন প্রশ্ন যা দেশ সমাজ ও সময় সম্পর্কে তাদের আরো অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। গল্পকারের গতিময় সরস ও সপ্রতিভ ভাষাভঙ্গি বইটির বড় বৈশিষ্ট্য। সু. ব.

আমাদের কালের কথা : তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮–১৯৭১) রচিত আত্ম-জীবনীমূলক গ্রন্থ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে 'কথা সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। তারাশঙ্করের এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী তারাশঙ্করের বিপুল সাহিত্যসৃষ্টিকে বুঝতে হলে 'আমার কালের কথা'র মূল্য অপরিসীম। লেখকের শিল্পমানস, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলতত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটনের আকর গ্রন্থ এটি। উপরন্তু এ গ্রন্থের মাধ্যমে স্রষ্টার সৃষ্টিকেই কেবল নয়, তার ব্যক্তি-পুরুষটিকেও পাঠক অত্যন্ত আপন করে চিনতে পারে। তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী'র অনেক টুকরো কাহিনী 'আমার কালের কথা'র মধ্যে ছড়িয়ে আছে। 'পদচিহ্ন' উপন্যাসের অনেক উপাদান সম্পর্কেও এ গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। তারাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনের নানা স্মৃতি, তাঁদের জমিদারি পরিচালনা ও প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা, তাঁর সাহিত্যজীবনের উন্মেষপর্বের কথা এবং তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা অকৃত্রিম দরদের সঙ্গে শৈল্পিক ভঙ্গিতে ও সাবলীল ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। তারাশঙ্করের এই রচনা হালকা চালের বৈঠকি মেজাজের গদ্যে লিখিত। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডায়েরী জাতীয় রচনা'র সঙ্গে এর তুলনা চলে। মু.আ.জ.

আমাদের জাতীয়তার বিকাশের ধারা : অজয় রায় রচিত বাঙালি জাতিসত্তা নির্ণয় বিষয়ক বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখক আমাদের জাতীয় সত্তা ও জাতীয়তাবাদ কি তা সনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের জাতীয়তার ভিত্তিভূমি, মানসলোক, বিশ শতকের উদ্বোধন, পাকিস্তান পর্ব, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ, উল্লিখিত এই পাঁচটি বিষয় পরম্পরার বহু উদাহরণসহ লেখক জাতীয়তার ধারা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শুধু যে স্বাধীন স্বদেশ ভূমির অভ্যুদয় হলো তা নয়, জাতিসত্তা বিকাশের ধারায় যুক্ত হলো নতুন মাত্রা। আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা এই প্রক্রিয়ারই ফসল। 'বাঙালি জাতীয়তবাদ' একটি মিমাংসীত সত্য। অথচ ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরপরই কোনো কোনো মহল এই সত্যকে অস্বীকার করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। এই সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন আমাদের জাতীয় বিকাশ ও জাতীয়তা নিয়ে এ বিতর্কের ব্যাপারটি রাজনীতির ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থরক্ষার প্রশ্নের সাথে একই সুতোয় গাঁথা।... স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রচেষ্টা ব্যাহত করার জন্যে জাতিসত্তা সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সংশয় সৃষ্টি করা হচ্ছে, বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে সচেতনভাবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিসত্তার পরিচয় নির্ধারণের কোনো তথ্য বা বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করে তা থেকে নিজের বক্তব্যের যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা হয় নি।' গ্রন্থকার জাতীয়তার বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তার কতিপয় অবিকশিত উপাদান ও সীমাবদ্ধতার কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন।

www.pathagar.com

বক্তব্যের গভীরতা, নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি, ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের ফলে বাঙালি জাতিসত্তার নির্মোহ পরিচয় উদঘাটনে 'আমাদের জাতীয়তার বিকাশের ধারা' গবেষকদের নিকট নিঃসন্দেহে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হবে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশকাল যথাক্রমে, অক্টোবর ১৯৮১ ও জুলাই ১৯৯১। প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র। মা. আ.

আমাদের প্রাচীন শিল্প : তোফায়েল আহমদের বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্প সম্পর্কে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ গ্রন্থ। এই বইয়ে ১৬টি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশের বয়নশিল্প, মসলিন, জামদানী, চরকা, সুচীশিল্প, রেশমশিল্প, পাটশিল্প, নৌশিল্প, লবণশিল্প. নীলশিল্প, অলঙ্কার, কাগজ, লাক্ষারঞ্জক, চিনি, হস্তিদন্তশিল্প প্রভৃতি। প্রবন্ধকার একজন নিবেদিত প্রাণ গবেষক হিসেবে বাংলাদেশের এইসব শিল্পের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি, সুনাম, বৈশ্বিক গুরুত্ব, বাণিজ্যিক গুরুত্ব প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। ব্রিটিশপূর্ব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এগুলোর গুরুত্ব ও ভূমিকা এবং ইংরেজ আগমণ ও শিল্প বিপ্লবের সূত্রে এসব শিল্পের মর্মান্তিক পরিণামের কথা বলেছেন। 'অর্থনৈতিক পটভূমি' নামক প্রথম প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপট এবং ইংরেজ আগমণে এর পরিণতি। দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিক, পর্যটক, বিশেষজ্ঞ ও প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে রচনা করেছেন তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রবন্ধ। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। প্রকাশক এ. এইচ. খান ৪, দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪। মো. আ. মি.

আমাদের ভাষার লড়াই : বদরুদ্দীন উমর। মহান ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত প্রবন্ধের বই। প্রকাশক : শিশু সাহিত্য বিতান, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম। প্রচ্ছদ : কাইয়ূম চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৭, মূল্য : পনের টাকা, গ্রাহক মূল্য : বারো টাকা। এটি মহান ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এখলাসউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত টাপুর টুপুর গ্রন্থমালার প্রথম বই। বইটির শুরুতেই রয়েছে তাঁর সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়তে তিনি টাপুর টুপুর গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এরপর রয়েছে গ্রন্থকারের বক্তব্য। বইটি ২১টি অধ্যায়ে লেখা। এগুলো হলো : পাকিস্তান আন্দোলন ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা, ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত, ১১ই মার্চের ধর্মঘট, ১১ই মার্চের পরবর্তী ঘটনা, পূর্ববাংলায় মহম্মদ আলী জিন্নাহ, পূর্ব বাংলার সাধারণ পরিস্থিতি, বাঙলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের চক্রান্ত, পূর্ব বাংলায় সরকারি নির্যাতন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, ১৯৫১ সালের নতুন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টনে বক্তৃতা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী, একুশে ফেব্রুয়ারি, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, পরবর্তী ঘটনা, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষাসংগ্রাম কমিটি, গ্রেফতার, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সম্মেলন, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির এপ্রিল কনভেনশন, তদন্ত কমিশন ও ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা আছে : ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় প্রায় ষোল মাস কারাবরণকারী আমার পিতা জনাব আবুল হাশিমের স্মৃতির উদ্দেশে। খা.বি.উ.জ.

আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত বাংলা ভাষা ও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ। বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, বয়স, এসব বিষয়সমূহ কালক্রমিকভাবে উপস্থাপন এবং একই সাথে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বিবিধ সংবাদ, ঐতিহাসিক তথ্য, প্রামাণ্য উপকরণাদিও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত

www.pathagar.com

লেখাগুলো ইতিহাস, মাতৃভাষা-চেতনা প্রাসঙ্গিক কথা, ভাষা আন্দোলন, এই তিন পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রবন্ধ ছাড়া শুধু বাংলা ভাষাকে বিষয় করে লেখা ছয়টি পুরনো কবিতা ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের ভাষা বিষয়ক ক'একটি অভিভাষণও এই গ্রন্থে রয়েছে। গ্রন্থভুক্ত লেখকবৃন্দ হচ্ছেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম, রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হামেদ আলী, সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল মালেক চৌধুরী, অতুল প্রসাদ সেন, মোজাফফর আহমদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আকরম খাঁ, প্রমথ চৌধুরী, তসদ্দুক আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ এনামুল হক, কবিরউদ্দিন আহমদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। এই গ্রন্থের শেষে অর্থাৎ 'ভাষা আন্দোলন' পর্বে রয়েছে, প্রস্তাব, বিবৃতি, চুক্তি, স্মারকলিপি, ইশতাহার, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বায়ান্নোর ঘটনাপঞ্জি, একুশের ইতিহাস, একুশের গান। সুসম্পাদিত এই গ্রন্থটি গবেষক ছাড়াও বাংলা ভাষা এবং মহান ভাষা আন্দোলন বিষয়ক তথ্যাবলি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। মা. আ.

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ : রফিকুল ইসলাম। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। প্রকাশক : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও বই নকশা : হাশেম খান। প্রথম প্রকাশ : ১১ চৈত্র ১৩৯৭, ২৬ মার্চ ১৯৯১। মূল্য : চব্বিশ টাকা। এটি শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে রয়েছে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও দুর্লভ চিত্র। ছটি অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো হলো : পূর্বকথা, ভাষার জন্য, রাজনৈতিক অধিকারের জন্য, স্বাধিকারের জন্য, স্বাধীনতার জন্য ও মুক্তিযুদ্ধ। সহজ-সরল ভাষায় এবং অল্পকথায় ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনা, মহান ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বইটিতে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বকথা অধ্যায়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়টি আরো তথ্যবহুল। এ অধ্যায়ে স্বাধীনতার ঘোষণা, বাংলাদেশ সরকার গঠন, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, নৌ কমান্ডো ও বিমান বাহিনীর যুদ্ধ। সম্মিলিত বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল, সেকটর ও হেডকোয়ার্টারের কথা, সেকটর কমাণ্ডারগণ, নিয়মিত বাহিনী, গণবাহিনী, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমাণ্ড ও সর্বাত্মক যুদ্ধ, মুক্তিবাহিনীর বিজয় অভিযান, পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বুদ্ধিজীবী নিধনে আলবদর-আলশামস তথা স্বাধীনতা-বিরোধীদের কর্মকাণ্ড বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। খা.বি.উ.জ.

আমাদের শহর : আমেরিকান নাট্যকার Thorton Wilder-এর 'Our Town' (1938) নাটকের অনুবাদ। অনুবাদক মমতাজউদ্দীন আহমেদ। নাটকটি তিন অঙ্কের। প্রথম অঙ্কে দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ, দ্বিতীয় অঙ্কে মূল ঘটনার অগ্রসর ও ক্লাইমেক্স এবং তৃতীয় অঙ্কে পরিণতি। নাটকের মূল চরিত্র ৬/৭টি, তবে মোট চরিত্র বিশের অধিক। প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে মঞ্চাধ্যক্ষ, ডাক্তার গিবস, মিসেস গিবস, মিসেস ওয়েব, জর্জ গিবস, এমিলি ওয়েব প্রমুখ। দুইটি পরিবারের কাহিনীতে নরনারীর প্রণয় ও পরিণয় এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এর মধ্যেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে একটি শহরের এক যুগের ঘটনাসমূহ। নাটকের চরিত্রগুলো জীবনবাদী ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। তারা জীবনাচরণে স্বাভাবিক, সরল ও সহজ। নাটকে মঞ্চাধ্যক্ষ নামে একটি চরিত্র আছে—যার কাজ ঘটনাসমূহকে আহ্বান করা, ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা, দর্শকের সঙ্গে আলাপ করা এবং নিজেকে নাটকের চরিত্রে রূপান্তরিত করা। অনুবাদে সম্পূর্ণভাবে মূলকে অনুসরণ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। এবং ভাষা খুবই চমৎকার। এরকম মঞ্চ উপযোগী অনুবাদ নাটক বাংলায় অসংখ্য নয়। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল। প্রথম প্রকাশ : ১ আগস্ট ১৯৭৮। প্রকাশক : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা। মো. আ. মি.

আমাদের শিক্ষা কোন পথে : আবদুল্লাহ আল-মুতী। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬ সাল। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের বহুমুখী সমস্যার মূল দিকগুলো কি কি, কী তাদের চরিত্র—তারই তথ্যভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে এ গ্রন্থে। 'আমাদের শিক্ষা কোন পথে' গ্রন্থটি 'কালের যাত্রার ধ্বনি', 'সবার জন্য শিক্ষা' ও 'চাওয়া-পাওয়ার হিসেব' শীর্ষক তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তিনটি, দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি এবং তৃতীয় খণ্ডে চারটি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলো হলো যথাক্রমে—উপনিবেশের দীঘল ছায়া, অসম অর্থনীতি : অসম শিক্ষা, স্বাধীনতার পঁচিশ বছর ; অমর একুশ ও গণশিক্ষা, শিক্ষার উপানুষ্ঠানিক ধারা, উদ্ভাবন ও স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা, জীবনভর শেখার সমাজ ; শিক্ষার কাছে কী চাই, জ্ঞানচর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার, একাডেমীর কাছে প্রত্যাশা এবং সংস্কৃতির সংকট ও সম্ভাবনা। বাংলাদেশে এ যাবৎ কোন সুষ্ঠু, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণীত হয় নি। ফলে মুখস্থসর্বস্ব শিক্ষাদান পদ্ধতি, নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও কালো টাকার ছড়াছড়ি, শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের অসহায়ত্ব সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ধস নেমে এসেছে। 'অথচ আজকের দিনে উন্নতমানের শিক্ষা ছাড়া আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির এগোবার কোনো পথ নেই। সাম্প্রতিককালে যেসব দেশ অতি দ্রুত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি লাভ করেছে তারা সবাই একটি সর্বজনীন ও দক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। কী করলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নানা জটিল সমস্যার সমাধান হবে, বাংলাদেশ অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে একুশ শতকের দিকে এগোতে পারবে—এ ধরনের প্রশ্ন যে কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে আলোড়িত না করে পারে না।' জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক আবদুল্লাহ আল-মুতী সরকারের সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে শিক্ষার পটভূমি আলোচনা, বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধানের চরিত্র উপলব্ধি ও মৌল দিকগুলো চিহ্নিতকরণ এবং কতিপয় বিকল্প পথ ও মতের অনুসন্ধান করেছেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে আলোচিত জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান এবং মানসম্মত শিক্ষার ব্যাপারে ভাবনার দিগন্ত প্রসারিত হবে। শা. আ.

আমাদের সময়কার জীবন : বদরুদ্দীন উমর রচিত তেইশজন ব্যক্তিত্বের অবদানের ওপর মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ। লেখক তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থভুক্ত ব্যক্তিত্বসমূহের কর্মের মূল্যায়ন করেছেন। রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীসহ যাঁদের কথা এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন : ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শেখ মুজিবুর রহমান, জাহানারা ইমাম, বিনয় ঘোষ, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব, অজিত গুহ, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, আরজ আলী মাতুব্বর, সিরাজউদদ্দীন হোসেন, রশিদ চৌধুরী, সুখেন্দু দস্তিদার, আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, শান্তিসেন, আসহাবউদ্দীন আহমদ, ডক্টর মুহম্মদ মূর্তজা, সাইদুল হাসান, মুহম্মদ আমানুল্লাহ প্রমুখ। এই গ্রন্থে 'আমার মা' নামে একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধও রয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশক : সংলাপ। প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। মূল্য : একশ টাকা। মা. আ.

আমাদের সময়কার নায়ক : রুশ কবি মিখাইল লেরমন্তভের রচিত উপন্যাস। বাংলায় অনুবাদ করেছেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষের দিকে রাশিয়ায় আবির্ভাব ঘটে এই উপন্যাসের। শুধু সেই সময়ের উপর নয় পরবর্তী বহুকালের

www.pathagar.com

উপর এই গ্রন্থ অনপনেয় ছাপ ফেলে। উপন্যাসের নায়ক—রুশ ককেশাস সেনাবাহিনীর অফিসার পেচোরিন। অসাধারণ বুদ্ধিমান, প্রতিভাদীপ্ত, সুশিক্ষিত এই মানুষটিকে সারা গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় নিঃসঙ্গতার ভারে পীড়িত। বন্ধুত্বের আনন্দ, প্রেমের সুখ তার জানা ছিলো না। তার মন অবিশ্বাস, মোহভঙ্গ ও এক ঘেয়েমির গুরুভারে জর্জরিত। ১৮২৫ সালের ডিসেম্বরে জারতন্ত্র যখন অভিজাত বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান দমন করে এবং তখনকার কালের রাশিয়ার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাণসংহার করে তারই অব্যবহিত পরে যে বন্ধ্যাবস্থার সংকট যুগ সূচিত হয় এই মানুষটির ট্র্যাজিক ভাগ্য তারই ফল। লেরমন্তভের (১৮১৪-১৮৪১) এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশের পর শতবর্ষেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। রুশ ভাষায়, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির ভাষায় কোটি কোটি কপিতে এর বিপুল সংখ্যক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত। গ্রন্থের ভূমিকায় গবেষক ইরাকলি আন্দ্রোনিকভ বলেছেন, 'আমাদের সময়কার নায়ক বাস্তবিকই একটি চিত্র, কিন্তু একটি মানুষের নয়, আমাদের যুগের পাপের পূর্ণ প্রকাশ নিয়ে এই চিত্র সৃষ্টি হয়েছে।' প্রকাশক : রাদুগা প্রকাশন, মস্কো। বাংলা অনুবাদের প্রকাশকাল ১৯৮৫। মূল্য লেখা নেই। বি.ব.

আমার আততায়ী : হাসনাত আবদুল হাইয়ের উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৮০ (মুক্তধারা)। ষাট ও সত্তর দশকের ঢাকা শহর কাহিনীর পটভূমি। কোনো এক রফিক আহমেদের জীবনকাহিনী ও তার মানসিক অস্থিরতা উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য। কাহিনী, প্লট ও চরিত্রচিত্রণ সাদামাটা—বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব কোথাও নেই। অনুক্রমিক একগামিতায় রফিক আহমেদ একাধিক নারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথমে সহপাঠিনী ছবি, পরে স্ত্রী রেখা এবং সবশেষে পরস্ত্রী জরিনা। আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা উপন্যাসটিতে রফিক আহমেদ তার স্বকৃত অপরাধসমূহ একে একে বর্ণনা করে যেতে থাকে। রফিক তার প্রথম প্রেমিকা ছবির সঙ্গে প্রতারণা করে রেখাকে বিয়ে করলে ছবি আত্মহত্যা করে। ছবির ভাই বাবু এতে ক্ষেপে গিয়ে রফিককে ছুরিকাহত করে। শ্বশুরের অফিসে চাকরি নিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে রফিক প্রচুর বিত্তের মালিক হয়। এক পর্যায়ে শ্বশুরের চাকরি ছেড়ে নাসের চৌধুরীর সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে দেয়। সেখানেই জরিনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ হয় তার। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নাসের চৌধুরী ছিলো পাকবাহিনীর দালাল। দালাল আইনে ধরা পড়লে রফিক তার যাবতীয় সম্পত্তি হস্তগত করে। অবশেষে রফিক এক ধরনের মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের ফলে তার মনে হয়, কোনো এক আততায়ী যেন তাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করছে এবং হত্যা করার সুযোগ খুঁজছে। স্ব.স.

আমার একজনই বন্ধু : হাবীবুল্লাহ সিরাজী রচিত কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক মুক্তধারা, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম খান। মূল্য : ২০.০০ টাকা। 'আমার একজনই বন্ধু' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোট ২৮টি কবিতা। ব্যক্তিগত দুঃখবোধ, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও হতাশার সপ্রতিভ কাব্যিক প্রকাশই কবিতাগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য। কাব্যিক উপলব্ধির মানব-সমাজ-সংলগ্ন। এ কারণেই গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক। সু. ব.

আমার একাত্তর : প্রাবন্ধিক, গবেষক আনিসুজ্জামানের লেখা স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে। প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। প্রচ্ছদ শিল্পী : অশোক কর্মকার, মূল্য : একশত পঁচিশ টাকা। মোট ২৬টি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। '১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সকালের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে

www.pathagar.com

পৌঁছালাম। সারা দেশে তখনো গণ-অভ্যুত্থান চলছে।' এভাবেই লেখকের 'আমার একাত্তর' গ্রন্থ রচনার সূচনা। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। ১৯৬৯ সালে আনিসুজ্জামান সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের স্মৃতিচারণ শুরু করেছেন ৭ মার্চ দিনটিকে ঘিরে। ঐ সময় তিনি চট্টগ্রামে ছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণ সরাসরি বেতারে প্রচারের কথা থাকলেও তা প্রচারিত হয় নি। ঐ দিন গভীর রাতে ভাষণ সম্পর্কে জানতে তিনি তাঁর শিক্ষক মুনীর চৌধুরীকে ফোন করেন। ৮ মার্চ তাঁরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এ. আর. মল্লিককে সভাপতি করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। এরপর বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের ভেতর দিয়ে স্মৃতিচারণ এগিয়ে যেতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল লেখক সস্ত্রীক আগরতলা গিয়ে পৌঁছান। সেখান থেকে ১৫ মে কলকাতায় তাঁর স্ত্রীর ফুপুর বাসায় যান। কলকাতায় তিনি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এমনি সময়ে কামরুজ্জামানের মাধ্যমে খবর আসে, অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন লেখককে দেখা করতে বলেছেন। দেখা করার পর জানতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী চান তিনি যেন তাঁর দপ্তরে যোগ দেন। ইতোমধ্যে লেখক শিক্ষক সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অবশ্য স্বল্প কিছু দিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় তাঁকে পরিকল্পনা সেলে যোগ দিতে হয়। বাংলাদেশের বিজয় লাভের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত লেখক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। এ সময়ে তিনি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লেখা 'আমার একাত্তর' গ্রন্থে মুক্তি-সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। তিনি ৫ জানুয়ারি কলকাতা থেকে বাংলাদেশের পথে রওনা হন। সৈ.আ.জা.

আমার এগারটি গল্প : রাবেয়া খাতুনের গল্প গ্রন্থ। মূল্য : ২০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৮। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : আফজাল হোসেন। প্রকাশক : রিয়াজ আহমেদ খান। ইমপ্রেস। রাবেয়া খাতুনের এগারটি উল্লেখযোগ্য গল্প নিয়ে এটি একটি চমৎকার সংকলন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রতিকৃতি লেখক তাঁর নিজস্ব বর্ণনা পদ্ধতিতে তুলে ধরেছেন। সমকালীন জীবন চিত্রণে, মানুষের মনন বিশ্লেষণে আর অন্তর্লীন দুঃখবেদনায় প্রতিটি গল্প উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থভুক্ত এগারটি গল্প রাজু তোমার জন্য মন খারাপ, মালতীর বাবা, ইয়ামীনের খোঁজে, সাকিন কেললা লালবাগ, একজন সুস্থ মানুষের শেষ চিঠি, ভেজাল বসবাস, প্রাণবন্ত পৃথক পুরুষ, রিলিফের নৌকা, করতোয়ায় একরাত্রি, ভয়ংকর সুন্দর ও পাঁচটা পোড়া সিগারেট। প্রথম গল্প 'রাজু তোমার জন্য মন খারাপ' এ ত্রিমুখী চিন্তাস্রোত এসে এক মোহনায় মিলেছে। 'মালতীর বাবা' এগারটি গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। সিনেমা হলের গেইট কিপারের একমাত্র মেয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এটি একটি মর্মস্পর্শী গল্প হয়ে উঠেছে। এই সংকলনের গল্পে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ, নাগরিক নিষ্ঠুরতা, দাম্পত্যের টানাপড়েন, মানুষের ভণ্ডামি ইত্যাদি নানা বিষয়। 'একজন সুস্থ মানুষের শেষ চিঠি গল্পে' পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কীভাবে বলি হয় নির্দোষ নারী সমাজ-তারই মর্মস্পর্শী কাহিনী বিধৃত হয়েছে। মধ্যবিত্তের জীবনে রদবদল ঘটে খুব কমই। তারই চিত্র 'ভেজাল বসবাস' গল্পে ফুটে উঠেছে। এভাবেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন বিশ্লেষণের দলিল হয়ে উঠেছে রাবেয়া খাতুনের 'আমার এগারটি গল্প' গ্রন্থটি। পা.র.

আমার কথা : ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র স্মৃতিকথার অনুলেখন করেছেন শুভময় ঘোষ। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ভূমিকায় লিখেছেন 'আমি সত্যি এতদিনে জানতাম না যে, বাবা ওস্তাদ

www.pathagar.com

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মুখের কথার ওপর ভিত্তি করে এত সুন্দর একটা বই লেখা হয়েছিলো। বাবার কথার মধ্য দিয়েই এইভাবে তাঁর প্রজ্ঞার কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসত। আমার সব চেয়ে যেটা ভাল লাগলো তাহল সেই কতকাল আগে একটা ছোট্ট ছেলে এত মনোযোগ সহকারে এমন একটা কাজে হাত দিয়েছিলো।' বইটি একদিকে আত্মকথা, অন্যদিকে উত্তম পুরুষে বর্ণিত এক উপন্যাস। সিরাজু ডাকাতের বংশধর কীভাবে হয়ে উঠলেন এক অসামান্য সংগীতসাধক, দুর্গম সাধনার কাঁটা-মোড়া সোপানপরম্পরা কী করে করলেন অতিক্রম, কী চোখে ইয়োরোপ দেখলেন এক সাতষট্টি বছরের যুবা-সেই ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত অকপট মজলিশি ভঙ্গিতে বলে গেছেন শুদ্ধপ্রাণ সাধক, আরেক শিল্পপ্রাণ যুবক (শুভময় ঘোষ) অনুলিখনে ধরে রেখেছেন সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৯। দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬, মূল্য ১৪ ভারতীয় রুপি। বি.ব.

আমার কবিতা : কবি আসাদ চৌধুরীর নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ আলের ফেব্রুয়ারিতে। প্রকাশক : বিকেল প্রকাশনী, ১৮ তাহের বাগ লেন, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : বিশ টাকা। 'আমার কবিতা' সংকলনটি মূলত কবির ছয়টি কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া কিছু কবিতার সমাহার। ছয়টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'তবক দেওয়া পান', 'বিত্ত নাই, বেসাত নাই', 'প্রশ্ন নেই, উত্তরে পাহাড়', 'জলের মধ্যে লেখাজোখা', 'যে পারে পারুক আমি পারবো না' এবং 'মধ্যমাঠ থেকে'। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'উৎসর্গ' কবি অনেক পরে টের পেয়েছেন, ঘরে ফেরার সময় তাঁর পুরো শরীর কখনও ঘরে ফেরে না। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, যতই সময় অতিবাহিত হতে থাকে মানুষ ততই তার পরিচিতদের অংশ বিশেষ হয়ে যায়। 'বিত্ত নাই, বেসাত নাই' কবিতায় কবি মির্জা গালিবকে উদ্দেশ্য করে গজলের ঢঙে কথা বলেছেন। 'প্রশ্ন নেই, উত্তরে পাহাড়' কবিতায় সমতলের মানুষের দুঃখ ও অপমানের চিত্র উৎকীর্ণ। প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই। প্রতিকার চেয়ে অথবা না চেয়েও অনেক বেদনা ঝরেছে। 'একটিমাত্র আশা' কবিতায় কবি বিলাপ করেছেন সানকি ভরা ভাত, পরনের কাপড়, এক ফালি ছাদ আর রোগের ওষুধের জন্য। 'যে পারে পারুক, আমি পারবো না' কবিতায় কবি এলিট শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করেছেন। 'মধ্যমাঠ থেকে' কবিতায় কবির একান্ত কামনা সব অস্ত্রাগার, অস্ত্রের কারখানাগুলো যেন খাদ্যের গুদাম আর ওষুধের কারখানা হয়। সৈ. আ. জা.

আমার চিন্তাধারা : গোলাম মোস্তফা রচিত স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৬২, প্রকাশক আহমদ পাবলিশিং হাউস। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত মোট সাঁইত্রিশটি প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। সংকলনটিতে গোলাম মোস্তফার প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী মননের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, জীবনী, সাহিত্য সমালোচনা, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় প্রবন্ধগুলোর আলোচ্য। অধিকাংশ প্রবন্ধে লেখকের পাকিস্তানপ্রীতি লক্ষণীয়, পাশাপাশি পাওয়া যায় দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুকূলে অসংখ্য যুক্তি ও তার প্রতি লেখকের আন্তরিক সমর্থন। একটি প্রবন্ধে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের পক্ষে সাফাই গাওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ১৯২২, ১৯৪৩ ও ১৯৬০ সালে লেখা প্রবন্ধ তিনটিতে স্ববিরোধী বক্তব্য লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, লেখকের নজরুল-বিরোধী প্রবন্ধগুলো সংকলনটিতে স্থান পায়নি, বরং একটি প্রবন্ধে ইসলামি গানের লেখক হিসেবে নজরুলের তারিফ করা হয়েছে। ইকবালকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকল্প-রূপে হাজির করার চেষ্টা আছে। কয়েকটি

www.pathagar.com

প্রবন্ধে লেখক পুঁথিসাহিত্য ভিত্তিক পূর্ব-পাকিস্তানি বাংলাভাষা সৃষ্টির পক্ষে ওকালতি করেন, যদিও তাঁর নিজের রচনাশৈলীতে এর কোনো প্রয়োগ দেখা যায় না। কয়েকটি প্রবন্ধে নির্মল সাহিত্যরস ও শুদ্ধ মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'দার্জিলিং ভ্রমণ', 'মাঠের কবি, আমি কেন লিখি', 'সমালোচনার সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলো এ জাতীয়। বিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক-ইতিহাস সন্ধানীর জন্য 'আমার চিন্তাধারা' একটি মূল্যবান বই। প্রী.মি.

আমার চোখে : ড. আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধ গ্রন্থ। মূল্য : ১৪০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৪, প্রকাশকাল : কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯। প্রচ্ছদ ধ্রুবএষ। প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম। অন্যপ্রকাশ ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, আলোকচিত্র ডেভিড বারিকদার। আমার চোখে প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বই ও ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থ লেখক যেসব ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁরা হলেন— ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, কাজী মোতাহার হোসেন, সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, সুফিয়া কামাল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, অজিত গুহ, কামরুল হাসান, আহসান হাবীব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সিরাজুদ্দীন হোসেন, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। যেসব বই আলোচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাহলো—পুরনো পত্রিকার নতুন সংকলন, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা, রবীন্দ্র উক্তির সুনির্বাচিত সংগ্রহ, মন্বন্তরের ছবি, বনফুলের আত্মজীবনী, আবুল মনসুরের আয়না, সমরেশ বসুর স্মরণে, স্মৃতির অনুরণন, হ্যার নাম বইরশাল, জিজ্ঞাসা সংকলন, ঢাকা গ্রন্থমেলা : কয়েকটি বই, দর্শন কোষে আরজ আলী, কালগত জীবন ও চিরন্তন প্রবৃত্তি, ডক্টর জিভাগো, মিকাশের হিসাব নিকাশ, পল জনসনের রুশো, বাক স্বাধীনতার স্বপক্ষে, বিচারপতি সায়েমের স্মৃতিকথা, বাংলাদেশ পরিচালনার সমস্যা। এই গ্রন্থের বেশির ভাগ প্রবন্ধ 'ভোরের কাগজ' সাময়িকীতে ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়েছিল 'আমার চোখে' নামকরণে। আনিসুজ্জামানের এই গ্রন্থটিকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন বলা যায়। পা.র.

আমার ছেলেবেলা : বুদ্ধদেব বসুর ভিন্ন ভিন্ন সময়ের স্মৃতিকথা। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো দেশ পত্রিকায়। 'আমার ছেলেবেলা' ও 'আমার যৌবন' বই দুটোতে তাঁর বাল্যকাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর পরবর্তী সময়ের স্মৃতিকথার অসম্পূর্ণ খসড়া রচিত হয়েছে 'আমাদের কবিতা ভবন' শিরোনামে। তাঁর জীবন অবসানের জন্য লেখাটি সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু নরেশ গুহ 'আমার যৌবন'-বইয়ের নিবেদনের লিখেছেন যে, পাণ্ডুলিপিতে না-লেখা অংশের কিছু পরিকল্পনার নিদর্শন রয়েছে এবং বন্ধুদের সাথেও অসম্পূর্ণ অংশ নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় ঢাকা শহর, রমনা, শাহবাগ, সদরঘাট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তিনি লিখেছেন 'শুনতে পাই, ঢাকা আজকাল বিলকুল বদলে গিয়েছে ; তাই যে শহরের পথে-পথে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন, তার কিঞ্চিত বিবরণ লিখতে প্রলুব্ধ হচ্ছি।' (আমার যৌবন, পৃ. ১৭)। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় বর্তমান (২০০১) বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ৭৪ বছর আগের যে ইতিহাস জানা যাচ্ছে তা অন্য কোনো ইতিহাস বইয়ে পাওয়া যাবে না। কবির দৃষ্টিতে, কবির ভাষায় তথ্যবহুল ইতিহাসে জানা যাচ্ছে সে সময়ের রাজনীতি, পরিবেশ, অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাত্রা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কবি, সঙ্গীতসাধক, শিক্ষাবিদদের বহু অজানা কথা। যেমন, 'রমনা' এলাকার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন 'অনেকের মুখে

www.pathagar.com

তখনও নাম ছিলো 'নিউ টাউন।' কবি নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখে লিখেছেন : চওড়া কাঁধে বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, মাঝখান দিয়ে সোজা সিঁথি করা কোঁকড়া চুল গ্রীবা ছাপিয়ে প্লাবিত, মুখখানা বড়ো ও গোলছাঁদের। নেত্র আয়ত ও কোণ রক্তিম। গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দর পাঞ্জাবি। কাঁধে সূর্যমুখী হলুদ চাদর। কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর গান, প্রাণে তাঁর অফুরাণ আনন্দ ...।' পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেছেন কবি নজরুলের গান গাওয়া, গান লিখে লিখে গাওয়া, হাসি আর শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করার কথা। স্মৃতি কথায় বলেছেন রমনার সব সুন্দরের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সেই তথাকথিত চামালিয়া হাউস তথা The chummuly House-এর কথা যেখানে মেয়েদের হোস্টেল ছিলো। সে যুগের ছাত্রীদের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু এভাবে : 'হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এলেন পাঁচটি অথবা সাতটি সহপাঠিনী। সৈনিক অথবা সন্যাসিনীদের মতো শ্রেণীবদ্ধ হয়ে হাঁটছেন তাঁরা, সমতালে পা ফেলে ফেলে—মাথা আঁচলে ঢাকা, চওড়া-পাড়ের শাদা শাড়ি পরনে, যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ নেই।' 'একমুঠো ছাত্রীও আছেন আমাদের সঙ্গে—আছেন এবং অনেক বিষয়ে নেই। যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, পৃথকৃত ও সুরক্ষিত এক অতি সুকুমার উপবংশ, তাঁরা অবকাশের প্রতিটি মিনিট যাপন করেন তাঁদের পর্দায়িত বিশ্রাম কক্ষে, অধ্যাপকদের নেতৃত্ব ছাড়া সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হন না। মহিলাগুচ্ছকে পশ্চাদবর্তী করে চলেছেন এক একজন অধ্যাপক, পুনশ্চ নির্বিঘ্নে পৌছিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের কমনরুমের দোরগোড়া পর্যন্ত।' মাছের ঝোল-ভাত খাওয়ার স্মৃতি থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত স্বনামখ্যাত অধ্যাপকদের কথা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীলকুমার দে, সত্যেন্দ্রনাথ রায় সকলের কথা বলেছেন তিনি। প্রগতি পত্রিকার কথা বলেছেন। ওয়ারি, নারিন্দা, পুরানা পল্টন তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সর্বশেষ লিখেছেন তাঁর জীবনের নির্বন্ধের কথা অর্থাৎ ঢাকার বিখ্যাত গায়িকাদের অন্যতম প্রতিভা বসু বা রানু সোমের সাথে তাঁর প্রণয়ের কথা। সে প্রেম পরিণতি প্রেম বিয়েতে। বিয়ের প্রস্তুতির জন্য টাকার অভাব মেটাতে তিনি আড়াইশো টাকা ঋণ প্রার্থনা করে একটি চিঠি দিয়েছিলেন অধ্যাপক রমেশ মজুমদারকে। তিনি পত্রপাঠ সে অনুরোধকে সম্মানিত করেছিলেন সে কথাও স্মৃতিকথায় কৃতজ্ঞতার সাথে লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু। এরপরই তাঁর অধ্যাপনার চাকরি ও বিবাহিত জীবন যাপন শুরু কলকাতায়। 'আমাদের কবিতাভবন' জুড়ে আছে সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে স্মৃতিকথা। মা.বে.

আমার ছেলেবেলা : কবি সানাউল হকের (১৯২৪-১৯৯৩) জীবনস্মৃতি। গ্রন্থটি ঢাকার আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯৮৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে সানাউল হকের শৈশব-কৈশোর-প্রথম যৌবনের কথা আকর্ষণীয় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সানাউল হকের কবি হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত আলোচ্য গ্রন্থের শব্দস্রোতে রূপায়িত। তাঁর কালের সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় নানা প্রবণতাও এখানে পাওয়া যায়। বি. ঘো.

আমার জীবন : কবি নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণমূলক রচনা। বৃহদাকার এই গ্রন্থটি মোট পাঁচ ভাগে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রকাশকাল যথাক্রমে : প্রথম ভাগ ১৯০৮ ; দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৯ ; তৃতীয় ভাগ ১৯১০ ; চতুর্থ ভাগ ১৯১২ ও পঞ্চম ভাগ ১৯১৩। পাঁচ ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা সর্বমোট (২৬৪+৪৩০+৫১৪+৪৮০+৫২৪) ২২১২। পাঁচ ভাগের গ্রন্থটির কেবলমাত্র প্রথম ভাগটি নবীনচন্দ্র সেনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থটিতে লেখক তাঁর জন্ম, কৈশোর, শিক্ষা, চাকরি, বিবাহ, সাহিত্যচর্চা থেকে শুরু করে পুরো জীবনের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মসূত্রে বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল দেখার এবং সেসব অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

www.pathagar.com

পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি গ্রন্থটিতে এইসব অভিজ্ঞতার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে 'আমার জীবন' ব্যক্তিবিশেষের আত্মজীবনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি হয়ে উঠেছে একটি বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের, একটি জাতির, একটি যুগের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসও। 'আমার জীবন' নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক কালে প্রায় অবহেলিত একটি গ্রন্থ। বিদগ্ধ সমালোচকগণ এর জন্য নবীনচন্দ্রের আত্মশ্লাঘাকেই দায়ী করেছেন। এছাড়া এক সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে নবীনচন্দ্রের পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা ছিলো। এই পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা সূত্রে নবীনচন্দ্র পরিচিত বন্ধুজনের অনেক অসদাচরণের নীরব সাক্ষী থেকে যান। জীবন-সায়াহ্নে তিনি 'আমার জীবন' রচনার সময় তাদের সেইসব দোষ-ত্রুটির কথা অবলীলায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁর বন্ধুমহল এই গ্রন্থটি সম্পর্কে চরম বিমুখতা প্রদর্শন করেছেন। রচনা-শৈলী ও শিল্পমান বিচারে 'আমার জীবন' নবীনচন্দ্র সেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এর বিশালতা, এর আন্তর-চারিত্র্য একে প্রায় মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছে। 'আমার জীবন' বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী রচনাধারায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন। সা.আ.

আমার জীবন আমার অভিজ্ঞতা : মনিরউদ্দীন ইউসুফের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৯২। প্রকাশ করেছে কালান্তর। ২৮টি পরিচ্ছেদে লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়, বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, আত্মীয়-স্বজনের পরিচয়, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের শাসনকালে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত কিছু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় তুলে ধরেছেন। কোথাও সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে লেখকের নিজের কথা, আবার কোথাও কোথাও লেখা প্রবন্ধের আদল লাভ করেছে। লেখকের ধারণা, তাঁর জীবৎকালের ছয় দশকে বাংলাদেশে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা অতীতের কয়েক শতাব্দীর পরিবর্তনের সমান। সে সঙ্গে তিনি এটাও মনে করেন যে, এতোটা পরিবর্তন সত্ত্বেও দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি এখনো পর্যন্ত সামন্তবাদী মানসিকতা থেকে মুক্ত নয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতি লেখকের দুর্বলতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তিনি সমর্থন করেছিলেন এই কারণে যে, ইসলামের নামে পাকিস্তানের শাসকগণের ভণ্ডামি ও দুর্নীতি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। স্বাধীন বাংলাদেশের চার মূল নীতিকে তিনি 'হিং টিং ছট' নামে আখ্যায়িত করেন,সমালোচনা করেন শেখ মুজিবের স্তাবকবেষ্টিত শাসনকালকে। লেখকের নিকট 'পুঁজিবাদী গণতন্ত্র' এবং 'মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র' সমান অকল্যাণকর এবং 'বিধাতা নির্মিত বিধান' ইসলামতন্ত্রের মধ্যে গোটা মানবজাতির কল্যাণ নিহিত বলে তাঁর ধারণা। স্মৃতিকথার পরিশিষ্টে ৩০টি ছবিসহ একটি বংশলতিকা রয়েছে। প্রী.মি.

আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক আজিজুর রহমান মল্লিকের স্মৃতিকথা। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৯৫। প্রকাশ করেছে আগামী প্রকাশনী। বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় স্মৃতিকথাটিতে স্থান পেয়েছে। যেসব ঘটনার অনুষঙ্গে এসব বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পাকিস্তান আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতীয় চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সর্বোপরি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দেশগঠন ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটনার সঙ্গে লেখকের সম্পৃক্ততা কখনো দর্শকের, কখনো অংশগ্রহণকারীর। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কাজে। বাংলাদেশ সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করতেও তাঁকে দেখা গেছে। স্মৃতিকথাটিতে জীবনের এসব সংশ্লিষ্টতা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। গ্রন্থটিতে কোনো পরিচ্ছেদ-বিভাগ নেই। প্রাঞ্জল ভাষায় ও সরল বাক্যবিন্যাসে লেখক একটার পর একটা ঘটনা তুলে ধরেছেন। স্মৃতিকথাটির বিভিন্ন পর্যায়ে লেখকের অসাম্প্রদায়িক অথচ ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং একই সঙ্গে শাশ্বত বাঙালি মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত অধ্যাপক মল্লিকের ভাষণ সংকলিত হয়েছে, যেখানে সমকালীন ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। ৬৪টি আলোকচিত্র স্মৃতি-কথাটিকে অধিকতর প্রামাণ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রী.মি.

আমার জীবন-ধারা : খান বাহাদুর আহছানউল্লাহর আত্মজীবনী। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা, ১৯৪৬। বইটিতে লেখকের কর্মজীবনের চেয়ে ধর্মজীবন অধিক জায়গা দখল করে আছে। আছে বাংলার নানা স্থানে তাঁর ভ্রমণের বৃত্তান্ত। ভ্রমণকালে লেখক যেসব ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই ধর্মপ্রাণ। বইটিতে সমকালীন বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। লেখক নিজে ইসলামের মরমি পথের একজন সাধক এবং প্রচারক। তাই তাঁর ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় শরিয়ত অপেক্ষা তরিকত ও মারেফতের প্রতি পক্ষপাত লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত সুফিবাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও পীরভক্তির পক্ষে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় একদিকে নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ, গভীর ধ্যান ও তত্ত্বজ্ঞান ; অন্যদিকে গীতবাদ্যসহ ভক্তিমার্গ অবলম্বন — উভয়কেই লেখক সমর্থন করেন। একই কারণে বইটির কোথাও কোথাও শরিয়তপন্থি সাধনার অগভীরতা, সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার প্রতি সংযত কটাক্ষ করা হয়েছে। তাছাড়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধকদের প্রতি সতর্ক শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হলেও বইটিতে পৌত্তলিকতা, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা আছে। আগাগোড়া সাধু রীতিতে রচিত বইটির বানান-পদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। সহজ বাংলায় প্রতিস্থাপনযোগ্য বহু শব্দ তিনি হয় সংস্কৃত, না হয় আরবি-ফারসি উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন। লেখকের ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা প্রায় ক্ষেত্রেই আবেগপূর্ণ, তবে সাম্প্রদায়িকতা পরিহারের প্রচেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। প্রী.মি.

আমার দাহ আমার হাত : কবি খালেদা এদিব চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ। মূল্য : দশ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৮। দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, প্রচ্ছদপট : কাজী হাসান হাবীব। প্রকাশক : আবদুল মোমেন। পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ৩৩/১ পাটুয়াটুলি, ঢাকা। এ গ্রন্থের কবিতার সংখ্যা ৪৫। বক্তব্য বলিষ্ঠ বলে কাব্যগ্রন্থটিকে তীব্র সতেজ মনে হয়। উপমা-চিত্রকল্পের অসাধারণত্বে কবিতার শরীরে রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পাঠক পড়তে পড়তে একাত্ম হয়ে পড়েন। মনে হয় এ যেন নিজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ যেন নিজেরই সুরের অনুরণন। পাথর কী ধারণ করতে পারে সবটুকু জল-যন্ত্রণা!/আকাশ কী বনভূমি হয়ে যেতে পারে—এক মুহূর্তে!/আহা আমি কাকে বলব/ আমার সর্বাঙ্গে লেপন করো সভ্যতার কষ্ট/অঙ্কন করো তৈলচিত্র/ (আমার দাহ আমার হাত)। কবি মনে করেন জীবন মানেই যন্ত্রণা, দাহ/দুঃখ-কষ্ট/আনন্দ-বেদনা অভিমানের মিশ্রণ। পাওয়ার জন্য হাহাকার/পেয়ে হারানোর বেদনা। সংশয়বিদ্ধ কবি যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করেন : কাউকে বলা যায় না সুন্দর/কাউকেও বলা যায় না গোলাপ/মানুষের জীবনে সুন্দরের বড় অভাব/তুমি কাকে দেবে প্রেম/কাকে দেবে ভালোবাসা/নষ্ট হাওয়া বইছে তুফানে/ (বৈরী বাতাস)। দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত কবির কণ্ঠ—পরম/আত্মীয় বন্ধু প্রার্থিত স্বদেশ তুমি ধমনীতে/ লতানো মেঘের ঝাড়/ (স্বদেশ তোমার ঘ্রাণ)।

www.pathagar.com

কবির শিল্পিত উপলব্ধিকে ধারণ করেছে 'আমার দাহ, আমার হাত'। বুদ্ধিগ্রাহ্য সবল বিন্যাসে কবিতাগুলি পেয়েছে তারুণ্যের প্রভা। যে প্রভা একটি গ্রন্থকে সুদীর্ঘ সময় ধরে উজ্জ্বল রাখে। পা. র

আমার দুটো ডানা : আখতার হুসেন রচিত কিশোর কবিতার বই। প্রকাশক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২, মূল্য ২০.০০ টাকা। আমার দুটো ডানা আখতার হুসেনের ১৪টি কিশোর কবিতার সংগ্রহ। শিশু-মনস্তত্ত্ব-সংলগ্ন নানা বিষয়-অনুষঙ্গের কাব্যিক প্রকাশই এই বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বক্তব্যের সঙ্গে গভীর কবিকল্পনা ও ছন্দের সাবলীল কারুকাজ কবিতাগুলোর প্রাণ। বাংলাদেশে কিশোর কবিতা চর্চার অগ্রগতির অন্যতম স্মারক 'আমার দুটো ডানা' বই। সু.ব.

আমার দেশ আমার ভাষা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রকাশক : বর্ণমিছিল, ঢাকা। প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৮৪, বৈশাখ ১৩৯১। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৮, মূল্য : ২০.০০। এটি লেখকের দ্বিতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে মোট ৮টি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম হলো--ইংরেজির ভবিষ্যৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, ব্যবহারিক জীবনে ও উচ্চ শিক্ষায় বাংলা, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার পরিবেশ, বুদ্ধিজীবী স্মরণে বিপন্ন বুদ্ধিজীবী—একটি কাল্পনিক সংলাপ, বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা প্রসঙ্গে ভিন্ন ভাবনা। এই প্রবন্ধগুলোতে বাংলাদেশের শিক্ষা ও ভাষা প্রসঙ্গে অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর সময়োপযোগী রাজনৈতিক ও সামাজিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধকারের চিন্তার মৌলিকত্বই প্রবন্ধগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সু. ব.

আমার প্রথম লেখা : সম্পাদনা দাদাভাই। তেরজন নামিদামি সাহিত্যিকের প্রথম লেখার কাহিনী সম্বলিত সম্পাদিত গ্রন্থ। প্রকাশক : কাকলী প্রকাশ, ৩৮ শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা। প্রচ্ছদপট ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৭, মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। আমার প্রথম লেখা পঞ্চাশ দশকের ভিন্নধর্মী একটি গ্রন্থ। সে আমলে শিশু-কিশোরদের জন্য লিখে যারা সুনাম কুড়িয়েছিলেন, তাঁদের প্রথম লেখার মজার মজার ঘটনা বইটিতে সংকলিত। এসব মজার ঘটনা বা কাহিনী প্রথমে দৈনিক ইত্তেফাকের কচিকাঁচার আসরে ছাপা হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে দাদাভাই এ কাহিনীগুলো সম্পাদনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে যাঁদের প্রথম লেখার কাহিনী স্থান পেয়েছে, তাঁরা হলেন : অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, জসীমউদ্‌দীন, বন্দে আলী মিয়া, মোহাম্মদ মোদাব্বের, মোহাম্মদ নাসির আলী, হোসনে আরা, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, হাবীবুর রহমান, রোকনুজ্জামান খান, আবদুল্লাহ আল-মুতী ও ফয়েজ আহমদ। গ্রন্থটির ভূমিকায় দাদাভাই উল্লেখ করেছেন : আজকাল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ছোটদের পাতায় সাহিত্য সাধনার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে এদেশের ভাইবোনেরা। কিন্তু দশ-পনের বছর আগেও ছোটদের সাহিত্য সাধনার তেমন কোন সুযোগ ছিলোনা। তাই বর্তমান কালের সাহিত্যিকদের প্রথম যুগের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস আজকের দিনের ভাইবোনদের অন্তরে যথেষ্ট প্রেরণা জোগাবে বলেই আমার ধারণা। বিশেষ করে এই রচনাগুলোর যে একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাও একবাক্যে সবাই স্বীকার করবেন বলে আশা রাখি। খা.বি.জ.উ.

আমার প্রিয় গল্প : কৃষণ চন্দর। অনুবাদ করেছেন অর্ঘ দাশ। ভূমিকায় কৃষণ চন্দর লিখেছেন, 'আমি আমার দিদিমার মুখে গল্প শুনেছি, নিজের মায়ের মুখেও গল্প শুনেছি। সেজন্য আমার গল্পের শিল্পকৌশলও অত্যন্ত পুরনো। যাতে গল্পের পাঠক গল্প

www.pathagar.com

পড়ে আনন্দ পায়, রাত, মৃত্যু, অন্ধকারের ভয় দূর হয়ে যায়। আমরা সূর্যের সন্তান। তাই যাতে জীবনের সুখকর উজ্জ্বল কল্পনা জাগ্রত হয়। আমরা অন্ধকারের সন্তান হলে আমাদের চোখ থাকত না, আমাদের অনুভূতির অবস্থা একটু অন্য রকম হত। কিন্তু আমরা যে সূর্যের সন্তান। অগ্নি আমাদের দেশ। তাপ আমাদের ভোজন। চাঁদনি আমাদের প্রিয়তমার মুখ। আমরা চোখের ওপর চোখ ফেলে তাকিয়ে প্রেম করি, কারণ আমরা অন্ধ নই। এই পৃথিবীতে চোখের থেকে পবিত্র আর কিছু নেই।...আমি সেই বোকাদেরই একজন যারা ঘন অন্ধকারে জঙ্গল পার করে হাতির দাঁতের স্বপ্নপুরীর দরজা ভেঙে ঘুমিয়ে থাকা রাজকুমারীর চোখে চুমু খেতে আগ্রহী। আমার এই নির্বাচিত প্রিয় গল্পের সংকলনের গল্পগুলো সেই ইচ্ছারই প্রতীক।' সংকলনের গল্পগুলো হল--কালুভঙ্গী, ঝিলমের বুকে নৌকোয়, শাহজাদা, পুঞ্জের ক্লিওপেট্রা, ভক্তরাম, মহালক্ষ্মীর পুল, পাঁচ টাকার স্বাধীনতা, দু ফার্লং লম্বা রাস্তা এবং গুলদুম। প্রকাশক : দীপায়ণ, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা : ১৩৮, প্রকাশকাল : ১৩১৭, মূল্য : ২৫ রুপি। বিব

আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৯১৫ খ্রি:। গ্রন্থের প্রথম অংশ 'আমার বাল্যকথা' লেখকের আত্মজীবনীর অভিব্যক্তি। তবে এতে আত্মজীবনীর ভাববৈশিষ্ট্য পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। কেননা লেখকের নিজের জীবনের অন্তরঙ্গ বিষয় ও ঘটনাসমূহ খুব সামান্যই এতে বিবৃত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মবহুল জীবনে যে সব বিদগ্ধ মনীষীর সান্নিধ্যে আসেন, তাঁদের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ ও তাঁদের চরিত্রচিত্রণই এই অংশের প্রধান আকর্ষণ। গ্রন্থের শেষার্ধ 'আমার বোম্বাই প্রবাস' প্রচলিত ভ্রমণকাহিনীর ছাঁচে না লিখে লেখক দাক্ষিণাত্যের ইতিবৃত্ত, ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন। খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধের আকারে এই সব বিচিত্র তথ্যের বিবরণী দেওয়া হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের রচনারীতিতে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। আ.জ.

আমার বিশ্বাস—আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪/ফাল্গুন ১৩৯০, প্রকাশক : রূপম প্রকাশনী, ৯৫, আরামবাগ, ঢাকা। প্রচ্ছদ : মামুন কায়সার চৌধুরী, মূল্য : ১৫.০০ টাকা। আবদুল মান্নান সৈয়দের আত্মবিশ্লেষক চারটি গদ্য সংকলন 'আমার বিশ্বাস'। শিরোনামগুলো হলো : আমার গদ্য, আমার কথকতা, আমার কবিতা, আমার বিশ্বাস। ষাটের দশকে ব্যতিক্রমী কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ। তাঁর ব্যতিক্রম যাত্রা যেমন বিষয় উপস্থাপনে তেমন শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে। তাঁর গদ্য যেমন নিজস্ব তেমনি কথকতা, কবিতা এবং সাহিত্য বিশ্বাসও ভিন্ন। তাই তাঁর সাহিত্য--যাত্রা থেকে পাঠক উন্মুখ হয়ে আছে বিবিধ প্রশ্ন নিয়ে—জিজ্ঞাসার ফোয়ারা নিয়ে। এ গ্রন্থে সৈয়দ সেসব গ্রন্থিগুলো উন্মোচন করেছেন। তাই তিনি লিখেছেন, 'আমার গদ্যে মেধা ঝরিয়ে ক্রমব্যাপ্ত হয়েছে হৃদয়—এবং কোমলতার কেন্দ্রীয় কারণ হয়তো সেই।' তাঁর এ অংশে তার গদ্য চর্চার একটি পটভূমিরও বর্ণনা আছে। সৈয়দের গল্প ও উপন্যাস চর্চার প্রেক্ষিত ও বিস্তর আলোচনা আছে 'আমার কথকতা' প্রবন্ধে। এর প্রচ্ছদ, অপছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনালোচিত গল্পের কলকব্জার উপর আলো ফেলেছেন সৈয়দ। 'জীবন পথে চলতে চলতে যা আমারই নিজস্ব উপার্জন' তাই তার গল্প ও উপন্যাসে উঠে এসেছে--বলেছেন সৈয়দ। 'আমার বিশ্বাস' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমার শিল্পের প্রধান উৎস কল্পনা' অন্যতম প্রধান উৎস মৌনতা' এবং 'উৎস শিল্প'। এসব নিয়েই আবদুল মান্নান সৈয়দের 'আমার বিশ্বাস'। মা. জা.

www.pathagar.com

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি : অমর একুশের গান। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী রচিত একুশের কবিতায় সুরারোপ করে এই গানটি অমর একুশের গান হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এই গানটি যখন রচনা করা হয়, সেই ১৯৫২ সালে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন, তিনি একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিছিলে গুলি বর্ষণের পরে যারা আহত হয়েছিলেন তাদের দেখার জন্য মেডিকেল কলেজের আউটডোরে যান। সেখানে গিয়ে একটি লাশ দেখতে পান, তার মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল। ঐ লাশটি ছিলো শহীদ রফিক উদ্দিনের। এ লাশটি দেখার পর তাঁর মনে যে ভাবটি এসেছিলো সেটি হলো : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশের ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।' পরবর্তী সময়ে এই পংক্তিটিকে প্রথম পংক্তি রেখে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটিকে সুর দেন প্রখ্যাত শিল্পী আবদুল লতিফ। গুলিস্তানের ব্রীটেনিয়া হলে ঢাকা কলেজের অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবার সময় শিল্পী আবদুল লতিফ এই গানটি গেয়ে শোনান। তার পরদিন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক্সট্রা অর্ডিনারি গেজেটে গানটি নিষিদ্ধ করা হয়। শুধু তাই নয় ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই গান রচনার জন্য আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীও বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে প্রখ্যাত সুরকার আলতাফ মাহমুদ এই কবিতাটিকে নতুন করে সুরারোপিত করেন। বর্তমানে গানটি আলতাফ মাহমুদের এই সুরে গাওয়া হচ্ছে। এই সুরটি ধীরে ধীরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সভাসমিতি এবং একুশের প্রভাত ফেরিতে এটি গীত হতে থাকে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান তাঁর 'জীবন থেকে নেয়া' সিনেমায় এই গানটি ব্যবহার করলে এটি সাধারণ মানুষের মুখের গানে রূপান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে একটি কবিতা, একটি গণ-সঙ্গীত হিসেবে বাঙালির জাতি-সত্তায় গেঁথে যায়। আজকের দিনে এই গানটি ছাড়া একুশের অনুষ্ঠান চিন্তাও করা যায় না। গানের রচয়িতা আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী এই গান প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন : 'এই গান লেখার জন্য আমি গর্বিত। এই গানের ভেতর দিয়ে একটি সময়কে নয়, একটি যুগকে নয়, একটি জাতির সত্তাকে আমার ক্ষুদ্র ও নগণ্য শক্তির দ্বারা রূপ দিতে পেরেছি। আমাদের নতুন প্রজন্ম যাদেরকে আজকাল অসত্য ইতিহাস শেখানো হচ্ছে তারাও উৎস-মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার একটা অবলম্বন পাচ্ছে এ গানের মাধ্যমে। এটাই আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।' সে. হো.

আমার ভেতরের বাঘ : হাসান হাফিজুর রহমানের সপ্তম কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ১৯৮৩। প্রকাশক : অধুনা সাহিত্য সংসদ, ৯৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : বারো টাকা। ২৪টি কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত। কবির মৃত্যুর মাত্র দুই মাস আগে প্রকাশিত হয় বইটি। সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের পটভূমিতে কবিতাগুলো রচিত। ন্যূনতম নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে দেশের মানুষ তখন বঞ্চিত। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর যে একটি সাহসী সত্তা ছিল তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় এই বইয়ের কবিতায়। 'বাঘ' এখানে সাহস ও সংগ্রামের প্রতীক হয়ে এসেছে যা তাঁকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে। এই বাঘকে তিনি সযত্নে আড়াল করে রেখেছিলেন। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাকে আর আড়ালে রাখা গেল না। সে বাঘ যে ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে সে কথা প্রকাশ করে দেয়া হলো শেষ পর্যন্ত। 'আমার ভেতরের বাঘ' কাব্যগ্রন্থে কবির শরীর ও হৃদয়ের অবসন্নতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে জীবন ও মনুষত্বের প্রতি তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার, অন্যদিকে রুগ্ন ও মরণাপন্ন

www.pathagar.com

শরীর। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে তাঁর কবিসত্তার প্রতিমাটি ফুটে উঠেছে 'আমার ভেতরের বাঘ' কাব্যগ্রন্থটিতে। আ. মা.

আমার যত গ্লানি : রশীদ করীমের উপন্যাস। মূল্য : ১৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৭৮। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭৩। প্রকাশক : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ৬০ পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১। প্রচ্ছদশিল্পী : কালাম মাহমুদ। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক অস্থিরতাকে আশ্রয় করে উপন্যাসটি রচিত। 'আমার যত গ্লানিকে' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবেও চিহ্নিত করা যায় না। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ছাড়া আর সবই কল্পনাপ্রসূত। উপন্যাসে কিছুটা পরাবাস্তবধর্মীতা লক্ষ করা যায়। ছোট ছাট চমৎকার বাক্যে খণ্ড খণ্ড ঘটনায় উপন্যাসের কাহিনী গতি লাভ করেছে। নায়ক প্রতিনিয়ত নিজের মাঝে নিজেই ধূম্রজাল বিস্তার করেছে। ধোঁয়াশার ভেতরে স্বপ্ন কল্পনা নাকি বাস্তবতা নায়ক নিজেই তা নির্মাণে ব্যর্থ হয়। ফলে অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়গুলোও আর তুচ্ছ থাকেনা। 'অনন্য' নামক মহার্ঘ বস্তুটি তখন উপন্যাসের কাঠামোকে মজবুত করে তোলে। স্বাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এরফান ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ হয় কিন্তু বাহ্যিক আবরণে তার বিন্দুমাত্র ছাপ পড়তে দেয় না। বিবেক বর্জিত কাজ করে—বিবেকের কশাঘাতে নিজেই রক্তাপ্লুত হয়। সমাজবাস্তবতার কাছে বার বার হার স্বীকার করে, কিন্তু তার ভেতরের আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটে না। এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকেই জীবন্ত মনে হয়। ফলে পাঠক আর লেখকের দুস্তর ব্যবধানটিও নিমেষে ঘুচে যায়। নানা ঘাত প্রতিঘাতের পর উপন্যাসের পরিশেষ হয়ে উঠেছে আশা জাগানিয়া। পা. র.

আমার শব্দে আজন্ম আমি : কবি জাহানারা আরজুর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮। প্রকাশনায় নওরোজ সাহিত্য সংসদ ঢাকার পক্ষে ইফতেখার রসুল জর্জ। ৩৮/৪ বাংলা বাজার গ্রন্থপল্লী দোতলা, ঢাকা-১১০০। দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, প্রচ্ছদ নসাস অংকন বিভাগ। সত্তর দশকের গোড়া থেকে নিয়ে আশি দশকের প্রারম্ভের সুদীর্ঘ সময়ের কিছু সংখ্যক কবিতা নিয়ে এ কাব্য সংকলন গ্রথিত। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন 'রুনা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা রুহুল আমিন বাবুল। 'আমার শব্দে আজন্ম আমিতে' কবিতার সংখ্যা ৩৮। বেশির ভাগ কবিতা ব্যক্তিগত অনুভূতি নির্ভর। কবির হৃদয় অসম্ভব স্পর্শকাতর। ফলে প্রতিবেশী চলে গেলেও তিনি মুষড়ে পড়েন। ব্যথিত হন। ওরা চলে গেছে/গোলাপী ওড়না জড়ানো কিশোরী মেয়েটির/সেই চটুল অকারণ হাসি আর টুকরো কথায় সচকিত হব না/ আমি, ছোট্ট মাখন নরম খোকাটার জামা-কাঁথা/ লাল-নীল- হলুদ হরেকরঙা বেবীফ্রকগুলো রঙিন/বেলুনের মতো বাতাসের দোলায় দুলবে না আর/(প্রতিবেশি)। আলোর পিয়াসী কবি 'প্রথম রোদের প্রার্থনায়' রত হন। আবার নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে (পুরানো আঘ্রাণে সিক্ত' হয়ে ওঠেন/উপমা, রূপক, চিত্রকল্পে কবি যেন নিজের শব্দে আজন্ম মগ্ন/শব্দের সরোবরে কখনো আমি রাজহাঁস হয়ে/ সাঁতার কাটি/কখনো জলন্ত সূর্যটাকে নিয়ে আসি/হাতের মুঠোয়/কখনো জীবনের চোরাবালিতে পা রেখেও/নিয়ত কাঁচের স্বর্গ গড়ি/(আমার শব্দে আজন্ম আমি) কবি নিয়ত বিষন্নতা, সন্তাপ, বেদনায় নিমজ্জিত/কখনো আশাবাদী হলে 'বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা' করেন। কবিতাকে প্রচণ্ড ভালোবেসে নিজের আত্মজের সঙ্গে তুলনা করে বলেন—আমার কবিতা এ যে আমার নাড়ি-ছেঁড়া ধন/এ মহার তন আমি ভালবাসি ঠিক যেমন মা তার/সন্তানকে ভালোবাসে;/পাখী ভালবাসে তার শাবককে। এভাবেই কবি শব্দে আজন্ম মগ্ন থেকে কবিতাকে লালন করেন। পা.র.

আমার শিল্পী জীবনের কথা : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। বইটি স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স লিমিডেট

www.pathagar.com

ঢাকার বরাতে প্রকাশ করেছেন মোস্তফা কামাল। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬০। বইটি সঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদের আত্মজীবনী। বইয়ের শুরুতে লেখকের পুত্রের লেখা ভূমিকা থেকে জানা যায় ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাস থেকে আব্বাসউদ্দীন এ রচনা শুরু করেন এবং ১৯৫৮ সালে তা শেষ করেন ; তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর বর্ণময় জীবনের অনেক প্রসঙ্গই অব্যক্ত থেকে গেছে, নিতান্ত যেটুকু না বললেই নয় সেটুকুই বিবৃত আছে এ বইয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট সমৃদ্ধ কলেবরের এ বইটিতে অত্যন্ত সুলিখিত অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে একজন কৃতি মানুষের জীবনচিত্র। স্মৃতিসূত্র ধরে লেখকের আটবছর বয়সের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা থেকে জীবনীর শুরু—বলা চলে, সে সময় থেকেই সঙ্গীতের সাথে তাঁর সম্পৃক্তির সূচনা। মোট সাতটি শিরোনাম চিহ্নিত পর্বে সমগ্র জীবনী অংশটিকে ভাগ করা হয়েছে: ১. প্রথম গানের প্রেরণা ২. কলেজ জীবন ৩. শিল্পীর আসনে ৪. নবজাগরণে বাংলার মুসলমান ৫. উত্তরকাল ৬. বিদেশভ্রমণ ৭. জীবন সায়াহ্নের স্মৃতি। এই পর্বগুলোতে শিল্পীর ঘটনাবহুল জীবনের নানা তথ্য উপস্থাপন করার পর অত্যন্ত আবশ্যকীয়ভাবে 'আমার রেকর্ডের গানের তালিকা' সংযুক্ত হয়েছে। এই সুসঙ্গত সংযোজন বইটিকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা ও গুরুত্ব দান করেছে। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হয়েও শৈশবের অতি সাধারণ জীবন যাপনের কথা অকপটে বলেছেন তিনি, সেই সাথে দুরন্ত গ্রাম্যজীবনের নানা বৈচিত্র্য ও কৈশোরিক স্বপ্নবিলাস, চারপাশের পশু পাখি ও প্রকৃতি থেকে সুর আহরণের কথাও বলেছেন। বর্ণনায় আছে বাল্যপ্রেম ও বিচ্ছেদ, পরবর্তীকালে ভিন্নজনের সাথে পারিবারিক ব্যবস্থায় বিয়ের প্রসঙ্গ; বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের বৃত্তান্ত। স্কুল জীবন থেকেই মেধাবী ছাত্র আব্বাসউদ্দীন সকলের স্নেহের পাত্র ছিলেন, সেই সূত্রে ধার্মিক মুসলিম পরিবারের সদস্য হয়েও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের স্নেহ-সান্নিধ্যে উদার মানবিক বোধসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তৎকালীন উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ খেয়াল গাইয়ে রাজেন রায়ের গান শুনে এবং পরবর্তীকালে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে এসে তিনি সঙ্গীত জগতের সাথে সম্পৃক্ত হন। এরপর কোলকাতা থেকে তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড বের হয়। পরের ইতিহাস কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তাঁর ক্রমশ প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির ইতিহাস। লেখক ব্যক্তিজীবনে অনেক গুণী ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন— কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, কুচবিহারের রাজা শ্রী জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনসহ অনেকেরই। শারীরিক অসুস্থতার কারণে জীবনের যে সকল অন্তরঙ্গ মানুষের কথা বিস্তারিত বলতে পারেননি, তাঁদের সাথে সম্পর্কের আন্তরিকতা থেকে লেখক জীবনীর শেষ পর্যায়ে তাঁদের নামোল্লেখ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আব্বাসউদ্দীন আহমদের জীবনীগ্রন্থটি একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যুগের দলিল। র. আ. ক.

আমার সনেট : আবদুল মান্নান সৈয়দ। সনেট সংকলন। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৬/ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। প্রকাশক : শিল্পতরু প্রকাশনী, ২৯০, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দিন খালেদ। মূল্য : পঁচিশ টাকা। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের ১৯৮৫-৯০ সালের মাঝে রচনার আঠাশটি সনেটের সংকলন 'আমার সনেট' কাব্যগ্রন্থটি। মান্নান সৈয়দের নিজস্ব মুদ্রা এ সনেটগুলোতে ছেপে উঠেছে বিষয় ও প্রকরণে। সনেটের প্রচলিত বন্ধ কে কবি এখানে মুক্তি দিয়েছেন। লিখেছেন ব্যতিক্রমি 'গদ্য সনেট'। শুধু 'কবির কাজ' সনেটে কেনো? বিষয় ও আঙ্গিকে কোনটিতেও সৈয়দ প্রচলনকে গ্রাহ্য করেনি। 'তুমি একটা ঝর্ণা। তুমি ফুল। তুমি তারা।/ তুমি একটা অনিঃশেষ আশ্চর্য ফোয়ারা—'র মত মান্নান

www.pathagar.com

সৈয়দ 'আমার সনেট' গুচ্ছে আশ্চর্য ফোয়ারার মত উপস্থাপন করেছেন নিজে--চমৎকার সৃষ্টিশীলতায়। 'আমার সনেট' গুচ্ছে যেমনি আছে বিষয়ের বৈচিত্র্য, তেমনি প্রকরণের। মান্নান সৈয়দকে এখানে পাওয়া যায় যৌবনের অনন্ত গান শোনাতে। তারা, ফুল, উড়ন্তপরী, সাদা গোলাপ যেমনি কবিকে আলোড়িত করেছে তেমনি ব্যক্তি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, শাহাদাৎ হোসেন,' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমানকে নিয়েও মান্নান সৈয়দ ফলিয়েছেন সনেটের ফোয়ারা। এখানে 'প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায়' কবির ভোর হয় 'উত্তেজিত, উদ্বেজিত, আশ্চর্য রঙিন'। মাঘের ভেতর দিয়ে কবি টের পান বসন্তের। এখানে অদম্য হয়ে উঠেন কবি সুকান্তের 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' নিয়ে লিখে যে চমৎকার প্রেমের কবিতা। মা. জা.

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি : এই গানটি যে রাষ্ট্রে বাংলা একমাত্র সাংবিধানিক ভাষা, সে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানের রচয়িতা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কটি দেশাত্মবোধক গান লেখেন, এটি সেগুলোর একটি। গানটি রচিত হওয়ার সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে গানটি প্রথম যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'বন্দে মা-তরম' নামের দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের সংকলনে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটি ১৯০৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। গানটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে' গানটির সুরে এ গানটির সুর করা হয়। সে.হো.

আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরার গণ-আন্দোলন : লেখক দশরথদের। ত্রিপুরার গণ-আন্দোলন ভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক রচনা। দশরথদেব এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি বাংলা হরফে ককবরক ভাষায় লেখেন। আলোচ্য বইটি তাঁর বাংলা অনুবাদ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় দীনেশদেববর্মা লিখেছেন--'রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতি জনগণকে সচেতন করে শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য জনশিক্ষা আন্দোলন সূচনা থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মতবাদপুষ্ট সমাজতন্ত্রকে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মুক্তিপরিষদের ভূমিকার তিনি তাঁর এই রচনায় স্থান দিয়েছেন।' তিনি ত্রিপুরার বঞ্চিত, অবহেলিত উপজাতি জনগোষ্ঠীর পক্ষে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতি গঠন করেন। সেসময়ে ত্রিপুরার সামন্ত রাজা জনশিক্ষা সমিতির নেতাদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তীব্র গণআন্দোলনের মুখে রাজতন্ত্রকে নতিস্বীকার করতে হয় এবং জনশিক্ষা সমিতি স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দান করতে বাধ্য হয়। এই বিষয়টি লেখক তাঁর এই গ্রন্থে যেমন তুলে ধরেছেন তেমন আছে ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড চিত্র। যেমন : 'দেওয়ানি শাসনে উপজাতিদের ওপর পুলিশ-মিলিটারীর অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে মুক্তি পরিষদ গঠন, স্বাধীনোত্তর ভারতের কংগ্রেসের জওহর লাল নেহেরু সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনী গঠন করে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করা, মুক্তি পরিষদের বৈপ্লবিক শৃঙ্খলা, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তি পরিষদের নেতা ও কর্মীদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ, উপজাতিদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অউপজাতি জনগণের সমর্থন লাভে তথা মুক্তি পরিষদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মধ্য দিয়ে উপজাতি অউপজাতি জনগণের মেলবন্ধন সুদৃঢ় করা তথা ত্রিপুরার বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্ত ভিত্তি রচনার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে এই গ্রন্থে দশরথদেব তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখায় তুলে ধরেছেন। বইটি ফেব্রুয়ারির

www.pathagar.com

২০০০ সালে আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করে দেশের কথা পাবলিকেশনস, আগরতলা। মূল্য ৫০.০০ টাকা। কমরেড দশরথদেব ১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সে.হো.

আমি : মূল লেখক মারাঠি কথাশিল্পী হরি নারায়ণ আপটে। অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। 'আমি' সামাজিক উপন্যাস। ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনী লেখার পদ্ধতিতে উপন্যাসের নায়ক ভাবানন্দের জীবন কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপন্যাসে তাঁর সমাজ সংস্কার ও কলাবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, উপযুক্ততা ও সৌন্দর্য ; এই দুই গুণে উপন্যাসটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। বিশিষ্টতার এই সংজ্ঞা নতুন সাহিত্যকর্মের ভূমিকা রচনা করে। এই ভূমিকা পুরনো প্রথা ও রীতি–নীতির প্রচারস্থল না হয়ে, হয়েছিলো স্বাধীন চিন্তাধারার বাহক। মহৎ সাহিত্যিকের গুণ হৃদয়ের বিশালতা। এই গুণ হরি নারায়ণের ছিলো। ভাবানন্দ, গণপত রাও বা যশবন্ত রাওয়ের চরিত্র–চিত্রণে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। হরি নারায়ণের কল্পনায় ব্যক্তিত্বের রূপ আছে, এক উচ্চ–শিক্ষিত সমাজ সংস্কার, প্রচারক ও পথনির্দেশকের। তিনি মনের পবিত্রতাকে এক শ্রেষ্ঠতম সাধন মনে করতেন। তাই তাঁর উপন্যাসের নায়ক চিত্রিত হয় পথ–নির্দেশক রূপে, যিনি মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলেন এবং সৎ ভাবনারাশির সঞ্চার করেন। কল্পনাশ্রয়ী অদ্ভুত বাতাবরণ থেকে বাস্তবানুগ বাতাবরণ পর্যন্ত হরিনারায়ণের সাহিত্যকৃতির চিত্রপট বিস্তৃত। জীবনকে সম্পূর্ণতায় দেখবার প্রয়াস এবং তাকে সুনিয়োজিত কথা দ্বারা অনবদ্যভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতার গুণে মারাঠি সাহিত্যে হরি নারায়ণ আপটের বিশিষ্ট স্থান ও এটি তাঁর বিশিষ্ট অবদান। মারাঠি উপন্যাসে তাঁকে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক বলা হয়। তাঁর জন্ম ৪ মার্চ ১৮৬৪, মৃত্যু ৩ মার্চ ১৯১৯। প্রকাশক ; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লি। প্রকাশকাল : ১৯৭৪, পৃষ্ঠা : ২২০, মূল্য : ৫.৭৫ রুপি। বি.ব.

আমি অনাহারী : শামসুর রাহমানের একাদশতম কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল : ১৯৭৬। প্রকাশক : বইঘর, ১১০/২৮৬ বিপণী বিতান, চট্টগ্রাম। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। দাম : আট টাকা। উৎসর্গ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বন্ধুবরেষু। ৫৩টি কবিতার সংকলন এটি। আমি অনাহারীতে শামসুর রাহমানের কবিসত্তা পরাবাস্তবতা নির্ভর হলে তার চারিত্র্য লক্ষণ পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের পরাবাস্তবতার চেয়ে আলাদা। বস্তুগত কাল প্রতিবেশের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার ফলে কবির মগ্নচৈতন্যে যে পরাবাস্তবতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে তারই মূর্তরূপ প্রকীর্ণ হয়ে আছে আমি অনাহারীর কবিতাবলিতে। প্রায়শই চেতন–অচেতনের ব্যবধান যাচ্ছে লুপ্ত হয়ে, বাস্তব পৃথিবী অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পরাবাস্তব রূপসজ্জা। সমকালীন জীবনানুভূতি সর্বদাই শামসুর রাহমানের কাব্যচেতনায় প্রোথিত। আমি অনাহারী এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আমি অনাহারীর সমকালীনতা এমনভাবে অবচেতন পরাবাস্তব জগতে মিশে আছে যে প্রায় বোঝাই যায় না সমকাল প্রতিবেশের কোন অনুষঙ্গে প্রাণিত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিসত্তা। আ. মা.

আমি, অনুপম : নবনীতা দেবসেনের উপন্যাস। এটি ১৯৭৬ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। উপন্যাসটির পটভূমি সত্তর দশকের ভারতের অশান্ত রাজনীতি। এর আখ্যান কাহিনীতে বিভ্রান্ত যুবশক্তি ও ভীত সন্ত্রস্ত বুদ্ধিজীবীর পরাভব এবং আদর্শবাদী যুবচিত্তের পুনরুত্থান নিপুণতায় চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুপম রায়ের পরিচয় বিধৃত হয়েছে এভাবে—'তিনটে শহর থেকে একযোগে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের যে একমাত্র ইংরেজি দৈনিক,

www.pathagar.com

সেই 'ডেইলি নিউজে' তিনি 'রয়জ কর্ণার' নাম দিয়ে রাজনৈতিক পর্যালোচনার একটি সাপ্তাহিক কলম লেখেন। 'রয়জ কর্ণার' আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা এবং দিল্লি থেকে প্রকাশিত এই কাগজটির সম্মান এবং প্রচারসংখ্যা সহসা লাফিয়ে উঠেছিল। বোম্বাই এডিশনের সূত্রপাত সেই থেকেই— বলতে গেলে, একপক্ষে তাঁরই জনপ্রিয়তার কল্যাণে, এখন তিন শহরে শিকড় ছড়িয়েছে 'ডেইলি নিউজ'। সংবাদপত্রের মহলে এইসব গল্প এখন দেশজোড়া কিংবদন্তী। আকাশ-বাণীতে 'রয়জ কর্ণার' সাপ্তাহিক ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ; অনুপম রায়ের বাঁধা ছ' মিনিট বিশ্ব-রাজনীতি-পরিক্রমা। কে-না চেনে ওই ভারী, ভরাট কণ্ঠস্বর, ওই ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন ইংরেজি উচ্চারণ? বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ন্যুয়র্ক টাইমসে প্রতিদিন তাঁর স্বাক্ষরিত সংবাদ সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, মার্কিন দেশের তিনটি নেট ওয়ার্ক থেকে তাঁর টি.ভি. সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে, এবং বি.বি.সি.-তেও।' পরিচয়সূত্রটির দীর্ঘ উদ্ধৃত-করণের কারণ এরই মধ্যে তার ধ্বংসের বীজ লুকায়িত রয়েছে। ব্যক্তি অনুপম রায়ের তাবৎ বিশ্বাস এবং বোধের স্বপ্নময় জগৎয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে যথা নিয়মে। স্বরশক্তি ফিরে পেতে ভিয়েনাতে একটা অস্ত্রোপচার হবে মৃত্যুভাবনা মরবিডতাড়িত অনুপম রায়ের। তখন তার কর্মতালিকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, এয়ার ইণ্ডিয়া, ভিসার ফর্ম, মেডিকেল সার্টিফিকেট, ছুটির আবেদন, নো-অবজেকশন লেটারের আবেদন এবং রেডিওতে 'রয়জ কর্ণার' বন্ধ থাকবে অনির্দিষ্টকাল। পতনের এ ইঙ্গিতময়তার মধ্যেই 'আমি, অনুপম' উপন্যাসের সার্থকতা নিহিত। **শা.আ.**

আমি একটি স্বপ্ন কিনেছিলাম : বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত মোট নয়টি ছোটগল্পের সংকলন। এই গল্পগুলো মানুষের অস্তিত্ব, ব্যক্তির মনের ভেতর ও বাইরের সংঘর্ষ, আমির সমস্যা, উন্মুল ভাবনা প্রভৃতি অতি আধুনিক চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত। গল্পগুলোর নাম থেকে গল্পের সমস্যার রূপ পাওয়া যায়। গল্পগুলো আমি একটি স্বপ্ন কিনেছিলাম, অন্তর ও বাইরের ডাক, জাল দিয়ে মেঘ ধরা, আত্মহত্যার অধিকার, মৃত্যুই ধ্রুব জীবনের পরপারে, বাইরের থেকে অন্তরে, মানুষ থেকে গাছ, ও আমি। প্রকাশক র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১০৪। মূল্য ৬৫.০০ টাকা। **জ্ঞা.ব.**

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌র কাব্যগ্রন্থ। ঢাকা থেকে কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। এ গ্রন্থে সঙ্কলিত কবিতার সংখ্যা উনচল্লিশটি। কবিতাগুলোতে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌র মাতৃ ও মৃত্তিকা-প্রেম একটি বিন্দুতে এসে সংহতি লাভ করেছে। বাঙালি জাতিসত্তার মৃত্তিকামূলে শিকড় সঞ্চার করে এ কাব্যগ্রন্থে কবি সঙ্ঘচেতনায় সাহসী মানুষের সম্ভাবনার ছবি এঁকেছেন। বিষয়ের সাথে সাথে প্রকরণ-পরিচর্যাতেও এখানে আছে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌র স্বকীয়তার স্বাক্ষর। **বি.ঘো.**

আমি, দূরগামী : আল-মাহমুদ। প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৪০০/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, প্রকাশনায় : শিল্পতরু প্রকাশনী, ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫। মূল্য : পঁচিশ টাকা। দুটি অনুবাদ কবিতাসহ মোট চব্বিশটি কবিতার সংকলন এটি। জীবনের উপান্তে এসে কবি আল-মাহমুদ বাংলা কবিতাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান? এর উত্তর পাওয়া যাবে 'আমি, দূরগামী'তে। লোকজ শব্দ ও লৌকিক উপমার কবি এখন আধুনিক সন্তের মত গূঢ় আধ্যাত্মিকতায় পুনরুজ্জীবিত। কবিতায় আল-মাহমুদ এখন রহস্যময়তায় বিশ্বাসী। লোকজ ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় সমন্বয় আল-মাহমুদের কবিতা। তাঁর শব্দ ব্যবহার ও বিষয় উপস্থাপনা এতো নিজস্ব যে বাংলা কবিতায় শিরোনাম-হীন প্রতিটি পংক্তি বলে দেয় যে এ লাইনটি

www.pathagar.com

'আল-মাহমুদী'য়। নন্দনপ্রিয় একবির সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা এতোই জাগ্রত যে কবিতার পরতে পরতে উঠে আসা রূপময় ছবির অলৌকিক দৃশ্যাবলী। উপমহাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস কবিতা হয়ে উঠে আল-মাহমুদের কবিতায়। তখন 'মনে হয় প্রতিটি বিষন্ন মুখই উদ্‌গীরণ করতে পারে বুলেট। প্রতিটি যুবতীর বক্ষসুষমায় লুকিয়ে আছে বিস্ফোরক? এখানে 'বিপাশার চোখ' কবিতার কাছে হয়ে উঠে 'কৃষ্ণ সাধকের প্রেমিকা রাধার চোখ হয়ে। নির্লজ্জের মত কবি বিপাশাকে দেখেন সৌন্দর্যানুভূতি নিয়ে। মা. জা.

আমি নই : মনজুরে মওলা রচিত কাব্য নাটক। মূল্য : ১২০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৪০৬, মার্চ ২০০০। প্রচ্ছদ আবিদ-এ-আজাদ। কাব্য নাটকটি সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্ন-বাস্তবতার এমন এক আশ্চর্য জগত নিয়ে যা কেবল কবিতার ভেতর দিয়েই ছুঁয়ে যাওয়া সম্ভব। ফলে কাব্যময় সংলাপে আমরা জীবনের নানান দিক অবলোকন করি। যেন আতশী কাঁচের ভেতর দিয়ে এই অবলোকন। এবং এই অবলোকন সত্যাসত্য হয়ে পড়ে। চারপর্বে বিভক্ত কাব্যনাটকটির পংক্তিতে পংক্তিতে আছে লেখকের বাস্তব নিরীক্ষা। ফলে নাটকটিতে গোলক ধাঁধার এক জগত সৃষ্টি হয়েছে। কখনো মনে হয় এ নাটকের মানুষগুলো যেন আমাদের চিরচেনা। মুহূর্তে বিভ্রম কেটে যায়—মনে হয় তারা এ জগতের নয়। এ কাব্যনাটকে কোনো পাত্রপাত্রীরই নাম নেই। ফলে অনুমিত হয় এক বিশেষ জায়গার ও সময়ের মানুষ হয়েও এরা কেউই কোনো বিশেষ জায়গার বা সময়ের মানুষ নয়। এক প্রৌঢ়ের মনে হয় তিনি খুন হয়ে যাবেন। সঠিক না জানলেও তাঁর মনে হয় তিনি খুন হয়ে যেতে পারেন। আসলে এ গ্রন্থে সবই যেন রূপক। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কার হাতে খুন হয় মানুষ? অস্তিত্বের হাতে? চৈতন্যের হাতে? আমিত্বের হাতে? মৃত্যুর কী ই বা প্রয়োজন জীবনে। স্পট লাইটের মতো জীবনের নানা ঘুপচি ঘাপচিতে আলো ফেলে এগিয়েছে এ কাব্য নাটক। তৈরি হয়েছে মুখের ভাষায়, প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে জীবনের সামগ্রিকতা। অস্তিত্বের ব্যাপক, গভীর সংকট। পৃথিবীতে কেবলই মানুষের নিয়তি। অস্তিত্বের খোঁজ করাই মানুষের কাজ, মুখ্য ও চূড়ান্ত কাজ। এর জন্য প্রশ্ন তুলতে হয়, উত্তর খুঁজতে হয়। কিন্তু উত্তর কি আসলে পাওয়া যায়? গোলমালটা বোধ হয় অস্তিত্বের প্রশ্নেই। আমি নই—আমি আসলে কে? মহাকালে আমার অস্তিত্বই বা কোথায়। পা,র.

আমিনা : নবী করিম মোহাম্মদ (দ:)-এর মাতা। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের যোহরা গোত্রের ওহাব ইবনে আবদুল মন্নাফের কন্যা। আমিনার মাতা বাররা বিনতে আবদুল উযযা আবদ্ আল দার গোত্রের ছিলন। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর সঙ্গে আমিনার বাগদান ও বিবাহ হয়। নবী করিম (দ:)-এর ছয় বছর বয়সে আমিনা ইন্তেকাল করেন এবং মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি আল-আবওয়া নামক স্থানে সমাধিস্থ হন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর মাতা শিফা নবী করিম (দ:)-এর জন্মকালীন বর্ণনা দিয়েছেন। শিফা বলেন, "আমি নবী করিম (দ:)-এর মাতা আমিনার ধাত্রী নিযুক্ত ছিলাম এবং রাত্রে তাঁর প্রসব বেদনার পর যখন মোহাম্মদ মোস্তফা আমার হাতে জন্মগ্রহণ করে তখন সে মুহূর্তে অদৃশ্য জগত হতে আমি একটি কণ্ঠস্বর শুনলাম। স্বরটি হলো : 'তোমার প্রভূ তোমাকে দয়া প্রদর্শন করুন।' এবং পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবী এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে আমি সে আলোতে দামেস্কের কয়েকটি প্রাসাদকে আলোকিত দেখলাম।" এবং বর্ণিত হয়েছে যে, মা আমিনা সে রাতে দেখেছেন যে এক ঝাঁক সুন্দর পাখি তাঁর ঘরে উড়ে এসেছিলো যাদের ঠোঁটগুলো পান্নার মতো সবুজ ছিলো এবং পাখাগুলো চুনীর মতো লাল ছিলো। আ.সৈ.গো.দ.

www.pathagar.com

আমিনা ও মদিনার গল্প : কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিখ্যাত গল্প। সেলিনা হোসেনের 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' (২০০০) শীর্ষক সংকলনে এটি গ্রথিত হয়েছে। উনিশশ' একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারীধর্ষণের মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এ-গল্প। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শিবিরে বন্দি আমিনা ও মদিনা নামের দুই কিশোরীর বুকফাটা আর্তনাদের মধ্য দিয়ে গোটা বাঙালি জাতির বিপর্যয়-বিপন্নতার ছবি এখানে প্রস্ফুটিত। তাদের পরহেজগার পিতা মুয়াজ্জিন আল-আমিন, যিনি পাকিস্তানের দালালি করেছেন, নিজের কন্যাদের তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন পাকিস্তানি সেনা অফিসারের হাতে, তার অকথিত যন্ত্রণাও এখানে উন্মোচিত। সমাপ্তিতে আমিনা ও মদিনাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসছে বীর মুক্তিযোদ্ধারা--এমন একটি স্বপ্নদৃশ্য গল্পটিকে অভিষিক্ত করেছে পরিণামী সদর্থক চেতনায়। বি. ঘো.

আমি নারী : লীলা মজুমদার রচিত বইটির প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৯৫। প্রকাশক এস. এন. রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড ; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। মূল্য পঞ্চাশ টাকা। ২৬০ পৃষ্ঠার বইটিতে কোন ভূমিকা নেই, লেখকের কথা নেই, প্রকাশকের নিবেদন নেই। এমনকি কোন সূচিপত্রও নেই। সেজন্য বলা যায় বইটি পাঁচজন নারীর পাঁচটি ভিন্নকাহিনী নিয়ে গ্রন্থিত একটি সম্পূর্ণ কাহিনী। কেষ্টদাসী, পাখি, অন্তরা, পঞ্চমীপুরান ও বাঁশের ফুল শিরোনামের পাঁচটি কাহিনীর পাঁচজন নারী কেষ্টদাসী বা কৃষ্ণমণি দেবী, মালা, বিনিপিসি, টুনি, মায়া-র জীবন কাহিনীকে ঘিরে নানা বয়সের আরো বহু নারী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন লীলামজুমদার। পরিবারে, সমাজে, অন্দরমহলে নানা স্বার্থের টানাপোড়েনে নারীর ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে যায়। লেখিকা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন সেই ব্যক্তি নারীকে। নারীর ব্যক্তিত্বের দৃঢ় উন্মীলন ঘটেছে 'আমি নারী' বইটিতে। নারীর চিরায়ত মাতৃত্বের স্বরূপ উদঘাটনেও লেখিকা যত্নশীল হয়েছেন। পড়তে পড়তে মনে হবে এরা বুঝি ব্যতিক্রমী নারী। কিন্তু কাহিনীর শেষে মনে হবে না, এরা আমাদের চারপাশের অতি সাধারণ নারী। লেখিকার দেখার কৃতিত্বে 'আমি নারী' হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী নারীর কাহিনী। লেখিকা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন বেশ কয়েক বছর। তার ছাপ পড়েছে কাহিনীগুলোতে। বইটি উৎসর্গ করেছেন 'বাংলার মেয়েদের।' মা.বে.

আমিনুল ইসলাম : দর্শনশাস্ত্রের লেখক। কুমিল্লা জেলার জামবাড়ি গ্রামে ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আমিজউদ্দিন আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে বি.এ. অনার্স (দর্শন) ও ১৯৬৫ সালে এম.এ. (দর্শন) পাস করেন। 'The Individual and The Absolute : A Reexamination of Some Points in British Idealist Philosophy' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৬৯ সালে স্কটল্যান্ডের সেন্ট এন্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচনা তাঁর এক অসাধারণ কীর্তি। এছাড়া বাঙালির দর্শনচিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাঙালি দার্শনিকদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যা বাংলায় আলোচনা করে এ ভাষার শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন (১৯৭৮), মুসলিম দর্শন (১৯৮৫), আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন (১৯৮০), সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন (১৯৮২) মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, জগৎ জীবন দর্শন (১৯৯২), বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৯৪)। নু.ই

www.pathagar.com

আমি বিজয় দেখেছি : এম আর আখতার মুকুল রচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রথম মুদ্রণ অগ্রহায়ণ : ১৩৯১, চতুর্থ মুদ্রণ : পৌষ ১৩৯১। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : কামাল মাহমুদ, অঙ্গসজ্জা : মুনির খান, আলোকচিত্র : গোলাম মওলা, মোহাম্মদ আলম ও আমিনুল হক। রণাঙ্গনের ম্যাপ : এ্যাডবিজ লিঃ, ঢাকা। ফটোকম্পোজ ও মুদ্রণ : জেনিথ প্যাকেজেস, লিঃ, ঢাকা। মূল্য : একশত টাকা। সাগর পাবিলশার্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটিতে রয়েছে গ্রন্থকারের স্মৃতিচারণসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দী, সত্তরের নির্বাচনী ফলাফল, ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক, বাঙালি হত্যার নীল নকশা, অপারেশন সার্চ লাইট, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ঘোষণা বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ, মুক্তিযুদ্ধের সেকটর, সেকটর কমাণ্ডার ও সামরিক অফিসারের তালিকা, রণাঙ্গনের মানচিত্র, বাংলাদেশ বিমান ও নৌবাহিনীর জন্মকথা, মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ আলোকচিত্র, আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তান যুদ্ধবন্দীদের তালিকা, মুক্তিযুদ্ধে মওলানা ভাষানীর অবদান, মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা, বামপন্থী নেতাদের অভিমত, ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পরিচিতি, মুজিব নগর সরকারের প্যাড ও প্রচারপত্রের নমুনা এবং মুজিব নগর ও রনাঙ্গন থেকে প্রচারিত পত্র-পত্রিকার ফটোচিত্র। এছাড়াও রয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে আহত হয়েছেন ও নরপশু পাকসেনার হাতে সম্ভ্রম হারিয়েছেন, সেইসব মা-বোনদের। **খা.বি.জ.উ.**

আমি বীরাঙ্গনা বলছি : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার যেসব নারী-সদস্য কোনো না কোনোভাবে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে দিনের পর দিন পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সেইসব যুদ্ধাহত কয়েকজনের সত্য কাহিনী নির্ভর জীবন-ইতিহাস 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'। গ্রন্থের লেখক নীলিমা ইব্রাহিম, গ্রন্থটির দুটি খণ্ড, প্রথম খণ্ডে তিন জন ও দ্বিতীয় খণ্ডে চার জন বীরাঙ্গনার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ১৯৭১ সালে অনেক বাঙালি রমণীর জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। যাঁরা যুদ্ধরত অবস্থায় বা বন্দি শিবিরে অবরুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের দেওয়া হয়েছে শহীদের মর্যাদা। আর বিজয়ের পর বন্দি শিবিরের নারকীয় পরিবেশ থেকে যাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের দেওয়া হয়েছে বীরাঙ্গনা উপাধি। বলা বাহুল্য এসব বীরাঙ্গনার কেউই আর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নি। 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' তাদের সেই মর্মন্তুদ বেদনা বিধুর সত্য কাহিনী। গ্রন্থটির পরিকল্পনা অত্যন্ত অভিনব। এই গ্রন্থ রচনার পটভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে নীলিমা ইব্রাহিম লিখেছেন—'১৯৭২ সালে যুদ্ধ জয়ের পর যখন পাকিস্তানী বন্দিরা ভারতের উদ্দেশ্যে এ ভূখণ্ড ত্যাগ করে তখন আমি জানতে পারি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ধর্ষিতা নারী এ বন্দিদের সঙ্গে দেশ ত্যাগ করছেন। অবিলম্বে আমি ভারতীয় দূতাবাসের সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার অশোক ডোরা এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত মরহুম নূরুল মোমেন খান যাঁকে আমরা মিহির নামে জানতাম তাদের শরণাপন্ন হই। উভয়েই একান্ত সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এসব মেয়েদের সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ আমাদের করে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নওসাবা শরাফী, ড. শরীফা খাতুন ও আমি সেনানিবাসে যাই এবং মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করি। পরে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে নারকীয় বর্বরতার কাহিনী জানতে

www.pathagar.com

পারি। সেই থেকে বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মে।' গ্রন্থভুক্ত সাত জন বীরাঙ্গনা তারা ব্যানার্জি, মেহেরজান, রীনা, শেফা, ময়না, ফাতেমা, মীনা শুধুমাত্র সাত জনেই সীমাবদ্ধ নয়, লেখকের নিপুণ রচনাশৈলীর কারণে তাঁরা বিস্ময়কর ভাবে হয়ে উঠেছেন ত্রিশ লক্ষ আত্মত্যাগী বাঙালি ও মৃত্যুঞ্জয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি। বীরাঙ্গনাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামগ্রিক সত্তা-স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন। কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়ে নি, প্রাক-স্বাধীনতা আমলের প্রসঙ্গ থেকে স্বাধীনোত্তর নানা ঘটনা, বঙ্গবন্ধুর মহিমাময় ভূমিকা, হানাদার বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরসহ তাদের দোসরদের অমানবিক কীর্তিকলাপ, এমনকি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান স্থপতি স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক হত্যার ঘটনাও আলোচিত হয়েছে। প্রাঞ্জল ও সরস বর্ণনা স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ উপস্থাপনায় প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব এবং স্বাধীনোত্তর কালের জটিল ও তিক্ত-গ্লানিকর রূঢ় বাস্তবতা যেন ছবি হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পড়তে পড়তে মনে হয় গ্রন্থকার কেবল কাহিনী বর্ণনা করছেন না, একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করছেন। বীরাঙ্গনার কণ্ঠে উচ্চারিত সত্য ভাষণে স্বদেশকে জানা ও চেনা এবং ভবিষ্যৎকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার প্রচ্ছন্ন অঙ্গিকার 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ ও বাস্তবতা উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে এটি একটি অপরিসীম মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক জাগৃতি প্রকাশনী, ১০/বি সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ডিসেম্বর ১৯৯৪ ও দ্বিতীয় খণ্ড ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদ এঁকেছেন সিতারা ইব্রাহিম আহসান উল্লাহ, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম খান। উভয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যাই ৮০ এবং মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **সু.ব.**

আমি বেঁচেছিলাম অন্যদের সময়ে—হুমায়ুন আজাদ : প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৬/ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, প্রকাশক : নন্দন প্রকাশন, ৪৭ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। হুমায়ুন আজাদের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে'। কবিতায় হুমায়ুন আজাদ সবসময় বহির্মুখী। প্রতিবেশ তাকে আক্রান্ত করে। আচমিত হন তিনি সামাজিক বায়ভারে। তিনি কৌলিন্যের--তবে তা বোধের। মৌলিকে লিখেছেন তিনি 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে'। তবে তিনি যা চেয়েছেন তা কখনো পাননি--হননি। 'এখনো আমার সময় আসেনি/আমি যে পৃথিবীকে চেয়েছিলাম, তাকে আমি পাইনি/ তখনো আমার সময় আসেনি। এখনো আমার সময় আসে নি/অমি বেঁচে ছিলাম/ অন্যদের সময়ে।' এ কাব্যে সময়কে তিনি ছুঁয়েছেন তীক্ষ্ণ রুক্ষতায়। সামাজিক অসঙ্গতিকে তুলে এনেছেন তীব্র কটাক্ষে। 'টেলিভিশনে/এখন আমাদের দারিদ্রকে/কী সুন্দর, রঙিন, আর মনোরম দেখায়।' তেমনি 'পার্টিতে' চুপকরে খাবার সময়, তৃতীয় বিশ্বের একজন চাষীর প্রশ্ন, গোলামের গর্ভধারিণী ইত্যাদি কবিতায় শ্লেষ হয়ে উঠেছে প্রধান। কথা দিয়েছিলাম তোমাকে, তরুণী সন্ত, যে তুমি ফোটাও ফুল, যদি একবার তাকাও, পর্বত, শিশু ও যুবতীসহ কয়েকটি কবিতা একাব্যে চমৎকার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। **মা. জা.**

আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি : বিপ্রদাশ বড়ুয়া। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১০টি গল্পের সংকলন। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরের মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা নিয়ে লেখা গল্প। ছয়টি যুদ্ধের সময়ের ও ৪টি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে লেখা। প্রথম গল্প 'আশ্রয়' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিহারী স্বামী-স্ত্রী জটিল অবস্থায় শেষ পর্যন্ত বুঝতে

পারল যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। একাত্তরের মার্চে তাদের যে বাঙালি পরিবার আশ্রয় দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আবার আশ্রয় চাইল ভারতের বিহার রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার আত্মোপলব্ধিতে। 'মেয়েটি' গল্পে এক তরুণী নারীর যুদ্ধে যাওয়া ও পিতাকে যুদ্ধ চলাকালে দেখতে আসার কাহিনী। প্রকাশক মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা ১১০০। প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১১০, মূল্য ৬০.০০ টাকা। জ্ঞা.ব.

আমির খুসরু : তুর্কির বিখ্যাত লাকিন গোত্রের নেতা পিতা সয়ফউদ্দীন মুহম্মদ তুর্কিস্থানের কিশ নামক নগরের অধিবাসী ও গোত্রপতি ছিলেন। চেঙ্গীস খাঁর অভ্যুদয়ের পর তিনি ভারতে চলে আসেন। যোগ্যতাবলে সয়ফউদ্দীন ভারতের তৎকালীন রাজসভায় উচ্চপদ লাভ করেন। আমির খুসরু রাজপুত রমনীর গর্ভে ভারতের পাতিয়ালায় জন্ম গ্রহণ করেন। কবি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বুলবন। আমির খুসরু তাঁর 'গোরবাতন-কামেল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সম্রাটের অন্যতম গুণগ্রাহী পারিষদ কতলু খাঁর দরবারভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন ও তাঁর প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। কতলুখাঁর দরবারে আমির খুসরু বহু কাসিদা রচনা করেন। ৬৮৭ হিজরি সালে লক্ষণাবতীতে (তৎকালীন বাংলা) তোগ্রাখাঁ বিদ্রোহী হলে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বুলবন স্বয়ং অভিযান চালিয়ে তাঁকে দমন করেন। এই অভিযানে আমির খুসরু সম্রাটের সঙ্গী ছিলেন। তৎকালীন সুলতানের শাসনকর্তা সুলতান মুহম্মদ তিমুরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে কবি আমির খুসরু ও হাসান দেহলভী তাতারদের দ্বারা বন্দী হয়ে বলকে নীত হন। পরে কবি মুক্তি পেয়ে ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর রচিত মর্সিয়া বাদশাহর পারিষদদের মুগ্ধ করে। গিয়াসুদ্দীন বুলবনের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র কায়কোবাদের রাজত্বকালে আমির খুসরু 'কোরআন-ই-সায়াদান গ্রন্থ' রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ 'মোজায়েমুল ফতুয়া', 'লায়লামজনু' 'সপ্তরেহেস,' 'নওসপহর', 'তোগলক নামা' ইত্যাদি। আমির খুসরু নেজামউদ্দীন আউলিয়া কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তাঁর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আমির খুসরু গিয়াসউদ্দীন বুলবন থেকে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক অবধি সব সম্রাটেরই সভাকবি ছিলেন। আমীর খুসরুই ভারতের প্রথম ফারসি কবি, হিন্দি-ফারসি মিশ্র-ভাষায়ও তিনি বয়েত বা চুটকী কবিতা রচনা করেছিলেন। সু.গ.

আমি সেই ইলেক্ট্রা : সিকদার আমিনুল হকের কবিতাগ্রন্থ। কবি, কবিতা, কবির আমিত্ব, কবির যন্ত্রণা, কবিতার সংকট, কবির অহঙ্কার, কবির দ্রোহ ও কবিতার বিচিত্র প্রসঙ্গই এই গ্রন্থের উপজীব্য। ৪৬টি কবিতার অধিকাংশে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কবি ও কবিতার, যন্ত্রণা ও আনন্দের সম্পর্ক ; কবি ও তার জীবিকার সংকট ; কবিতার দার্শনিকতা, মাহাত্ম্য ও অহঙ্কার। নারী, যৌবন, আভিজাত্য, বনেদি সমাজ, প্রতিষ্ঠা—তার চেয়েও মহৎ কবিতা ; শুভ-সম্ভাবনা যখন ক্ষীণ তখন কবিকে বাঁচায় কবিতা ; 'প্রত্যহের রুঢ় চারপাশে' কবি দর্শক ; কল্লোল-উত্তর কবিতায় সোনার ফসল ফলে না ; কবিতা লিখে রাখে মানুষের অন্তরঙ্গ ইতিহাস ; 'কবিতার ডানাই আকাশ'—এসবই গ্রন্থের মূল বিষয়। শুধু কবি ও কবিতা বিষয়ক নামকরণে রচিত হয়েছে অনেকগুলো কবিতা। যেমন : 'আমি ও আমার কবিতা', 'কবি', 'কবি জীবনের দিকে', 'আমার হয় নি কবিতার জন্যে', 'আমার ও সন্ধ্যার শ্লোক', 'আমি সেই ইলেক্ট্রা', 'তরুণ কবিতার পক্ষে', 'উপমার দিকে', 'বিষ্ণু দে : এক লাল কমলের স্মৃতি', 'কবি যে-ভাবে রাখে', 'কবিতা-সভার প্রতি', 'উত্তর তিরিশের অন্ধকারে', 'অভিজ্ঞতা ও আত্মস্মৃতির লাবণ্য রাশি'। এছাড়া ব্যক্তি

www.pathagar.com

মানুষের অধিক বয়সের পরিণাম, রাজপথের হতাশা, নারীকে নিরাসক্ত অবলোকন, মানবপ্রীতি, মৃত্যুচিন্তা প্রভৃতিও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রায় সব কবিতাই সফলতার চূড়া স্পর্শ করেছে। এ গ্রন্থে কবিতা বাছাই করা কষ্টকর, সব কবিতাই উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবীব। প্রচ্ছদ ব্যবহৃত কবি প্রতিকৃতি : শামসুল ইসলাম আলমাজী। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। প্রকাশক : লুৎফুল আরেফিন, কবিকণ্ঠ প্রকাশনী। মো. আ. মি.

আমি হাঁটছি : অসীম রায়। অত্যন্ত জীবন-ঘনিষ্ঠ এই কাব্যগ্রন্থে রূঢ় বাস্তবের খণ্ড চিত্রাবলী সযত্নে শব্দের মালায় গেঁথে তুলেছেন কবি। দেশ, দেশের মানুষ, তাদের রাজনীতি, বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা আর একই সঙ্গে প্রেম, বেদনা, স্মৃতি ও স্বপ্নের ভেতরে তার উত্থান। পঞ্চাশের দশকের এই কবি তাঁর পূর্বসূরী তিরিশের কবিদের জীবনবোধ ও কাব্যাদর্শে অনেকখানিই অনুপ্রাণিত। তবে তিনি জানেন, 'শিল্পে তো একমাত্র সান্ত্বনা। স্বপ্নই স্বপ্ন ডেকে আনা।' তিনি স্বপ্নের কথা বলেন, বলেন শত প্রতিকূলতার ভেতর জেগে ওঠার স্বপ্নের কথা, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের কথা। কথাই তাঁর স্বপ্ন। '...অন্তর-আলোকে ওঠো উদ্ভাসিত হয়ে,/কথা বলো, যতক্ষণ কথা আছে দু-নয়ন ছেয়ে।' আর বলেছেন, 'দেখেছি কয়লার গাদায় ভোরের অপরাজিতা।' এই দৃষ্টির ভেতরই তাঁর জয় চিহ্নিত। ১৯৫০-১৯৭১ সাল সময় পরিসরে লেখা কবি অসীম রায়ের সর্বমোট ৭১টি কবিতা সূচিভুক্ত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে। মো.শা.

আমীর হামজা : যুদ্ধবিগ্রহমূলক কাহিনীকাব্য। হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজাকে নায়ক করে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিকভাবে এ বৃহৎ কাব্যখানি রচিত হয়েছে। এর কাহিনী ভাগ এমন—আমীর হাজমা ইসলাম প্রচারের জন্য পারস্যে প্রেরিত হন। পারস্য-রাজ নওশেওয়াঁ স্বীয় উজীর বক্তাক ও জপিনের কুপরামর্শে চালিত হয়ে আমীর হামজাকে বিষ-নজরে দেখতে থাকেন এবং তাঁকে নানাবিধ বিপদে পতিত করতে চেষ্টিত হন। হামজা নওশেওয়াঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হন। নওশেওয়াঁ পরাজিত হয়ে বিভিন্ন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন এবং বারবার হামজা কর্তৃক পরাজিত হন। ওদিকে নওশেওয়াঁর কন্যা মেহের নেগার হামজার রূপে, গুণে ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হন। হামজাও রাজকুমারীকে ভালবাসেন। তিনি কৌশলে রাজপুরী থেকে মেহের নেগারকে উদ্ধার করে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। নওশেওয়াঁর আশ্রয়দাতা নরপতিগণ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ক্রমশ আমীর হামজার দল বৃদ্ধি করতে থাকেন। নওশেওয়াঁও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। হামজা পরিশেষে হিন্দীয়া নাম্নী এক রমনীর হাতে নিহত হন। এ আখ্যানের আমীর হামজার সাথে হযরত মুহম্মদের পিতৃব্য হামজার সম্পর্ক নামসারমাত্র। ঐতিহাসিক হামজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর একটি মাত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ হামজা দিগ্বিজয়ী ও রূপকথার নায়ক। এ আখ্যানের প্রথম কবি আবদুল নবী। তাঁর পুঁথিটি আশিটি পর্বে বিভক্ত এক বিরাট গ্রন্থ। রচনাকাল ১৬৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয় কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা। তাঁরা উভয়ে আঠার শতকের কবি। গরীবুল্লাহ 'দস্তান্-ই-আমীর হামযা' নামক ফার্সি কাব্য অবলম্বনে 'আমীর হামজা' রচনা শুরু করেন। কাব্যের প্রথম অর্ধাংশ (১২৮ পৃ.) রচনার পর তিনি পরলোক গমন করেন। বাকি অর্ধাংশ (১২৪ পৃ.) পরে সৈয়দ হামজা রচনা করে এ কাব্যের সমাপ্তি দান করেন (১২০১ বা. সন)। তাঁর অংশও ফার্সি কাব্য অবলম্বনে রচিত। উভয় কবিই দোভাষী রীতিতে এ কাব্য রচনা করেছেন। পুথিখানি বটতলার সুবাদে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রাম-

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমান সমাজে পুঁথিখানি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। আ.জ.

আযান : ইসলাম ধর্মে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজের জন্য মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিন আযান দেন, যার অর্থ নামাজের জন্য আহ্বান করা। আযান দানকারীদের মধ্যে হযরত বেলাল (রাঃ) নবী করিম (সঃ)-এর সময়ে তাঁর খুব প্রিয় ছিলেন। আযান স্বভাবত নামাজের পনরো মিনিট আগে দেয়া হয়ে থাকে মসজিদের ছাদ হতে, দরজা হতে বা বিশেষভাবে সুউচ্চ মসজিদের মিনার হতে ; তবে আজকাল মাইক্রোফোন ব্যবহারের জন্য মুয়াজ্জিন মসজিদের ভিতর থেকে আযান দেন, কিন্তু লাউড স্পিকার ছাদে বা মিনারে স্থাপিত থাকে। আযানে আল্লাহু আকবার ৪ বার, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২ বার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ ২ বার, হাই আলাছ্ ছালাহ্ ২ বার, হাই আলাল্ ফালাহ্ ২ বার, পুনরায় আল্লাহু আকবার ২ বার, এবং পরিশেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার উচ্চারিত হয়। তবে ভোরে ফজরের নামাজের আযানে হাই আলাল ফালাহর পরে আছ ছালাতু খায়েরুম মিনান্নাউম ২ বার বলা হয়। আবার ঠিক ফরজ নামাজের পূর্বে ইমামের পিছে দাঁড়ানো মুয়াজ্জিন পুনরায় আযান দেন, যাকে আকামত বলা হয়। আকামতে হাই আলাল ফালাহ্ এর পরে কাদকা মাতিছ্ ছালাহ্ বলা হয় ২ বার। আ. সৈ. গো. দ.

আম্বিয়াবাণী : হায়াত (হেয়াত) মামুদ রচিত পয়গম্বর বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ। রচনা কাল ১৭৫৭ সাল। কোরান-হাদিস ও আরবি-ফার্সি নবীবিষয়ক গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে কবি এ কাব্য রচনা করেছেন। এর প্রথমাংশে সৃষ্টিপত্তন, মধ্যাংশে আদম, শীশ, নুহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, মুসা, ঈসা প্রমুখ পয়গম্বরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে এবং শেষাংশে হজরত মুহম্মদের (সঃ)-এর জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি ড. মযহারুল ইসলাম সম্পাদনা করে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'হেয়াত মামুদ' (১৯৬১)-এর পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করেছেন। আ. জ.

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ : রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে। উৎসর্গ করেছেন কবি সুফিয়া কালামকে। বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ২০টি প্রবন্ধ ১৬ বছর ধরে তৈরি করতে পেরেছেন লেখক। তিনি বইটির শুরুতে 'বইটি সম্বন্ধে দু'একটি কথা' প্রসঙ্গে লিখেছেন 'এই বইটিতে সংকলিত দুয়েকটি ছাড়া সব ক'টিই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রধানত বাংলা ও অন্যান্য বিভিন্ন ভাষার স্বদেশ ও বিশ্ব বিপ্লবী সাহিত্যের চিন্তা, সৃষ্টি, কাজ, সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়ে রচিত। লেখক বহুকে ও বিচিত্রকে তাদের প্রগতির নির্দিষ্ট অভিমুখিতার সাধারণ লক্ষ্যে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন মার্কসীয় সংযোগ সূত্রের মুক্তধারায়।' বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়, পাবলো নেরুদা, গিওনী লুকাচ, শলোকভয়ের সাহিত্য-কাব্য আলোচনা পাঠকের ভাবনা-চিন্তাকে প্রসারিত করবে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন সেন, সোমেন চন্দ মুনীর চৌধুরী ও শহীদুল্লাহ কায়সারের সাহিত্য আলোচনার মধ্যদিয়ে লেখক রণেশ দাশগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের পাঠকের জন্য নতুন দিক নির্দেশনা ও ভাবনার জগৎকে প্রসারিত করেছেন। বইটি দুষ্প্রাপ্য। নতুন সংস্করণ প্রকাশের দাবি রাখে। মা. বে.

আয়না : আবুল মনসুর আহমদের গল্পের বই আয়না। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা, ১৯৩৫। বইটিতে মোট সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলো হাস্যরসাত্মক। বইয়ের সূচনায় 'আয়নার ফ্রেম' নামে কাজী নজরুল ইসলামের

www.pathagar.com

একটি ভূমিকা রয়েছে। বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে নজরুল ইসলাম সেখানে লিখেছিলেন : "যে-সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ-মূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোশ-পরা এই বহুরূপী বনমানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলিটিক্সের আখড়ায়, সাহিত্য-সমাজে যেন বহুবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।" গল্পগুলোর নাম যথাক্রমে : হুযুর-কেবলা, গো-দেওতা-কা দেশ, নায়েবে নবী, লীডরে-কওম, মুজাহেদীন, বিদ্রোহী সংঘ, ধর্মরাজ্য। এগুলোর মধ্যে 'বিদ্রোহী সংঘ' গল্পটি ছাড়া বাকি সবগুলো গল্পেই ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ী কয়েকটি চরিত্রকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে জর্জারিত করা হয়েছে। প্রথম গল্পে কোনো এক পীর সাহেবের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করা হয়। দ্বিতীয় গল্পে ব্যঙ্গ করা হয় হিন্দু আর্যসমাজীদের। তৃতীয় গল্পের বিষয়বস্তু স্বার্থান্বেষী দুই মোল্লার দ্বন্দ্ব। চতুর্থ গল্পের মূল চরিত্র এমন একজন ধর্মব্যবসায়ী, যে জীবিকা ও রাজনীতিতে সুকৌশলে ধর্মকে ব্যবহার করে। পঞ্চম গল্পে পরিবেশিত হয়েছে মোহাম্মদী ও হানাফি মজহাবের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, অথচ অর্থহীন এক বাহাস। সপ্তম গল্পে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতাকে কটাক্ষ করা হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের লক্ষ্য কিছুটা ভিন্নতর। গল্পটিতে এমন একটি গোষ্ঠীকে সমালোচনা করা হয়েছে, যাঁরা আত্মিক স্বাধীনতার কথা বললেও দেশের স্বাধীনতা নিয়ে ভাবেন না। কিছু কিছু অনুষঙ্গে মনে হয়, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর এ গল্পটি লেখার সময়ে হয়তো ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কর্মীদের কথা ভেবেছিলেন। **স্ব. স.**

আয়না : লেখক মালয়ালাম ভাষার পি. কেশবদেব। বাংলায় অনুবাদ করেছেন চন্দনা দত্ত। আয়না কেরালার কৃষক আন্দোলনের কাহিনী। এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের ঘটনার পটভূমিতে লেখক তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি রচনা করেন। তিনি অকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের জন্য। আয়না উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক পরিচিতি আছে। তিনি ২৫টি উপন্যাস, ১৫টি গল্পসংগ্রহ, ১১টি নাটক, ৭টি একাঙ্কিকা, ৪ খণ্ডে আত্মজীবনী, একটি প্রবন্ধ-সমালোচনা রচনা করেছেন। শুধু কবিতাই তিনি লেখন নি। মালয়ালাম ভাষায় তিনি সর্বহারাদের প্রথম লেখক হিসাবে পরিচিত। জন্ম ১৯০৪। কেশবদেব বলেছেন 'আয়না' এক স্মৃতিচারণ। চরিত্রদের মধ্যে 'হবা'ই তার প্রতিভূ। এই লেখা অকরনীয় পাঠকবৃন্দকে কেরালার সমাজ-জীবনের ইতিহাসের একটা বিশেষ কালের সঙ্গে পরিচিত হতে প্রভূত সাহায্য করে। আয়নার প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি। পৃষ্ঠা : ১৫৯, প্রকাশকাল : ১৯৭৯, মূল্য : ৯.২৫ রুপি। **বি. ব.**

আয়াত : অর্থ নিদর্শন। আল্লাহর নিদর্শন। পবিত্র কোরান সকল বিশ্বাসী মুসলমানের মতে আল্লাহর বাণী যা নবুওত প্রাপ্তির পর থেকে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর হৃদয়ে ফেরেস্তা জীবরাইল (আঃ) কর্তৃক আল্লাহ হতে ওহী হিসেবে নাযিল হতে থাকে তেইশ বছর ধরে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনি (রাঃ) এর সময়ে তা পূর্ণভাবে সংকলিত হয়। পবিত্র কোরানে ১১৪টি ছোট ও বড় সূরা বা পরিচ্ছেদ আছে এবং ৬৬৬৬টি ছোট ও বড় আয়াত আছে। এই সকল আয়াতে আল্লাহর একক সত্তা, তাঁর গৌরব, মহিমা, সর্বময় ক্ষমতা, জ্ঞান, শক্তি এবং সকল প্রাণী ও মানুষের স্রষ্টা প্রতিপালক ও আহারদাতা হিসেবে দয়া, ক্ষমা, প্রেম, সৃজনশীলতা ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের বর্ণনা, ব্যঞ্জনা, কাহিনী, সতর্কীকরণ ও উপদেশ আছে। গদ্য কবিতার

www.pathagar.com

মত ও তৎকালীন আরবি কবিতার মত এ সকল আয়াত শ্রুতিমধুর এবং তেলাওয়াত-কালে তাল ও ছন্দময় মনে হয়। পবিত্র কোরানে উল্লেখ আছে, "নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কোরান, যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ" (৫৬ : ৭৭-৮০)। আ. সৈ. গো. দ.

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) : নবী করিম মোহাম্মদ (দঃ)-এর সহধর্মিনী। তিনি হিজরী ৬১৩ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৬৭৮ সালে ইন্তেকাল করেন। নবী-পত্নীগণের মধ্যে তিনি একমাত্র কুমারী ছিলেন। খাদিজা (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর নবী করিমের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ছয়/সাত বছর। আয়েশা (রাঃ) ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর কন্যা। তিনি পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী, মহৎ, কর্মশীলা ও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর আঠারো বছর বয়সের সময় নবী করিম (দঃ)-এর ওফাত হয়। হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে, সাহাবা তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ) আলীর খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আয়েশা (রাঃ) সে বিদ্রোহে যোগদান করেন। যুদ্ধে তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ) নিহত হন। আয়েশা (রাঃ) সেই যুদ্ধে উটের উপরে আসীন ছিলেন। প্রতিপক্ষ তাঁর সামনে এসে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। এই যুদ্ধকে উটের যুদ্ধ বলা হয়। আয়েশা (রাঃ) কে বন্দী করা হলেও পরে তাঁকে মদিনা শরীফে স্বাধীন জীবনযাপন করতে দেয়া হয়। ধর্ম বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল এবং উদ্ভূত সামাজিক সমস্যাবলিতে তিনি কুরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে মতামত দান করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ করা হয়। নবী পত্নী হওয়াতে তাঁর উপাধি ছিল "উম্মুল মোমেনীন"। আ. সৈ. গো. দ.

আর্তনাদে বিবর্ণ : মযহারুল ইসলামের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন। প্রকাশ কাল : ঢাকা, এপ্রিল ১৯৭০। গ্রন্থটিতে কবিতার সংখ্যা ৩৮। 'আর্তনাদে বিবর্ণ' গ্রন্থের কবিতাগুলো ষাটের দশকের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত।গোটা ষাটের দশক জুড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী এই দেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার হরণের খেলায় মেতে উঠেছিল। তাদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। ফলে এই দেশের অনেক শিল্পী সাহিত্যিককেই নানা রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও রূপকের আশ্রয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে দেখা গেছে। মযহারুল ইসলামের 'আর্তনাদে বিবর্ণ' গ্রন্থটি সেই দুঃসময়ের কাব্যিক দলিল। এই গ্রন্থে তিনি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের চরিত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আর্তনাদে বিবর্ণ' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা সমকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও স্বৈর শাসকদের চরিত্র নিয়ে রচিত হলেও কোনো কোনো কবিতার আবেদন সমকালকে অতিক্রম করে শিল্প সফলতা পেয়েছে। সা. আ.

আর এক জীবন : মকবুলা মনজুর। উপন্যাস। প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলা বাজার, ঢাকা-১। প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৬৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৩। মূল্য : পাঁচ টাকা। 'আর এক জীবন' প্রেম ভালোবাসা আর স্নেহ-মমতায় ভরা লায়লা ও খালেদের জীবন কাহিনী। সাদামাটা হলেও আজ থেকে ৩৪ বছর আগে লেখা এই উপন্যাসটির শুরুটা বেশ চমৎকার। যেমন : শীতের মনমরা বিকেল। শান্তিনগর বাস স্টপ। বেদী বাঁধানো চৌমাথায় নিশানা। লাইট পোস্টটা অকর্মণ্য দাঁড়িয়ে।

www.pathagar.com

এখনও সন্ধ্যা নামেনি। ওর কাজও শুরু হয়নি তাই।...লালপাড় শালখানা ভালো করে জড়িয়ে নিলো লায়লা। বাস এসেছে মতিঝিলের চওড়া পথের বুক ভেঙে। ব্যাগে হাত রাখলো লায়লা। চার আনা আছে। যাওয়া-আসার ভাড়া দিয়ে অবশিষ্ট থাকবে এক আনা। উপন্যাসের এই অংশটুকু পড়ে জানা গেলো ষাটের দশকে চার আনা নিয়ে একজন মহিলা অনায়াসে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াতে পারতেন। উপন্যাসের বিষয়টি অবশ্য লায়লা খালেদ ও শওকতের জীবনের ঘটনা। যা ব্যর্থতা আর পাওয়ার আনন্দে পূর্ণতা পেয়েছে। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে এই পরম প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। বেঁচে থাকার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। গ্রন্থটির সহজ-সরল বর্ণনা ও কাহিনী নির্মাণ সুন্দর। খা. বি.জ.উ.

আর কতদিন : জহির রায়হান। বইটি প্রকাশ করেছে সন্ধানী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৭০। যুদ্ধকালীন বাস্তবতা, লাঞ্ছিত মানবতার আর্তি ও শান্তির সপক্ষে জোরালো আবেদন নিয়ে লেখা উপন্যাস। কাহিনী সংঘটনের বিস্তারিত বর্ণনা এতে নেই, কাহিনী শুরুর কোনো স্থান কালও নির্দেশিত নেই। তবে গ্রন্থটির প্রকাশকাল এবং ঘটনাবিন্যাসের আলোকে সহজেই অনুমেয়, মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সময়ের অস্থির সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনমুখর প্রেক্ষাপটে আসন্ন যুদ্ধের একটি ভয়াবহ সম্ভাবনা লেখকের মনে ছায়াপাত করেছিল। আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মর্মন্তুদ বাস্তবতাও এ কাহিনীতে স্পষ্ট। একটি নোংরা অন্ধকার ঘরে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে, যুবক-যুবতী, শিশু ও সন্তানসম্ভবা মাসহ উনিশজন ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের বন্দীদশা। তারা উন্মত্ত প্রতিপক্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্য এ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। একটি সদাশয় পরিবারের কর্তা ও তাঁর স্ত্রী 'বুড়ি মা' শঙ্কিত মানুষগুলোকে নিজেদের বাড়ির সিলিংয়ের দোতলায় আশ্রয় দেন। এ দম্পতির ছেলে তপু এদেরই মতো অনিশ্চিত কোনো অবস্থানে আছে। অনেক মৃত্যু, ধ্বংস, রক্তের মধ্যেও ঘাতকের তীব্র তাড়া খেয়ে বহু জায়গায় পালিয়ে পালিয়ে প্রিয়সঙ্গী ইভাকে নিয়ে ফিরে এসেছে নিজ পরিজনদের মধ্যে। ইভার কোলে অচেনা মৃত মায়ের সদ্যোজাত সন্তান। ইভা আর তপু শাশ্বত শান্ত আর ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। তারা যে কোনো মূল্যে পৃথিবীর শান্তি ও মানবতাকে রক্ষা করতে চায়। তারা পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের সকল হত্যা, মৃত্যু ও নির্মমতার বিরুদ্ধ শক্তি। কিন্তু বহু কষ্টে বাড়ি ফিরতে সক্ষম তপু আর ইভা শান্তির বদলে তপুর বাবা-মা, বোন, ভাইদের দেখে হত্যাকারীর ভূমিকায়। প্রতিহিংসা তাদের চেনা মুখে রক্তপিপাসু রাক্ষসে আদল এনে দিয়েছে। তপু আর ইভা এই ঘাতকদের হাত থেকে বাঁচতে শিশুটিসহ আবার পালাতে থাকে নিরুদ্দেশের পথে। শান্তি ও ভালবাসার জন্য মানুষের এই চিরন্তন অন্বেষা উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনাম, জেরুজালেম, সাইপ্রাস, হিরোশিমা, আফ্রিকা—কোনো ভূখণ্ডই আলাদা নয়। মৃত্যুময় যে কোনো রক্তাক্ত জনপদেই লাঞ্ছিত মানবতা আর্তনাদ করছে মুক্তির অন্বেষায়। এ উপন্যাসের ভাষা এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। টুকরো টুকরো তাৎপর্যময় বাক্যে সমগ্র কাহিনীর ব্যতিক্রমী বুনন এক অসাধারণ শিল্পশৈলীয় স্মারক। র. আ. ক.

আর. কে. নারায়ণ : খ্যাতিমান ভারতীয় ঔপন্যাসিক। তাঁর পুরোনাম রাসিপুরম কৃষ্ণ স্বামী নারায়ণ। তিনি ১৯০৬ সালে মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সরকারি শিক্ষা বিভাগে চাকুরি করতেন। পিতার বদলির চাকুরির কারণে শৈশব থেকে নারায়ণ দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাবার চাকুরি স্থল মহীশুরে মহারাজারস কলেজিয়েট হাইস্কুলে ভর্তি হন। তার পরে এই কলেজ থেকে তিনি গ্রাজুয়েট হন। ১৯৩০ সালে শিক্ষা জীবন শেষ করে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন। দুই বছর চাকুরি করার পর তিনি স্থির করলেন যে, পেশাদার লেখক হবেন। তাই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে লেখক হিসেবে তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু করেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ১ম বই Swami And Friends। এর পরে একে একে প্রকাশিত হতে থাকে : 'The Bachelor of Arts', 'The Dark Room', 'The English Teacher', 'Mr Sampath the Printer of Malgudi', 'Waiting for the Mahatma', 'The Guide', 'The Man-Eater of Malgudi', 'The Vendor of Sweets', 'The Painter of Signs'. এছাড়াও আছে ছোট গল্পের সংকলন, 'A Horse and Two Goats', 'An Astrologer's Day', 'Lawley Road', Malgudi Days', নিবন্ধ সংকলন : 'Next Saturday', Reluctant Guru' ; ভ্রমণ কাহিনী, My Dateless Diary', স্মৃতিচারণ : 'A Writer's Nightmare', 'My Days'। এইসব গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যায় যে নারায়ণ ইংরেজি ভাষায় লিখতেন। সমালোচকের মতে : 'ইংরেজি ভাষায় সহজ ভারতীয়ত্ব ফুটিয়ে তুলতে নারায়ণ যতটা সফল, তাঁর জন্য তাঁকে অবশ্যই ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের একজন দিকপাল বলতে হয়।' নারায়ণ তাঁর উপন্যাসে একটি কল্পশহরের সৃষ্টি করেছেন, যার নাম মালগুডি। এই মালগুডি তাঁর উপন্যাসে বারে বারে ফিরে আসে। তিনি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে নিজের মতো করে উপস্থাপন করেছেন। পুরাণের দেবতা, দৈত্য-দানব এবং অন্যান্য চরিত্র তাঁর মতো করে সৃষ্টি করেছেন। এইসব চরিত্রের দেখা মেলে আধুনিক মালগুডিতেও, যারা Man Eatar হিসেবে ফিরে আসে। তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে এবং এ তালিকা বেশ দীর্ঘ। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Royal Society of Literature ও American Academy and Institute of Arts and Letter's। তিনি ২০০১ সালের ১৩ মে মৃত্যুবরণ করেন। সে. হো.

আরজ আলী মাতুব্বর : সাহিত্যিক, দার্শনিক। তিনি ১৩০৭ সনের ৭ পৌষ বরিশাল জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। আর্থিক অনটনের কারণে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাঁর শিক্ষার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে গ্রামের জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে স্থানীয় মক্তবে ভর্তি করে দেন। কিন্তু দেড় বছরের মাথায় তাঁর পড়াশুনার পাট চুকে যায়। মক্তবে যেটুকু শিখেছিলেন, সে শিক্ষাকে অবলম্বন করে তিনি নিজ উদ্যোগে পড়াশুনা চালিয়ে যান। তিনি একজন স্ব-শিক্ষিত প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী, সংস্কারমুক্ত এবং বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তিনি কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯৩৬-৪০ সালের মধ্যে তাঁর লেখালেখির সূচনা। পরবর্তী সময়ে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেন। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিলো অপরিসীম। তিনি আত্মজীবনী সহ উপরোক্ত বিষয়ে মোট ১৮টি পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রশ্ন করা। তিনি অজস্র প্রশ্ন করেছেন। বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে যে নানামুখী গোঁড়ামি সমাজকে গ্রাস করে আছে তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রশ্ন। এই প্রশ্ন সমাজের প্রতিটি মানুষকে ভাবায় এবং প্রশ্নগুলোর এমন যথার্থ যে যে কোনো মানুষই প্রশ্নকারীর দিকে গভীর শ্রদ্ধায় এবং বিনম্র দৃষ্টিতে তাকাতে বাধ্য হয়। তিনি পাঠাগার স্থাপন করেছেন মুক্তবুদ্ধির চর্চার জন্য। তিনি জ্ঞানের শিখা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মৃত্যুর পর তাঁর শরীর ও চোখ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দান করে গেছেন। তিনি একজন অগ্রগামী চিন্তার মানুষ ছিলেন। সমাজের পথ রুদ্ধকারী বিষয়গুলোকে শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্রতী হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁকে নিগৃহীত হতে হয়েছিলো মৌলবাদী মহলের কাছ থেকে। আর পাকিস্তানি আমলে তাঁর উপর জারি হয়েছিল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং ঘোষিত

www.pathagar.com

হয়েছিলো মত প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হাসনাত আব্দুল হাই তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন উপন্যাস "একজন আরজ আলী"। তিনি ১৩৯২ সনের ১ চৈত্র মৃত্যুবরণ করেন। সে. হো.

আরণ্যক : বেদ। হচ্ছে কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলো অর্থগর্ভ শ্লোকের সমষ্টি। এই শ্লোককে বলা হয় মন্ত্র। শ্লোক সম্বলিত এক একটি সম্পূর্ণ কবিতাকে বলা হয় সূক্ত (সু+উক্ত)। অতএব ঋক্ বেদ সূক্তের সংকলন গ্রন্থ। ঋগ্বেদের গীতগুলোর আলাদা সংকলনের নাম 'সামবেদ' এবং যজ্ঞবিষয়ক সংকলনের নাম 'যুজর্বেদ'। বেদ শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ বলে এর অপর নাম 'সংহিতা'। ছন্দে লেখা বলে এর অন্য নাম ছন্দ, শিষ্যরা গুরুমুখে শুনে লিখত বলে এর আর এক নাম 'শ্রুতি'। শ্লোকগুলির তাৎপর্য ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্বন্ধে গদ্যে যে আলোচনা থাকে, তারই নাম 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণ সাধারণভাবে যাগযজ্ঞবিষয়ক নিয়ম-নীতি-পদ্ধতির নির্দেশক গ্রন্থ। যাগযজ্ঞের বিকল্প ধ্যানাদি উপাসনার নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি গ্রন্থের নাম আরণ্যক। আরণ্যকের লিপিবদ্ধ বিষয় হচ্ছে—অরণ্যাশ্রমে যাত্রার আগে গুরুর নিকট শিষ্যের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ। অরণ্যাশ্রম বাস উপলক্ষে এর উৎপত্তি বলে আরণ্যক নামে চিহ্নিত করা হয়। আরণ্যকের সংখ্যা চার—বৃহৎ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় এবং কৌশিতকী। উপনিষদের সঙ্গে আরণ্যকের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। সেজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ঐতরেয় উপনিষদ ইত্যাদি বলা হয়। সু. জা.

আরণ্যক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৬-১৯৫০) প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে কার্তিক ১৩৪৪ থেকে ফাল্গুন ১৩৪৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকরে প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। ১৯২৮ সাল থেকে বেশ কিছুকাল বিভূতিভূষণ পাথুরিয়াঘাটা এস্টেটের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের কাজ নিয়ে ইসমাইলপুর ও আজমাবাদের অরণ্যপরিবেশে অবস্থান করেন। তখন তিনি 'আরণ্যক' রচনার পরিকল্পনা করেন। অনেক সমালোচক আরণ্যকে বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-নিদর্শন রূপে মনে করেন। ভারতের সাহিত্য আকাদেমী এই গ্রন্থকে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় আরণ্যকের অনুবাদও হয়েছে। 'আরণ্যকে' প্রকৃতি জড় নয়, মানুষেরই মনের দোসর। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এবং মানুষের বিচিত্র ভাব অপূর্ব লিরিক সুরে অথচ এপিক সুলভ ব্যাপকতায় বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়ে গঠিত এক মহান জগৎ ও জীবনই হচ্ছে আরণ্যেকের প্রাণসত্তা। এই অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশে লেখক বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা ট্যাঁড়বারো দেবের কল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। উপন্যাসের সাধু এক সরল বিশ্বাসী আত্মভোলা লোক, বেঙ্কটেশ্বর কবি, মটুক নাথ অধ্যাপক, সৌন্দর্য পিয়াসী যুগলপ্রসাদ উদ্ভিদ বিদ্যাবিদ, সাঁওতাল-রাজ দোবরু পান্না অরণ্যরহস্যের সাক্ষী, তরুণীভানুমতী যৌবনোচ্ছল ও আভিজাত্য গর্বে গৌরবময়ী, স্বভাবশিল্পী ধাতুরিয়া নৃত্যবিশারদ। এদের সকলের উপরই অরণ্যমহিমার রাজছত্র প্রসারিত। অন্যান্য যারা আরণ্য-জীবনে নানা ভূমিকা পালন করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজপাঁড়ে, জয়পাল কুমার, কুণ্ডা রাজপুতানী, গনোরী তেওয়ারি, নকছেদী তুলসী-মঞ্চী, গিরিধারীলাল প্রমুখ। এছাড়া রাখালবাবুর বিধবা স্ত্রী এবং দরিদ্র বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিত যুবতী কন্যা রুবা ও জয়া বাঙালির সমাজ জীবনের বাইরে এক অরণ্য-সমাজের আভিজাত্য-গৌরবহীন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এরা সবাই এই অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে জীবনের সামঞ্জস্যবিধান করে নিয়েছে। আ. জ.

আরণ্যক উপনিষদ্ : বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা নিয়ে যেমন গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণগুলো, তেমনি এর জ্ঞানকাণ্ডকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছে উপনিষদগুলো। উপনিষদ্গুলো

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণাত্মক বেদের শেষাংশ বলই পরিগণিত। এজন্যে উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে যেগুলো দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য উন্মোচনে নিয়োজিত সেগুলোকে আরণ্যক উপনিষ বলে। অতি জটিল ও দুরূহ তত্ত্ব বলে এর চর্চার জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত স্থান, কাল, পাত্র, একাগ্রতা ও নির্জন পরিবেশ। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে বলা হয়েছে : 'পৃথিবী রাজ্য দান করলেও উপনিষদ্ অতি প্রিয় শিষ্য বা জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া কাকেও দান করা হতো না।' সে জন্য অনেক উপনিষদ্ই আরণ্যক উপনিষদ্‌রূপে গণ্য। বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় এবং কৌশিতকী ইত্যাদি উপনিষদ্‌কে আরণ্যক উপনিষদ্ রূপে চিহ্নিত করা চলে। অরণ্যাশ্রমে এদের উৎপত্তি বলেই এরা আরণ্যক উপনিষদ্ রূপে পরিচিত। আদি ঔপনিষদিক চিন্তা-চেতনার উদ্ভবক্ষেত্র জনক রাজার বিদেহ রাজ্য বলে কথিত। সু. মু.

আরণ্যক দৃশ্যাবলী : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী রচিত মোট ১৮টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৭৫ (মুক্তধারা)। প্রবন্ধগুলোর নাম যথাক্রমে : উদ্যানবিহারী অভদ্রতা, ধ্বনিই শুধু এবং প্রতিধ্বনি, আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন-জিজ্ঞাসা, অনূদিত স্বর্গ এবং বাস্তবিক নরক, শত্রুকে চেনা, নতুন বছর পুরাতন প্রশ্ন, সঙ্কটাচ্ছন্ন গ্রন্থজগৎ, রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সমাজ, উন্মুক্ত পথের স্বচ্ছন্দ যাত্রী, প্রান্তবর্তী আলো, চলে গেছেন অপরাজেয়, বিভাজনের অপচয়, কৃষ্ণ সাহেবদের ক্রোধ ও লড়াই, বাংলাদেশে ইংরেজির অতীত ও ভবিষ্যৎ, শিক্ষার সঙ্কট, সমাজের প্রত্যাশা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, হৃদয়ের শিক্ষা চাই, আমার বন্ধুদের কয়েকজন। মননশীল প্রবন্ধগুলোতে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। প্রবন্ধগুলোকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : তত্ত্বালোচনা বিষয়ক এবং ব্যক্তি-মূল্যায়ন বিষয়ক। তত্ত্বালোচনামূলক প্রবন্ধগুলোতে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে লেখকের অবস্থান সুস্পষ্ট। একটি প্রবন্ধে লেখক পরিবর্তনবিমুখম তথাকথিত উদারপন্থীদের সমালোচনা করেছেন। দেশের সাধারণ মানুষের অধিকারহীনতার কথা বলেছেন একাধিক প্রবন্ধে। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা, প্রকাশনা জগতের সংকট এবং মুক্তবুদ্ধিচর্চার দৈন্যদশা কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এছাড়া ব্যক্তি-মূল্যায়ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে বেশ কয়েকজন বাঙালি মনীষীকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যাঁরা আলোচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, ফররুখ আহমদ, কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, আরজ আলী মাতুব্বর, নীরদ সি চৌধুরী, ডঃ শামসুজ্জোহা, গিয়াসউদ্দীন, রাশীদুল হাসান, আনোয়ার পাশা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আ. গ.

আরণ্যক ব্রাহ্মণ : বেদের যে ভাগে যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ ও মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে, তারই নাম ব্রাহ্মণ। একে এক হিসেবে বেদের আদিম ব্যাখ্যা বা বিবরণ বলা যেতে পারে। ব্রহ্ম(ন্) শব্দের অর্থ বেদ। তাই বেদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় একে ব্রাহ্মণ বলা হয়। ব্রাহ্মণগুলোর মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আলোচনা আছে। ব্রাহ্মণগুলোর যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সাঙ্কেতিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, ঐগুলোকেই বলা হয় আরণ্যক ব্রাহ্মণ। কেননা অরণ্যে বা নির্জন বনে এগুলো পাঠ করা হতো। ব্রাহ্মণের এসব কর্ম ও জ্ঞানাত্মক কথা সাধারণের বোধগম্য ছিল না বলে যেখানে সেখানে এগুলো যাকে তাকে বলা বা শেখানো হতো না। অতি কঠিন তত্ত্ব বলে এ বিষয় সম্যক অবধান করার জন্য অরণ্যের নির্জনতা আবশ্যক হতো। এ থেকেই 'আরণ্যক ব্রাহ্মণ' কথার উৎপত্তি। ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপদেশে পূর্ণ ; ব্রাহ্মণোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ ও তাদের রহস্যময় দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদর্শনের প্রয়োজনেই আরণ্যক ব্রাহ্মণগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল। সু. মু.

www.pathagar.com

আরণ্য জনপদ : আবদুস্ সাত্তার রচিত এই গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতিদের আদি উৎস এবং এদের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থে বর্ণিত উপজাতি সমূহ হচ্ছে : চাকমা, তংচঙ্গ্যা, মগ, কুকি, লুসাই, মুরং, টিপ্‌রা, সেন্দুজ, পাঙ্খো ও বনজোগী, খুমি, গারো, হাজং, মণিপুরী, খাসিয়া, সাঁওতাল, ওরাও, রাজবংশী। এসব উপজাতির উৎপত্তি, সামাজিক ও পেশাগত পরিচয়ের পাশাপাশি তাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিষয়েও আলোচনা রয়েছে। এছাড়া আছে উপজাতি জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনাচরণ ও তাদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের অনেকগুলো দুর্লভ আলোকচিত্র এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লিখিত একটি পত্রও। 'আরণ্য জনপদ' প্রথম প্রকাশিত হয় জুন ১৯৭৩ সালে। প্রকাশক : জলি বুকস্, ঢাকা। মূল্য : পনের টাকা। মা. আ.

আরণ্য নীলিমা : আহসান হাবীবের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। অবশ্য রচনাকালের দিক থেকে দ্বিতীয়। নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা কথাবিতান থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশকাল ১৯৬২। প্রচ্ছদ : আশীষ চৌধুরী। আরণ্য নীলিমার উপজীব্য উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি এক তরুণ চিত্র শিল্পী ও তাঁর স্ত্রীর মনোজাগতিক সংকট, বলা যেতে পারে যে চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমান সমাজের যে অংশটি আধুনিক ও নাগরিক জীবনে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল তাদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি মানুষকে নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। তবে উপন্যাস রচনার জন্য যে বিস্তৃত প্রেক্ষাপট ও বিচিত্র চরিত্রসমাহার কাঙ্ক্ষিত বলে সচরাচর ধরে নেয়া হয়ে থাকে তা এ উপন্যাসে নেই। আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম ধর্ম মানুষের মনোজগতের জটিলতাকে উন্মোচন করা। আরণ্য নীলিমা ঐ বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ। ঢাকা কেন্দ্রিক উপন্যাস চর্চায় ঐ দিক থেকে তাই এটি পথিকৃৎস্থানীয়। কারণ এর রচনাকালে ঢাকা কেন্দ্রিক সাহিত্যে নাগরিক জীবনযাত্রা প্রতিফলন উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটতে শুরু করেনি। আ. ম.

আরব : আরব উপদ্বীপের অধিবাসীরাই মূলত আরব। কুয়েত, ইয়ামন, আবুধাবী, মক্কা-মদিনা প্রভৃতি নিয়েই আরব উপদ্বীপ। ইসলামোত্তর যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত ইরাক (সুমের-ব্যাবিলন) আসিরিয়া (সিরিয়া), কেনান, জেরুজালেম থেকে আফ্রিকার উত্তরাংশের জনগণের অধিকাংশ ইসলাম বরণ করে এবং দরবারী ভাষা আরবি গ্রহণ করে। একচ্ছত্র শাসন, অভিন্ন ধর্ম ও ভাষার প্রভাবে গত ১৩০০ বছরে এরা জাতি অর্থে আরব বলে আত্মপরিচয় দেয়। এদের মধ্যে আর্য ও সেমিটিক রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। মূল আরব ভূখণ্ডের অধিবাসীরা সামাজিক দিক থেকে দুইভাগে বিভক্ত :—স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনকারী আরব ও যাযাবর বেদুঈন। খ্রিস্টপূর্ব নয় শতকে ৩ আসরীয় উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে আরব বলতে আরব উপদ্বীপের ও মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি এলাকায় বাসিন্দাদেরকে বুঝাত। য়ুরোপীয়রা মধ্যযুগে আরবগণকে স্যারাসেন (স্যারাস রাজ্য থেকে) নামে অভিহিত করতো। আরবদেশ একটি উপদ্বীপ। রাজনৈতিক দিক থেকে আরব দেশ চারটি স্বাধীন রাজ্যে ও চারটি আধাস্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত—সৌদি আরব, ইয়েমেন, দক্ষিণ ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র, কুয়াইত এবং বাহরাইন, কাতার ও ওমান। আরব দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ও ২০ জন মেষ ও ছাগ পালন করে থাকে। পশুপালকগণ যাযাবর। বর্তমানে তেল সম্পদের জন্য আরব দেশ অত্যন্ত ধনী ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী। আরবরা গড়নে লম্বা ; নাক উন্নত ; অতিথি পরায়ণ ও সরল। আ.সৈ.গো.দ.

আরবি ভাষা : প্রাচীন ফিনিসীয়, হিব্রু ও আরবি সুপ্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার একটি

www.pathagar.com

ভাষা থেকে উদ্ভূত। এলাকার প্রধান নরগোষ্ঠীর নাম সামীদ। এখানকার আরব জাহানের প্রচলিত ভাষা আরবি। এটা সেমেটিক নামের ভাষা পরিবারের সদস্য। ইসলামের উদ্ভবের আগেও আরবিতে একটি ঐশ্বর্যশালী আরবি সাহিত্য ছিল। ইসলামের জয়যাত্রার প্রথম কয়েক শতাব্দীতে আরবেরা যেসব দেশ পদানত করেছেন, সে সব দেশে তাঁরা আরবি ভাষা চাপিয়ে দিয়েছেন। এভাবে বর্তমান মধ্য প্রাচ্যের ও উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশে আরবি প্রচলিত হয়েছিল। ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ায় মুসলমানদের কাছে এ ভাষা পবিত্র ও স্বর্গীয় বলে বিশেষ মর্যাদা পায়। আরবি লিপি ডান থেকে বামে লেখা হয়ে থাকে। আ. গ.

আরব্য উপন্যাস/আলিফ লায়লা : বিশ্বের গল্পকথার ভাণ্ডারে আরব মনীষার শ্রেষ্ঠদান 'আরব্য উপন্যাস'। আরবিতে এটি 'আলিফ লায়লা' ওয়া লায়লা অর্থাৎ 'হাজার এক রজনীর গল্প' নামে পরিচিত। এটি বিচিত্র ধরনের গল্পকথার এক বিরাট সংকলন গ্রন্থ। এই গল্পগুলো গণসৃষ্টি--অর্থাৎ বহু শতাব্দীব্যাপী বহু মানুষের ব্যক্তিক সৃষ্টি ও নির্বিশেষ সৃষ্টি হিসেবে মুখে মুখে চালু ছিল এসব গল্প। পরে এ নামে লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়েছে। কেউ কেউ এর মধ্যে ইরানী (অপ্রাপ্য) উপাখ্যান সংগ্রহ 'হাজার আফসানা'র প্রভাব ও অনুকৃতি লক্ষ্য করেন। এ গল্পগুলো মানবমনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে স্বীকৃত। এতে বর্ণিত গল্পগুলোর পরিমণ্ডল ভারত, চীন, ইরান, তুরস্ক ও আরব জাহানের মিশর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। অনেক গল্পেই বাগ্দাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের নামের উল্লেখ থাকলেও গল্প-গুলো বহু পূর্বকাল থেকে লোকমুখে চালু ছিল। পরবর্তীকালে এগুলো সংগৃহীত হয়েছে। আরব্য উপন্যাসের এই অজস্র গল্পের মধ্যে আলাদীনের যাদু প্রদীপের কাহিনী, আলী বাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনী এবং নাবিক সিন্দাবাদের কাহিনী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে জনপ্রিয়। পাশ্চাত্যে এগুলো প্রায় ফোকলোরের মর্যাদা পেয়েছে। আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলোর বিষয়, বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। এই গল্পভাণ্ডারের সৃষ্টি সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী চালু রয়েছে। কথিত আছে যে শাহ্‌রিয়র নামক কোন এক নৃপতি একবার তার স্ত্রীর চরিত্রহীনতার প্রমাণ পেয়ে স্ত্রীকে তো হত্যা করলেনই এবং সেই কলঙ্কের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদেরও রেহাই দিলেন না। ঐ ঘটনার পর থেকেই তিনি প্রত্যেক রজনীতে এক একজন রমণীকে বিয়ে করতেন এবং প্রভাতে সেই হতভাগিনীর মস্তক ছেদন করতেন। এরূপে বহু রমণী নিহত হলো। এই সময় উজীর-কন্যা শাহেরজাদী নারীসমাজকে কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার সংকল্প নিয়েই এগিয়ে আসলেন বাদশাহর পত্নীত্ব গ্রহণ করতে। তিনি বিয়ের পরই বাদশাহের অনুমতি নিয়ে ভগিনী ছনিয়াজাদীকে বাসরকক্ষে নিয়ে এলেন এবং রাত্রি প্রভাত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ভগিনীর অনুরোধে এক মনোহর গল্প বলতে শুরু করেন। সে গল্প শেষ হওয়ার পূর্বে ভোর হয়ে যায়। কিন্তু সেই গল্প শেষ পর্যন্ত শোনার তীব্র আগ্রহে বাদশাহ সেদিন তাঁকে হত্যা করলেন না। শাহেরজাদী কিন্তু এমন সুকৌশলে গল্পের পর গল্প বলে চললেন যে বাদশাহ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি গল্প শোনার আগ্রহে তাকে আর হত্যা করতে পারলেন না। এমনি ভাবে হাজার এক রাত্রি গল্প শোনার পর বাদশাহ নারী চরিত্রে আস্থা ফিরে পান এবং হত্যা কার্য থেকে বিরত হন। উজীর-কন্যা শাহেরজাদী কথিত এই হাজার এক রাত্রির গল্পই আরব্য উপন্যাসে সংগৃহীত রয়েছে, এই হচ্ছে সাধারণের ধারণা। আরব্য রজনীর এই কাহিনীগুলো বিচ্ছিন্ন গল্পের সমষ্টি হলেও উদ্দেশ্যগত যোগসূত্রে ও বক্তার অভিন্নত্বের জন্য এক বৃহত্তর ঐক্যে সংহত হয়েছে। এই গল্পগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও আরব জগতের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, এর শহর,

www.pathagar.com

বাজার, পল্লী, সরাইখানা, মরুপথ, এর আমোদ-প্রমোদ, নৈতিক শিথিলতার যে ছবি ফুটে উঠেছে, তাতে এক জনগোষ্ঠীর মানসিকতার অখণ্ড এক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য ও অতি প্রাকৃতের কুয়াশা জীবনের বাস্তবতাকে কোথাও আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এই কারণেই এই গল্পসংকলন অনেকটাই উপন্যাসের ভাবমর্যাদা মণ্ডিত হয়েছে। আলিফ লায়লা বা আরব্য উপন্যাস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের একটি বলে স্বীকৃত। সু. মু.

আরভিং, ওয়াশিংটন : সাহিত্যিক। তিনি আমেরিকার এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে ১৭৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার পর কলেজে ভর্তি না হয়ে আইন পড়তে শুরু করেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। ১৮০৪ সালে প্রথমবারের মতো ইয়োরোপে যান। লন্ডনে বাসকালে তিনি প্রায়ই নাটক দেখতেন। দেশে ফিরে আইন ব্যবসা শুরু করলেও, অচিরেই সাহিত্যের দিকে তাঁর সকল মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ওয়াশিংটন অবিবাহিত ছিলেন। তিনি স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সহকারি রূপে কাজ করেন। ১৮৪২ থেকে ১৮৪৫ পর্যন্ত স্পেন সরকারের মন্ত্রীত্বের পদে বহাল ছিলেন। সাহিত্যে তিনি প্রথমে ক্লাসিক রীতির অনুসরণ করলেও, পরে জার্মান গথিকপন্থীদের ও ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্কটের প্রভাবে রোমান্টিক ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর রচনায় অনুভূতি ও রসবোধ অত্যন্ত সযত্ন মার্জিত ও পরিশীলিত ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে "রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কল" (Rip van winkle), "ব্রেস ব্রীজ", "টেল্‌স অব এ ট্র্যাভেলার" (Tales of a Traveller), "দি আলহামরা" (The Alhamara) প্রধান। ওয়াশিংটন প্রধানত ছোটগল্প ও প্রবন্ধাদি রচনা করে গেছেন। ১৮৫৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ম. ই.

আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। বইটির প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা-এর ব্যানারে সাহিত্য-সাগর মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই, তবে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নামের নিচে (১৯৩৫ ইংরেজি) লেখা আছে। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের ভূমিকার তারিখ নভেম্বর ১৯৩৪ ইংরেজি এবং গ্রন্থকারদ্বয়ের বক্তব্যের নিচে তারিখ ১ মার্চ, ১৯৩৫। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য কালপর্বে তৎকালীন বঙ্গদেশ ছাড়াও অন্যান্য রাষ্ট্রে এ ভাষার চর্চা ও উৎকর্ষের তথ্যবহুল ইতিহাস ও অনুপুঙ্খ গবেষণাসমৃদ্ধ আকরগ্রন্থ। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমসাধ্য যৌথ গবেষণার ফল এ বই। এ বইটি থেকে তথ্য প্রমাণসহ জানা যায় যে, একসময়ে বাংলা ভাষা পূর্বভারতের বহুদূর পর্যন্ত রাজসভায় সম্মান পেয়েছিলো। তাছাড়া আসাম ও ত্রিপুরাসহ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যেও রাজসভার কাজ এবং সর্বসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা নির্বাহ হতো বাংলায়। তাদের দলিলপত্রও বাংলায় লিখিত হতো। তৎকালীন বঙ্গের পূর্বপ্রান্তের দুর্গম পর্বতমালাবেষ্টিত সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলা ভাষা প্রাচীনকালে আরাকান দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। এরই ফলে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান বা রোসাঙ্গে বাংলা ভাষা-সাহিত্য উৎকর্ষের সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে। সে সময়কার সাহিত্যচর্চার অমূল্য ইতিহাস এ বইয়ে সংকলিত। এ বইয়ে সাতটি বিষয়ভিত্তিক শিরোনামাঙ্কিত অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মগ বা আরাকানবাসীদের পরিচয়, তাদের সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের সংস্পর্শ ও ধীরে ধীরে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভায় মুসলমান প্রভাবের ধারা পর্যন্ত আলোচিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি দৌলত কাজী বা কাজী দৌলতের জন্ম, প্রাথমিক জীবন, রাজসভায় তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর রচিত কাব্যসমূহ ও কাব্যদর্শ ইত্যাদি

www.pathagar.com

আলোচিত। তৃতীয় অধ্যায়ে কোরেশী মাগন ঠাকুরের পরিচয়, তাঁর সম্পর্কে বিদ্যমান বিতর্কের বিশদ ব্যাখ্যা ও শেষে সর্বসাধারণের দ্বিধাখন্ডন, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় ও রচনার সমালোচনা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় কবি আলাওল : তাঁর জন্ম পরিচয়, প্রাথমিক জীবন, কবি-জীবনের পৃষ্ঠ-পোষকতার পর্যায়, কাব্যসমূহ ও সেসবের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এ অধ্যায়ে। সেই সাথে আলাওলের দুঃখময় জীবন ও শেষ বয়সে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনও আলোচিত। পঞ্চম অধ্যায়ে রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য সাধনার প্রতিক্রিয়া, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সাহিত্য ও ফারসি সুকুমার সাহিত্যের আমদানি, সেই সাথে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন মানবীয় প্রেম ইত্যাদি আলোচিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের প্রভাব আলোচিত। এ পর্যায়ে সপ্তদশ শতাব্দীর সুস্পষ্ট লক্ষণধারী কবি মরদন, শমসের আলী, মোহাম্মদ খান, দোনাগাজী চৌধুরী, আবদুল নবী, সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর, মোহাম্মদ রাজা, মোহাম্মদ রফীউদ্দীন, সেরবাজ, শেখ সাদী, আবদুল আলীম, রামজী দাস, আবদুল হাকীম ও অন্যান্য সমকালীন কবিদের কর্ম ও জীবন নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলিম সমাজের বিভিন্ন বিষয়, সমসাময়িক সম্মানিত মুসলিম শ্রেণী, তাদের উপর সুফী প্রভাব, বিভিন্ন লোক সংস্কার ইত্যাদি। মূল আলোচনার এই সাতটি অধ্যায় শেষে নতুনপ্রাপ্ত দু'টি উল্লেখযোগ্য বিষয় তুলে ধরা হয়েছে পরিশিষ্ট (ক) 'রোসাঙ্গ-রাজ-অভিষেক-চিত্র' ও পরিশিষ্ট (খ) 'কবি দোনা গাজী চৌধুরী' শিরোনামে। এরপর রয়েছে বর্ণানুক্রমিক সুশৃঙ্খল নাম সূচি, যা গবেষকদের জন্যে খুবই সহায়ক। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার বাইরে ভিন্ন ভাষাভাষী মানবসমাজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, সম্প্রসারণ, সমাদর ও সম্মানের ঐতিহাসিক স্মারক এ বই। র. আ. ক.

আরাফাত : যিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে তালবিয়া পড়তে পড়তে হজ্জব্রত পালনকারী হাজীগণ আরাফাত ময়দানে সমবেত হয়ে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করেন। আরাফাত মসজিদুল হারাম, মক্কা থেকে ১২ মাইল বা ১৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হজ্জের আনুষ্ঠানিক এবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো আরাফাতে লক্ষ লক্ষ হাজী ওকুফ বা অবস্থান করে নামায, যিকর, কোরান পাঠ, দোয়া দরুদ সম্পন্ন করে থাকেন। আরাফাত শব্দটি আরবি আরিফা বা জানা হতে উদ্ভূত। কারণ হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ)-জান্নাত হতে আসার পর পুনরায় আরাফাতে মিলিত হন। এক প্রান্তে পর্বত 'জবল-ই-রহমত' অবস্থিত। আ. সৈ. গো. দ.

আরেক কালান্তর : আহমদ রফিক রচিত প্রবন্ধের বই। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে কতিপয় বিতর্ক ও মূল্যায়ন বিষয়ক আটটি প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে। চল্লিশের দশকে কোন কোন অত্যুৎসাহী পক্ষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই মর্মে বিতর্ক তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী কবি, ধনতন্ত্রের প্রতিভূ, প্রতিক্রিয়াশীল স্রষ্টা। এসব অভিযোগ প্রবল যুক্তি সহকারে লেখক খণ্ডন করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'বিতর্কের আলোয়' বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করে প্রবন্ধকার লিখেছেন, "রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার নিয়ে অনুরূপ অসহিষ্ণুতা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সমভাবে লক্ষণীয়। এমনো দেখা গেছে যে বুদ্ধদেব বসু কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীলতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে নৈরাজ্যের ধারালো ছুরিতে। ......বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-রচনার একটি সবিশেষ অংশ বিস্মৃতির বা অবহেলার বালুচরে চাপা পড়েনি। ব্যক্তির বা সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুসঙ্গে কিংবা বিবিধ কার্যকারণ প্রসঙ্গে ওরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বা তাদের আমরা স্মরণ করেছি।" গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'মানুষের

www.pathagar.com

স্বপক্ষে : কালান্তরে' বিষয়টি নিয়ে লেখক আরো খোলামেলা ভাবে বলেছেন, "রবীন্দ্র সাহিত্যের সামগ্রিক বিচারে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের অন্যতম অগ্রসর চিন্তার মানুষ। আজ নিঃসংশয়েরবলা যায়, বাংলাভাষী অঞ্চলে এই জ্ঞান বৃদ্ধ মনীষী তাঁর নিজস্ব আলোকবৃত্তে প্রগতি চিন্তার প্রতীকরূপে বিবেচিত হবেন। বাঙালীর হাসি কান্না, সুখ-দুঃখের অনুভূতির থেকে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ঝেড়ে ফেলা, আজকে দূরে থাক, আগামীকালেও সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে সংশয়ের পর্যাপ্ত কারণ বর্তমান। রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙালীর সাংস্কৃতিক একটি সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার.....। উপরে উল্লিখিত দুটি প্রবন্ধ ছাড়া গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে : রাজনীতির জটিল উদ্যানে, কবি স্বভাব : শৈল্পিক সততায়, স্বদেশ ও সম্প্রদায় : উদারভাষ্যে, মাটির ভুবন : গভীর মননে, বিশ্ব-চৈতন্যের ঘাটে, রবীন্দ্র মানস : কালান্তরে। 'আরেক কালান্তর' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী। প্রথম প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৭৭, প্রচ্ছদ আবদুল বাসেত, মূল্য : চৌদ্দ টাকা, নতুন সংস্করণের মূল্য : সত্তর টাকা। মা. আ.

আরেক ফাল্গুন : ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে জহির রায়হান রচিত উপন্যাস। প্রকাশ কাল : ১৩৭৫ সন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। নগ্ন পায়ে প্রভাত ফেরী, শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কালো ব্যাজ ধারণ, মিছিল, কালো পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি একুশের ক্রিয়াকর্ম এতে উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলো আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে স্বাধিকার আন্দোলনের দ্যোতকরূপে চিত্রিত হয়েছে। তাই একুশ উদযাপনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। শত শত ছাত্র-যুবককে পুলিশ জেলে পুরে। তবু, তারা বিচলিত হয় না। তাদের বিশ্বাস আগামী বারের ফাল্গুনে জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আরো তীব্রতর হবে। আসাদ, কবি রসুল, মুনিম, সালমা ইত্যাদি চরিত্র সংগ্রামমুখী এবং সমাজ-সচেতন প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। এদের বিপরীত মেরুর চরিত্র রূপে অঙ্কিত হয়েছে মাহমুদ, বজলে হোসেন ও সবুর। এরা স্বার্থবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও ভীতু। নূ. ই

আরোগ্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ। ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে মোট তেত্রিশটি কবিতা আছ। কবিতাগুলোর নাম নেই। সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কবিতাগুলো ১৯৪১ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা। শান্তিনিকেতনে অবস্থানের সময় লিখেছেন। কবিতার নিচে বাড়ির নাম, তারিখ এবং কোন সময়ে লিখেছেন, যেমন--সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন 'কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর'-কে, যিনি তাঁর অসুস্থতার সময়ে তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন। এই সমস্ত কবিতা তিনি চিকিৎসার পর কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে মুখে মুখে রচনা করেন। বেশিরভাগ কবিতাই কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। প্রথম কবিতায় কবি লিখছেন : 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি,/অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,/এই মহামন্ত্রখানি/চরিতার্থ জীবনের বাণী।' ৩৩ সংখ্যক শেষ কবিতায় আছে 'এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে থাক,/চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি/ভেদ করি কুহেলিকা/সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।' নিগূঢ় সত্যের প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ বেলাতেও। এই তাঁর শিল্পের সাধনা। যে কাব্য মুখে মুখে রচিত হয় সেখানেও থাকে একই ব্যঞ্জনা। কবি আমাদের অমৃত রূপের সন্ধান দিয়ে গেছেন। সে. হো.

আরোগ্য : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) রচিত সমাজসচেতনমূলক উপন্যাস।

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ সন। 'আরোগ্য' উপন্যাসের নায়ক কেশব ড্রাইভার চোরাকারবারী অনিমেষের গাড়ি চালায়। অনিমেষের মেয়ে ললনাকে তার ভালো লাগে। কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তার সঙ্গে ললনাদের ব্যবধান যথেষ্ট। তাই ললনার কাছ থেকে সে বই চেয়ে পড়ে, যাতে ললনা বুঝতে পারে সে একেবারে অশিক্ষিত ড্রাইভার নয়। এদিকে কেশব শহরতলীর গরীব বিধবা মেয়ে মায়াকে ভালোবাসে। কিন্তু তাকে বিয়ে করতেও সে দ্বিধান্বিত হয়। কেননা অসুস্থ মানসিকতার জন্য কেশবের মনে হয় মায়ার প্রেম কৃত্রিম ও স্বার্থপ্রণোদিত। অসুস্থ বিকারগ্রস্ত কেশব মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ডাক্তার দত্তকে দেখায়। কিন্তু দত্তের চিকিৎসায় কোনো ফল হয় না। তাকে ডাক্তার দত্ত বলেন, দুটো জীবনকে এক সঙ্গে ভোগ করা যায় না। কেশব অনুভব করে চারদিকে সংসারের মধ্যে যে অনিয়ম রয়েছে তারই জন্য সে আজ ব্যধিগ্রস্ত। ললনা এবং মায়াও সেই অনিয়মের শিকার। সংসারের নিয়ম পাল্টাতে না পারলে কেউ সুস্থ হতে পারবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে মানুষের জীবন ও মন বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসীয় জ্ঞানের ফলে তিনি উপলব্ধি করেছেন সামাজিক কারণেই মানুষ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আ. ই.

আরোগ্য নিকেতন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১) রচিত উপন্যাস। পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যা 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় 'সঞ্জীবন ফার্মাসী' নামে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে। উপন্যাসটি ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার' এবং ১৯৫৬ সালে 'সাহিত্য আকাদেমী' পুরস্কার লাভে সম্মানিত হয়। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ উপকরণ চিকিৎসক ও চিকিৎসাবৃত্তি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'দেবতার ব্যাধি' ও 'বোবা কান্নার' মিহির ডাক্তার এবং 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে সর্প চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা যায়। নবীন ও প্রবীণ এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে সংঘাতের বর্ণনা তারাশঙ্করের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতনে'র সৃষ্টি। এতে নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি—ডাক্তারের জ্ঞানের সঙ্গে সনাতন চিকিৎসা পন্থায় বিশ্বাসী প্রাচীন ভিষকের ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতার বিরোধের চিত্রটি তারাশঙ্কর মনস্তাত্ত্বিক কলাকুশলতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। দেবীপুর গ্রামের প্রবীণ কবিরাজ জীবন দত্ত ওরফে জীবন মশায়, আতর বৌ, সেতাব, প্রদ্যোত ডাক্তার ও তার স্ত্রী এবং পরাণ মণ্ডল এই সব চরিত্র তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। জীবন-মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে রানা পীক, মহা পাঠের মোহান্ত সন্ন্যাসী, ভুবন রায়, গণেশ বায়েন মৃত্যুকে অচঞ্চল চিত্তে স্বেচ্ছায় আহ্বান জানায়, অন্যদিকে জীবন মশায়ের পুত্র বন বিহারী, মতি, রমা, মঞ্জুরী, দাঁতু ঘোষাল জীবনকে আকঁড়ে ধরতে গিয়ে জীবনের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত উপভোগ করতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় অন্তর হাহাকার করে ওঠে। কুলধর্ম ও পারিবারিক ঐতিহ্যরক্ষা এবং সনাতন কবিরাজি চিকিৎসা-পদ্ধতি পরিচালনা জীবন মশাইয়ের ধর্ম, অন্যদিকে আধুনিক ডাক্তারী বিদ্যার অত্যাশ্চর্য বিষয়ের প্রতিও তিনি সশ্রদ্ধ। তরুণ বয়সে মঞ্জুরীর প্রতি তার মোহাকর্ষণ ও ভূপীবোসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মঞ্জুরীর ছলনাময় আচরণ তার অন্তর বিষিয়ে তোলে। আতর-বৌয়ের ঈর্ষা, অভিমানের খোঁচায় তার অন্তর দাউ দাউ করে জ্বলে। রঙ্গলাল ডাক্তারের শিষ্যত্ব গ্রহণ জীবন দত্তের জীবনের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তার আপাতঃ প্রশান্তিকে আতর-বৌ শ্লেষপূর্ণ বাক্যে আঘাত করেছে। নিদান হাঁকায় বিরক্ত হয়

www.pathagar.com

রোগীর আত্মীয়স্বজন এবং তরুণ প্রদ্যোত ডাক্তার। শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনেই আসে সেই মৃত্যু, শান্ত মনে তাকে অভ্যর্থনা জানায় জীবন মশায়। এই উপন্যাসে মৃত্যুতত্ত্বই প্রধান, তবে জীবনদত্তের নামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবন দানের কৌশল তার জানা থাকলেও সর্বক্ষেত্রে যে-তা সার্থক নয়, তার জীবনই তার প্রমাণ। সু. মু.

আর্ত শব্দাবলী : কবি হাসান হাফিজুর রহমান রচিত কবিতার বই। প্রকাশক : পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ৩৪/১ চামেলীবাগ, ঢাকা-২। প্রথম প্রকাশ : ১৫ ভাদ্র, ১৩৭৫। গ্রন্থটিতে মোট ৩৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। স্বদেশ প্রেমের গভীর আকুতি এ কাব্যগ্রন্থের মূল উপজীব্য। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা-- ওডেসিউসের চোখে ন্যসিকা : আমার মনে, হ্যামলেট, স্মৃতি তর্পণ, সেই অমৃত সময়, অনন্য স্বদেশ, এক সাদা বাড়ী আছে জানি, রথের রেখা, স্বর্গ, নকল রাজা ইত্যাদি। মানুষের সম অধিকারে বিশ্বাসী কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁর প্রতিটি কবিতাই আশার বসতি গড়ে। সুখী ভবিষ্যৎ নির্মাণের নির্দেশনা দেয়। কিন্তু তাঁর হৃদয়ও কখনও কখনও আহত হয় : দু'একটা ভাবনার তীক্ষ্ণ বর্শায় আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছি,/আহা কাল রাতে এত তীব্র রক্ত কোথায় ছিল!/কয়েকটি মুহূর্ত নক্ষত্রের মতো জমে এসে/ছড়িয়ে দিয়েছিলো কয়েকটি অকস্মাৎ দীর্ঘশ্বাস'। অবশ্য কবির এ দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যার চোখে স্বপ্ন হৃদয়ে আশাবাদ খেলা করে তার বিবেক তো ঘোষণা করবেই—'এমনও বার্ধক্য আছে, তরুণের উচ্চকিত উদ্বোধনী গানের মতোই। তা নিঃসংশয়--জীবনের শুরুর মতই তা শেষ হয়/প্রাণের শীর্ষ আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে চারপাশের অন্তহীন/ সুখে ছড়িয়ে। সে স্বপ্ন আমি কিছুতেই চোখ থেকে মুছে ফেলতে পারি না'। শব্দ কি কখনও আর্ত হয়? কিংবা হতে পারে?-এ প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক। হাসান হাফিজুর রহমানের 'আর্ত শব্দাবলী' কেমন করে আত্মার মৌলিক অধ্যায়ের সন্ধান লাভ করেছে এ গ্রন্থ পাঠে তার সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। শা. আ.

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে : ঔপন্যাসিক। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই জন্ম গ্রহণ করেন। তার পুরো নাম ছিল আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে, কিন্তু পরে তিনি তার নামের মিলার শব্দটি বাদ দেন। পিতা ছিলেন ডাক্তার। ছেলেকেও তিনি ডাক্তার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা চেয়েছিলেন ছেলে তাঁর সঙ্গীত-শিল্পী হোক। অথচ পিতা-মাতা উভয়ের আশা ব্যর্থ করে দিয়ে হেমিংওয়ে নিজেকে পৃথিবীর একজন সেরা কথাশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। উনিশ বছর বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি 'কানসাস সিটি স্টার' পত্রিকার রিপোর্টারের চাকুরি গ্রহণ করেন। সেখানে হেমিংওয়ে মাত্র সাত মাস ছিলেন, কিন্তু এখান থেকেই তিনি তাঁর লেখার প্রেরণা অনুভব করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত ইটালীর পদাতিক বাহিনীতে অ্যামবুলেন্স ড্রাইভারের চাকুরি নিয়ে হেমিংওয়ে রণক্ষেত্রে যান। যুদ্ধে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি দেশে ফিরে আসেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগান তাঁর Farewell to Arms উপন্যাসে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে হেমিংওয়ে তাঁর এক বাল্য বান্ধবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর সংবাদ পত্রের রিপোর্টারের কাজ নিয়ে তিনি যান তুরস্কে। সে কাজ ভালো না লাগায় প্যারিসে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। পুণরায় সংবাদ পত্রের রিপোর্টার হয়ে গৃহযুদ্ধ কবলিত স্পেনে ছুটে যান। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস Far whom the Bell tolls-এ তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কার্যকরী করেন। মানুষের বর্বরতার কাহিনীকে হেমিংওয়ে নির্দ্বিধায় বর্ণনা করেছেন তাঁর সাহিত্যে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের শিকারি, একজন নির্ভীক যুদ্ধ-সাংবাদিক এবং একজন

www.pathagar.com

ভালো মুক্তিযোদ্ধাও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি কুসংস্কারকে এড়াতে পারেন নি। কিছু করবার আগে সুলক্ষণ কুলক্ষণ বিচার করে তিনি করতেন। হেমিংওয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The old man and the sea, The sun also rises, Green hills of Africa, In our time, Men without Women ইত্যাদি। ১৯৫৪ সালে সাহিত্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ম. ই

আর্নেস্টো চে গুয়েভারা : আই. লাভরেৎস্কি রচিত 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য। ১৯৭৬ সালে মস্কোতে রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলায় প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। বিপ্লবী চে গুয়েভারার জীবনী উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর ও ঘটনাবহুল। ১৯৬৯ সালে লাভরেৎস্কি হাভানায় গিয়ে চে.র জীবনের উপাদান সংগ্রহ শুরু করেন। সেই সুবাদে এক বৈঠক বসে আলবার্তো গ্রাগন্দোর বৈঠকখানায়। সেখানে ছিলেন চে-র বাবা ডন আর্নেস্টো গুয়েভারা লিঞ্চ, আলবার্তো চে গুয়েভারা এবং লেখক। চে-র ভেনিজুয়েলীয় স্ত্রী জুলিয়া মাঝে মাঝে এসে আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন। ঐতিহাসিক লাভরেৎস্কি দীর্ঘ কয়েক বছরের চেষ্টায় এই বই রচনা করেন। এটি চে-র প্রামাণিক এবং অনন্য জীবনী হিসাবে পরিচিত। কিউবান বিপ্লবের নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর অন্যতম সহচর ছিলেন চে। চে কিউবার প্রথম বিপ্লবী সরকারের অর্থ-মন্ত্রী ছিলেন। চে-র ছেলেবেলা থেকে সারা জীবনের সঙ্গী ছিল হাঁফানি। এই হাঁফানি নিয়ে তিনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাহাড়ে- জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো, যুদ্ধ, পরিকল্পনা ইত্যাদি করে গেছেন। হাঁফানির টান উঠলে এক পুরিয়া ঔষুধ, এক কাপ গরম কফি বা গরম খাবার কিছুই জোটেনি কখনো কখনো। মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যাওয়া ময়দা বা আটার তৈরি খাবার খেতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেছেন বহুবার। তারপর আসে কিউবার বিজয়। বিপ্লবীদের সরকার গঠিত হল, কিছুদিন পর চে. আবার বেরিয়ে পড়লেন বলিভিয়ার মুক্তিসংগ্রামে। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা। অসামান্য এক জীবনী গ্রন্থ 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা'। চে-র জন্ম আর্জেন্টিনায়। বাংলা ভাষায় প্রকাশক : মনীষা গ্রন্থালয় প্রা. লি., ৫৪ এ হরি ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬। পৃষ্ঠা ৪১৩, মূল্য : ২৫ রুপি। বি. ব.

আর্মেনীয় : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের শতম বর্গের ভাষা। এ বর্গের ভাষা চতুষ্টয়ের অন্যতম শাখা হচ্ছে আর্মেনিয়ান। এশিয়া মাইনর এবং কাস্পিয়ান হ্রদের অন্তর্বর্তী এলাকায় এভাষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের পর প্রায় চার শতাব্দী রোমের অধীনে থাকলেও আর্মেনিয়ানরা নিজেদের ভাষা বিসর্জন দেয় নি। পারস্য ও সিরিয়া কর্তৃক এলাকাটি একাধিকবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে আর্মেনীয় ভাষায় অন্যান্য ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন এবং শ্লাভিক শব্দের আদিতে যেখানে P (প) ধ্বনি বসে, জার্মানিক শাখায় সেখানে বসে F (ফ), আর আর্মানীয় ভাষায় বসে h (হ)। এ মিলের কারণে তাঁরা আর্মেনীয়কে ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক বর্তমানে এ ভাষায় কথা বলে। ম. মু.

আর্য : আর্য শব্দটি ভাষাবাচক না জাতিবাচক এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পণ্ডিততের মতে আর্য বলতে একটি ভাষা গোষ্ঠীকেই বুঝতে হবে। আর্য জাতি বাচক শব্দ নয়। আর্য ভাষা গোষ্ঠীর আদিনিবাস কোথায় ছিলো ও ভারতে আর্য সভ্যতার পত্তন কোন সময় হতে আরম্ভ হয়েছিলো তার মীমাংসা এখনও হয়নি।

www.pathagar.com

বর্তমানে ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাহায্যে পণ্ডিতেরা বলেন, রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে দানিয়ুব নদীর তীরাঞ্চলে ছিল আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির জন্মস্থান। এখন থেকে আনুমানিক ২০০০ খ্রিস্টপূর্বে আর্যভাষী একটি গোষ্ঠী এশিয়া মাইনরের কাপ-পাদোদিয়া অঞ্চলে ও ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যভাষী অপর একটি গোষ্ঠী মধ্য এশিয়ায় আমু-শিরদরিয়ার উপত্যকায় এসে বসবাস করতে থাকে এবং এখান থেকে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে একদল ইরানে ও অপরদল ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ বা ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। অন্যমতে ভারতে আর্য বর্গের জনগোষ্ঠীর দুইটি দল ভারতে প্রবেশ করে। প্রথম দলটি ছিল আলপ্ পর্বতবাসী। এজন্যে এদেরকে আলপীয় বা আলপাইনীয় আর্য বলা হয়। এরা বৈদিক আর্যদের অন্তত হাজার বছর আগে এশিয়ামাইনর ও মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং অপর শাখার আর্যরা বাস করত দানিয়ুব নদীর উপত্যকায়। তারা একদিকে যেমন উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব য়ূরোপে ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি এশিয়ামাইনর-কৃষ্ণহ্রদ হয়ে মধ্য এশিয়ার আমু-শির দরিয়ায় অনেককাল বসতি করার পরে জ্ঞাতিবিরোধের ফলে অসুর পন্থীরা (অহুরামজদা) ইরানে এবং দেবপন্থীরা (দেইব) ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে প্রবেশকারী বিজেতা অর্যরা বৈদিক আর্য নামে পরিচিত। এ জন্যই এশিয়া-য়ুরোপের আর্যভাষায় আজো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় এবং ইরানের প্রাচীন জেন্দ আবেস্তার ভাষায়ও বৈদিক ভাষায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। ম. মু.

আর্যদেব : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর্যবেদ নামে দুজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে এই নামের একজন কবি অনেকগুলো সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করে মহাযান ধর্মমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে চর্যাপদেরও একজন কবির নাম আর্যদেব। ৩১ নং চর্যাটি তাঁর রচনা। তাঁকে কম্বলাম্বরের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। কম্বলাম্বরের সময়কাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক। শেষোক্ত আর্যদের কানেরী গীতিকা নামক গ্রন্থেরও প্রণেতা। মু. আ. জ.

আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প : হিন্দু পুরাণের ন্যায় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক গ্রন্থ। এতে রাজনৈতিক ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বিবৃত হয়েছে। ইতিহাস না হলেও 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প' মধ্য যুগের বৌদ্ধ জগতে রক্ষিত প্রাচীন ও প্রকৃত কিংবদন্তীমূলক সংকলন বলে ধারণা করা হয়। এতে নৃপতিদের পুরো নাম না দিয়ে কেবল আদ্য অক্ষর বা সমার্থক শব্দ প্রদত্ত হয়েছে। এই গ্রন্থোক্ত রাজা সোম সম্ভবত শশাঙ্ক, 'হ' হর্ষবর্ধন ও 'র' রাজ্যবর্ধন। বাংলাদেশের রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের যে সংঘর্ষ হয়, তার বিবরণ এই গ্রন্থ থেকেই গৃহীত। পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য না হলেও হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে এর কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং হরিকেল সিলেটের সমার্থকরূপে উল্লিখিত হয়েছে। আ.ন.ম.র.

আর্য্যগাথা (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত কাব্যগ্রন্থ। ১ম ও ২য় ভাগের প্রকাশকাল যথাক্রমে ৫ মার্চ ১৮৮২ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩। আর্য্যগাথা ১ম ভাগ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম গ্রন্থ। আর্য্যগাথা মূলত গানের সংকলন। প্রথম ভাগের গানগুলোকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন—প্রকৃতিবিষয়ক গান, ভগবদ্ চিন্তার প্রকাশ, বেদনাবিহবলতা ও দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি। গানগুলোতে কবির সহজাত প্রাণের আকুতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, জীবন সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ নেই। প্রকৃতির মানসলোকেই কবির বিচরণ। ভগবদ্প্রেমমূলক কবিতাগুলোতেও আধ্যাত্মিক চিন্তার গভীরতা নেই। সর্বত্রই একটা বিষণ্ন ভাব কবিচিত্তকে আচ্ছন্ন করে

www.pathagar.com

আছে। ১ম ভাগে প্রকৃতিপূজা বিষয়ক কয়েকটি গান—বীনা, প্রকৃতি-স্তোত্র, নীহার, কাননকুসুম, তরু, তটিনী, হ্রদ, জন্মভূমি ইত্যাদি। ঈশ্বর-স্তুতি বিষয়ক—মন ভাব তাঁরে, এস এস এস নাথ, এস হে হৃদয়বন্ধু, কত আর প্রেমময় ইত্যাদি। বিষাদোচ্ছ্বাসমূলক--নিশীথে গান শুনিয়া, দুঃখশোক-পরিপূর্ণ, বিষাদসঙ্গীত, সান্ধ্য-চিন্তা, নিশীথ, স্মৃতি, অশ্রুজল ইত্যাদি। ১ম ভাগের 'আর্য্যবীণা' অংশে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশপ্রেমমূলক গান--বীণা বাজিবে কি আর, স্বদেশ-স্তোত্র, ভারতমাতা, বিষণ্ণা ভারতী, কেন রে ভারতবাসী, আর্য্যবিধবা, আয় ভারত সন্তান, আর্য্যইতিহাস ইত্যাদি। আর্য্যগাথা ২য় ভাগের কবিতা ও গানে কবির কল্পনাপ্রদান হৃদয়োচ্ছ্বাসের চেয়ে মানবিক প্রেমানুভূতির পরিচয় সুস্পষ্ট। ২য় ভাগের মূল উৎস নারীপ্রেম। বিশ্বপ্রকৃতিও যেন কবির বাস্তব কল্পনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর প্রেয়সীকে প্রকৃতির প্রসাধন-বৈচিত্র্যে অলঙ্কারমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। কবির এই রূপকল্পে কৃত্রিমতার স্পর্শ নেই। কল্পনালক্ষ্মী ও রক্ত মাংসের মানবী দুজনকেই কবি আরাধনা করেছেন। কবিকল্পনার রক্তমাংসের মানবীটি যখন জ্যোতির্ময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছে, তখন গান ও কবিতার গীতিরস উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছে। আর্য্যগাথা ২য় ভাগে দ্বিজেন্দ্র-লাল কয়েকটি ইংরেজি, স্কচ ও আইরিশ কবিতার অনুবাদ করেছেন। ২য় ভাগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গানের প্রথম কলি--এসেছ তুমি/বসন্তের মত মনোহর, ছিলে বা তখন/পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল, তার সরল সুঠাম দেহ, আয় আয় আয় লো যমুনে আয়, আয় রে প্রাণের আলো, বড় সাধে নিরাশ কৈলে নাথ ইত্যাদি। আ.ই

আল-আমিন : অর্থ বিশ্বাসী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে তাঁর সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, চারিত্রিক নির্মলতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণের জন্য সমকালীন আরববাসী 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিবি আমিনার গর্ভে ইসলামের পূণ্যভূমি মক্কায় ২৯ আগস্ট (১২ রবিউল আউয়াল), ৫৭০ খিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ তাঁর জন্মের পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লালন-পালনের সকল দায়িত্ব পিতামহ আবদুল মুত্তালিব গ্রহণ করেন। তিনি নবজাত শিশুর নাম রাখেন মুহাম্মদ যার অর্থ প্রশংসিত। আল-আমিন উপাধি পাওয়ার মতো অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হন বিশ্বনবী মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "ইন্নি লাকুম্ রাছুলুন আমিন" অর্থ "আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাছুল" (২৬ : ১০৭)। সুরা তাকবীরে আরও বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী, যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বস্ত (আমীন)" (৮১ : ১৯-২১)। আ. সৈ. গো. দ.

আল্-ইস্লাম : 'ইসলামী সাহিত্য মাসিক'। সম্পাদক : আল্হজ্ব মোমিন উদ্দীন আহমদ। প্রথম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ-১৩৬৪ (জানুয়ারি-১৯৫৮) সালে প্রকাশিত হয়েছিলো। ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করলে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানা যায় : 'দীন ও দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র আল্লার মনোনীত ধর্ম ইসলামের শাশ্বতবাণীর সুষ্ঠু প্রচার ও তার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করাই আল্-ইস্লামের মূখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বুক হইতে সর্বপ্রকার কুসংস্কার, অসত্য, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, ঘুষ, ধোকা, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী ও অধর্মকে নির্বাসিত করিয়া তদস্থলে ইসলামের ন্যায়বিচার, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও ঐক্য স্থাপন, শিক্ষার আমূল সংস্কারসাধন করত প্রকৃত ধর্মভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে

www.pathagar.com

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা জাতীয় সম্পদের প্রাচুর্যবিধান, সুদ ও ধনতান্ত্রিকতা দূর করিয়া জাতীয় অর্থের সুষ্ঠু বণ্টন দ্বারা ইসলামী অর্থনৈতিক ভারসাম্য স্থাপন করিয়া কমিউনিজম ও নাস্তিকতার গতিরোধ করণ এবং সর্বোপরি দুঃখ-দৈন্য ও দুর্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত জনগণের অকৃত্রিম ও অকুণ্ঠ সেবার দ্বারা দুনিয়ার বুকে প্রকৃত ধর্মরাজ্য বা জান্নাতের নমুনা প্রতিষ্ঠার জন্যই 'আল্-ইসলামে'র এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশ। ......ইসলামের ব্যাপক খেদমতই 'আল্-ইসলামের' প্রধান উদ্দেশ্য।' রেজিস্টার্ড নং ডি-এ. ৩৪১, মূল্য প্রতি সংখ্যা। আট আনা, বার্ষিক-সাড়ে পাঁচ টাকা, ষান্মাষিক তিন টাকা। পত্রিকাটি ১৪ নং ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ধানমন্ডী, পোঃ রমনা, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোমিন উদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত, হেজাজ প্রেস, ২০ কৈলাশ ঘোষ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা সাওগাত প্রেস, ৩৬ নং লয়াল স্ট্রীট, ঢাকা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, আলতাফ প্রেস, ১১ নং শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লেন, ঢাকা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। আল্-ইসলামের প্রকাশ অনিয়মিত ছিলো এবং উহা বিভিন্ন প্রেসে ছাপা হতো। কিন্তু উহা বেশ কিছুদিন (১৯৬১?) স্থায়ী হয়েছিলো।
মু.আ.জ.

আল্ইস্লাহ্ : সাহিত্য মাসিক। সম্পাদক : মুহম্মদ নূরুল হক। ১ম বর্ষ থেকে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদা ছিল এক টাকা। ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৪৫) থেকে বার্ষিক চাঁদা এক টাকার স্থলে দু'টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ সময় ষান্মাসিক চাঁদা এক টাকা দু'আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। রেজিস্টার্ড নং সি. ২০৮৩, কোটি চাঁদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, সিলেট থেকে মুহম্মদ নূরুল হক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পত্রিকাটিতে ইসলাম ধর্মের বৈচিত্রময় নানারূপ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতিও এতে স্থান পায়। পত্রিকাটি ১৩৪১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সাময়িকীটি ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন যুগিয়েছিল। ৩৯শ বর্ষ : ১০-১২শ সংখ্যা (যুগ্ম সংখ্যা) সংখ্যার বার্ষিক চাঁদা সডাক-ছয় টাকা, প্রতি সংখ্যা-আট আনা। আলোচ্য সংখ্যায় সম্পাদকের 'নিবেদন' : 'এই সংখ্যার সহিত আল্-ইস্লাহে্র বর্ষ শেষ হইল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কাল কি ঘটিবে কিছুই বলা যায় না। তাই আমরা স্থির করিয়াছি যে ৪০শ বর্ষের আল্-ইস্লাহ্ বর্তমানে প্রকাশ স্থগিত রাখিব। তারপর দেশের অবস্থা বুঝিয়া যে কোন মাস হইতে নবকলেবরে আল্-ইস্লাহ্ প্রকাশের আয়োজন করিব।' ৩৯শ বর্ষ : ১১শ-১২শ সংখ্যা, ফালগুন-চৈত্র-১৩৭৭ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ-১৯৭১) সালে প্রকাশিত হয়েছিলো। উহার রেজিস্টার্ড নং ডিএ-৯২। উহা মুহম্মদ নূরুল হক কর্তৃক সিলেটের 'লিপিকা-প্রিন্টার্স' থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মু.আ.জ.

আলকাপ/আলকাফ : এক বিশেষ শ্রেণীর লোকনাট্য যা দর্শকদের নিয়ে অভিনীত হয় অর্থাৎ দর্শক পরিবেষ্টিত হয়ে এ নাটকের আসর বসে। 'কাপ' অর্থ নাটক। 'আল' শব্দের অর্থ রঙ্গরস। এটি প্রাচীন বাংলা শব্দ। সুতরাং 'আলকাপ' বলতে বোঝায় রঙ্গরসাত্মক নাটিকা বা কৌতুক নাটিকা। সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিউমার ও উইট-এর সমন্বয় ঘটে এ নাটকে। আলকাপের লিখিত রূপ থাকে না। এ নাটক ছড়া, গান ও নাচের সম্মিলনে আলকাপের নিজস্ব গায়নরীতিতে পরিবেশিত হয়। এতে নির্দিষ্ট কোনো নাট্যকার নেই, তাই সংলাপ মুখস্থ করবার দরকার হয় না। একটা অস্পষ্ট কাঠামো শিল্পীদের মনের ভিতরে থাকে যা আসরের চাহিদা ও চরিত্র অনুযায়ী পূর্ণতা লাভ করে। সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতি কিংবা সামাজিক সমস্যা এ

www.pathagar.com

নাটকের বিষয়বস্তু। মূলত গ্রামীণ জনসমাজ থেকেই আলকাপের উদ্ভব ও বিকাশ। আলকাপ নাটকের দলে কমপক্ষে দশজন অভিনেতা থাকে। একজন থাকেন ওস্তাদ বা মাস্টার, একজন সঙাল বা কমেডিয়ান, এক বা দু'জন ছোকরা নাচ-গান করে এবং স্ত্রী চরিত্রে রূপ দেয়। এ ছাড়া থাকে কয়েকজন বাদক ও দোহার। আলকাপ দলের মূল স্তম্ভ হলো নাচিয়ে ছোকরা এবং সঙাল। নাচিয়ে ছোকরার বয়স বার থেকে বিশ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। তার সাজ-পোশাক হয় মেয়েদের পোশাকের মতো। এমনকি মাথার চুলও লম্বা থাকে। আলকাপে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে হারমোনিয়াম, ডুগডুগি, তবলা, কয়েক জোড়া করতাল ও খঞ্জনি। হারমোনিয়ামে সুর বাজিয়ে দলের সবাই গলা মিলিয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে নাটকের দৃশ্যপট উন্মোচন করে। প্রথমে সরস্বতী, তারপর অন্যান্য দেব-দেবী, স্থানীয় পীর ও সবশেষে ওস্তাদ তানসেনের নামে তারা জয়ধ্বনি দেয়। এ ছাড়া দলের প্রথম দীক্ষাগুরু ও পরবর্তী সময়ের ওস্তাদদের নামেও জয়ধ্বনি দেওয়া হয়। জয়ধ্বনির পর শুরু হয় সমবেত বন্দনা। নাট্যদলের ছোকরা হলো বন্দনার মূল গায়ক। অন্যরা দ্রুততালে ধুয়ো গায়। তারপর দু'তিন মিনিটের গৎ বাজিয়ে নাচিয়ে ছোকরাকে প্রস্তুত করা হয়। তখন সে আসরে এসে গান গাইতে থাকে। খেমটা, টপ্পা ও ঝুমুর জাতীয় গান হয়। সব গান ও ছড়াতেই ধুয়ো দেওয়ার রীতি প্রচলিত। ছোকরার নাচ-গানের পর আসরে নামে সঙাল। সঙাল ছোকরা ও দলের সঙ্গে কিছুটা রঙ্গ-রসিকতা করে। এ পর্যায়ে এসে ছোকরা ও সঙাল দ্বৈতগান পরিবেশন করে। সবশেষে আসেন ওস্তাদ। তিনি তাৎক্ষণিক বিষয় নিয়ে মুখে মুখে ছড়া গান বাঁধেন। এভাবে জমে ওঠে আলকাপের আসর। আলকাপ নাটকে দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রীতিও রয়েছে। এ ধরনের আসরকে বলা হয় 'পাল্লার আসর'। আসরের দুই প্রান্তে বসে দুই দল। মুখে মুখে ছড়া ও গান বেঁধে একে অন্যকে হারাবার প্রয়াসে মেতে ওঠে। অন্যান্য লোকনাট্যের মতো আলকাপের বক্তব্য জোরালো ও তীর্যক হয়ে থাকে। সাধারণত আলকাপের সময়কাল হয় আধঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ আড়াই ঘণ্টা। নাটক চলাকালে দৃশ্যপট পরিবর্তন বোঝানোর জন্য বাজনা বাজানো হয়। এ নাটকে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে কথাবার্তা এবং হাস্য-পরিহাস চলে। দর্শকদের সঙ্গে নিয়েই নাটক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। অভিনেতারা উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সংলাপ তৈরি করে। আবার গানে গানেও সংলাপ বলে। এদিক থেকে এ নাটককে অপেরার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কখনও কখনও আলকাপে কাল্পনিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করে দর্শককে স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন আলকাপের আসর যেন 'মায়ার' আসরে পরিণত হয়। আবার মুহূর্তের মধ্যেই ওস্তাদ বাস্তবতার আবহ তৈরি করেন। আলকাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ দর্শক। দর্শকের অংশগ্রহণ ব্যতীত আলকাপে প্রাণ আসে না। এ নাটক হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আসর। এখানে ধর্মের স্থান গৌণ, মানুষই মুখ্য। ড.শা.আ.

আলট্রাইজম্ : ইংরেজি সাহিত্যে চরমপন্থার অনুসরণকে আলট্রাইজম্ নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সমালোচক আলট্রাইজম্ বলতে মানবতাবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা প্রসূত একটি বিশেষ মতবাদকে বুঝে থাকেন। আলট্রাইজম্ মতবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যিকগণ মনে করেন বিশ্বসৃষ্টির মূল রহস্যে মানবজাতির স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু নেই। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টা প্রাণীজগতের সবার জন্য একই নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা এই বিশ্বাসের জোরে মানুষের জন্য যে সুবিধাজনক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে, আলট্রাইজম্ মতবাদ অনুযায়ী সেই বিধি-ব্যবস্থার কোনো মূল্য নেই এবং তা জীব-সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেয়। তাই প্রকৃতির জগতে মানুষের জন্য কোনো স্বতন্ত্র নিয়ম প্রবর্তিত হতে পারে না। ইংরেজি

সাহিত্যে আলট্রাইজমের প্রকাশ সোচ্চার হলেও বাংলা সাহিত্যে তার প্রকাশ এখনো তেমন সুস্পষ্ট নয়। আ. ই

আলতাফ মাহমুদ : সঙ্গীতশিল্পী। ১৯৩৩ সালে বরিশাল শহরের ফকির বাড়ি রোডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কোনো ওস্তাদের কাছে গান শেখেন নি। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা ছিল সহজাত। বাল্যকাল থেকেই ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। নিজের সাধনায় গণসঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১৯৫১ সালে যুবলীগের (১৯৫১) সাংস্কৃতিক অঙ্গসংগঠন শিল্পী সংসদের সঙ্গীত পরিচালকের পদ লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' কবিতাটিতে গানের সুর দেন। সুরটি বিপুলভাবে মানুষকে আন্দোলিত করে এবং কবিতাটি একটি জনপ্রিয় গণসঙ্গীতের মর্যাদা পায়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি গানটি পরিবেশন করেন। তাঁর সাধনার ফলে গানটি একুশের প্রভাত-ফেরীর গান হিসেবে সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়। বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও তাঁর সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কার বউ, রহিম বাদশা ও রূপবান, বেহুলা, আগুন নিয়ে খেলা, সংসার, আঁকাবাঁকা, আদর্শ ছাপানমানা, নয়নতারা, শপথ নিলাম, প্রতিশোধ, কখগঘঙ, মিশর কুমারী, কুচবরণ কন্যা, সুয়োরাণী দুয়োরাণী, আপন দুলাল, সপ্তডিঙ্গা ইত্যাদি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন। আলতাফ মাহমুদ ছিলেন গণ-মানুষের শিল্পী। গান গেয়ে বাঙালির জাতীয় সত্তাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর সঙ্গীতচর্চার লক্ষ্য। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে, ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে, ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের মিছিলে ও মিটিংয়ে গণসঙ্গীত গেয়ে সংগ্রামমুখর জনতার চেতনাকে শাণিত করে তুলেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকায় বসে গণজাগরণমূলক গান লিখে স্বাধীন বাংলা বেতারে পাঠাতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্য ও টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। ৩০ আগস্ট (১৯৭১) ঢাকার আউটার সার্কুলার রোডের বাসা থেকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। দখলদার বাহিনীর হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। নূ.ই

আলপনা : এক বিশেষ ধরনের চিত্রকর্ম যা লোকশিল্পের আওতায় পড়ে। আলপনা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের গ্রামে ও শহরে সমানভাবে প্রচলিত। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য আলপনা অঙ্কন। এই চিত্রকর্ম নকশার আঙ্গিকে সম্পাদিত হয়। গ্রাম-বাংলার ঘরের মেঝে ও মাটির দেওয়ালে আলপনা এঁকে সুসজ্জিত করার রীতি বহুকাল ধরে প্রচলিত। ব্রতের অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়া হয় চালের পিটুলীর মাধ্যমে। ঘন চালের পিটুলী তৈরি করে মধ্যমা, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর সাহায্যে পুরানো কাপড়ের টুকরো কিংবা পাটের টুকরো সেই পিটুলীতে ভিজিয়ে নিয়ে অনামিকা দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। সূক্ষ্মরেখা আঁকতে কনিষ্ঠা আঙুলের ব্যবহার হয়। আলপনার ছবিগুলো প্রধানত জ্যামিতিক ও দ্বিমাত্রিক। আলপনার চিরাচরিত মোটিফ হল — পদ্ম, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানের গুচ্ছ, ষষ্ঠীর পুতলি, সর্পিল রেখা, বৃত্তায়িত রেখা, পেঁচা, কলাগাছ, ফুলগাছ, নৌকা, রথ, কল্কা, উদীয়মান সূর্য, গহনা, গোলাবাড়ি, তৈজসপত্র, নানাবিধ পার্থিব সম্পদ প্রভৃতি। বিভিন্ন ব্রতের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত আলপনার মোটিফে রূপভেদ পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া তন্ত্রের নানারকম অলঙ্কৃত চিহ্নের সূক্ষ্ম ও জটিল রূপায়নও আলপনায় দেখা যায়। গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে আলপনায় প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহারই বেশি দেখা যায়। মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে মানুষ বিশেষ বিশেষ চিহ্নকে শুভচিহ্ন হিসেবে ভাবতে শুরু

www.pathagar.com

করে এবং আলপনার মোটিফে তার ব্যবহার চালু করে। বর্তমানে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বিভিন্ন উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠানে আলপনার ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে হাল আমলের এই আলপনার মোটিফে প্রাচীন লোকশিল্পের প্রভাব তেমন নেই। কারণ এর সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারের সম্পর্ক একেবারেই নেই। বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির স্মারক 'শহীদ মিনারের' পাদদেশে সাদা রঙের মোটা তুলির আঁচড়ে আঁকা আলপনা এক নতুন অভিধা লাভ করেছে। প্রতি বছর একইভাবে এই আলপনা আঁকার পুনরাবৃত্তি ঘটতে ঘটতে এই রীতি বর্তমানে সারা বাংলাদেশে প্রচলিত। বলা যায়, এটিই আমাদের একমাত্র লোকচিত্র যা লোকসমাজের একান্ত নিজস্ব সম্পদ, যার শিকড় লৌকিক ধ্যান-ধারণার অন্তঃস্থলে প্রোথিত হওয়া সত্ত্বেও আজ তা গ্রাম ও নগরবাসী নির্বিশেষে সকল বাঙালির সুরুচির প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া বিয়ে এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পিঁড়ি, কুলা, মঙ্গলঘট, লক্ষ্মীর সরা, সখের হাঁড়ি, কলসি প্রভৃতির গায়ে এবং ঘরের সিঁড়ি ও মেঝেতে সুশোভিত রঙিন চিত্রে প্রতিফলিত আলপনার নকশা আমাদের ঐতিহ্যময় লোকচিত্রেরই প্রতিভাস। ড. শা. আ.

আলফ্রেড টেনিসন : কবি। ইংল্যান্ডের অন্তর্গত লিঙ্কনশায়ারের এক গ্রামে ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক পল্লী-পুরোহিত। সেকালের প্রথানুযায়ী টেনিসনকে (Tennyson) গ্রামার স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলে তাঁর অধ্যয়নে অনুরাগ ছিল না। পিতার কাছেই লেখাপড়া করতে থাকেন। বাল্যবয়সেই কবিতা লেখা শুরু হয়। কেম্ব্রিজে পড়াশোনা শেষ করার পর তাঁর বিখ্যাত কবিতা "লেডী অব সোলট" (Lady challote) ও "লোটাস ঈটার্স" (Lotus Eaters) প্রকাশিত হয় এবং তিনি মুক্তছন্দের একজন প্রভাবশালী কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। "মর্ট ডি আর্থার" (Morte d Arthur) নামক কবিতা তাঁর জন্য নিয়ে আসে প্রার্থিত যশ ও স্বীকৃতি। এরপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের রাজকবি ছিলেন এবং আভিজাত্যসূচক 'লর্ড' (পীয়রেজ) উপাধিতে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর মধ্যে "ইন্‌মেমোরিয়ম" (In Memoriam), "মড" (Maud) ও "আইডিল্‌স্ অব দি কিং" (Idylls of the King) প্রধান। সমালোচকদের মতে, টেনিসনের লেখায় গ্রাম জীবনের ঐতিহ্য ও শোভা ছন্দাকারে রূপলাভ করেছে। ১৮৯২ সালে পরলোক গমন করেন। ম. ই.

আল-ফারূক : আল্লামা শিবলী নোমানী রচিত একটি উর্দু জীবন-চরিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৮৯৯ সাল। এই গ্রন্থে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূকের ঘটনাবহুল জীবনী, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান, আদর্শ শাসন প্রণালী এবং তাঁর মহান চরিত্র বিশদভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। গ্রন্থকার শিবলী নোমানী এর জন্য ১৮৯২ সালে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁকে ইস্তাম্বুল, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করতে হয়। উর্দু সাহিত্যের জীবনচরিত শাখায় 'আল-ফারূক' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উমর ফারূক সম্পর্কে তথ্যাদি জানার পক্ষে এটি একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। বাংলায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আ. রা.

আলবানীয় : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের শতম বর্গের ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাকে প্রধানত কেন্তম ও শতম বর্গে ভাগ করা হয়েছে। চারটি শাখাকে শতম বর্গের মধ্যে দেখানো হয়েছে। সে চারটি ভাষা হচ্ছে বাল্টো-শ্লাভিক, আলবানীয়, আর্মানীয় এবং ইন্দো-ইরানীয়। আলবেনীয়া রাষ্ট্রের প্রধান ভাষা আলবানীয়। বর্তমানে এ ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষের মতো। ম. মু.

www.pathagar.com

আলবেয়ার কামু : আলজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলে Albert Camus-এ জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ ৭ নভেম্বর ১৯১৩। তাঁর পিতা একজন সাধারণ কৃষিকর্মী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কামুর দরিদ্র পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়ে। বৈরী পরিবেশে লালিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৬ সালে কামু আপন চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল দর্শন। প্রথম জীবনে কামু দারিদ্র্যের কারণে এবং মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে জীবন সম্পর্কে খানিকটা নিরাশাবাদী হয়ে পড়েছিলেন। যক্ষ্মারোগে কামু এক সময় মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি বেঁচে উঠেছিলেন। আর বেঁচে উঠেছিলেন বলেই বিশ্ব একজন অসাধারণ সাহিত্যিককে হারানোর অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়। প্রথম জীবনে আলবেয়ার কামু ফ্রান্সের একটি সম্পাদকীয় দপ্তরে চাকুরি নেন। কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। স্কুলের শান্ত নির্মল পরিবেশ তাঁকে সাহিত্যচর্চার সুযোগ এনে দেয়। ১৯৪২ সালে ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কামুর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস The Plague (১৯৪৭) যুদ্ধোত্তর য়ুরোপিয় সাহিত্যের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি। পুস্তকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একমাত্র ফ্রান্সেই এর সোয়া লক্ষ কপি বিক্রি হয়। কামুর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- 'দি আউট সাইডার', 'দি মিথ অব সিসিফার' এবং 'দি ফল'। ১৯৫৭ সালে আলবেয়ার কামু সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬০ সালে এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। **মু. আ. জ.**

আলবেরুনী : সত্যেন সেন রচিত জীবনভিত্তিক উপন্যাস। সত্যেন সেন বইটি লিখেছেন জেলে বসে, উৎসর্গ করেছেন তাঁর সেজদা ও প্রতিমা বউদিকে। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে, প্রকাশ ভবন থেকে, পুনর্মুদ্রিত হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় (১৯৭১) কলকাতা থেকে মুক্তধারা প্রকাশনীর উদ্যোগে। বইটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় মুক্তধারা, ঢাকা থেকে ১৯৮৭ সালে। সর্বশেষ প্রকাশিত হয়েছে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী কর্তৃক। 'সত্যেন সেন রচনা সমগ্র'-এর চতুর্থ খণ্ডে উপন্যাসটি সংযোজিত হয়েছে, ১৯৮৭ সালে। হাজার বছর আগে ভারত-সন্ধানে আসা আরল সাগরের দক্ষিণের দেশ খোরেজমের উরগেঞ্জ শহরের বাসিন্দা- গণিতবিদ, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষানুরাগী এবং দেশপ্রেমিক আবু রায়হান বিন আহমদ আলবেরুনীকে নিয়ে। আলবেরুনীকে নিয়ে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন সত্যেন সেন। পরবর্তীকালে লেখক বলেছেন যে, জেলে বসে লিখেছেন তাই আলবেরুনীতে আরো বেশি তথ্য ও আলবেরুনীর দেশপ্রেমমূলক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস তুলে ধরতে পারেন নি। বই পাওয়া যায়নি, জেলখানার বদ্ধ পরিবেশ ও সরকারি বিধিনিষেধ ছিল। আলবেরুনীর সমসাময়িক আরো বহু ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ছিলেন কিন্তু আলবেরুনীর মতো দেশপ্রেমিক-প্রতিবাদী অন্যেরা কিন্তু ছিলেন না। সাহিত্যিক সত্যেন সেন সেজন্যই 'আলবেরুনী' কে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। বইটির প্রথম প্রকাশনার ভূমিকায় জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছিলেন : 'লেখক এই বইয়ের মারফতে এমন একজন মহা-ব্যক্তিত্বশীল সাহিত্যিক ভাবুক ও লোকপ্রেমিককে বাংলা পাঠকদের কাছে পরিচিত করে দিচ্ছেন যে, এই কাজটাকে আমি অশেষ পুণ্যের কাজ বলে মনে করি। আশা করি, পাঠক সমাজ এ-বই পড়ে আনন্দ পাবেন আর আত্মোন্নতির মত মহৎ ফলও পাবেন।' লেখক আলবেরুনীকে দেশ-কাল, জাতীয়তা ও ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত জগৎবিখ্যাত এক মানবতাবাদী পণ্ডিত হিসেবে অঙ্কন করেছেন। বর্ণনা কৌশলে আলবেরুনীর অদম্য জ্ঞানপিপাসা, প্রজ্ঞা ও মনীষা পাঠকের মনোজগৎকে

www.pathagar.com

আলোকিত করে। এখনও এই বইটির আবেদন অক্ষুণ্ন আছে। মা. রে.

আলম নগরের উপকথা : শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত একটি উপন্যাস। প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩৬২। এতে সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং উভয়ের দ্বন্দ্বের ফলে গণ-চেতনার বিকাশ চিত্রিত হয়েছে। সৈয়দ আসলাম একজন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত। তাঁর রন্ধনশালার বহিষ্কৃত কর্মচারী মীর খাঁ তেজারতি করে বিত্তশালী হয়। নবাবী জৌলুসের ব্যয় মেটাতে গিয়ে সৈয়দ আসলাম তাঁর বিষয়-সম্পত্তি মীর খাঁর নিকট বিক্রয়-বন্ধক রেখে গতায়ু হয়। নবাবজাদা আলমগীর বিলাত ফেরত উচ্চ শিক্ষিত ; সে সাম্যবাদী ও মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী। বাই মহলের কন্যা রোশন বাইকে ভালবাসতে সে সঙ্কোচ-বোধ করে না। মীর খাঁ তার ইংরেজি শিক্ষিতা কন্যা স্যালীকে আলমগীরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে চায়। সে আলমগীরকে বশীভূত করার জন্য কন্যাকে প্রলুব্ধ করে। স্যালী নবাব-পুত্রকে বশে আনতে ব্যর্থ হয়। মীর খাঁ আলমগীরকে পৈতৃক দেনার দায়ে মহল থেকে বিতাড়িত করে তার দখল নেয়। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাঁধে। মীর খাঁ রোশন বাইর শালীনতাহানী করতে গিয়ে নিহত হয়। রোশন স্যালীর হাতে নিগৃহীত হলে জনতা মহল ঘেরাও করে। স্যালী আগুন দিয়ে মহল পুড়িয়ে দেয়। আলমগীর বসবাসের জন্য একটি চালাঘর তৈরি করে। সে জনতার মুক্তির জন্য সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে। এ উপন্যাসে সৈয়দ আসলামের সামন্ততান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম, মীর খাঁর পুঁজিবাদী আচার-আচরণ, আলমগীরের বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা ও রোশনের সঙ্গে তার নিঃস্বার্থ প্রেম এবং আলমনগরের জনজীবনের ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার ও জীবন-সংগ্রাম সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে এই উপন্যাসের নাম ছিল 'বাইমহল' (১৩৬২), দ্বিতীয় সংস্করণে এর নাম রাখা হয় 'আলম নগরের উপকথা' (১৩৭১)। নূ. ই.

আলমগীর কবির : চলচ্চিত্রকার। পিতার কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশের রাঙ্গামাটিতে ১৯৩৮-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বরিশাল। পিতা আবু সাইয়েদ আহমেদ ছিলেন P.W.D-র একজন কর্মকর্তা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৫২), ঢাকা কলেজ থেকে আই.এস.সি. (১৯৫৪) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে বি.এস.সি. অনার্স (১৯৫৮) পাস করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বৃটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটে ইতিহাস, সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন (১৯৬২-১৯৬৪)। অতঃপর বিবিসি'তে ফ্রি লান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন (১৯৬৪-১৯৬৬)। ১৯৬৬-তে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বছর (১৯৬৭) ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডের' সিনিয়র এডিটর নিযুক্ত হন। চলচ্চিত্রের সমালোচক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঢাকা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের (১৯৬৯) তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। একজন মসিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকারের চিফ রিপোর্টার ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানের পরিচালক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে (১৯৭১) বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞকে ভিত্তি করে জহির রায়হানের পরিচালনায় নির্মিত চলচ্চিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'-এর তিনি চিত্রনাট্যকার ও ধারাভাষ্যকার। মুক্তিযুদ্ধের উপর একক প্রচেষ্টায় নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'লিবারেশন ফাইটার্স' (১৯৭১)। স্বাধীনতা লাভের পর সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র : 'ধীরে বহে মেঘনা' (মুক্তিকাল-১৯৭১), 'সূর্যকন্যা (মুক্তিকাল-১৯৭৬), 'সীমানা পেড়িয়ে' (মুক্তিকাল-১৯৭৭), "রূপালী সৈকতে'

www.pathagar.com

(মুক্তিকাল-১৯৭৯), 'মোহনা' (মুক্তিকাল-১৯৮০), 'পরিণীতা' (মুক্তিকাল-১৯৮৬) ও 'মনিকাঞ্চন' (মুক্তিকাল-১৯৮৮)। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র : 'প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' (মুক্তিযুদ্ধকাল-১৯৭২), 'কালচার ইন বাংলাদেশ', 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে'। চলচ্চিত্রের দক্ষ পরিচালক, হৃদয়গ্রাহী সংলাপ রচয়িতা ও সৃজনশীল চিত্রনাট্যকার হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। Cinema in Bangladesh (1979), This was Radio Bangladesh-1971 (1484) ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। ফেরী পার হওয়ার সময় যমুনা নদীতে নিমজ্জিত হয়ে ১৯৮৯-এর ২০ জানুয়ারি মারা যান। নু. ই

আল-মনসুর : পুরো নাম মুহম্মদ ইব্‌নে-আবী আমির আল-মনসুর। ৯১৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। আরব শাসিত স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও সেনাপতি হিসেবে পরিচিত। প্রথমে তিনি স্পেনের উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় হাকামের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ৯৭৭ সালে হাকামের মৃত্যুর পর তাঁর শিশু পুত্র খলিফা দ্বিতীয় হিশামের অভিভাবকরূপে স্পেন শাসন করতে থাকেন। তিনি 'আল-হাজিব আল-মনসুর' উপাধি ধারণ করে কার্যত স্পেনের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। খলিফা ছিলেন তাঁর হাতের পুতুল। শাসন সংক্রান্ত প্রায় সব কাজ তিনি নিজের নামেই করতেন। তাঁর নামেই মুদ্রাঙ্কণ ও খুতবা পাঠ হতো। আল-মনসুর আরবদের স্থলে বার্বারদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। উত্তর স্পেনের খ্রিস্টান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অনেকবার অভিযান চালিয়ে তিনি সাফল্য লাভ করেন এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উমাইয়া আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর আমলে স্পেন আগের চাইতে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিস্তার, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মহানুভবতার জন্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সদাশয়তা, ন্যায়-পরায়ণতা, দানশীলতা, সুবিচার ও মহৎ চরিত্রের কথা স্পেনে প্রবাদে পরিণত হয়। বিদ্রোহ দমনে তিনি ছিলেন কঠোরহস্ত ; আপন পুত্রকেও তিনি ক্ষমা করেননি। আল-মনসুর শেষ বয়সে তাঁর এক পুত্রের অনুকূলে পদত্যাগ করলেও মৃত্যু পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষমতা তাঁর হাতেই ছিলো। আল-মনসুরকে "খ্রিস্টীয় দশ শতকের বিসমার্ক" বলা হয়। ১০০২ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। আ. খা.

আল মাহমুদ : কবি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুর রব মীর। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জর্জ সিক্সথ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। সাংবাদিকতা ও চাকুরি তাঁর পেশা। ঢাকার সংবাদপত্র 'গণকণ্ঠ' (অধুনালুপ্ত)-এর সম্পাদক (১৯৭২-১৯৭৩), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক (১৯৭৫-১৯৯৫) এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'কর্ণফুলী'র সম্পাদক (১৯৯৫-)। একজন শব্দ-সৈনিক হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (১৯৭১) তিনি অবদান রাখেন। আধুনিক বাংলা কবিতার তিনি একজন বিশিষ্ট রূপকার। বাংলাদেশের লোকজীবন ও পল্লী প্রকৃতির স্নিগ্ধ-শ্যামল রূপ আল মাহমুদের কবিতায় মনোরমভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর কবিতা আন্তরিকতায় ঋদ্ধ এবং তাতে একটি শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া দেশমাতৃকার জাগরণের বাণী, ব্যক্তি-মানসের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সংগ্রামী চেতনা ও জীবনের প্রত্যয় পরিস্ফুটিত হয়েছে। আধুনিক আঙ্গিকে তিনি আঞ্চলিক শব্দ-সম্ভারের সুচারু ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিককালের কবিতায় ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্য বিধৃত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : লোক লোকান্তর

www.pathagar.com

(১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৫), সোনালী কাবিন (১৯৬৬), মায়াবী পর্দা দুলে উঠো (১৯৬৯), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৬), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭)। গল্পকার হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছেন। গল্পগ্রন্থ : পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪), গল্প সমগ্র (১৯৯৭)। উপন্যাস : ডাহুকী (১৯৯২), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫)। কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮) লাভ করেন। সাহিত্যে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদক (১৯৮৭)–এ ভূষিত করে। নূ. ই

আল মুজাহিদী : কবি। ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল হালিম জামালী। ১৯৫৭ সালে তিনি টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী সরকারী হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন ১৯৬৫ সালে। দুবছর পর আবার একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। বারো বছর বয়স থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। ছাত্রজীবনে লেখালেখির পাশাপাশি ছাত্র লীগের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত মুক্তিযুদ্ধের গান স্বাধীন বাংলা বেতারে হয়। আল মুজাহিদীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'হেমলকের পেয়ালা' (কাব্যগ্রন্থ) প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি শিশুদের জন্য বেশ কিছু উল্লখযোগ্য গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর ছড়া-কবিতা পাঠকনন্দিত। আলমুজাহিদী একজন সমাজসচেতন, মৃত্তিকামনস্ক কবি। তাঁর কবিতায় স্বদেশ, প্রকৃতি, মানবপ্রেম, জীবনাচরণের বিভিন্নদিক ফুটে উঠেছে। তিনি একজন গদ্য লেখকও। তাঁর রচনায় মননশীলতার ছাপ বিদ্যমান। এযাবৎ তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে দ্রুপদ ও টেরাকোটা, দূরপাবারবত, মৃত্তিকা অতিমৃত্তিকা, সিলুতট, সহস্র দিবস সহস্র রজনী, কাঁদো হিরাশিমা কাঁদো নাগাসাকি, কালের বন্দিশে, যুদ্ধনাস্তি, প্রিজন ভ্যান, প্রাচ্য পৃথিবী ও ধরিত্রীর ধুলো এবং ছোটদের জন্য রচিত হালুম হুলুম, তালপাতার সেপাই, ইস্টিশানে হুই সেল, সোনার মাটি রূপোর মাটি, আলোর পাখিটা, পালকি চলে দুলকি তালে, রূপালি রোদ্দুর, টপনের ডায়েরি ও লাল লণ্ঠন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। খা. বি. জ. উ.

আল-লাত : প্রাক্-ইসলামিক যুগে মক্কাবাসীদের একটি দেবমূর্তির নাম। সে সময়ে কাবা ঘরে আরব পৌত্তলিকদের উপাসনার জন্য ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। এগুলোর মধ্যে লাত, মনাত ও উয্যা ছিল সর্বাধিক পরিচিত। এদেরকে আল্লাহর কন্যা হিসেবে পৌত্তলিকরা উপাসনা করত। পৌত্তলিকরা এদের কাছে করুণা চেয়ে প্রার্থনা করত। রসুলুল্লাহ্ হিজরী অষ্টম সালে মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘরের এই সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করেন। আ.সৈ.গো.দ.

আলাউদ্দিন আল আজাদ : বিশিষ্ট সাহিত্যিক। নরসিংদী জেলার রায়পুর থানার রামনগর গ্রামে ১৯৩২ সালের ৬ মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গাজী আবদুস সোবহান। তিনি নারায়ণপুর শরাফত উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে প্রবেশিকা, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৪৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৫৪ সালে স্নাতকোত্তর ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ সালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। আলাউদ্দিন আল আজাদ সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত থাকলেও বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও চাকরি করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের

www.pathagar.com

সংখ্যা একশ'র কাছাকাছি। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার কিছু গ্রন্থ—ছোটগল্প : জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮)। উপন্যাস : তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), অপর যোদ্ধারা (১৯৯২)। কবিতা : মানচিত্র (১৯৬১), ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২), নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ (১৯৮৩)। নাটক : মরক্কোর জাদুকর (১৯৫৯), নরকে লাল গোলাপ (১৯৭২)। প্রবন্ধ : শিল্পীর সাধনা (১৯৫৮), সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু (১৯৭৪)। শিশুসাহিত্য : উপন্যাস—জলহস্তী (১৯৮২), রসগোল্লা জিন্দাবাদ (১৯৯৪)। পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (কর্ণফুলী উপন্যাসের জন্য, ১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৬)। আলাউদ্দিন আল আজাদ কথাশিল্পী, কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি মূলত প্রবন্ধ লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও পঞ্চাশের প্রারম্ভে ছোটগল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি'তে তাঁর আত্ম-প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের বাস্তববাদী ধারার এক সমৃদ্ধ সম্প্রসারণ। তাঁর কথাসাহিত্যে এদেশের ভূমিস্তর তথা গণজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও সংগ্রামের অনবদ্য রূপায়ণ ঘটেছে। কবিতায় প্রেম, বিপ্লব ও মানবভাগ্যের গভীর তরঙ্গ আবেগ ও প্রজ্ঞার আবহে মূর্ত হয়েছে। নাটকে তিনি মূলত নিরীক্ষাধর্মী। আজাদের প্রবন্ধাবলী সাহিত্যতত্ত্বের পরিধিতেই মূল আবর্তন লাভ করেছে, যেখানে তিনি আন্তঃসাংস্কৃতিক গতিধারারই প্রতিভূ। ম. ব.

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ : বাংলার স্বাধীন সুলতান। তাঁর পিতা আরব দেশ থেকে এসে মুর্শিদাবাদ জেলায় বাস করতে থাকেন। লেখাপড়া শেষ করে হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার গুণে হাবশী সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহের প্রধানমন্ত্রী হন। মুজাফ্ফর শাহ্ নিহত হওয়ার পর ১৪৯৩ সালে হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি দক্ষিণ বিহার (মগধ), কামরূপ, কুচবিহার, ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ ও চট্টগ্রাম জয় করে উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি হিন্দুদের উচ্চপদে চাকুরি দেন। তাঁদের মধ্যে উজির গোপীনাথ বসু, ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, প্রধান দেহরক্ষী কেশব ছত্রী, টাকশালার অধ্যক্ষ অনুপ, সেনাপতি গৌরমল্লিক, উপদেষ্টা রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শাসনামলে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। তিনি চৈতন্যকে খুব সম্মান প্রদর্শন করেন। হুসেন শাহের উৎসাহে বাংলা সাহিত্য প্রভূত উন্নতিসাধন করে। কবি মালাধর বসু ও বিজয়গুপ্ত তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস 'মনসামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। শ্রীকর নন্দী সর্বপ্রথম মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। অনেক বৈষ্ণব কবিতায় হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড়ের সোনা মসজিদ তাঁর স্থাপত্যকলার এক অমর কীর্তি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনের উদ্দেশ্যে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মের সংমিশ্রণে সত্যপীরের আরাধনা প্রচলন করেন। বাংলার এই বিচক্ষণ, উদার, সফল ও জনপ্রিয় শাসক ১৫১৯ সালে পরলোক গমন করেন। নূ. ই

আলাউদ্দীন খল্জী : দিল্লীর সুলতান। ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খলজী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন ফীরূয শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কন্যা-জামাতা। জালালুদ্দীন তাঁকে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ১২৯৬ সালে সুলতান জালালুদ্দীনকে হত্যা করে আলাউদ্দীন দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। বিজেতা ও শাসক হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। উত্তর

www.pathagar.com

ভারতের গুজরাট, চিতোর, মালব, উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণ ভারতের দেবগিরি, হোয়সল (মহিশূর), পাণ্ড্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসননীতির মূলকথা ছিল সুলতানের প্রাধান্য সর্বময় করে তোলা। এ ব্যাপারে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাসনব্যবস্থায় কতকগুলো সংস্কার-মূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেন। মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও ধনবান হিন্দুদের অর্থবল খর্ব করেন। রাজকর্মচারীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ বন্ধ করে দেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন। চাল, আটা, চিনি, তেল, কাপড় প্রভৃতির মূল বেঁধে দেন। ফলে জিনিস-পত্রের দাম খুব সস্তা ছিল। ধনীদের উপর নানা প্রকার কর ধার্য এবং ভূমি-রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন। অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির হাতে অবাধ অর্থ সমাগমের পথ বন্ধ হয়ে যায়, রাজকোষের আয় বৃদ্ধি পায়। আলাউদ্দীন একটি বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সাম্রাজ্য থেকে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র লোপ পায়। সুলাতন আলাউদ্দীন খল্‌জী ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাহসী, বুদ্ধিমান, তেজস্বী, বিচক্ষণ, বিদ্যোৎসাহী, শিল্পানুরাগী, কঠোর পরিশ্রমী এবং একজন সুদক্ষ শাসক। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ। শাসন ব্যাপারে তিনি কাজী, উলেমা প্রমুখের পরামর্শ গ্রহণ করতেন না। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম বৃহত্তর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আলাউদ্দীন নিরক্ষর ছিলেন, তবে বিদ্বানদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। বিখ্যাত কবি আমির খসরু তাঁর রাজত্বের গৌরব বৃদ্ধি করেন। মৃত্যু. ২ জানুয়ারি ১৩১৬। সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের কাহিনী অবলম্বনে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। নূ. ই

আলাওল : কবি। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারির জোবরা গ্রামে ১৫৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে ফরিদপুর জেলার ফতেহাবাদ পরগণার জালালপুর তাঁর জন্মস্থান। তাঁর পিতা ফতেহাবাদের অধিপতি সমশের কুতুবের সচিব ছিলেন। ফতেহাবাদেই আলাওল তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটান। একদা জলপথে চট্টগ্রাম যাবার সময় আলাওল ও তাঁর পিতা পর্তুগীজ জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন। ঘটনাস্থলে পিতা নিহত এবং আলাওল বন্দি অবস্থায় পর্তুগীজ নৌবন্দর দিয়াঙ্গায় নীত হন। সৌভাগ্যক্রমে রোসাঙ্গে আনীত হলে তিনি রোসাঙ্গ রাজের অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদানের সুযোগ পান। পরে সেনাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। রাজ-অমাত্য মাগন ঠাকুর আলাওলের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন। মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের ভাবানুবাদ করেন (১৬৪৫-১৬৪৮), যা 'পদ্মাবতী' নামে সুপরিচিত। ১৬৫৯ সালে তিনি দৌলত কাজীর (১৬০০-১৬৩৮) অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী' রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্য : 'সয়ফুলমুলক বদি-উজ্জামান' (১৬৫৬-১৬৬৯), 'তোহফা' (১৬৬৪), 'হপ্তপয়কর' (১৬৬৫), 'সিকান্দর নামা' (১৬৭১)। দিল্লির সিংহাসনের দখলকে কেন্দ্র করে সংঘটিত খাজওয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯) সুজা আওরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত হয়ে প্রথমে বাংলাদেশ, পরে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানে সুজা সপরিবারে নিহত হন (১৬৬০) এবং তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে আলাওল পঞ্চাশ দিন কারাভোগ করেন। আলাওল মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের এক অসাধারণ প্রতিভা। সে প্রতিভা বহুমুখী, কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, পাণ্ডিত্যে, দর্শনে তা স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত। ভাবৈশ্বর্যে ও রচনানৈপুণ্যে তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে তিনি

ক্লাসিক–রীতি বা শিষ্ট–বাণীভঙ্গি প্রবর্তন করেন। ধর্ম–সংকীর্ণতামুক্ত মানবিকতার ভাবধারা রূপায়ণ তাঁর কাব্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আলাওলের 'পদ্মাবতী' বাংলা কাব্য–সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। মৃত্যু. ১৬৭৩ সাল। নূ. ই.

আলাওল সাহিত্য পুরস্কার : ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা ১৯৬৯ সাল থেকে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। ১৯৭৫ সাল থেকে এই সংস্থা জাতীয় পর্যায়ে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তন করে। সংস্থার নিয়মানুযায়ী মৌলিক গ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। দু'বছর পর পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ প্রতিযোগিতার জন্য আহবান করে দেশেরে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বিচারকমণ্ডলী গঠন করা হয় এবং বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটিকে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিটি পুরস্কারের মান নগদ ৫০০০.০০ টাকা ও সংস্থার মনোগ্রাম খচিত একটি ফলক। বিদেশী কোন লেখকের বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন গ্রন্থ বা কোন লেখকের বাংলাদেশের বাইরে প্রকাশিত গ্রন্থ বিবেচনার জন্য গৃহীত হয় না। পুরস্কারের নীতিমালা কার্যকরী সংসদ নির্ধারণ করে। তবে প্রতি বছর কবিতা ভিন্ন অন্য দুটি বিষয় পরিবর্তিত হয়। আলাওল সাহিত্য পুরস্কার সর্বপ্রথম অর্জন করেন ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল। এ পর্যন্ত মোট ৩৭ জন লেখক এ পুরস্কার অর্জন করেছেন।। পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি যথাক্রমে ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালের কাব্য গ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৫), জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'শাজের সীমানা' (১৯৭৭), মিরজা আব্দুল হাইয়ের 'ছায়া প্রচ্ছায়া' (১৯৭৭), কবি রফিক আজাদের 'দুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' (১৯৭৯), মমতাজউদ্দিন আহামদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭৯), আখতার হুসেনের হৈ হৈ রৈ রৈ (১৯৭৯), মোহাম্মদ রফিকের 'কীর্তিনাশা' (১৯৮১). আব্দুল মান্নান সৈয়দের 'করতলে মহাদেশ' (১৯৮১), সেলিনা হোসেনের 'মগ্ন চৈতান্য শিস (১৯৮১). হাসান আজিজুল হকের পাতালে হাসপাতালে (১৯৮৩), নির্মলেন্দু গুনের 'অচল পদাবলী' (১৯৮৩), এখলাসউদ্দিন আহমদের 'অন্যমনে দেখা (১৯৮৩), মুহম্মদ নূরুল প্রদার শুক্লা শকুন্তলা (১৯৮৫), ড. আনিসুজ্জামানের 'পুরোনো বাংলা গদ্য' (১৯৮৫)। সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরুলদীনের কারা জীবন' (১৯৮৫), খন্দকার আশরাফ হোসেনের 'পার্থ তোমার তীব্র তীর (১৯৮৭), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলে কোঠার সেপাই (১৯৮৭), মহিদুল হাসানের 'মূলধারা একাত্তর' (১৯৮৭), হাবীবউল্লাহ সিরাজীর 'পোশাক বদলের পালা (১৯৮৯), শওকত আলীর 'শুন হে লখিন্দর (১৯৮৯), তপন চক্রবর্তীর 'কোথা থেকে কেমন করে এলাম (১৯৮৯), খালেদা এদিব চৌধুরীর 'তোমার পতাকা যারে দাও' (১৯৮৯), ওমর আলীর 'ফেরার সময়' ১৯৯১), বশরী আল হেলালের 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' (১৯৯১), মামুনুর রশীদের 'অববাহিকা' (১৯৯১), অসীম সাহার পুনরুদ্ধার (১৯৯৩), আবু ওসমান চৌধুরীর 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' (১৯৯৩), মঞ্জু সরকারের 'প্রতিমা উপন্যাস (১৯৯৩), মহাদেব সাহার 'এসো তুমি পুরানের পাখি' (১৯৫), শান্তনু কায়সারের 'তৃতীয় মীর' (১৯৯৫), নাসরীন জাহানের পাগলাটে এক গাছবুড়ো (১৯৯৫), মোফাজ্জল করিমের 'তোমার হাতে গ্রেনেড এবং আমার বুকে প্রেম', রাহাত খানের 'হে মাতঃবঙ্গ (১৯৯৭), আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (১৯৯৭), মাহবুব সাদিকের 'অনন্ত নক্ষত্র চোখ' (১৯৯৯), শহীদুল জহিরের 'ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প' (১৯৯৯), সুকুমার বড়ুয়ার 'ঠুসঠাস' (১৯৯৯)। পা. র.

www.pathagar.com

আলাপ : রাগ পরিবেশনার সময় গায়ক নোম-তোম প্রভৃতি বোল ও আকারাদি স্বরধ্বনির সাহায্যে বিলম্বিত লয়ে এবং অনিবদ্ধভাবে রাগের যে রূপ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন তাকে আলাপ বলা হয়। তবে আজকাল খেয়াল অঙ্গে নিবদ্ধ প্রথায় আলাপ প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রথাবদ্ধ আলাপের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা একমাত্র ধ্রুপদেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। ধ্রুপদেয় আলাপে চারটি তুক বা পর্যায় থাকে। আলাপে সাধিত রাগ রূপ বিস্তারের কৌশল ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী আলাপকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। মুখ্য আলাপ শ্রেণীসমূহ হচ্ছে : আওচায় আলাপ, বন্ধান আলাপ, কয়েদ আলাপ ও বিস্তার আলাপ। আলাপকে আলপন ও আলপ্তিও বলা হয়। ক. গো.

আলালের ঘরের দুলাল : প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালে। তার আগে রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদের স্বয়ং পরিচালিত 'মাসিক পত্রিকা'য় (১৮৫৭) 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আলালের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮৭০ সালে। জীবনের বিভিন্নমুখী তথ্যবহুল ঘটনার সমন্বয়ে উপন্যাসের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে। পারিবারিক জীবনের বাস্তব মুখীন চিত্র, আইন আদালতের কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা এবং চরিত্র অনুযায়ী নানা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে আলাল এবং তাঁর স্রষ্টার কৃতিত্ব ধরা পড়ে। মতিলাল এবং তার দুষ্কর্মের সহচরবৃন্দের কীর্তিকলাপে, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম প্রভৃতি কেউ অনুনাসিক উচ্চারণে, কেউ সঙ্গীত প্রিয়তায়, কেউ বাক্যভঙ্গির পুনরাবৃত্তিতে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে তা লেখকের মানবচরিত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র ঠকচাচা। বলা যায় উপন্যাসের নায়ক সে। যদিও মতিলালের জীবন-ইতিহাসই এতে প্রধান, তথাপি ঠকচাচার দ্বারাই কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ঠকচাচীও উজ্জ্বলরেখায় চিত্রিত হয়েছে। ঠকচাচা জালিয়াৎ ও ফেরেববাজ ধুরন্ধর। সব সত্ত্বেও সে পাঠকের চিত্তে অবলীলায় স্থান পেয়েছে। তবে 'আলালে' যে সংঘাতটি ফুটে উঠেছে তা বাইরের জিনিস, অন্তর্জীবনের কোনো দ্বন্দ্বের পরিচয় এতে নেই। চরিত্র অনুযায়ী কথ্যভাষার প্রয়োগ প্যারীচাঁদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। বাস্তব দৃষ্টি, চরিত্র সৃষ্টি ও কৌতুকাবহ চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে প্যারীচাঁদ এতে ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। সাধুভাষাকে কথ্যভাষার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি বাংলা গদ্যে সরসতা ও সজীবতা আনয়ন করেছেন। তাঁর গদ্যের ভিত্তি সাধু হলেও সরল ও সর্বজন গ্রাহ্য। শব্দ নির্মাণে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। একদিকে বাংলা গদ্যে রঙ্গরস এনেছেন, অন্যদিকে বাংলা ভাষায় সঞ্চারিত করেছেন কাহিনী বয়নের অপরূপ মাধুর্য। আ. ই.

আলাহিয়া : দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে কোমল ও শুদ্ধ উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। আরোহে শুদ্ধ নিষাদ ও অবরোহে কোমল নিষাদ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। জাতি সম্পূর্ণ। আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমেই সাত স্বর ব্যবহৃত হয়। বাদীস্বর ধৈবত, সংবাদীস্বর গানধার। ঠাট বিলাবল। আরোহ : স র গ ম প ধ ন র্স। অবরোহ : র্স ন ধ ণ ধ প ম গ র স। ক. গো.

আলাহিয়া-বিলাবল : দিবা গেয় রাগ। এই রাগে শুদ্ধ ও কোমল আরোহে ছয় স্বর ও অবরোহে সাত স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরোহে মধ্যম বর্জিত। বাদীস্বর ধৈবত, সংবাদীস্বর গানধার। ঠাট বিলাবল। আরোহ : স র গ র গ প ধ ন ধ ন র্স। অবরোহ : স ন ধ প ধ ণ ধ প ম গ ম র স। ক. গো.

আলিবাবা : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত গীতিনাট্য। প্রকাশ কাল ১৮৯৭ সাল। নাটকটি

বসুমতী-গ্রন্থাবলী সিরিজের অন্তর্ভুক্ত 'ক্ষীরোদ গন্থাবলী' ৫ম খণ্ডে সংকলিত। শত বছরের বাংলা নাটকের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এ গীতিনাট্য সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে প্রায় কিংবদন্তীর মর্যাদায় অভিষিক্ত। এর কাহিনীটি হলো : আলিবাবা ও কাসিম সহোদর ভাই। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে কাসিম ওমরা হয় আর আলি থেকে যায় কাঠুরিয়া। বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দস্যুদের গোপন আস্তানা ও লুণ্ঠিত ধনসম্পদের খোঁজ পায় আলী। সেখান থেকে মোহর নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলে কাসিম ও তার স্ত্রী সাকিনা আলীর মহর পাওয়ার কথা জেনে যায়। তারা লোভী হয়ে ওঠে ও কৌশলে আলিবাবার কাছ থেকে ধনসম্পদের গুহার সন্ধান জেনে নেয়। জেনে নেয় গুহামুখ উন্মুক্ত করার মন্ত্র। কিন্তু সেখানে গিয়ে কাসিম মন্ত্রভুলে আটকা পড়ে দস্যুদলের হাতে নিহত হয়। আলি গুহার সব সম্পদ ও কাসিমের লাশ নিয়ে এলে দস্যুরা কৌশলে তার বাড়ি খুঁজে বের করে। উনচল্লিশটি তেলের ড্রামের ভেতর সঙ্গী-দস্যুদের ভরে আলির বাড়িতে তাকে হত্যা করতে আসে দস্যু সর্দার। কিন্তু বাড়ির বাঁদী মরজিনার তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ফুটন্ত গরম তেলে দগ্ধ হয়ে মারা যায় তারা সবাই। পরে আবার যখন দস্যুসর্দার প্রতিশোধ নিতে ছদ্মবেশে আলির বাড়িতে আতিথ্য নেয়, তখনও বুদ্ধিমতি মরজিনা তাকে চিনতে পারে। নাচগানে মনোরঞ্জন করার ছলে ছুরিকাঘাতে সর্দারকে হত্যা করে। এমনিভাবে সবকিছু নির্বিঘ্ন হয়। সকলের ইচ্ছায় আলির ছেলে হুসেনের সঙ্গে মরজিনার বিয়ের পর হুসেন-মরজিনা নবাব ও বেগম হয়। আরব-পারাস্যের এই প্রচলিত কাহিনীকে গীতিনাটকে রূপ দিয়েছেন ক্ষীরোদ প্রসাদ। এর নাটকটিতে কাহিনী-উপস্থাপনায় মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে অত্যন্ত উপভোগ্য রঙ্গ-রসিকতার মাধ্যমে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে সাবলীলভাবে। একই সাথে সমাজের কিছু রূঢ় বাস্তবতা, রক্তের আত্মীয়তা সত্ত্বেও ধনী-গরীবের অবস্থানগত বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে। আর এতে উপস্থাপিত হয়েছে অতিরিক্ত লোভ-নীচতা-নিষ্ঠুরতার কঠোর পরিণাম এবং সততার জয়। রোমান্স, কৌতুক আর adventure-এর বিচিত্র সমাবেসে আলিবাবা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। র. আ. ক.

আলিবালি : এটি এক প্রকার মসলিন কাপড়ের নাম। আলিবালি বা আলাবালি শব্দের মূল নির্ণয় করা যায়নি। তবে তাঁতিদের মতে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার জন্য এ মসলিনকে আলিবালি নাম দেওয়া হয়েছিল। এর দৈর্ঘ্য ২০ গজ এবং প্রস্থ ১ গজ ছিল। এর সুতার সংখ্যা ১১০০ থেকে ১৯০০পর্যন্ত উঠানামা করত। এ কাপড়ের ওজন ছিল প্রায় ৪০ তোলা। ড.শা.আ.

আলী আসগর : বিজ্ঞান লেখক। ১৯৩৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ গোলাম হোসেন। পদার্থবিজ্ঞানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭০ সালে সাউথ হ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জমাট পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচ.ডি করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে শিশুতোষ রচনার মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। তাঁর প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলো বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞান অভিভাবন (১৯৮৯), ধূমকেতু (১৯৯১), ভাষা ও বিজ্ঞান (১৯৯১), বিজ্ঞান আন্দোলন : বিজ্ঞানের বিচিত্র জগত থেকে (১৯৮৯), শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা (১৯৯৭) ও অনুবাদয় গ্রন্থ : সূর্যের জন্ম ও মৃত্যু। ছোটদের জন্য রচিত তার গ্রন্থগুলোর ভাষা সহজ-সরল, বর্ণনাভঙ্গি চমৎকার। বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার জন্য চট্টগ্রামের বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক ১৯৯১ সালে শিক্ষা পুরস্কার এবং ১৯৯৫ সালে যশোরের বদরুল আলম ফাউন্ডেশন কর্তৃক পুরস্কৃত হন। বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলনেও খ্যাতি রয়েছে। খা. বি. জ. উ.

www.pathagar.com

আলী আহমদ : গবেষক। লক্ষ্মীপুর জেলার চর রোহিতা গ্রামে ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ইসমাইল গাজী, মাতা লায়লী বানু। স্থানীয় আহমদীয়া হাই মাদ্রাসা থেকে ১৯২৯ সালে এন্ট্রান্স, ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৩২ সালে এফ.এ., কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৩৫ সালে বি.এ., ঢাকা আর্মানিটোলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে বি.টি. এবং বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ সালে বাংলায় এম.এ. পাস করেন। আহমদীয়া হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক, কুমিল্লা জেলা স্কুলের ভার্নাকুলার শিক্ষক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বাংলার প্রভাষক, বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী উন্নয়ন অফিসার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষক পদে চাকরি করেন। নিষ্ঠাবান সংগ্রাহক ও নিবেদিতপ্রাণ গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অম্লান। বাংলা একাডেমীর শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ গড়ে তোলা হয়েছে তাঁর সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পুথি-পুস্তক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা দ্বারা। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি (১৯৮৫) গ্রন্থটি তাঁর গবেষণা কর্মের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। পুথিগতপ্রাণ ও জাতীয় ঐতিহ্যানুসন্ধানী আলী আহমদ ১৯৮৭ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নু. ই

আলী ইমাম : শিশু-সাহিত্যিক। পিতার নাম-আলী আকবর। ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। নওয়াবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে। এরপর স্নাতক সম্মান (বাংলা সাহিত্য) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে নির্বাহী প্রযোজকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে, প্রবন্ধ : সোনালী তোরণ (১৯৮৬), আলোয় ভুবন ভরা (১৯৮৭), কবিতা : ধলপহর (১৯৭৯), হিজল কাঠের নাও (১৯৮৮)। শিশুতোষ : দ্বীপের নাম মধুবুনিয়া (১৯৭৫), অপারেশন কাঁকনপুর (১৯৭৮), চারজনে (১৯৭৯), তিতির মুখীর চৈতা (১৯৭৯), সাদা পরী (১৯৭৯), পাখিদের নিয়ে (১৯৭৯), রূপালী ফিতে (১৯৭৯), সোনার তম্বুরি (১৯৮১), জীবন বাংলাদেশ : মরণ বাংলাদেশ (১৯৮১), ধূসর পুথি (১৯৮২), নীল ডুংরির আতঙ্ক (১৯৮১), প্রবাল দ্বীপের আতঙ্ক (১৯৮৩), ভিনদেশী কিশোর গল্প (১৯৯১), কাছ থেকে দূরে (১৯৯১)। জীবনী : খেয়াল খুশির রাজা (১৯৯১), ফোটে কত ফুল (১৯৯১)। আলী ইমাম ১৯৮৭ সালে ইকো সাহিত্যপুরস্কার, একই সালে নেধুশাহ সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৯০ সালে লেখিকা সংঘ পুরস্কার লাভ করেন। শিশু-কিশোরদের মাঝে তাঁর রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা তাঁর রচনার অদ্যতম বৈশিষ্ট্য। সৈ. আ. জা.

আলী (রা:) : মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা। ৬০০ সালে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মুহম্মদের পিতৃব্য আবু তালিবের পুত্র। শিশুকাল থেকে মুহম্মদের (দঃ) সাথে লালিত পালিত হন। আলী যখন দশ বছরের বালক তখন মুহম্মদ (দঃ) নবুয়ত পান। সেই বালক বয়সেই আলী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী যোদ্ধা এবং অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও বিক্রমের অধিকারী। বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁকে জুলফিকার নামক তরবারি উপহার দেন। খাইবারের সুরক্ষিত কামুস দুর্গ জয় করলে নবী (দঃ) তাঁকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর বাঘ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাধক। হাদিস,

www.pathagar.com

তাফসীর ও আরবি ব্যাকরণে ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। বিদ্যাবত্তার জন্য জ্ঞানের দ্বার উপাধি পান। নবী (দঃ) তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে আলীর সঙ্গে বিবাহ দেন। ওসমানের মৃত্যুর পর ৬৫৬ সালে আলী খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি শান্ত, দয়ালু ও সহিষ্ণু শাসক ছিলেন এবং দুর্বল ও দুস্থকে সদা সাহায্য করতেন। নিজে অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আলীর ত্যাগ, তেজ ও বীরত্ব বাংলাভাষী লেখকদের লিখনীতে নানা বর্ণে বিধৃত হয়েছে। ৬৬১ সালের ২৭ জানুয়ারি কুফার জুমা মসজিদে নামাজরত অবস্থায় আততায়ীর হাতে নিহত হন। **নূ. ই**

আলী রাজা (রজা)/কানু ফকির : জন্ম ওশখাইল, আনোয়ারা--চট্টগ্রাম, আঠারো শতক। সাধক, পণ্ডিত, পীর, তান্ত্রিক ও শাস্ত্রজ্ঞ কবি। পিতা মুহম্মদ শাহী। আলী রাজা লোকসমাজে কানু ফকির নামে সমধিক খ্যাত। তাঁর গুরুর নাম ছিল কেয়ামদ্দিন। 'জ্ঞান চৌতিশা' প্রণেতা বালক ফকির এবং 'গুলে বকাউলী' প্রণেতা মুহম্মদ মুকিম তাঁর শিষ্য ছিলেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করে আলী রাজা অমর হয়েছেন--আগম ও জ্ঞানসাগর (অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ), যোগকালন্দর (তান্ত্রিক মতবাদ বিষয়ক গ্রন্থ), ধ্যানমালা (সঙ্গীত শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ), সিরাজকুলুব (দরবেশী গ্রন্থ), ষটচক্রভেদ ও পদাবলী। কবি রচিত ৪৬টি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত মুসলিম বৈষ্ণব কবি' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। 'জ্ঞানসাগর' আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ড. অহম্মদ শরীফ সম্পাদিত 'মধ্যযুগের রাগ-তালনামা' গ্রন্থে আলী রাজার ৮টি রাগ-তালের পদ সংকলিত হয়েছে। আলী রাজার দুই পুত্র এরশাদউল্লাহ ও সরাফতউল্লাহ পদাবলী রচনা করেছেন। **নূ. ই**

আলেকজান্ডার ডফ, রেভারেন্ড ড. : জন্ম ১৮০৬ সালের ২৫ এপ্রিল। ১৮২৯ সালে তিনি স্কটল্যান্ড থেকে কলকাতা আগমন করেন। ভারতে আসার তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষি হওয়ার প্রেরণা যোগানো। এই কারণে তিনি Free Church Institution নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৪ সালে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৪০ সালে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৫০-এ আবার স্বদেশ গমন এবং ১৮৫৬-তে পুনরায় কলকাতা ফিরে আসেন। ভারতে বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং তাতে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৮৭৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত Free Church Institution পরে Scottish Churches College-এ রূপান্তরিত হয়। পাদ্রী ডফের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন অনেক হিন্দু যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এ নিয়ে হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। **মু. আ. জ.**

আলেকজান্ডার দূমা/ডুমা : পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুক্রমে মিশ্র রক্তের অধিকারী এই ফরাসি ঔপন্যাসিকের পিতা ছিলেন একজন জেনারেল। প্যারিসের সন্নিকটে অবস্থিত এক হোটেলের গৃহিণীকে দূমা/ডুমা (Dumas) বিয়ে করেছিলেন। তাঁর কতিপয় রোমান্টিক নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়ার পর তিনি উপন্যাস লেখায় মনোযোগী হন। উৎসাহ-উদ্দীপক রোমাঞ্চকর রীতিতে গল্প বলার বিশেষ ক্ষমতা ছিল দূমার। কিন্তু তাঁর রচনায় ইতিহাসের বিকৃতি, পুনরাবৃত্তি দোষ ও পরিশীলনের অভাব দেখা যায়। তিনি

www.pathagar.com

অনেক লিখেছেন ; জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি ফরাসি ঔপন্যাসিকদের প্রথম কাতারে স্থান পেয়ে থাকেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর মধ্যে "দি থ্রী মাস্কেটিয়ার্স (The Three Musqueteers), "দি কাউন্ট অব মন্টোক্রিস্টো" (The count of Monte-Cristo), "দি টুয়েন্টি ইয়ার্স আফটার" (The twenty years after), "দি ম্যান ইন দি আয়রন মাস্ক" (The Man in the iron Mask) প্রধান। ম. ই

আলেকজান্ডার পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) : প্রথম আধুনিক রুশ কবি। তাঁর হাতেই রুশ সাহিত্য আধুনিক ভাষা ও ভঙ্গি লাভ করে বলে কথিত। পুশকিনের বিপ্লবধর্মী উদার চিন্তা কবিতায় রূপ পেতে থাকলে তিনি রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে নির্বাসিত হন। জার প্রথম নিকোলাস তাঁকে আবার দেশে ফিরিয়ে আনেন। নতুন জারের এই মহানুভবতা পুশকিনকে হতবুদ্ধি করে দেয়। জার কিন্তু পুশকিনের ব্যক্তিগত যশকে কাজে লাগাবার জন্য তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ১৮৩১ সালে পুশকিন নাটালিয়া নামে এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেন। স্ত্রীর বিলাসিতা পূর্ণ জীবন-যাপনের ফলে পুশকিন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নাটালিয়ার বদৌলতে রাজপ্রাসাদের নাচের মজলিসেও পুশকিন-দম্পতিকে যোগ দিতে হতো। এই সময়ে জার তাঁকে আর্থিক সাহায্যও করতেন। ১৮৩৭ সালে জনৈক ফরাসি ভদ্রলোক নাটালিরার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় পুশকিন তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, ফলে পুশকিন আহত হয়ে দু'দিন পরে ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। গীতি কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠ ও আধুনিক গল্পকার রূপে রুশদেশে পুশকিনকে পথিকৃৎ বলে গণ্য করা হয়। তাঁর প্রধান রচনার মধ্যে 'রাসলান রুডমেশী", "ইউজিন ওনেগিন' (Eugenee onegin), "ব্রোঞ্জ হর্সম্যান", "টেল অব জার সালগণ" এবং "কুইন অব স্পেড্স্" (Queen of spodes) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বল্পায়ু সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর রচনা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে ও হচ্ছে। পুশকিন কেবল কবিই নন, আধুনিক রস গদ্যও তাঁর হাতে জন্মলাভ করে। আধুনিক রস লেখ্যভাষার জন্মদাতা এবং রুশ সাহত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও প্রথম কথাসাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃত। ম. ই

আলেকজান্ডার পোপ : আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) ইংল্যান্ডের উইন্ডসর অরণ্য-সংলগ্ন এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পোপ প্রথানুযায়ী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। পিতৃ গৃহেই তিনি ইংরেজ কবিদের, বিশেষ করে ড্রাইডেন (Drysden) ও স্পেনসরের (Spencer) রচনাসমূহ গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প বয়সেই পোপ কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী কবি-সমালোচক ছিলেন। তাঁকে সমকালের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গণ্য করা হয়। তাঁর প্রাথমিক যুগের বিখ্যাত কবিতা 'দি রেপ অব দি লক' (The rape of the lock) তাঁর খ্যাতিকে নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। পরিণতবয়সে তিনি "অ্যান অ্যাসে অন ম্যান" (An essay on Man) নামে এক দার্শনিক কবিতা প্রকাশ করেন ; যাতে সে যুগের চিন্তা যুক্তি-শৃঙ্খলার মাধ্যমে অত্যন্ত জোরালো অথচ পরিশীলিত ভাষায় রূপ লাভ করে। সমালোচকদের মতে, পোপ ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী কবি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে "দি রেপ অব দি লক" ও "অ্যান অ্যাসে অন ম্যান"-সহ "প্যাসটোরালস্" (Pastorals) "অ্যাসে অন ক্রিটিসিজম" (Essay on criticism), "গ্রে অ্যান্ড সুইফস্" ও "অ্যাপিসিল্স্" (Epistle) প্রধান। ম. ই

আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন : আধুনিক রুশ সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন (A lexander Soljhenetsyn) জন্মগ্রহণ করেন সোভিয়েত

রাশিয়ার একটি বুদ্ধিজীবী কশাক পরিবারে। জন্মস্থান কিশলো ভোদসক শহর। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন। মা ছিলেন শিক্ষয়িত্রী। রোস্তভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও অংকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগের করসপন্ডেন্স কোর্সের ছাত্রও ছিলেন। এ ছাড়া তিনি দর্শন এবং ইতিহাস নিয়েও পড়াশুনা করেছেন। ১৯৪১ সালের জুন মাসে সলঝেনিৎসিন রেড আর্মিতে যোগ দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হন। ১৯৪২ সালে তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর কমান্ডার পদে নিযুক্ত হন। সলঝেনিৎসিন লেনিনগ্রাদের যুদ্ধে আহত হয়ে বীর যোদ্ধা হিসাবে পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। কোনো এক বন্ধুকে চিঠিতে স্তালিন-বিরোধী কিছু সমালোচনা লিখলে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, ফলে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী হয়ে ১৯৪৫ সালে তিনি আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড পেয়ে মধ্য এশিয়ায় নির্বাসিত জীবন ভোগ করেন। বন্দীদশায় দুবার তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট সেন্ট্রাল এশিয়ার নির্বাসিত জীবন থেকে তিনি মুক্তি পান। ইতিমধ্যে তাঁর লেখার কাজ এবং একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ এক সঙ্গে চলে। তিনি কিছু কবিতা লিখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'one day in the life of the Ivan Denisovitch' দু'দিনে এর ৯৪,৯০০ কপি বিক্রয় হয়। সালঝেনিৎসিনের অন্যান্য কয়েকটি রচনা স্লুচাই না স্তানৎসী ক্রেচ্‌তোভকা, মাত্রেয়েনিন ড্বয়, ফর দ্যগু আফদ্যকজ, ক্যান্সার ওয়ার্ড, দ্য ফার্স্ট সার্কেল ইত্যাদি। ১৯৭০ সালে আলেকজান্ডার সালঝেনিৎসিন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য ১৯৬৪ সালে তিনি প্রস্তাবিত লেনিন পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হন। ম. ই

আলেফ মিয়ার পৃথিবী : আহমেদ হুমায়ূন। প্রতীক চরিত্রের ধারাবাহিক বর্ণনা। প্রকাশক : সন্ধ্যা রায়, গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র, নয়ারহাট, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৯, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : রফিকুন নবী, মূল্য : বিশ টাকা। আলেফ মিয়া একটি প্রতীকী চরিত্র। আলেফ মিয়ারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার তীরে। এদেরই প্রতিনিধি আমাদের সমাজের আলেফ মিয়া। তার স্বপ্ন বিমুখ প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয়া বীজে একদিন সোনা ফলাবে। ঘরে উঠবে স্বপ্নের ফসল। দুমুঠো ভাতের অভাব দূর হবে। দীর্ঘদিন এই স্বপ্ন বুনেছে আলেফ মিয়া। তার প্রতীক্ষার শেষ নেই। বেঁচে থাকার লড়াই-এ আলেফ মিয়া অপ্রতিরোধ্য এক যাত্রী। আলেফ মিয়ার চৌদ্দটি কাহিনী এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এগুলো সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিলো এবং অনেকের দৃষ্টি কেড়েছিলো। গ্রন্থিত কাহিনীগুলোর মধ্যে আলেফ মিয়ার চাওয়া পাওয়া, সম্পত্তির হিসাব, খাওয়া-দাওয়া, রাজনীতি, ঈদ, প্রেম এবং আলেফ মিয়ার জীবনে একুশ, মহান ভাষা আন্দোলন ও আলেফ মিয়ার প্রেস ফ্রিডম সম্পর্কে তীব্র ভাষায় ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ রয়েছে। বইটির অংগসজ্জা সুন্দর। সহজ-সরল ভাষায় লেখা। খা. বি. জ. উ.

আলেখ্য : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ৮ জুলাই ১৯০৭ সাল। কবির স্ত্রীবিয়োগের পর ব্যক্তিজীবনের ব্যথা ও বেদনার ছবিই এই কাব্যের মূল বিষয়। অধিকাংশ কবিতায় স্ত্রীবিয়োগের নিষ্ঠুর আঘাতে কবির উদ্বেলিত হৃদয়ের মর্মবেদনারই প্রকাশ ঘটেছে। স্ত্রীবিয়োগ ব্যথার পাশাপাশি বাৎসল্যরসেরও অভিব্যক্তি হয়েছে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিতা 'ঘুমন্ত শিশু', 'পুত্রকন্যার বিবাদ', 'নূতন মাতা', 'বিপত্নীক', 'মাতৃহারা', 'হতভাগ্য' ইত্যাদি। শোকের বিষয় কাব্যে অবলম্বিত হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলালের সহজাত বিদ্রূপ প্রবণতা এই কাব্যে অপেক্ষাকৃত কম। কবি যেন এক বিষণ্ন-মহিম ভাবলোকে ধ্যানস্থ হয়েছেন। আলেখ্যের স্ত্রীবিয়োগ ব্যথার কবিতাগুলো মাতৃহারা

www.pathagar.com

পুত্রকন্যাদের প্রতি কবির হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার প্রকাশে যথার্থ ট্র্যাজিক রূপ লাভ করেছে। এই ব্যথা ও বেদনার মধ্যে কোনো তাত্ত্বিক ভাবের প্রক্ষেপ না ঘটায় কবিতাগুলোর শিল্প-মাধুর্য অক্ষুণ্ন রয়েছে। কবির হৃদয়-উৎসারিত ভাবের রূপই এগুলোতে প্রাধান্য লাভ করেছে। স্বভাবজ গীতিরসের ধারাটিও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। স্ত্রীর স্মৃতি অথবা পুত্রকন্যাদের কথা বলতে গিয়ে কবি কখনো কখনো গার্হস্থ্য জীবনের মধুময় জীবনের কথা স্মরণ করেছেন। গার্হস্থ্য জীবনের মমতাপ্লুত ছবি অঙ্কন করে কবি গেয়েছেন— 'চাঁদের কিরণ এসে, মেয়ের মায়ের কেশে,/ কোমল মুখে দেহে, পড়েছে সে, ছেয়ে।/ চাঁদের কিরণ এসে/ ঢলে পড়েছে সে/ মেয়ের কচি মুখে,/ মেয়ের কচি বুকে।' (তৃতীয় চিত্র : নূতন মাতা)। দাম্পত্য জীবনের বাইরে দুই একটি কবিতায় কবির বিদ্রূপপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আলেখ্যের চতুর্দশ চিত্রের 'নেতা' ও পঞ্চদশ চিত্রের 'ভক্ত' কবিতায় বক্তৃতা-সর্বস্ব আত্মপরায়ণ নেতা ও ভোগসর্বস্ব ভক্তকে কবি বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন। কিন্তু এই ব্যঙ্গরস কবির হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত নয়। আ. ই

আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর রচনাসংগ্রহ : কিউবার স্পেনিওল ভাষার লেখক আলেহো কার্পেন্তিয়ের (১৯০৪-১৯৮০)-এর রচনা সংগ্রহটি অনুবাদ করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সূচিতে আছে—উপন্যাস দুটি 'এই মর্তের রাজত্ব' ও 'মৃগয়া'। গল্প 'সান্তিয়াগোর রাস্তা', 'উৎসের দিকে', 'শরণার্থীর অধিকার', 'যে-মতো নিলা', 'প্রজ্ঞাবানেরা' এবং 'পলাতকেরা'। এ ছাড়া আছে নিবন্ধ ও টিকা 'কুবৃকী বাস্তবতা, বাস্তবের কুহক ও আলেহো কার্পেন্তিয়ের' অধ্যায়। স্পেনিওল বা স্প্যানিস ভাষায় রচিত লাতিন আমেরিকার সাহিত্যকে কুহকী 'বাস্তবতার জগৎ বলে। কার্পেন্তিয়েরের বাবা ছিলেন ফরাসি স্থপতিবিদ আর মা রুশী ব্যালেরিনা। তাঁর মধ্যে ইন্ডিয়ান বা আফ্রিকাবাসীর রক্ত ছিল না। তিনি নিজে সঙ্গীততত্ত্ববিদ, সঙ্গীত রচনাকার, গল্প-উপন্যাসকার, কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রত্যক্ষ রাজনীতিক। তাঁর রচনার ভঙ্গি দুঃসাহসী, চমকপ্রদ, খুঁটিনাটিতে ঠাসা— আর তার সঙ্গে মিশে আছে কৌতুক, তীব্র এবং তাৎপর্যময়। এ শুধু নিছক গল্প বলে যাওয়া নয়, বরং সুদূর অতীতের বাস্তবতাকে ভাষার-ছন্দে পুনরুদ্ধার করার দুরূহ চেষ্টা। কিন্তু সেই বাস্তবতার সঙ্গে ওতপ্রোত মেশানো আছে এমন এক আবহাওয়া, যেটা ক্যারিবিয়ন তথা লাতিন আমেরিকার ইতিহাসের অতিকায় ও বেগবান কিংবদন্তির সঙ্গে জড়ানো। কার্পেন্তিয়েরের রচনায় দেখতে পাওয়া যায় পুরাণ আর কিংবদন্তি, আদিম কল্পনা আর ঐতিহাসিক সময়, বাস্তব আর স্বপ্ন সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে তাঁর উপন্যাস বা গল্পকে নিয়ে যায় তথাকথিত বাস্তবের পরপারে কোনো অধিকতর বাস্তবতায়, কুহকে ইন্দ্রজালে জাদুবিশ্বাসে। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। প্রকাশকাল : ১৯৯১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৬, মূল্য : ১০০ রুপি। বি. ব.

আলোকপাতের মুহূর্তে : তিমুর পুলাতভ। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'কাইপের দ্বিতীয় যাত্রা' 'ডাক দাও মা', 'ছোট জনবসতি অঞ্চল' উপন্যাসগুলো ও ছোটগল্প 'আলোকপাতের মুহূর্তে'। পরস্পরের মধ্যে মিল নেই এই ছোট উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলোর কিন্তু পড়ার পক্ষে একই রকমের আকর্ষণীয়। লেখক কোনো উপদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন না; কোনো কিছু শেখাতে চাচ্ছেন না। তিনি যেন আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁর রচনাবলীর নায়কদের সঙ্গে মিলে ভেবে দেখার, আলোচনা করার জন্য, কোনো কিছু নিয়ে তর্ক করার বা হাসাহাসি করার, আর হয়তো বা কোনো কিছু স্বীকার করার ...। তিমুর পুলাতভের জন্ম ১৯৩৯ সালে

www.pathagar.com

বুখারা শহরে। এখানে বাস করত তাজিক, উজবেক ও তুর্কমেনীয় জাতির লোকেরা ...। তাই ছেলেবেলা থেকেই তিমুর পুলাতভ গড়ে উঠেছেন 'প্রকৃত বুখারাবাসী'--বহুভাষাভাষী হিসাবে। পরে শিক্ষালাভের সময় রুশ ভাষাও প্রবেশ করে তাঁর জীবনে। তাঁর মৌলিক, কল্পনাভিত্তিক লেখাগুলো সারা রাশিয়ায় খ্যাতি অর্জন করেছে, অনূদিত হয়েছে আরবি, উর্দু ও সুইডিশ ভাষায় এবং সবশেষে বাংলায়। প্রকাশক রাদুগা প্রকাশন, তাশখণ্ড। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২৭৯। কি.ব.

আলোছায়া : নূরুল মোমেন। বইটির প্রকাশক আমেনা মোমেন। ও সি ডাব্লিউ এস ৪৮, ঢাকা। প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ—অক্টোবর ১৯৬২, ২য় সংস্করণ—জুন ১৯৬৮। মানব-হৃদয়ের আলো আঁধার, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন প্রকৃতি ও তা বহিঃ-প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য, সংবেদনশীল অনুভূতির তারতম্যকে বিষয়বস্তু করে লেখা নাটক। বিশিষ্ট শিল্পপতি হাম্মাদ জামিলের প্রচণ্ড মেজাজে পরিবার ও কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সকলে সর্বদা তটস্থ। তিনি একদিকে যেমন কঠোর শাসক ও নিষ্ঠুর, অন্যদিকে কোমল স্নেহপরায়ণ। কিন্তু তাঁর কোমল প্রবৃত্তিটির প্রকাশ ঘটে দৈবাৎ, আর তা-ও বুঝতে পারে খুব কম মানুষই--সে রকম একজন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ তাঁর আত্মীয় (সম্বন্ধী) শরাফত, অন্যজন পুত্র সুলতানের হবু বধূ পারভীন। হাম্মাদ জামিলের মনে প্রকৃতই ভালবাসা আছে কিনা তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ সরফারোশের পরামর্শমতো একটি কৌশল অবলম্বন করে পরিবারের সদস্যরা। বিশ্বাসযোগ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাঁকে একটি মর্মান্তিক মিথ্যা দুঃসংবাদ দেয়া হয়। দেখা যায়, সাধারণ কোমল স্বভাবের মানুষের চাইতে অনেক বেশি তীব্র ও গভীর প্রতিক্রিয়া ঘটে তাঁর। এ আকস্মিক দুঃসংবাদে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং মানসিক ভারসাম্য ও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘ চিকিৎসায় সুস্থ হলেও স্বভাবে হয়ে পড়েন পূর্বব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ উল্টো। এবার তিনি নিরীহ, শান্ত ও যে কোনো জটিলতার ভয়ে ভীত। ফলে তাঁর ব্যবসায় ধস নামে, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এসে দাঁড়ায় শূন্যের কোঠায়। আরো দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় আবারো তাঁর আগেকার মেজাজ ও দাপট ফিরে এলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আসলে যার যা স্বকীয়তা, তার বাইরে তাকে ভিন্নরূপে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা কখনো ফলপ্রসূ হয় না। নাটকটিতে মূল চরিত্র হাম্মাদ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের সমাবেশ রয়েছে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্বভাবের বৃত্তে সফলভাবে চিত্রায়িত করেছেন নাট্যকার। র. আ. ক.

আলোর পাখিটা : আল মুজাহিদী রচিত শিশু-কিশোর উপন্যাস। প্রকাশক : জাগৃতি প্রকাশন, নীলক্ষেত রোড, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০০, প্রচ্ছদপট ও অঙ্গসজ্জা : রফিকুল ইসলাম, মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। আলোভালো একটি পাখির নাম। পাখিটি বনপাড়ায় এসে অন্য পাখিদের ঘুম ভাঙায়। শুধু বন-প্রান্তরের পাখিই নয়, মানুষেরও ঘুম ভাঙাতে আলোভালো উড়ে বেড়ায় বনান্তরে, লোকালয়ে। পাখিদের নিয়ে এ উপন্যাসটি সমগ্র কাহিনী গড়ে উঠেছে। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্রটিই আলোভালো। আলোভালো বনের হরিণের সঙ্গে কথা বলে। কথা বলে লাল পরী, পিপিট, আবাবিল, খঞ্জনা, মাছ খেকো, বেলেহাঁস ও অন্যান্যদের সাথে। এসব পাখিদের সঙ্গে আলোভালোর ভাব হয়, তাদের শোনায় দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা। পরোক্ষভাবে এই উপন্যাসটির মূল বক্তব্য হচ্ছে বনের পাখিদের মাধ্যমে মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বনগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া। উপন্যাসটির আর একটি চমৎকারিত্ব হচ্ছে ছড়া-কবিতার মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়কে বৈচিত্র্যময় করে তোলা। উপন্যাসটির বর্ণনা অভিনব। আদুরে ভাষায় রূপকথার ঢঙে এর কাহিনী

www.pathagar.com

বিন্যস্ত হয়েছে। বর্ণনা কখনো কখনো কাব্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা শোভিত। খা.বি.জ.উ.

আলোর ফুলকি : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কিশোর উপন্যাস। ফ্লেরেন্স ইয়েটসন হানের The Story of Chanticleer-এর ভাব অবলম্বনে আলোর ফুলকি রচিত। পাখিদের বিচিত্র জীবন, ওদের হাসি কান্না মান অভিমান, এমন কি পরস্পরের ঝগড়াঝাটি নিরসনের জন্য মজার অধিবেশন আহ্বানসহ অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানার বর্ণনা রয়েছে এই উপন্যাসে। কুঁকড়ো নামে এক সুকণ্ঠি পাখি মনে করতো তাঁর গানে অন্ধকার দূর হয়, পৃথিবীব্যাপী ফুটে ওঠে দিনের আলো। বনের পেঁচারা মোটেই পছন্দ করতো না কুঁকড়োকে কারণ রাতের অন্ধকার হচ্ছে পেঁচাদের বিচরণের শ্রেষ্ঠ সময়। আলো অন্ধকার নিয়ে পাখিদের যুক্তি পাল্টা যুক্তি বেশ কৌতূহলী করে তোলে। চড়াই বলে একটি ছোট পাখিকে খুব ভালোবাসতো কুঁকড়ো। চড়াই কুঁকড়ো বলতো, তোমার গানে নয়, সকাল প্রকৃতির নিয়মে। ছোট এতটুকুন পাখির বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিজ্ঞানমনস্ক প্রশ্নে কুঁকড়ো বেশ বিব্রত বোধ করলেও চড়াইয়ের প্রতি কখনো কমেনি। রূপ লাবণ্য নিয়েও পাখিরা মানুষের মতো কতো সচেতন উপন্যাসটি পাঠ করলে সহজে অনুমান করা যায়। বিষয় বৈচিত্র্য ও বর্ণনা ভঙ্গির কারণে 'আলোর ফুলকি' নিঃসন্দেহে একটি মজার উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে 'আলোর ফুলকি' ১৩২৬ সনে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। এটি বর্তমান অবনীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মা.আ.

আল্লাহ : ইসলাম ধর্মে একক, উপমাহীন, পবিত্র একমাত্র উপাস্য আল্লাহ। আদি, অন্ত, প্রকাশ্যে ও গোপনে একমাত্র চিরঞ্জীব, সর্বব্যাপী, সর্বত্র বিরাজমান, সার্বিক ক্ষমতাসম্পন্ন, সকল কর্মের নিয়ন্ত্রক, সর্বজ্ঞানী মহান, গৌরবময়, অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ নিরাকার মহাশক্তি আল্লাহ। ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সৌরমণ্ডলে তাঁর সার্বিক শক্তি সকল বস্তুকে আবেষ্টন করে আছে। পবিত্র কুরআনে তাঁর নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম আছে, তবে আল্লাহ নামটি সার্বিক গুণের নিরঙ্কুশ একক স্বত্তা। সকল নামকে আসমাউল্ হুস্না বলা হয়, যার অর্থ সুন্দরতম নামসমূহ। আসমান ও জমিনের সকল বস্তু ও সকল প্রাণী আল্লাহর তসবিহ করছে এবং সকল বস্তু ও রাজত্ব তাঁরই। তিনি সকলের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, মহাপ্রতিপালক, আহারদাতা ও বিধানদাতা এবং প্রেমময়। আল্লাহর সত্তাবাচক নামের সাথে অংশীবাদ, দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের কোন সাজুয্য নাই। আ.সৈ.গো.দ.

আশরাফ আলী খান : কবি। ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার পানাইল গ্রামে ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেলওয়ার হোসেন খান। স্থানীয় হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। অতঃপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান করে কলেজের পাঠ ত্যাগ করেন। কলকাতায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কেরানিগিরি চাকরি গ্রহণ করেন (১৯২৩)। তাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক বেদুঈন (নভেম্বর ১৯২৭) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকারি চাকুরি থেকে পদত্যাগ করেন। কলকাতার দৈনিক ছোলতান সম্পাদনা করেন (১৯২৮-১৯২৯)। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক নওজওয়ান বের হয়। তিন সন্তানসহ এক বিধবা আত্মীয়াকে তিনি বিয়ে করেন। বিদ্রোহের, বিপ্লবের, সাম্যের ও বেদনার কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : ভোরের কুহু (১৩৩৬) ও কঙ্কাল

www.pathagar.com

(১৩৪২)। কবি ইকবালের বিখ্যাত কাব্য 'শেকওয়া' তিনিই প্রথম বাংলায় কাব্যানুবাদ করেন (১৩৪০)। দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণায় কলকাতায় তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন, ১৯ নভেম্বর ১৯৩৯। নূ. ই

আশরাফ উজ জামান : কথা সাহিত্যিক। তিনি ১৯১১ সালের ১০ অক্টোবর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে তিনি কমার্শিয়াল আর্টে ডিগ্রি লাভ করেন। শৈশব থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম মঞ্জিল। এটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'খেয়া নৌকার মাঝি' গল্পগ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য বই। এই গ্রন্থটি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর গল্পগ্রন্থ অরণ্য নদী পর্ব্বত ও সমুদ্র প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। তিনি বেতার-টিভিতে নিয়মিত নাটক লিখলেও প্রকাশিত নাটক মাত্র একটি। এটির নাম 'সয়লাব'। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন একটি। নাম 'সীমান্তে' মুসাফির। ছোটদের জন্য তাঁর বেশকটি গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো হলো : 'মহাযুদ্ধ বিভীষিকা', 'হতে হবে বীর পালোয়ান' এবং অনূদিত উপন্যাস 'এলেম নতুন দেশে'। এটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। খা.বি.উ.

আশা কানন : কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) রচিত একটি রূপকধর্মী কাব্য। প্রকাশকাল ১৮৭৬ সাল। এ গ্রন্থ বিদেশি কাব্যের অনুকরণে রচিত। আশা-কাননের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিকে রূপকছলে প্রত্যক্ষীভূত করা। হেমচন্দ্রের দর্শন-চিন্তার বিকাশ এ কাব্য। কবি এতে নিদ্রাবেশে প্রথমে আশার সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয়াদি পর্ব সম্পন্ন করেন। পরে আশা কাননে প্রবেশ করে একে একে মানুষের মনোজীবন ও প্রবৃত্তির নানা-দিকের পরিচয় ও তাঁর পরিণাম দর্শন করেন। আশা কানন দর্শনতত্ত্বমূলক কাব্য হলেও গীতিকবিতার ভাবাদর্শ এতে যথারীতি রক্ষিত হয়েছে। আ. ই

আশাপূর্ণা দেবী : গল্পকার, উপন্যাসিক। তিনি ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ও পৈত্রিক নিবাস হুগলী জেলার বেগমপুর গ্রাম। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করলেও পারিবারিক গোঁড়ামির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্ভব হয়নি। তৎকালীন বাঙালি হিন্দুর নিয়ম অনুযায়ী কৈশোরেই তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর স্বামী কৃষ্ণনগর নিবাসী কালিদাস গুপ্ত। সেটি ১৯২৪ সাল। শৈশবেই আশাপূর্ণা দেবীর শিল্পমানস সাহিত্যসৃষ্টিতে উন্মুখ ছিল। পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি দিকগুলি যথানিয়মে পালন করেও তিনি অবসর সময়ে সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন থাকেন। বাল্যকালেই তিনি কবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। শিশু সাহিত্যও লিখেছেন। তবে গল্প রচনাই তাঁর শিল্পমানসের স্বাভাবিক স্ফূরণ লক্ষ করা যায়। পরিণত বয়সে যখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় তখন থেকেই সমাজ এবং জীবনের রূপটি তাঁর কথাসাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় বিকশিত হতে থাকে। লেখার সূত্রে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত হন। আশাপূর্ণা দেবীর শিল্পমানসের পরিপুষ্টি সাধন হয় তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের নানা জায়গায় ব্যাপক ভ্রমণ করেন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনা তাঁর গল্পের উপজীব্য। উপন্যাসের ক্ষেত্রেই আশাপূর্ণা দেবীর অধিক সাফল্য। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে সমাজ। জীবনের চিত্রায়নে তিনি কোথাও কোথাও রোমান্টিক শিল্প চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৪ সালে 'লীলা পুরস্কার' সম্মানিত হন।

www.pathagar.com

আশাপূর্ণা দেবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : বলয় গ্রাস, অগ্নিপরীক্ষা, যোগ-বিয়োগ, মিত্তির বাড়ি, শশিবাবুর সংসার, নবজন্ম ইত্যাদি। গল্পের বই : জল আর আগুন, হাফ হলিডে ইত্যাদি। আ.জ.ভূ.

আশাবরী : দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে কোমল নিষাদ, কোমল ধৈরত ও কোমল গানধার ব্যবহৃত হয়। উড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। আরোহে পাঁচ স্বর ও অবরোহে সাত স্বর ব্যবহৃত হয়। আরোহে গানধার ও নিষাদ বর্জিত। বাদীস কোমল ধৈবত, সংবাদীস্বর কোমল গানধার। ঠাট আশাবরী। আরোহ : স র ম প দ র্স। অবরোহ : র্স ণ দ প ম জ্ঞ র স। ক. গো.

আশার ছলনে ভুলি : ডক্টর গোলাম মুরশিদ লিখিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা, ১৯৯৫ (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)। পূর্ববর্তী জীবনীকারদের উপস্থাপিত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে এবং কলকাতা, মাদ্রাজ ও ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত নতুন নতুন তথ্যের উপরে ভিত্তি করে বইটিতে মাইকেলের জীবনী পুনর্গঠন করা হয়েছে। মাইকেলের অন্তর্জীবন, সাহিত্যজীবন ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে যে সম্পর্কসূত্র রয়েছে, সে ব্যাপারে জীবনীকারের বিশেষ মনোযোগ লক্ষ করা যায়। বইটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। 'জননীর ক্রোড়নীড়ে' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মাইকেলের জন্মস্থান, বংশপরিচয় ও বাল্যজীবন সম্পর্কে, এবং কলকাতার ছাত্রজীবনে তাঁর অধীত বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। 'সাধিতে মনের সাধ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মাইকেলের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত জটিলতা এবং খ্রিস্টান হওয়ার পরবর্তী কালের শিক্ষা ও ছিন্নপ্রায় পারিবারিক জীবন। 'পরদেশে' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য মাইকেলের মাদ্রাজ-জীবন—সেখানকার চাকরি, দাম্পত্য জীবন ও সাহিত্যচর্চা। 'মধুচক্র গৌড়জন যাহে' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে মাইকেলের কলকাতার জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। 'প্রবাসে দৈবের বশে' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া মাইকেলের লন্ডন ও ভার্সাইয়ের প্রবাস-জীবন আলোচিত হয়েছে। 'কি ফল লভিনু হায়' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য ব্যারিস্টার মাইকেলের অন্তিম জীবন। 'রেখো মা দাসেরে মনে' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে মাইকেলের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে যেসব নতুন প্রসঙ্গ আলোচনায় স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে হেনরিয়েটার সঙ্গে মাইকেলের প্রণয় সংক্রান্ত বহু অজ্ঞাত তথ্য এবং রেবেকা ও হেনরিয়েটার সত্যিকারের পরিচয় সম্পর্কিত তথ্যাদি উদ্ধার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট ৭৩টি প্রামাণ্য ছবি জীবনীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। জীবনীটির ভাষা সরল ও কথ্যভঙ্গির। স্ব. স.

আশিস সান্যাল : কবি, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক। ১৯৩৮ সালের ৭ জানুয়ারি নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশ-ভাগের পর পরিবারের সঙ্গে চলে যান ভারতে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে অধ্যাপনাকে বেছে নেন। কবি হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটে ষাটের দশকের প্রথমদিকে। এ পর্যন্ত তাঁর তেরটি কাব্যগ্রন্থ, চৌদ্দটি শিশু-কিশোর সাহিত্য গ্রন্থ, তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ, অনূদিতসহ পাঁচটি গল্প ও উপন্যাস, সম্পাদিত দশটি গ্রন্থ এবং ইংরেজিতে সাতটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া হিন্দিতে তিনটি এবং গুজরাটিতে একটি বইয়ের তরজমা হয়েছে। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'নির্বাচিত কবিতা' ও 'ভোরের বৃষ্টি' কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। তিনি ইন্ডিয়ান রাইটার্স এসোসিয়েশানের সাধারণ সম্পাদক। প্রথম সার্ক লেখক সম্মেলন প্রধানত তাঁর উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আফ্রো-এশীয় লেখক সংস্থার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত

www.pathagar.com

ছিলেন। তাঁর বহুমুখী লেখায় তিনি প্রথমত ও শেষত মানুষের জীবনদর্শনের অভিজ্ঞানই প্রকাশ করেছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি পুরস্কার এবং ১৯৯২ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদের 'ভূয়ালকা' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। গৌ.ম.

আশুতোষ ভট্টাচার্য : গবেষক। কিশোরগঞ্জ জেলার ঝালুয়া গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯০৯ সালের ১৭ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ জেলার বকজোড়-গান্দি গ্রাম। পিতা মুরারিমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন কিশোরগঞ্জ আদালতের উকিল। মাতা কুমদিনী দেবী। কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে প্রথম বিভাগে আই. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি.এ. অনার্স (বাংলা) ও ১৯৩২ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. (বাংলা) পাস করেন। 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগে বাংলার লেকচারার, রিডার ও রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদে অধ্যাপনা করেন। বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি, বাংলা মঙ্গলকাব্য ও বাংলা নাট্যসাহিত্যের গবেষণায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' (১৯৩৬), 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড ১৯৫৪, ২য় খণ্ড ১৯৬৩, ৩য় খণ্ড ১৯৬৫, ৪র্থ খণ্ড ১৯৬৬, ৫খণ্ড ১৯৬৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৭২), 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড ১৯৫৫, ২য় খণ্ড ১৯৬১), রবীন্দ্রনাট্য ধারা (১৯৬৬) ইত্যাদি তাঁর প্রধান গবেষণা-মূলক গ্রন্থ। তাঁর গবেষণায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মঙ্গলকাব্য তথা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ, কবিকুলের জীবনচরিত, কবিদের অঙ্কিত সমকালীন সমাজচিত্র ও মানুষের জীবনাচরণ এবং এসব কাব্যের সাহিত্যমূল্য সুবিস্তৃভাবে বেরিয়ে এসেছে। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী স্বর্ণপদক ও ১৯৮৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা) থেকে বি.সি.এল. স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৮৪ সালের ১৯ মার্চ কলকাতায় পরলোক গমন করেন। নূ. ই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : শিক্ষাবিদ, বিচারপতি ও লেখক। কলকাতার মলঙ্গা লেনে ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার জীরাট-বলাগড়। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম.বি., মাতা জগত্তারিণী দেবী। কলকাতা সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৮৮০ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে ১৮৮২ সালে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এফ.এ., ১৮৮৪ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ., ১৮৮৫ সালে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাস করেন। ১৮৮৬ সালে প্রতি পেপারে গড়ে শতকরা ৯৬ ভাগ নম্বর পেয়ে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। একই বছর প্রেমচাঁদ--রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে দশ হাজার টাকা বৃত্তি পান। ১৮৮৮ সালে বি.এল. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ওকালতিতে অসাধারণ পসার লাভ করেন। এ সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি ডক্টর অব ল ডিগ্রি পান। ১৯০৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯০৩-১৯২৩) নিযুক্ত হন। একই সাথে ১৯০৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। দুই বছর মেয়াদী এ পদে ক্রমাগত

www.pathagar.com

চার বার (১৯০৬-১৯১৪) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২১ সালে পঞ্চম বার উপাচার্য পদে (১৯২১-১৯২৩) নিযুক্তি লাভ করেন। তাঁর হাতে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভূতপূর্ব পুনর্গঠন সাধিত হয়। নিছক পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থার পরিবর্তে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নত পঠন-পাঠনের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাস এবং কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু, বিজ্ঞান ও আইন কলেজ স্থাপন, স্কুল-কলেজে বাংলা পত্র প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের জন্য স্নাতকোত্তর ক্লাস প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং কর্তৃত্ব বলবত তাঁর এক যুগান্তকারী কীর্তি। 'সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে' এ ধরনের আপত্তিকর শর্তারোপ করলে ষষ্ঠবার উপাচার্য নিয়োগের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। লর্ড লিটন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার খর্ব করতে উদ্যত হন তখন তিনি প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ জানান। উপাচার্য ও বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ (১৯২৩) করে তিনি ঘোষণা করেন : 'স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয়, স্বাধীনতা সর্বক্ষণের, এর কমে আমি সন্তুষ্ট নই।' তাঁর এই তেজস্বীতার স্বীকৃতিস্বরূপ জনগণ তাঁকে 'বেঙ্গল টাইগার' (বাংলার বাঘ) উপাধি দেয়। তিনি ছিলেন গণিত ও আইন শাস্ত্রের ভাষ্যকার। বাংলা ভাষায় মননশীল প্রবন্ধ রচনায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : Geometry of Comics (1892), Law of Perpetuities (1899), Arithmetic for Schools (1901) এবং জাতীয় সাহিত্য (বাংলা ভাষায়, ১৯৩২)। ১৯১৪ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে কে.টি. ও সি.এস. আই. উপাধি দেয়। ১৯২৪ সালের ২৫ মে পাটনায় পরলোক গমন করেন। — নূ. ই

আশুরঞ্জনীতত্ত্ব : ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত বাঙলায় এসরাজ বাদন সম্পর্কে রচিত প্রথম গ্রন্থ। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এসরাজ যন্ত্রের পরিচয় ও বাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ সহ বহু গতের স্বরলিপি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। — ক. গো.

আশুরা : ইসলামের ইতিহাসে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার তারিখ ১০ মহররম, ৬০ হিজরিকে আশুরার দিন বলা হয়। কারবালার যুদ্ধের প্রধান কারণ মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতা। ইমাম হাসানের সাথে তার সন্ধি হয়েছিলো যে, মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর মহানবী (দঃ)-এর দৌহিত্র এবং হযরত আলীর কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হুসাইন খলিফা হবেন যিনি ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ ছিলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ ছিলেন দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী। ৬০ হিজরির ৯ মহররম কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন সপরিবারে ইয়াযিদ বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হন। ইমাম হুসাইনের পরিবারকে ওবায়দুল্লাহ ফোরাত নদীর পানি নেওয়া হতে বঞ্চিত করলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিষ্ঠুরতার কারণে হৃদয় বিদারক অবস্থা সৃষ্টি হয়। দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১০ মহররম, ৬০ হিজরিতে। কাশেম নামক ইমাম হুসাইন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথমে শহীদ হন। এর পরে আসগর নামক ইমাম হুসাইনের পুত্রকে ভীষণ পিপাসার্ত অবস্থায় তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করা হয়। অপর তীরের আঘাতে ইমাম হুসাইনের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং পাপিষ্ঠ সীমার তরবারি দ্বারা তাঁর শিরশ্চেদ করে। একমাত্র যয়নুল আবেদীন ছাড়া পরিবারের সকল পুরুষ শাহাদত বরণ করেন। ইমাম হুসাইনকে কারবালায় সমাধিস্থ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে প্রতি বৎসর শ্রদ্ধার সাথে আশুরা পালিত হয়। এ দিনের অন্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে যে, মুসলিমগণ রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিশ্বাস করেন যে আল্লাহতায়ালা ১০ মহররম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি আরম্ভ করেন, পৃথিবী সূর্য হতে সৃষ্ট হয়, আদমকে সৃষ্টি করা হয়, নূহের নৌকা মহাবন্যার পর মাটি স্পর্শ করে, ইব্রাহিম

www.pathagar.com

নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নিরাপদে মুক্ত হন, লূত নবীর শহর ধ্বংস হয়, ইয়াকুব নবী ইউসুফ নবীর সাথে মিলিত হন, ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে তিন দিন ও তিন রাত পর মুক্তি লাভ করেন। মুসলিম নরনারী আশুরা উপলক্ষে রোজা পালন ও দোয়া খায়ের করে থাকেন। কারবালার ঘটনাকে অবলম্বন করে কথাসাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন তিন খণ্ডে 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসটি রচনা করেন আঠারো শতকের আশির দশকে। আ. সৈ. গো. দ.

আশেকে রসুল (২ খণ্ড) : মুন্সী দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৭) রচিত হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রশংসামূলক গীতিকাব্য। ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯০৭ সাল। এই খণ্ডে মোট ৩৬টি কবিতা আছে। ২ খণ্ডের কবিতা সংখ্যা ১৩। অধিকাংশ কবিতা হজরতের জীবনের স্মরণীয় ঘটনাকে অবলম্বন করে আত্ম-নিবেদনের সুরে লেখা। কবিতা-গুলোতে শিল্পরস ঘনীভূত না হলেও কবি-চিত্তের ভক্তি-আবেগ, নিবেদন ইত্যাদির প্রকাশ কৃত্রিম নয়। মোট ২ টি খণ্ডেই ভাবের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। আ.ই.

আশ্রম : হিন্দুপুরাণে চার প্রকার আশ্রমের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন--ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং যতি (সন্ন্যাস)। এই চার প্রকার আশ্রম হলো ব্রাহ্মণদের জীবন-যাত্রার চার অবস্থা। ছাত্রাবস্থা, গুরুগৃহবাস, গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন ও শিক্ষা এই চারটি অবস্থা ব্রহ্মচর্যের অন্তর্ভুক্ত। গৃহীর পক্ষে বিবাহিত অবস্থায় সংসার ধর্ম পালন করা এবং পূজা অর্চনা ও বেদাধ্যয়ন গার্হস্থ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করলে সংসারের মোহত্যাগ করে বনে গমন বানপ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থায় যাবতীয় দুঃখ ক্লেশ ভুলে ফলাহার ও ভগবৎ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করা পরমধর্ম। এবং সন্ন্যাস ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ভিক্ষান্নে কালাতিপাত ও দেশভ্রমণ অর্থাৎ সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। সু.মু.

আশ্রয় : হরি মোটোয়ানি রচিত উপন্যাস। মূল ভাষা সিন্ধি। বাংলায় অনুবাদ করেছেন আফসার আহমদ ও দুর্গা থাবরানি। উপন্যাসটির জন্য হরি মোটোয়ানি অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯৫) পেয়েছেন। ৬৫ পৃষ্ঠার ছোট এই উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে একটি শব্দ 'আশ্রয়'-কে কেন্দ্র করে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছিল মোহন। তার বাবা সব দিক সামাল দিতে পারতেন না। বাধ্য হয়ে বালক মোহনকে পড়াশুনো ছেড়ে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। নানা জায়গায় সে কাজ করে, আর সব জায়গা থেকে কাজ ছেড়ে সে চলে আসে। কারণ, 'তোকে আশ্রয় দিয়েছি' কথাটা সহ্য করতে পারে না মোহন। মাথায় রক্ত উঠে যায়। বড় লোকের মেয়ে শোভাকে ভালোবাসে সামান্য চাকুরে মোহন। তাদের ভালোবাসর কথা জানতে পেরে শোভার বাবা মোহনকে ডেকে পাঠান। বিয়েতে সম্মতি দেন। ফ্লাট দিতে চান ভাবী জামাতাকে। মোহন রাজি হয় না। সুন্দর ভবিষ্যৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে সে চলে যায় অন্য জায়গায়। কাজ নেয় মদের দোকানে। সেখানেও একদিন মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি খোয়ায়। এরও মূলে আছে ওই কথা আশ্রয়। মালিকের হাতে মার খেয়ে জ্ঞান হারায় মোহন। জ্ঞান ফিরে পায় হাসপাতালে। সেখানেই ফিরে পায় জীবনসঙ্গীনি শোভাকে। সুস্থ হয়ে তাকে নিয়ে মোহন যাত্রা করে সিন্ধুনগর উদ্দেশে। সেখানে তারা গড়ে তুলবে নিজেদের আশ্রয়। হরি মোটোয়ানির জন্ম (১৯২৯) হয়েছিল পাকিস্তানের লারকানাতে। ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকার। ৩৫ বছরের বেশি সময় জুড়ে সম্পাদনা করে চলেছেন সিন্ধি সাহিত্যপত্র 'কুঞ্জ'। তাঁর প্রথম ছোট গল্পের সংকলন 'হিক লকির' (১৯৭৫)। প্রযোজনা করেছিলেন 'হোজামালো' নামে একটি চলচ্চিত্র, যার বিষয়

www.pathagar.com

ছিল শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। পেয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উদ্‌যাপন পুরস্কার এবং জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সংহতির জন্য রামকৃষ্ণ জয়দয়াল পুরস্কার। বইটির প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি। প্রকাশকাল : ১৯৯৮, মূল্য : ৪০ রুপি।

আষাঢ়ে : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত ব্যঙ্গ–বিদ্রূপাত্মক কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে কবিতাগুলো সাধনা, সাহিত্য ও প্রদীপ পত্রিকায় ছাপা হয়। আষাঢ়ে কাব্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন––'বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে (রেভারেন্ড রিচার্ড হ্যারিস বারহাম রচিত) Ingoldsby Legends–এর অনুকরণে কতকগুলো হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া আষাঢ়ে নামে প্রকাশ করি।' সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের নানা অসঙ্গতির ‍ি কটাক্ষ করে কবি ব্যঙ্গবিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। খণ্ড কবিতায় কবি যে হাস্যরসাত্মক কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তাতে 'হাস্য এবং অশ্রু, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরতলার ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলার গভীরতা' সবই এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা–গুলোর বিষয় বাস্তব জীবন ও চিত্র–চরিত্রের সঙ্গে নিকট সম্পর্কিত হওয়ায় এগুলোর ভাষা এবং ছন্দোবদ্ধ শিথিল। স্বভাবতই আষাঢ়ের কবিতাগুলোকে সমিল গদ্য নামে অভিহিত করা যায়। কবিতার বিষয়সমূহে গল্পের রস থাকায় এগুলো যথার্থই উপভোগ্য হয়েছে। ছন্দোহীন রোমান্স বর্জিত জীবনের প্রতিটি অসঙ্গতির প্রতি কবি হাস্যরসের জ্যোতি বর্ষণ করেছেন। 'অদলবদল' কবিতায় ঘটনার কৌতুককর অসঙ্গতি থেকে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা'য় নববিবাহিত হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রার কৌতুক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের চিত্র হিসেবে 'শ্রীহরি গোস্বামী', 'বাঙ্গালী মহিমা', 'ভট্টপল্লীতে সভা', 'নসীরাম পালের বক্তৃতা', 'কলিযুগ', 'শুকদেব', 'ডেপুটি–কাহিনী' ইত্যাদি কবিতার নাম করা যায়। আ.ই.

আসকার ইবনে শাইখ : নাট্যকার। ময়মনসিংহ জেলার মাইজহাটি গ্রামে ১৯২৫ সালের ১০ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহম্মদ সমীরউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে এম.এস.সি. পাস করেন। Incidence of Induced Abortion in Rural Bangladesh শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৮৩ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি পান। তিনি ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। ১৯৯০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনায় তাঁর সাফল্য সর্বজনবিদিত। ফকির বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের তিনি সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহের কাহিনী তাঁর সামাজিক নাটকে রসালো সংলাপে পরিস্ফুটিত হয়েছে। প্রকাশিত নাটক : বিরোধ (১৯৪৭), পদক্ষেপ (১৯৪৮), বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৪৯), দুরন্ত ঢেউ (১৯৫১), শেষ অধ্যায় (১৯৫২), বিলবাওড়ের ঢেউ (১৯৫৫), এপার ওপার (১৯৫৫), প্রতীক্ষা (১৯৫৭), প্রচ্ছদপট (১৯৫৮), লালন ফকির (১৯৫৯), অগ্নিগিরি (১৯৫৭), তিতুমির (১৯৫৭), রক্তপদ্ম (১৯৫৭), অনেক তারার হাতছানি (১৯৫৭), কর্ডোভায় আগে (১৯৮০), রাজপুত্র (১৯৮০), রাজা রাজ্য রাজরানী (১৯৮০), মেঘলা রাতের তারা (১৯৮১), কন্যা জায়া জননী (১৯৮৭) ; প্রবন্ধ–গবেষণা : বাংলা মঞ্চ নাটকের পশ্চাৎভূমি (১৯৮৬), বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে (১৯৮১)। ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৮৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। নূ. ই

আসন শিল্প : বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত মেয়েলী লোকশিল্পের একটি শাখা।

www.pathagar.com

সূচি শিল্পের উল্লেখযোগ্য একটি নিদর্শন আসন। উপবেশনের জন্য আসনের ব্যবহার বাংলাদেশ ও ভারতে প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত। এটি এক ধরনের লোকাচার। বৈদিক যুগে কুশনির্মিত আসন ব্যবহার করা হতো। বর্তমান যুগেও আসনের ব্যবহার বিলুপ্ত হয়নি। উপকরণ ও বুননের পার্থক্যের জন্য আসন বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির হয়ে থাকে। এর মূল উপকরণ চট বা কাপড়। এছাড়া কুশ, মাদুর, খেজুর পাতা, তালপাতা, পশম, নাইলনের ফিতা ইত্যাদিও আসনের জমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাদুরকাঠি, কুশ ও পাতার আসনের উপর নানা ধরনের ভেষজ ও প্রাকৃতিক রং দিয়ে সুদৃশ্য নকশা আঁকা হয়। এ ধরনের আসন প্রধানত প্রার্থনার কাজে ব্যবহার করা হয়। পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা সাধারণত পুরনো শাড়ির পাড় থেকে তোলা সুতো দিয়ে আসনের নকশা বানায়। চটের আসনের জন্য মাপমতো চট কেটে নিয়ে ঘর গুণে গুণে তা সুতো দিয়ে ভরাট করে নকশা তোলা হয়। বর্তমানে বাজারের কেনা সুতো বা উল দিয়েও আসন বোনা হয়। আসনের উপরের নকশা তোলা হয়ে গেলে তার উল্টো পিঠে মাপ মতো পুরানো বা শক্ত কাপড় দিয়ে আসনের কিনারাসহ মুড়ে দেওয়া হয়। আসনকে আরও সুন্দর করবার জন্য শাড়ির সুন্দর পাড়, ক্রুসের লেইস বা অন্য কাপড় দিয়ে চারপাশের কিনারা কুঁচি দিয়ে সেলাই করা হয়। কাপড়ের আসনেও একইভাবে সুতো দিয়ে নকশা করা যায়, আবার বিভিন্ন রঙের কাপড়ের টুকরো মূল জমির উপর বসিয়ে সেলাই করে নানা ধরনের নকশা তোলা যায়। আসনের নকশা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। গ্রামের কিশোরী ও গৃহবধূরা তাদের চারপাশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করে আসনের নকশা। আসনের নকশার বিষয়বস্তুকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন : জ্যামিতিক নকশা, নানাবিধ ফুল, বৃক্ষ ও লতা-পাতা , পশু-পাখি, মানুষ সম্পর্কিত বিষয়, দৃশ্য বা ঘটনার চিত্রণ এবং নাম ও শুভ কামনাসহ বক্তব্য প্রভৃতি। আসনের চিত্রিত নকশার মোটিফের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে গ্রাম-বাংলার মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষার নানা রূপ। অন্যদিকে তাদের শিল্পীসত্তাও প্রকাশমান হয়ে উঠে। কোনো কোনো আসনে একাধিক মোটিফের সমাবেশ ঘটে। 'আসনের ফোঁড়' বা বুননের মধ্যে ও বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। 'তমসনে ফোঁড়' বা 'ক্রস স্টিচই' আসনের আদি ও অকৃত্রিম বুনন। এর বাইরে রয়েছে — আনারসের চোখ, ছাঁটা কাজ, বরফি সেলাই, টানা সেলাই, তারা নকশা, বকুল ফুল প্রভৃতি ডিজাইন। গ্রামের মেয়েদের হাতে বোনা আসন লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে লালন করছে। তাদের সৃজনী শক্তি ও সৌন্দর্যবোধের মেলবন্ধন হিসেবে আসন শিল্প আজও সকলের কাছে সমাদৃত। ড. শা. আ.

আসন্ন বাস্তিল্ ও অন্যান্য কবিতা : জিল্লুর রহমন সিদ্দিকীর কবিতাগ্রন্থ। হাসেম খানের প্রচ্ছদে প্রকাশিত গ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ২৯। অধিকাংশ কবিতা গদ্যছন্দে রচিত। সনেটও রয়েছে কয়েকটি। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির নানাবিধ প্রসঙ্গ প্রস্ফূটিত হয়ে উঠেছে ই কাব্যে। মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা বাঙালির সংগ্রামী চেতনার দৃঢ়তা, বিপন্ন বর্তমানকে অতিক্রম করে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা, মানুষের যুথবদ্ধ সংগ্রামের চিরায়ত প্রবণতা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, স্মৃতিময় নস্টালজিক অনুভব, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষোভ, সমকালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য ও তা থেকে উত্তরণ প্রভৃতি মুখ্য হয়ে উঠেছে আলোচ্য কাব্য গ্রন্থে। বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগ্রামী প্রবণতা বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে—এই কবিতা-গ্রন্থে। কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১০০০। মো. আ. মি

www.pathagar.com

আসমানী পর্দা : আবুল মনসুর আহমদ রচিত রম্য রচনার সংকলন। প্রথম মুদ্রণ মাঘ ১৩৬৩ সন। গ্রন্থটিতে মোট ৮টি ব্যাঙ্গ কাহিনী স্থান পেয়েছে। এগুলো হলো : আসমানী পর্দা, খাজা বাবা, আহ্‌লে সুন্নত, আদু ভাই, ত্রিযুগমিতি, নিমক হারাম, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি এবং ছহি বড় ওয়ারতনামা। রচনাগুলো কোনটা গল্পের আঙ্গিকে, কোনটা নাটিকার আঙ্গিকে আবার কোনটা পুঁথির আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার এবং পাকিস্তানি শাসন শোষণের নানা পর্যায়ে লেখকের ব্যঙ্গোক্তি পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে। গ্রন্থটি পাঠ করলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের সঠিক চিত্র ভেসে উঠে। আষাঢ় ১৩৫৯ সনে রচিত 'আসমানী পর্দা'য় লেখক বক ধার্মিকদের খোলস উন্মোচন করেছেন। ইসলামের নামে এরা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের আবেগকে, চেতনাকে উস্‌কে দেয়। এদের সবধরনের অপকর্ম ধর্মের নামে জায়েজ করে নেয়। ওযিরে-আযম-এর কণ্ঠে লেখকের ভাষ্য : 'শুধু ইসলামের খাতিরেই আমরা মন্ত্রিত্ব করতেছি। আমরা ছাড়া অন্য কোন দল ইসলামের খেদমত করতে পারবে এ কথা যদি আমরা বুঝতে পারতাম, তবে এই মুহূর্তে আমরা আসন ত্যাগ কতে প্রস্তুত হৈতাম। কিন্তু আমরার দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরার মত ইসলামের প্রতি সত্যিকার দরদ নিয়া কেউ কাজে অগ্রসর না। শুধু স্বার্থ সিদ্ধির মতলবে মন্ত্রিত্ব দখল করতে চায়।' লেখক নিয়তির অমোঘ পরিণতি হিসেবেই এইসব ভণ্ডদের অসারতা, করুণ পরাজয় নিপুণ হাতে এঁকেছেন। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলে যে এর সুখকর পরিণতি হয় না তার সাক্ষ্য রয়েছে 'খাজা বাবা' (রচনাকাল : ভাদ্র, ১৩৫৬), 'আহ্‌লে সুন্নত', 'ত্রিযুগমিতি' (রচনাকাল : অগ্রহায়ণ ১৩৪৭), 'নিমকহারাম' (রচনাকাল : ভাদ্র ১৩৫৯), 'ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি' (রচনাকাল : ভাদ্র ১৩৫২), 'ছহি বড় ওয়ারতনামা' (রচনাকাল : পৌষ ১৩৫১) প্রভৃতিতে। গ্রন্থের একমাত্র করুণ রসের চিরায়ত কাহিনী পৌষ ১৩৪৫ সনে রচিত 'আদু ভাই' গল্পটি। এ গল্পটির আবেদন সর্বজননীন। **শা. আ.**

আসরারে খুদী : আল্লামা ইকবাল রচিত এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফারসি কাব্য গ্রন্থ। আসরারে খুদীই ইকবালের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, এর বাংলা অর্থ আত্মার রহস্য। গ্রন্থটিতে আত্মার রহস্য এবং এর উৎকর্ষ সাধনের বিভিন্ন স্তর বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই ইকবাল স্বদেশে এবং বিদেশে, বিশেষত পাশ্চাত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আসরারে খুদী প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পরে আর. এ. নিকলসন কর্তৃক এর একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের লোকেরা ইকবালের ভাবধারার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। তাছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর ইকবাল একজন দার্শনিক কবিরূপেও পরিগণিত হন। বাংলা সাহিত্যের ওপরও আসরারে খুদীর বেশ প্রভাব পড়ে এবং এর একাধিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আবদুল মান্নান সর্বপ্রথম বাংলায় এর গদ্যানুবাদ করেন। **আ. রা.**

আসাদ চৌধুরী : কবি। তিনি বরিশালের উলানিয়ায় ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আরিফ চৌধুরী। তিনি ১৯৫৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বরিশাল উলানিয়ার করনেশন হাইস্কুল থেকে। উচ্চমাধ্যমিক বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। শিক্ষকতা পেশায় কয়েক বছর চাকরি করে তিনি বাংলা একাডমীর পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। মূলত কবিতা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র হলেও তিনি শিশুসাহিত্য এবং প্রবন্ধ রচনায়

www.pathagar.com

সৃষ্টিশীল, স্বচ্ছন্দ এবং অবাধ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ : কবিতা : তবক দেওয়া পান (১৯৭৫), বিত্ত নাই বেসাত নাই (১৯৭৬), প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড় (১৯৭৯), জলের মধ্যে লেখাজোখা (১৯৮২), যে পারে পারুক (১৯৮৩), মধ্য মাঠ থেকে (১৯৮৪), মেঘের জুলুম পাখির জুলুম (১৯৮৫), আমার কবিতা (১৯৮৫), ভালবাসার কবিতা (১৯৮৫), প্রেমের কবিতা (১৯৮৫), দুঃখীরা গল্প করে (১৯৮৭), নদীও বিবস্ত্র হয় (১৯৯২), ভালবাসার কবিতা (১৯৯৭), বাতাস যেমন পরিচিত (১৯৯৮), বৃষ্টির সংসারে আমি কেউ নই (১৯৯৮)। প্রবন্ধ-গবেষণা : সংগ্রামী নায়ক বঙ্গবন্ধু (১৯৭৫), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৮৩), রজনীকান্ত সেন (১৯৮৯), যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ (সম্পাদনা ১৯৯১), কোন অলকার ফুল। শিশুতোষ : রাজার নতুন জামা (রূপান্তর, ১৯৭৯), ছয়টি রূপকথা (অনুবাদ, ১৯৭৯), এশিয়ার গল্প (অনুবাদ), রাজা বাদশার গল্প (১৯৮০), গ্রাম বাংলার গল্প (১৯৮০), ছোট রাজপুত্র (অনুবাদ, ১৯৮২), এককা দোককা (১৯৮০), গর্ব আমার অনেক কিছুর (১৯৯৬)। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতি আসাদ চৌধুরীর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ই তাঁর কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি উর্দু গজলের ডঙে নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার রসায়নে তাঁর কবিতায় আলাদা মাত্রা সংযোজন করেছেন। তিনি আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৫), অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), জীবনানন্দ পদক এবং ত্রিভুজ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। সৈ. আ. জা.

আসিয়া : ১৯৬০ সালে নির্মিত একটি বাংলা চলচ্চিত্র। ছবিটি পরিচালনা করেন ফতেহ লোহানী। কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেন নাজীর আহমদ। ছবির পাত্র-পাত্রীরা হলেন : সুমিতা দেবী, কাজী খালেক, রনেন কুশারী, ভবেশ মুখার্জি, মাধুরী চ্যাটার্জি প্রমুখ। গ্রামীণ সমাজ জীবনের এক বাস্তব কাহিনী চিত্রিত হয়েছে এ ছবিতে। নায়ক-নায়িকার গোপন প্রেম এর প্রতিপাদ্য। ছবিটি সৃষ্টিশীল ও জীবননিষ্ঠ হওয়ায় দর্শকমহলে নন্দিত হয়েছিল। আসিয়ার গান রচনা করেছেন আবদুল করিম ও মোবারক। সংগীত পরিচালনা করেন আবদুল আহাদ ও সমর দাশ। গানে কণ্ঠ দেন ফেরদৌসী রহমান, মাহবুবা রহমান, মোস্তফা জামান আব্বাসী প্রমুখ। নৃত্যে অংশ নেন ঝর্ণা (শবনম), কামাল লোহানী ও আলতামাস। ১৯৬১ সালে শ্রেষ্ঠ বাংলা চলচ্চিত্র হিসেবে আসিয়া প্রেসিডেন্ট পদক ও নিগার (উর্দু পত্রিকা) পুরস্কার পায়। নু. ই.

আহমদ ছফা : কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক। চট্টগ্রামের গাছবাড়িয়ায় ১৯৪৩ সালের ৩০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হেদায়েত আলী। গাছবাড়িয়া নিত্যানন্দ গৌরিচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজ থেকে ১৯৬২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। লেখালেখিই তাঁর পেশা। তিনি উত্থানপর্ব নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ : উপন্যাস : সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭), ওঙ্কার (১৯৭৫), একজন আলী কেনানের উত্থান পত্তন (১৯৮৯), মরণ বিলাস (১৯৯০), অলাত চক্র (১৯৯০), গাভি বিত্তান্ত (১৯৯৪), অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (১৯৯৬), পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ (১৯৯৬)। প্রবন্ধ-গবেষণা : জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১), বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৭৩), বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৭৯), সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১৯৮০), আহমদ ছফার প্রবন্ধ (১৯৯২), রাজনীতির লেখা (১৯৯২), শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র

www.pathagar.com

চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭), সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৯৭), যদ্যপি আমার গুরু প্রফেসর রাজ্জাক (১৯৯৭)। গল্প : নিহত নক্ষত্র (১৯৬৯)। কবিতা : জল্লাদ সময় (১৯৭৪), দুঃখের দিনে দোহা (১৯৭৫), একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা (১৯৭৭)। অনুবাদ : তানিয়া (১৯৬৭), ফাউস্ট (১৯৮৬), বার্ট্রান্ড রাসেলের সংশয়ী রচনাবলী। শিশুতোষ : দোলে আমার কনকচাঁপা (১৯৬৮), গো হাকিম (১৯৭৭)। আহমদ ছফা ১৯৭৫ সালে লেখক শিবির সাহিত্য পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর সা'দত আলী আখন্দ পুরস্কারও প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৮০ সালে তিনি ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের অধিকারী সমাজমনস্ক লেখক। তাঁর আর্থ-সামাজিক বিষয়ের বিশ্লেষণ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। ২০০১ সালের ২৭ জুলাই তিনি ঢাকায় পরলোক গমন করেন। সৈ. আ. জা.

আহমদ মীর : কথাসাহিত্যিক। কলকাতার বালিগঞ্জে ১৯২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস চুঁচুড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ। পিতা মফিজউদ্দীন আহমদ, মাতা আজিজা খাতুন। স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা। হুগলী মোহসীন কলেজ থেকে ১৯৪৫ সালে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে এম.এ. (বাংলা) পাস করেন। ১৯৫৫ সালে স্পন্দন (ঢাকা, ১৯৫৫) নামক মাসিক সাহিত্যপত্র এবং ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে রমনা (ঢাকা, ১৯৫৫) নামক সচিত্র পাক্ষিক রম্য পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯৬১ সালে রমনাকে সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করে সম্পাদনা করেন (১৯৬১-১৯৬৩)। ১৯৬২-তে পাকিস্তান সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদ সাময়িকী পাক-জমহুরিয়াত-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৮-তে পাকিস্তান সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের উপ-পরিচালক ও ১৯৭৬-এ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক পদে উন্নীত হন। 'বার্ডস অ্যান্ড বক্স' নামক প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। গল্পকার, অনুবাদক ও প্রকাশক হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। আরণ্য পরিবেশ, রোমান্টিক ভাব-ব্যঞ্জনা, নর-নারীর মনোলোকের রহস্যানুসন্ধান এবং মনোরম ও সাবলীল ভাষা তাঁর গল্পের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। 'লালমোতিয়া' (১৯৬৫) আহমদ মীরের একমাত্র গল্পগ্রন্থ। অ্যালান পো-এর শ্রেষ্ঠগল্প (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৫৭) তাঁর অনুবাদ কর্মের প্রধান নিদর্শন। তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও তাঁর প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী এদেশের প্রকাশনা শিল্পের এক সুরুচি ও সৌকর্যের উপকরণ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯। সা.আ.

আহমদ রফিক : কুমিল্লা জেলার শাহবাজপুর গ্রামে ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবদুল হক ও মাতা রহিমা খাতুন। তিনি নড়াইল মহকুমা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক (১৯৪৭), মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৪৯) এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. (১৯৫৮) পাস করেন। তাঁর পেশা শিল্প-ব্যবস্থাপনা ও সাহিত্যচর্চা। আহমদ রফিক কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তিনি পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকে অদ্যাবধি প্রায় চার দশক ধরে কবিতা লিখছেন। তাঁর কবিতায় মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, নিসর্গ-প্রীতি, স্বদেশ-প্রেম, বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্য সন্ধান ও সমাজ-বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। আহমদ রফিকের গবেষণার বিষয় সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ও বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়াও তাঁর ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক

www.pathagar.com

মননশীল রচনাদি সুধীমহলে সমাদৃত হয়েছে। আহমদ রফিক সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী সাহিত্যকর্মী। এই বোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, গবেষণা ও অনুবাদ মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশাধিক। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : শিল্প সংস্কৃতি জীবন (প্রবন্ধ, ১৯৫৮), পদ্মাপারের সেই গাল্পিক যাদুকর (গবেষণা, ১৯৭৬), আরেক কালান্তরে (প্রবন্ধ, ১৯৭৭), বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি (প্রবন্ধ, ১৯৮৬), রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও বাংলাদেশ (গবেষণা, ১৯৮৭), ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য (১৯৯১), রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প (১৯৯৬), জাতিসত্তার আত্ম-অন্বেষা (১৯৯৭), রবীন্দ্রভুবনে পতিসর (১৯৯১), বাউল মাটিতে মন (কবিতা, ১৯৭১)। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৯), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯২), একুশে পদক (১৯৯৫), রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধি (ট্যাগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৯৭) ইত্যাদি লাভ করেন। সা. আ.

আহমদ শরীফ : লেখক, গবেষক। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুল আজিজ। পটিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯৪০ সালে আই.এ. ও ১৯৪২-এ বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪-এ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাস করেন। 'সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' বিষয়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০-১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারী ছিলেন। ১৯৫৭-তে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৭০-এ রিডার ও ১৯৭২-এ প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭৩-১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন এবং ১৯৭৫-১৯৭৮ সালে বাংলা বিভাগের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৩ সালে অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৪-১৯৮৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক ছিলেন। এছাড়া ১৯৬৯-১৯৭ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি, ১৯৭২-১৯৮১ সালে বাংলাদেশ লেখক সমিতির সভাপতি, ১৯৭৬-১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি, ১৯৯২-১৯৯৪ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও গদ্য লেখক। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়। মধ্য যুগের বহু কবির লুপ্তপ্রায় রচনাবলী সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। দেশ, সমাজ, জাতি, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। বাঙালি জাতীয় চেতনার মর্মবাণী, মানবতাবাদ, সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণা, প্রগতিশীল জীবনবোধ তাঁর রচনায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন নির্ভীক, সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী ও স্বঘোষিত নাস্তিক। সরকারের অন্যায়, অবিচার ও নির্যাতন এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজকে মরণোত্তর দেহদান ও অন্ধজনকে আলোদানের জন্য সন্ধানীকে মরণোত্তর চক্ষুদান করেন। সাহিত্যকৃতির জন্য ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৯১ সালে একুশে পদক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৩ সালে ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ—প্রবন্ধ-গবেষণা : বিচিত চিন্তা (১৯৬৮), স্বদেশ অন্বেষা (১৯৭০), সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ (১৯৭২), বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড

www.pathagar.com

১৯৮৩), মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য (১৯৮৫), বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা (১৯৮৭), বাঙলা, বাঙালী, বাঙালিত্ব (১৯৯২) ইত্যাদি। সম্পাদনা : লায়লী মজনু (১৯৫৭), পুঁথি পরিচিতি (১৯৫৮), আলাওল বিরচিত তোহফা (১৯৫৮), মহম্মদ খান বিরচিত সত্য কলি বিবাদ সংবাদ (১৯৫৯), মুহম্মদ কবীর বিরচিত মধুমালতী (১৯৫৯), মুসলিম কবির পদসাহিত্য (১৯৬১), রসুল বিজয় (১৯৬৪), নীতিশাস্ত্র বার্তা (১৯৬৫) শা'বারিদ গ্রন্থাবলী (১৯৬৬), কোরেশী মাগন বিরচিত চন্দ্রাবলী (১৯৬৭), বাঙলার সূফী সাহিত্য (১৯৬৯), নসিহতনামা (১৯৬৯), বাউল তত্ত্ব (১৯৭৩), হিন্দু রচিত পদসাহিত্য (১৯৭৩), সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামান (১৯৭৫), সওয়াল সাহিত্য (১৯৭৬), আলাওল বিরচিত সিকান্দরনামা (১৯৭৭), সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবী বংশ (১৯৭৮), সৈয়দ সুলতন বিরচিত রসুলচরিত (১৯৭৮), শেখ মত্তালিব বিরচিত কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব (১৯৭৮), বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (১৯৯২) প্রভৃতি। মৃত্যু : ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। নূ. ই

আহমেদ হুমায়ুন : লেখক ও সাংবাদিক। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শাহবাজপুর গ্রামে ১৯৩৬ সালের ১৮ মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ শামসুদ্দীন আহমেদ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোহিনীকিশোর হাইস্কুল থেকে ১৯৫৩ সালে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৬ সালে আই.এস.সি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ১৯৬০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে বি.এস.সি. অনার্স এবং ১৯৬১ সালে এম.এস.সি. (পদার্থবিজ্ঞান) পাস করেন। তিনি অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সম্পাদক ছিলেন। ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতার মুখে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল জনপ্রিয়তা ও বাঙালির জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা বিশ্লেষণে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অজ্ঞ, অখ্যাত ও কঙ্কালসার মানুষের বেঁচে থাকার বিচিত্র চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর অপরাপর রচনায়। রঙ্গ-ব্যঙ্গের স্বাদে তাঁর লেখা সমৃদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৩), সিঙ্গেল কলাম, ডবল কলাম (১৯৮৬), আলেফ মিয়ার পৃথিবী (১৯৮৪)। ১৯৮৭ সালে একুশে পদক লাভ করেন। ২৩ জুলাই, ১৯৯৯ সালে ঢাকায় তিনি পরলোক গমন করেন। নূ. ই

আহমেদুর রহমান : সাংবাদিক ও লেখক। ব্রাহ্মণবাড়িড়া জেলার সরাইল উপজেলার উচালিয়াপাড়া গ্রামে ১৯৩৩ সালের ১ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আহম্মাদী সমাজ-ভুক্ত মুন্সী আবদুর রহমান (সাবরেজিস্টার অফিসের কর্মচারী), মাতা মোজাফফরনেসা, স্ত্রী হাফিয়া। বাল্যকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। সরাইল অন্নদা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪৯), ঢাকা সলিমুল্লাহ নৈশ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৫৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. অনার্স (১৯৫৭) ও এম.এ. (১৯৬০) পাস করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ এবং স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে নকল নবিসের চাকরি পান। ১৯৫১ সালে এ চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। ১৯৫২ সালে দৈনিক মিল্লাতের সহ-সম্পাদক (১৯৫২-১৯৫৮) ও ১৯৫৮ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক (১৯৫৮-১৯৬৫) পদে নিযুক্তি পান। ইত্তেফাকে ভীমরুল ছদ্মনামে উপ-সম্পাদকীয় রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (১৯৫২) একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এ ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বাধীন সংস্কৃতি সংসদের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে ফেব্রুয়ারির জেনারেল আইয়ুব খানের

www.pathagar.com

সামরিক শাসন-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সামরিক সরকার তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে। ১৯৬৪ সালে মধ্য জানুয়ারির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকী (১৯৬১) পালনের তিনি একজন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্রবিরোধিতার পটভূমিকায় ইত্তেফাকের পাতায় রবীন্দ্রনাথকে তিনি বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও তাঁর সাহিত্যকর্ম বাঙালি সংস্কৃতির এক শ্বাশত ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে তুলে ধরেন। তিনি একজন বুদ্ধিদীপ্ত প্রাবন্ধিকও। সাংবাদিকতার কাজে বিদেশে গমনকালে কায়রোতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। হাবিবুর রহমান মিলনের সম্পাদনায় 'আহমেদুর রহমান রচনাবলী' (১৯৬৭) প্রকাশিত হয়। মৃত্যু : কায়রো (মিশর) ৫ মে ১৯৬৫। নূ. ই

আহম্মদ সাদী : উর্দু ভাষার কবি, কথাশিল্পী এবং অনুবাদক। তাঁর নিজের ভাষা উর্দু হলেও বাংলা ভাষাকে তিনি নিজের ভাষার মতো ভালোবাসতেন। তিনি ১৯৩১ সালে বিহার-রাজ্যের মুঙ্গের জেলার চিরবিলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৭'-এর দেশ বিভাগের পর তিনি সৈয়দপুরে চলে আসেন। এখানে একটি এনজিও-তে চাকুরি করতেন। আর লেখালেখি ছিলো তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি উর্দু ভাষায় নিজের লেখালেখির পাশাপাশি বাংলা ভাষার অজস্র গল্প, কবিতা, উপন্যাস অনুবাদ করেছেন। তাঁর দু'টি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। ১ম বইটি দুদে চেরাগে মাহফিল' (১৯৮৩), অপরটি 'মিট্রি কি খুশবু' (১৯৮৯)। এছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের প্রধান লেখকদের গল্প এবং কবিতা অনুবাদ করেছেন। তিনি নজরুলের কবিতা সংকলনের একটি উর্দু সংস্করণও তৈরি করেছিলেন। কবি আসাদ চৌধুরী আহম্মদ সাদী সম্পর্কে লিখেছেন : "এদেশে একটিও উর্দু পত্রিকা নেই, একজন প্রকাশকও নেই যিনি উর্দু বই প্রকাশ করেন। সেখানে আহম্মদ সাদী, যাঁর নিজের কবিতার সংখ্যা প্রায় তিনশ', দুশ'র অধিক গল্প লিখেছেন, সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা ভাষার প্রধান কবি সাহিত্যিকের উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক উর্দুতে অনুবাদ করে ভারত আর পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের লেখকদের পরিচিতি উর্দু ভাষীদের কাছে তুলে ধরেছেন।" তিনি ১৯৯৯ সালের ১৯ নভেম্বর সৈয়দপুরের নয়াবাবু পাড়ায় নিজের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। সে. হো.

আহসান হাবীব : কবি। পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাফিজুদ্দীন হাওলাদার, মাতা জমিলা খাতুন, স্ত্রী সুফিয়া খাতুন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই.এ. অধ্যয়ন করেন। আর্থিক অনটনের কারণে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে জীবিকার সন্ধানে ১৯৩৬সালে কলকাতায় গমন করেন। দৈনিক আজাদের সহ-সম্পাদক, মাসিক বুলবুলের সহকারী সম্পাদক ও মাসিক সওগাতের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৩-১৯৪৮ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্রের স্টাফ আর্টিস্ট পদে চাকরি করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) কিছুকাল পর কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। আজাদ ও মোহাম্মদীর সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা করেন। ১৯৫৭-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনের প্রোডাকশন অ্যাডভাইজার ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ১০ নভেম্বর দৈনিক পাকিস্তানের (স্বাধীনতাত্তোর নাম দৈনিক বাংলা) সাহিত্য পাতার সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রায় দুই দশক এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন বিশিষ্ট কবি। তীক্ষ্ণ সমাজ-মনস্কতা ও গভীর সংবেদনশীলতা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাব, ভাষা ও ছন্দের পরিশীলিত ও সুললিত রূপায়ণ তাঁর কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে

www.pathagar.com

তুলেছে। ব্যঙ্গ কবিতা রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ—কবিতা : রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়াহরিণ (১৯৬২), সারাদুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৯৭৫), মেথ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দু'হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫) ; উপন্যাস : আরণ্য নীলিমা (১৯৬২) ; শিশুকিশোর সাহিত্য : ছোটদের পাকিস্তান (১৯৫৩), রানীখালের সাঁকো (১৯৬৫), ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮)। সাহিত্যকৃতির জন্য ১৯৬১-তে বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৭৮-এ একুশে পদক লাভ করেন। মৃত্যু : ঢাকা, ১০ জুলাই ১৯৮৫। নূ.ই.

আহীর ভৈরব : দিবা প্রথম প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে ঋষভ ও নিষাদ কোমল হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমেই সাত স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাদী স্বর মধ্যম, সংবাদী স্বর ষড়জ। ঠাট ভৈরব। আরোহ : স ঋ গ ম প ধ ণ র্স। অবরোহ : র্স ণ ধ প ম গ ঋ স। ক. গো.

আহীরী টোড়ী : দিবা গেয় রাগ। এই রাগে কোমল ঋষভ, কোমল গানধার ও তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। ষাড়ব জাতি। আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমে ছয় স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধৈবত বর্জিত স্বর। বাদীস্বর পঞ্চম, সংবাদী স্বর তার ষড়জ। ঠাট টোড়ী। অবরোহ : স ঋ জ্ঞ হ্ম প ন র্স। অবরোহ : র্স ন প হ্ম জ্ঞ ঋ স। ক. গো.

আহুতি : প্রমথ চৌধুরী রচিত রোমান্টিক ভাবের গল্প। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যা সবুজপত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে 'আহুতি' (১৯১৯) গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রমথ চৌধুরী মূলত রোমান্টিক ভাবের বিরোধী, কিন্তু এই গল্পে তাঁর রোমান্টিকতা-বিরোধী মন অতীতকে ঘিরে যে কল্পনার জাল বুনেছে, তাতে এক অভিশপ্ত কাহিনী রোমান্টিক ভাবধারাকে আশ্রয় করে বিচিত্র রেখায় ফুটে উঠেছে। রুদ্রপুরের পরিবেশ বর্ণনায় লেখক এক নিপুণ রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। অতীতের এক বিলুপ্ত কাহিনীর প্রকাশ ঘটেছে কিরীটচন্দ্রের অসহায় কণ্ঠের আর্তধ্বনিতে। সিংহবাহিনীর পাষাণ প্রতিমার মতো রত্নময়ী এক অভিশপ্ত পরিবার-জীবনের নীরব সাক্ষী। রঙ্গিনীর অন্ধসংস্কার ও অমূলক সন্দেহ-পরায়ণতা এবং রত্নময়ীর প্রতিহিংসার নিষ্ঠুরতাকে ধ্বংসের প্রতীক ঝড় ও ভূকম্পনের সঙ্গে মিলিয়ে লেখক এক আদিম, অসংস্কৃত ও বর্বর পৃথিবীর বীভৎস রূপ উদঘাটন করেছেন। আ.ন.ম.ব.র.

ইউজিন ও' নীল : প্রখ্যাত নাট্যকার। তিনি ১৮৮৮ সালের ১৬ অক্টোবর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। ছেলেবেলায় ও'নীল ভীষণ অশান্ত প্রকৃতির ছিলেন। সেই জন্য একবার তিনি স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। চব্বিশ বছর বয়সে ডাক্তার যক্ষ্মা সন্দেহ করে তাঁকে স্যানোটোরিয়ামে পাঠান, সেখানেই তিনি প্রথম লেখার প্রেরণা অনুভব করেন। তিনি তখন নাটক লিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে আমেরিকান নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাটক বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শ হিসেবে স্থান লাভ করে। নাটকের জগতে নতুন নিরীক্ষার দ্বারা ইউজিন ও'নীল আমেরিকার একজন অবিসম্বাদিত নাট্য-প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি পান। ১৯৫৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। জীবনে ও'নীল খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছেছিলেন। তিনি অনেকগুলো উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। Annarchristic তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর অন্যান্য রচনা—Desire under the Elms, Strange Interlude, The Emperor Jones ইত্যাদি। ১৯৩৬ সালে ও'নীল নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। ম. ই.

ইউজেনিও মন্তেল : প্রখ্যাত ইটালীয় কবি। আড্রিয়াটিকের তীরবর্তী বন্দর নগরী জেনোয়ায়

১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তুরিন, ফ্লোরেন্স ও মিলানে বসবাস করেন। জীবিকার জন্য মন্ডেল প্রথমে অনুবাদক, পরে সাংবাদিক ও কখনো কখনো সঙ্গীত সমালোচক হিসেবে কাজ করেন। অদ্রিয়াটিক তীরবর্তী জন্মভূমিকে তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। জেনোয়ার কাছে সমুদ্রের উপরেই তাই তাঁর অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়। জনৈক ইংরেজ সমালোচকের মতে ইউজেনিও মন্ডেলের কবিতা হচ্ছে 'Totality of the Sea'। ১৯২৫ সালে মন্ডেলের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'ও সি দ্য সোনিয়া' প্রকাশিত হলে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩০ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অকাজিওঁ' (Occasion) প্রকাশিত হয়। মন্ডেল ছিলেন সংবেদনশীল কবি। তিনি নিরিবিলিতে থাকতে ভালোবাসতেন এবং কবিতা লিখতেন সংগোপনে ও খ্যাতির প্রতি আসক্ত না হয়ে। ১৯৭৫ সালে ইউজেনিও মণ্ডেল কাব্যে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ছিলেন ইটালির পঞ্চম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যক্তি। ১৯৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। আ.ন.ম.ব.র.

ইউটোপিয়া : ল্যাটিন ভাষায় রচিত ও ১৫১৬ সালে প্রকাশিত স্যার টমাস মোর একটি গ্রন্থের নাম। গ্রিক ভাষায় ইউটোপিয়ার অর্থ শূন্যতা। টমাস মোরের গ্রন্থে এমন একটি আদর্শ রাজ্যের কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে মানবজাতির সর্ববিধ কল্যাণের ব্যবস্থা আছে এবং দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতি দুর্দশার স্থান নেই। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার জন্য ইউটোপিয়া নামটি সমাজতন্ত্রী দার্শনিক ও কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিদের সৃষ্ট সর্ববিধ কাল্পনিক আদর্শ রাজ্যের ধারণার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। প্লেটোর 'রিপাবলিক' এবং সেন্ট অগাস্টিনের 'সিটি অব গড' প্রথম যুগের কল্পনা রাজ্য সম্পর্কিত ইউটোপীয় গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত। স্যার টমাস মোরের পরে এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো--কামপানেলার 'দি সিটি অব দি সান' (১৬২৩), ফ্রান্সিস বেকনের 'দি নিউ অ্যাটলান্টিস্' (১৬২৭) এবং জেমস হ্যারিংটনের 'ওশিয়ানা' (১৬৫৬)। কয়েকজন ফরাসি লেখকও কাল্পনিক আদর্শ রাজ্য-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে স্কটল্যাণ্ডের রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) ছিলেন আদর্শ-স্থানীয়। ইউটোপিয়া জাতীয় বিষয়ের ওপর কয়েকটি ইংরেজি উপন্যাসও রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে এডওয়ার্ড বেলামির 'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড' (১৮৮৮), স্যামুয়েল বাটলারের 'এরেওয়েন' (১৮৭২) এবং উইলিয়ম মরিসের 'এ ড্রীম অব জন বল' (১৮৮৮) ও 'নিউজ ফ্রম নোহোয়ার' (১৮৯১)। তাছাড়া এ্যারিস্টো-ফেনের 'দি বার্ডস', ম্যানডেভিলের 'দি ফেবল অব দি বীজ' এবং সুইফ্টের 'গ্যালিভার্স ট্রাভেলস' (১৭২৬)-এর অংশবিশেষ বিদ্রূপাত্মক ইউটোপিয়ার পর্যায়ে পড়ে। চলতি শতকে কাল্পনিক ইউটোপীয় রাজতন্ত্রকে আলডুয়াস হাক্সলি তাঁর 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' (১৯৩২)-এ এবং জর্জ অরওয়েল তাঁর 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' (১৯৪৮)-এ তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছেন। লোককাহিনী শ্রুত 'অ্যাট্লান্টিস্', 'ফরচুনেট আইল্স' এবং 'এল্ ডোরাডো' জাতীয় ইউটোপিয়া অতীতের বিশ্বাসপ্রবণ লোকেরা যুগ যুগ ধরে খুঁজে হয়রান হয়েছে। এমন চিত্তাকর্ষক ধারণা এখন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়নি। বাংলা সাহিত্যে এমন একটি রচনা বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'। ম. ই

ইউনুস এমরে : তুরস্কের কবি। তিনি ১২৪১ সালে তুরস্কের আনাতুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের এই কবি প্রায় আশি বছর জীবিত ছিলেন। নিজের মাতৃভাষা তুর্কি ছাড়াও তিনি আরবি ও ফারসি খুব ভালো জানতেন। ইউনুস এমরেই প্রথম তুর্কী কবি যিনি তাঁর মাতৃভাষাতে কবিতা লিখেছিলেন। তিনি যে ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন, সেটি ছিলো আনাতলিয়ার গ্রামে-গঞ্জে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। রাজধানী ইস্তাম্বুলের শিক্ষিত সমাজের প্রমিত ভাষা তা ছিলো না। সেই মধ্যযুগে মুসলিম কবিরা

www.pathagar.com

আরবি এবং ফার্সিতে কবিতা লিখতেন। তাঁর সমসাময়িক কবি মাওলানা জামালউদ্দিন রুমীর 'মসনবী' কাব্যের ভাষা ছিলো ফার্সি। ইউনুস এমরে তাঁর কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু নিরাভরণ তুর্কী ভাষা ছিলো তাঁর প্রাণের ভাষা। তিনি নিজ মাতৃভাষায় তাঁর কবিতাকে অমর করেছেন এবং সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে নিজেও হয়েছেন অমর। তাঁর নিজগ্রাম আনাতুলির ধূসর, রুক্ষ পর্বতময় প্রকৃতি ছিলো তাঁর কবিতার প্রাণ। ইউসুফ এমরে ছিলেন মরমী কবি। ধর্ম তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি গোঁড়ামীতে আবদ্ধ ছিলো না। ছিলো সংকীর্ণতামুক্ত, উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে স্নাত। যে কারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মানব জাতির যথার্থ প্রতিনিধি। তিনি তুরস্কের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ। ১৯৯১ সাল ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিলো 'ইউনুস এমরে বৎসর' হিসেবে। এর ফলে কবি প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর পরে পৃথিবীর মানুষের সামনে নতুন রূপে ফিরে আসেন। এই উপলক্ষে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় ইউসুফ এমরে কবিতা সংকলন। এই সুফী কবিকে বাংলাভাষী মানুষেরা চিনতে পারে এই অনুবাদ কবিতার মধ্য দিয়ে। কবিতাগুলো অনুবাদ করেন জনাব আরশাদ-উজ-জামান। এর কাব্যিক রূপ দান করেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। ইউনুস এমরে ১৩২১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সে. হো.

ইউরিপিদিস : প্রাচীন গ্রিসের প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। তাঁর জীবনকাল খ্রিঃ পূঃ ৪৮৫-খ্রিঃ. পূঃ ৪০৭। এস্কাইলাস ও সফক্লেসের নাটকসমূহের সঙ্গে ইউরিপিদিসের নাটকগুলিও এথেন্সের জাতীয় উৎসবে মঞ্চস্থ হতো। তাঁর উনিশটি নাটক পাওয়া গেছে, এ থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এথেন্সের রাজনীতিতে ইউরিপিদিসের (Euripides) কোনো ভূমিকা ছিল না। দক্ষ হাতে চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রীসের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার প্রচেষ্টাই প্রধানত তাঁর নাটকে রূপ পেয়েছে। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'পেলিয়াডিস' (Polyadis), 'ফেলোকটেটাস' (Pheloctetas), 'এন্ড্রোমেকি' (Andromacke), 'ওরেস্টস' (Orestes) অন্যতম প্রধান। জানা যায় যে, তিনি শেষদিকে ম্যাসিডোনিয়ায় চলে যান ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ম্যাসিডোন-রাজ্যের শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা ছিল না কী তাঁর ম্যাসিডোন গমনের কারণ। ম. ই

ইউসুফ : বাইবেলোক্ত জেকবের পুত্র জোসেফ। পবিত্র কুরআনে তিনিই হযরত ইয়াকুবের প্রিয়পুত্র ইউসুফ। কুরআনের বর্ণনামতে কেনান নিবাসী হযরত ইয়াকুবের বারো পুত্রের মধ্যে ইউসুফ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ভাইদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সুদর্শন এবং পিতার অত্যধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন বলে অন্য ভায়েরা তাঁকে ঈর্ষা করতো। তারা সবাই ছিলো তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। একদিন তারা মেষ চরাবার কথা বলে পিতাকে রাজি করিয়ে ইউসুফকে এক নির্জন প্রান্তরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁকে এক কূপে ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে পিতাকে জানায় যে বাঘের কবলে পড়ে ইউসুফ প্রাণ হারিয়েছে। কথিত আছে, পুত্রশোকে হযরত ইয়াকুব কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ওদিকে আরবের একদল বণিক পথচলার সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে পানির সন্ধানে উক্ত কূপের কাছে যায়। কূপের মধ্যে ইউসুফকে দেখতে পেয়ে বণিকেরা তাঁকে উদ্ধার করে মিসরে নিয়ে যায় এবং সেখানকার এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট বিক্রি করে দেয়। ইউসুফের প্রভুপত্নী জোলেখা ইউসুফের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। একদিন জোলেখা ইউসুফের নির্জন কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর নিকট প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ইউসুফ তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন। জোলেখা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীর নিকট

ইউসুফের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ করেন। বিচারে তাঁকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। ইউসুফ ছিলেন বিজ্ঞ, মেধাবী ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। মিসরের তৎকালীন রাজা ফিরাউনের দেখা এক অদ্ভুত স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। নিজ প্রতিভা বলে অচিরেই তিনি মিসরের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর জন্মস্থান কেনানে তখন মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তাঁর পিতা ও বৈমাত্রেয় ভায়েরা খাদ্যের সন্ধানে মিসরে আগমন করলে ইউসুফের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। মহান হৃদয় ইউসুফ তাঁর ভাইদের পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফের এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ আছে। এ ঘটনা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের কাব্য রচনার সূত্রপাত ঘটে ইউসুফ-জোলেখার প্রণয়কাহিনী দিয়েই। **আ. খা.**

ইউসুফ-জোলেখা : রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান-মূলক কাব্য। এ কাব্যের উপজীব্য বিষয় হলো ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়-কাহিনী। এ উপাখ্যান বাইবেল ও কোরানে যথাক্রমে জোসেফ ও ইউসুফের কাহিনী হিসেবে বিধৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ কাহিনীর প্রথম কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর। তাঁর 'ইউসুফ-জোলেখা' (রচনাকাল আনুমানিক ১৩৮৯-১৪০৯ সাল) কুরআনের ভাষা অবলম্বনে রচিত। সগীরের কাব্যে প্রথমে তৈমুস বাদশার কন্যা জোলেখার জন্মবৃত্তান্ত, বয়ঃপ্রাপ্তি, স্বপ্নদর্শনে এক রূপবান পুরুষের প্রতি তাঁর প্রেমাসক্তি, স্বপ্নদৃষ্ট প্রেমিক সম্ভাবনায় আজিজ-মিসিরকে নির্বাচন ও তাঁর সহিত জোলেখার বিবাহ, আজিজ-মিসির ভিন্ন পুরুষ হওয়ায় জোলেখার হতাশ্বাস ও বিলাপ ইত্যাদি ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। এরপর ইউসুফের প্রসঙ্গ এসেছে। ইউসুফ ছিলেন হজরত ইয়াকুবের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। ইয়াকুব তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। এতে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। একদিন মেষ চরাবার কথা বলে পিতার নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে ইউসুফকে তারা এক বিজন বনে নিয়ে যায়। সেখানে তারা ইউসুফকে এক কূপে ফেলে ঘরে এসে পিতাকে জানায় যে, ইউসুফকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। মনির নামে এক বণিক ইউসুফকে কূপ থেকে উদ্ধার করে মিসরে নিয়ে যায়। আজিজ-মিসির তাঁকে ক্রয় করেন। জোলেখা ইউসুফের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি প্রেম নিবেদন করেন। ইউসুফ তা প্রত্যাখ্যান করেন। জোলেখা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে স্বামীর নিকট ইউসুফ তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করেন। বিচারে ইউসুফের কারাদণ্ড হয়। মিসররাজের স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আজিজ-মিসিরের পদ লাভ করেন। অতঃপর ইউসুফের সঙ্গে জোলেখার বিবাহ হয়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে ইউসুফের পিতা ও ভাইয়েরা দেশত্যাগ করে মিসরে আগমন করলে ইউসুফের সঙ্গে তাদের পুনর্মিলন ঘটে। হৃদয়বান ইউসুফ হিংসাপরায়ণ ভাইদের ক্ষমা করে তাদের সাদরে গ্রহণ করেন। এবং দ্বিতীয়াংশে ইউসুফের সহোদর ইবনে আমীনের সঙ্গে বিধুপ্রভার প্রেম ও বিরহের গল্প রয়েছে। এ কাব্যের দ্বিতীয় কবি রাজ্জাক নন্দন আব্দুল হাকিম। তিনি ফার্সী কবি জামীর 'য়ুসফ জুলায়খা' কাব্যাবলম্বনে তাঁর 'ইউসুফ-জোলেখা (রচনাকাল সপ্তদশ শতক) রচনা করেছেন। তৃতীয় কবি ফকীর গরীবুল্লাহ। তাঁর কাব্যের উপজীব্যও জামীর 'য়ুসফ জুলায়খা'। গরীবুল্লাহর ইউসুফ-জোলেখা (রচনাকাল আনুমানিক ১৭৬৫ সাল) দোভাষী বাংলায় রচিত। তাঁর কাব্যের কাহিনীর বক্তা পীর বদর, আর শ্রোতা বড় খা গাজী। পীর বদরের 'বাতুন' নির্দেশে কবি একাব্য রচনা করেছেন, নারী প্রেমের মোহিনী শক্তির তীব্রতা

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা দিয়ে বড়-খাঁকে ফকিরি পন্থার উপদেশ দিতেন। মু.আ.জ.

ইউসুফ পাশা : কবি। তিনি ১৯৪৪ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ ইসহাক। ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তার লেখালেখির শুরু। কবিতার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কলাম লেখেন। তার গদ্য রচনা সহজ-সরল। তার প্রথম প্রকাশিত বই অপ্রতুল পুতুল নাচে। এই গ্রন্থটি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তার আরো তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। বই তিনটি হলো : প্রণয়ের প্রজাপতি, রুদ্ধ তোমার দরোজায় ও একা একা যাই। তার কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং সামাজিক চিত্র সরল গদ্যে ও পদ্যে বর্ণিত। খা. বি. জ. উ.

ইউস্টেস কেরী : ইংল্যাণ্ডের নর্দামটনশায়ারের অন্তঃপতি পলার্সপিউরি গ্রামে ১৭৯১ সালের ২২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা টমাস কেরী। ইউস্টেস ছিলেন রেভাঃ উইলিয়াম কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির অন্যতম কর্মী হিসেবে তিনি ১৮১৪ সালের প্রথম দিকে শ্রীরামপুর আসেন। চার বৎসর কাল কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের তত্ত্বাব-ধানে ইউস্টেস শিক্ষানবিস থাকেন। ১৮১৮ সালে কলকাতায় এসে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮২৫ সালে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ইউস্টেস কেরীর একটিমাত্র বাংলা রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি একটি প্রচার পুস্তিকা, নাম 'সত্যদর্শন' (১৮১৮)। উইলিয়াম কেরীর জীবনী অবলম্বনে তিনি একটি ইংরেজি গ্রন্থও রচনা করেন। পুস্তকটির নাম 'Memoir of William Carey, D.D. (১৮৩৬)। ১৮৫৫ সালের ১৯ জুলাই পরলোক গমন করেন। আ.ই

ইংরেজি ভাষা : ইংরেজি ভাষা ইন্দো ইয়োরোপীয় পরিবারের জার্মানিক শাখার অন্তর্ভুক্ত। এটি মূলত ইংল্যাণ্ডের ভাষা। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির উত্থানের ফলে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল আঠারো-উনিশ শতকে। বর্তমানে আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরেজি ভাষা প্রসারিত হয়েছে। ভারত উপমহাদেশে, মালয়েশিয়ায়, ফিলিপাইনে এ ভাষা প্রচলিত আছে। ইংরেজি ভাষার বিকাশের ইতিহাসে তিনটি কাল নির্দেশ করা হয়। (১) প্রাচীন ইংরেজি (৪৪৯-১০৬৬), (২) মধ্য ইংরেজি (১০৬৬-১৪৭৬), (৩) আধুনিক ইংরেজি (১৪৭৬ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)। ভাষার স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক রূপে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা ককন ইংলিশ, ইণ্ডিয়ান ইংলিশ, ব্লাক ইংলিশ, ক্রিয়ল ইংলিশ, আমেরিকান ইংলিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশ ইত্যাকার নামকরণ করে ইংরেজি ভাষার বিচিত্র রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেত চান। প্রাচীন ইংরেজির চারটি প্রধান উপভাষা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে এক. নর্দাস্‌ব্রিয়ান, দুই. মার্সিয়ান, তিন. ওয়েস্ট স্যাক্সন এবং চার. কেন্টিশ। প্রথম দুটোকে বলা হতো এ্যাংলিয়ান। প্রথমে এ উপভাষার প্রসার ছিল, কিন্তু পরে রাজা আলফ্রেডের সময় থেকে ওয়েস্ট স্যাক্সন বুলি প্রাধান্য লাভ করে। প্রাচীন ইংরেজির বিকাশে ৫৯৭ সালে ইংল্যান্ডে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার এবং ৭৯০ সালে স্কান্ডিনেভীয় আক্রমণ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে বলে ধরা হয়। নমান বিজয়ের (১০৬৬ সাল) সময় থেকে মধ্য ইংরেজির কাল ধরা হয়। প্রাচীন ইংরেজিতে যেমন স্কন্ডিনেভিয় প্রভাব প্রবল, মধ্য ইংরেজিতে তেমনি ফরাসি প্রভাব প্রধান। মধ্য ইংরেজির ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। ১৪৭৬ সালে ইউলিয়ম ক্যাক্সটন (১৪২২-৯১) মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে আধুনিক ইংরেজির সূচনাকাল ধরা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ভাব পরিবহনের মাধ্যম হওয়াতে ইংরেজি বিশ্বজোড়া পরিচিতি ও ব্যবহার লাভ করেছে। ম. মু.

ইকড়ি মিকড়ি : এখলাসউদ্দিন আহমদের ছড়াগ্রন্থ। মূল্য ১.০০ টাকা। প্রকাশক : ৩২ নন্দলাল দত্ত লেন, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা- কালাম মাহমুদ, প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৭৫ সন। 'ময়না মোতি মুক্তোমাণিক/তোমার তরে আনবো খানিক/এখন শুধু বন্ধ করা/ছিঁচ কাঁদুনে কান্না/কাল সকালে আবার দেবো/ চুন্নি হীরে পান্না'—ইকড়ি মিকড়ি শুরু হয়েছে এরকম চমৎকার ছড়া দিয়ে। এভাবেই ছড়ায় ছড়ায় পুরো গ্রন্থই ছন্দময় হয়ে উঠেছে। বিষয় বৈচিত্র্যের কারণেও এ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে আরো বেশি নান্দনিক। রাজা, রাণী, ডাক্তার, হাতি, রেলগাড়ি, গাধা, খুকু ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত ছড়ায় লেখকের স্বতস্ফূর্ততা লক্ষণীয়। ছন্দ নিয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দেবার লক্ষ্যে তিনি লিখেছেন--'ছন্দ গড়া সহজ ভেবে/লিখতে বসে ছড়া/কাগজ কলম হাতে নিয়ে চক্ষু ছানাবড়া/কাগজ কলম দু'য়ে মিলে/লাগায় জোরে দ্বন্দ্ব/তবু তো হায় এত্তোটুকু মিললো নাকো ছন্দ/।' বিষয় বৈচিত্র্য ও ছন্দের গুণে ইকড়ি মিকড়ি শিশুদের মনভোলানো ছড়াগ্রন্থ। পা. র.

ইকবাল, আল্লামা মুহম্মদ : পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ১৮৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। স্কুলের পাঠ শেষ করে লাহোর সরকারি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৭ সালে বি. এ. ও ১৮৯৯ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ পাস করেন। অতঃপর প্রথমে লাহোর অরিয়েন্টাল কলেজে ও পরে লাহোর সরকারি কলেজে দর্শন শাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। ১৯০৫ সালে কেম্ব্রিজে যান ; জার্মানির হাইডেলবার্গেও অধ্যয়ন করেন। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। ১৯০৮ সালে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাতেই নিয়োজিত ছিলেন। ইউরোপে থাকাকালে ইকবাল পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তখন থেকেই তাঁর মন জড়বাদী দর্শনের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। নানা অসঙ্গতি সত্ত্বেও তাঁর 'রিকনস্ট্রাক্শন অব রিলিজিয়াস থট্স ইন ইসলাম' (Reconstruction of Religious thoughts in Islam) তাঁকে চিন্তাবিদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইকবালের পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে 'আস্রারে খুদী', 'পায়ামে মশ্রিক', 'জাবীদনামা', 'বানে জিব্রীল' ও 'শোকোয়া' প্রধান। ইকবাল ফারসি ও উর্দু ভাষায় কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলি প্রধানত ইংরেজি ভাষায় লিখিত। তিনি প্যান ইসলামিস্ট বা বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদী ছিলেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্যতম উদ্ভাবক ও পাকিস্তান নামের স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির সমর্থক ছিলেন, তিনি ইসলামি সাম্যে ও অর্থনীতিতে আস্থাবান ছিলেন, তা-ই মার্কসবাদ তাঁর সমর্থন পায়নি। ইকবাল শ্রেষ্ঠ ইসলামি কবি হিসেবে প্রখ্যাত। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো ফারসি ভাষায় রচিত। ১৯৩৮ সালে ২১ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ম. ই

ইকামত্ : এই আরবি শব্দটির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ানো। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় তা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্মে সালাত বা নামাযের জন্য আহ্বান করে যে আযান দিনে পাঁচবার প্রত্যেক নামাযের প্রায় পনরো মিনিট আগে দেয়া হয় সেরূপে ইকামত ঠিক ফরজ নামাজ মসজিদে বা অন্যত্র আদায় করার আগে উচ্চৈঃস্বরে দেয়া হয়। মুয়াজ্জিন ইকামত দেয়ার সাথে সাথে ইমাম সাহেবের পিছনে মুসাল্লিগণ দাঁড়িয়ে পড়েন ও নামাজের জন্য নিয়ত করেন। জামাতবদ্ধ হয়ে ইকামতে আযানের মতো আল্লাহু আকবার চারবার, আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দু'বার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ দু' বার, হাইআলাছ্ ছালাহ্ দু'বার, হাইআলাল ফালাহ্ দু'বার, কাদ্কা মাতিছ্ ছালাহ্ দু'বার আল্লাহু আকবার দু'বার এবং পরিশেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ একবার বলে

www.pathagar.com

ইকামত সম্পন্ন করা হয়। এর সাথেই ইমাম সাহেব ফরজ নামাজ শুরু করেন। ইকামতে কাদ্‌কামাতিছ্ ছালাহের অর্থ হলো সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠিত করা হলো। ইমাম সাহেব তাকবীর 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ শুরু করেন এবং মুছাল্লীগণও পিছনে নিয়ত করে দু'হাত তুলে তাকবীর বলে হাত বাঁধেন। হানাফি মাযহাব মতে, যা বাংলাদেশে প্রচলিত, আযানের পনরোটি বাক্য। কাদকা মাতিছ্ ছালাহ্ দু'বার সহ বাক্য হয় সতরোটি। তবে ইমাম শাফী মতাবলম্বী ও আহ্‌লে হাদিছ জামাত অনুযায়ী ইকামত বাক্যসহ তাঁদের বাক্য এগারোটি। কারণ তাঁরা আল্লাহু আকবার চারবারের স্থলে দু'বার এবং অন্যান্য বাক্য একবার উচ্চারণ করেন। তবে শেষের আল্লাহু আকবার এবং তার আগে কাদকা মাতিছ্ ছালাহ দু'বার বলে থাকেন। একাকী নামাজ পড়ার সময়ে ইকামত নিম্নস্বরে বলা যায়। কিন্তু জামাতে নামাযের সময়ে সবাই শোনার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ইকামত বলা প্রয়োজনীয়। - আ.সৈ.গো.দ.

ইকারুসের আকাশ : শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল : ১৯৮২ ; প্রকাশক : সব্যসাচী, ১ গোবিন্দ দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ : শামসুর রাহমানের পাণ্ডুলিপ অবলম্বনে সৈয়দ হক। মূল্য : ১০.০০ টাকা। উৎসর্গ : সৈয়দ শামসুল হক বন্ধুবরেষু। ২০টি কবিতার সংকলন। দেশীয় রাজনীতির সামষ্টিক প্রসঙ্গে প্রধানত গ্রিক ও পারস্য পুরাণের ব্যবহার রয়েছে সংকলিত অধিকাংশ কবিতায়। ইকারুস, ইলেকট্রা, আগামেমনন, ক্রাইমোথেমিস, ডেডেলাস, এন্টিগোনি প্রভৃতি গ্রিক পুরাণের চরিত্রের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছে রুস্তম, তহমিনা, আফ্রসিয়ার, সোহরাব প্রভৃতি পারস্য পুরাণের চরিত্র। 'ইলেকট্রার গান' শীর্ষক বহুবিখ্যাত কবিতাটিতে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ঘটনার ট্র্যাজেডি মূর্ত হয়ে উঠেছে--অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ বইয়ে। নিজের কবিতা বিষয়ে আত্মকথন-ধর্মী কবিতা আছে এতে। বিশ্বকবিতার কয়েকজন প্রতিভূ লোরকা, আরাগঁ, নেরুদা, নাজিম হিকমত, হাফিজ, সাদী প্রমুখের প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র এক ভাবলোকে বিচরণ ও গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস দুটি সনেটে মূর্ত হয়েছেন সত্যসন্ধ রূপে। আ. মা.

ইক্লোগ : সাধারণত ছোট কবিতা অথবা বড়ো কবিতার অংশবিশেষকে ইক্লোগ বলা হয়। ইক্লোগ বড়ো কবিতার অংশবিশেষ হলেও তার মধ্যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থের দ্যোতনা থাকে, অর্থাৎ পৃথক ব্যবহারের মধ্যেও তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা বা পূর্ণতা থাকে। Pastoral কবিতাকেও আজকাল ইক্লোগ বলা হয়। সাধারণত গ্রাম্য মেষপালকের জীবন, তাদের সুখ-দুঃখের গাথা ও কাহিনীই Pastoral কবিতার অন্তর্ভুক্ত। তবে Eclogue গ্রাম্য জীবনকে আরো বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখে। গ্রাম্য মেষপালকের সুখ-দুঃখের জীবনের কথা ছাড়াও এতে থাকে গ্রাম্য মানুষের সুখ-দুঃখভরা জীবনের টুকরো কথা ও কাহিনী। সামাজিক পত্র-পত্রিকায় বন্ধুবর্গ বা প্রিয়জনদের মৃত্যুতে যে শোকগাথা প্রকাশিত হয় সেগুলোও ইক্লোগের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা সাহিত্যে এ বিশেষ নামে চিহ্নিত কোনো কবিতা নেই। আ. ই

ইক্ষ্বাকু : হিন্দু পুরাণোক্ত সূর্যবংশীয় নরপতিদের আদি পুরুষ। হাঁচি দেওয়ার কালে বৈবস্বত মনুর নাসিকা থেকে এর উৎপত্তি। অযোধ্যায় তিনি রাজত্ব করেছেন। বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডব ইত্যাদি একশত পুত্রের জন্মদান করেছেন। তাঁর নামানুসারে এই বংশের নাম ইক্ষ্বাকু বংশ। এই বংশেই রামের জন্ম হয়। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিকুক্ষি বা কুক্ষি রাজা হন। অপর এক ইক্ষ্বাকু বারাণসীর রাজা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সুবন্ধু। ইক্ষুদণ্ড ভেদ করে জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম ইক্ষ্বাকু হয় বলে কথিত। আ. ই

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ-বিন্ বখ্‌তিয়ার খিলজী : বঙ্গদেশের প্রথম মুসলিম বিজেতা।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের গরমশির নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্বান ছিলেন এবং তাঁর দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। চাকরি লাভের আশায় ভারতে আসেন। ১১৯৭ সালে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসামউদ্দীনের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। হুসামউদ্দীন তাঁকে বর্তমান মীর্জাপুর জেলার একাংশে দুইটি ক্ষুদ্র পরগনার জায়গীর দান করেন। সেখানে বখতিয়ার একটি বৃহৎ সেনাদল গঠন করেন। ১১৯৯ (আনুমানিক) সালে অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে দক্ষিণ মগধের উদণ্ডপুর বৌদ্ধ বিহার অধিকার করেন। এই বিহারের নামানুসারে বিজয়ী সৈন্যরা মগধ রাজ্যের নাম রাখে বিহার। ১২০১ সালে মাত্র সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বখ্‌তিয়ার অতর্কিত আক্রমণ করে বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া দখল করেন। লক্ষ্মণ সেন ভয়ে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করলে বখ্‌তিয়ার বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন। অতঃপর উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের বিরাট অঞ্চল এবং লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) তাঁর অধিকারে আসে। একজন স্বাধীন সুলতানের ন্যায় বখ্‌তিয়ার বঙ্গদেশ শাসন করেন। রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। ১২০৬ সালে তাঁর বিশ্বাসঘাতক অনুচর আলী মর্দান খিলজী তাঁকে হত্যা করে। বাংলা সাহিত্যে বখ্‌তিয়ার খিলজীর নাম নানা প্রসঙ্গে এসেছে। আল মাহমুদের 'বখতিয়ারের ঘোড়া' (১৯৮৫) কবিতায় বখ্‌তিয়ার খিলজীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে। নূ. ই

ইখ্‌তিলাফ : এই আরবি শব্দটির অর্থ মতভেদ। ইসলামি ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় কোনো ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যেকার মতানৈক্যকে ইখতিলাফ বলা হয়। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা, আদর্শ ও দর্শনগত মতানৈক্য সাধারণত সমাজে হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্মে হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর সময়ে, যদিও তাঁকে সকল সাহাবাকেরাম সকল ব্যাপারে মান্য করতেন, সাহাবাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয়েছে। পরবর্তী মাযহাবের ইমাম ও তরীকার ইমামদের মধ্যেও মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ছোটখাট ইখ্‌তিলাফ বা মতভেদ হতো। মাযহাবে দেখা যায় স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন কুরআন ও হাদিসের গভীর তাৎপর্য লাভকারী ইমামদেরকে কেন্দ্র করে হানাফি, মালিকি, শাফী ও হাম্বলী মাযহাব বিস্তার লাভ করে। তবে এ সকল মাযহাবের অনুসরণকারীদের এবং কাদিরিয়া, চিশতীয়া, নক্‌শবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকার সুফিদের মধ্যে ইবাদতের বা যিকিরের বিভিন্ন বিষয়ে ছোট খাট ইখ্‌তিলাফ বা মতভেদ থাকলেও সকলে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আযানে শাফী মাযহাব ও আহ্‌লে হাদিস জামাতের অনুসারীরা প্রথম আল্লাহু আকবর চারবারের স্থলে দু'বার ঘোষণা করেন। মুজাদ্দেদিয়া তরীকার সুফিগণ উচ্চৈঃস্বরে জলি যিকিরের পরিবর্তে নীচুস্বরে খফী যিকির করা পছন্দ করেন। ইমামগণের সকলের মতে, মহানবী (দঃ) পরবর্তী সময়ে যুগের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ হেদায়তকারী। ইখতিলাভের মাধ্যমেই সত্য ও অসত্যের যাচাই হয় ও ভুলভ্রান্তি শুদ্ধ হয়। মতভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। রাসুলুল্লাহ (দঃ) উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় আলিমদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে ইখ্‌তিলাফ আল্লাহর রহমত স্বরূপ। আ.সৈ.গো.দ.

ইছামতী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শেষ উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৫ জানুয়ারি, ১৯৫০ সাল। পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে মাসিক 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত হয়। বিভূতিভূষণের দিনলিপি পাঠে জানা যায় ১৯৪৬ সালে তিনি মোল্লাহাটি এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইছামতীর পটভূমি সম্পর্কে

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। একদিকে পথের পাঁচালী রচনা, অন্যদিকে ইছামতীর পরিকল্পনা সাহিত্যের এই দুইটি বিষয়েই তখন তিনি নিবিষ্ট ছিলেন। মোল্লাহাটি গ্রাম বিভূতিভূষণের পৈতৃক নিবাস বারাকপুরের খুব নিকটে। মোল্লাহাটির নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ' রচিত হয়। ইছামতী নদীর কূলে কূলে গড়ে ওঠা জনপদ, জনজীবন এবং লোকালয়ের প্রাণস্পন্দন বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি কথাশিল্পীর শিল্পমানসও গভীরভাবে আন্দোলিত করে। ইছামতীতে লেখক চিত্রশিল্পী কোল্স্ওয়ার্দি গ্র্যান্ট এবং তাঁর রচিত Anglo Indian life in Rural Bengal–এর কথা উল্লেখ করেছেন। গ্র্যান্টের গ্রন্থে মোল্লাহাটির নীলকুঠির বিশদ বিবরণ আছে। বিভূতিভূষণ উপন্যাসের উপাদান হিসেবে এই বিবরণকে গ্রহণ করেছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেকার কাহিনী, ঘটনা ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে ইছামতী উপন্যাস রচিত হয়েছে। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্রের ভীড় লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভবানী বাঁড়ুয্যে কিংবা তার পুত্রত্রয় তিলু বিলু নীলু বিভূতিভূষণের নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা মানুষ। একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তিতে এদেরকে তিনি গড়ে তুলেছেন। গয়া মেম অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। রাজারাম দেওয়ান পরম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, কিন্তু ইংরেজের চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে ছলচাতুরী ও জোচ্চুরির একশেষ করেছে। ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির মনে যে বাণিজ্য–চেতনা জাগে নালুপাল যেন তারই প্রতীক। প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণের প্রতিনিধি নিস্তারিণী। বলা যায়, ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত ইছামতী মূক জনগণের ইতিহাস। **আ. ই**

ইজমা : অর্থ দল। দলগত ঐকমত্য। ইসলামি শরীয়তে কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে আইনগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। নবী করিম (দঃ) হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, 'আমার অনুসারীরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে কখনো ভুল করবেনা।" ইজমা ধর্ম বিশেষজ্ঞ উলামা মাশায়েখদের ঐকমত্য সংখ্যাগরিষ্টের রায় দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবে গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে যেখানে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়না সেখানে ইজমা দ্বারা ঐকমত্য গ্রহণ করা হয় যা ফিকাহ্ শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত। যে সকল ফকীহ ও আলিম ইজ্মা দ্বারা সম্মিলিত চূড়ান্ত গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেন তাঁদের আহ্লুল্ ইজ্মা বলা হয়। ইজ্মা বা ঐকমত্য গ্রহণ কালে অবশ্য মতবিরোধ দেখা দেয়। কারণ ব্যক্তিগত আদর্শ, দর্শন, রাজনৈতিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক অভিরুচি, গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। ফলে ইজমা গ্রহণকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতবাদকেই প্রাধান্য দেয়া হয় যা শরীয়ত সম্মত ও গ্রহণীয়। ইসলামে আউলিয়াকেরামের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এবং নবীগণের মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়ার বিধান কুরআন বা সুন্নাহতে পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত নেই, তবে এ দু'টি ইজ্মা মতে উলামা মাশায়েখগণ অনুমোদন করেছেন। সুন্নী মতে, ইজমা পছন্দনীয় এবং বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে শিয়া মতে, ল্যাটিন "ভক্স পপুলি ভক্স ডেই"। অর্থাৎ "জনগণের কণ্ঠস্বর আল্লাহর কণ্ঠস্বর", সংখ্যাগরিষ্ঠের বাণীর ও মতের গ্রহণীয় নীতির প্রতি সমর্থন দেয়। মহানবী (দ:)–র সাহাবীগণও বহু পরিস্থিতিতে ও ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইজ্মা নীতি অনুসরণ করেছেন। **আ. সৈ. গো. দ.**

ইঞ্জিল : সাধারণভাবে খ্রিস্টান শাস্ত্রগ্রন্থ নিউটেস্টামেন্টকে আরবি ভাষায় ইঞ্জিল বলে। কুরআন শরীফে ইঞ্জিল শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় বারো (Twelve) বার এবং যীশু বা ঈশা কর্তৃক প্রচারিত ঐশবাণী বুঝাতেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। ইঞ্জিল শব্দটি মোহাম্মদের (সঃ) সমকালীন খ্রিস্টীয় সাধকগণ কর্তৃক

www.pathagar.com

রক্ষিত ও পঠিত শাস্ত্র গ্রন্থকেও বুঝায়। বিশেষত মথি, মার্ক, লুক ও যোহন রচিত মঙ্গল-সমাচার চতুষ্টয়কেই ইঞ্জিল মনে করা হয়। আধুনিক-কালে বাইবেলের গোটা নববিধান (New Testament) -কেই ইঞ্জিল বলে চিহ্নিত করা হয়। যে মঙ্গল সমাচারগুলোর কথা উল্লেখ করা হল সেগুলোতে যীশুর জন্ম ও নিভৃত জীবন, প্রকাশ জীবনের অদ্ভুত কার্যাবলী, ঐশশক্তি প্রকাশ, উপদেশমালা, খ্রিস্টমণ্ডলী স্থাপন, মৃত্যু পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে মথিলিখিত সমাচার, ইহুদীদের জন্য লেখা ও উপদেশমূলক; মার্কের সমাচার প্রাচীনতম, বর্ণনাত্মক ও সংক্ষিপ্ত লুকের সমাচার যীশুর দয়ার কথা, গ্রিকদের জন্য রচিত আর যোহনের সমাচার হচ্ছে সময়ের আধ্যাত্মিক ও পরবর্তীকালে রচিত। **সু. মু.**

ইডিয়ম : বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হলে ঐ শব্দসমূহকে বাগ্‌ধারা বা ইডিয়ম (idiom)বলা হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি পদ ইডিয়ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—(ক) বিশেষ্য পদের ইডিয়ম হিসেবে ব্যবহার--**হাতটানের** অভ্যাস ত্যাগ কর (চুরি করা)। **ডানহাতের ব্যাপারটা** সেরে নাও (ভোজন)। **রাগের মাথায়** কাজটা করা ভাল হয়নি **(ক্রোধবশত)। গায়ে হাত তুলো** না (প্রহার করা)। (খ) বিশেষণ পদের ইডিয়ম হিসেবে ব্যবহার—**কাঁচা চুল** পাকা হয় (কালো চুল)। পাকা রাঁধুনি। (দক্ষ)। (গ) ক্রিয়াপদের ইডিয়ম হিসেবে ব্যবহার—তিনি একজন **নাম করা** লোক (প্রসিদ্ধ)। **ডানা কাটা** (পরমা সুন্দরী)। (ঘ) বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশের রীতিসিদ্ধ (idiomatic) প্রয়োগ—কান-পাতলা (অন্যের কথা শোনা); ইঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ব) ইত্যাদি। (ঙ) বিশেষ্যস্থানীয় বাক্যাংশের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ—কাঠের পুতুল (জড় পদার্থ); গভীরজলের মাছ (সুচতুর) ইত্যাদি। (চ) ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ— তোমার পাওনা **কড়ায়-গণ্ডায়** মিটিয়ে দেব (সম্পূর্ণ-ভাবে) সব **নয় ছয়** করে ফেললে কেন (বিশৃঙ্খলা)। **শি. প্র. লা.**

ইড়া : প্রজা সৃষ্টির জন্য হিন্দু পুরাণোক্ত বৈবস্বত মনু একদা এক পাকযন্ত্র তৈরি করে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই উপলক্ষে তিনি ঘি, মাখন ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ করলে সেই জল থেকে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মিত্র-বরুণ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি মনু-দুহিতা। মিত্র-বরুণ তখন তাঁকে বলেন, তুমি আমার। ইড়া তখন কোনো উত্তর না দিয়ে মনুর কাছে গিয়ে বলেন, আমি আপনার কন্যা। আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুন। মনু তখন ইড়ার মাধ্যমে কঠোর যজ্ঞ করেন। উপরোক্ত তথ্য শতপথ ব্রাহ্মণে ব্যক্ত হয়েছে। **আ. ই**

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না : তন্ত্র অনুসারে মেরুদণ্ডের বাঁ দিকের একটি নাড়িকে 'ইড়া' বলা হয়। মেরুদণ্ডের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নাড়িকে 'পিঙ্গলা' এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থিত অপর একটি সূক্ষ্ম নাড়ির নাম 'সুষুম্না'। এই তিনটি নাড়ির মিলনকে 'ত্রিবেণী' বলে। তন্ত্র সাধনায় এসব নাড়ি চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির গুণবিশিষ্ট। তন্ত্রসাধকদের কাছে ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী স্বরূপ। **সু. মু.**

ইতল বিতল : কবি সুফিয়া কামাল রচিত শিশুতোষ ছড়ার বই। প্রকাশকাল নেই। কবির জবানীতে জানা যায় ১৯৬৫ সালে সৈয়দ মোহাম্মদ শফি, ফিরিংগী বাজার রোড, চট্টগ্রাম থেকে বইটি প্রকাশ করেছেন। শিল্পী হাশেম খান প্রচ্ছদ এঁকেছেন। ২২ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ছিল এক টাকা। উৎসর্গ করা হয়েছে 'সব খোকা-খুকুদের'। শিশুসাহিত্যিক এখলাসউদ্দিন আহমদের সবিশেষ অনুরোধে কবি একরাতেই লিখেছেন 'ইতল বিতল'-এর ২৪টি ছড়া। কবি প্রথমে ভেবেছিলেন বইয়ের

www.pathagar.com

নাম দেবেন 'সোনা নয়, রূপা নয়'। পরে স্বামী কামালউদ্দিন খানের মতানুসারে নাম রেখেছেন 'ইতল বিতল'। মিষ্টি-মধুর ছড়াগুলোর সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি শিশুমনে সহজেই দাগ কাটে। মা. বে.

ইতালির জনক গ্যারিবল্ডী : মাশিয়া ড্যাভেন পোর্ট। এই বইটি ইতালির জনক জুসেপী গ্যারিবল্ডীর জীবন কাহিনী ও সেই সঙ্গে ইতালিকে সার্বভৌম একটি দেশ হিসেবে গঠন করার কাহিনী। আজও ইতালিকে একটি নাম তাদের এক মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ করে দেয় একই আবেগে, একই শ্রদ্ধায় ও গৌরববোধে--সে নাম গ্যারিবল্ডী। আর ইতালির যে কোনো গৌরবময় অধ্যায় যেন গ্যারিবল্ডীর আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্তরূপ। বইটি অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ নাসির আলী। প্রকাশক মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ১১০০। দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮০, পৃষ্ঠা ১৪৪, মূল্য ১৩.০০ টাকা। বি.ব.

ইতি : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত গণিকার জীবনকথা-অবলম্বিত ছোট গল্প। লেখকের 'ইতি' (১৩৩৮ সন) গল্পসংকলনের শেষ গল্প। গল্পটি এক বারবণিতার জীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের মর্মান্তিক ছবি। গ্রামে থিয়েটার করার জন্য সরলাকে আনা হয়েছে। কিন্তু সে কোনোদিন নাটকে অভিনয় করেনি। তবে কথায় সে পটু। প্রথম দিনেই তার কথাবার্তায় দক্ষতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। রমেশবাবু মনে মনে বলেন, মেয়েটি দেখতে ভীতু, কিন্তু কথায় একেবারে জিলিপি। সরলার অভিনয়ের অংশটুকু হচ্ছে জালন্ধরের রাজার একমাত্র কন্যা রাজকুমারী মালতী-মালার অভিনয়। হিরণকুমারের সঙ্গে মালতীর প্রেম। মালকানানগরের রাজপুত্রীর সঙ্গে হিরণকুমারের প্রেম হয়েছে মনে করে মালতীর ক্রূর সন্দেহ এবং আহত অভিমান। সব দৃশ্যেই সরলা টেক্কা মেরেছে। কিন্তু শেষ সিনটিতে এসে সে বড়ো ভাবব্যাকুল হয়ে পড়ে। এই সিনটিতে মালতী হিরণকুমারকে হত্যা করার জন্য হাতে বিষাক্ত ছুরিকা নিয়ে প্রবেশ করবে। চোখে জ্বলবে তার দীপ্তি, অধরে কুটিল হিংসা, ক্রোধে সমস্ত দেহ যেন একটি লালায়িত বহ্নিশিখা। কিন্তু সরলা কিছুতেই মুখে-চোখে সেই দৃপ্ত ভাব আনতে পারে না। মুখখানি তার সুকোমল ও সুকুমারই থেকে যায়। পরের বারে ঘুমন্ত হিরণকুমারের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে যাবে মালতী, কিন্তু দেখবে হিরণকুমার তার আগেই বিষ খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তারপর মালতীর অনুশোচনা ও অন্তর্জ্বালা। হিরণকুমাররূপী নিমাইয়ের মাথাটা কোলের কাছে টেনে সরলা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে। নিমাইয়ের চোখও ভিজে উঠেছে। কেবল তার দিদির কথা মনে পড়ে, যিনি অসুখের সময় তাকে প্রাণপণ সেবা করেছিলেন। এবার সরলার কান্না ও কাকুতিতে সবাই মুগ্ধ হয়। বাস্তবতার মর্মান্তিক যাতনায় সরলা তার অভিনয়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য উচ্চতর ভাবানুভূতির আস্বাদ পেয়ে ধন্য হয়। আ. ন. ম. ব. র.

ইতিকথার পরের কথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৫৯ সন। বারতলা গ্রামের জমিদার জগদীশের পুত্র শুভময় বৈজ্ঞানিক। দেশ-বিদেশে বিজ্ঞানের বিচিত্র জ্ঞান সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজের দেশে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে নানা সমস্যার সমাধান করবে, এই খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সে বিলেত যাত্রা করে। দেশে ফিরে শুভ তার এককালের সহপাঠী গ্রাম্য ডাক্তার নন্দের পরামর্শমত তার 'নব শিল্পমন্দির'কে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। দেশে তখন শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছে। নিরীহ কৃষকগণ জোতদারদের ধান লুঠ করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়। শোষিত মানুষ তাদের অবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তনে দৃঢ় সঙ্কল্প। শুভ জমিদারের ছেলে, কিন্তু সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। গজেনের বালবিধবা লক্ষ্মীর কথাবার্তা শুনে সে অবাক হয়। লক্ষ্মী কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। গ্রাম্য কৃষকদের

www.pathagar.com

উন্নতিকল্পেও সে নানা কথা ভাবে। সেজন্য শোষক জমিদার পিতার মতবাদের বিরোধিতা করে সে। কিন্তু শুভ বুঝতে পারে আপ্রাণ চেষ্টা এবং আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও সে যেহেতু জমিদার জগদীশের ছেলে, সেজন্য তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা জমাতে পারে না। একাহিনীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র কৈলাশ। শোভিয়েত আর চীনের ভাবধারায় সে উদ্দীপ্ত। লক্ষ্মী আর সে কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। ভূদেবের কন্যা মায়ার সঙ্গে শুভর মিলনের ইঙ্গিতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ম. চৌ.

ইতিবৃত্ত : মূল হিরোডোটাস। ইংরেজি অনুবাদ আউব্রে দ্য সেলিনকোর্ট। বাংলায় অনুবাদ করেছেন শাহেদ আলী। বৃহৎ এই গ্রন্থটির প্রকাশক বাংলা একাডেমী। প্রকাশকাল জুন ১৯৯৪। পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস লেখক হিরোডোটাসের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় তিনি এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, ক্যারিয়ার ডরিয়ান শহর হ্যালিকার্নাসাসে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বেচ্ছাচারী Lygdamus কর্তৃক হিরোডোটাস তাঁর জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। ঘুরে বেড়ানোর নেশা ছিল তাঁর রক্তে। যৌবনে ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন তিনি। শেষ জীবনে দক্ষিণ ইতালির থুরীঈতে গমন করেন--এবং সম্ভবত সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। হিরোডোটাসের কালজয়ী গ্রন্থ The Histories. এটি মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম লিখিত ইতিহাস। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪২৫ সালের দিকে। হিরোডোটাস দুটি পারসিক যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যার একটি ঘটেছিল তাঁর জন্মের সমকালে (আনুমানিক ৪৮৪ খ্রি. পূ.), আর দ্বিতীয়টি তাঁর বাল্যকালে। এসব গ্রিক-পারসিক সংগ্রাম তাঁর ইতিহাসের উপজীব্য। তাঁর পূর্বসূরি মিলেটারাসী হিকাটিউসের রচনাবলি, নানা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং প্রায় জীবনব্যাপী দেশভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা—এই তিনটি ছিল তাঁর The Histories রচনার মুখ্য উপাদান। এছাড়া তৎকালে প্রাপ্ত শিলালিপির সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ইতিবৃত্তের গোড়াতেই হিরোডোটাস বলেছেন : 'আমি আমার অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি, যেন মানুষের কর্মকাণ্ড, তার সাফল্য ও কীর্তিগুলোর স্মৃতি কীর্তিত না হয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হয়। সে সাফল্য গ্রিকদেরই হোক অথবা বিদেশীদেরই হোক।' তাই তিনি বিভিন্ন দেশের মানুষের সামাজিক বৈচিত্র্য, রীতিনীতি, সংস্কার, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব, ধর্মবোধ, যুদ্ধ-বিগ্রহ সাফল্য-ব্যর্থতার চমকপ্রদ কাহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর 'ইতি-বৃত্তে'। হিরোডোটাসের ইতিবৃত্তে'র ভূগোল হারকিউলিসের স্তম্ভ থেকে পারস্য পর্যন্ত প্রসারিত। ইতিহাসের জনক হিরোডোটাসের 'ইতিবৃত্তে'র বিষয়বস্তু শুধু মানুষের রাজ-নৈতিক প্রচেষ্টার বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এতে আছে তাঁর জীবনের সামগ্রিক রূপ। আধুনিক ইতিহাস তত্ত্বের প্রায় সবগুলো বৈশিষ্ট্য তাঁর 'ইতিবৃত্তে' বর্তমান। আজকের পৃথিবীর মানুষ ইতিহাস মানেই রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার হিসেবনিকেশ—একথা অস্বীকার করছে। হিরোডোটাসের মধ্যেও এ ধরনের সংকীর্ণতা ছিল না। তাঁর 'ইতিবৃত্ত' রচনার পেছনে কাজ করেছে একটা সংস্কারোত্তীর্ণ বিশ্বনাগরিক বোধ। মূল গ্রন্থ শুরুর আগে 'বাংলা অনুবাদকের কথা', 'ইংরেজি অনুবাদকের ভূমিকা' ও অনুবাদকের লেখা 'হিরোডোটাস ইতিহাসের জনক' অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। সা. আ.

ইতিহাস : ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক-শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ। বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের মুখপত্র। শ্রী নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ কর্তৃক বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের পক্ষে ২ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর সেন কর্তৃক ইন্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন

www.pathagar.com

স্কোয়ার, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা, বার্ষিক পাঁচ টাকা। ব্যবস্থাপক--শ্রী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এ মুখার্জী এন্ড কোং লিঃ, কলকাতা- ১২। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার সূচিপত্র : ঐতিহাসিক চিত্রের 'সূচনা-শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-১৯৫, গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি-শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী-১৯৮, ইতিহাস ও গণবিজ্ঞান-শ্রীরমা-প্রসাদ দাশগুপ্ত-২১৯, দুইটি ঐতিহাসিক চিন্তাধারা-শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী-২২৭, স্বাধীন কাছাড় রাজ্যের শেষ অধ্যায় ও তৎকালীন জীবন-শ্রীদেবব্রত দত্ত-২৩৭, বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস-শ্রীসুকুমার সেন, ললিতকলা বিষয়ক পরিভাষা-শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত-২৫৩, স্যার উইলিয়াম ফস্টার-শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ২৫৭। সাইজ-৬˝ x ৯˝। সা. আ.

ইতিহাস আমাদের দিকে : সন্তোষ গুপ্ত রচিত প্রবন্ধের বই। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিপ্লব ও শঠতার নামে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ও মূল্যবোধসমূহকে কিভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিতর্কিত করে তুলেছে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ মূলত সেই বিষয়ের ওপর লেখা। এ ছাড়া অতীত এবং সমকালীন কতিপয় ঘটনা নিয়েও একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা' এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আজকাল অনেকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এরা একদিকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি তাদের পশ্চাতে এসে দাঁড়ান। যেমন—'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মুক্তি-যুদ্ধের চেতনার সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নয়। জামাত নেতা গোলাম আযম ১৯৭১ সালে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'মুসলমান কখনো বাঙ্গালী হাতে পারেন না।' বাংলাদেশী হতে আপত্তি নেই।... অবশ্য জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত তারা গ্রহণ করে নি। জামাত পরিচালিত কোনো কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। এই একই প্রবন্ধের শেষে লেখক স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি নয়, উপরন্তু তার ভাবাদর্শ থেকেও মুক্তি অর্জন ছিল মূল লক্ষ্য। পাকিস্তানি ভাবাদর্শের সঙ্গে রাজনীতিতে কিংবা চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে আপোষ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করা যায় না। 'ইতিহাস আমাদের দিকে' প্রকাশক ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রকাশকাল : ১৯৯৭। প্রচ্ছদ অঙ্কনে আনোয়ার ফারুক। মূল্য : ১৬০.০০। মা. আ.

ইতিহাসমালা : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরীর নামে প্রচলিত একটি গ্রন্থ। প্রকাশকাল : ১৯৮২ সাল। এটি আসলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সূত্র হতে সংকলিত প্রায় দেড়শত গল্পের সংগ্রহ। কেরী এই গ্রন্থের সম্পাদক ও সংকলক মাত্র। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থ-গুলির মধ্যে ইতিহাসমালা রচনাভঙ্গির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। এতে সাধুভাষায় লেখা ১৫টি দেশি বিদেশি গল্প আছে। গল্পগুলো ব্যঙ্গাত্মক। আ. জ.

ইতিহাসে বাঙালি--রমাপ্রসাদ চন্দ : ঐতিহাসিক গ্রন্থ। প্রকাশনা : কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১, প্রচ্ছদ : অনুল্লেখ, মূল্য : পনেরো রুপি। গ্রন্থকার রমাপ্রসাদ চন্দ জীবনের শুরুতে নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব এবং প্রাচীন বাংলার ইতিহাস তথা প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন, মূর্তি ও প্রাচীন ধ্বংসস্তুপের বিবরণ সংগ্রহ ও গবেষণায় মনোযোগী হন। 'ইতিহাসে বাঙালি' গ্রন্থটিতে বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এটি তাঁর বাঙালির ইতিহাস গবেষণার প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলো বহুপূর্ব, প্রবাসী, মানসী, মর্মবাণী

www.pathagar.com

ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাগুলো প্রকাশিত হলে বাঙালির পুরনো ও প্রচলিত অনেক তথ্যের অসারতা এবং অনৈতিহাসিকতা ধরা পড়ে। বাঙালির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলো সহায়ক ও অবশ্যই মৌলিক। গ্রন্থটিতে রয়েছে বারোট অধ্যায়। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম : ইতিহাস, বাঙ্গালির ইতিহাসের উপাদান, বাঙ্গালির উৎপত্তি, বাংলার প্রাচীন ইতিহাস, বাঙ্গলার সভতার প্রাচীনতা এবং বাঙ্গালির উৎপত্তি, বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালির ইতিহাস, শশাঙ্কের কলঙ্ক ও রাজ্যবর্ধন হত্যা, আদিশুর, ক্ষত্রপকর্নসেন কামরূপ রাজ্যমালা, বিক্রমপুর—একাল ও সেকাল ও দুর্গোৎসব। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটির গ্রন্থকারের গবেষণা ও তার মানের নানা তথ্য উল্লেখ করে একটি সুচিন্তিত মুখবন্ধ লিখেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। গ্রন্থটি পাঠক সমাদৃত হয়েছে। **খা. বি. জ. উ.**

ইতিহাসের রক্ত পলাশ পনেরই আগস্ট : আবদুল গাফফার চৌধুরী। স্মৃতিচারণামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। প্রকাশক : বঙ্গবন্ধু শিল্প-গোষ্ঠী, ৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা ১১০০। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। প্রচ্ছদপট ও বঙ্গবন্ধুর স্কেচ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : একশ টাকা। 'ইতিহাসের রক্ত পলাশ পনেরই আগস্ট' একটি স্মৃতিচারণমূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার পর লন্ডন থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত 'বাংলার ডাকে' প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তখন এই রচনাটির শিরোনাম ছিল 'মুজিব হত্যার নেপথ্যে।' রচনাটি সে সময়ে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। দীর্ঘদিন পর এটি নতুন শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির চুয়াল্লিশ অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কাহিনী, বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের আগে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ৭১-র পরবর্তী অনেক ঘটনা এই স্মৃতিচারণ-মূলক রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতেই লেখক বলেছেন : ...এইসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমার নিজস্ব ডায়েরির তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে এই স্মৃতিচারণা।' দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও লেখনী শক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণে পাঠককে তিনি সহজেই বন্দী করে ফেলেন। গ্রন্থটি অন্য অর্থে ঐতিহাসিক দলিল। তিনি লিখেছেন : 'নেতৃত্বে যেমন ভাসানী, সাংবাদিকতায় মানিক মিয়া, সংগঠনের ক্ষেত্রে তেমনি এগিয়ে এলেন শেখ মুজিব। কৃষিজীবী বাঙালি মুসলমানদের মধ্য থেকে যে নব্যশিক্ষিত যুব সমাজ গড়ে উঠেছিল, শেখ মুজিব ছিলেন তার প্রতিনিধি। তাঁর রাজনীতির ভাষা পরিশীলিত নয় ; তাতে তাত্ত্বিকতা নেই। আছে সারল্য, দৃঢ়তা ও মিলিট্যান্সি। আওয়ামী লীগের ভাসানী, মুজিব, মানিক মিয়ার মাধ্যমে গ্রাম বাংলার এই নবজাগরণকে তাই ইংরেজিতে বলা হয়েছে— 'রাইজ অব রুরাল বেঙ্গল'।' চুয়াল্লিশ অধ্যায়ে তিনি মুজিব হত্যা প্রসঙ্গে কিছুটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু অমর কীর্তি স্বাধীন বাংলাদেশ এবং তাঁর হত্যার পেছনে স্বাধীনতা বিরোধী ও বিদেশীদের ষড়যন্ত্রের কথা পৌঁছে দিয়ে গ্রন্থকার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। **খা. বি. জ. উ.**

ইতিহাসের রূপরেখা : আবদুল হালিম রচিত মানবসমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ। প্রকাশক : প্রকাশ ভবন, ৫ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৭৩। প্রচ্ছদ : আব্দুল মুকতাদির। মূল্য : নয় টাকা। এই গ্রন্থটিতে 'সংগ্রহ অর্থনীতির' যুগ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সোজা কথায় লেখক 'মানব সমাজের ক্রমবিকাশে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন কিভাবে মানুষের চিন্তাধারায় বিবর্তন ও বিপ্লব এনেছে, সমাজের অবকাঠামো যে উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, এর ওপর আলোকপাত করেছেন।' এটি একটি সমাদৃত গ্রন্থ। দুইশত চার পৃষ্ঠার

www.pathagar.com

এই গ্রন্থটিতে রয়েছে পাঁচটি অধ্যায়। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা অধ্যায়টিতে রয়েছে পুরোগলীয় ও নবোগলীয় যুগের কথা। দাসপ্রথা অধ্যায়ে রয়েছে ব্রোঞ্জযুগ, লৌহযুগ ও গ্রিক সভ্যতার কথা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অধ্যায়ে রয়েছে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্ষয়ের কথা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধ্যায়ে বণিক ধনতন্ত্র, পালিত ধনিতন্ত্র ও সাম্যবাদী যুগের কথা বলা হয়েছে। শেষ অধ্যায়টিতে রয়েছে সমাজতন্ত্র। এই অধ্যায়ে পুঁজিবাদের ক্ষয় ও সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বইটির শুরু রয়েছে কিছু দুর্লভ চিত্র ও সন্তোষগুপ্তের লেখা ভূমিকা দিয়ে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই শোভিত। **খা. বি. জ. উ.**

ইত্তেফাক : 'দৈনিক ইত্তেফাক' প্রথমে সাপ্তাহিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৯ সালের শেষভাগে। তখন এটি ছিল মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মুখপত্র এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানী ছিলেন সম্পাদক। সে সময় পত্রিকাটির মাস্টার হেডের নিচে লেখা থাকতো 'প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী'। তখন এটি ইয়ার মোহাম্মদ খান কর্তৃক বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। পরে আবু জাফর শামসুদ্দীন পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় পত্রিকাটির ব্যয় নির্বাহ করা ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠে। এ আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্যে দলীয় কর্মীরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকাটি বিক্রি করেন এবং চাঁদা ওঠান। এরপরও আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত হতে পারে রি। এই অবস্থায় ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট মওলানা ভাসানীর নিকট থেকে তফাজ্জল হোসেন পত্রিকাটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপন কাঁধে তুলে নেন এবং নিজে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। অতপর তফাজ্জল হোসেনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ১৯৫৩ সালে ২৪ ডিসেম্বর 'ইত্তেফাক' নবরূপে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালের ৩১ মে ১ম বর্ষ ১৫৮ সংখ্যায় এই পত্রিকার প্রধান সংবাদ শিরোনাম ছিল : "যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া পূর্ব বঙ্গে ৯২-ক ধারা জারী... ।" প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়, 'অদ্যকার সম্পাদকীয় প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।' এদিন মাত্র দুই পৃষ্ঠার এই কাগজের দাম ছিল এক আনা। উল্লেখ্য 'দৈনিক ইত্তেফাক' প্রকাশের পরও সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' চালু ছিল। ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলার ওপর ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করলে প্রথমবার 'ইত্তেফাক'-এর প্রকাশনা কিছু দিনের জন্যে বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার ও নিউ নেশান প্রেস (ইত্তেফাকের নিজস্ব প্রেস) বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে স্বাভাবিক কারণে 'ইত্তেফাক' প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। একটানা দুই বৎসর সাতমাস বন্ধ থাকার পর প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের কাছে নতি স্বীকার করে পাক সরকার নিউ নেশান প্রেস মুক্ত করে দিলে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর পুনঃপ্রকাশ শুরু হয়। প্রথম দিকে পত্রিকাটি নানাভাবে পাকিস্তান সরকারের রোষাণলের শিকার হলেও পত্রিকাটির নির্ভীক ভূমিকার জন্যে তৎকালীন পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষ করে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাঙালি জাতিয়তাবাদী চেতনা বিকাশে 'দৈনিক ইত্তেফাক' অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে। পত্রিকাটি ব্যাপকভাবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে তফাজ্জল হোসেনের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও অবদান ছিল অপরিসীম। সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তফাজ্জল হোসেন নিজে মোসাফির ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' (প্রথম নাম ছিল 'রাজনৈতিক ধোকাবাজী') নামক একটি কলাম লিখতেন। কলামটি দ্রুত অতীব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শুধু তা নয়, 'ইত্তেফাক'-

www.pathagar.com

এর কাটতি বৃদ্ধিরও অন্যতম আকর্ষক মাধ্যমে পরিণত হয়। ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালের মতে, 'শুধু একটি কলাম লিখে স্মরণ কালের মধ্যে কোনো সাংবাদিক এমন অবিস্মরণীয় ভাবমূর্তি তৈরি করতে পেরেছেন বলে মনে পড়ে না। উক্ত কলাম সম্পর্কে কথা শিল্পী আবুল ফজল লিখেছেন; অমন খাজু স্বচ্ছ সহজবোধ্য, তীক্ষ্ণ ও সরস গদ্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় খুব কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে বিদ্রুপের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ তাঁর কলমের মুখে যেভাবে ঝলসে উঠতো, তা সত্যই বিস্ময়কর। 'রাজনৈতিক মঞ্চ" কেউ শুধু মাত্র একবার পড়ে তৃপ্তি পেত না, বারবার পড়ে উপভোগ করতো।" তফাজ্জল হোসেনের মৃত্যুর পর 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক হন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও নির্বাহী সম্পাদক হন সিরাজুদ্দীন হোসেন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাত্রে পাক হানাদার বাহিনী 'দৈনিক ইত্তেফাক' কার্যালয় ধ্বংস করে দেয়। ফলে ২৬ মার্চ থেকে ২০ মে পর্যন্ত পত্রিকাটি বন্ধ থাকে। পুনরায় ২১ মে থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। আবার ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর বন্ধ থাকার পর ১৮ ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করে। বর্তমানে মইনুল হোসেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সম্পাদকমণ্ডলির সভাপতি ও রাহাত খান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। মা. আ.

ইত্তেহাদ : আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৩ মাঘ, ১৩৫৩—১৭ জানুয়ারি ১৯৪৭ সাল শুক্রবার। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬, মূল্য ৬ পয়সা। ১৯৯ কলকাতা পার্ক স্ট্রিটস্থ ইত্তেহাদ প্রেস থেকে সৈয়দ হাসান আলী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ ছিলো এমন : ক. ইন্দোচীনে ফরাসির বেপরোয়া আক্রমণ, খ. বর্ম্মার শাসন সংস্কার সম্পর্কে লন্ডনে আলোচনার গতি অব্যাহত, গ. আবার কলকাতায় ট্রাম ধর্মঘটের আশঙ্কা ইত্যাদি। মা. আ.

ইদানীং আমরা : আহমদ শরীফ রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৯৩ সনের ২৫ বৈশাখ। গ্রন্থটির প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ শিল্পী : আবুল বারক আলভী এবং মূল্য : সাদা : ৪৫.০০ টাকা ও লেখক কাগজ ৩৪.০০ টাকা। এই গ্রন্থটি অসংখ্য ছোট ছোট প্রবন্ধের সমন্বয়ে রচিত। বিষয় : শিক্ষা, সমাজ এবং রাজনীতি। বাংলা সাহিত্যের তিন দিক্‌পাল মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু নতুন জিজ্ঞাসার অবতারণা আছে। আর শেষ ভাগে আছে 'মনের বনে' নামে নিজস্ব অনুভব-উপলব্ধির কিছু অভিব্যক্তি। প্রবন্ধ-গ্রন্থটির বিষয় বিন্যাস যথাক্রমে : 'বিদ্যাদানের ও গ্রহণের রূপান্তর ধারা' 'বিদ্যার ক্রমবিকাশ ও নারীশিক্ষা', 'শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের সঙ্কট', 'আজকের শিক্ষা ভাবনা', 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি', 'বাংলাদেশ অনুন্নত কেন? উন্নতির উপায় কি?' 'কালের দাবি ও রাজনীতি', 'উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতিক ও গণমানব', 'দেশ ও রাজনীতি', 'আজকের বাঙলার রাজনীতি', 'ইদানীং সংবাদে বিম্বিত বাঙলাদেশ', 'নেতৃত্ব-সঙ্কট', 'তেমন মানুষ চাই', 'গণনেতার প্রতীক্ষায়', 'বুর্জোয়া সমাজে বুদ্ধিজীবী', 'সেকাল ও একাল', 'সেই পুরোনো কথাটি', 'প্রবৃত্তিবশ্যতা ও শ্রেয়োচেতনা', 'একাশির একুশের ভাবানা', 'জুলুম প্রতিরোধের একুশে', 'একুশের ঐতিহ্য', 'মধুসূদন ও আধুনিকতা', 'রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ', ১৩৯০ সালে আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন', 'কালান্তরে শরৎ-বীক্ষা', 'কালিক প্রত্যয়ের আলোকে শরৎচন্দ্র', শরৎচন্দ্রের পথের দাবি' এবং 'মনের বনে'। এই গ্রন্থে আহমদ শরীফের তীক্ষ্ণ পর্যালোচনা এবং তীব্র উপলব্ধি বিষয়কে প্রগাঢ় করেছে। ফলে প্রবন্ধগুলো ঋদ্ধ এবং দার্ঢ্য। সৈ. আ. জা.

ইঁদুর : সোমেন চন্দ্র রচিত একটি অসাধারণ গল্প। জীবনের পরতে পরতে যে বাস্তবের

www.pathagar.com

অনুশীলন প্রতিনিয়ত আমরা চর্চা করে চলেছি, আমাদের শাণিত বোধ যেখানে আটপৌরে সমাজ ব্যবস্থার কাছে আনত-বিপ্লব—একটি ইঁদুরের সংগ্রাম সেই মানুষের বিরুদ্ধে। আমাদের মস্তিষ্কের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটায় ইঁদুরের দিনরাত কুট কুট কাটা। পরিশ্রমী ইঁদুর জীবনের তাগিদে পথ করে নেয়—মানুষের ক্ষতির মাধ্যমে, জাগতিক ধ্বংসের মাধ্যমে। সে ধ্বংসের তীব্রতা দারিদ্র্যে আনে দীনতা—মানুষের সংগ্রামের কাছে সে দীনতার হয় অনিবার্য পরাজয়। 'সমস্ত বাড়ী খুশীর বাজনায় মুখরিত হয়' কিংবা 'দুনিয়ার সবাই একজোট হয়'—এরকম উচ্চারণ সকল সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে দারিদ্র্যের দেয়াল টপকে মহান কমরেডের অবস্থান এনে দেয়। এনে দেয় বিজয়ের গৌরব—একটি সামান্য বাসা এক অসামান্য হাসিতে ভেসে যায়। জীবনের নিরন্তর পরিবর্তনের সবটুকু অধ্যায় তুলে ধরতে একটি ছোট গল্পের কতটুকু অবকাশ থাকে- ! নিয়মের অজস্র ধারাবাহিকতায় জীবনের যে খণ্ডচিত্র একটি সমগ্র বোধকে জাগ্রত করে চিন্তার অবকাশকে হাতের মুঠোয় এনে দেয়—ইঁদুর গল্প তাই। জীবন দর্শনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এর কোনো জুড়ি নেই। **কা. রো.**

ইদ্দত : ইসলামি বিধান বিশেষ, যা বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের পুনর্বার বিয়ে করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি সে নারী গর্ভধারণ করে থাকেন তবে ইদ্দতের মাধ্যমে আগত সন্তানের পিতৃত্ব নিরূপণ করা হয়। অপরদিকে ইদ্দত পালন করা হয় এ জন্য যে, যদি তিনবার তালাক স্বামী কর্তৃক উচ্চারিত না হয়ে থাকে তবে প্রথানুযায়ী আবার স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে। এরূপ ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল তালাকের ক্ষেত্রে তিন মাস বা তিন ঋতুকাল। যদি বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী গর্ভবতী থাকে তবে তাঁর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ইদ্দত পালন করতে হয়। যদি স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভে সন্তান না থাকে তাহলে ইদ্দত চার মাস দশ দিন হয়। তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী ইদ্দতকালে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা যতটুকু প্রয়োজন তা স্ত্রীর জন্য বন্দোবস্ত করতে নৈতিকভাবে দায়ী। এ সব ব্যাপারে আইনগত দিক বজায় রাখার জন্য আলোচনা সাপেক্ষে উভয় পরিবার পর্যায়ে শালিসে ঐকমত্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। **আ. সৈ. গো. দ.**

ইনু মামার কমলা লেবু : হোসেন মীর মোশাররফ। প্রকাশনা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৮, অঙ্গসজ্জা : মাহবুবুল আমীন, মূল্য : তের টাকা। বইটিতে রয়েছে দশটি গল্প। গল্পগুলোর শিরোনাম হলো : ইনুমামার কমলালেবু, উপহার, রাত্তা, ঝিনুক ও গিরিবাজ পায়রা, সুজনের কবুতর, নালী, আতাগাছে তোতাপাখি, পয়মন্ত, লালু ও ভুলুর গল্প। নামের মধ্যে গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। বিষয়-বৈচিত্র্যে প্রতিটি গল্প উজ্জ্বল। শিশুদের উপযোগী এইসব গল্প ওদের নিয়ে যায় পরিচিত জগতের ভুবনে। যা শিশুমনের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে ওঠে। গল্পগুলোর বর্ণনা সহজ সরল। এক বৈঠকে পড়ে শেষ করা যায়। **আ. তা.**

ইন্টারলুড ড্রামা : সমাজচিন্তামূলক লঘুরসের ক্ষুদ্র নাটিকাকে ইন্টারলুড ড্রামা বলে। সমাজ-জীবনের দোষত্রুটি, পতন-স্খলন ইত্যাদি এই জাতীয় নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে তোলে। বিষয় অনুসারে কৌতুক রসের উৎসারণ ইন্টারলুড নাটকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন, মূর্খ ব্রাহ্মণের ভণ্ডামি ও ধনবান ব্যক্তির কুকীর্তির প্রতি ইঙ্গিত করে রচিত হয় প্রিয়মাধব বসুর 'বুঝলে কিনা' প্রহসনটি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে দুর্নীতি ও কুকর্ম করে গেছে তারই প্রতি ইঙ্গিত করে বাংলায় আরো অনেক Interlude drama রচিত হয়েছে। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনটিও ইন্টারলুড ড্রামার নিদর্শন। ইন্টারলুড ড্রামা সাধারণত ক্ষুদ্র আকৃতির হয়। আকৃতির দিক থেকে বড়

www.pathagar.com

হলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দু'টি ইন্টারলুড ড্রামার আদর্শের অনুসারী। ম. ই

ইন্ডিকা : মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরিত গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের ভারতবর্ষ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার বিবরণ সংবলিত গ্রন্থ। পশ্চিম এশিয়ার গ্রিক রাজা সেলিউকাসের দূতরূপে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন বলে জানা যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থটির সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না। তবে অনেক প্রাচীন গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকার এই গ্রন্থ থেকে তাঁদের গ্রন্থে অনেক অংশ উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকেই বইটি সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। জার্মানির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শোয়ানবেক গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে মেগাস্থিনিসের রচনার উদ্ধৃতির অনুবাদ সংগ্রহ করে 'India as described by Megasthenes of Arrian' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থই মেগাস্থিনিস সম্পর্কে জানার একমাত্র অবলম্বন। এতে মেগাস্থিনিসের রচনার মাত্র ৫৯টি অংশ (fragment) উদ্ধার করা হয়েছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণে ভারতবর্ষ ও তাম্রপর্ণের ভৌগোলিক বিবরণ ছাড়াও বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে দেশে দাসত্বপ্রথা বলে বিশেষ কিছু ছিল না। এদেশের ভূমি উর্বর ছিল, চৌর্যবৃত্তি প্রায় অজ্ঞাত ছিল। তাঁর মতে এদেশে সাতটি জাতি ছিল। তাঁরা কখনও বিদেশি জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয় নি বা নিজেরাও অপর জাতির লোককে আক্রমণ করেনি। তিনি এদেশের দার্শনিকদের বর্ণনা দিয়েছেন এবং পৌরশাসন ও সামরিক সমিতিসমূহের বিবরণও দিয়েছেন। মোটকথা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক টুকরো সংবাদই এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। সু. মু.

ইন্দিরা দেবী : কথাসাহিত্যিক। জন্ম কলকাতায়, ১৮৭৯ সালে। পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। স্বামী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশবে পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষালাভ করেন। গল্প ও উপন্যাসের সুলেখিকা হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯০৭ সালে তাঁর গল্প কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করে। নির্মাল্য (১৯১৫), কেতকী (১৯১৫) ও ফুলের তোড়া (১৯১৮) ইন্দিরা দেবীর গল্পের বই। স্পর্শমণি তাঁর একটি বহুল পরিচিত উপন্যাস। ঘরোয়া পরিবেশ অঙ্কনে নিপুণতার পরিচয় রেখেছেন। লেখারভঙ্গি সরল ও মাধুর্যমণ্ডিত। ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী তাঁর অনুজা। তিনি ১৯২২ সালে পরলোক গমন করেন। নূ. ই

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : সঙ্গীত শিল্পী ও লেখিকা। পিতার কর্মক্ষেত্র দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরে ১৮৭৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ১৮৯২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে বাংলাসাহিত্যের ক্ষণজন্মা গদ্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা তাঁর এক অসাধারণ কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। লেখিকা হিসেবেও খ্যাতিমান। গ্রন্থাবলী : নারীর উক্তি (১৯২০), রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম (১৯৫৪), রবীন্দ্রস্মৃতি (১৯৫৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ : বাংলার স্ত্রী-আচার (১৩৬৩), পুরাতনী (১৩৬৪)। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯৪১) পর স্বামী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করেন। সে সময় থেকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত

www.pathagar.com

শিক্ষাদান করতেন। ১৯৫৬ সালে কিছুকাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী পদক (১৯৪৪), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট ডিগ্রি (১৯৫৭) ও রবীন্দ্র-ভারতী সমিতি থেকে রবীন্দ্র-পুরস্কার (১৯৫৯) লাভ করেন। ১৯৬০ সালের ১২ আগস্ট তিনি মারা যান। নূ. ই

ইন্দো-ইউরোপীয় : ধ্বনি, শব্দ ও ব্যাকরণের সাদৃশ্য বিচার করে পৃথিবীর অনেকগুলো ভাষাকে নানা পরিবারে বা ভাষাবংশে বিভক্ত করা হয় ; ইন্দো-ইউরোপীয় অনুরূপ একটি ভাষাবংশের নাম। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি, তবে গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাসমূহের ভাষা-বিশ্লেষণ করে মূলের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। ইউরোপের, ভারতের এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী এলাকার প্রধান প্রধান ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্তর্ভুক্ত। কেলতিক, জার্মানিক, ইতালিক, হেলেনিক, বাল্টো-শ্লাভিক আলবেনীয়, আর্মেনীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় এবং তোখারীয় এ গোষ্ঠীর ভাষা। 'ক' ধ্বনি ও 'শ' ধ্বনির ব্যবহার-বিধি অনুযায়ী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলোকে দুটো বর্গে বিভক্ত করা হয়। 'ক' ধ্বনি রক্ষিত হয়েছে যে বর্গে তাকে বলা হয় 'কেন্তুম' আর 'শ' রক্ষিত হয়েছে যে বর্গে তাকে বলা হয় 'শতম'। মূল ভাষায় ১০০ সংখ্যাবাচক শব্দটি ছিল Kmtom. শব্দটি দু বর্গের বিভিন্ন ভাষায় নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে :

কেন্তুম বর্গ	**শতম বর্গ**
ইতালিক :	কেন্তুম (Centum লাতিন)
	ইন্দোইরানীয় শতম (সংস্কৃত)
	সতেম (আবেস্তা)
গ্রিক :	হে-কাতোন (he-Katon)
জার্মানিক :	হুন্দ্ (hund= Khund. গথিক)
	রাল্টোশ্লাভিক : সিম্‌তাস (Szimtas লিথুয়ানীয়)
কেলতিক :	কেত্ (cet প্রাচীন আইরিশ)
তোখারীয় :	কন্ত (kant)

বলা হয়েছে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এর যে কোনো শাখা-ভাষার ধ্বনি থেকে অধিক সংখ্যক ধ্বনি ছিল। ব্যাকরণ মোটামুটি সংস্কৃত ও গ্রিক ভাষার অনুরূপ, তবে ক্রিয়া বিন্যাস ভিন্নতর ছিল। প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ সৃষ্টি করা হতো। সমাস ছিল, তবে দু পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পদে মূল স্বরধ্বনির নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে পরিবর্তন ঘটত। পদের উচ্চারণে স্বরভঙ্গির অবস্থান অনুসারে অর্থ পরিবর্তন সংঘটিত হতো। ম. মু.

ইন্দ্র : পুরাণ মতে, দেবমাতা অদিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ইন্দ্রের জন্ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর ছাড়া অন্যান্য দেবতাদের উপর ইন্দ্র কর্তৃত্ব করেন। তাই তিনি দেবরাজ নামে খ্যাত। ইন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—তাঁর জন্ম সময়ে আকাশ পৃথিবী পর্বত ভীতকম্পিত হয়েছিলো। তাঁর কেশ, শ্মশ্রু, অশ্ব, রথ পিঙ্গলবর্ণ। তাঁর দুই হাত দীর্ঘ। ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র, ধনুর্বাণ অঙ্কুশ। তিনি সহস্রাক্ষ। সোমরস তাঁর প্রিয় পানীয়, এমনকি মাতা অদিতির স্তনে তিনি সোমরস দর্শন করেন, পিতা ত্বষ্টার সোমরস বলপূর্বক পান করেন। তিনি বায়ুমণ্ডলের দেবতা—আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের উপর তাঁর কর্তৃত্ব। বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতে তিনি অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি ঘটান। ইন্দ্র বহুভোজী ও চিরযুবা। তিনি জন্মাবধি যোদ্ধা, শত্রুদমনকারী ও অজেয়। ঋগবেদের চতুর্থাংশ জুড়ে তাঁর বর্ণনা আছে। ইন্দ্রের শত্রু-রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, অহি, বৃত্র উরণ, বিশ্বরূপ, অর্বুদ, বল প্রভৃতি দানব। তিনি সূর্যালোকে উষাকে প্রকাশ করেন। শত অশ্বমেধযজ্ঞে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। সেই কারণে ইন্দ্র নৃপতিগণের শত অশ্বমেধযজ্ঞে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন। মুনিঋষিদেরও তাঁর ভয়। সেজন্য স্বর্গ অপ্সরীদের দ্বারা তিনি তাঁদের তপোভঙ্গ করান। দৈত্য দানবকে তিনি দমন করেন, অনেক সময় তাদের দ্বারাও পরাভূত হন। একবার বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাভূত হয়ে ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যচ্যুৎ হন, পরে দধীচির অস্থিনির্মিত

www.pathagar.com

বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ইন্দ্র সম্পর্কে যেসব পুরাণকাহিনী প্রচলিত আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে—গৌতম মুনির সঙ্গে তাঁর বিরোধ, মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পরাজয়, দুর্বাসা মুনির সঙ্গে বিরোধ, কৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদি। সু. মু.

ইন্দ্রজিৎ/মেঘনাদ : রামায়ণের চরিত্র। রাবণের পুত্র। মন্দোদরীর গর্ভে তাঁর জন্ম। জন্মকালে মেঘ গর্জনের ন্যায় শব্দ করায় তাঁর অপর নাম মেঘনাদ। মহামায়ার পূজা করে তিনি মায়াবল লাভ করেন। অক্ষয় তূণীর তাঁর দুর্ধর্ষ অস্ত্র। দ্বিগ্বিজয় করতে একদা তিনি রাবণের সঙ্গে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্র ও তৎপুত্র জয়ন্তকে পরাভূত করে ইন্দ্রজিৎ আখ্যা পান। ইন্দ্রের বন্দীদশা মোচন করতে তিনি ব্রহ্মার কাছে অমরত্বের প্রার্থনা করেন, কিন্তু ব্রহ্মা তাতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইন্দ্রজিৎ পূজার জপ ও হোম সমাপনণান্তে অগ্নিরথে থেকে যুদ্ধ চালনাকালীন অমরত্বের দাবী করেন। ব্রহ্মা স্বীকৃত হন। রাম-রাবণের যুদ্ধে প্রথমে তিনি রাম-লক্ষ্মণ পরাজিত ও অজ্ঞান করেন। কিন্তু হনুমান ঔষধ এনে তাঁদের সঞ্জীবিত করেন। তখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ অজেয় হওয়ার সংকল্প করেন, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই লক্ষ্মণ অন্যায়ভাবে তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক বাংলায় অমর কাব্য 'মেঘনাদবধ' রচিত হয়। উক্ত কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণও একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। ম. চৌ.

ইন্দ্রদ্যুম্ন : হিন্দু পুরাণোক্ত সূর্যবংশীয় এক রাজা, যিনি অবন্তি বা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। একদা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুপূজা করতে মনস্থ করেন ; কিন্তু পূজার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে না পেয়ে অবশেষে তিনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এসে পূজা করেন। পূজা ও যজ্ঞাদি শেষে ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেন ; কিন্তু এতে তিনি কি মূর্তি স্থাপন করবেন তা স্থির করতে অসমর্থ হন। এ ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে বিষ্ণু তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁর সনাতনী মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। বিষ্ণু তাঁকে আরো বলেন যে, আজ খুব ভোরে সমুদ্রতীরে গিয়ে তিনি এক কাষ্ঠখণ্ড ভেসে যেতে দেখবেন। ঐ কাঠ দিয়েই যেন তিনি তাঁর মূর্তি নির্মাণ করেন। বিষ্ণুর স্বপ্নাদেশমতো ইন্দ্রদ্যুম্ন খুব ভোরে উঠে সমুদ্রতীরে যান এবং এক ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড পেয়ে নিজের হাতে কুঠার দিয়ে তা ছেদন করতে থাকেন। এমন সময় বিষ্ণু ও বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ বেশে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হন এবং কাষ্ঠখণ্ড ছেদনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। রাজার জবাব শুনে ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু বলেন যে, এই কঠিন কাজ রাজাকে দিয়ে সম্পন্ন হবে কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে একজন কুশলী শিল্পী আছেন, যিনি বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি তৈরি করে দিতে পারবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মাকে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করে দিতে বলেন। রাজাজ্ঞায় বিশ্বকর্মা শঙ্খচক্র ও গদাধর কৃষ্ণমূর্তি, গৌরবর্ণ লাঙ্গলাস্ত্রধারী বলদেব মূর্তি এবং সুভদ্রার সুশোভন মূর্তি নির্মাণ করে দেন। ম. চৌ.

ইন্দ্রধনু : রামায়ণোক্ত শরাসন বিশেষ। রামচন্দ্র যখন বনবাসে ছিলেন তখন মহর্ষি অগ্যস্ত রামকে এই ইন্দ্রধনু উপহার দেন। এই অস্ত্রের সাহায্যেই রাম রাবণকে বধ করেন। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রামচন্দ্রের সাহায্যার্থে ইন্দ্র তাঁর সারথি মাতলীকে রথ ও ইন্দ্রধনুসহ লঙ্কায় প্রেরণ করেন। আ.রা.

ইন্দ্রধ্বজ : দেবাসুরের যুদ্ধে পীড়িত দেবতাগণ ব্রহ্মার উপদেশে নারায়ণকে স্তবে সন্তুষ্ট করেন। এতে ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে বলেন যে, ক্ষীরোদসাগরে গিয়ে নারায়ণের স্তব করলে দেবতারা একটা ধ্বজ পাবেন, যা অসুর বিনাশে সাহায্য করবে। দেবতারা ব্রহ্মার উপদেশমতো ক্ষীরোদসাগরে গিয়ে নারায়ণের স্তব করলে নারায়ণ স্তবে তুষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে তাঁদেরকে সেই ধ্বজ দান করেন। সেই ধ্বজকে বংশদণ্ডে যুক্ত করে তার সাহায্যে দেবতারা অসুরদের পরাস্ত করেন। এর নামই ইন্দ্রধ্বজ। নারায়ণ বলেছিলেন যে, যে রাজা ইন্দ্রধ্বজের পূজা করবেন, তাঁর রাজ্য শস্যপূর্ণ হবে ; সেখানকার প্রজাবৃদ্ধি পাবে এবং প্রজারা নীরোগ হবে। ভাদ্র মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে রাজ্যের শান্তি ও প্রজাবৃদ্ধির কামনায় পূর্বকালে রাজারা ইন্দ্রের প্রীত্যর্থ এই ধ্বজা বিধিমত পূজা করে মাটিতে প্রোথিত করতেন। পরে বৈধানুষ্ঠানসহ ঐ ধ্বজা বিসর্জন দেয়া হতো। আ.রা.

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি ও কথা-সাহিত্যিক। বর্ধমান জেলার পান্ডাগ্রামে ১৮৪৯ সালের ১৪ মে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুড়ি। পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়া আদালতের উকিল ছিলেন। ১৮৬৯-এ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। প্রথমে বীরভূমের হেতমপুর স্কুলে, পরে বর্ধমানের ওকড়সা স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৮৭১-এ বি.এল. পাস করেন। প্রথমে পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরে, পরে কলকাতা হাই কোর্টে এবং সবশেষে বর্ধমানে আইন ব্যবসা করেন। গদ্যে-পদ্যে ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ রচনা তাঁকে বাংলা সাহিত্য জগতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'উৎকৃষ্ট কাব্যম' (ব্যঙ্গকাব্য, ১৮৭০). 'কল্পতরু' (উপন্যাস, ১৮৭৪), 'ভারত-উদ্ধার' (ব্যঙ্গকাব্য, ১৮৭৮), 'ক্ষুদিরাম' (উপন্যাস, ১৮৭৮) ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। পাঁচ সর্গে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ভারত-উদ্ধার' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকাব্য। এ কাব্যে সেকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের হাস্যজনক দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'কল্পতরু' বাংলায় প্রথম ব্যঙ্গ-উপন্যাস। ব্রাহ্মধর্মানুসারীদের ব্যঙ্গ করে এটি রচিত। ১৮৭৮-এ 'পঞ্চানন্দ' নামে ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে পত্রিকাটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। 'পঞ্চানন' ছদ্মনামে চুটকি লিখেছেন। এ রচনাগুলো 'পঞ্চানন্দ' ও 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে এগুলো 'পাঁচুঠাকুর' ও 'পঞ্চানন্দ' নামে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। মৃত্যু. ২৩ মার্চ ১৯১১। নূ. ই

ইন্দ্রপ্রস্থ : দিল্লীর নিকটবর্তী এক অধুনালুপ্ত শহর। একে ইন্দ্রপত্ বা পুরনো দিল্লীও বলা হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করে হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের অর্ধরাজ্য দান করে কুরু রাজধানী (হস্তিনাপুর) থেকে কিছু দূরে যমুনাতীরবর্তী খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। পঞ্চপাণ্ডব এতে সম্মত হয়ে সেখানে যান এবং ঘোর খান্ডববন দগ্ধ করে তাঁরা স্থানটিকে বাসোপযোগী করে তোলেন। সেখানে তাঁরা বহু সুরম্য সৌধ নির্মাণ করেন এবং শহরটিকে পরিখা প্রাকারবেষ্টিত ও উপবন-সরোবর শোভিত করে তোলেন। এভাবে খাণ্ডবপ্রস্থ স্বর্গধামতুল্য নগরে পরিণত হয় এবং যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। জাতকের বর্ণনামতে ইন্দ্রপত বা ইন্দ্রপ্রস্থ শহরের আয়তন সাত যোজন। ভাগবতপুরাণের মতে যুধিষ্ঠিরই ছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম রাজা। পদ্মাপুরাণে বর্ণিত আছে, ত্রিদশাধীশ ইন্দ্র এখানে স্বর্ণযূপ দিয়ে অনেক যাগযজ্ঞ করেছিলেন এবং সেসব যাজ্ঞে নারায়ণের সমক্ষে ব্রাহ্মণদের বহু রত্নপ্রস্থ দান করেছিলেন। এজন্য উক্ত স্থানের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ হয়েছে। বর্তমান ফিরোয শাহ কোট্‌লা এবং সম্রাট হুমায়ূনের সমাধিস্থলের মধ্যবর্তী স্থানে যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মিত হয়েছিল। দিল্লীর পুরনো কেল্লা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ম. চৌ.

ইন্দ্রবর্মা : মহাভারতোক্ত চরিত্র বিশেষ। মালবের রাজা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদের পক্ষাবলম্বন করেন। বিখ্যাত 'অশ্বত্থামা' হাতীটি ছিল ইন্দ্রবর্মার। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম এই হাতী বধ করে দ্রোণকে হীনবল ও যুদ্ধত্যাগ করাবার উদ্দেশ্যে 'অশ্বত্থামাহতঃ' বলে ঘোষণা

www.pathagar.com

করেন। কারণ দ্রোণের পুত্রের নামও ছিল অশ্বত্থামা, যিনি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিজের পুত্রের নিহত হওয়ার খবর শুনে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে দ্রোণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে 'অশ্বত্থামা হতঃ" এবং মৃদুস্বরে 'ইতি গজ' উচ্চারণ করেন। ম. চৌ.

ইন্দ্রভূতি (খ্রিস্টীয় ৭ম/৮ম শতক) **:** উড্ডীয়ান বা ওদ্যানের রাজার নাম ইন্দ্রভূতি। তিনি বঙ্গভূমে 'বজ্রযোগিনী সাধন' প্রবর্তন করেন। এই ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করেন তাঁর ভগিনী বা কন্যা। তিব্বতী সূত্র অনুযায়ী তাঁর রচিত ২৩টি গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে। তার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল পুঁথি 'কুরুকুল্লা-সাধন' ও 'জ্ঞানসিদ্ধি' গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। ইন্দ্রভূতির গুরু ছিলেন আচার্য অনংগবজ্র। অনুমান করা হয় তিব্বতের বিখ্যাত বৌদ্ধগুরু ও সাধক পদ্মসম্ভব ইন্দ্রভূতির পুত্র ছিলেন। আ. জ. ভূ.

ইন্দ্রানী : পুরাণের চরিত্র বিশেষ। ইন্দ্রের স্ত্রী এবং জয়ন্ত ও জয়ন্তীর মাতা। তাঁর অন্য নাম সচী। ঋগবেদের উক্তি অনুযায়ী তিনি স্ত্রীকুলে ভাগ্যবতী, কেননা স্বামী তাঁর চিরযুবা। তাঁর মধ্যে যৌন আবেদন বেশি থাকায় কয়েকটি রাজকুমারীর মধ্যে ইন্দ্র তাঁকে মনোনীত করেন। পুরাণমতে তিনি দৈত্য পুলোমার কন্যা। একদা ইন্দ্র ইন্দ্রানীর সতীত্ব নাশ করলে শাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুলোমাকে হত্যা করেন। মহাভারত মতে রাজা নমুষও একদা ইন্দ্রানীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সু. মু.

ইব্‌নে খলদূন : আফ্রিকাবাসী ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব দর্শনের স্থপয়িতা। ১৯৩২ সালে তিউনিসে জন্ম। ইব্‌নে খলদূন তিউনিসে শিক্ষা শেষ করে ২০ বছর বয়সে মিশরের রাজদরবারে সেক্রেটারিরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। সুদীর্ঘ ২২ বছর তিনি ভূমধ্যসাগরের উভয় পার্শ্বের আরো কয়েকটি দেশের রাজদরবারে অনুরূপ উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন। তৈমুর লঙের অগ্রাভিযান প্রতিহত করার জন্য যে মিসরীয় বাহিনী উদ্যোগী হয়, ইব্‌নে খলদূনও তার সঙ্গে ছিলেন (১৪০০-০২)। মঙ্গোল বাহিনীর কাছে দামেশ্‌ক নগর সমর্পণকালে সন্ধির শর্তাবলী নিরূপণের কাজে তিনি নির্বাচিত হলে দুর্ধর্ষ তৈমুর তাঁকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি মঙ্গোল শাসনাধীন দামাস্কাসেও কিছুকাল বিচারপতি পদে নিয়োজিত ছিলেন। সেখান থেকে মিশরে ফিরে গিয়ে তিনি সেখানকার প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেও ইব্‌নে খলদূন মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুল ইবার' তাঁর অমর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। অনেক মনীষীর মতে তাঁর এই গ্রন্থটি মধ্যযুগের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। গ্রন্থটি ৬ ভাগে বিভক্ত। এতে সভ্যতা, যাযাবর ও স্থায়ী নাগরিকদের সংস্কৃতি, সরকারের শাসননীতি, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন, জীবিকার বিভিন্নপথ, নানাবিধ বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। পুরো গ্রন্থটিকে বিরাট বিশ্বকোষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ রচিত 'মুকাদ্দামা' মধ্যযুগের চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আস্তিকের সীমাবদ্ধ চিন্তাধারার মধ্যে থেকেও তিনি আত্ম-জিজ্ঞাসায় যেমন দ্বিধা করেননি, তেমনি এর বিজ্ঞানসম্মত যথার্থ জবাব দানেও তাঁর বিচ্যুতি ঘটেনি। তিনি মুসলিম রাজ-রাজড়াদের মধ্যে বহু যুদ্ধবিগ্রহ, জয়-পরাজয় ও উত্থান-পতন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং এসবের কুফল তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছে। আরবদের সম্পর্কে বহু কঠোর উক্তি তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। তথাপি আধুনিক আরব বিশ্ব ইব্‌নে খলদূনের বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছে। আরবের বিভিন্ন দেশে (যেমন— কায়রো, আলজিয়ার্স, বৈরুত) তাঁর কিতাবুল ইবারের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

উনিশ শতকে ফরাসিসহ ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর রচনাবলী, বিশেষত 'মুকাদ্দামা' বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৯৭ সালে তাঁর স্মারক 'খালদুনিয়া' নামে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে আরবি বক্তৃতা, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মু.আ.রা.

ইব্‌নে বতুতা : মধ্যযুগের বিখ্যাত বিশ্ব-পর্যটক। আফ্রিকার তানজিয়েরে জন্ম। জীবনকাল ১৩০৪-১৩৭৮ সাল পর্যন্ত। পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ্ মুহম্মদ ইব্‌নে বতুতা। তিনি শামসুদ্দীন এবং মওলানা বদরুদ্দীন নামেও অভিহিত হন। অদম্য দেশ ভ্রমণের নেশায় ইব্‌নে বতুতা ১৩২৫ সনে মাত্র ২১ বছর বয়সে দেশত্যাগ করেন এবং ১৩৫৩ সন পর্যন্ত জীবনের ২৮ বছর তিনি বিশ্ব পর্যটনে কাটান। প্রথমে তিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ও মিশর, সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্র, রাশিয়ার কিয়দংশ, ভারতীয় উপমহাদেশ, সিংহলসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চল ও অন্যান্য দেশ, এশিয়া মাইনর এবং চীন ভ্রমণ করেন। শেষ পর্যায়ে তিনি পুনরায় আরব দেশ এবং পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় পরিভ্রমণ করে ১৩৫৩ সনে স্বদেশে ফিরে যান। মধ্যযুগে অরক্ষিত বিপদসঙ্কুল পথে সকল বাধাবিপত্তি ও কষ্ট অগ্রাহ্য করে এবং কখনো কখনো জীবনবিপন্ন করেও ইব্‌নে বতুতা সর্বমোট ৭৭,৬৪০ মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। ১৩৫৫ সনে রাজাজ্ঞায় তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত মুহম্মদ ইব্‌নে জুযাইয়েরকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করান, এবং এর নাম দেন 'তুহতাফ আল-নুজ্জার ফী গারাইব আল-আমসার ওয়া আজাইব আল-আফসার'। সংক্ষেপে এই গ্রন্থকে 'রিহ্‌লাত ইব্‌নে বতুতা' কিংবা শুধু রিহ্‌লা বা ভ্রমণকাহিনী বলা হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে ইব্‌নে বতুতা বিশ্ব-পর্যটন কালে স্বভাবতই বিভিন্ন দেশের মুসলিম তীর্থ পরিদর্শন, মুসলমান ফকির-দরবেশের সঙ্গলাভ এবং তৎকালীন মুসলমান শাসকদের রাষ্ট্রশাসন প্রণালীর সঙ্গে পরিচয়লাভে আগ্রহী ছিলেন। মুহম্মদ বিন তঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-৫১) ভারতবর্ষে এলে দিল্লির দরবারে তিনি পরম সমাদরে গৃহীত হন। ১৩৩৪ থেকে ১৩৪২ সন পর্যন্ত ইব্‌নে বতুতা দিল্লির প্রধান কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪২ সনে সুলতান তাঁকে চীনদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। রাজকার্য উপলক্ষে এবং চীন গমনকালে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন এবং সর্বস্তরের লোকদের সঙ্গে মিশে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পান। এই অভিজ্ঞতা তাঁর ভারত বিবরণকে সমৃদ্ধ করেছে। দিল্লীর রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে তিনি কুতবুদ্দীন আইবেক থেকে মুহম্মদ বিন তুঘলক পর্যন্ত সুলতানদের ভারত শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসহ মুহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর রাজদরবার ও শাসনপদ্ধতির খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁর রচনায় সন্নিবিষ্ট করতে পেরেছেন। আবার ভারতের প্রায় সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রাণালী, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক তথ্যাদি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ সম্পর্কে ইব্‌নে বতুতার মন্তব্য এই যে, এদেশের মতো পণ্যের এতো কম মূল্য তিনি পৃথিবীর আর কোথাও দেখেননি। তখন বাংলাদেশে চাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কল্পনাতীত প্রাচুর্য ছিল। এখানকার প্রকৃতির শ্যামলিমা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ্‌জালালের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি শ্রীহট্ট গিয়েছিলেন। ইব্‌নে বতুতা যে সকল সময় তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও নির্ভরযোগ্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছেন, এমন কথা বলা চলে না। তবে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থানকালে যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তা

www.pathagar.com

নিরপেক্ষভাবে তাঁর গ্রন্থে বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন। বর্ণনার দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর রিহ্‌লা থেকে খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতকের সমগ্র ভারতের একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তখানি ইংরেজি ও ফরাসি সহ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এমন কি প্যারিস থেকে ৫ খণ্ডে আরবি মূল রিহ্‌লা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে (১৮৫৩-৫৯ খ্রিঃ)। সু. মু.

ইবরাহীম খাঁ : লেখক ও শিক্ষাবিদ। টাঙ্গাইল জেলার বিরামদি (শাহবাজ নগর) গ্রামে ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শাহবাজ খাঁ, মাতা রতন খানম, স্ত্রী আঞ্জুমন্নেসা। এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। পিংলা হাই স্কুল থেকে ১৯১২ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে আই. এ., কলকাতা সেন্ট পল্‌স কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ১৯১৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. (ইংরেজি) ডিগ্রি পান। একই বছর করটিয়া ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগদান করেন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এ আন্দোলনের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে করটিয়া ইংরেজি স্কুলকে জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। ১৯২৩ সালে ল. পাস করেন। ১৯২৪-১৯২৬ সালে ময়মনসিংহ জজ আদালতে আইন ব্যবসা করেন। করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অর্থে ১৯২৬ সালে করটিয়া সাদত কলেজ স্থাপন করেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় বাইশ বছর এ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠভাবে অংশ নেন। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য, ১৯৫৩সালে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭-১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ১৯৪৮-১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ভুয়াপুর হাই স্কুল, ভুয়াপুর বালিকা বিদ্যালয়, ভুয়াপুর কলেজ ও করটিয়া জুনিয়র গার্লস মাদ্রাসার তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ইবরাহীম খাঁ একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক। ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। বাঙালি মুসলমানের জাগরণ, ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য, মুসলিম মহাপুরুষদের গৌরবগাঁথা, মানবকল্যাণ ও জন-মানুষের জীবনাচরণ তাঁর লেখায় রসমণ্ডিতভাবে রূপায়িত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ—নাটক : কামাল পাশা (১৯২৭), আনোয়ার পাশা (১৩৩৭), ভিস্তি বাদশা (১৩৫৭), ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫) ; উপন্যাস : বৌ বেগম (১৯৫৮) ; গল্পগ্রন্থ : আলু বোখরা (১৯৬০), উস্তাদ (১৯৬৭), দাদুর আসর (১৯৭১) ; স্মৃতিকথা : বাতায়ন (১৩৭৪) ; ভ্রমণকাহিনী : ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪) ; শিশুসাহিত্য : নিযাম ডাকাত (১৯৫০), ব্যাঘ্রমামা (১৯৫১), শিয়াল পণ্ডিত (১৯৫২), বেদুঈনদের দেশে (১৯৫৬), ছোটদের মহানবী (১৯৬১), ইতিহাসের আগের মানুষ (১৯৬১), গল্পে ফজলুল হক (১৯৭৭), ছোটদের নজরুল। সাহিত্যকৃতির জন্য ভারতের বৃটিশ সরকার খানবাহাদুর, পাকিস্তান সরকার তমঘা-এ-কায়েদে আযম (১৯৬৩) খেতাব ও বাংলাদেশ সরকার একুশে পদক (১৯৭৬) প্রদান করে। ১৯৬৩ সালে নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৭৮ সালের ২৯ মার্চ ঢাকায় পরলোক গমন করেন। নূ.ই.

ইবসেন : প্রখ্যাত নাট্যকার। নরওয়ের স্কিয়েন শহরে ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়ে ক্ষতির দরুন ইবসেনের বাল্যকালে তাঁর পরিবার দারিদ্র্যকবলিত হয়। ইবসেন তখন

www.pathagar.com

রাজধানী ক্রিস্টিয়ানায় আসেন, তখন নরওয়েতে শিক্ষা-সাহিত্যে জাতীয় জাগরণের যুগ চলছে। জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাট্যশালা। ইবসেনের কিছু কিছু নাটক সেখানে মঞ্চস্থ হলেও আর্থিক স্থায়িত্ব কিংবা আশানুরূপ ফল তাঁর লাভ হয়নি। এইসময় ভাগ্য তাঁকে নিয়ে যায় রোমে। ইতালীর রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রতিবেশ তাঁর কল্পনাকে সুদূরপ্রসারী করে দেয়। তখন থেকে ইবসেনের মন চলে যায় নন্দনতত্ত্ব থেকে নৈতিকতার দিকে। ইতালী থেকে তিনি প্রথমে ড্রেসডেনে ও পরে মিউনিকে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তখন থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। সমাজের দোষত্রুটি নির্দেশ করা ও অবিরত আত্মসমালোচনা করাই ইবসেনের নাট্য-ধর্ম। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে 'ব্রাণ্ড' (Brand), 'পীয়র জিন্ট' (Peer Gynt), 'এম্পরার এণ্ড গ্যালিলিয়ন', 'এ ডল্স হাউস' (A Doll's House), 'ঘোস্টস' (Ghosts), 'এন এনিমি অব দি পীপ্ল' (An Enemy of the People), 'দি ওয়াইল্ড ডাক' (The Willd Duck), ও 'হেডা গোবলার' (Hedda Gabler) প্রধান। সমালোচকদের মতে, ইবসেন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভা এবং উনিশ শতকের একজন চিন্তাগুরু। ইবসেন উনিশ শতকের শেষার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। ১৯০৬ সালে পরলোক গমন করেন ম.ই.

ইবাদত : এ শব্দটি আরবি আব্দ্ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অল্লাহতায়ালাকে প্রভু, উপাস্য গণ্য করে তাঁর সকল কাজে উপাসনা করা এবং মুহাম্মদ রাসুলল্লাহ (দঃ)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন এবং রাসুল (দঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আদেশ নির্দেশ পালন করা। পবিত্র কুরআনে সুরা ফাতেহাতে আমরা প্রতিবার অঙ্গীকার করি, 'ইয়া কানাবুদু ওয়া ইয়া কানাছতাইন (১:৪), অর্থ "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" কালিমা শাহাদতে আমরা বলি, "আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।" এর অর্থ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ মাবুদ (ইবাদতের যোগ্য) নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক (অংশীদার) নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দাস ও রাসুল।" ইসলামে ইবাদত দু'প্রকার : হক্কুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর হক বা স্রষ্টা সম্পর্কিত ইবাদত এবং হক্কুল ইবাদ বা মানুষ ও সৃষ্টি সম্পর্কিত ইবাদত। ইসলামে প্রতিটি কাজ আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করলে সব কার্যাবলী ইবাদত বলে পরিগণিত হয়। সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধ মান্য করে চলতে হবে। আল্লাহর একত্বের উপর ঈমান বা বিশ্বাস রেখে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রিসালতকে মান্য করে এবং আনুগত্য, সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্বশীলতার সাথে সালাত (নামায), সিয়াম (রোজা), যাকাত দান, হজ্জব্রত (সামর্থ্য ও সঙ্গতি থাকলে) পালন করে হক্কুল্লাহ এবং মানুষ ও সৃষ্টির সাথে ইসলামের আহকাম, বিধি-নিষেধ পালন করে হক্কুল ইবাদ সম্পন্ন করলে একজন মুসলমান নাজাৎ বা মুক্তি এবং মাগফেরাত বা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে জান্নাতবাসী হবেন বলে আশা করা যায়। রীতিমত ইবাদত করলে দেহমন পবিত্র হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, আত্মশুদ্ধি হয় এবং হৃদয়ে এক অনাবিল শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্যের চেতনা আসে। হাদিসে আছে, "আস্সালাতু মিরাজুল মোমেনীন", অর্থ নামায মোমেনের মিরাজ স্বরূপ। জীবনকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করার নামই ইবাদত। আ.সৈ.গো.দ.

ইব্রাহিম : ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাসে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) প্রভাব ও নেতৃত্বের দিক দিয়ে এবং পবিত্র কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্র একত্বের ধর্ম প্রচারে এক বিশিষ্ট

ভূমিকা পালন করেন। পবিত্র কুরআনে কম বেশি পঁচিশটি সুরায় তাঁর উল্লেখ আছে। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর পিতা আজরের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করার, স্থানীয় লোকদের নিকট সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক উপাস্য আল্লাহর অস্তিত্বের প্রচারের কথা এবং তাঁর নবী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে একজন সত্য প্রচারক হিসেবে। তাই তাঁকে হানিফ ও আল্লাহ্‌র বন্ধু বা খলিল বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি যে সম্প্রদায়ে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা মূর্তি ও নক্ষত্র পূজা করতো। ইব্রাহিম তাঁর অন্তরে ঐশী আলো দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন যে সকল মূর্তি জড় পদার্থ এবং তাদের কাছে প্রার্থনা মানুষের জন্য নিরর্থক এবং এক প্রকার প্রহসন কারণ মানুষ তাঁর হাতে বানানো মূর্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না। তাই তিনি তাঁর গোত্রের ও সম্প্রদায়ের নিকট এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য প্রচার করতে থাকেন কিন্তু পিতা ও স্বজন থেকে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হন। ফলে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয় এবং দেশের বাদশাহ নমরুদ ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু আল্লাহর অসীম মহিমায় অগ্নিকুণ্ড ফুলের উদ্যান হয়ে যায়। ইব্রাহিমের দু'জন স্ত্রী ছিলেন– সারা ও হাজেরা। তাঁর পুত্র ইসমাইল এবং ইসহাকও নবী ছিলেন। ঈমানের এক পরীক্ষায় আল্লাহ ইব্রাহিমের প্রাণপ্রিয় পুত্রের কুরবানীর আদেশ দেন। পিতা ও পুত্র উভয়ে সমস্ত হয়ে যান। কিন্তু কুরবানীর সময়ে আল্লাহর অসীম দয়ায় একটি দুম্বা ইসমাইলের স্থলে যবেহ হয়ে যায়। সেই থেকে ঈদুল আযহা পালনকালে মুসলমানগণ পশু কুরবানী দেন। তিনি তাঁর পুত্র ইসমাইলের সাথে মক্কায় কাবা বা আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেন যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জগতের মিলনের কেন্দ্রবিন্দু। **আ. সৈ. গো. দ.**

ইব্রাহিম খান, ফতেহ জঙ্গ : মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা ও প্রভাবশালী পত্নী নূরজাহানের তৃতীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম খান, ফতেহ জঙ্গ, একজন বিচক্ষণ শাসক ও রণকৌশলে সুযোগ্য সেনাপতি ছিলেন। তিনি প্রাথমিক অবস্থায় শাহী মহলে বখশী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীকালে বিহারে সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন খোখারা জনপদ জয় করার জন্য সেখানে হীরক খনির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশ অঞ্চলে তৎকালে ১৬১৭ হতে ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর শাসনকাল সে সময় শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য সুপরিচিত ছিল। কৃষি, শিক্ষা ও শিল্পে তাঁর আমলে সবিশেষ উন্নতি হয়। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাঁর আগে মুঘলদের দ্বারা আটককৃত সোনারগাঁয়ের মুসা খান ও কোচ রাজাকে তিনি সসম্মানে মুক্তি দান করেন। এ কারণে তাঁরা উভয়ে মুঘল প্রশাসনের শুভাকাঙ্ক্ষী ও মিত্র হয়ে পড়েন। আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমনে ইব্রাহিম খান কামরূপের ক্রোড়ী শেখ ইব্রাহিম, রাজা বলিনারায়ণ ও মধুসুদনের বিদ্রোহ দমন করে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮১৮ খিস্টাব্দে ইব্রাহিম খান তিন অংশে প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করে ত্রিপুরার রাজাকে পরাস্ত করে বন্দি করেন ও ত্রিপুরা রাজ্য দখল করেন। পরবর্তীকালে যখন মঘ রাজা ও হিজলীর জমিদার বাহাদুর খান বিদ্রোহ করেন, ইব্রাহিম খান ১৬২০ থেকে ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের প্রবলভাবে দমন করেন। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ত্রিপুরার অরণ্যপথে চট্টগ্রাম অভিযানে গমন করেন তবে বিবিধ অসুবিধার কারণে ফিরে আসেন। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে শাহযাদা খুররম (শাহজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলায় আগমন করলে ইব্রাহিম বাধা দেন এবং পরাস্ত ও নিহত হন। ইব্রাহিম খান একজন শান্তিকামী ও সচ্চরিত্র মুঘল সুবাদার ছিলেন। **আ.সৈ.গো.দ.**

ইভো আন্দ্রিচ : আধুনিক যুগোশ্লাভ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি বোসনিয়ার অন্তর্গত

ট্রাভনিকে ১৮৯২ সালের ১০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। আন্দ্রিচ যখন দু'বছরের শিশু তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ভিশেগার্ডের সমাজ ও তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আন্দ্রিচ তাঁর শৈশব জীবন কাটিয়েছেন। এখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ভিশেগার্ডের জীবন নিয়ে পরে তিনি লেখেন 'The Bridge on the Drina'। অল্প বয়সেই বিভিন্ন পত্র প্রক্রিয়ায় তাঁর প্রবন্ধ, কবিতা ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দুঃখ, দারিদ্র্য এবং লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে আন্দ্রিচ তাঁর পরাধীনতার ক্ষোভ প্রকাশ করলে বিদেশি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে জেলে আবদ্ধ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মুক্তি পান। দীর্ঘ দিন কারাভোগের ফলে আন্দ্রিচ হয়ে উঠেন দুঃখবাদী। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও বেদনা তাঁকে সংবেদনশীল করে তোলে। বন্দি জীবনেই মূলত তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, কথাসাহিত্য সব রকম সাহিত্যই রচনা করেছেন। যুদ্ধ শেষে যুগোশ্লাভিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, আন্দ্রিচ তখন পীপল্‌স অ্যাসেম্বলির সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর এপিকধর্মী রচনা The Bridge on the Drina-কে কেন্দ্র করেই ১৯৬১ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য তাঁর অপর দুটি উপন্যাস 'বোসনিয়ান স্টোরি' ও 'মিস এক্স'। ম.ই

ইমন : কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়। বাকি সকল স্বর শুদ্ধ। বাদীস্বর গান্ধার, সংবাদীস্বর নিষাদ। জাতি সম্পূর্ণ। আরোহ : ন্‌ র গ হ্ম প ধ ন র্স। অবরোহ : র্স ন ধ প হ্ম গ র স। ক. গো.

ইমন কল্যাণ : রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় রাগ। এই রাগে মধ্যম শুদ্ধ ও তীব্র উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। বাকি স্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। অর্থাৎ আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমে এই রাগে সপ্তস্বর ব্যবহৃত হয়। ঠাট কল্যাণ। বাদীস্বর গান্ধার, সংবাদীস্বর নিষাদ। আরোহ : স র গ হ্ম প ধ ন র্স। আরোহ : র্স ন ধ প হ্ম গ ম গ র স। ক.গো.

ইমরান নূর : কবি। লেখক নাম ইমরান নূর, প্রকৃত নাম মনযুর-উল- করিম। পিতার নাম মযহার-উল করিম। ১৯৩৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস থেকে লাভ করেন ডিডিএ। তিনি বাংলাদেশে সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব। সত্তর দশক থেকে তাঁর লেখালেখির শুরু। প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই, নাম শীতল দুপুর। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে মেঘের অশ্রু (১৯৮৫), চন্দ্র বিন্দুর উপাখ্যান (১৯৮৮), তোরঙ্গের আলিঙ্গন (১৯৮৮), পৃথিবীতে দ্বীপান্তর (১৯৯১), ইমরান নূরের কবিতা (১৯৯১), সফেন সমুদ্র নীল (১৯৯৩), ভ্যানিটিবাগে ভালোবাসা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিশুদের জন্য লেখা রাজা আমার মনের মতো (১৯৮৪), ছড়ায় ছড়ায় গল্প, ভোম্বলের অম্বল, নালিশ নিয়ে ইলিশ এলো বইগুলোও সমাদৃত। তাঁর স্মৃতিকথা-ধর্মী গ্রন্থ : 'শিলালিপিতে একাত্তর' বেশ জনপ্রিয়। তিনি অনেকগুলো সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে ভাসানী পুরস্কার (১৯৮৩), কবিতালাপ গোষ্ঠীর স্বর্ণপদক (১৯৯০),জিয়া স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯১), সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের কবি জীবনানন্দ দাশ স্বর্ণপদক (১৯৯০), দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদের শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক (১৯৯৩) ও বিক্রমপুর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিক্রমপুর পদক (১৯৯৩) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। খা.বি.জ.উ.

ইমরুল কয়েস : প্রাক্-ইসলামি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব কবি। রাজকীয় কিনদাহ্ গোত্রে জন্ম। প্রকৃত নাম হুদুজ ইব্‌নে হুজর। ইমরুল কয়েস অত্যন্ত উত্তেজনাময় ও দুঃসাহসিক ভবঘুরে জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন বহু কাহিনীর নায়ক। তবে সেসব

www.pathagar.com

কাহিনীর মধ্যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। কথিত আছে যে, উনাইযাহ্ নাম্নী এক আরব বালার সঙ্গে তাঁর অপরিণত বয়সের প্রেম অনুমোদন না করে তাঁর পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। আবার অন্যদের মতে, তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে এক ভৃত্যের হাতে সমর্পণ করলে ভৃত্য তাঁর বদলে একটি হরিণকে হত্যা করে তার চোখ দু'টি এনে মনিবকে দেখায়। তাঁর পিতা হুজ্‌র বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে তাঁকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ইমরুল কয়েস কন্‌স্ট্যান্টিনোপলে গিয়ে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সাহায্যপ্রার্থী হন। সম্রাট তাঁর সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রদান করেন ; কিন্তু স্বদেশে ফেরার পথে তিনি আংকারায় মারা যান। আবার এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের এক রাজকুমারীর শ্লীলতাহানি করায় সম্রাট কুপিত হয়ে তাঁকে একটি বিষাক্ত পোশাক উপহার দেন। উক্ত পোশাক পরিধানের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইমরুল কয়েসের কাব্যে ব্যক্তিগত আশা-নিরাশা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের চিত্র তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবদান সকল যুগের আরবদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। আরবগণ তাঁকে প্রেমের কবিতা রচয়িতাদের আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করে। পাশ্চাত্য সমালোচকদের কাছেও তাঁর কবি-প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইমরুল কয়েসের কাসীদা বিখ্যাত 'মু আল্লাকাত' নামক সংকলনে স্থান পেয়েছে এবং তা ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আ.ন.ম.ব.র.

ইমরোজ : পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যবিষয়ক সাধারণ মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ। মোহাম্মদ আবদুল খালেক কর্তৃক ৭৩ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, মালিক প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে ছ' টাকা, ষাণ্মাসিক সাড়ে তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা ন' আনা। ১ম বর্ষ: ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন-১৩৫৬। ১ম বর্ষের: ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য : 'ইমরোজ' কোনো দল বা ব্যক্তিবিশেষের পত্রিকা নয়। এর উদ্দেশ্য হবে সত্যিকার সাহিত্য প্রচার। নূতনত্বের সম্ভাবনা-পূর্ণ মৌলিক রচনা পরিবেশনের দিকেই 'ইমরোজ' বিশেষভাবে লক্ষ রাখবে। মানসম্মত গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, রস-রচনা, প্রবন্ধ ও ইসলামীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা 'ইমরোজ'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হবে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের অনুবাদ সাহিত্যও এর অঙ্গীভূত থাকবে।'... ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে ইসলামিক আদর্শ ও ভাবধারা ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবেই এ ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ ও সর্বসুন্দর হতে পারবে। 'ইমরোজ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এই সর্বসুন্দর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। এই উদ্দেশ্য সফল করতেই আত্মনিয়োগ করবে।' ১ম বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যার সূচিপত্র : আশীর্ব্বাদ-কাজী নজরুল ইসলাম-১, সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা (প্রবন্ধ)--ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-২, চুল (গল্প)—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-৫, নতুন ও পুরাতন (কবিতা)—প্রজেশ কুমার রায়-১৭, পাকিস্তানের খাদ্য-সমস্যা (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-১৮, কৃষাণী (কবিতা)—জসিমউদ্‌দীন-২৩, অন্দর ও বাহির (উপন্যাস)-নওশাবা-২৪, ধরিত্রীর নবজনম (কবিতা)—শাহাদাৎ হোসেন-২৮, একটি ভগ্নহৃদয়ের কাহিনী (গল্প)—নেশাদ বানু-২৯, আমেরিকার প্রবাস কাহিনী (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—শাহ এফ. রহমান-৩৪, তোমারে দেখিয়া (কবিতা)--এ.এন.এম. বজলুর রশীদ-৩৮, ইনভিজিবল কালেকশন (অনুবাদ সাহিত্য)—মাহবুব জামাল জাহেদী-৩৯, আরব রসায়নের সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্যাদি-এম. আকবর আলী-৪৬, গান-দেওয়ান গোলাম মরতুজা-৫০, ক্রন্দসী (উপন্যাস)—হামেদ আহমদ-৫১, উজির বৈঠক

www.pathagar.com

(রস রচনা)—ওমর উল্মিয়া-৫৮, সম্পাদকীয়-৬৩। আ.জ.ভূ.

ইমামচুরি : চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার অনুকরণে হযরত মুহম্মদের (দঃ) দৌহিত্র হাসান ও হোসেন বাল্যকালে এক সওদাগর কর্তৃক নদীতীরস্থ গঞ্জের বাজার থেকে অপহৃত হবার কাল্পনিক কাহিনী 'ইমামচুরি' কিস্‌সায় বর্ণিত। নবীর ও নবীদৌহিত্রের মহিমা ও কেরামতি প্রদর্শনই কিস্‌সা বানানোর লক্ষ্য। চৈতন্যলীলার কাহিনী প্রভাবিত মুসলিম কর্তৃক সে আদলে এ গল্প পরিকল্পিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পাঁচ খানা ভণিতাহীন ইমামচুরির পুঁথি রয়েছে। এ ছাড়া দোভাষী শায়ের ফকির মুহম্মদেরও একখানা মুদ্রিত পুঁথি (১২৬৪ সন তথা ১৮৫৭ সাল) চালু রয়েছে। এসব পুঁথি আঠারো শতকের শেষ পাদে ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত। নূ.ই

ইমারত : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি বিখ্যাত গল্প। ১৩৫২ সনের শারদীয়া সংখ্যা 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। আরো কয়েকটি গল্পের সঙ্গে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৫৩ সনে। একজন রাজমিস্ত্রীর জীবনকথা এ গল্পের উপজীব্য। অঞ্চলের সবচেয়ে পাকা রাজমিস্ত্রী জনাব আলি। অনবদ্য শিল্পী জনাব আলি কিন্তু ব্যক্তিজীবনে উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী। একদা সাঁওতাল পরগনায় গিয়ে নিয়তির নির্মম শিকারে পরিণত হয় সে। সেখানে যায় সাহেবানদের গির্জা তৈরি করতে। ফিরে আসে দুরারোগ্য ব্যাধি আর জীর্ণ শরীর নিয়ে, সঙ্গে সেখানকার এক সাঁওতাল মেয়ে। যে সারাজীবন মন্দির, মসজিদ, গির্জা আর বড় বড় ইমারত তৈরি করেছে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তার ভাগ্যে একখানি ভাঙা কুঁড়েও জুটলো না। যাও ছিলো, জমিদারের খাজনা বাকি পড়ায় সেটুকুও নিলাম হয়ে যায়। নিলামে খরিদ করে রশিদ আলির বাপ। বেইমান রশিদ সাঁওতাল মেয়েটিকেও গ্রাস করে। জনাব আলির শিষ্য আবদুল কিন্তু তার সঙ্গে বেইমানি করতে পারে না। আকাশে বৃষ্টির ঘনঘটা, জনাব আলির জীবনের অন্তিম লগ্ন আসন্ন। সেই মুহূর্তে তার সারাজীবনের কীর্তি অপরূপ মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। ঘন কালো মেঘ সিমেন্ট করা মেঝের মতো বাহার খুলেছে। মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি। বাচ্চারা বারান্দায় ছুটোছুটি করছে। তার নিজের হাতে গড়া ছাদ, কোনো ভয় নেই, এক ফোঁটা বৃষ্টিও গলে পড়বে না। আনন্দ রহো, আরাম করো। আর একদিকে খোদাতায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারত বুড়ো বটগাছটার আশ্রয়ে স্বস্তি পায় মুমূর্ষু জনাব আলি। আবহমানকালের বটগাছকে নিয়ে যে লোকবিশ্বাস গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে মিশে যায় জনাব আলির লোকায়ত জীবনের কাহিনী। 'বটগাছ খোদাতায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারত'—তারাশঙ্করের আস্তিক্যবুদ্ধিজাত এই কবিকল্পনা 'ইমারত' গল্পের নতুন তাৎপর্য। জীবনমৃত্যুর দোলায়িত রহস্যের প্রেক্ষাপটে মানবজীবন-সত্যের এরূপ শিল্পসুন্দর বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যে বিরল। আ.ই

ইমেজিজ্‌ম/ রূপকল্পবাদ/ চিত্রকল্পবাদ/ প্রতিমাবাদ : বিশ শতকের প্রথম দশকে কাব্য-সাহিত্যে এমন এক নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, যার ফলে কবিতা থেকে রোমান্টিকতা অপসারিত হয় এবং ন্যূনতম বাকরীতির সাহায্যে কবিতার শরীর নির্মিত হয়। এই নতুন পদ্ধতির নামকরণ হয় ইমেজিজম বা প্রতিমাবাদ। যথাযথ রূপকল্পের মাধ্যমে কবিতায় ভাবের প্রতিমা বা image সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। ভাবের আন্তর রূপের অভিব্যক্তি অপেক্ষা কবিতার রূপকল্প ও কায়া নির্মাণেই প্রতিমাবাদী কবিগণ অধিকতর মনোযোগ দেন। প্রতিমাবাদী আদর্শের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো—(ক) কাব্যের ভাষা অনাবশ্যক ভূষণমণ্ডিত হবে না। ভাবের রূপকল্প তৈরিতে যে শব্দগুলো অপরিহার্য তার অতিরিক্ত কোনো শব্দপ্রয়োগ চলবে না। লৌকিক জীবনে যে

www.pathagar.com

ভাষা ব্যবহার হয়, তার প্রয়োগ অনাবশ্যক নয়। (খ) ভাবকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করতে নতুন ছন্দের প্রবর্তন আবশ্যক। এই ছন্দের গুণে প্রচলিত ছন্দোরীতি আচ্ছন্ন হয়ে ভাব সঙ্গীতের মাধুর্যে অভিষিক্ত হবে। (গ) বিষয়বস্তু নির্বাচনে কবির অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। (ঘ) কাব্যে ভাবের অস্পষ্টতা বা অনির্দেশ্যতা থাকবে না। (ঙ) ভাবের সংহত রূপসৃষ্টি করতে হবে। এই শর্তগুলো পূরণ করতে পারলেই কবিতায় ইমেজিজ্‌ম সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। আ.ই

ইম্প্রেশনিজম্‌ : যে শিল্পকলায় প্রকৃতির দৃশ্যপট ও তার বর্ণিতব্য বিষয়ের পারিপার্শ্বিকতাকে, বিশেষ করে প্রকৃতির বর্ণ ও আলোর যাথার্থ্যকে যথাযথভাবে ধরে রাখা হয়, তাকেই সাধারণভাবে ইম্প্রেশনিষ্ট আর্ট রূপে অভিহিত করা হয়। ভোরে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যা অথবা রাত্রিতে আলোর যে বিচিত্র লীলাখেলা দেখা যায়, ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্পীরা তার স্বরূপ উপলব্ধি করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাকে ফুটিয়ে তোলেন তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে। যে বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকৃতি তার রঙ বদলায়,—নরম সকাল, খরদীপ্ত দুপুর, ধূসর বিকেল, কিংবা সন্ধ্যার স্তিমিত আভার অপসৃয়মান যে রূপ অথবা বসন্তের পুষ্পিত ঔজ্জ্বল্য, শীতের রুক্ষতা কিংবা হেমন্তের হলদে বিবর্ণতা, এসবই ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্প-সাহিত্যে, যেমন আছে ঠিক তেমনি করে, রূপ লাভ করে। চিত্রশিল্পের মতো সাহিত্যেও বিশেষ করে কবিতায় এমনি ইম্প্রেশনিজমের ছাপ দেখা যায়। আ.ই

ইয়াওমুল হিসাব : হিসাব নিকাশের দিন বা শেষ বিচারের দিন। পবিত্র কুরআনে কিয়ামত বা পুনরুত্থানের দিবসকে হিসাব নিকাশের দিনও বলা হয়েছে। এইদিন আল্লাহ মানুষের পার্থিব জীবনে কৃতকর্মের হিসাব করে তাকে পুরস্কৃত কিংবা শাস্তিদান করবেন। ইসলামি বিশ্বাস মতে, পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, সেগুলির সবই তার আমল-নামায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। শেষ বিচারের দিন তা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। উক্ত আমলনামাই মানুষের ভালমন্দ কাজের সাক্ষ্য দেবে এবং সে অনুযায়ী তার পারলৌকিক ভাগ্য নির্ধারিত হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, অনু পরিমাণ ভাল কাজের জন্যও মানুষকে যেমন তার প্রতিদান দেয়া হবে, তেমনি অনু পরিমাণ মন্দ কাজের জন্যও তাকে প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এই সূক্ষ্ম হিসাবের জন্যই কিয়ামতের দিবসকে হিসাব নিকাশের দিন বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল কিয়ামত', ইয়াওমুল আখির', 'আখিরাত' ইত্যাদিও বলা হয়েছে এবং বহুস্থানে এর উল্লেখ আছে। এই দিনটির উপর বিশ্বাস স্থাপন ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। আ.সৈ.গো.দ.

ইয়াকুব, হযরত : পবিত্র কুরআনোক্ত পয়গম্বর। বাইবেলে তাঁকে জেকব বলা হয়েছে। তিনি হযরত ইব্রাহীমের প্রপৌত্র ছিলেন। ইব্রাহীমের পুত্র হযরত ইসমাঈল, ইসমাঈলের পুত্র হযরত ইসহাক এবং ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুব। কুরআনের সুরা ইউসুফে তাঁর উল্লেখ আছে। তাঁর বারোজন পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ইউসুফ তাঁর অত্যধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইউসুফের অন্য ভায়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে এক নির্জন প্রান্তরে নিয়ে এক কূপে নিক্ষেপ করে। তাঁরা ঘরে ফিরে এসে হযরত ইয়াকুবকে জানান যে ইউসুফকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। প্রিয়তম পুত্রের জন্য শোকাতুর পিতা কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান। পরে ইউসুফের জামা তাঁর চোখে স্পর্শ করা মাত্র তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। ওদিকে একদল বণিক কূপ থেকে ইউসুফকে উদ্ধার করে তাদের সঙ্গে মিসরে নিয়ে যায় এবং সেখানকার এক ধনী ব্যক্তির নিকট তাঁকে বিক্রি করে দেয়। ধীরে ধীরে আপন প্রতিভাবলে ইউসুফ সে দেশের উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। কিছুকাল পর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে হযরত ইয়াকুব ও তাঁর পুত্রগণ খাদ্য লাভের আশায়

www.pathagar.com

মিসরে গেলে আশি বছর পরে পিতা পুত্রের পুনর্মিলন ঘটে। হযরত ইয়াকুবের জন্ম সম্পর্কে অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। মাতৃগর্ভে নাকি ইয়াকুব ও তাঁর জমজ ভাই ঈসাউ–এর মধ্যে ঝগড়া হয় কে আগে ভূমিষ্ঠ হবেন। ইয়াকুব জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মাতাকে বাঁচানোর জন্যে পরে ভূমিষ্ঠ হন। কাহিনীতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রথমা স্ত্রী নীয়ার মৃত্যুর পরেই তিনি তাঁর বোন রাহীলকে (বাইবেলের মতে রেচেল) বিয়ে করেন। আ.সৈ.গো.দ.

ইয়াযীদ : উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার পুত্র এবং দ্বিতীয় উমাইয়া খলিফা। ইয়াযীদের মাতা মাইসূন ছিলেন বেদুঈন গোত্রীয় জেকোবি খ্রিস্টান। মুয়াবিয়া তাঁর জীবদ্দশায়ই ৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে পুত্র ইয়াযীদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ইয়াযীদ খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হলে জনগণের নির্বাচিত খিলাফত—প্রজাতন্ত্র বংশগত রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইমাম হুসাইন তাঁকে খলিফারূপে স্বীকার করতে অসম্মত হন। কুফায় হযরত আলীর বহু সমর্থক ছিল। তাঁরা হুসাইনকে খলিফা ঘোষণা করে তাঁকে কুফায় আমন্ত্রণ জানান। হুসাইন প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় কিছু সংখ্যক অনুগামীসহ সপরিবারে কুফা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োজিত কুফার গভর্নর উবায়দুল্লাহর বিরোধিতার ফলে তিনি কুফার পরিবর্তে কারবালা প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হন। সেখানে ক্ষুধায় কাতর হুসাইনের সহচর ও আত্মীয়দের সঙ্গে ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। তাতে বহু আত্মীয় ও অনুগামীসহ হুসাইন নির্মমভাবে নিহত হন। কারবালার এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ইয়াযীদের শাসনকালের কলঙ্কজনক ঘটনা। এই শোকাবহ ঘটনায় শিয়া সম্প্রদায় সহ বিশ্বের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যথিত হয় এবং এর পর থেকে ইসলামে উৎকট সাম্প্রদায়িকতার বিষ সংক্রামিত হয়। হুসাইনের শহীদ হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর মক্কা মদীনায় ইয়াযীদের প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা হিসেবে আনুগত্য লাভ করলে ইয়াযীদ মদীনায় সিরীয় সেনাবাহিনী পাঠান। ৬৮২ খ্রিস্টাব্দে এই সেনাবাহিনী তিনদিন ধরে পবিত্র নগরী ধ্বংস করে এবং পরের বছর মক্কায় হানা দেয়। আবদুল্লাহ অবরুদ্ধ অবস্থায় ৬৪ দিন পবিত্র নগরী রক্ষা করেন ; কিন্তু হানাদার বাহিনীর আঘাতে কা'বা শরীফের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ১০ নভেম্বর ইয়াযীদ মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান। মাত্র সাড়ে তিন বছরের খিলাফতকালে ইয়াযীদ রসূলুল্লাহর পরিবারের হত্যাকারী এবং পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনার ধ্বংসকারী হিসেবেই ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কাব্যচর্চা ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এছাড়া তাঁর রাজত্ব–কালে তিনি এমন কোনো ভালো কাজ করেননি, যার জন্যে তাঁর সামান্য প্রশংসাও করা যায়। তাঁর সময়ে ইসলামের কোনো বিস্তার ঘটেনি। আ.সৈ.গো.দ.

ইয়াসিন্তো বেনাভেন্তে : স্প্যানিশ ভাষার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক। তিনি ১৮৬৬ সালে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক। বেনাভেন্তে কিছুকাল আইন অধ্যয়ন করেন, কিন্তু লেখায় আত্মনিয়োগ করে আইন পড়া ছেড়ে দেন। কবিতা এবং গল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন। পরে নাটক লিখতে থাকেন। ১৮৯৩ সালে 'দি আদার্স নেস্ট' নাটকটি তাঁকে প্রভূত সাফল্য এনে দেয়। তাঁর নাটকের প্রধান গুণ বলিষ্ঠ সংলাপরীতি, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের শাণিত দীপ্তি এবং বাস্তবতাবোধের তীব্রতা। বেনাভেন্তের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'দি বোন্ডস অফ ইন্টারেস্ট' বা শেষরক্ষা। অন্যান্য রচনা– পিপল উই নো, সাটারডে নাইট। ১৯১৩ সালে বেনাভেন্তে স্প্যানিশ একাডেমীর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কেবল সাহিত্যিকই ছিলেন না, স্পেনের শিক্ষা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর

www.pathagar.com

অবদান আছে। তিনি আজীবন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা ও মিলনের বাণী শুনিয়েছেন। ১৯২২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে পরলোক গমন করেন। ম.ই.

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা : এশিয়ার সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের পর ১৯৬৮ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারের গৌরব লাভ করেন। ১৮৯৯ সালের জুন মাসে তাঁর জন্ম। শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তখন শিশু কাওয়াবাতা প্রতিপালিত হন দাদা এবং দাদীর স্নেহচ্ছায়ায়। পনের বছর বয়সে পিতামহের মৃত্যু হলে কাওয়াবাতা গভীর বেদনায় সেই মৃত্যুদৃশ্য অবলোকন করেন। তাঁর তখনকার অনুভূতিকে তিনি ধরে রেখেছেন তাঁর রচিত দিনলিপি সাহিত্যে। ১৯২৫ সালে তাঁর সেই দিনলিপি 'য়ুরোকুসাইলোনিকি' নামে প্রকাশিত হয়। কাওয়াবাতা চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি হলেন সাহিত্যিক। ১৯২০ সালে তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হন। কিন্তু পরের বছর তিনি জাপানি সাহিত্য নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন কয়েকটি পত্র পত্রিকায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তখন তিনি 'সিনসিচো' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ১৯২৪ সালে স্নাতক হওয়ার পর তিনি আর একটি প্রগতি পন্থী সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। যাতে জাপানি সাহিত্যের নতুন ভাবধারার প্রস্রবণ বয়। কাওয়াবাতার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি তাঁর উপন্যাস 'Yakiguni" (Snow Country)। গ্রন্থখানি সুইডিশ ভাষায় অনূদিত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সেম্বাজুরু, ইজু নো ওদেরিকো ও ইয়ামা না ওতো। দেশের সেরা সাহিত্যিক হিসাবে ১৯৪৪ সালে কাওয়াবাতা 'কানকিকুচি' পুরস্কার পান। ১৯৫২ সালে জাপানের শিল্প সাহিত্য আকাদেমি তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৫৯ সালে জার্মানি থেকে তিনি 'গ্যেটে' পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর বই বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ম.ই.

ইয়োনা : নাটক। লিখেছেন রোমানিয়ার মারিন সোরেস্কু। বাংলায় অনুবাদ করেছেন অমিতা বসু। বাইবেলের গল্পে নবী ইয়োনাকে সমুদ্রের এক পারে তিমি মাছে গিলে ফেলে, আরেক পারে গিয়ে তিনি সেই মাছের হাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। নাটকের আখ্যানভাগের শুরু এই উপাখ্যান থেকে। নায়ক ইয়োনা এই নাটকে জেলে। তার চিত্তভূমিই রঙ্গভূমি। দিনের পর দিন সে জাল ফেলে কিন্তু মাছ একটিও ওঠে না। জালে মাছ পড়ুক আর নাই পড়ুক, সমুদ্রের তীরে সে আসে একাকীত্বের সন্ধানে। নির্জনে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য। সবাই তো নিজের নিজের কর্মের বন্ধনে বাঁধা। এক এক জনের কাছে সংসার এক এক মূর্তি ধরে আসে। ইয়োনার কাছে সে আসে মাছের রূপ ধরে। 'ইয়ো' প্রাচীন রোমানিয়ান ভাষার শব্দ যার অর্থ 'আমি'। এর থেকে নাটকের পরিকল্পনা করেছেন লেখক। এই নাটকের মূল সুর অদ্ভুত রস। লেখকের স্বভাবসিদ্ধ বক্রোক্তি ও শব্দের জাদুতে নাটকটি অপূর্ব। কাব্যসৌন্দর্য এর পরতে পরতে। নাটকটি প্রথম রোমানিয়া ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে, সাপ্তাহিক 'লুচেয়াফ্যারুল' পত্রিকার ১১ জানুয়ারি সংখ্যায়। ওই বছর বুখারেস্টের একটি প্রকাশনা-ভবন থেকে বই হয়ে বের হয়। লেখকের বয়স তখন ৩২। তখনো পর্যন্ত রোমানিয়ার সাহিত্যে সোরেস্কু ছিলেন চমক লাগানো ভাবের আর ঝলক দেওয়া কথার ফুলঝুরির কবি। চপল স্ফুলিঙ্গের অন্তরালে যে আত্মজিজ্ঞাসার অগ্নিকাণ্ড চলছিলো, তার প্রথম পরিচয় বহন করে আনে 'ইয়োনা'। প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১। প্রকাশকাল : ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : পূর্বাভাসসহ ৩৬, মূল্য ১০ রুপি। বি.ব.

ইরাবান : মহাভারতোক্ত চরিত্র বিশেষ। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের অন্যতম পুত্র, নাগরাজ

কৌরব্যের কন্যা উলূপীর গর্ভে জন্মে। কথিত আছে, অর্জুনের বনবাসকালে একদিন গঙ্গা- স্নানে নামলে উলূপীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাতের ফলে তাঁদের মধ্যে বিবাহ হয় ও মিলন ঘটে। তাঁদের এই মিলনের ফল ইরাবান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইরাবান শকুনির ছয় ভাই এবং কৌরব পক্ষের বহু সৈন্য ধ্বংস করে অবশেষে অলম্বুষ নামক এক রাক্ষসের হাতে তিনি নিহত হন। ম.চৌ.

ইল/ইলা : হিন্দু পুরাণোক্ত চরিত্রবিশেষ। রামায়ণে ও বিভিন্ন পুরাণে রাজা ইলের কৌতুককর কাহিনীর বর্ণনা আছে। রামায়ণের বর্ণনামতে বাহ্লীক দেশের রাজা কর্দমের পুত্র ইল পরম ধার্মিক ছিলেন। মৃগয়ায় গিয়ে তিনি একদা অকস্মাৎ কার্তিকেয়ের জন্মস্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং তথায় মহাদেব ও উমাকে বিহাররত অবস্থায় দেখতে পান। মহাদেবের ইচ্ছাক্রমে সেখানকার সমস্ত পুরুষ পশু বা প্রাণী স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়। রাজা ইলও নারীতে রূপান্তরিত হলেন। এই আকস্মিক পরিবর্তনে ভীত নরপতি মহাদেবের শরণাপন্ন হলে তিনি কিম্পুরুষত্ব লাভ করেন। এর অর্থ রাজা ইল একমাস সুন্দরী স্ত্রীরূপে এবং একমাস পুরুষরূপে থাকবেন। এভাবে পালাক্রমে একবার স্ত্রীরূপে থাকাকালে চন্দ্রের পুত্র বুধের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। এর ফলে নারীরূপী ইলের গর্ভে পুরুরবা নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রই ছিলেন বিখ্যাত রঘুবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চ্যবন, বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষির পরামর্শে মহাদেবকে খুশি করার জন্য ইল অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে স্ত্রীরূপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। মৎস্যপুরাণে বর্ণিত কাহিনীতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। এখানে ইলের পরিচয় দেয়া হয়েছে বৈবস্বত মনুর শ্রেষ্ঠ পুত্র হিসেবে। রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী ইল মৃগয়ায় নয়, দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিলেন। নারীরূপে তিনি ইলা নামে পরিচিতা হন এবং তাঁর পূর্বস্মৃতি সম্পূর্ণ লোপ পায়। ইলারূপে অবস্থানের সময় চন্দ্রের পুত্রবধূ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁদের মিলনের ফলে পুরুরবার জন্ম হয়। পুরুষ অবস্থায় ইলের উৎকল, গয় ও হরিভাশ্ব নামে তিনটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর নামানুসারে তাঁর বর্ষ 'ইলাবৃতবর্ষ' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। আ.রা.

ইলছোবা : রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ। এ গ্রন্থে লেখক তাঁর স্থানীয় ইতিবৃত্তিমূলক ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। ইলছোবার পুরাকীর্তি লেখককে অনুপ্রাণিত করে। ভগবতী তলায় বিশ্রামরত জনৈক ব্রাহ্মণকে ভগবতী দর্শন দিয়ে বর্তমান জীর্ণদশাপ্রাপ্ত ইলছোবার পুনরাবৃত্তি তাকে শোনান। রাজা গণেশের আমলে যশোরনিবাসী লক্ষ্মীকান্ত এক সন্ন্যাসীর কাছে রূপা থেকে সোনা তৈরির অলৌকিক কৌশল শিখে। ইতোমধ্যে লক্ষ্মীকান্তের পুত্র হরিদাস করিম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়। লক্ষ্মীকান্ত কন্যা ইলবিলাকে নিয়ে ঝিটকীপোতা চলে আসে। একদিন সেই সন্ন্যাসী লক্ষ্মীকান্তকে গৌড়রাজ সমীপে নিয়ে আসেন। রাজা গণেশ তাঁর সৌভাগ্যের কথা শুনে তাকে রাজপদ দেন। এদিকে লক্ষ্মীকান্তের কন্যা ইলবিলা রাজা গণেশের পুত্র যদুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়। পুত্র হরিদাস উজির রহিম খাঁর কন্যা সোনাবিবির প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। এরপর লক্ষ্মীকান্ত স্বগ্রামে এসে ইলবিলার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। দেবপল্লীর রাজা যখন বিয়ের বাসরে উপস্থিত হন তখন যুবরাজ ছদ্মবেশে এসে ইলবিলাকে হরণ করে নিয়ে যান এবং পরে তাকে বিয়ে করেন। দেবপল্লীর রাজা দেবপাল অগত্যা মালতী ও মাধবীকে বিয়ে করেন। যেখানে ইলবিলার বিবাহ-মণ্ডপ তৈরি হয়েছিলো তার নাম রাখা হয় ইলাসভা বা ইলছোবা। ইলছোবা নামের পশ্চাতে এই ঘটনার কতটুকু সাক্ষাৎ সম্পর্ক রয়েছে তা জানা না গেলেও রামগতি তাঁর বিবৃত ঘটনার সমন্বয় সাধনে সফলকাম হয়েছেন। তবে

ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠার চেয়ে কাহিনীতে রোমান্টিকতা আনয়নই ছিলো রামগতির বিশেষ উদ্দেশ্য। মু.আ.জ.

ইলতুৎমিশ, শামসুদ্দীন : দিল্লির দাস রাজবংশের তৃতীয় সুলতান। তুর্কিস্থানের ইলবেরী উপজাতীয় বংশে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি সুলতান কুতবুদ্দীন আইবেকের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে কুতবুদ্দীন পরে তাঁর সঙ্গে আপন কন্যার বিয়ে দেন, তাঁকে বদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং 'আমিরুল উমরা' পদে উন্নীত করেন। ১২১১ সালে কুতবুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহ্ সুলতান হন ; কিন্তু তিনি অকর্মণ্য ও বিলাসী ছিলেন বলে দিল্লির আমীরগণ ইলতুৎমিশকে দিল্লির সিংহাসন গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। ইলতুৎমিশ ঐ সময় বদায়ুন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্র তিনি সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং দিল্লীর সন্নিকটে এক যুদ্ধে আরাম শাহকে পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসনে বসেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দিল্লির অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ও বহিরাগত আক্রমণগুলিকে প্রতিহত করেন। বদায়ুন, বারানসী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর আয়ত্তে আসে। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমিত হয়। ১২২৬ সালে তিনি রনথম্ভোর ও সিন্ধুদেশ এবং ১২৩২ সালে গোয়ালিয়র পুনরাধিকার করেন। ১২৩৪ সালে মালব আক্রমণ করে তিনি উজ্জয়িনী নগর বিধ্বস্ত করেন। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের মূর্তিটি তিনি দিল্লিতে নিয়ে আসেন। আনুমানিক ১২২৯ সালে বাগদাদের আব্বাসী সুলতান আল-মুসতান্সিরের (১২২৬-৪২ খ্রিঃ) নিকট থেকে তিনি সম্মানসূচক আবা (পোশাক) এবং 'সুলতান-ই-আযম' খিতাব লাভ করেন। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে ভারতের মুসলমান শাসন বিধিসংহত প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ইলতুৎমিশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বর্ধিত হয়। ইলতুৎমিশ শিল্পানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, ধর্মপরায়ণ ও উদারচেতা শাসক ছিলেন। একাধিক কবি ও মনীষী তাঁর সভা অলংকৃত করতেন। ইসলামি শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি দিল্লি ও মুলতানে দু'টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লির অসম্পূর্ণ কুতবমিনার ও আজমীরের 'আঢ়াই দিন কা ঝোপড়া' মসজিদের কাজ তাঁর দ্বারাই সম্পূর্ণ হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে কুতবুদ্দীন যে মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, ইলতুৎমিশের শাসনামলে তা সুদৃঢ় হয়। ১২৩৬ সালের ২৯ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। আ.ন.ম.ব.র.

ইলবিলা : রামায়ণোক্ত যক্ষরাজ কুবেরের মা ও বিশ্রবা মুনির পত্নী। ইলবিলার পিতা ছিলেন রাজা তৃণবিন্দু এবং মা অপ্সরা অলম্বুষা। তাঁর গর্ভজাত পুত্র বলে কুবেরের অপর নাম ঐলবিল। কোথাও ইলবিলাকে পুলস্তের স্ত্রী এবং বিশ্রবা মুনির মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ম. চৌ.

ইলশে গুঁড়ি : অরুণাভ সরকারের শিশুতোষ গ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা করেছেন রণজিৎ নিয়োগী। মূল্য : পাঁচ টাকা। গ্রন্থটিতে মোট ২৫টি ছড়া সংকলিত হয়েছে। তবে 'ইলশে গুঁড়ি' নামের কোনো কবিতা নেই। গ্রন্থটিতে প্রতিলেখন (প্রতিলেখন ১, ২, ৩) নামের একটি কবিতা আছে। লেখক রবীন্দ্রনাথ, যতিন্দ্রমোহন বাগচী, কাজী নজরুল ইসলামের ছড়া এবং কবিতার অনুকরণে ছড়া রচনা করেছেন। যেমন : 'আমাদের ছোট নদী/চলে বাঁকে বাঁকে/শহীদের লাশ তাতে/ভাসে ঝাঁকে-ঝাঁকে।' শিশুতোষ এই গ্রন্থটিতে কুমকুম এবং রিমি নামের ছোট্ট মেয়ে সম্পর্কে ছড়া রয়েছে ; রয়েছে টুপটাপ বৃষ্টির ছড়া। ছোট্ট শিশুকে নিয়ে মাতৃহৃদয়ের আকুতিভরা ছড়া 'অভ্যুদয়' শিশুদের ভালো লাগবে। 'আজব' নামের ছড়াটি শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক। সবশেষ ছড়া 'আমার দেশ'। এই ছড়াটিতে স্বদেশভূমির প্রতি অপরিসীম

www.pathagar.com

মমতা বিধৃত হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি পড়লে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা আদল খুঁজে পাওয়া যায়। সৈ.আ.জা.

ইলা : বৈবস্বত মনুর কন্যা, বুধের পত্নী ও পুরূরবার মা। মনু মিত্রাবরুণের উপাসনা করে একটি পুত্র সন্তান প্রার্থনা করেন। কিন্তু উপাসনার ত্রুটিবশত পুত্রের পরিবর্তে কন্যা হয়। এ কন্যার নামই ইলা। তিনি পরে বিষ্ণুর বরে পুরুষত্ব লাভ করে 'সুদ্যুম্ন' নামে খ্যাত হন। পরে অভিশপ্ত কুমার বনে (কার্তিকেয়ের বিহার বনে) প্রবেশ করে পুনরায় স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন। তাঁর পুরোহিত বশিষ্ঠ শিবের উপাসনা করলে তিনি একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ হয়ে থাকার বর লাভ করেন। ম.চৌ.

ইলাবৃতবর্ষ/ ঐলাবৃতবর্ষ : জম্বুদ্বীপের অংশবিশেষ ; এর নয় বর্ষের চতুর্থ বর্ষ। জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীজের নয় পুত্র ছিলো। তাঁরা হলেন—নাভি, কিংপুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরন্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমান। রাজা জম্বুদ্বীপকে নয় ভাগে ভাগ করে তাঁর নয় পুত্রকে তা দান করেন। তাঁদের প্রত্যেকের অধিকৃত ভূখণ্ড তাঁদের নিজেদের নামানুসারে 'বর্ষ' বলে খ্যাত হয়। যেমন--নাভিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরন্ময়বর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কেতুমানবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষকে ঐলাবৃতবর্ষও বলা হয়। এটি জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত। এর উত্তরে নীল পর্বত, দক্ষিণে নিষধ পর্বত, পশ্চিমে মাল্যবান পর্বত এবং পূর্বে গন্ধমাদন পর্বত। ইলাবৃতবর্ষ মেরু পর্বত (সুমেরু) বেষ্টন করে আছে। ম.চৌ.

ইলা মিত্র : নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় মালেকা বেগম রচিত ইলামিত্রের সংগ্রামী জীবন কাহিনী। 'ইলা মিত্র' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে প্যাপিরাস প্রকাশনী থেকে। তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী নেত্রী ইলামিত্র ১৯৫০ সালে বন্দি হয়ে রাজশাহী জেলে পুলিশী নির্যাতন ও বর্বর অত্যাচারের শিকার হন। একাদিক্রমে চার বছর রাজশাহী ও ঢাকা জেলে বন্দি জীবন কাটান। ১৯৫৪ সালে ভারতে চিকিৎসার জন্য প্যারলে মুক্তিপান। তিনি ভারতে স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করেন ও শিক্ষাবিদের পেশা গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে রাজনীতিতে যোগ দেন ও নির্বাচন করেন। জয়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য হন। অব্যাহতভাবে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে ইলা মিত্র (জন্ম ১৯২৫) আজও জন-নন্দিত। সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে তিনি উৎসাহী। অনুবাদ করেছেন কবি নাজিম হিকমতের 'জেলখানার চিঠি' ; 'হিরোশিমার মেয়ে', মনে প্রাণে-২ খণ্ড, লেনিনের জীবনী ও রাশিয়ার ছোট গল্প। 'হিরোশিমার মেয়ে' বইটির জন্য সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার পেয়েছেন। 'ইলা মিত্র'-কে নিয়ে গল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখা হয়েছে। শিল্পী মুর্তাজা বশির ইলা মিত্রের ছবি এঁকেছেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত কবিতা 'কেন বোন পারুল ডাকো রে'?, গোলাম কুদ্দুস রচিত 'ইলা মিত্র' কবিতা, শহীদ সাবের রচিত 'শোকার্ত মায়ের প্রতি', কথা সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ফুল ফোটার গল্প' ও 'সূর্যমুখী', কথা সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কয়েকটি কমলালেবু', ফয়েজ আহমেদ রচিত 'নাচোল সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ ও ইলামিত্র', নুরুন্নবী চৌধুরী রচিত 'আমার দিদিকে' এবং কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রচিত 'কাঁটাতারের প্রজাপতি' ইত্যাদি লেখায় ইলামিত্রের সংগ্রামী জীবন ও চরিত্রের মাধুর্য ফুটে উঠেছে। ইলা মিত্র সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিল্পীদের আগ্রহ ও সাহিত্যের উপাদানরূপে মূল্য দেয়ার সাক্ষ্য বহন করছে। অ.ন.

ইলিয়ট, টি. এস : যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুই মিসৌরিতে ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি রোমান্টিক

www.pathagar.com

ভাবধারার বিরোধী মতবাদ, বিভিন্ন দর্শন ও মরমী চিন্তার দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯১৪ সালে তিনি য়ুরোপ হয়ে ইংল্যান্ডে আসেন ও অক্সফোর্ডে পড়াশোনা শুরু করেন। কিছুদিন অধ্যাপনা ও ব্যাঙ্কে কাজ করার পর বিখ্যাত 'ফেবার এণ্ড ফেবার' প্রকাশনীর সঙ্গে যুক্ত হন। লন্ডনেই বিভিন্ন সাময়িকীতে ইলিয়টের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'দি সন অব জে. এলফ্রেড প্রুফ্রক' (The son of J. Alfred Prufrock) ১৯১৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত কবিতা 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' (Waste Land) প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়টের (Eliot) নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়। তাঁর সমালোচনামূলক নিবন্ধগুলি চিন্তার জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করে এবং সেগুলি তরুণ লেখকদের জন্য হয়ে উঠে পথের দিশা। ইলিয়ট বিশ শতকের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী কবি হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ ও নাটকের মধ্যে 'স্যাক্রেড উড' (Sacred wood), 'হোমেজ টু ড্রাইডেন' (Homage to Dryden), 'সিলেকটেড এ্যাসেজ' (Selected essays) এবং 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' (Murder in the Cathedral), 'ফ্যামিলি রিয়ুনিয়ন' (Family Reunion), 'দি ককটেল পার্টি' (The Cocktail Party) প্রধান। ১৯৪৮ সালে তিনি 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ম. ই

ইলিয়ট, জর্জ (মেরিয়ান ইভান্স) : ইংল্যান্ডের ওয়ারউইক শায়ারে ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই মহিলা ঔপন্যাসিক মেরিয়ান ইভান্স জর্জ ইলিয়ট ছদ্মনামেই লিখতেন এবং এই নামেই প্রখ্যাত। শিক্ষা শেষে যৌবনকালেই তিনি য়ুরোপ পরিভ্রমণ করেন এবং সেখান থেকে ফিরে 'ওয়েস্ট মিনিস্টার' সাময়িকীর সম্পাদনা-বিভাগে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অ্যাডাম বিডি'। ১৮৬০ সালে তিনি ইতালীতে যান এবং সেখান থেকে তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রোমোলার' উপাদান সংগ্রহ করেন। এই উপন্যাসের জন্য ইলিয়টকে সাত হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। সাহিত্য-পুরস্কারের জন্য এত বড় অঙ্ক সেকালে অভাবনীয় ছিলো। সেসময়ের বিখ্যাত লেখক টমাস কার্লাইল, হার্বার্ট স্পেন্সর ও হেনরী লিউসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গাঢ় হয়েছিলো। হেনরী লিউসের সঙ্গে সে পরিচয় বিবাহ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলো, যদিও তা আইন-সম্মত বলে বিবেচিত হয়নি। জর্জ ইলিয়টের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'রোমোলা' (Romola) ও 'অ্যাডাম বিডি' (Adam Bede) সহ 'দি মিল অন দি ফ্লস' (The Mill on the Floss) ও 'সাইলাস মার্নার' (Silas Marner) প্রধান। সমালোচকগণ এই মহিলাকে ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী ঔপন্যাসিক রূপে বিবেচনা করেন। তিনি ১৮৮০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ম. ই

ইলিয়ড : হোমার রচিত মহাকাব্য। ট্রয়ের যুদ্ধে একিলিসের হাতে হেক্টর মৃত্যুবরণ করেন। পুত্রশোকে বিধ্বস্ত পিতা ট্রয়রাজ প্রায়াম শেষকৃত্যের জন্যে একিলিসের শিবিরে পৌঁছুলে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। হেক্টরের শেষকৃত্যের পর ওডিসাসের পরামর্শ অনুযায়ী কাঠের একটি প্রকাণ্ড ঘোড়া ট্রয় নগরের দেয়ালের কাছে রেখে একিয়ানরা তাদের জাহাজসহ পার্শ্ববর্তী দ্বীপে আত্মগোপন করেন। ট্রোজানরা মনে করেন গ্রিক সৈন্যরা পালিয়ে গেছেন। ফলে ট্রয় নগরীতে নেমে আসে আনন্দের বন্যা। অতি উৎসাহী ট্রোজানরা ঘোড়াটিকে টানতে টানতে ট্রয় নগরের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসেন। রাতে ঘোড়া থেকে বের হয়ে গ্রিক সৈন্যরা অতর্কিত আক্রমণ করে বিশ্রামরত ট্রোজানদের ওপর। সাথে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে আত্মগোপনকারী অন্য গ্রিক সৈন্যরাও এসে যোগ দেন। গ্রিকদের প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন ট্রোজানরা এবং শোচনীয় পরাজয়ের ভেতর দিয়ে ধ্বংস হয়ে যায় ট্রয় নগরী। এই

www.pathagar.com

যুদ্ধে জয় পরাজয়ের ভেতর দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে 'ইলিয়ড' আখ্যান। হোমার রচিত বিশ্ব সাহিত্যে সমাদৃত এই ধ্রুপদী মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদ করেছেন, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। E.V.RIEU-এর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে বাংলায় অনূদিত এই গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে জুলাই ১৯৬৭ সালে। উল্লেখ্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এটিই ছিল বাংলা ভাষায় 'ইলিয়ড'-এর প্রথম অনুবাদ। অনূদিত এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অনুবাদক হোমারের বিভিন্ন প্রকৃতির উপমা, রূপক ও বিশেষণ বাংলাতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে রূপান্তরিত করেছেন। তার ফলে হোমারের পৃথিবীকে আমরা আমাদের পরিমণ্ডলের মধ্যে নতুন করে অবলোকন করতে পারি।' গ্রন্থটি বর্তমানে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। **মা. আ.**

ইলিয়াস : বিশিষ্ট পয়গম্বর। তিনি সিরিয়ায় প্রেরিত হন। সেখানকার বালবাক শহরের রাজা তাঁর ভক্ত ছিলেন। কিন্তু রানী এবং অন্যান্য লোক তাঁর বিরোধিতা করে। তাদেরকে সত্যপথে পরিচালিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে তাদের জন্য তিনি বদ-দোয়া করেন। এর ফলে দেশে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন হযরত ইলিয়াস তাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন যে তাঁর উপদেশ মেনে চললে তিনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবেন। কিন্তু এবারও তারা তাঁর উপদেশ মানতে অস্বীকৃত হলে হযরত ইলিয়াস পুনরায় তাদের জন্য বদ-দোয়া করেন। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হয়। এক ধ্বংসাত্মক বন্যার কবলে পড়ে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র হুকুমে কেবল হযরত ইলিয়াস রক্ষা পান। বাইবেলে হযরত ইলিয়াসকে 'ঈলাইজা' বা 'ঈলাইয়াস' বলা হয়েছে। **আ.ন.ম.ব.র.**

ইল্বল : হিন্দু পুরাণোক্ত ও প্রহ্লাদ বংশজাত জনৈক ধনাঢ্য রাক্ষস। বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও এক সিংহিকার গর্ভে জন্ম। ইল্বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে একটি ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ তার প্রার্থিত বর প্রদান না করায় এ দু'ভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণবিনাশে কৃতসংকল্প হয়। তারা এমনই মায়াবী ছিলো যে ইল্বল ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সংস্কৃত বাক্য বলে শ্রাদ্ধের ছলে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে আনত। বাতাপি মেষরূপ ধারণ করত এবং ইল্বল তাকে ব্রাহ্মণদের সম্মুখে কেটে তার মাংস রেঁধে তাঁদের খাওয়াতো। আহার পর্ব সমাধা হলে ইল্বল বাতাপির নাম ধরে আহ্বান করা মাত্র সে ব্রাহ্মণদের উদর ভেদ করে বেরিয়ে আসত। এভাবে দু'ভাই বহু ব্রাহ্মণ হত্যা করে। মহর্ষি অগস্ত্য বিদর্ভ রাজকন্যা লোপামুদ্রাকে বিয়ে করার পর একদিন তার সঙ্গম প্রার্থনা করলে লোপামুদ্রা স্বামীর কাছে অলঙ্কার ও মূল্যবান আভরণাদি দাবি করেন। স্ত্রীর দাবি পূরণ করার মতো অর্থ অগস্ত্যের ছিলো না। তাই তিনি স্ত্রীর দাবি পূরণের জন্যে অর্থের অন্বেষণে ধনাঢ্য রাক্ষস ইল্বলের নিকট উপস্থিত হন। অতিথি সৎকারের উদ্দেশ্যে বাতাপিকে পূর্ববৎ মেষে রূপান্তরিত করে ইল্বল তার মাংস অগস্ত্যকে আহার করতে দেয়। অগস্ত্য তার সমস্ত মাংস একাই আহার করে সঙ্গে সঙ্গে তা জীর্ণ করে ফেলেন। ইল্বল পূর্বের ন্যায় বাতাপির নাম ধরে আহ্বান করলে সমুদ্র শোষক অগস্ত্য বায়ু নিঃসরণ করে সহাস্যে বলেন যে, বাতাপি তাঁর উদরে জীর্ণ হয়ে গেছে। ইল্বল এতে বিষণ্ন ও ভীত হয়ে অগস্ত্যের মনোভাব জানতে চাইলে অগস্ত্য তাঁর বাঞ্ছিত অর্থ কামনা করেন। ইল্বল তখন অগস্ত্যকে তাঁর বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করে বিদায় দেন। মতান্তরে ক্রুদ্ধ ইল্বল অগস্ত্যকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর কোপানলে ভস্মীভূত হন। **ম. চৌ.**

www.pathagar.com

ইল্লিবিল্লি : হাবীবুল্লাহ সিরাজী রচিত ছড়ার বই। প্রকাশক : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৮১। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন সিরাজুল হক। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মূল্য : ৩.৭৫। ইল্লিবিল্লি বইটিতে মোট ১৫টি ছড়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিশু কিশোরদের চেনা-জানা জগতের নানা মজার মজার বিষয় ছড়াগুলোর মূল উপজীব্য। সহজ-সরল ছন্দ ও কাব্যিক উপস্থাপনা ছড়াগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সম্পূর্ণ চার রঙে মুদ্রিত ছবিগুলো বইটিকে দিয়েছে নান্দনিক ব্যঞ্জনা। সু. ব.

ইশ্‌ক : অর্থ প্রেম বা প্রেমাবেগ। যদিও শব্দটি পবিত্র কুরআনে নেই, আরবি সাহিত্য ও কবিতায় এর গুরুত্ব বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধিজীবী, ধর্মবিদ, দরবেশ এবং আধ্যাত্মিক সুফি মহলে এ শব্দটি হৃদয়ের অনুভূতি, আবেগ সম্বলিত মানবিক সম্পর্ক বা মরমী সাধকদের ঐশীপ্রেম (ইশ্‌ক্-এ-ইলাহী) নিয়ে বহু প্রকারে আলোচিত, মূল্যায়িত হয়েছে। উর্দু ও ফারসি সাহিত্য ও সুফিদর্শনে ইশ্‌ক্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে লোভ, হিংসা ও স্বার্থপরতার স্তর থেকে মানুষকে উৎসর্গকারী, প্রেমময়, উদার, মহৎ, কল্যাণ ও মঙ্গলকামী উচ্চতর চিন্তা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার এবং সংঘাত ও প্রতিশোধের পরিবর্তে সত্য, সহনশীলতা ও শান্তির অভিধা হিসেবে। সাধারণ অর্থে ইশ্‌ক অদম্য প্রেম নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বা ব্যক্তিকে লাভ করার প্রেরণাকে বোঝায়, যে প্রেরণাকে শওক্ বলা হয়। আল্লাহর সৃষ্ট মানব, মানবী, প্রকৃতি, আকাশ ও পৃথিবীর সকল বিভেদ, বৈষম্য ও বৈচিত্র্য যখন একত্বের অনুভূতিতে সার্বিক এককে কেন্দ্র করে আলোড়িত ও আকর্ষিত হয় তখন ইশ্‌ক্ সর্বেশ্বরবাদের নিষ্কলুষ চেতনার জন্ম দেয় এবং আল্লাহর একত্বে শুধু সত্য ও সুন্দর ব্যক্তির হৃদয়কে আন্দোলিত করে। ব্যক্তি আত্মা তখন বিশ্বআত্মায় প্রেমাভিভূত হয়। আশিক, মাশুক ও ইশ্‌ক্ এক হয়ে যায়। দু'য়ের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি প্রণয়-উপাখ্যানে এবং সুফিদের জীবাত্মা-পরমাত্মার (আশিক-মাশুকের) প্রেমের রূপক কাব্যে ও বর্ণনায় ইশ্‌ক্-এর মহিমা প্রশংসিত হয়েছে। রুমী, জামী, খৈয়াম, ফরিদুদ্দিন আত্তার প্রমুখ ফারসি কবি এবং উত্তর ভারতের আমীর খসরু, মালিক মুহাম্মদ নামক কবিদের রচনায় এ ধরনের প্রেম রূপক কাব্য সুধীমহলে সমাদৃত হয়েছে। কুরআনে মোহাব্বা এরূপ ইশ্‌ক্-এর আরবি শব্দ যা আল্লাহ্ প্রেমিককে ঐশীপ্রেমে দৃঢ় করে। আ.সৈ.গো.দ.

ইসমাইল : বিশিষ্ট নবী। তিনি হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী হাজিরার গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইব্রাহীম তাঁর এই শিশুপুত্র ও স্ত্রীকে মক্কার ধূসর ও কঙ্করময় উপত্যকায় নির্বাসন দেন। তাঁদের সঙ্গে যে সামান্য খেজুর ও পানি দেয়া হয়, কয়েকদিন পর তা ফুরিয়ে গেলে তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা শুরু হয়। শিশু ইসমাইল মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেন। বিবি হাজেরা চারদিকে কেবল কঙ্করময় মরুভূমি ছাড়া শ্যামলিমার ছিটেফোঁটাও দেখতে পান না। শিশুপুত্রের কান্নায় অস্থির হয়ে তিনি অদূরস্থ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে ছুটাছুটি করেন। আরবি ভাষায় এই ছুটাছুটিকে 'সাঈ' বলা হয়। কয়েকবার ছুটাছুটির পর হাজেরা পুত্রের নিকট এসে দেখতে পান যে, শিশু পুত্রের ছটফটানির সময় যে স্থানে পায়ের মৃদু আঘাত পড়েছে, সেখানকার মাটি ভেদ করে পানি নির্গত হচ্ছে। সেখানে একটি কূপ খনন করা হয়। পরবর্তীকালে সেটিই জমজম কূপ নামে খ্যাত হয়। এর কিছুকাল পরে আল্লাহ্ কর্তৃক স্বপ্নদৃষ্ট হয়ে হযরত ইব্রাহীম তাঁর প্রিয়পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করার জন্য এক নির্জন স্থানে নিয়ে যান এবং চোখ বাঁধা অবস্থায় তাঁকে কুরবানি করতে উদ্যত হওয়া মাত্র আল্লাহর নির্দেশে সেখানে ইসমাইলের পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে যায়। তখন থেকে শুরু হয় আল্লাহর নামে কুরবানির

www.pathagar.com

রীতি, যা প্রতি বছর জিলহজ্ব মাসে মুসলমানেরা পালন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানে যুগে যুগে মানুষকে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইলের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত ইসমাইল তাঁর পিতার সঙ্গে মক্কায় কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে এর বিবরণ আছে। ইসমাইলের ১২ জন পুত্র ও ১ জন কন্যা ছিল। তাঁরা সিরিয়া, ইরাক, জেরুজালেম ও মিসরে বাস করতেন। হযরত ইসমাইল ১৩৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তৌরাতে ইসমাইল ও তাঁর পুত্র কন্যাদের বিস্তারিত বিবরণ আছে। আ.সৈ.গো.দ.

ইসমাঈল শহীদ, শাহ্ : ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি সংস্থার আন্দোলন ও জিহাদের অন্যতম প্রধান নেতা এবং শাহ্ ওলীউল্লাহর পৌত্র। শাহ্ ইসমাঈল পিতামহের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মক্কায় হজব্রত পালন করে তিনি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে এসে মুসলমান সমাজের সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পীর ও গোর পূজা, দরগায় মানত প্রভৃতি শেরক্ ও বিদায়াতের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহ ও যে কোনো সৎ ব্যবসায়ের (এমন কি মুচিগিরি পর্যন্ত) পক্ষে তিনি প্রচারণা চালাতে থাকেন। তাছাড়া তিনি আশরাফ-আতরাফের পার্থক্য দূর করতেও সচেষ্ট হন। তাঁর মতে ইসলামে সৎ ও অসতের পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। যে কোনো সৎ ব্যবসায় বা শ্রমই সম্মানের যোগ্য। এভাবে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ঘুমন্ত মুসলমান জাতিকে জাগ্রত করার কাজে ব্রতী হন। এই উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন এবং বিশ্বের সকল মুসলমানকে একই রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন (প্যান-ইসলাম) ছিল তাঁর কার্যক্রমের লক্ষ্য। এজন্যে তিনি সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করেন। সাইয়িদ আহমদ বেরেলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শাহ্ ইসমাঈল শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে আকোয়ার যুদ্ধে অগ্রগামী দলের সেনাপতিরূপে তিনি রণজিৎ সিংহের সেনাপতি বুধ সিংহকে পরাজিত করেন। দীর্ঘদিন শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থেকে অবশেষে বালাকোটে শিখদের আকস্মিক নৈশ আক্রমণে সাইয়িদ আহমদ বেরেলভীর সঙ্গে তিনিও শহীদ হন। জামালুদ্দিন আফগানী প্রমুখ পরবর্তী সংস্কারক তাঁর প্যান-ইসলামি নীতিকে বিশ্বময় প্রচার করেন। আ.সৈ.গো.দ.

ইসমাইল হোসেন শিরাজী : লেখক ও রাজনীতিবিদ। সিরাজগঞ্জ শহরে ১৮৭৯-র ৫ আগস্ট তাঁর জন্ম। পিতার নাম আবদুল করিম, মাতা নূরজাহান খানম, স্ত্রী ওয়াজেদন নেসা। পিতার পেশা ছিলো ইউনানী চিকিৎসা। ১৮৯৭-তে সিরাজগঞ্জ বি.এল. হাই স্কুলে ভর্তি হন। প্রবেশিকা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে শিক্ষা বিস্তার, সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম সম্পর্কিত প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ কর্মে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। শিরাজীর বাগ্মিতা ও প্রচারকর্মের খ্যাতি দূর দূরান্তরে বিস্তার লাভ করে। অতঃপর রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের প্রয়াস চালান। কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসেবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ে তাঁর জাতীয় জাগরণমূলক কাব্য 'অনল প্রবাহ' (১ম সংকরণ ১৯০০)-এর পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৯০৯)। আপত্তিকর রচনা প্রকাশ ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে কাব্যটি বাজেয়াপ্ত এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে শিরাজী দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১২-র ১৪ মে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। বলকান যুদ্ধে (১৯১২-১৯১৪) ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের সদস্য হিসেবে তুরস্ক সফর করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২২) তিনি অবদান

www.pathagar.com

রাখেন। সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০–১৯২৫) নেতৃত্বাধীন স্বরাজ্য দলেরও (১৯২৩) প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। ১৯৩১–এ আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩১) নেতৃত্ব করায় তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী লেখক। মুসলমানদের সর্বাত্মক কল্যাণকামনা ও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য। প্যান ইসলামি মতবাদ তাঁর সাহিত্য–মানস গঠনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অগ্নিস্রাব কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশ শতকের বাঙালি মুসলমান কবিদের পথ–প্রদর্শক। জাতীয় জাগরণমূলক কাব্য সৃষ্টিতে ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত এবং কবি নজরুল ইসলামের পূর্বসূরি। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য—অনলপ্রবাহ (১৯০০), স্পেনবিজয় (১৯১৪), সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬), প্রেমাঞ্জলি (১৩২০ বঙ্গাব্দ) ; উপন্যাস--রায়নন্দিনী (১৩২২ বঙ্গাব্দ), তারাবাঈ, ফিরোজা বেগম (১৯১৮) ; প্রবন্ধ—স্ত্রী শিক্ষা (১৩১৪ বঙ্গাব্দ), তুর্কী নারী জীবন (১৩২০ বঙ্গাব্দ), তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১৩), আদব–কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), স্পেনে মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬)। তিনি ছিলেন ‘ইসলাম প্রচারক’ পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী। ১৯৩১–এর ১৭ জুলাই বহুমূত্র রোগে মৃত্যুবরণ করেন। **নু. ই**

ইসরাঈল : নবী ও ইহুদিদের পূর্বপুরুষ। বাইবেলে তাঁকে জেকব এবং পবিত্র কুরআনে ইয়াকুব বলা হয়েছে। তাঁর নামানুসারেই ইসরাইল জাতির নামকরণ করা হয়। তাঁর ১০ জন পুত্র এবং ২ জন পৌত্রের (তাঁরা ছিলেন জোসেলের অর্থাৎ হযরত ইউসুফের পুত্রদ্বয়) নামানুসারে ইসরাঈলের ১২টি উপজাতিরও নামকরণ হয়। যথা—রুবেন, সিমিয়ন, জুডা, যেবুলান, ইসাকার, ড্যান, গ্যাড, অ্যাশার, ন্যাফ তালায়, বেনজামিন, ঈফরাইয়াম ও মান্যাসে। ইসরাঈলের রাজা রীহোবোয়ামের রাজত্বকালে ইহুদি রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর উত্তরাংশ ইসরাঈল ও দক্ষিণাংশ জুডা নামে পরিচিত হয়। পবিত্র কুরআনে ইসরাঈল নামটি একবার এবং ‘বনু ইসরাঈল’ নামটি বহুবার উক্ত হয়েছে বাইবেলে ইসরাঈল সম্পর্কে যে কাহিনী আছে, তার অংশবিশেষ কুরআনেও হযরত ইউসুফ সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে। **আ.সৈ.গো.দ.**

ইসরাফিল : আল্লাহ্ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ চার ফেরেশ্তার অন্যতম। ইসলামি মতে, এই ফেরেশ্তার শিঙ্গার ফুৎকারে কেয়ামত হবে। ইসরাফিলের কল্পিত আকৃতি সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা বিরাট ও বিস্ময়কর। তাঁর দুটি পা সপ্ত পৃথিবীর নিম্নভাগ ও তাঁর মাথা আল্লাহ্র আরশের সপ্তশীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর দেহে চারটি ডানা আছে ; তারমধ্যে একটি ডানা পশ্চিমে, আরেকটি পূর্বে অবস্থিত। তৃতীয় ডানা দিয়ে তিনি নিজের দেহ আবৃত রাখেন এবং চতুর্থ ডানা দিয়ে আল্লাহ্র অসীম শান–শওকত থেকে আত্মরক্ষা করেন। তাঁর সারা দেহ লোমে আবৃত এবং তাঁর অসংখ্য মুখ ও জিহ্বা আছে। সংরক্ষিত ফলকের লিপি থেকে তিনি আল্লাহ্র সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করেন। তিনি প্রথম তিন বছর পর্যন্ত মহানবী হযরত মুহম্মদের সহচর (দ:) ছিলেন এবং তাঁকে পয়গম্বরের কাজে দীক্ষাদান করেন। পরে জিবরাইল (আ:) ফেরেশতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁর মাধ্যমে রসুলের নিকট কুরআন নাজিল হতে থাকে। কথিত আছে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ইসরাফিল হাতে শিঙ্গা নিয়ে আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহ্র আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি প্রথম বারের মতো শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। এই নিনাদে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হয়ে কেয়ামতের সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্র হুকুমে তিনি দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে তার নিনাদে সমস্ত প্রাণী পুর্নজীবিত হবে এবং রোজ হাশরের সৃষ্টি হবে। তখন হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষের যাবতীয়

ইহলৌকিক কাজের হিসাব নেয়া হবে এবং সে অনুযায়ী তাদের বিচার হবে। ঐ বিচারেই সাব্যস্ত হবে কে বেহেশ্‌তে যাবে, আর কে দোজখবাসী হবে। আ.সৈ.গো.দ.

ইসলাম : আরবি শব্দ সালাম থেকে উৎপন্ন ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ বা শান্তি বা মুক্তি। মহানবী হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর উপর আল্লাহ থেকে অহি বা প্রত্যাদেশ হিসেবে ফেরেশতা জিবরাইল (আ:) কর্তৃক আনীত ধর্ম ৬১০ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় যা পরে পবিত্র কুরআনে সংকলিত হয়। কুরআনে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিদায় হজ্জ ভাষণে নবী করিম (দ:) ঘোষণা দেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার কল্যাণ কামনার সমাপ্তি করলাম ও ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে অনুমোদন করলাম। ৫:৫।" বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে ও স্থানে মানুষ ধর্ম ও সত্য জীবনপদ্ধতি ত্যাগ করে অনাচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ নবী প্রেরণ করে মানুষকে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য উপদেশ দেন ও আহ্বান করেন। ইসলাম অনুসারী একজন মুসলিম শান্তিতে আত্মস্থ হয় ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য মনে না রেখে মানুষকে আপন করে ভেদাভেদ ভুলে অনাবিল শান্তিতে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে। এ ধর্মে আল্লাহ্‌র একত্ব, মুহম্মদ (দঃ)-এর রিসালত, ঐশী গ্রন্থ কুরআন, আখেরাত, ফেরেশতাতে পূর্ণ ইমান বা বিশ্বাস রেখে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ অর্থাৎ ইমান, সালাত বা নামায, সিয়াম বা রোজা, হজ্জ ও যাকাত পালন করতে হয়। পবিত্র কুরআনে একটি সম্পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে যা স্থান, কাল, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পবিত্রতার সাথে বজায় রাখতে হবে। ইসলামি আইনে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস মতে জীবনপদ্ধতির অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়। নবী করিম (দ:) বিদায় হজ্জ ভাষণে মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন। ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মের পর তৃতীয় সেমিটিক ধর্ম ইসলামে একত্ববাদের মূল্য বিষয়ে কোনো দ্বিমত নাই। আ.সৈ.গো.দ.

ইসলাম কাহিনী : রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৮-১৯২৭) রচিত ইসলাম ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৩১১ বঙ্গাব্দ। রামপ্রাণ গুপ্তের অধিকাংশ রচনাই ইসলাম বিষয়ক। তাঁর 'হযরত মোহাম্মদ' (১৩১১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের ন্যায় 'ইসলাম কাহিনী'তেও তিনি ইসলাম সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে লেখক হযরত মোহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাব ও তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচার, মহররম ও কারবালার বিষাদময় বিবরণ, ওম্মিয়া বংশ এবং আব্বাসীয় বংশের ইতিহাস, হারুণ-অর-রশীদের চিত্তাকর্ষক জীবন ও রাজত্বের ইতিহাস, বাগদাদ নগর ধ্বংসের ইতিবৃত্ত এবং খলিফাগণের শাসননীতি,—তার সুফল ও কুফল ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন। রামপ্রাণ গুপ্তের রচনায় ইসলামের ইতিহাস সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে; লেখক বাহুল্য ও উচ্ছ্বাস যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। আ.ন.ম.ব.র.

ইসলাম খাঁ : বাংলাদেশের খ্যাতনামা মুঘল সুবাদার (১৬০৮-১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ)। ইসলাম খান ছিলেন ফতেহ্‌পুর সিক্রীর বিখ্যাত দরবেশ শেখ সলীম চিশ্‌তীর পৌত্র। সুবাদার নিযুক্ত হয়ে বাংলাদেশে এসে তিনি মূসা খান (ঈসা খানের পুত্র) ও বারো ভুঁইয়াদের দমনে আত্মনিয়োগ করেন। বীরভূমের বীর হামীর, হিজলীর সলীম খান, যশোরের প্রতাপাদিত্য ও কামতার লক্ষ্মীনারায়ণ বিনা বাধায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। পাচোটের শামস খান, ভূষণার ছত্রজিৎ ও সাহাজাদপুরের রাজারাজ কিছুকাল বাধাদানের পর ইসলাম খানের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হন। সোনারগাঁর জমিদার মূসা খানের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ

www.pathagar.com

হয়। যুদ্ধের পর মূসা খানের প্রধান প্রধান দুর্গ ও রাজধানীর পতন ঘটলে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। ভাওয়ালের বাহাদুর গাজি, বানিয়াচঙ্গের আনোয়ার গাজি প্রমুখ বারো ভূঁইয়াও আত্মসমর্পণ করেন। ভুলুয়ার রাজা অনন্তমানিক্যের সঙ্গে ইসলাম খানের সংঘর্ষ বাঁধে। অনন্তমাণিক্য পরাজিত হয়ে আরাকানে পালিয়ে যান। বোকাইনগরের উসমান বিতাড়িত হয়ে পরে মুঘল বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। বাকলার রাজা রামচন্দ্র বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। বায়েযীদের হাত থেকে সিলেট উদ্ধার করে ইসলাম খান কাছাড়ের রাজার নিকট থেকে কর আদায় করেন। মঘ ও পর্তুগীজ দস্যুরা ভুলুয়া অধিকার করলে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। কামরূপের রাজাও বিতাড়িত হন এবং পাণ্ডুতে মুঘল থানা স্থাপিত হয়। ইসলাম খান ভাওয়ালে শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন উদ্যোগী, দৃঢ়চিত্ত ও সফলকাম শাসক। ঢাকাস্থ ইসলামপুর তাঁরই স্মৃতি বহন করে। তিনি এখানকার আশিক জমাদার লেনস্থ মসজিদটি নির্মাণ করেন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আ.ন.ম.ব.র.

ইসলাম প্রচারক : ‘মুসলমানদিগের ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ক মাসিক পত্রিকা’। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্মদ। কড়েয়া-(কলকাতা) ১নং গোরস্থান রোড থেকে আবদুস সামাদ (ম্যানেজার) কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৪নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট (কলকাতা) মিলন যন্ত্রে, শ্রীমুনীন্দ্রনামাহন বসু দ্বারা মুদ্রিত। ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল ভাদ্র-১২৯৮ সাল। বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য সডাক তিন আনা। ৮ম বর্ষ : ৭ সংখ্যার প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ-১৩১৪ সাল। কলকাতা-১৫৯ নং কড়েয়া রোড-রেয়াজুল ইসলাম প্রেসে, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ কর্তৃক মুদ্রিত ও ৪০ নং কড়েয়া গোরস্থান লেন থেকে আজিজুদ্দীন আহ্মদ কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা। সাইজ : ৬´´× ৯´´। রেজিস্টার্ড নং-সি-৩০৮। ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা ভাদ্র-১২৯৮-এর সূচিপত্র : সূচনা-১, কিমিয়া সাআদাতের বঙ্গানুবাদ-৯, বড়পির সাহেবের জীবনচরিত-১৭, কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ-২১, হজরত আলি-২৩, নূরল ইমান জামায়াত-২৬, ধর্মসংবাদ-৩১-৩২। ‘প্রচার ভিন্ন ধর্মের উন্নতি হইতে পারে না’—ইসলাম ধর্মের নানা কথা প্রচারের জন্যই ইসলাম প্রচারক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিলো। পত্রিকাটি আট বছর বন্ধ থাকার পর আবার ১৩১৪ সালে এটি চালু হয়। নব প্রকাশিত ইসলাম প্রচারক কত বছর চলেছিল তা জানা যায় না। আ.জ.

ইসলাম শাহ্/সলীম শাহ্ : সম্রাট শের শাহের দ্বিতীয় পুত্র এবং সূরবংশীয় দ্বিতীয় সুলতান (১৫৪৫-১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। ইসলাম শাহের পূর্ব নাম ছিলো জালাল খান। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি কালিঞ্জরের সুলতান হিসেবে অভিষিক্ত হন এবং ইসলাম শাহ্ উপাধি ধারণ করেন। পিতৃ সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিল খানের সঙ্গে আপোস মীমাংসায় পৌঁছে তিনি তাঁকে বায়ানার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে আদিল খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ইসলাম শাহ্ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হন। ইসলাম শাহ বহু সরাইখানা এবং রাজধানী দিল্লির প্রতিরক্ষার জন্য যমুনার তীরে ইসলাম গড় দুর্গ নির্মাণ করেন। সাসারামে নির্মিত শের শাহের সমাধিসৌধ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সঙ্গীত ও ললিতকলায় এবং শিক্ষাবিস্তারে ইসলাম শাহের বিশেষ আগ্রহ ছিলো। সম্রাট আকবরের সভার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন তাঁর শিষ্য ছিলেন। বহু কবি ও পণ্ডিত দ্বারা তাঁর রাজসভা অলংকৃত ছিলো। মাত্র ৯ বছর রাজত্বের পর কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী না রেখেই তিনি পরলোকগমন করেন। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁর নাবালক

www.pathagar.com

পুত্র ফীরূয খান মুবারিয খানের হাতে নিহত হন। মুবারিয খান ছিলেন ইসলাম শাহের শ্যালক, শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও নিযাম খান সূরের পুত্র। ভাগ্নেকে হত্যা করে তিনি মুহম্মদ আদিল শাহ্ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। মু.আ.জ.

ইস্‌লামী বাংলা/মুসলমানী বাংলা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শতাব্দীকাল সময়কে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যেকার এক ক্রান্তিকাল বলে অনেক ঐতিহাসিক চিহ্নিত করে থাকেন। এই ক্রান্তিকালের প্রথমদিকে নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয় সাহিত্যেরই জের চলেছিলো এবং দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটেছিলো। তথাপি এই সময়কার সাহিত্যের আসরে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখতে পাওয়া যায় হিন্দু সমাজের কবিয়ালদের এবং মুসলমান শায়েরদের। এই 'শায়ের'রা বাঙলা ও হিন্দুস্তানীর (উর্দু-হিন্দির) বাগভঙ্গির ব্যাপক মিশ্রণসহ এক বিচিত্র বাংলা ভাষা-ভঙ্গীতে উপাখ্যান রচনা করে একটি বিশিষ্ট কাব্যধারার সৃষ্টি করেছিলেন। এই সব পুঁথির বিষয়বস্তু আরবি, ফার্সি, উর্দু জগত থেকেই মুখ্যত আমদানি করা হলেও, তার সঙ্গে বাংলার লৌকিক জীবনের উপাদানও মিশ্রিত হয়েছিলো। আরবি-ফার্সি শব্দের বাহুল্য, নামধাতু রূপে হিন্দি ধাতুর ব্যবহার, অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার এবং আরবি-ফার্সি বহুবচন ইত্যাদির ব্যবহারে বিশিষ্ট এই মিশ্রভাষারীতির কাব্যগুলোকে প্রথম লঙ সাহেব তাঁর পুস্তক তালিকায় 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য' বলেছেন এবং এর ভাষাকে 'মুসলমানী বাংলা ভাষা' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ব্লুমহার্টও এই নামই ব্যবহার করেছিলেন। পরে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই নামই ব্যবহার করেন। ডঃ সুকুমার সেন একে 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' বলেছেন। এই ইস্‌লামী বা মুসলমানী বাংলা ভাষার নমুনা ছিলো এরূপ : (ক) কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম। (খ) ভেজ আয় রব মেরে দরুদ সালাম আপনে পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম। এই মুসলমানী ভাষা নামাঙ্কন থেকে অনেকের ধারণা তখন বাঙালি মুসলমানের কথ্যভাষা বোধ হয় এরূপ ছিলো। সাক্ষ্যপ্রমাণ দৃষ্টে এটা সর্বৈব সত্য বলে মনে হয় না। হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছিলেন, যে সব মুসলমান বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ মিশ্রিত করে কথা বলতে পারেন, তারা আবার সুচারু বাংলাও বলতে পারেন। ১৮৫৫ সালে লং সাহেব লিখেছিলেন, আরবি-ফার্সি মিশ্রিত এই ভাষা হুগলীর মাঝি-মাল্লাদের মধ্যেই প্রচলিত। শহরে-নগরেও কিছু কিছু প্রচলন রয়েছে। মনে হয় বাংলাদেশে ভিন্নভাষী মুসলমানের সংমিশ্রণের ক্ষেত্র যেখানেই রচিত হয়েছিলো সেখানেই এই ভাষার ব্যবহার হতো। অন্যত্র সাধারণ বাংলাই চালু ছিলো। তবে এই মিশ্র ভাষা তথা মুসলমানী বাংলায় রচিত পুঁথিগুলো সকল স্তরেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। আসলে উত্তর ভারতীয় ও বিদেশী মুসলিম অধ্যুষিত নগর-বন্দর এলাকায় মুসলিম সমাজেই এই হিন্দি-উর্দু-বাঙলা মিশ্র ভাষার উদ্ভব। কলকাতা-হাওড়া-হুগলী বন্দর নগরের ও প্রশাসন কেন্দ্রের লিখিয়ে সত্যনারায়ণ পাঁচালীকার কৃষ্ণরামপাল ভারতচন্দ্র রায় (মানসিংহ খণ্ডে) প্রমুখরাই প্রথম এ মিশ্রভাষা প্রয়োগ করেন, পরে আঠারো শতকের শেষার্ধে হাওড়া-হুগলীর ফকির গরীবউল্লাহ ও সৈয়দ হামজা তা অনুকরণ করেন। এখন মুসলমানি বাঙলা ও মুসলমানি পুঁথিকে যথাক্রমে দোভাষীরীতি ও দোভাষী পুঁথি নামে অভিহিত করা হয়। **সু.মু.**

ইষ্টিমিষ্টি : শামসুল ইসলাম রচিত শিশুতোষ ছড়া গ্রন্থ। প্রকাশক : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী,

www.pathagar.com

পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও বই নকশা : ফরিদা জামান। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮১, দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৬, মূল্য : এগারো টাকা। অনেকগুলো মিষ্টি ছড়ার সংকলন ইষ্টিমিষ্টি। বার পৃষ্ঠার এই বইটিতে রয়েছে বাইশটি ছড়া। ছড়াগুলোর শিরোনাম : ইষ্টিমিষ্টি, শূন্যে উড়াল দিয়ে, বাদল, বকুল, ঘুম, লোকটা, ভেঙ্কি, সুগায়ক সরদার, হুতুম, নীলপরী, বান, মিছিল, নিধিরাম ও কুল। স্বরবৃত্তে ছন্দে লেখা সবগুলো ছড়ার বিষয় শিশুদের উপযোগী। দু'একটি ছড়ায় লোকজ ছড়ার আমেজ সহজে চোখে পড়ে। নীলপরী ছড়াটি অপূর্ব এরকম আর একটি ছড়া ফুল। মিছিল ছড়াটিতে মহান একুশে ফেব্রুয়ারির কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ইষ্টিমিষ্টির সবগুলো ছড়া-কবিতার শব্দ প্রয়োগ সহজ-সরল। ছড়ার মূল ছন্দ স্বরবৃত্তে লেখা, মিলগুলোও চমৎকার। লোকজ বিষয়কে নিয়ে লেখা ছড়াগুলো এই বইয়ের চমৎকার ছড়া। দু'একটি ছড়ায় সমাজচিত্র আঁকা হয়েছে। প্রচ্ছদ পর্ব ও ভেতরের ছবিগুলোও সুন্দর। কিন্তু অযত্নে ছাপা হয়েছে। **খা.বি.উ.জ.**

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি : রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের বণিক সম্প্রদায় পর্তুগাল, স্পেন ও হল্যাণ্ডের বণিকদের দেখাদেখি ইউরোপের বাহিরে বাণিজ্য বিস্তারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে লণ্ডনবাসী কয়েকজন বণিক একত্রিত হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করে। তারা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে রানী এলিজাবেথের সনদ বলে উত্তপাশা অন্তরীণ থেকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এক চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পর রাজকীয় সনদ উপেক্ষা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নতুন এক বণিক সংঘকে এশিয়ায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়। দুই কোম্পানি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে মিলিত হয়ে একটি যৌথ সংস্থা গড়ে তোলে, যার পুরো নাম ছিল 'দি ইউনাইটেড কোম্পানি অব মার্চেন্টস্ অব ইংল্যাণ্ড ট্রেডিং টু দি ইস্ট-ইণ্ডিজ। ইতিহাসে এই কোম্পানিই প্রখ্যাত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রূপে পরিচিত। কি করে একটি সাধারণ বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে কোম্পানি এক বিশাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো তা আজ ইতিহাসের ব্যাপার। প্রথম দিকে কোম্পানি যথার্থই একটি সাধারণ বাণিজ্যিক সংস্থা ছিলো। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ডাচদের সঙ্গে না পেরে উঠে, ভারতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে তারা সুরাটে কুঠিস্থাপনের অনুমতি পায়। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস রো'র দৌত্যের ফলে কোম্পানির বাণিজ্যিক সুবিধা আরও বৃদ্ধি পায়। ক্রমে কোম্পানিটি সুরাট থেকে শুরু করে আগ্রা আমেদাবাদ, করোচে কুঠি স্থাপন করে। পরে মাদ্রাজ ও হুগলিতে এবং কলকাতা ও বোম্বেতে কুঠি স্থাপিত হয়। বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করে। দেশীয় রাজণ্যের গৃহ বিবাদের সুযোগ নিয়ে কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির। যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম সোপান। তারপর দেশীয় রাজ্য-বাদশাহ্‌দের গৃহবিবাদ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোম্পানির রাজশক্তি ভারতের ভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হয়। কালক্রমে মহীশূর, মারাঠা ও শিখশক্তিকে পর্যুদস্ত করে কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে গোটা ভারতবর্ষের শাসনকর্তা বনে যায়। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেয়। কোম্পানির শাসনামলে ভারতে নানা যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচনা করে কোম্পানি শাসনই ভারতবর্ষকে আধুনিকতার দিকে আকর্ষণ করে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় শাসন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তনের ফলে দৃঢ়বদ্ধ এক নতুন ভারত-বর্ষের জন্ম কোম্পানি শাসনের বহুতর কুফল সত্ত্বেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতে কোম্পানির শাসনের সমালোচনা শুরু হয়েছিল। একটি বণিক সমিতির হাতে এতোবড় একটা সাম্রাজ্যের ভার থাকা উচিত নয়, এই মর্মে বিলাতের শাসন কর্তৃপক্ষ ভাবতে শুরু করেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকেই। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ভারতের ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর প্রাথমিক পরাজয় কোম্পানি অবলুপ্তি পথ প্রশস্ত করেছিল। অবশেষে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলে কোম্পানির আমলের অবসান ঘটে। সু.মু.

ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র : ইব্রাহীম খাঁ রচিত ভ্রমণকাহিনী। প্রকাশকাল ১৯৫৪। প্রকাশক : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লাহোর, করাচী, ঢাকা। মূল্য : দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি পত্রাকারে রচিত। গ্রন্থটিতে মোট ১৬টি পত্র রয়েছে। গ্রন্থকার যখন যে জায়গায় গিয়েছেন, সেখান থেকে তিনি তাঁর প্রিয়জনদের পত্র লিখেছেন। চিঠি প্রাপকের তালিকায় রয়েছেন স্ত্রী, পুত্র এবং বন্ধুবরেষু ব্যক্তিবর্গ। লেখক সেই সময়ে ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলেন আন্ত-পার্লামেন্টারি কনফারেন্সের অধিবেশনে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে। লেখকের লেখা পত্রসমূহের সূচি এরকম : করাচীর পত্র (১ম), বৈরুতের পত্র, আলেপ্পোর পত্র, আঙ্কারার পত্র, ইস্তাম্বুলের পত্র, নিকোশিয়ার পত্র, কায়রোর পত্র, জেদ্দার পত্র, মক্কা শরীফের পত্র, মদীনা শরীফের পত্র, দামেস্কের পত্র (১ম), দামেস্কের পত্র (২য়), তেহরানের পত্র (১ম), তেহরানের পত্র (২য়), এবং করাচীর পত্র (২য়)। এভাবে পত্র লেখার ফলে পাঠকের পক্ষে নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে লেখকের আবেগ অনুভূতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা ইত্যাদি জানা অনেকটা সহজ হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে তিনি 'আ' ধ্বনি যে মানব মনের নান্দনিক সৌন্দর্যের স্মারক, সে বিষয়ে দু'চারটি কথা বলেছেন। সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখক বিভিন্নস্থানে ভ্রমণের সময় তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি বোধ, পাশাপাশি সেসব স্থানের বিভিন্ন শৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সৈ.আ.জা.

ইস্পাত : নিকোলাই অস্ত্রভস্কি রচিত উপন্যাস। ইস্পাত আরও, আরও মজবুত করে তোলা হয় আগুনের পোড় খাইয়ে খাইয়ে... কিন্তু, মানুষের চরিত্র? কী করে মানুষের চরিত্র আরও, আরও মজবুত করে তোলা যায়, যাতে সে চরিত্র হবে ইস্পাতের চেয়ে দৃঢ়, বিপদে অবিচলিত, বন্ধুত্বে নির্ভরযোগ্য, আর ভালোবাসায় একনিষ্ঠ। নিকোলাই অস্ত্রভস্কির 'ইস্পাত' উপন্যাসে তার উত্তর আছে। উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্রই সত্য, বাস্তব জীবনের প্রতিকৃতি। প্রধান চরিত্র পাভেল করচাগিন হলেন লেখক নিজেই। অস্ত্রভস্কির (১৯০৪-১৯৩৬) জীবন ছিলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু বীরত্বপূর্ণ। গৃহযুদ্ধে ভীষণভাবে আহত এই যুবক বিশ বছর বয়সেই অন্ধ হয়ে যেতে থাকলেন, তাঁর চলৎশক্তিহীনতা অবধারিত হয়ে গেল। আর সেই অবস্থায় তিনি লিখলেন এই চমৎকার উপন্যাস,—যৌবন, ভালোবাসা আর সংগ্রাম, এবং প্রথম যুগের সোভিয়েত কমসোমল তরুণ-তরুণীদের জীবন নিয়ে দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসটি। উপন্যাসটির রচনাই হলো অস্ত্রভস্কির মহৎ মানবিক কীর্তি। উপন্যাসখানি অনূদিত হয়েছে ৪৮ টি ভাষায়, প্রকাশিত হয়েছে ৪২ টি দেশে। সোভিয়েত ইউনিয়নেই উপন্যাসটি ৪৯৫ টি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে, আর বিক্রি হয়েছে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কপি। প্রকাশক প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, বাংলায় অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্র মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩১৮+৩৮৬। বি.ব

www.pathagar.com

ইস্পাত প্রত্যয় : তাসাদ্দুক হোসেন রচিত উপন্যাস। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮০, প্রচ্ছদ : হাশেম খান, মুদ্রণে ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা। মূল্য : চব্বিশ টাকা। ইস্পাত প্রত্যয়-এর কাহিনী শুরু হয়েছে পাকিস্তানের মারগালা পাহাড়ের বর্ণনা দিয়ে। শেষ হয়েছে পাথুরে পাহাড়ের লাল সূর্য ওঠার মনোরম দৃশ্যের ছবি এঁকে। উপন্যাসটির শুরুতেই রয়েছে 'প্রাসঙ্গিক' শিরোনামের একটি ভূমিকা। এই ভূমিকাটির দ্বিতীয় স্তবকে ঔপন্যাসিক লিখেছেন : কার্যোপলক্ষে আমাকে কয়েক মাস পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে থাকতে হয়েছিলো। আমার মূল কর্মস্থল ছিলো সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশের সীমান্তে। আর সেই স্থানের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিলো এই উপন্যাস আজ থেকে কয়েক বৎসর আগে, গত ১৯৫৯ সালে। এই ভূমিকাটি সুদীর্ঘ। এগারোটি অধ্যায়ে উপন্যাসটির কাহিনী বিধৃত। লেখক ভূমিকাতে নিজেই স্বীকার করেছেন যে কাহিনীর বর্ণনায় অসংলগ্নতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ১৯৫৯ সালে লেখা উপন্যাস ছাপা হয়েছে সুদীর্ঘ একুশ বছর পর। উপন্যাসটির ভূমিকার শেষপর্বে কিছু আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রতিশব্দ দেয়া হয়েছে পাঠকদের সুবিধার্থে। ২৫৬ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের প্রচ্ছদপট সুন্দর। খা.বি.জ.উ.

ইস্পাতের স্বাক্ষর : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯৫৬ সাল। উপন্যাসটিতে শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন দলের সাংগঠনিক সংস্থার মধ্যে তীব্র বিরোধ ও সংঘর্ষের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। দেবজ্যোতি শ্রমিক আন্দোলনের নেতা। যাদের জন্য সে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে, তাদের নীতিহীনতা, মূঢ়তা ও দলাদলি তাকে হতাশ করে। বস্তুত, ভারতের স্বাধীনতা-উত্তরকালের দলীয় রাজনীতির বিরোধ, হিংসা ও স্বার্থপরতার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শবাদী মানুষের মোহভঙ্গ ও রাজনৈতিক ব্যর্থতার কাহিনীই উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। এতে উনিশশ পঞ্চাশ ও ষাট দশকের যে রাজনৈতিক আবর্ত ও আন্দোলনের পটভূমি উপস্থাপিত হয়েছে, তা থেকে দুটি বিষয় পরিস্ফুট হয়। তা হলো, একদিকে কংগ্রেস ও গান্ধীসমর্থকদের অসহযোগ, সত্যাগ্রহ এবং অন্যদিকে আগস্ট আন্দোলনের চেতনার প্রতিফলন। 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'-এ মার্কসবাদের ভাবগত আদর্শের প্রচার যতটা হয়েছে, তার যথার্থ প্রয়োগ এবং ব্যাপক জনসমর্থনের প্রতিচ্ছবি সার্থকভাবে ফুটে ওঠেনি। তথাপি এ উপন্যাস ভারতীয় রাজনীতির এক ক্রান্তিকালকে ধারণ করে আছে অপার মমত্ববোধে। ড.শা.আ.

ইহরাম : ইসলাম ধর্মে ইহরাম-এর ব্যবহারিক অর্থ হলো হজ্জ্ব বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে নখ কেটে, চুল কামিয়ে, গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে মীকাতে দেহ ও মনের শুদ্ধিসহ পুরুষরা মাথা না ঢেকে সেলাইবিহীন সাদা দু'টি চাদর উপরে ও নিচে পরা এবং মহিলারা শুধু মুখ খোলা রেখে সমস্ত শরীর আবৃত করা। হজ্জ্ব বা উমরার জন্য ইহরাম পরিধানের আধ্যাত্মিক চেতনা হলো পার্থিব কামনা বাসনা উৎসর্গ করে সমস্ত কর্ম ও উদ্দেশ্য আল্লাহর জন্য ত্যাগ করে শুধু আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। ইহরাম পরিধানকারিকে মুহরিম বলা হয়। এ পবিত্র আনুষ্ঠানিকতার অন্য গুণ হলো সমস্ত মুসলিম উম্মাহর বা বিশ্বমুসলিমের ঐক্য, সাম্যবাদ এবং কোনো প্রকার কৌলিন্য বা উঁচু নিচু পদমর্যাদার পার্থিব ভেদাভেদ রহিতকরণ। ইহরাম পরা অবস্থায় নির্দিষ্ট জায়গায় ও সময়ে দোয়া তালবিয়া পড়তে হয় : লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লা শরীকা লাকা লাব্বাইকা। এই তকবীর আল ইহরাম পড়াসহ হজ্জ্ব উমরার আনুষ্ঠানিকতা আরম্ভ করতে হয় এবং পালনকারী দেহমনে

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের অনুভূতি লাভ করেন। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোনো ছোট বড় প্রাণী ও জীব হত্যা, স্ত্রী মিলন, ঝগড়া বিবাদ, সুগন্ধি ব্যবহার, নখ ও চুল কাটা নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় মুহরিম কোন বিবাহের চুক্তি করতে পারবেনা। কোনরকম ভুলত্রুটি হয়ে গেলে কাফ্‌ফারা হিসেবে কুরবানি দিতে হয়। যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত ইহরাম পরে থাকতে হয়। এ সময় হাজীগণকে সকল প্রকার পবিত্রতা বজায় রাখতে হয় এবং তাঁরা কুরবানির পর মাথার চুল ছোট করে অথবা মাথা মুন্ডন করে ইহরাম খুলবেন। আ.সৈ.গো.দ.

ইহুদি জাতি : ইসরাঈল নবীর (হযরত ইয়াকুব) বংশধর এবং জুদাহ্‌ বা ইহুদি ধর্মমতের অনুসারী। যিশুখ্রিস্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে কৃষকরূপে ইহুদিদের মিশরে বসতি স্থাপনের সময় থেকেই তাদের ইতিহাস শুরু হয়। সেখানে তারা বনূ ইসরাঈল বা আল-ইয়াহুদ নামে পরিচিত ছিলো। ফেরাউন বাদশারা তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করলে মোযেযের (হযরত মূসা) নেতৃত্বে তারা মিশর ত্যাগ করে কেনানে চলে যায়। সেখানে তারা রাজা সলের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রথম ইহুদি রাজ্যের পত্তন করে। রাজা সল ফিলিস্তিনীদের হাতে পরাজিত হন। ইহুদিদের পরবর্তী রাজা ডেভিড (হযরত দাউদ) ফিলিস্তিনীদের পরাজিত করে। তাঁর পুত্র রাজা সলোমন (হযরত সুলায়মান) প্রথম ইহুদি ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শীঘ্রই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইহুদি রাজ্য ইসরাঈল ও জুডা এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব ৭২২ অব্দে ইসরাঈলীগণ কেনান থেকে নির্বাসিত হন। ম্যাকাবীয়দের নেতৃত্বে ইহুদিগণ তাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরে পায়। কিন্তু ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান শক্তি জেরুজালেম ধ্বংস করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইহুদিরা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রুসেডের সময় থেকে খ্রিস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত তারা বিভিন্ন জাতি কর্তৃক নির্যাতিত এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। পুঁজিবাদের উদ্ভবের ফলে সারা ইউরোপে ইহুদিদের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় রাশিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিমে ফ্রান্স পর্যন্ত সকল ইউরোপীয় দেশে ইহুদি খেদাও আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে নাৎসী দল ক্ষমতাসীন হলে সেখানে ইহুদি নির্যাতন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সমগ্র বিশ্বে ইহুদিদের সংখ্যা ছিলো প্রায় এক কোটি ষাট লাখ। ঐ যুদ্ধের সময় পঞ্চাশ থেকে ষাট লাখ ইহুদি নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর তাদের অনেকে ইউরোপ ত্যাগ করে প্যালেস্টাইনে এসে বসতি স্থাপন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সেখানে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকে তারা ছলে বলে কৌশলে ও বলপ্রয়োগে বহু আরব ভূমি দখল করে নিচ্ছে। তারা ফিলিস্তিনীদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। আর তাদেরকে শক্তি জোগাচ্ছে বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আ.ন.ম.ব.র.

ইহুদি ধর্ম : সর্বপ্রাচীন একত্ববাদী ধর্ম। তৌরাত গ্রন্থ, পুরাকাহিনী ও বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং তালমূদ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিধি-বিধান এই ধর্মের ভিত্তি। ইহুদি ধর্মের মূলনীতি হলো একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার (ইয়োভা/জেহোভা) উপাসনা এবং ইসরাঈল জাতির নেতা মোযেয (হযরত মূসা)-এর নিকট জেহোভা কর্তৃক প্রেরিত ধর্মীয় আইনকানুন সম্বলিত তৌরাত গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। প্রাচীনকালে ইহুদি ধর্মাবলম্বীগণ এসেন, স্যাড্যুসী ও ফ্যারিসী—এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলো। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ইহুদিদের মধ্যে ক্যাবালিস্ট ও হাসিদিম নামে দু'টি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিস্টীয় আঠারো শতকে ইহুদি ধর্মে এক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সংস্কারপন্থী ইহুদিগণ তৌরাতের বহু বিধি-নিষেধ বর্জন, ধর্মীয় উপাসনায় মাতৃভাষার ব্যবহার এবং আচার-অনুষ্ঠান হ্রাস করার পক্ষপাতী। আ.ন.ম.ব.র.

ঈ-ৎসিঙ : ভারত পর্যটনকারী চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু। চীনের চিলি প্রদেশে ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। ঈ-ৎসিঙ অতি অল্প বয়সে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং ক্রমশ বৌদ্ধ শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর মনে ভারত পর্যটনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বগামী ফা-হিয়েন ও হিউয়েনসাঙের আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ৬৭১ খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টন থেকে সমুদ্র পথে প্রথমে সুমাত্রা দ্বীপের শ্রীবিজয়ে উপনীত হন। সে-সময় শ্রীবিজয় বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে জলপথে তিনি পূর্ব ভারতের বাণিজ্যনগরী তাম্রলিপ্তে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে পদব্রজে নালন্দা, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, বৈশালী, কুশীনগর, সারনাথ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থ পরিদর্শন করেন। পরে পুনরায় নালন্দায় এসে দশ বছর কাল সেখানে তিনি গভীরভাবে বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা এবং ৪০০ বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করেন। এ সময়ে ঈ-ৎসিঙ ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেও কৃতবিদ্য হন ; কিন্তু তিনি কখনও চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেননি। সংগৃহীত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি নিয়ে নালন্দা থেকে তাম্রলিপ্ত ও জলপথে শ্রীবিজয় হয়ে ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ বছর পর তিনি স্বদেশে ফিরে যান। ঈ-ৎসিঙ বাকি জীবন ভারত থেকে সংগৃহীত বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ঈ-ৎসিঙ মূল সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমস্ত বিনয়পিটক চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতীয় ভিক্ষুদের সাহায্যে তিনি সর্বমোট ৫৬টি বৌদ্ধ শাস্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া ঈ-ৎসিঙ ৭টি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তন্মধ্যে দু'টি গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থ দুটির একটিতে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা ও বৌদ্ধ ধর্মের রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব জানার জন্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি পশ্চিম দেশে আসতেন তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত ও সাধনা অপর গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। প্রথম গ্রন্থটি ইংরেজিতে ও শেষেরটি ফরাসিতে অনূদিত হয়েছে। সু. মু.

ঈদুল আযহা : এটি মুসলিমদের একটি অতি পবিত্র উৎসব। প্রাচীনকালে নবী হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়ে নিজ ঈমান ও সর্বোচ্চ ত্যাগের যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তারই স্মরণে প্রতি বৎসর পালিত হয় ঈদুল-আযহা উৎসব। প্রতি হিজরি সনের শেষ মাস জিলহজ মাসের দশম দিনে এই উৎসব পালিত হয়। ঐদিন প্রভাতে মসজিদ বা ময়দানে সমবেত নামাজে যোগদান করে ঘরে ফিরে সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান পশু জবেহ করেন। এই অনষ্ঠানকে বলা হয় কুরবানী। বহু মুসলমান প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশ থেকে এই দিনে হজব্রত পালনের জন্য মক্কা গমন করেন এবং ঐখানেই কুরবানী দিয়ে থাকেন। একটি ছাগল-ভেড়া-দুম্বায় একজন এবং গরু কিংবা উটে সাতজন একত্রে কুরবানী দিতে পারে। আ.সৈ.গো.দ.

ঈদুল ফিতর : মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। রমজানের পুরো একমাস রোজা বা সিয়াম পালন এবং তৎসংশ্লিষ্ট ইবাদত ও বিধি-নিষেধ পালনের পর আনন্দ প্রকাশের জন্য শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে জাঁক-

www.pathagar.com

জমকের সাথে এই উৎসব পালিত হয়। দিনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভাল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন, গরিব দুঃখীদের মধ্যে ফিতরা বিতরণ এবং জামাতে ঈদের সালাত আদায়। তবে এই দিনের তাৎপর্যময় কাজ হলো ফিতরা বিতরণ। সিয়াম পালনের সময় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তা পূরণের জন্য এবং যাতে সমাজের সর্বস্তরের লোক ঈদোৎসবে অংশীদার হতে পারে তজ্জন্য গরিব দুঃখীদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হারে সাদ্‌কায়ে ফিতরা বিতরণ করতে হয়। সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষে ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। মাথা পিছু কত টাকা ফিতরা দিতে হবে তা আগেই রাষ্ট্র কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দেন। এই ফিতরা ঈদের নামাজের আগেই পরিশোধ করতে হয়। তারপর ঈদগাহে কিংবা এর অভাবে বড় মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করতে হয়। ঈদুল ফিতরের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তকবিরসহ দু'রাকাত ওয়াজিব সালাত পড়তে হয়। সালাতের শেষে ইমাম সাহেবকে পর পর দু'টি খুতবা পাঠ করতে হয়। এইদিন মুসলমানেরা ইর্ষা-দ্বন্দ্ব ভুলে পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করে থাকে। ঈদের দিন সিয়াম পালন হারাম। কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান আছে এমন : 'রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।' আ. সৈ. গো. দ.

ঈদে মিলাদুন্নবী : এটি নবি দিবস নামে পরিচিত। মুসলমানদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মদিন ও ওফাদ দিবস। এ জন্মদিন ও ওফাদ দিবসের তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। বলা হয়, সমগ্র আরব বিশ্ব যখন পৌত্তলিকতার অন্ধকারে ডুবে যেতে বসেছিল, তখন আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। মুহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ সালের ১২ রবিউল আউয়াল। ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত পাওয়ার পর তিনি পৃথিবীবাসীকে মুক্তি ও শান্তির পথে আহ্বান করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই আহ্বান পৌঁছে দিয়ে ৬৩ বছর বয়সে ৬৩২ সালের এই ১২ রবিউল আউয়ালেই তিনি ইন্তেকাল করেন। কুরআনে মহান আল্লাহর আদেশ আছে, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি অনুগ্রহ কামনা করেন। হে মোমিনগণ, তোমরাও নবির জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।' ৩৩:৫৬। ঈদে মিলাদুন্নবীতে বিশেষ করে দরুদ ও সালাম জানানো হয়। মিশরে ফাতেমী বংশীয় শাসকগণ এ বরকতপূর্ণ দিনে স্বজন, উলেমা, পির ও মাশায়েখগণকে আমন্ত্রণ করে অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য সামাজিকভাবে দরুদ ও সালাম পেশ, জশন-ই জুলুম, খতম শরিফ, নাথ, হামদ ও ছানা এবং নবি করিম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনী আলোচনা ও ওয়াজমাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতেন। আরবে ঈদে মিলাদুন্নবী ৬০৪ হি/১২০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত হয়। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায়, তুরস্ক, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এদিন যথাযোগ্য পর্যাদার সাথে পালিত হয়। ঈদে মিলাদুন্নবীতে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মহান চরিত্র পবিত্র জীবন, নৈতিক আদর্শ আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর ও সফল করতে পারেন। আ. সৈ. গো. দ.

ঈ-নীড : মহাকাব্য। প্রাচীন রোমের শ্রেষ্ঠ কবি ভার্জিল রচিত ল্যাটিন ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র ট্রোজান বীর ঈনিয়াসের নাম অনুসারেই কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে। ট্রয়ের পতনের পর ঈনিয়াস কি ভারে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বহু কষ্ট বরণের পর বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বর্তমান রোমের প্রতিষ্ঠাতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তারই কাহিনী ঈনীড কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাদশ সর্গে রচিত এই মহাকাব্যে

www.pathagar.com

রচনার ভার্জিলের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মহান রোমান সম্রাট অগাস্টাসের নেতৃত্বে রোমের অভ্যুদয়ের যশোগান। যে প্রভূত স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে রোমক জাতির মহত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছিলো ভার্জিল তারই প্রতি আলোকপাত করেছেন এই কাব্যে। রোমকদের গুণাবলীর প্রশংসা তিনি করেছেন ; তাদের দুর্বলতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। মোট কথা গোটা কাব্যে ঈনিয়াসের বিপুল কর্মকীর্তির কথার মধ্য দিয়ে তিনি অগাস্টাসের সমকালীন রোমান জাতির চরিত্র-মহিমা ও কর্মকীর্তিরই যেন জয়গান গেয়েছেন। ভার্জিল এই কাব্য রচনায় হোমার প্রভৃতি পূর্ববর্তী বহু লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত উপকরণকে নিজস্ব ভাষা ও কল্পনাশক্তির যাদুস্পর্শে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাষার গাম্ভীর্য ও ভাববৈচিত্র্য ঈনীড কাব্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

সু. মু.

ঈভ : বাইবেলে বর্ণিত মানবজাতির আদি জননী ; প্রথম সৃষ্ট মানব আদমের স্ত্রী। মুসলমানদের কাছে তিনি 'হাওয়া' নামে পরিচিতা। কোরানে ও বাইবেলে বিশ্বের প্রথম নারী সৃষ্টি সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। নিদ্রামগ্ন আদমের বাঁ পাঁজরের অংশবিশেষ থেকে আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেন। তারপর প্রভু পরমেশ্বর বললেন, 'মানুষের একা থাকা ভাল নয় ; তার অনুরূপ সহকারিনী একজনকে আমি মানুষের জন্য তৈরি করব।' ..."তিনি মানুষকে (আদমকে) গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন... তাঁর একখানি পাঁজর নিয়ে...সেটি দিয়ে একটি নারী গড়ে তুলে তাকে পুরুষটির কাছে উপস্থিত করলেন। পুরুষটি তখন বলল, 'এটি হল আমার অস্থি থেকে গঠিত অস্থি, আমার দেহ থেকে গঠিত দেহ, এর নাম হবে নারী, কেননা নরদেহ থেকে একে তুলে নেয়া হয়েছে।' ...পুরুষ (আদম) নিজ স্ত্রীর নাম রাখল 'হবা', কারণ সে জীবিত সকলের জননী হল।" —ওল্ড টেস্টামেন্ট]। হিব্রু ও আরবি ভাষায় 'ঈভ' শব্দটি 'হবা' (হাওয়া) রূপে প্রচলিত। হিব্রু ভাষায় এ শব্দটির অর্থ জীবিতা বা জীবনদায়িনী। মুসলমানদের কাছে তিনি 'হাওয়া' নামেই পরিচিতা। ওল্ড টেস্টামেন্টের মতে ঈভ সর্পবেশী শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে আদমকেও একাজে প্ররোচিত করেন (মতান্তরে মদ্যপানের কথা আছে)। খ্রিস্টীয় মতে এই আদি পাপের ফলেই বিশ্বের সকল নারীকে রজঃস্রাব, গর্ভধারণ, প্রসববেদনা ইত্যাদি জনিত শাস্তি ভোগ করতে হয়। স্বর্গচ্যুত ও পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার পর মক্কার অদূরে আরাফাত ময়দানে আদম ও ঈভের পুনর্মিলন ঘটে।

সু. মু.

ঈমান : অর্থ বিশ্বাস। আরবি আমল হতে উদ্ভূত ঈমানের আভিধানিক অর্থ শান্তি অর্জন। ঈমান ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। এর ইসলামী পরিভাষায় অর্থ সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং স্বীকৃতি দেয়া। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে ঈমান এনে বিশ্বাসের সকল দিক পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে সৎকর্ম করে তাকে মোমিন বলে। সাধারণত চারটি অঙ্গীকারের মাধ্যমে একজন মুসলিম মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসকে প্রকাশ করেন। প্রথম কলিমা তৈয়ব—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রাছুলাল্লাহ' যার অর্থ 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মামুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। দ্বিতীয় হলো সাক্ষ্য বাক্য বা কালিমা শাহাদত—'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই ; এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।' তৃতীয় হলো সংক্ষিপ্ত ঈমান বাক্য বা ঈমানে মুজমাল—'আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি ও মৌখিকভাবে স্বীকার করি এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলীসহ তাঁর উপর ঈমান আনলাম এবং তাঁর সকল আদেশ মেনে নিলাম।' চতুর্থ হলো বিষদ ঈমান বাক্য বা

www.pathagar.com

ঈমানে মুফাছ্ছাল্—'আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণ, রোজ কিয়ামত এবং তকদিরে ভাল ও মন্দ সকল আল্লাহ্ হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনলাম।' এই সাতটি বিষয়ে ঈমান রাখার উপরে ইসলাম ধর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সমস্ত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ও সর্বত্র বিরাজমান, জীবন্ত ও চিরস্থায়ী। আ. সৈ. গো. দ.

ঈশপ্‌স্ ফেবল্‌স্ : ঈশপ্‌স্ ফেবল্‌স্ বা ঈশপের গল্পগুলো প্রাচীন বিশ্বের গল্প-ভাণ্ডারে গ্রীকদের বিশেষ অবদান। ঈশপ প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে জানা যায়। রূপকচ্ছলে পশু-পক্ষীর চরিত্র আশ্রয় করে লোকচরিত্র ও জীবনতত্ত্ব রূপায়ণই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। ইশপের আগে রূপকাশ্রয়ী পশু-পক্ষীর গল্প বড় কেউ একটা লেখেন নি। গল্পচ্ছলে নীতিকথা বলা, উপদেশ প্রদান করার একটা সজ্ঞান চেষ্টা ঈশপের গল্প-গুলোতে দেখা যায়। ঈশপ লেখক ছিলেন না, তিনি ছিলেন গল্পের কথক। শোনা যায়, তিনি পথের ধারে বসে ছেলেমেয়েদের জড়ো করে তাদের কাছে নানা গল্প বলতেন। তিনি দেখতে কুৎসিত ছিলেন। কিন্তু তাতে ছেলেমেয়েদের কিছু এসে যেত না। তারা গল্প শোনার জন্যে তাঁর চারদিকে ভিড় জমাত। ঈশপের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হচ্ছে এই : তিনি গ্রীসের থ্রেস প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি গ্রীক মহিলা কবি স্যাফো ও গ্রীসের তথাকথিত 'সপ্তজ্ঞানী লোকের' সমসাময়িক ছিলেন। তিনি প্যাসেসে দ্বীপে আয়াডমন নামক এক মনিবের গৃহে ক্রীতদাসের কাজ করতেন। আয়াডমন পরে তাঁকে মুক্ত করে দেন। ঈশপের মৃত্যু সম্পর্কে নানা লোকশ্রুতি আছে। একটি কিংবদন্তী এই যে তিনি ভেলকির অধিবাসীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। বিশ্বের নানা ভাষায় ইশপের গল্পগুলো অনূদিত হয়েছে। সুধীসমাজে ঈশপের গল্পগুলো 'Wisdom Literature' বা জ্ঞানগর্ভ নীতি উপদেশমূলক সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। খ্রিস্টীয় সমাজে বাইবেলের পরই গুরুত্বলাভ করেছিলো নীতি ও সদুপদেশপূর্ণ ঈশপের গল্পগুলো। এমন সৌভাগ্য অন্যকোন শ্রেণীর গল্পের ভাগ্যে ঘটে নি। গোটা পৃথিবীতে ঈশপের গল্প জনপ্রিয় হয়েছে। সু. মু.

ঈশা খাঁ-স্বর্ণময়ী : মোহাম্মদ আবুল কাসেম লিখিত একটি উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা, ১৯৩০ (মখদুমি লাইব্রেরি)। সোনারগাঁর বিখ্যাত ভুঁইয়া ঈশা খাঁর সঙ্গে বিক্রমপুরের বিখ্যাত ভুঁইয়া রায় পরিবারের কন্যা স্বর্ণময়ীর প্রণয়কে ভিত্তি করে বিশ শতকের গোড়ার দিকে মোট তিনটি উপন্যাস রচিত হয়। অন্য দুটির লেখক শশিভূষণ বিশ্বাস (সোনাবিবি, ১৯১১) এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী (ঈসা খাঁ ও রায়নন্দিনী, ১৯১৬)। একই বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও উপন্যাস তিনটিতে লেখকত্রয়ের মনোলোক ত্রিধাবিভক্ত। শশিভূষণ বিশ্বাসের উপন্যাসে হিন্দু চরিত্রগুলোকে অপেক্ষাকৃত ভালো এবং মুসলমান চরিত্রগুলোকে অপেক্ষাকৃত খারাপরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর রায়নন্দিনী উপন্যাসে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করেন। মোহাম্মদ আবুল কাসেম তাঁর উপন্যাসটি লেখার সময়ে উল্লিখিত অভিযোগের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। তার ফলে তাঁর উপন্যাসে ঈশা খাঁ-স্বর্ণময়ীসহ উপন্যাসের সকল চরিত্রকে অসাম্প্রয়ায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করা হয়। ইতিহাস-নির্ভরতার দিক দিয়েও উপন্যাসটি পূর্ববর্তী উপন্যাস দুটোর তুলনায় অধিক বাস্তবানুগ। এ উপন্যাসে ঈশা খাঁ হিন্দু বংশোদ্ভূত, তিনি চাঁদ রায় ও প্রতাপাদিত্যকে গুরুজনের মতো মান্য করতেন। চাঁদ রায় পরিবারের সঙ্গে ঈশা

www.pathagar.com

খাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিলো, সেই সুবাদে বিধবা স্বর্ণময়ীর সঙ্গে ঈশা খাঁর পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে প্রণয়, এবং প্রণয় থেকে তাঁদের বিয়ে হয়। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর স্বর্ণময়ী সহমৃতা হন। স্বরূপচন্দ্র রায়ের 'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস' (১৮৯০) ও কেদারনাথ মজুমদারের 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' (১৯০৫) গ্রন্থের তথ্য, পাশাপাশি ঐতিহাসিক জেমস ওয়াইজ ও আবদুল করিমের গবেষণার সঙ্গে মোহাম্মদ আবুল কাসেমের উপন্যাসের কাহিনীর মিল অধিক। **স্ব. স.**

ঈশান কোণ : পুরাণ মতে এই কোণের অধিপতি হচ্ছেন শিব। পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণকে ঈশান কোণ বলা হয়। ঈশান মূলত শিবকে বলা হয়। শিবের রুদ্রমূর্তির ন্যায় ঈশান কোণের মেঘও ঝড়ের আকারে রুদ্রমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। 'ঈশানের পঞ্জীভূত মেঘ ...' রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে প্রভাবিত করেছে। **ম. চৌ.**

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, রায় বাহাদুর : গদ্যশিল্পী ও অনুবাদক। ১২৬৭ সনে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই পিতৃহীন হন। নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায় গুণে বৃত্তিসহ কলেজের শিক্ষা লাভ করেন। সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন প্রথমে গৃহশিক্ষকতা ও সংবাদ পত্রে রচনাদি লিখে। ১৮৮০ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশন থেকে প্রথম গ্রেডে বৃত্তিসহ বি.এ. এবং ১৮৮২ সালে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. পাস করেন। ১৮৮৫ সালে সরকারি শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন। এই সূত্রে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন, পরে স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত হন। প্রখর ব্যবসায়ী বুদ্ধির জন্য তাঁকে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরামর্শদাতা ও পরিচালক নিযুক্ত করে। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। পিতা-মাতার স্মৃতি রক্ষাকল্পে তাঁদের নামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া পুষ্করিণী খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মন্দির তৈরি ও হাসপাতালে অকাতরে অর্থদান করেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রে ঈশানচন্দ্র ঘোষ যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দীর্ঘদিন শিক্ষা বিভাগে থাকায় তিনি সফলতার সঙ্গে কয়েকটি স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব মূল পালি থেকে 'বৌদ্ধজাতকে'র অনুবাদ। দীর্ঘ দিনের সাধনায় তিনি এ কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি ১৩৪২ সনের ১১ কার্তিক মৃত্যুবরণ করেন। **আ. জ. ভূ.**

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি। ১৮৫৬ সালের ১৫ মার্চ হুগলীর গুলিটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হিন্দু স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে কলকাতা হাইকোর্টের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি লাভ করেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৩০০ সালে হুগলী থেকে 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ঈশানচন্দ্র ছিলেন অত্যধিক ভাবপ্রবণ। শেষ জীবনে মাত্রাতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার জন্য বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করে প্রাণ বিসর্জন দেন। ঈশানচন্দ্র নিঃসন্দেহে একজন সুকবি ছিলেন। তাঁর কাব্যে অগ্রজ হেমচন্দ্রের ক্ষীণ অনকৃতি থাকলেও তিনি যে বেদনাবিহ্বল প্রেমের চিত্র অংকন করেছেন তাতে তাঁর বিশিষ্ট শিল্পরূপটি সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর কবিতার গীতি-উচ্ছ্বাস বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম। মোট চারটি কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। চিত্তমুকুর (১২৮৫), বাসন্তী (১৮৮০), যোগেশ-কাব্য (১৮৮১) ও চিন্তা (১৮৮৯)। অন্তর্গূঢ় বেদনার এক অকৃত্রিম প্রকাশ যোগেশ কাব্যগ্রন্থ। 'সুধাময়ী' নামে তাঁর একখানি অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩০১-০২ ও ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। তিনি ১৮৯৭ সালের ১২ জুন মৃত্যুবরণ করেন। **আ.জ.ভূ.**

ঈশান নাগর : সিলেট জেলার নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর

www.pathagar.com

পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর তাঁর বিধবা মাতা তাঁকে নিয়ে স্বগ্রামবাসী অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে নদীয়ার শান্তিপুরে এসে অদ্বৈত আচার্যের আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। ঈশান নাগর অদ্বৈতর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরুর আদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারার্থে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। গুরু পত্নীর আদেশেই অদ্বৈত জীবনী অবলম্বনে তিনি 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ প্রণয়ন (১৫৬৮) করেন। 'চৈতন্য-ভাগবতে' তাঁকে চৈতন্য দেবের গৃহভৃত্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর তিনি শচীমাতা ও বিষ্ণু প্রিয়ার সেবা করতেন। 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ থেকে চৈতন্য এবং অদ্বৈতাচার্য সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য অবগত হওয়া যায়। তবে এ গ্রন্থের অনেক বিষয়ই প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতদের ধারণা। মু. আ. জ.

ঈশান যুগী : বাউল-সাধক ও বাউল-গান রচয়িতা। জীবনকাল আঠারো-উনিশ শতক। বাউল দীনু তাঁর গুরু এবং বাউল মদন তাঁর শিষ্য ছিলেন। বাউল ধর্মের তত্ত্বকথা ঈশান যুগীর গানে রসমণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একটি বিখ্যাত গান—'ধন্য আমি বাঁশীতে তোর আপন মনের ফুঁক,/এক বাজনে ফুরাই যদি,/নাইরে কোন দুখ।' মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত 'হারামণিতে' এবং উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'বাঙলার বাউল ও বাউল গানে' ঈশান যুগীর পদ সঙ্কলিত হয়েছে। মু. আ. জ.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : কবি ও সাংবাদিক। ঈশ্বর গুপ্ত নামে সমধিক পরিচিত। চব্বিশ পরগনার কাঁচড়াপাড়ার শিয়ালডাঙ্গায় ১৮১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত শিয়ালডাঙ্গা কুঠিতে মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরি করতেন। পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা ঈশ্বরগুপ্তকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন তাঁর মা মারা যান। হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। বিমাতার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ঈশ্বরগুপ্ত সেই বাল্যকালেই (১৮২২) পিতৃগৃহ ত্যাগ করে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মাতামহের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কলকাতায় নিজের চেষ্টায় ইংরেজি, সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষা, বেদান্তদর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্র শেখেন। ১৮২৭ সালে দুর্গামণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দুর্গামণি ছিলেন বোকা ও দেখতে কুৎসিত। তাই ঈশ্বরগুপ্তের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। এটি ভারতীয় ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। পত্রিকাটি ১৮৩১ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়, ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন দৈনিকে রূপান্তরিত। ঈশ্বরগুপ্ত মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ লুপ্ত, কিন্তু মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব তখনও হয়নি,—এই দুয়ের মাঝখানে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে খণ্ড কবিতা রচনার আদর্শ প্রবর্তন করেন। সমাজ জীবনের চারপাশে যা দেখেছেন তা নিয়েই কবিতা লিখেছেন। ব্যঙ্গরসাত্মক ও কৌতুক কবিতা রচনায় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপই তাঁর রচনারীতির বিশেষত্ব। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই তাঁকে বিদ্রূপাত্মক করে তুলেছিল। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর ন্যায্য পাওনা পান নি। সেই ক্ষোভ থেকে যখনই অবকাশ পেয়েছেন তখনই বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেছেন। অসুখী দাম্পত্য জীবনের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। অনুপ্রাস ও অলংকারের চাকচিক্য ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর দেশপ্রেমমূলক ও নীতিকবিতাগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সমর্থক ছিলেন। তাঁর কবিতায় তাঁর সে মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রামচন্দ্রগুপ্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো আট খণ্ডে সংকলন (১৮৬২-১৮৭৪) করেন। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু ১৮৫৯ সালের ২৩ জানুয়ারি। নু. ই.

www.pathagar.com

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যশিল্পী। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা ভগবতী দেবী। গ্রামের পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আট বছর বয়সে পিতার কর্মক্ষেত্র কলকাতায় আসেন। ১৮২৯ সালে কলকাতা সরকারি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। বিদ্যাচর্চা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষালাভ শেষ করে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৮৪৯ সালে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরের বছর (১৮৫০) এ কলেজের নবসৃষ্ট অধ্যক্ষ পদে নিযুক্তি লাভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। এছাড়া সংস্কৃতের বদলে ইংরেজিতে গণিত শিক্ষাদান, বেদান্তের সঙ্গে মিলের লজিক পাঠ ও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার রীতি চালু করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সরকার ১৮৫৫ সালে তাঁকে হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত করে। এ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে এই জেলাগুলোর গ্রামাঞ্চলে ২০টি বালক বিদ্যালয় ও ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন তাঁর কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলে ১৮৫৮ সালে ৫০০ শত টাকা বেতনের সরকারি চাকরি থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর সারাজীবন আপোসহীন সংগ্রাম চালান। বহু বিবাহ প্রথা রহিত ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্য শাস্ত্রসম্মত যুক্তির অবতারণা করেন। বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করার জন্য হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতার মুখে তিনি সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে বিধবা-বিবাহ আইনের একটি খসড়াও সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। ব্যবস্থাপক সভা খসড়াটি গ্রহণ করে। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে খসড়াটি আইনে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগরের সাধনা ও শ্রম সার্থকতা লাভ করে। বিদ্যাসাগর শিল্পসম্মত বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিসেবে খ্যাত। তাঁকে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের গদ্যে লালিত্য ও ছন্দমাধুর্যের অভাব ছিল। বিদ্যাসাগরই স্বতঃস্ফূর্ত, গতিশীল ও ব্যঞ্জনাময় বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেন। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সাহিত্য রচনা – উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রাখেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বই : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), হিন্দি থেকে অনুবাদ ; শকুন্তলা (১৮৫৪), সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ; সীতার বনবাস (১৮৬০), সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ;ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), ইংরেজি থেকে অনুবাদ। বিদ্যাসগারের দানশীলতা ও মানবপ্রীতি সর্বজনবিদিত। তাঁর সমাজ সংস্কারের স্বীকৃতি হিসেবে মহারানী ভিকটোরিয়া তাঁকে সি.আই.ই. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই কলকাতায় পরলোক গমন করেন। **নূ. ই**

ঈশ্বরপুরী : মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং শ্রী চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু। জন্মস্থান কুমারহট্ট বা হালিশহর, কর্মস্থল গয়া। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে যে ঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসী হয়েও সাধারণ বেশে থাকতেন। সেজন্য নবদ্বীপে অদ্বৈতের গৃহে গেলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেন নি। চৈতন্য জীবনচরিত থেকে জানা যায়, ঈশ্বরপুরী 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামে একটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন। নিমাই ১৫০৮ সালে গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্য নাম গ্রহণ করেন। পুরী থেকে বৃন্দাবন যাত্রার পথে চৈতন্যদেব যখন গৌড়দেশে আগমন

www.pathagar.com

করেন, তখন তিনি কুমারহট্ট গ্রামে গিয়ে ঈশ্বরপুরীর নাম করে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। রূপ গোস্বামী সংকলিত 'পদাবলী'তে ঈশ্বরপুরী বিরচিত তিনটি শ্লোক স্থান পেয়েছে। সু. মু.

ঈসা খাঁ : পূর্ববঙ্গের বার ভুঁইয়ার প্রধান। আবুল ফজল রচিত 'আকবর নামা'য় (১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ) একজন প্রসিদ্ধ ভুঁইয়া হিসেবে ঈসা খাঁর উল্লেখ আছে। তাঁর পিতা (মতান্তরে পিতামহ) কালিদাস গজদানী ছিলেন অযোধ্যাবাসী রাজপুত, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাবেক ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ অঞ্চল সুসং ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলা এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার কিয়দংশ ঈসা খাঁর শাসনাধীন ছিল। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মুঘল বাহিনীর হাতে আফগান নেতা দাউদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হলে ঈসা খাঁ পূর্ববঙ্গে মুঘলদের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। বঙ্গদেশে আকবরের দলত্যাগী সেনাপতি ও বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা মাসুম খাঁ কাবুলীকে ঈসা খাঁ আশ্রয় দিয়ে তাঁকে তাঁর সহযোগী করে নেন। অন্যান্য বার ভুঁইয়াও মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খাঁর সঙ্গে যোগ দেন। মুঘল সেনাপতি তরসুন খাঁ এই মিলিত বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ঈসা খাঁ ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আক্রমণ করে মুঘল সেনাপতি শাহবাজ খাঁকে বঙ্গদেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করেন ; কিন্তু ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি মানসিংহ ঈশা খাঁর রাজ্যের অধিকাংশ স্থান দখল করলে ঈশা খাঁ পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ঈসা খাঁর রাজধানী কাত্রাভু আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হন। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খাঁ সম্রাট আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথিত আছে যে, ঈসা খাঁ মানসিংহের সঙ্গে আগ্রায় যান এবং সম্রাট তাঁকে 'দেওয়ান' ও 'মসনদ-ই-আলী' উপাধি দান করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঈসা খাঁর মৃত্যু হয়। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের নিকট হয়বতনগর ও জঙ্গলবাড়িতে ঈসা খাঁর বংশধরগণ এখনো বর্তমান। আ.জ. ভূ.

উইলকিন্স, স্যার চার্লস : চার্লস উইলকিন্স ১৭৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের সমরসেট শায়ারের ফ্রোমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওয়াল্টার উইলকিন্স। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশ বছর বয়সে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটারের পদ নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। কলকাতায় সেক্রেটারির অফিসে দু'বছর কাজ করে তিনি মালদহে কোম্পানির কুঠিতে সহকারী সুপারিন্‌টেন্ডেন্টরূপে কাজ করেন। চরিত্রে অনেক দোষ থাকলেও গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন এদেশের ভাষা-সাহিত্য ও জ্ঞানভাণ্ডারের অনুরাগী। তাঁরই প্রবর্তনায় উইলকিন্স সংস্কৃত, ফারসি ও বাংলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সমস্ত ভাষায় তিনি হরফ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাঙলা হরফ নির্মাণ কাজে তাঁর অন্যতম সহায়ক ছিলেন হুগলী জেলার পঞ্চানন কর্মকার। হেস্টিংসের নির্দেশে হরফ তৈরি করিয়ে উইলকিন্স ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলী থেকে হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপান। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কোম্পানির প্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি উক্ত প্রেসের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ঐ পদে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। তিনি বাংলা ছাড়া সংস্কৃত ও ফারসি হরফও নির্মাণ করেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মালদহ ছাপাখানায় ফ্রান্সিস গ্লাড-উইন সংকলিত ইংরেজি-ফারসি অভিধান ছাপা হয়। হেস্টিংসের আগ্রহেই উইলকিন্স মহাভারত ও ভাগবদগীতা অনুবাদ করেন। গীতা ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে মুদ্রিত হয়। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠাতেও (১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। লন্ডনে ইন্ডিয়া সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হলে (১৭৯৯ খ্রিঃ) তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু সেখানে কাজ করেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চদরের লেখক। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্স'-এ তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। তাঁর অন্যান্য রচনা—'Story of Shakuntala from the Mahabharate', Compilation of Jon's Manuscripts', 'Rechardson's Persian-Arabic-English Dictionary, 'A grammar of the Sanskrit language', 'Redicals of the Sanskrit language'. ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সু. মু.

উইলিয়ম ইয়েট্‌স : ইংল্যাণ্ডের লোবরা নামক স্থানে তিনি ১৭৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জুতা তৈরির ব্যবসা ছিল তাঁর পৈত্রিক পেশা। ব্রিস্টলের ব্যাপটিস্ট কলেজে অধ্যয়নকালে ইয়েট্‌স প্রাচ্য ভাষা সম্পর্কে উৎসাহিত হন এবং সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শিখেন। ১৮১৫ সালে ভারতে এসে তিনি বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। এ ব্যাপারে উইলিয়ম কেরী তাঁকে সহায়তা করেন। সমসাময়িককালে উইলিয়ম ইয়েট্‌স একজন দক্ষ প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারী গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। সংস্কৃত, বাংলা, গ্রিক, হিব্রু ইত্যাদি ভাষাচর্চা ছাড়াও ধর্মযাজকের কাজ, ধর্মসংক্রান্ত বক্তৃতা ও মুদ্রণ বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় ছিল তাঁর তখন নিত্যকর্ম। কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এছাড়া ইয়েট্‌স ভারত-প্রবাসী ইউরোপিয়দের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ সালে স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের কর্মে ব্রতী হন। ১৮২৪ সাল থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল তিনি স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮২৬ সালে অবশ্য স্বাস্থ্যলাভের জন্য একবার বিলাত যান। স্কুল বুক সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ইয়েট্‌স রচিত বাংলা গ্রন্থাবলী : পদার্থবিদ্যাসার (১৮২৫), জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩৩), সারসংগ্রহ (১৮৪৪), বাইবেল (অনুবাদ, ওয়েঙ্গার ও সি.বি. লুইস কর্তৃক ইয়েট্‌সের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৮৬১ ও ১৮৬৭ সাল), প্রাচীন ইতিহাসের সমুচ্চয় (১৮৩০), সত্য ইতিহাস সার (১৮৩০), হিতোপদেশ (১৮৪১)। Introduction to the Bengali Language (১৮৪৭), Bengali Grammar (১৮৪৯), The Dying words of Jesus (১৮১৮), Barters call to the unconverted (১৮৩৬), Translation of Dodridge's Rise and Progress of Religiqn (Anglo-Bengali, ১৮৪০) ইত্যাদি তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ। মৃত্যু : জুন ১৮৪৫। ম. ই

উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন : ১৮৮১ সালের ৭ মে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক। কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও দর্শন পড়েন। লন্ডন মিশনারি সোসাইটির সদস্য হয়ে কলকাতায় আসেন এবং সেখানকার লন্ডন মিশনারি কলেজে উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে মিশনারি সমাজের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় গৃহশিক্ষকের কাজ নিয়ে দিল্লি চলে যান। সি.এফ.এন্ড্রুজের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯১২ সালে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। তিনি ধীরে ধীরে বাংলার সংস্কৃতি আত্মস্থ করেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল আশ্রমের পাশের সাঁওতাল পল্লী। ১৯১৩ সালে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের জন্য এন্ড্রুজের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা যান। ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। শান্তিনিকেতনের 'পিয়ার্সন পল্লী' তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান যান। পিয়ার্সন

www.pathagar.com

চীনও ভ্রমণ করেন। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর রচিত একটি পুস্তকের প্রচার তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়। সরকার কর্তৃক বন্দি হয়ে তিনি ইংল্যান্ডে নীত হন এবং যুদ্ধকাল পর্যন্ত গৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গা ভ্রমণ করেন। ১৯২১ সালে পুনরায় শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রাকালে ইতালিতে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। পিয়ার্সন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস ও কিছু কবিতার অনুবাদ করেন। জাপানে অবস্থানকালে তিনি 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর এই পুস্তক অনূদিত হয়। তিনি ১৯২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। আ. জ. ভূ.

উইলিয়ম ওয়ার্ড : ১৭৬৯ সালের ২০ অক্টোবর ব্রিটেনের ডার্বি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মুদ্রণশিল্পে শিক্ষা লাভ করে উইলিয়ম ওয়ার্ড ছাপাখানার কাজ নিয়ে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। এদেশে বাইবেল মুদ্রণ ও তার প্রচারের পুণ্য আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে ছিলো। ক্রমে উইলিয়ম কেরী, যশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ডের সমবেত প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ওয়ার্ড নিজে মিশন প্রেসের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এছাড়া তিনি শ্রীরামপুরে একটি কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপন এবং তা পরিচালনা করেন। শ্রীরামপুর কলেজের আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড সারা ইউরোপ ঘুরে প্রায় তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। শ্রীরামপুরেই তাঁর জীবনাবসান হয়। একজন বক্তা ও লেখক হিসেবেও ওয়ার্ডের সুনাম ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ —View of the History, Literature and Mythology of The Hindus : Including a Minute Description of their manners and customs (চার খণ্ড ১৮১১), Memoirs of Krishna Pal the First Hindu convert of Bengal. তিনি ১৮২৩ সালের ৭ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। আ. জ.

উইলিয়ম জোন্‌স্‌, স্যার : ১৭৪৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে অক্সফোর্ডে প্রাচ্য ভাষা শিখেন। এছাড়া পাশ্চাত্যের নানা ভাষা শিক্ষা করে তিনি একজন পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত হন। ১৭৮৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসেবে জোন্‌স ভারতে আগমন করেন। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও তার আজীবন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইংরেজদের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও তৎসম্পর্কে গবেষণা করেন। জোন্‌স তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও ভাষণে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রিক, ল্যাটিন, গথিক ইত্যাদি ভাষার প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত ভাষাসমূহ ও ফারসি ভাষা একটিমাত্র মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর এই গবেষণা ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত, ফারসি ও আরবি ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। জোন্‌স ভাষা ও সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ১৭৭০ সালে তিনি ফারসি ভাষায় রচিত নাদির শাহের জীবনী ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। পরের বছর ফারসি ভাষায় একটি ব্যাকরণ লেখেন। এছাড়া অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন তিনি। তাঁর অনূদিত 'শকুন্তলা' পাঠ করে সংস্কৃত সাহিত্যের উপর জার্মান সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উইলিয়ম জোন্‌স গীতগোবিন্দ ও হিতোপদেশ এবং মুসলমান আইনেরও অনুবাদ করেন। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। পাশ্চাত্যদেশে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনই ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত। ১৭৯৪ সালের ২৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। আ. জ. ভূ.

www.pathagar.com

উইলিয়ম মর্টন : লন্ডন মিশনারি সোসাইটির যাজক ছিলেন। ভারতে এসে তিনি উত্তর বিহারের মুঙ্গেরে অবস্থান করেন। পরে দিনাজপুর মিশনে কিছুকাল কাজ করে কলকাতায় আসেন। শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে তিনি দুই বৎসরকাল যুক্ত থেকে বাংলা অধ্যয়ন করেন। বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করার পর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। উইলিয়ম মর্টনের রচনাবলী—দ্বিভাষার্থক অভিধান or Dictionary of the Bengali Language with Bengali synonyms and English Interpretation (১৮২৮), দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ or A collection of Proverbs, Bengali and Sanskrit with their translation and application in English (১৮৩২), প্রার্থনাপুস্তক or Proverbs of Solomon (১৮৩৩), The Life of Daniel/the Prophet of God with a Bengali Translation (১৮৩৭), তথ্য প্রকাশ ও বজ্রসূচী or a Treatise on Idol worship and other Hindoo observances by Brajamohon Deb followed by translation from Vajrasuchi of Asvagosa (১৮৪২), Theological Vocabulary (১৮৪৫)। এছাড়া তিনি 'Short Questions 1835, Account of Madhu (১৮৩৬) ইত্যাদি খ্রিস্টীয় নীতিনিবন্ধ জাতীয় পুস্তিকা রচনা করেন। আ. ই

উইলিয়ম রাদিচে : কবি, গবেষক ও অনুবাদক। তিনি ১৯৫১ সালে উত্তর লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স করেন। ১৯৭৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অরিয়েন্টাল ও আফ্রিকান স্টাডিস থেকে বাংলায় ডিপ্লোমা লাভ করেন। পিএইচ.ডি. করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডক্টরাল থিসিসের শিরোনাম : Tremendous Literary Rebel : The Life and Works of Michael Madhusudan Dutta (1824-73)। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বিশের অধিক। কবিতার বই : Eight Sections (1974), Strivings (1981), Louring Skies (1985), The Retreat (1994) এবং Before and After (1995), Gifts (1999)। অনুবাদগ্রন্থ : Tagore's Selected Poems, 1995; Tagore's Selected Short Stories, 1991; উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'-এর অনুবাদ The Stupid Tiger and Other Tales, 1981; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক 'ডাকঘর'-এর অনুবাদ The Post Office, 1996; জর্মন লেখক Martin Kåmpchen-এর জর্মন ভাষায় লেখা গল্পের ইংরেজি অনুবাদ The Honey-Seller and Other Stories, 1994; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কণিকা', 'লেখন' এবং 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যত্রয়ের অনুবাদ Particles, Jottings, Sparks : The Collected Brief Poems of Rabindranath Tagore 2000। সম্পাদনা : Barbara Reynold-এর সঙ্গে যৌথ-সম্পাদনা The Translator's Art—Essays in Honour of Betty Radice, 1994; Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism (1997)। কোষগ্রন্থ : Teach Yourself Bengali, 1994. বাংলাদেশের সাহিত্য-অঙ্গনে উইলিয়ম রাদিচে খুব পরিচিত একটি নাম। চমৎকার বাংলা বলেন। ইংরেজি, জর্মন ও বাংলা ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল। ইংরেজিভাষী পাঠকের কাছে চিরায়ত বাংলা সাহিত্য, বিশেষভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁর অনুবাদ অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছে। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিসের বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার, বর্তমানে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগের প্রধান। স্ব.স.

উইলিয়ম হপকিন্স পিয়ার্স : ১৭৯৪ সালের ১৪ জানুয়ারি ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড ওয়ার্ডের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক শ্রীরামপুর এসে মিশনারির

কাজে ব্রতী হন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় লন্ডন ব্যাপটিস্ট মিশনের শাখা স্থাপন করেন। পরে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত মিশনারি প্রেস এক সময়ে বিখ্যাত ছাপাখানায় রূপান্তরিত হয়। বাংলার বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে তিনি মিশনারির কাজ পরিচালনা করেন। এক সময় স্কুল-বুক-সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। এদেশে নারী শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। একজন পণ্ডিত ও লেখক হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। মূল হিব্রু থেকে তিনি ফারসি ও বাংলায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য মুদ্রিত বাংলা পুস্তক—কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনী (১৮১৯), সত্য আশ্রয় (১৮২৮) ও ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮২৯)। তিনি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আ. জ. ভূ.

উইলিয়াম ফকনার : ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপির অন্তর্গত আলবেনীতে জন্মগ্রহণ করেন। মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন, কিন্তু স্নাতক ডিগ্রি লাভ করতে পারেন নি। উইলিয়াম ফকনারের চরিত্রে তাঁর পিতামহের প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে। তাঁর পিতামহ ছিলেন একজন অনমনীয় ও বেপরোয়া চরিত্রের। ফকনার বাল্যকালে এরূপ একটি চরিত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ায় পরবর্তী-কালে তাঁর ছোট গল্প ও উপন্যাসে সেই চরিত্রের ছাপ রেখে গেছেন। কবিতা দিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। কিন্তু সে সময় হঠাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি মসি ছেড়ে অসি ধারণ করলেন, ব্রিটিশ বিমানবাহিনীতে যোগদেন। কর্মজীবনে বিমান বাহিনীতে যোগদান ছাড়াও ভাগ্যের সন্ধানে তাঁকে রংয়ের কাজ থেকে শুরু করে অক্সফোর্ডে কিছুকাল পোষ্ট মাষ্টারের কাজও করতে হয়েছে। অন্যমনস্কতার অপরাধে শেষোক্ত কাজ থেকে তিনি এক সময় বরখাস্ত হয়েছিলেন। মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ দিকের অভিব্যক্তি উইলিয়াম ফকনারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Light in August। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা—'দি সাউথ অব দি ফিউরি', 'অ্যাজ আইলে ডাইং' ইত্যাদি। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাহিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় সে সময় তিনি বলেছিলেন—'সাহিত্যিককে সত্য সন্ধানী হতে হবে, তাঁকে শোনাতে হবে আশার বাণী'। তিনি ১৯৬২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মু. আ. জ.

উক্তি : যা উক্ত (যা বলা হয়েছে) হয়, তা-ই উক্তি (বচ্+ক্ত = উক্ত)। যেমন—বাবা বললেন, 'ভাত খেয়ে বিদ্যালয় যাও', এটা একটা উক্তি। উক্তি ২ প্রকার। যথা—(ক) প্রত্যক্ষ উক্তি ও (খ) পরোক্ষ উক্তি। যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল পুনরাবৃত্ত, পুনরুক্ত বা উদ্ধৃত হয় তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে এবং যে বাক্যে বক্তার উক্তি বর্ণনাকারীর নিজের ভাষায় প্রকাশ পায় তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। যেমন—(ক) মুক্তা বললো, 'কলমটি আমার চাই' (প্রত্যক্ষ উক্তি)। (খ) মুক্ত বললো যে, "কলমটি তার চাই। ইংরেজির মতো বাঙলায়ও উক্তি পরিবর্তনের কতগুলো নিয়ম আছে। (ক) প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্য লেখার সময়" " " [উদ্ধার চিহ্নের] ভেতর বসানো হয়। পরোক্ষ উক্তিতে তা লোপ পায়। (খ) বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বক্তার পুরুষের (Person) পরিবর্তন করতে হয়। (গ) পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধার চিহ্ন লোপ করে 'যে' নামক সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। (ঘ) বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়, ইত্যাদি। মু. চৌ.

উগ্রসেন : হিন্দু পুরাণোক্ত চরিত্র বিশেষ। মহাভারতে এই নামে তিনটি চরিত্রের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে মথুরার যদুবংশীয় রাজা আহুকের পুত্র ও কংসের পিতা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আহুকের মহিষী কাশ্যার গর্ভে দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। দেবকের চারপুত্র ও সাতকন্যা। এই সাত

www.pathagar.com

কন্যারই বিবাহ হয় বসুদেবের সঙ্গে। সর্বজ্যেষ্ঠ কন্যা দেবকীর গর্ভে ও বসুদেবের ঔরসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। উগ্রসেনের নয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্রদের মধ্যে কংস সর্বজ্যেষ্ঠ ; উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। উগ্রসেন রাজ্যলোভী এই পুত্র (কংস) কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহায়তায় কংসকে বধ ও উগ্রসেনকে উদ্ধার করেন। উগ্রসেন পুনরায় সিংহাসনে বসে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। যদুবংশের ধ্বংস তিনি স্বচক্ষে দেখে যান। (২) আরেক উগ্রসেন ছিলেন পরীক্ষিতের পুত্র ও জনমেজয়ের ভাই। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল উগ্রসেন। আ. রা.

উচিৎ শ্রবণ। অর্থাৎ পারমার্থিব ভাব : খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮-১৮৭০) রচিত নীতি বিষয়ক পুস্তক। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'উচিৎ শ্রবণ' গদ্যে-পদ্যে রচিত। এতে মূলত ধর্ম ও নীতিকাহিনীই প্রচারিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথমাংশে ব্যবহারিক জীবনের হাবভাব ও আচার-আচরণ সম্পর্কে এবং শেষাংশে সুফি সাধনতত্ত্বের আলোচনা স্থান পেয়েছে। খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকীর আলোচনায় সুফি সাধনতত্ত্বের সঙ্গে যোগসাধনায় কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বাউলদের অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে এর মিল রয়েছে। লেখক তাঁর নৈতিক দৃষ্টিতে ধর্মবিষয়ক যেসব নীতিকথাকে উচিৎ শ্রবণ বলে মনে করেছেন, নির্দ্বিধায় তিনি তা তাঁর আলোচনায় তুলে ধরেছেন। বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্বে প্রথম বাঙালি মুসলিম গদ্য লেখক হিসেবে শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী তাঁর এই গ্রন্থে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। অবশ্য গদ্য রচনার প্রাঞ্জলতা এতে অভাব রয়েছে। আ.ন.ম.ব.র.

উচ্চৈঃশ্রবা : হিন্দু পুরাণোক্ত অশ্ববিশেষ। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্র থেকে এই ঘোটকের উৎপত্তি। এর বর্ণ শ্বেত। এই শ্বেতবর্ণ অশ্বটি দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন। উচ্চৈঃশ্রবা অমৃতপানে অভ্যস্ত এবং হিন্দু পুরাণমতে সকল অশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ম. চৌ.

উজানিনগর : মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত স্থান। উজানিনগরে মনসামঙ্গল কাব্যের নায়িকা বেহুলার পিতৃগৃহ অবস্থিত ছিল। আবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সওদাগরও এই নগরের অধিবাসী ছিলেন। এখানকার রাজার নাম ছিলো বিক্রমকেশরী। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কবিগণ নানাস্থানে এই নগরের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ কবির বর্ণনায় দেখা যায় যে, উজানিনগর গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিলো। এখনো রাঢ় অঞ্চলের বর্ধমান জেলায় উজানি ও মঙ্গলকোট নামে দু'টি গ্রাম আছে। এই উজানিনগর এবং এর রাজা বিক্রমকেশরী সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মালব দেশের উজ্জয়িনী নগরী ও এর রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। আ. রা.

উজ্জয়িনী : দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মালব প্রদেশের একটি নগরী। এক সময় রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। এর অন্য নাম বিশালা এবং অবন্তি। এই প্রাচীন নগরীর নামকরণ কে করেছিলেন তা জানা যায় না। মহাভারতে এই নগরীর উল্লেখ আছে। উজ্জয়িনীর অস্তিত্ব এখন আর নেই। ১২৩৪ সালে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিস উজ্জয়িনী আক্রমণ করে তা ধূলিসাৎ করেন এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের মূর্তিটি তিনি সেখান থেকে রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে আসেন। কালক্রমে নগরটি ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কালিদাসের কাব্যে উজ্জয়িনীর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। মু.আ.রা.

উজ্জ্বলনীলমণি : রূপ গোস্বামী কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে রচিত বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বা অলঙ্কার শাস্ত্র। তিনি তাঁর 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে যে পাঁচটি মুখ্য রসকে ভক্তিরসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তন্মধ্যে প্রধানতম হলো শৃঙ্গার, মধুর বা উজ্জ্বল রস। আলোচ্য গ্রন্থে

www.pathagar.com

তাকেই অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করা হয়েছে। তাই গ্রন্থটির নাম হয়েছে 'উজ্জ্বলনীলমণি'— অর্থাৎ নীলমণি বা কৃষ্ণের উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এতে তাই আদর্শ নায়ক–নায়িকার (কৃষ্ণ ও রাধা) পটভূমি থেকে অলঙ্কার ও রসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। গ্রন্থটি পঞ্চদশ প্রকরণে সমাপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনাচ্ছলে ৩৬৫ রকমভাবে প্রেমের বিচিত্র আবেগ ও শৃঙ্গার রসাদি স্থায়ী ভাবসমূহ অলঙ্কার শাস্ত্রের আদর্শ অনুসারে বিস্তৃতভ-াবে বর্ণিত হয়েছে। উজ্জ্বল রসের স্থায়ীভাব হচ্ছে মধুরা রতি। এই গ্রন্থে এর সাতটি পর্যায় কল্পিত হয়েছে। কৃষ্ণ-গোপীর সম্ভোগ লীলায় এই রসের পরিপূর্ণ পুষ্টি। এসব বর্ণনায় দেখা যায় যে, আদিরসকে অপাকৃত বিভাবনার সাহায্যে উজ্জ্বলতম করে তোলাই 'উজ্জ্বলনীল-মণি'র উদ্দেশ্য। রূপ গোস্বামীর এই গ্রন্থটি খ্রিস্টীয় ষোলো-সতেরো শতকের বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। মু.আ.রা.

উড্রফ, স্যার জন জর্জ : কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী ও বিচারপতি এবং ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থকার। ইংল্যাণ্ডে জন্ম। পিতা জেম্‌স টি. উড্রফ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.ও বি.সি.এল. এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনস্থ ইনারটেম্পল থেকে ব্যারিষ্টারি পাস করে স্যার জর্জ উড্রফ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এ ব্যবসায়ে প্রভূত সাফল্য লাভের পর তিনি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে স্বল্পকালের জন্য প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এ সময়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলি পরে 'দি ল রিলেটিং টু রিসীভার্স ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' (১৯০৩ খ্রিঃ) নামে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে স্যার উড্রফ স্বদেশে ফিরে যান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইন বিষয়ের রীডার পদে কর্মরত থাকেন (১৯২৩–৩০ খ্রিঃ)। ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট সম্পদ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে উড্রফ প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্নবের নিকট গভীরভাবে এ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এর দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ও মহিমা প্রচারে ব্রতী হন। তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা এবং অনেকগুলি মূল তন্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রচার তাঁর জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন কলকাতা স্মল জজ কোর্টের উকিল অটলবিহারী ঘোষ। 'আর্থার অ্যাভালন' এই ছদ্মনামে উড্রফ তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'মহানির্বাণতত্ত্ব' (১৯১৩), 'দি সার্পেন্টি পাওয়ার' (১৯১৪), 'প্রিন্সিপল্‌স্ অব তন্ত্র' (১৯১৪ ও ১৯১৬), 'শক্তি অ্যান্ড শাক্ত' (১৯১৮) এবং 'পাওয়ার অ্যাজ লাইফ' (১৯২২)। তাঁর এসব রচনা প্রকাশের ফলে ভারতে ও বিদেশে তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে যে ঘৃণা ও উপেক্ষার ভাব ছিলো তা দূরীভূত হয় এবং এর প্রতি সুধীসমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মু.আ.রা.

উড়িয়ে নিয়ে যা কালমেঘ : জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের পঞ্চম গল্প গ্রন্থ। প্রকাশিত হয় আগস্ট ১৯৯২ সালে। এই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'শূন্যোদান' (১৯৯২) প্রবাসে বসে লিখলেও এতে বর্ণিত হয়েছে স্বদেশে তার স্বপ্নের ভিটে-বাড়ির করুণ অবস্থার কথা। দ্বিতীয় গল্প 'কল্পলোকে' (১৯৯২) প্রবাসী এক ব্যক্তির কন্যার অসুখ-বিসুখের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে পারিবারিক মূল্যবোধের ভাঙনই এ গল্পের মুখ্য বিষয়। 'উড়িয়ে নিয়ে যা কালমেঘ, বৈশাখের ঝড়' (১৯৯২) মুক্তিযুদ্ধোত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত জীবনের

www.pathagar.com

ব্যর্থতা মানুষের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার গাল্পিক উপস্থাপন। 'সুখবাস' (১৯৯১) গল্পটিও দূরপ্রবাসের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত, গল্পের আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে দেশের মাটি থেকে দূরে, বহুদূরে দুই তরুণ-তরুণী কিভাবে বেদনায়-ভালবাসায় সুখবাস রচনা করেছে সেই ইতিবৃত্ত। বার্ধক্যে এসে মানুষ কেমন অসহায় হয়ে পড়ে 'এক যযাতি' গল্প তার ইতিবৃত্ত। পুত্রকন্যা সমেত সংসারে বৃদ্ধদের অবস্থান এবং জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাদের ভাবনা বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। স্বভূমি-স্বঅবস্থান ছেড়ে মানুষ যখন দূরে চলে যায় তার জন্য যে শূন্যতা তৈরি হয় এক সময় তা আর থাকে না—এমন একটি দার্শনিক বোধ নিয়ে 'নিরালোকে ফেরা' গল্পটি লেখা হয়েছে। প্রবাসী এক ব্যক্তি দেশে ফিরে আসার পথে ভাবছে তার জন্য অপেক্ষা করার আর কেউ নেই, যে ছিলো সেও চলে গেছে দূরে, অনেকের সঙ্গে। দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামীণ মানুষের গল্প 'মহোৎসব'। এ গল্পটি 'উড়িয়ে নিয়ে যা কালমেঘ' গ্রন্থের অন্যান্য গল্পের তুলনায় নিরাভরণ ও সরল। 'উড়িয়ে নিয়ে যা কালমেঘে'র শেষ তিনটি গল্পের মধ্যে 'তার সঙ্গে আমার পরিচয়' ও 'তপুর মেলায়' ১৯৬৮ সালে এবং শেষ গল্প 'অচেনা' ১৯৬০ সালে রচিত। গল্প তিনটির শেষটি গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশের একেবারে প্রস্তুতিপর্বের রচনা, তবে 'তার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং 'তপুর মেলায়' যখন লিখছেন ততদিনে 'দুর্বিনীত কাল', 'বহে না সুবাতাস' ও 'সিতাংশু, তোর সমস্ত কথা'র গল্পগুলো লেখা হয়ে গেছে এবং এ সমস্ত গল্পে স্বকালে দংশিত মানুষের ছবি আঁকার কুশলতা জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলা গল্পের ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতায়। একই সময়কার রচনা হলেও 'তার সঙ্গে আমার পরিচয়' কিংবা 'তপুর মেলায়' সাফল্যের সে চূড়া স্পর্শ করতে পারেননি তিনি। সম্ভবত এ না পারাটা তার অজ্ঞাত নয়। তিনি নিজেও এ গল্প তিনটিকে বলেছেন তাঁর 'রচনার শেকড়বাকড়'। ত.শ.

উতঙ্ক : মহাভারতোক্ত মহর্ষি বেদের পরম গুরুভক্ত শিষ্য। গুরুভক্তির জন্য উতঙ্কের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। একদিন গুরুদেব উতঙ্কের ওপর যাবতীয় গৃহকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করে কার্যোপলক্ষে অন্যত্র চলে যান। উতঙ্কের চরিত্র পরীক্ষার্থে আশ্রমের উপাধ্যায়-পত্নীগণ তাঁর কাছে এসে বলেন যে গুরুপত্নী ঋতুমতী হয়েছেন ; এ সময়ে গুরু অনুপস্থিত। কাজেই গুরুপত্নীর ঋতু যাতে বিফলে না যায়, সে ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হবে। উতঙ্ক এহেন অসঙ্গত প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, গুরু তাঁকে এ জাতীয় অকার্য করার আদেশ দিয়ে যাননি। গুরু আশ্রমে ফিরে এসে এ ঘটনা শুনে উতঙ্কের প্রতি অতিশয় প্রীত হন। তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বগৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হতে বলেন। গুরুগৃহ থেকে বিদায় নেয়ার সময় তিনি উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে গুরুপত্নী তাঁকে রাজা পৌষ্যের ক্ষত্রিয়া-পত্নীর দুটি কুণ্ডলদ্বয় চেয়ে আনতে আদেশ দেন। কারণ ঐ কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করে গুরুপত্নী চারদিন পরে এক ব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে চান। কুন্ডলের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে উতঙ্ককে বহু অলৌকিক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। মহাভারতে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। যাহোক, সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ঐ কুণ্ডলদ্বয় সংগ্রহ করে উতঙ্ক যখন আশ্রমে ফিরছিলেন, তখন ছদ্মবেশী তক্ষক কৌশলে তা অপহরণ করে। দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তায় নাগলোকে গিয়ে উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় উদ্ধার করে এনে গুরুপত্নীর হাতে অর্পণ করেন। গুরুপত্নী এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উতঙ্ক হস্তিনাপুরের রাজা জনমেজয়ের নিকট যান। তিনি জনমেজয়কে তাঁর পিতৃহন্তা তক্ষকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। মু.আ.রা.

উতথ্য : মহাভারতোক্ত একজন ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন ঋষি। উতথ্যের পিতার নাম অঙ্গিরা,

www.pathagar.com

মাতার নাম শ্রদ্ধা ও স্ত্রীর নাম মমতা। তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। মমতার গর্ভে উতথ্যের এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র আপন পিতৃব্য বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হন এবং জগতে দীর্ঘতম ঋষি নামে খ্যাতিলাভ করেন। **মু.আ.রা.**

উৎকল : প্রাচীনকালে ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশ উৎকল ও ওড্র এই দুই নামে অভিহিত হতো। তখন উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চল উৎকল নামে পরিচিত ছিলো। উংকল ছিলো পঞ্চগৌড়ের অন্যতম রাজ্য। খ্রিস্টীয় সাত শতকের প্রথমে তা বাংলাদেশের হিন্দু রাজা শশাঙ্কের রাজ্য-ভুক্ত হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে উৎকল স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যখন (৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে) বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন, তখন উৎকল স্বাধীন রাজ্য ছিল। পাল বংশের সম্রাট দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৫০ খ্রিঃ) উৎকল আক্রমণ করলে উৎকলীরা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যায়। খ্রিস্টীয় এগারো শতকের শেষভাগে উত্তর বিহারের অন্তর্গত তিরহুতের রাজা গাঙ্গেয় দেব উৎকলের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন এরূপ দাবি করা হয়। উৎকল এককালে ভারতের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম পাদপীঠ ছিল। বর্তমান উড়িষ্যার কয়েকটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উৎকল নামটি জড়িত। যেমন—কটকস্থ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ও উৎকল সাহিত্য সমাজ, পুরীস্থ উৎকল নাট্য সংঘ ইত্যাদি। **আ. খা.**

উৎপত্তিবাদ : সংকৃত অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ আচার্য ভট্ট লোল্লটের রস সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত বিশেষ। ভট্ট লোল্লটের মতে রস মাত্রই উৎপন্ন হয়। যা পূর্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হয়েছে, তারই নাম উৎপত্তি। যেমন মাটি থেকে ঘটের উৎপত্তি। ঘট আগে ছিল না, পরে উৎপন্ন হয়েছে। মাটিই হচ্ছে ঘটের উৎপত্তির কারণ। তেমনি বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব ইত্যাদির সাহায্যে রসের উৎপত্তি হয়। অতএব অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন ভাব-অনুভাবই হচ্ছে রসের উৎপাদক কারণ। কালিদাসের শকুন্তলা নাটক থেকে উদাহরণ দিয়ে ভট্ট লোল্লট উৎপত্তিবাদের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। শৃঙ্গার শকুন্তলা নাটকের মূল রস। শকুন্তলার রূপ আলম্বন বিভাব, শকুন্তলার ভ্রূবিক্ষেপ ও কটাক্ষাদি অনুভাব এবং তার সঙ্গে কিছু সঞ্চারী ভাব ইত্যাদি সহযোগে দুষ্মন্তের হৃদয়ে মূল রস উৎপন্ন হয়েছে। ভট্ট লোল্লট কর্তৃক রস সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্তটিই হচ্ছে সাহিত্যে 'উৎপত্তিবাদ'। **আ. ই**

উৎপল দত্ত : নাট্যকার ও অভিনেতা। ১৯২৯-এর ২৯ মার্চ বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯-এ ইংরেজিতে বি. এ. অনার্স পাস করেন। ১৯৫৩-১৯৫৯ পর্যন্ত কলকাতা সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। সারাজীবন চলচ্চিত্র ও মঞ্চ-নাটকে অভিনয়, পরিচালনা, নাটক ও যাত্রাপালা রচনা এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭-এ 'দ্য শেকসপিরিয়ান্স' নামে নাট্যদল গঠন করেন। ১৯৪৯-এ এই দলের নাম পাল্টিয়ে রাখা হয় 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' এবং ১৯৭১-এ এর নামকরণ করা হয় 'পিপলস লিটল থিয়েটার'। বামপন্থী রাজনৈতিক নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তাঁর নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সুগভীর বেদনা তিনি তাঁর নাটকে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক—ছায়ানট (১৯৫৮), অঙ্গার (১৯৫৯), ফেরারী ফৌজ, ঘুম ভাঙার গান, কল্লোল, অজেয় ভিয়েতনাম, টোটা, তিতুমীর, মানুষের অধিকার (১৯৬৮), সূর্য শিকার (১৯৭১), টিনের তলোয়ার (১৯৭১), ঠিকানা (১৯৭১), ব্যারিকেড (১৯৭২), দুঃস্বপ্নের নগরী (১৯৭৪), জনতার আফিম, মালোপাড়ার মা, পেট্রোল বোমা, নীচের মহল, একলা চল রে, ক্রুশবিদ্ধ কুবা, এবার রাজার

www.pathagar.com

পালা, লেনিন কোথায়, লাল দুর্গ, স্তালিন ৩৪, তীর, নীল সা'দা-লাল (১৯৭৯), আজকের শাজাহান (১৯৮৪), ফুলবানু (১৯৯৩), সত্তরের দশক (১৯৯৩)। যাত্রাপালা—রাইফেল, দিল্লী চলো জালিয়ানওয়ালাবাগ, নীল রক্ত জয় বাংলা, সমুদ্র শাসন, সন্ন্যাসীর তরবারি, ঝড়, মাওসেতুঙ, বৈশাখী মেঘ, সীমান্ত, তুরুপের তাস, মুক্তিদীক্ষা, অরণ্যের ঘুম ভাঙছে, সাদা পোশাক, কুঠার, বিবিঘর, স্বাধীনতার ফাঁকি, দামামা ওই বাজে। অন্যান্য রচনা—শেক্সপিয়রের সমাজচেতনা, স্তানিস স্লাভস্কির পথ, স্তানিস স্লাভস্কি থেকে ব্রেখট, চায়ের ধোয়া, জপেনদা জপেন যা, গিরিশ মানস, টুওয়ার্ডস-এ রিভিলিউশনারী থিয়েটার, আশার ছলনে ভুলি, প্রতিবিপ্লব। পরিচালিত ছবি—মেঘ, ঘুম ভাঙার গান, ঝড়, বৈশাখী মেঘ, মা। অভিনীত ছবি—মাইকেল মধুসূদন, ঘনঅরণ্য, জয়বাবা, ফেলুনাথ, হীরক রাজার দেশে, আগন্তুক, ভুবন সোম, কোরাস, কলকাতা '৭১, যোগাযোগ, নৌকাডুবি, যুক্তি তর্ক গল্পো, পলাতক, শ্রীমান পৃথ্বিরাজ, পদ্মানদীর মাঝি, সাত হিন্দুস্থানী, সৌকিন, গুড্ডি, অমানুষ, আনন্দ আশ্রম। দীনবন্ধু পুরস্কার, রাষ্টপতি পুরস্কার লাভ। পদ্মভূষণ উপাধি ও সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার প্রত্যাখ্যান। মৃত্যু কলকাতা, ১৯ আগস্ট ১৯৯৪। নূ. ই

উৎস থেকে নিরন্তর : কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ। গল্পগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৯। প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী : এম. মনসুর আহমদ, মূল্য : চার টাকা। 'গৈরিক বাসনা', 'বৈশাখী গান', 'রতি বিলাস', 'শেওলা সবুজ রক্ত', 'মাষ্টার', 'ইচ্ছার বাগান কবিতা—আমার ভালবাসা', 'কান্নার তৃতীয় দিন', 'গোলাপ ফোঁটা সকাল', 'খেয়াঘাট', 'দীপান্বিতা', 'বিষণ্ন অন্ধকার', 'শেষ প্রলাপ রক্তের গভীরে', 'কাক জ্যোৎস্না' এবং 'উৎস থেকে নিরন্তর' ইত্যাদি গল্পের সমন্বয়ে এই সংকলন সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি গল্পের বিষয় এবং আঙ্গিক আলাদা। 'দীপান্বিতা' গল্পটি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। সাদৎ আলী পুলিশ বিভাগের একজন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তা। তাঁর পুত্র সবিন ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত। সবিনের চৌকির নিচে বড় বড় পোস্টার। তাতে লেখা আছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। নির্দিষ্ট দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে সাদৎ আলীর ডিউটি। অন্যেরা যেখানে গুলি চালাচ্ছে সেখানে তিনি নির্বিকার। ট্রিগার না টেপার অপরাধে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্তও করা হতে পারে। তাতে সাদৎ আলীর আপত্তি নেই, কারণ মাতৃভাষার পক্ষে কাজ করার তৃপ্তি তাঁর মন থেকে সব ভীতি দূর করে দেয়। 'বৈশাখী গান' এবং 'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পে মানুষের উদ্বোধন ঘোষিত হয়েছে। 'বৈশাখী গান'-এ ইফ্‌তি শরীরের চাহিদা মেটাতে গিয়ে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে আর 'উৎস থেকে নিরন্তর'-এ ওজুফা বাধ্য হয়ে অন্যের সন্তানের মা হয়েছে। সাদৃশ্য এই যে, তাদের কেউই গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করে নি। সমাজ এমন ঘটনা মেনে নেয় না, বিশেষ করে '৬৯ সালে তো নয়ই। তবুও গল্পকার এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন, যেখানে নারী শুধু নারী নয়, নারীও পুরুষের মতো মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। 'খেয়াঘাট' গল্পে দশ বছর বয়সের আবু যে গ্রামের যৌথ পরিবারে অবারিত প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠেছে, সে আপনজনদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না, কষ্ট পায়। এখানেই শিশুমনের দ্বন্দ্ব শিল্পরূপে তাৎপর্যময় হয়। বিচিত্র বিষয় এবং সাহসী প্রকাশের কারণে সেলিনা হোসেনের গল্পের ভুবনে প্রত্যাশিত আগমন এই প্রথম গ্রন্থে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সৈ. আ. জা.

উৎসব : আতোয়ার রহমান রচিত উৎসব সংক্রান্ত প্রবন্ধ গ্রন্থ। এই বইয়ে লেখক উৎসব কি? উৎসবের সংজ্ঞা, উৎসবের উদ্ভব, বিকাশ, রূপান্তর ও ভৌগোলিক সীমানা ভেদে দেশ দেশান্তরে উৎসবের প্রকৃতি কতো রকম,

www.pathagar.com

এইসব তথ্যের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। উৎসব মানব সামাজে সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হলেও আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনিবার্য পরিবর্তনের ছোঁয়ায় আজকাল অনেক আদি উৎসবের রূপ পাল্টে গেছে। এই বিষয়টিকে লেখক ছয়টি শ্রেণীতে চিহ্নিত করে ছোট ছোট শিরোনামে বর্ণনা করেছেন। যেমন : উৎসব কি ও কেন, উৎসবের উদ্ভব, উৎসবের শ্রেণী বিভাগ, জীবিকার উৎসব, চাওয়া এবং পাওয়া, ধর্মীয় উৎসব : ইহকাল-পরকাল, সাংস্কৃতিক উৎসব আনন্দলোক, ঐতিহাসিক বা স্মরণ উৎসব : বিমিশ্র কথা, রাজনৈতিক উৎসব : নানা বাণী, সামাজিক-পারিপার্শ্বিক উৎসব : কল্যাণবস্তু, উৎসবের রূপান্তর, উৎসবের সমাজ ও ইতিহাস, উৎসবের অবদান। মূলত এই ছয় শ্রেণীর উৎসবের উৎস এবং বৈচিত্র্যের ওপর ঐতিহাসিক তথ্য, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসহ লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য-পনের টাকা মাত্র। মা. আ.

উৎসর্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ। ১৩২১ সনে বই আকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে মোট ছেচল্লিশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলোর শিরোনাম নেই। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর কয়েকটি পরবর্তী সময়ে গান হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম 'আমি চঞ্চল হে। আমি সুদূরের পিয়াসি।' ৪ সংখ্যক কবিতাটি হলো 'তোমারে পাছে সহজে বুঝি/ তাই কি এত লীলার ছল/বাহিরে যবে হাসির ছটা/ভিতরে যাকে আঁখির জল।' রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিখ্যাত কবিতা ১৪ সংখ্যায় এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। যেমন : 'সব ঠাঁই মোট ঘর আছে, আমি/সেই ঘর মরি খুঁজিয়া/দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি/ সেই দেশ লব যুঝিয়া।' রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয় অংশে বলা হয়েছে, "উৎসর্গে প্রকাশিত সকল কবিতাই মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) হইতে গৃহীত। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী পূর্বপ্রচলিত গ্রন্থানুক্রমে মুদ্রিত না হইয়া ভাবানুষদক্রমে বিভিন্ন বিভাগে সজ্জিত ; এই সকল বিভাগের প্রবেশকরূপে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি নূতন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, পুরাতন কোন কোন কবিতাও অবশ্য প্রবেশকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সমকালে রচিত অনেক নূতন কবিতাও কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়, অন্য কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই।" সে. হো.

উৎসে ফেরার ছলচাতুরি : হায়াৎ মামুদ রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ। দশটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর বিষয় শিশু ও শিশুসাহিত্য। প্রবন্ধগুলো হল 'ইদানীংকালের শিশু-কিশোর ছড়া ও কবিতা', 'কুশলের কথা', 'এদেশের শিশুসাহিত্য : সমীক্ষা ও বিবেচনা', 'বুড়োদের ছেলেখেলা : উৎসে ফেরার ছলচাতুরি', 'একটি অভিধান সম্পর্কে', 'শিশুসাহিত্যের বিষয় ও ভাষা', 'কচি হাতের ছবি লেখা', 'আমাদের শিশু ও শিশুসাহিত্য', 'আমরা অমলের কাছে অপরাধী', 'শতবর্ষের শিশুসাহিত্য'। গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। বাঙালির শিশুসাহিত্য নিয়ে বর্ণনাত্মক জরিপমূলক প্রবন্ধ যেমন এই গ্রন্থে আছে তেমনি রয়েছে বিশ্লেষণাত্মক রচনাও। আলোচিত বিষয়াবলির ভেতর থেকে ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে আমাদের শিশু ও শিশুসাহিত্যের সার্বিক চিত্র। হায়াৎ মামুদের রচনার প্রধান যে লক্ষণ বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যাওয়া এবং প্রবল অন্বেষণে সত্যকে স্পর্শ করতে চাওয়া তা এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতেও উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। 'উৎসে ফেরার ছলচাতুরি' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে দি মিডিয়া, ১৩০ নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা ১২১৭। প্রকাশকাল ১৯৯৬। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪, মূল্য ৮০.০০। সু.ব.

www.pathagar.com

উত্তমপুরুষ : যে যখন কথা বলে অর্থাৎ বক্তা (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) ব্যাকরণে উত্তমপুরুষ। যে বা যারা শ্রোতা, যাকে বা যাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয় (তুমি-তোমরা) সে বা তারা মধ্যম পুরুষ এবং অনুপস্থিত বা উপস্থিত যার বা যাদের সম্বন্ধে বলা হয় সে বা তারা প্রথমপুরুষ। উত্তম পুরুষ যথা : আমি আজ মিতুদের বাড়ি যাব না।। এখানে আমি উত্তম পুরুষ। আমি, আমরা ইত্যাদি উত্তম পুরুষের সর্বনাম বা অন্য কথায় আমি, আমরা ইত্যাদি উত্তমপুরুষ। **শি.প্র.লা.**

উত্তম পুরুষ : রশীদ করীমের উপন্যাস। মূল্য : ৪.০০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২১৭। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬১। প্রচ্ছদ : শাহতাব। প্রকাশক : আনিস ব্রাদার্স, ৭০ ইসলামপুর রোড, ঢাকা-১। এই উপন্যাসে মুসলমান সমাজের ঐতিহ্য, আবেগ, অভিপ্সা এবং বিশেষ চরিত্রের প্রতি একনিষ্ঠ ও সশ্রদ্ধ থেকেও নতুন মূল্যবোধে লেখক উদ্বুদ্ধ এবং নিঃসংশয়। মনস্তত্ত্বের ঘুপচিগলিতে আলো ফেলে লেখক পথ বের করে এনেছেন। এ উপন্যাসে তৎকালীন প্রজন্মের জীবনাচার সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। একত্রিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত উপন্যাসটির ছোট ছোট কাহিনী, উপকাহিনীগুলো অত্যন্ত আপন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের সংযম ও পরিমিতবোধ- অনর্থক বাগবিতণ্ডা তিনি কোথাও করেননি। ফলে ইঙ্গিতময় ঘটনাগুলো, চিত্রগুলো আশ্চর্যভাবে নাড়া দেয়। লেখকের ভাষা, গল্প বলার কায়দা ও বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত চমৎকার। লেখকের ভাষা ও রচনায় শুধু যে স্বচ্ছন্দগতি আছে তা নয়, মাঝে মাঝে তা শিল্পীর তুলির মত ছবি ফুটিয়ে তুলতেও সক্ষম হয়েছে। মাঝে মাঝে ভাষার তির্যক ভক্তি হয়েছে উপভোগ্য। সংলাপ সংযত ও বুদ্ধিদীপ্ত। এ উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরিচ্ছন্ন জীবনদৃষ্টি। ঘটনার সঙ্গে পটভূমির যোগাযোগ সূত্রগুলি লেখক স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতনতার কারণেই এ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শাকেরকে ঘিরে সেলিনা, অনিমা, শেখর, মুশতাক, সলিল, চন্দ্রা, নিহার ভাবী, শিশির এরকম অসংখ্য চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। এদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় কোথাও কোথাও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। আধুনিক মননশীলতা, পরিশীলিত আঙ্গিক, অভিজ্ঞতার নির্লিপ্ত বর্ণনায় 'উত্তম পুরুষ' পরিশ্রমী পাঠকের পাঠতৃষ্ণা নিবারণ করে। **পা. র.**

উত্তর-অন্বেষা : 'ত্রৈমাসিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য পত্র'। সম্পাদক-ড. মযহারুল ইসলাম, প্রকাশক : মোহসিন রেজা, উত্তর-অন্বেষা কার্যালয়, রাজশাহী। মুদ্রক : মোঃ আবদুর রশিদ খান, আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড (কাজিরগঞ্জ) রাজশাহী। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪। প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩৬। মূল্য : ১.০০ টাকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার লেখক সূচি : সিকান্দার আবু জাফর, আতাউর রহমান, মযহারুল ইসলাম, চৌধুরী ওস্মান, আবুবকর সিদ্দিক, হেমায়েত হোসেন, হায়াৎ মামুদ, দিলওয়ার হোসেন, মোহসিন রেজা, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, হায়াৎ সাইফ, মামুদ শামস, আবদুল হাফিজ, আবদুস শাকুর, আবদার রশীদ, সেলিনা হোসেন, মুস্তাফিজ, মযহারুল ইসলাম, খোন্দকার সিরাজুল হক ও আবদুল হাফিজ। 'উত্তর-অন্বেষা' বাংলা বছরের আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্রে প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটিতে কোনো সম্পাদকীয় থাকতো না। ফলে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে নবীন-প্রবীণ ও বিভিন্ন মতাবলম্বী লেখকের রচনাই মুদ্রিত হতো। 'উত্তর-অন্বেষা'র কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই ছিলো উন্নতমানের। পত্রিকাটি প্রায় নিয়মিতভাবে পাঁচ বছর (১৩৭৪-১৩৭৮) প্রকাশিত হয়েছিলো। **সা. আ.**

উত্তর-আধুনিকতা : Postmodernism বা 'উত্তর-আধুনিকতা'কে এক ধরনের 'ভাবনাপদ্ধতি'

www.pathagar.com

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমকালীন বৈশ্বিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক প্রবণতাকে শনাক্তকরণ করার জন্যে গত শতাব্দীর চল্লিশের বা পঞ্চাশের দশকের পর থেকে সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, স্থাপত্য, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত এই পরিভাষা পরিবর্তিত নতুন এক নন্দন-ভাবনাকে নির্দেশ করে। আধুনিকতার প্রতিক্রিয়ায় উত্তর-আধুনিকতার সৃষ্টি ; ফলে আধুনিকতা থেকে তা স্বতন্ত্র। আধুনিকতার বিপরীতে এর অবস্থান। দার্শনিক-সামাজিক দিক থেকে বলা হয়, যুক্তিনির্ভর সন্দীপন যুগ (Age of Enlightenment) আধুনিকতার প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু উত্তর-আধুনিকতার পটভূমি হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিলম্বিত পুঁজিবাদী (late-capitalism) পৃথিবী। অর্থাৎ উত্তর-আধুনিকতার মূল কথা হচ্ছে আধুনিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা। উত্তর-আধুনিকতা আসলে এক ধরনের সমগ্রায়ণের (totalisation) বিপক্ষে ; একে যেমন বৈশ্বিক ভাবা যাবে না, তেমনি তা দৈশিকও নয়। উত্তর-আধুনিকতার অবস্থান আধুনিকতার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। উত্তর-আধুনিক নামের মধ্যেই ধরা আছে এর অর্থ, যদিও সবকিছুকে নিরর্থক করে তোলার দিকেই এর ঝোঁক। আধুনিকতা-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেই উত্তর-আধুনিকতার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তার। শিল্প-সাহিত্যে উত্তর-আধুনিকতা যে সব অর্থে ব্যবহৃত হয় তা এরকম : (১) অবাস্তব ও ঐতিহ্যহীন সাহিত্য-শিল্পকে নির্দেশ করে ; (২) তৃতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী আধুনিক শিল্প-সাহিত্যকে প্রাধান্য দেয় ; (৩) ১৯৫০ সালের পর বিলম্বিত পুঁজিবাদের ফলে পরিবর্তিত সামগ্রিক মানবীয় পরিস্থিতি এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, উত্তর-আধুনিকতায় আধুনিকতাবাদী শৈল্পিক সামগ্রকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বিভিক্তি ও বিচ্ছিন্নতাকে প্রাধান্য দেয়। বলা হয়—সমকালীন পৃথিবী উত্তর-সাংস্কৃতিক (Post-cultural), উত্তর-শিল্পবাদী (post-industrial) সমাজ হিসেবে গড়ে উঠেছে। তথ্যপ্রযুক্তি, বিশেষ করে গণমাধ্যম ও বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের কারণে এই সমাজ পূর্বের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। উত্তর-ফোর্ডবাদী (post-Fordism) অথবা বিশেষজ্ঞায়নের (specialisation) প্রভাবে গঠিত এই সময়পর্বে মানুষের জীবনে নতুন যে আকার পেয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা নতুন শক্তি ও ইচ্ছের কারণে বিচূর্ণ, ভঙ্গুর। আধুনিকতা কেন্দ্রায়িত ছিল উৎপাদন – ছোট কারখানা বা বৃহৎ শিল্পের উপর। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতা ভোগবাদকে প্রতিষ্ঠা দিল। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে বাণিজ্য ও অর্থসেবা, শপিং, বিনোদন ইত্যাদির মধ্যে। উৎপাদনমূলক পরিচিতি থেকে ভোগবাদে সরে আসবার ফলে আধুনিকতা তার কল্যাণচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। উদ্ভব ঘটে নতুন স্বতন্ত্র 'সামাজিক সামগ্রে'র (social totality)। আসলে আধুনিকতার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রগতি, যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর আস্থা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রগতির ধারণাই মানবিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি। উত্তর-আধুনিকতা এই বিজ্ঞাননির্ভর প্রগতিশীল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলে। উত্তর-আধুনিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে বিজ্ঞান বা জ্ঞান বস্তুনিরপেক্ষ, মূল্যনিরপেক্ষ ; 'সত্যিকার' জ্ঞান সহজে গ্রাহ্য হয় না। কোনো ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক দাবি সর্বজনীন ও ইতিহাস বিজড়িত নয়, একটি অসম্পূর্ণ, স্থানিক, বিশেষ মাত্র ;সব সময়ই ক্ষমতা ও নিয়মতন্ত্রে বাধা। এর অর্থ উত্তর-আধুনিকতা জ্ঞান ও চিন্তার বিশ্বজনীনতা এবং অপ্রতিরোধ্য প্রভাবকে অগ্রাহ্য করেছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক দাবিকে বিনির্মাণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড সচেতনতা দেখিয়েছে ভাষা, বয়ান (discourse) ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে। জ্ঞানের অকেন্দ্রিকতা ও অনিশ্চয়তাই উত্তর-আধুনিকতার মূল কথা ; এটি এমন এক বিশ্বের কথা বলে যেখানে কোনো কিছুই সুনির্দিষ্ট নয়, মানুষ ঐতিহ্যিকভাবে শিকড়িত নয়। বরং মানুষ সেখানে দ্রুত পরিবর্তন, বিমূঢ় অস্থিতির ঘূর্ণিপাকে

www.pathagar.com

আবর্তিত-জ্ঞান এখানে প্রতিমুহূর্তে পাল্টে যায়, অর্থের সবটাই নিরর্থক আর মানবিক অগ্রগতি বলে কিছুই ঘটে না। কোনো একক, অভিন্ন, সুসমন্বিত 'সাধারণ জ্ঞান' এতে তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। একথার অর্থ, উত্তর-আধুনিক শিল্পসংবেদনা সব সময় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, অভীপ্সার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় – যা নিজেকেই নিজের শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়, কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ফলে একে অনতিক্রম্য এবং প্রাধান্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হওয়া যুক্তি ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব না দিলেও চলে। উত্তর-আধুনিকতা প্রতিমুহূর্তে নিজেকে নির্মাণ ও প্রতিনির্মাণ করে চলেছে। এটি তাই অপ্রবহমান, বিচূর্ণ। আধুনিকতার মতো তা সত্য, মূল্যজ্ঞান, সমন্বিত অর্থ, নিশ্চয়তার বোধের দ্বারা চালিত নয়। ক্রীড়াশীলতার (playfullness) কারণে উত্তর-আধুনিকতা সবসময় অপ্রকাশমান অভীপ্সার চক্রে পড়ে নিরন্তর এমন এক ধরনের পরিচিতি তৈরি করছে যা স্থিতিহীন। কোনো বিষয়ই (subject) এতে বলয়িত হয়ে ওঠে না, বরং এটি দেয় অনেকান্ত অর্থ। উত্তর-আধুনিকতা প্রতিবাস্তবতাও নয়, এটি প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারটাকেই প্রশ্ন করে ; অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও বাস্তবতাকে তো বটেই। উত্তর-আধুনিকতা পরস্পরবিরোধী হলেও তাই বলা যায়, কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে না। এটি আসলে এক ধরনের মানসিক অবস্থা, সমালোচনামূলক মনোভঙ্গি ও রীতি, দেখা ও কাজ করবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ মাত্র। বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি উত্তর-আধুনিকতা শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে তা ইউরো-মার্কিন Postmodernism অর্থে তা ব্যবহৃত হচ্ছে না বলে উল্লেখ করেছেন পশ্চিম বাংলার অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন, উদয়নারায়ণ সিংহ, তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখ। বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের মধ্যেও এর ঢেউ এসে পৌঁছেছে, তবে তার নান্দনিক রূপটি এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়েই রয়েছে। ড. মা. জা

উত্তরকাল (নবপর্যায়) : ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্র। সম্পাদক : গুরুদাস ভট্টাচার্য ও জগন্নাথ বিশ্বাস, সহ-সম্পাদক : বিমল চক্রবর্তী ও দুর্গাদাস ভট্ট। কর্মাধ্যক্ষ : সরোজ মুখার্জী ও রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নেতাজী প্রেস, শ্রী অধীর কুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ থেকে শ্রীমৃণাল গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৩। প্রতি সংখ্যা ছ' আনা, বার্ষিক সডাক দেড় টাকা। আলপনা-শোভিত প্রচ্ছদ। সাইজ-৮˝– ৫˝। ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যার সূচিপত্র : সঙ্গীত-ঐতিহ্য ও আমাদের জেলা : সুধীন সেন-১, মানুষখেকো : নির্মল ভট্ট-৯, নানা চিঠির সুরে : ভাণু বদ্যি-১৪, পাখি-ভাষা (কবিতা) : আশরাফ সিদ্দিকী-২৩, চতুর্দ্দশপদী (কবিতা) : শক্তি চট্টোপাধ্যায়-২৪, তিমির হনন (কবিতা) : অতীন্দ্র মজুমদার-২৫, সংশপ্তক (কবিতা) : বিমল চক্রবর্তী-২৬, বুড়ো সিংহের কথা (কবিতা) : রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-২৭, শেষ হাসি (কবিতা) : জগন্নাথ বিশ্বাস-২৮, কবিতার জনপ্রিয়তা শুদ্ধসত্ব বসু-২৯, দূরবীণ : প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-৩৩, হিরো : দুর্গাদাস ভট্ট-৩৯, সমালোচনা : সাতভাই চম্পা, বিষকন্যা : আশরাফ সিদ্দিকী, সমালোচনা : বিমল চক্রবর্তী-৪৫, আমার বাংলা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, সমালোচনা : ত্রিপুরা বন্দ্যোপাধ্যায়-৪৭, অশোকের সময়ের গ্রাম : দুর্গাদাস সরকার, সমালোচনা : সুধাংশু ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক আন্দোলনের কয়েকদিন : অবনীকুমার রায়, সমালোচনা : র. ন. সে.-৫১, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্প : কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচনা : প্রণতি ঘোষ, মুর্শিদাবাদের সাময়িক পত্রিকা-৫২, সম্পাদকীয় : ৫৩-৫৫। সম্পাদকীয় মন্তব্য : 'নব পর্যায়ে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হলো। অনিবার্য কোনো কারণ না দর্শিয়ে স্পষ্টই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে নিজেদের ত্রুটিতেই বিজ্ঞাপিত সময়ের সীমা পার হয়ে পত্রিকা প্রকাশিত হলো।' পত্রিকাটি কত বছর চলেছিলো জানা নেই। সা. আ.

www.pathagar.com

উত্তরণ : সত্যেন সেন। দেশবিভাগের পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। দুই পর্বে বিভক্ত উপন্যাসের এক পর্বের কাহিনী বিন্যস্ত একটি মালবাহী জাহাজের শ্রমিকদের জীবন নিয়ে। নায়ক মালেকের জীবনের প্রথম অধ্যায় কাটে জাহাজে শ্রমিক জীবনের নির্মম ও তিক্ত অভিজ্ঞতায়। তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় কলকাতার রঙের কারখানায় চাকরির মাধ্যমে। জাহাজের খালাসিদের ওপর সারেংদের অন্যায় নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শ্রমিকরা শাস্তি পায়। তবুও তারা সংঘবদ্ধ হয়। সংগ্রামের প্রেরণায় জেগে ওঠে। কিন্তু এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ গ্রহণ করে এ সুযোগ। ভেঙে খান খান হয়ে যায় শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলবার স্বপ্ন—যেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না ভেদাভেদ, কেউ কারও ওপর জুলুম করবে না। উৎপাদনের সমান ভাগ ভোগ করবে সবাই। এই পর্বে পাকিস্তান আন্দোলন আরও জোরালো হয়। রাস্তায় রাস্তায় সভা-মিছিল, ঘরে বাইরে সর্বত্র আলোচনার জমজমাট আসর। খাঁটি মুসলমান সন্তান হিসেবে নায়ক মালেকও পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন জানায়। পাকিস্তান হলে তাদের সুখ-শান্তি হবে, উন্নতি হবে—এ আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গা সমাজে চরম বিপর্যয় নিয়ে আসে। মালেকও তা থেকে রেহাই পায় না। উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে দেশভাগের মধ্য দিয়ে। এ উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া উপস্থাপিত হয়েছে দাঙ্গার ঘটনায়। কিন্তু আন্দোলনের বৃহত্তর পটভূমির উল্লেখ নেই। নেই রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাতের সমীক্ষা। **ড. শা. আ.**

উত্তরপর্ব মুজিবনগর : শওকত ওসমান রচিত দিনপঞ্জি। মুজিবনগর আমাদের ইতিহাসে শুধু একটি নামই নয়, মুজিবনগর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিহ্নিত অভিধা। যাকে লেখক চিত্রিত করেছেন তাঁর নির্বাসিত জীবনের ভূখণ্ড হিসেবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে নিহত হলে লেখক দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। এই যাওয়া প্রতীকী অর্থে মুজিবনগরে যাওয়া। কারণ বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশে ঘাতকেরাই সেবক হয়ে উঠলে তিনি এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে থাকার চেয়ে বিবাগী জীবনকে শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন। 'উত্তর পর্ব মুজিবনগর' দিনপঞ্জি লেখার শুরু হয় ১৬ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখ থেকে। শেষ হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৮১ সালে। তিনি প্রতি-দিনই কিছু না কিছু লিখেছেন। একদিনও বাদ যায় নি। একটি দীর্ঘ সময়ের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী যেমন তাঁর লেখায় উঠে এসেছে, তেমনি দেশীয় খবরা-খবর, শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক নানা তথ্য, প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা কিংবা সাধারণ মানুষ তাঁর এই দিনপঞ্জির পৃষ্ঠা থেকে বাদ পড়ে নি। তিনি সমকালীন ঘটনাবলীকে তীক্ষ্ণ মননশীলতায় বিশ্লেষণ করেছেন। কখনো শুধুই উপস্থাপন করে ছেড়ে দিয়েছেন। ইতিহাসের নানা উপাদান এই দিনপঞ্জির পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসে। তাঁর ভাষা সরস, তীর্যক এবং কখনও বেদনাক্রান্ত। বইটি প্রকাশ করে সখিনা প্রকাশনী, ৩৪ গ্রীন রোড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৩। মূল্য : ৩৯০.০০ টাকা। **সে. হো.**

উত্তর প্রজন্ম : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ রচিত প্রবন্ধ সংকলন। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শিল্পতরু প্রকাশনী, ২৯১ সোনারগাঁ রোড, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ শিল্পী : মাসুক হেলাল এবং মূল্য : ষাট টাকা। এই প্রবন্ধগ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে 'কবি ও কবিতা' পর্যায়ে রয়েছে পাঁচটি রচনা। এগুলো হলো : ধূর্ত কবিতা, কবিতা ও অন্তমিল, অতিক্রমণের গান : রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, অবসিত ছন্দ এবং

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ। দ্বিতীয় পর্বে ষাটের দশক পর্যায়ে আছে আরো সাতটি লেখা। যেমন : আগন্তুক ঋতু, ষাটের কবিতা, ষাটের গদ্য, লিটল ম্যাগাজিন : ষাট ও সত্তর দশক, কণ্ঠস্বরের সম্পাদকীয়, খান মোহাম্মদ ফারাবী ও জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ। প্রথম পর্বের তৃতীয় রচনায় প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'বিদ্রোহী' বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ দুটি কবিতা কবিদ্বয়ের প্রায় একই বয়সের রচনা। দ্বিতীয় পর্বে লেখক ষাট ও সত্তর দশকের লিটল ম্যাগাজিন 'সমকাল', 'উত্তরণ', 'পূর্বমেঘ', 'কণ্ঠস্বর', 'স্বাক্ষর', 'সাম্প্রতিক', 'প্রতিধ্বনি', 'বক্তব্য', 'স্যাড জেনারেশন', 'যুগপৎ' ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লিটল ম্যাগাজিন 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রধান অবদান তাঁর ধারণা অনুসারে এর নতুন ও স্বতন্ত্র গদ্য। সর্বশেষ প্রবন্ধ আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' প্রসঙ্গে। প্রবন্ধকারের মতে কবি এই কাব্যগ্রন্থে 'চিত্রকল্পের অদ্ভুত ব্যবহারে, শব্দের নতুন অভিধায়, অনুষঙ্গের দুঃসাহসী প্রয়োগে এমনকি ভাষারূপের অনেক নতুন ও বিচিত্র ব্যবহার ও সংযোজনে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সেটা নিঃসন্দেহে আনন্দের।' সৈ. আ. জা.

উত্তর প্রসঙ্গ : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধের বই। দে'জ পাবলিশিং কর্তৃক ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭৩ থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৬। গ্রন্থটিতে মোট ১৭টি প্রবন্ধ রয়েছে। এগুলো হলো বঙ্কিমচন্দ্র – একটি টলায়মান বিগ্রহ ; ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের পশ্চাদপসরণ ; চিত্র ও চিত্রকর/রবীন্দ্র গোধূলি ; সান্ধ্য রবিচ্ছায়া ও দুজন আধুনিক কবি; মার্কসীয় তত্ত্ব ও বাংলা কবিতা ; কবিতার গভীরে, শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি' ; পুতুল নাচের ইতিকথা, পুনর্বিবেচনা ; 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসের শিল্পরহস্য ; কবিতার ধ্বনিকাঠামো ও চিত্রকল্প ; বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ; কবিতায় কলকাতার ছায়া ; গল্পের দর্পণে সত্যজিৎ রায় ; বাংলা উপন্যাসে কলকাতার স্পন্দন ; রামকৃষ্ণের অন্তঃপুর ; আলাপনী হোসেন মিঞা প্রসঙ্গে এবং উপন্যাসে মৃত্যু। 'উপন্যাসে মৃত্যু' লেখকের প্রথম বই 'প্রিয় প্রসঙ্গ' থেকে নেওয়া হয়েছে। এক সময়ে তিনি কেমন লিখতেন, কোন্ ধরনের লেখা লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত রচনা লেখা ছেড়ে রীতিমতো প্রবন্ধ প্রয়াসী হলেন, 'উপন্যাসে মৃত্যু' তার সাক্ষী। গ্রন্থিত ১৭টি প্রবন্ধের মধ্যে একটাই যোগসূত্র লক্ষ করা যায় আর তা হলো সাহিত্যরস উপভোগ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন নির্মোহ। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কবিদের প্রসঙ্গেও এটি প্রযোজ্য। পরিশিষ্ট অংশে 'আলাপনী হোসেন মিঞা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ লেখক আলাপচারিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ আলাপ নিছক আলাপচারিতা নয়। এ আলাপ শিল্পের গভীর তল স্পর্শ করে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : 'অ॥ তাহলে কি একজন শিল্পী সমাজ সচেতন হবেন না? আ॥ নিশ্চয় হবেন। কিন্তু তিনি শিল্পীর সমাজসচেতনতা আর সমাজতাত্ত্বিকের সমাজ চেতনতায় তফাত আছে এটা কিছুতেই ভুলে যাবেন না। একজন শিল্পী নিশ্চয় সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবল আগ্রহী ব্যক্তি হবেন, কিন্তু সেটা শিল্পী হিসেবেই হবেন। শিল্পীর সমাজের দিকে তাকিয়ে সমাজতাত্ত্বিক হতে যাওয়া, সমাজতাত্ত্বিকের সমাজের দিকে তাকিয়ে শিল্পী হতে চাওয়ার মতোই ভ্রান্তিপূর্ণ।' আলোচ্য গ্রন্থটিতে বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখার সন্ধান পাওয়া যায়। শা. আ.

উত্তর ফাল্গুনী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৭ সন। কবিতা সংখ্যা ১৯,— শর্বরী, সংশয়, ব্যবধান, প্রতিদান, মৌনব্রত, নিরুক্তি, অহৈতুকী, মরণতরী, অননুতপ্ত, প্রশ্ন, দুঃসময়, জন্মান্তর, বিলয়, মহানিশা, জাগরণ,

www.pathagar.com

মাধবী পূর্ণিমা, ডাক, দ্বন্দ্ব এবং প্রতিপদ। 'উত্তর ফাল্গুনী' সুধীন দত্তের অন্যতম প্রেমের কাব্য। কবির স্মৃতিতে সরাগ প্রেমের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল তারই রোমন্থন চলেছে এ কাব্যে। সুধীন দত্তের অধিকাংশ কাব্যেই প্রেমের স্মৃতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তবে সে স্মৃতিতে রকমফের রয়েছে। 'উত্তর-ফাল্গুনী'র প্রেম দীর্ঘদিন ব্যক্তিক অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হয়ে যখন পুরনো হয়ে পড়েছে তখন সেই স্মৃতি কবির ভাবলোকে এক নতুন আবেগ সঞ্চার করে। প্রেমের সেই স্মৃতি কবির মনে হিল্লোল জাগালেও তাতে বেদনার রেশ রয়েছে। যৌবন-অতিক্রান্ত কবি বিগত দিনের ছলাকলা ভরা প্রেমের সুখ-স্বপ্নে বিভোর ; কিন্তু তা স্মৃতিমাত্র। এই বোধই তাঁর মনে বেদনার রেশ এনেছে। অতীত নাট্যের এক মনোরম দৃশ্যপটে অভিনীত স্বপ্নকে কেবল রোমন্থন করা যায়, ধরে রাখা যায় না। 'উত্তর-ফাল্গুনী'র অনেক কবিতায় দেহভোগের কথা স্মরণ করা হয়েছে। নারীর দেহ-সৌন্দর্য ও সম্ভোগের মধ্যে কবি এক সময় পূর্ণতার প্রশান্তি পেয়েছেন, কালের বিবর্তনে সেই মধুময় স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বেদনায় ম্লান হয়েছেন। দেহের দাক্ষিণ্যে যে সত্য মিলেছিল তাকে তিনি চিরন্তন বলে মেনে নিতে পারেন নি, ফলে আজ তাঁকে দুঃসহ জ্বালায় পীড়িত হতে হচ্ছে। তথাপি জৈব ক্ষুধার চরম অভিব্যক্তিই উত্তর-ফাল্গুনী'র প্রেম-কবিতার বৈশিষ্ট্য, যদিও ফাল্গুনের উন্মাদনার পর তার চরম অবসান ; কেবল সেই সুখের স্মৃতি-বেদনাভরা রোমন্থন। গ্রন্থের নাম তাই 'উত্তর-ফাল্গুনী'। আ. ই

উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীত : হাসান হাফিজুর রহমান ও আলমগীর জলীল সম্পাদিত রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিশেষ করে বিবাহ, নায়র, প্রেম-বিরহ, বিষয়ক প্রায় শতাধিক আঞ্চলিক গীতির সংগ্রহ। মেয়েলী মনের সরলতা, আকুলতা, বধূ বেশে নতুন জীবনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা ও জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিফলন হচ্ছে সংগৃহীত গীতগুলোর বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, "মেয়েলী গীত হল একেবারেই মাটি সংলগ্ন জিনিস। সুতরাং এর পরিবেশন ও প্রতিফলনেরই সবটুকু অকৃত্রিম ; ফলে, সমাজ-ভিত্তিক একটা মৌলিক পরিচয়ও প্রত্যেক বিবর্তন-পর্যায়েই এতে অবিকৃত থেকে যায়। রংপুর ও রাজশাহীর মেয়েলী গীত এই সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। দু'টো আলাদা অঞ্চলে এই গীতগুলো ছড়িয়ে থাকলেও এদের অভিব্যক্তি-ভঙ্গি কাছাকাছি, জীবনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিষয় সমূহের প্রতি আকর্ষণ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখবোধের প্যাটার্নও সমগোত্রীয়, বিশেষ করে এমন কতগুলো গীত রয়েছে যার উৎসও এক—শুধু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলনের দরুণ কতিপয় শব্দের এদিক-ওদিক হয়েছে মাত্র। এর কারণ বোধ করি এই যে, এই দুই অঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও মানস গঠনের ভিন্নতা খুব বেশি নয়। এই জন্যে এদের উভয় ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যিক ব্যবহার একই পদ্ধতিতে, প্রায় একই ধরনের উল্লেখ ও মেজাজ উন্মোচিত হয়েছে।' গ্রন্থটি আরো একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য যে, সামাজিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের স্রোতে আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও প্রথাসমূহ যখন ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে 'উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীত'-এ বিশেষ একটি অঞ্চলের বিশেষ একটি কালের ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছে। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৬২ সালে। মা. আ.

উত্তর বসন্ত : কবি আবদুল কাদিরের কবিতা সংকলন। রবীন্দ্র প্রভাবিত চেতনা, ভাব ও ভাষার স্বাক্ষর পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। ২৩টি কবিতার এই সংকলনে বেশ কয়েকটি সনেটও রয়েছে। কবিতার প্রধান বিষয় প্রকৃতি ও নারী। বসন্ত, রাত্রি, চন্দ্রিমাসহ প্রকৃতির প্রাণ ও রূপের প্রতি একজন খাঁটি নিসর্গ প্রেমিকের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে এই কাব্যে। নারীর

www.pathagar.com

বন্দনা, প্রণয়ের আকুতি, বিরহের আকুলতা, প্রেমের আরাধনা প্রভৃতি নারী বিষয়ক কবিতাগুলোতে প্রধান হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও নারী একাকার রূপ লাভ করেছে। সব মিলে 'উত্তর বসন্ত' একটি খাঁটি রোমান্টিক কাব্য, মুগ্ধতা, রহস্যময়তা, আকুলতা ও আবিলতা এই রোমান্টিকতার প্রধান লক্ষণ। স্টাইলের ক্ষেত্রে চিত্রকল্প এই কাব্যের প্রধান আশ্রয় : 'নীল আকাশের বাঁকা পালঙ্কে ঘুমাইছে চন্দ্রিমা,- যাদুকরী রূপ উছলিয়া পড়ে ছাড়ি, দিগন্ত-সীমা। দিগম্পঙ্গনার মধু-অভিষেকে তারকার কানাকানি, ছায়াপথ-গাথা দিব্য-বীণায় গাহে বিমোহিতা বাণী।' (চন্দ্রা) **প্রথম প্রকাশ :** ১ জুন ১৯৬৭। **প্রকাশক :** সুলতানা ইবরাহীম, ২১ জয়নাগ রোড, ঢাকা। **প্রচ্ছদ :** আবদুর রউফ। **মো. আ. মি.**

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত : রচয়িতা শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে বিচিত্র বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে। এই সুদীর্ঘ এবং সুবিপুল অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহু গীতরীতি, বহু রকম বাদ্যযন্ত্র, বিবিধ সঙ্গীতশৈলী বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাঙ্গীতিক চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই স্বল্প পরিসরের গ্রন্থে উক্ত বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে বাংলার স্বকীয় সঙ্গীত-সাধনার ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বহু প্রয়োজনীয় সাঙ্গীতিক পরিভাষার ব্যখ্যাও যুক্ত করা হয়েছে। **প্রকাশক** ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ৫০ সুন্দরনগর, নয়াদিল্লী-৩। **প্রথম প্রকাশ** ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১০৮, মূল্য ৪ রুপি। বি.ব.

উত্তরা : হিন্দু পুরাণ মতে বিরাটরাজকন্যা। মাতা সুদেষ্ণা, পতি অর্জুনপুত্র অভিমন্যু। বিরাটরাজের প্রাসাদে একদা বৃহন্নলা নামে ক্লীববেশী অর্জুন উত্তরাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেন। বিরাটরাজ পরে অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে তাঁর হাতে কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাব করেন। অর্জুন কন্যাতুল্যা শিষ্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়ে পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে দেন। সপ্তরথী কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে অভিমুন্য নিহত হলে পরীক্ষিৎ উত্তরার গর্ভে ছিলেন। অশ্বত্থামা ঐশিকাস্ত্র প্রয়োগ করে গর্ভস্থ পরীক্ষিৎকে মারবার চেষ্টা করলে যোগবলে কৃষ্ণ তখন তাঁকে রক্ষা করেন। **ম. চৌ.**

উত্তরা : প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর মুখপত্র। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন বার-য়্যাট্-ল ও ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম.এ., পি-আর-এস, পিএইচ-ডি। সহ-সম্পাদক : শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী। মন্ত্রণা পরিষদ : শ্রীসরলা দেবী বি.এ., অধ্যক্ষ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম.এ., ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পিএইচ-ডি, ডাঃ শ্রীমেঘনাথ সাহা ডি-এস-সি, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম.এ., শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর। প্রিন্টার-শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, বেনারস-ব্রাঞ্চ-বেনারস, প্রকাশক : শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী, বি ২০/৪৬ ভেলুপুরা কাশীধাম। ৮ বর্ষ : ১ম সংখ্যা আষাঢ়-১৩৪০ এর সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী। প্রিন্টার-শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোড, কলকাতা, পাবলিশারস শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী, ২০/৪৬ ভেলুপুরা, কাশীধাম। ২য় বর্ষ : ৭ম সংখ্যা, চৈত্র-১৩৩৩-এর সূচিপত্র। গান (১) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৯১, (২) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-৪৯২, অভিভাষণ-শ্রীরাধাকুমুদ মুখো-পাধ্যায়-৪৯৩, ভাঙন (গল্প) : শ্রীনরেন্দ্র দেব-৫০১, সংকলন : সাহিত্যে শুচি-বিকার : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-৫৯৭, মহাকবি তুলসী-দাস : শ্রীচন্দ্রদেব দীক্ষিত-৫০৮, মুক্তি-পরশ (কবিতা) : শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-৫১১, যুগ্ম-অশ্রু (কবিতা) : শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী (১) অনামিকা-৫১২, (২) কালো-৫১২, প্রবাসী-বাঙালি : দিল্লী ও বাঙালি-শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-৫১৪, নতুন সংসার (কবিতা) দরবেশ-

www.pathagar.com

৫২১, বৈষম্য (উপন্যাস) : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-৫২২, গান : দেবেন্দ্রনাথ সেন-৫২৭, গান ও স্বরলিপি গান : শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন-৫২৮, স্বরলিপি : শ্রীদিলীপ কুমার রায়-৫২৮, পুস্তক সমালোচনা-৫২৯, কালোর আলো (কবিতা) : শ্রীরাসবিহারী মল্লিক : ৫৩২, সভাপতির অভিভাষণ : শ্রীঅমৃতলাল বসু-৫৩৩, পলাশের পুরস্কার (গল্প) : শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ-৫৩৯, অন্ধকূপের অন্ধকারে (উপন্যাস) : শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়-৫৪৩, সুন্দর (কবিতা) : হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়-৫৫০, চিত্রসূচী : প্রতীক্ষা (রঙিন) শ্রীচারুচন্দ্র রায় মুখপত্র। ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা পাওয়া যায়নি এবং উহা কত বছর চলেছিলো তা জানা যায় না। আ. জ.

উত্তরাধিকার—শহীদ কাদরী : কবিতা সংকলন। প্রকাশকাল : ১৯৬৭। শহীদ কাদরী বাংলা কবিতার পঞ্চাশের দশকে এক মুকুটহীন সম্রাট, 'উত্তরাধিকার' তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ। মোট চল্লিশটি কবিতার এটি গ্রন্থনা। একাব্যে তিনি জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের পথ ধরে বৈশ্বিক নন্দন চেতনা ও পঞ্চাশের নাগরিক জীবনযন্ত্রণার সমীকরণ পাওয়া যায় 'উত্তরাধিকার'-এ। একাব্যে পংক্তিতে পংক্তিতে তিনি দৃশ্যমান বস্তুকে দেখেছেন প্রবল অন্তরঙ্গে। মননের শাসনে এবং আবেগের প্রাবল্যের যৌথ প্রচেষ্টায়। একান্ত নাগরিক একাব্য গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে শহীদ কাদরীর কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য। প্রথম কবিতা 'বৃষ্টি বৃষ্টি' ব্যস্ত শহরের কোন এক সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টিতে মানুষের দিকহীন ছুটোছুটি এবং নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণাগাঁথা একেঁছেন। এ কবিতাগুলোতে স্বদেশ সংলগ্ন হয়েও নিজেকে ভেবেছেন কবি নিঃসঙ্গ-একা, অনেকটা উদ্বাস্ত মানসিকতায়। নগর জীবন তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে কষ্টময়—নিজেকে ভেবেছেন তিনি 'বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত সন্তান'। এটাই তার উত্তরাধিকার। সভ্যতার নানা রঙের ভেতর দিয়ে নিজেকে কবি বিশ্লেষণ করেছেন—কখনও বোদলেয়ারের কুৎসিত নন্দন চেতনায় নাগরিক বিকৃতি জীবনকে তুলে এনেছে 'নপুংসক সন্তের উক্তি'তে। বাসন্তী আকাশ দেখে কখনো মুগ্ধ হয়েছেন 'নির্বাণ'-এ। এ কবিতাবলীতে শহীদ কাদরীর মনোলোক পরিব্রাজকের মতো পরিভ্রমণ করেছে গণিকালয় থেকে সন্তের হৃদয়ে, তবে সঙ্গহীন একাকী—এবং যান্ত্রিকতায়, হতাশায়, সংকীর্ণতায় ও ব্যস্ততায়। জীবনে বহুমাত্রিকতা যেখানে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্পে উঠে এসেছে গুচ্ছ গুচ্ছ স্নিগ্ধতায়। মা. জা.

উত্তরাধিকার : বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পত্রিকা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে। সূচনা লগ্নে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ড. মযহারুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন কবি রফিক আজাদ। উত্তরাধিকার প্রথমে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত ত্রৈমাসিকই রয়েছে। এটি বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংখ্যা প্রকাশ করে। যেমন : ১ম বর্ষ হয় নিয়মিত সংখ্যার শেষে 'একুশের ক্রোড়পত্র' সংযোজন করে ঐ সংখ্যাটির একটি ভিন্নরূপ প্রদান করা হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমীতে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ থেকে ৫ম সংখ্যাটি বাংলা সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা ১৯৭৪ হিসেবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্যিকদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এসব সাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, বুদ্ধদেব বসু, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসু সংখ্যাটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হিসেবে পাঠক মহলে সমাদৃত হয়। ১৯৭৩ থেকে দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে বর্তমান পর্যন্ত উত্তরাধিকার পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে

www.pathagar.com

আসছে। বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক এবং নির্বাহী সম্পাদক পরিবর্তীত হয়েছেন। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল-ডিসেম্বর সংখ্যা কবি জীবনানন্দ দাসের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। বলা হয় : 'কবি জীবনান্দ দাস-এর জন্মশতবর্ষ (১৮৯৯) বাংলা একাডেমীর সশ্রদ্ধ নিবেদন'। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮০। কবি জীবনানন্দ দাসের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সংখ্যাটি বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে একটি বিশেষ সংযোজন। এই সংখ্যার সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং নির্বাহী সম্পাদক ওবায়দুল ইসলাম। সময়কাল ২০ বর্ষ-২-৩-৪ সংখ্যা। বৈশাখ -পৌষ ১৪০৬/এপ্রিল-ডিসেম্বর-১৯৯৯। মাঝে মাঝে এই পত্রিকাটি প্রকাশে বিলম্বিত হয়, এটি একটি প্রধান ত্রুটি হিসেবে পরিলক্ষিত। সে. হো.

উত্তরের খেপ : শওকত আলী রচিত উপন্যাস। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ একেছেন সমর মজুমদার, মূল্য : এক'শ বিশ টাকা। এ উপন্যাসে হায়দার একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর বাবা ছিলেন ট্রাক ড্রাইভার। হায়দারের মা বিহারী ঘরের সন্তান। সে এক বড়লোকের নাতনী মরিয়মকে বিয়ে করে, কিন্তু বিয়ে সুখের হয় না। মরিয়মের আবার অন্যের সাথে বিয়ে হয়। দ্বিতীয় বিয়েও মরিয়মের জন্য কোনো সুখ বয়ে আনে না। তাঁর স্বামী একজন মাতাল ও কুচক্রি। সাত বছর পর মরিয়মের সাথে তাঁর প্রাক্তন স্বামীর দেখা হয়। মরিয়ম হায়দারকে অনুরোধ করে তাঁদের একমাত্র সন্তান মিঠুকে সাথে নিয়ে যেতে। হায়দার নিতে চায় না, কারণ তার নিজের থাকবারই কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ঘটনাচক্রে হায়দার ট্রাক এ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়ে হাসাপাতালে ভর্তি হয়। হাসপাতালে মরিয়ম মিঠুকে নিয়ে যায় এবং আবারও অনুরোধ করে হায়াদার যেন মিঠুকে তাঁর সাথে রাখে। কারণ মিঠু যাকে বাবা বলে জানে, তার কাছ থেকে সে বাবার আদর পায় না। হায়দার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে মরিয়ম একজন লোকের সাথে মিঠুকে হায়দারের কাছে পাঠায়। হায়দার ক্রাচে ভর দিয়ে বাসে করে মিঠুকে নিয়ে মরিয়মের কাছে আসে। মরিয়ম চায় হায়দার তাঁদের সাথেই থেকে যাক। হায়দার মনস্থির করতে পারে না। সে ছেলেকেও সাথে নেয় না। মরিয়ম বলে--মিঠুকে সে ঢাকায় বোর্ডিংয়ে পড়াবে, তবে মিঠুর দেখাশোনা হায়দারকেই করতে হবে। উপন্যাসের শেষে হায়দার বলে, সে আবার মরিয়মের কাছে আসবে এবং অবশ্যই ঢাকায় যাবে। এভাবে এক আশাবাদের ভেতর দিয়ে শেষ হয় উপন্যাস। আশাবাদই মানুষের স্বপ্ন। স্বপ্ন জীবনকে দেয় মহিমা—এই প্রত্যয়ের ভেতরে এই উপন্যাস জীবনের প্রতি লেখকের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বাহী। সৈ. আ. জা.

উদভ্রান্ত প্রেম : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় রচিত একটি শোকোচ্ছ্বাসমূলক গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ। প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে গ্রন্থকারের হৃদয়ে যে শোকের ছায়াপাত ঘটে তারই পরিপ্রেক্ষিতে গদ্যে এই কাব্যিক গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। প্রণয়িনী-বিয়োগবিধুর হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবের অতি চমৎকার স্ফূরণ এ গ্রন্থটি। প্রণয়িনীর মুখচন্দ্র স্মরণ করে লেখক ভাবে আপ্লুত হয়েছেন এবং অশ্রুনির্ঝর গদ্যে তা ব্যক্ত করেছেন। সহৃদয় পাঠকচিত্তও তাতে বিগলিত হয়। কখনো তিনি বাসন্তী প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখে চরম শোকোচ্ছ্বাস নিবেদন করেছেন। পত্নীর স্মরণে কখনো উন্মাদের মতো লেখক জাহ্নবী তীরে অথবা শ্মশানভূমে একা বিচরণ করেছেন। কাব্যধর্মী সুললিত গদ্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলাসাহিত্যে তিনি এই জাতীয় গ্রন্থের সার্থক স্রষ্টা। আ.ই.

উদয়সিংহ : মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র এবং ইতিহাস-খ্যাত রাণা প্রতাপসিংহের পিতা। জীবনকাল ১৫৫২-১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কথিত আছে যে, শিশু উদয়সিংহকে ধাত্রী পান্না আপন পুত্রের প্রাণের

www.pathagar.com

বিনিময়ে রক্ষা করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাণা বিক্রমাদিত্য নিহত হওয়ায় ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে উদয়সিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শেরশাহ্ চিতোর জয় করলে উদয়সিংহ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং শেরশাহের মৃত্যুর পর চিতোর পুনরুদ্ধার করে মেবারের হৃত সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ করলে উদয়সিংহ জয়মল ও পত্ত নামে দু'জন রাজপুত বীরের উপর দুর্গ রক্ষার ভার দিয়ে এবারও সসৈন্যে আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে চিতোর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে সম্ভাব্য মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতিস্বরূপ উদয়সিংহ ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'উদয়পুর' নামক নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রতাপসিংহ মেবারের রাজা হন। চিতোর ত্যাগ করেছিলেন বলে উদয়সিংহ ঐতিহাসিক টড এবং রাজপুত চারণ কবিদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, চিতোর ত্যাগ ও উদয়পুর শহর নির্মাণ উদয়সিংহের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। **আ. খা.**

উদয়াদিত্য : বাংলাদেশের বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত ইসলাম খাঁ পরিচালিত মুঘল বাহিনীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যে জলযুদ্ধ হয়, তাতে উদয়াদিত্য সৈন্য পরিচালনার আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্যের স্থল বাহিনীর অধিকাংশ এবং ৫০০ রণতরী তাঁর অধীনে ছিল। যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী সল্কা নামক স্থানে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত উদয়াদিত্য পরাজিত হন এবং পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর প্রায় সব কামান ও রণতরী মুঘলবাহিনীর হস্তগত হয়। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ যাত্রার সময় তাঁর উপর রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে যান। যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। মুঘল বাহিনী তাঁকে এবং তাঁর পুত্রদেরকে কিছুদিন ঢাকায় বন্দী অবস্থায় রেখে পরে আগ্রায় পাঠিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু ঘটে। নওয়াব ইব্রাহীম খানের অনুরোধে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতাপের পুত্রদের মুক্তি দান করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। স্বীয় চরিত্র গুণে উদয়াদিত্য সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। স্বদেশী যুগে তাঁর বীরত্ব স্মরণ করে সরলা দেবী চৌধুরানীর উদ্যোগে কলকাতা আলফ্রেড থিয়েটারে 'উদয়াদিত্য-উৎসব' পালিত হয়। **আ. খা.**

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত : সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী স্বরের উচ্চগ্রামকে উদাত্ত, নিম্নগ্রামকে অনুদাত্ত এবং উদাত্ত ও অনুদাত্ত-এর মিলিত মধ্যস্বর হচ্ছে স্বরিত। সাধারণ অর্থে উদাত্ত হচ্ছে উচ্চস্বর, অনুদাত্ত নিম্নস্বর এবং স্বরিত হচ্ছে যে স্বরের আদ্য অর্ধেক উদাত্ত ও শেষার্ধ অনুদাত্ত। 'উদাত্ত' শব্দ মহদ্গুণসম্পন্ন, উচ্চ, বিপুল ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী উদাত্ত' এক ধরনের অর্থালঙ্কারের নামও বটে। 'অনুদাত্ত' শব্দেরও একটি ভিন্নতর তাৎপর্য রয়েছে। বৈদিক মন্ত্র বিশেষকেও 'অনুদাত্ত' বলা হয়। 'স্বরিত' বলতে নাদিত, উচ্চারিত অর্থও বোঝায়। **সু. মু.**

উদান : বৌদ্ধদের সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। এটি গৌতম বুদ্ধের উদাত্ত বাণীর সংকলন। গ্রন্থটি আট বগ্গে (বর্গ) বিভক্ত এবং এর প্রতিটি বগ্গে দশটি করে সুত্ত (সূত্র) আছে। সুত্তগুলির প্রথমে সাধারণত বুদ্ধের সমসাময়িক কালের কোনো একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং শেষে বুদ্ধের একটি উক্তি রয়েছে। এই উক্তিকেই 'উদান' বলা হয়। এই উদানগুলো সাধারণত ত্রিষ্টুভ বা জগতী ছন্দে রচিত।

www.pathagar.com

এগুলোতে বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ, অর্হতের মানসিক শান্তি, নির্বাণ প্রভৃতির মহিমা ও গৌরবের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুত্তের গল্প-গুলির চাইতে উদানগুলো সম্ভবত অধিক প্রাচীন এবং এগুলোর বেশীর ভাগই বুদ্ধের নিজের অথবা তাঁর প্রাচীন শিষ্যদের বাণী বলে মনে হয়। আ. খা.

উদাসিনী : অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত একটি গাথা কাব্য। প্রকাশকাল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ। উদাসিনী এককালে রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র প্রমুখ কবিদের মুগ্ধ করেছে। উদাসিনীর আখ্যানভাগ পার্নেলের 'দিহাসিট' কাব্যের বিষয়ের অনুরূপ। কাব্যের বিষয়বস্তু রোমান্টিক। প্রথম দৃশ্য কিন্নর কানন। নিশীথ রাতে ঘন বনান্তরে বন দেবীর সাহচর্যে পথিক আশ্বস্ত। প্রজ্বলিত চিতাগ্নি থেকে সরলা নাম্নী এক তরুণীকে উভয়ে উদ্ধার করেন। পরবর্তী সর্গে সরলার আত্মকথা। বিদর্ভের রাজ্যচ্যুত নৃপতি বিজয়ের কন্যা সরলা অসুস্থ পিতাসহ দ্বারে দ্বারে ঘুরে গঙ্গাতীরে এসে একদা ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময় আকস্মিক বানের কবল থেকে যুবক সুরেন্দ্র তাদের রক্ষা করে। এরপর সরলার পিতার মৃত্যু, কার্যব্যপদেশে সরলার সঙ্গে অঙ্গুরীয় বিনিময় করে সুরেন্দ্রের প্রস্থান, সেদেশের রাজার বাড়িতে সরলার আশ্রয়, সখী সুলোচনা কর্তৃক রাজকুমারের প্রতি সরলার আকর্ষণ প্রয়াস। সুরেন্দ্রের হঠাৎ আগমন ও সরলার সঙ্গে মিলন শেষে গোপনে প্রস্থান, রাজপুত্রের হাতে সুরেন্দ্রের আটক ও মৃত্যুদণ্ডাদেশ, কিন্তু সরলা কর্তৃক রাজপুত্রকে বিবাহের বিনিময়ে সুরেন্দ্রের মুক্তি, বিবাগী অবস্থায় সুরেন্দ্রের দেশ ত্যাগ, রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ের আগেই সুরেন্দ্রের পথ অনুসরণ করে সরলার পলায়ন, পথে স্বর্ণকৌটা, শঙ্করমূর্তি অঙ্গুরীয় ও মানুষের হাড়গোড় দেখে সুরেন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে সরলার নিশ্চিত বিশ্বাস ও সেই হাড়ের চিতায় সরলার আত্মবিসর্জনের সংকল্প, আগন্তুক কর্তৃক তার উদ্ধার। অষ্টম ও নবম সর্গে বনদেবী ও পথিকের সহায়তায় সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রের সঙ্গে সরলার সাক্ষাৎ ও তাঁর মূর্ছা। দশম সর্গে বসন্তের শোভাসম্ভারে পরিপূর্ণ পরিবেশে সুরেন্দ্রের পরিণয়। কাহিনীকাব্যখানিতে অক্ষয়চন্দ্রের রচনার অনায়াস সারল্য ও স্বচ্ছতা এবং গীতিকাব্যিক উচ্ছলতা পাঠককে মুগ্ধ করে। তবে তার কবিপ্রকৃতির খানিকটা ইমোশনাল রীতির অনুসারী। আ. ই.

উদাসী : আবদুল হামিদ খাঁ ইউসফজী রচিত গীতিকাব্য। প্রথম প্রকাশ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ। 'উদাসী' কাব্য আসলে তিনটি কাব্যের সংকলন— উদাসী, কিরণপ্রভা ও অরুণভাতি। প্রথম কাব্য 'উদাসী' কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। 'সংসার বিরাগী জিতেন্দ্রিয় ঋষি', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'শ্মশান সঙ্গীত', 'উৎপীড়িত প্রেমিক', 'নিরাশ সঙ্গীত', 'বিষাদ সঙ্গীত', 'নিরাশ সাধক', 'জীবন প্রহেলিকা', 'উদাস সঙ্গীত' ইত্যাদি কবিতায় 'হামিদ বাউর' রূপী কবির ব্যক্তিহৃদয়জাত সংসার-বিমুখতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। 'নভোস্থল', 'সমুদ্রযাত্রী', 'হিমাচল' ইত্যাদি কবিতায় প্রাকৃতিক জীবনের কথা ব্যক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় কাব্য 'কিরণ প্রভা'য় কবি পয়ার ছন্দে প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন,—'প্রেম ঐশ্বরিক সত্তা, ঐশ্বরিক ধন,/কি দিয়ে করিব ভব, প্রেমের তুলন?' ইত্যাদি। তৃতীয় গ্রন্থ 'অরুণভাতি' একটি কাহিনীভিত্তিক কাব্য। তবে কাহিনী বিবৃতির চেয়ে প্রেমিক হৃদয়ের আর্তি ও কাতরতা দেখাতে কবি বেশি উৎসুক। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে 'উদাসী' কাব্যে দুটি ভাবের অভিব্যক্তি ঘটেছে। একদিকে, ব্যক্তিহৃদয়প্রসূত প্রেমের অসাফল্য এবং সেই কারণে কবির মানবীয় প্রেমে বিশ্বাস ও ভক্তি হারিয়ে সংসারত্যাগী উদাসী হামিদ বাউরের বেশ ধারণ করে সর্বশক্তিমানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা, অপরদিকে স্বজাত ও স্বদেশের কল্যাণ কামনায় কবির সদিচ্ছার প্রকাশ। আ.ই.

উদাসী : সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ। গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ ধর্মকে আশ্রয় করে যে ক'টি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিলো, সেগুলোর মধ্যে

www.pathagar.com

উদাসী প্রাচীনতম। সংসারের সুখ-দুঃখের প্রতি একান্ত নিরাসক্ত হয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করাই যে তাদের আদর্শ, সম্প্রদায়টির নাম থেকেই তা বোঝা যায়। উদাসী সন্ন্যাসীদের সাধনার লক্ষ্য মায়ার ছলনা থেকে আত্মাকে রক্ষা করা, স্বার্থত্যাগ ও সুকৃতি দ্বারা আত্মার শুদ্ধি অর্জন এবং মরজীবনে ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভ। কবীরের ন্যায় নানকও সকল ধর্মের ঐক্য উপলব্ধি এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার বাণী প্রচার করতেন। ক্ষুদ্রতা ও ভেদাভেদজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার ভজনে জীবন অতিবাহিত করতে পারলে যে আত্মার শান্তি লাভ হয় এবং পৃথিবীও শান্তিময় হয়ে ওঠে, উদাসী সন্ন্যাসীগণ নানকের এই মতবাদেরই ধারক। প্রার্থনা এবং ধ্যান তাদের মুখ্য ধর্মকৃত্য। সংঘতে মিলিত হয়ে ধর্মালোচনা করা অথবা দলবদ্ধ হয়ে তীর্থভ্রমণ করা তাদের ধর্মানুশীলনের অঙ্গ। ভিক্ষাজীবী না হলেও সব সময় দারিদ্র্যাভ্যাস উদাসীদের নীতি। কিন্তু ছিন্নবস্ত্র পরিধান করলে কিংবা দিগম্বর হয়ে থাকলেই যে আত্মিক উন্নতি হয়, উদাসীরা তা বিশ্বাস করে না। সাধারণত উদাসীগণ যাজক বা পুরোহিতের কাজ করে থাকে। তাদের মুখ্য কৃত্য 'আদিগ্রন্থ' এবং গুরু গোবিন্দের 'দশম পাদশাহী দা গ্রন্থ' পাঠ ও ব্যাখ্যান। কখনো কখনো তারা কবির, সুরদাস বা মীরাবাঈ-এর ভজনও গেয়ে থাকে। উপাসকগণ গ্রন্থসাহেবকে যে অর্থ ও অপরাপর দ্রব্য উৎসর্গ করে তা উদাসী যাজকদের প্রাপ্য হয়। পুরোহিত সমবেত উপাসকদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। বারানসীর কোনো কোনো উদাসী প্রতিষ্ঠানে সূর্যাস্তের পর উপাসনাদি শুরু হয় এবং গভীর রাত পর্যন্ত সঙ্গীতানুষ্ঠান চলে। উদাসীদের অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং বেদান্ত ব্যাখ্যায় পারদর্শী। **আ. খা.**

উদাসীন পথিকের মনের কথা : মীর মশাররফ হোসেন রচিত উপন্যাস। বইটি প্রকাশিত হয় লাহিনীপাড়া কুষ্টিয়া থেকে। মুদ্রিত হয় ৪৬ নম্বর পঞ্চাননতলা লেন ভারত মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এন্ড কোং দ্বারা। মুদ্রণ কাল ১২৯৭ সন। মূল্য : ১.০০ টাকা। এই উপন্যাসে অধ্যায়গুলোকে লেখক 'তরঙ্গ' বলে উল্লেখ করেছেন। শুরুতেই আছে : প্রথম স্তর। প্রথম তরঙ্গ নীলকুঠি'। এভাবে সপ্ততিরিংশ পর্যন্ত অধ্যায়ের শিরোনাম 'শেষ অঙ্ক'। পরিশেষে তিনি 'পথিকের নিবেদন' বলে একটি প্যারা সংযোজন করেছেন। এই উপন্যাসের পটভূমি নীলচাষ এবং নীল বিদ্রোহ। উদাসীন পথিক লেখকের সাহিত্যিক ছদ্মনাম। এই ছদ্মনাম ব্যবহার করে তিনি নিজের মনের কথা বলার আকারে উপন্যাসের আঙ্গিক তৈরি করেছেন। উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র মীর। দ্বিতীয় তরঙ্গে তিনি শিরোনাম দিয়েছেন 'মীর সাহেব কে?' এই মীর সাহেবের বর্ণনায় তিনি বলেছেন, 'মীর সাহেব গৌরবর্ণ স্থূলাকায়, চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি এবং ঘোর আমোদি।' গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গে মনে করা যায় যে এই মীর সাহেব লেখক নিজেই। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র প্যারী সুন্দরী। সে সুন্দরপুরের জমিদার। নীলকর সাহেব কেনীর অত্যাচারে গ্রামবাসী প্যারী সুন্দরীর কাছে তাদের রক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়। প্যারী সুন্দরী এই আবেদনে সাড়া দিয়ে কেনীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য লাঠিয়াল পাঠায়। চতুর্থ তরঙ্গের শিরোনাম 'বাঙালি যুদ্ধ'। এভাবে শুরু হয় নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের বিস্তৃতি ঘটেছে। উপন্যাসের শেষ লেখক দেখিয়েছেন কেনীর মৃত্যু হয় কলকাতার দাতব্য চিকিৎসালয়ে। মিসেস কেনী সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় এবং এলাকা ছেড়ে চলে যায়। দেখা যায় 'দেশের লোকই ভাগ বন্টন করে কেনীর যাবতীয় সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইলো। নীল করের নাম দেশ হইতে একেবারেই লোপ পাইয়া গেল।' উপন্যাসের পরিণাম শিরোনামে যে তরঙ্গটি আছে তার প্রথম পংক্তি : 'কেনীর জমিদারী খণ্ড খণ্ড হইয়া বাঙালির দখলে

www.pathagar.com

আসিল।' লেখক শেষ করেছেন এভাবে 'পথিকের মনের কথা প্রথমস্তর কেনীর প্রসঙ্গ পরিণাম ফলের সহিত শেষ হইয়া সমাপ্ত হইলো।' এই উপন্যাসের আঙ্গিকটি নিঃসন্দেহে প্রচলিত ধারার আঙ্গিক নয়। লেখক নিজেকে আড়াল করে নিজেই কথা বলেছেন, এটাই এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। মীর মশাররফ হোসেনের চমৎকার গদ্যভঙ্গী এই উপন্যাসের অন্যতম দিক। সে. হো.

উদীচী : বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত একমাত্র সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে শিল্পী সাইদুল ইসলামের নারিন্দার বাসায় সত্যেন সেন-সহ ৬ জন মিলে "ওরে ওরে বঞ্চিত সর্বহারা দল" গানের মহড়ার মাধমে 'উদীচী'র যাত্রা শুরু। পরে ন্যাপ নেতা পীর হাবিবুর রহমানের সহায়তায় ঢাকার উত্তরাঞ্চলের একটি জায়গা পাওয়ার পর উদীচী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্য থেকে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন জীবনবাদী কথাশিল্পী, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সত্যেন সেন (১৯০৭–১৯৮১)। তিনি ছিলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনিই এই সংগঠনের নাম প্রস্তাব করেন 'উদীচী'—উত্তর আকাশের তারা। ১৯৭২ সালের পর উদীচী দেশব্যাপী দুবার সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে বিকশিত হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, কুমিল্লা, বরিশাল, ময়মনসিংহ জেলা সহ সারা দেশে অসংখ্য শাখা গঠিত হলে এই সংগঠন দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়। বর্তমানে একাত্তরটি সাংগঠনিক জেলায় উদীচীর দুই শতাধিক শাখা রয়েছে। ১৯৭২ সালে গণসংগীতের স্কোয়াড গঠন করে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে গণসংগীত স্কোয়াড ছাড়াও সারা দেশে উদীচীর ২০টি আবৃত্তি বিভাগ, ২৩টি নাটক বিভাগ, ১৬টি নৃত্য বিভাগ, ১৪টি সংগীত বিদ্যালয়, ৭টি পাঠাগার, ৭টি চারুকলা বিভাগ, ১টি সাহিত্য বিভাগ ও ১টি শিশু বিদ্যানিকেতন রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই সংগঠনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সত্যের সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, কলিম শরাফী, পান্না কায়সার, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ হাসান ইমাম প্রমুখ। উদীচী দেশের বাইরে লন্ডনে ও ভারতে অনুষ্ঠান করে প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রতি দুই বছর অন্তর উদীচী লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করে থাকে। ১৯৯৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রমনার বটমূলে উদীচীর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী সম্মিলনী উদ্‌যাপিত হয়। উদীচীর কেন্দ্র থেকে একটি অনিয়মিত সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়—'চারণ' নামে। এছাড়াও ত্রৈমাসিক বুলেটিন 'উদীচী বার্তা' প্রকাশিত হয়। মা.হ.

উদ্দালক : একজন বিখ্যাত আর্যঋষি। তাঁর প্রকৃত নাম আরুণি ; অরুণ ঋষির পুত্র। গুরুভক্তির জন্য তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গুরু আয়োদ ধৌম্যের বরে তিনি উদ্দালক নামে খ্যাত হয়েছেন এবং বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন। রাজর্ষি অশ্বপতির কাছে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতারক্ষামূলক নিয়ম স্থাপন করেন। বিবাহিতা নারীর ভিন্ন পুরুষে এবং বিবাহিত পুরুষের পরস্ত্রীতে আসক্তির শাস্তিবিধানের নিয়ম স্থাপন করেন। রাজা জনমেজয় তাঁর সর্পসত্রে উদ্দালককে সদস্যরূপে বরণ করেছিলেন। যোগবাশিষ্ট রামায়ণের উপশম-প্রকরণে উদ্দালক মুনির তপস্যা ও সিদ্ধিলাভের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আ. রা.

উদ্দেশ্য : বাক্য মধ্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। সুতরাং প্রত্যেক বাক্যের দুটো অংশ থাকে। যার বা যাদের সম্পর্কে কিছু বলা হয় সে বা তারা উদ্দেশ্য এবং যা কিছু বলা হয় তা বিধেয়। যেমন, সুমন গল্প করছে— এখানে 'সুমন' উদ্দেশ্য। শি.প্র.লা.

উদ্ধব : হিন্দু পুরাণোক্ত চরিত্র বিশেষ। তিনি বৃহস্পতির শিষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের সখা ও পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সত্যক, যদুবংশীয়

www.pathagar.com

রাজা শিনির পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান, সাধুসঙ্গের মহিমা, কর্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগ, ভক্তিযোগ, বদ্ধ ও মুক্তজীব প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশ দেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বদরিকাশ্রমে (কৃষ্ণধামে) গিয়ে বল্কল পরিধানপূর্বক ফলমূল আহার করে জীবনযাপন করতে এবং অলকানন্দা দর্শনে পাপমুক্ত হতে বলেন। উদ্ধব এ আদেশ পালনার্থে অন্তরে কৃষ্ণধ্যান করতে করতে বদরিকাশ্রমে যান এবং যোগান্তে দেহত্যাগ করে বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। আ. রা.

উদ্ধারণ দত্ত : নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শিষ্য। সপ্তগ্রামের দত্ত বংশে জন্ম। জীবনকাল ১৪৮১-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর পিতার নাম শ্রীকর দত্ত এবং মাতার নাম ভদ্রাবতী। পিতা ছিলেন ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক। পিতার মৃত্যুর পর উদ্ধারণ দত্ত তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) নিকট থেকে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটস্থ এক বিরাট এলাকার জমিদারি ক্রয় করেন এবং আপন নামানুসারে এর নাম দেন উদ্ধারণপুর। তিনি পরম বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সে সময়ে ধর্মপ্রচারার্থে সপ্তগ্রামে গেলে তাঁর গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করতেন। তিনি সর্বদা নিত্যানন্দের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ফলে এক সময়ে তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং তিনি সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করে মোক্ষলাভের আশায় নীলাচলে চলে যান। শেষ জীবন তিনি উদ্ধারণপুরেই কাটান এবং সেখানেই ৫৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। উদ্ধারণপুরে এখনো তাঁর সমাধি আছে। সেখানে গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি উদ্ধারণ দত্তের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় বলে প্রকাশ। নিত্যানন্দের প্রিয় সহচরগণ পরবর্তী কালে 'দ্বাদশ গোপাল' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। উদ্ধারণ দত্তকে সেই দ্বাদশ গোপালের অন্তর্গত 'সুবাহু' মনে করা হয়। তাঁর কোনো রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না ; তবে অধ্যয়নের জন্য তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদসংকলন পদামৃতসমুদ্রের একটি পদে আছে—

শ্রীকর নন্দন দত্ত উদ্ধারণ
ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস নিতাইর দাস
শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত॥

আ. খা.

উদ্ধারণপুরের ঘাট : একটি উপন্যাস। লেখক অবধূত। মূল্য তের টাকা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৯, প্রকাশক : মগবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল নেই। তবে উৎসর্গে ১৭ পৌষ ১৩৬৩ সালের উল্লেখ রয়েছে। উদ্ধারণপুরের ঘাট উপন্যাসের শুরু কান্না হাসির হাটে। ছত্রিশ জাতের মহাসমন্বয় ক্ষেত্রে। কাটোয়া ছাড়িয়ে গঙ্গার উজানে উঠতে থাকলে চোখে পড়বে উদ্ধারণপুর। শ্রী শ্রী চৈতন্য দেবের পার্ষদ শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে উদ্ধারণপুর। উদ্ধারণপুর বলতে বোঝায় উদ্ধারণপুরের ঘাট। 'যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে' এভাবেই উপন্যাসের কাহিনী জমে উঠেছে। শ্মশানের সাদা হাড় আর কালো কয়লা। উদ্ধারণপুরের দিন-রাত্তির, মানুষের জীবন আর মরণের চলচ্ছবি। শ্মশানের কালোরাত আলো করে বসে থাকে নিতাই বোষ্টমী। এই নিতাই বোষ্টমীকে নিয়ে আখড়া বেঁধেছে বাবাজী চরণদাস মোহন্ত। আর গোঁসাই মরার বিছানায় পড়ে থেকে পোড়া মেদ মাংসের ঘ্রাণকেই কেবল ধ্রুব বলে জেনেছে। কিন্তু গোসাঁইয়ের নির্মোহ জীবনে নিতাই বার বার মোহ বিস্তার করতে চেয়েছে। গোসাঁইয়ের ব্রত মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ব্রতচারী গোসাঁই জীবন সত্যের কাছে হোঁচট খেয়েছে। মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা চিতার আগুনে ঝলসে দিতে চাইলেও সেই আগুনের আলোই তাঁকে পথের সন্ধান দিয়েছে। তাই উপন্যাসের পরিশেষে দেখা যায় মানুষের জীবন আসলে অনন্ত রহস্যের আকর। নিতাই বোষ্টমী যে মোহন্তকে নিয়ে

www.pathagar.com

সুর বেঁধেছিল সে নর নয়, নারীও নয়—সে বিধাতার অমার্জনীয় ভ্রান্তির নিষ্ঠুর সাক্ষ্য। এই জীবনমুখি উপন্যাসে তাই দেখা যায় জাগতিক প্রবৃত্তিকে শবদেহের নিচে চাপা দিলেই সব নিঃশেষ হয়ে যায় না। বিধাতার অমার্জনীয় ভুলকে সংশোধনের লক্ষ্যে অনিশ্চিত এক জীবনে শেষ হয়েছে উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাটের ইতিকথা। **পা. র.**

উদ্বাস্তু : কবি অসীম সাহা'র কবিতার সংকলন। প্রকাশক : সম্প্রীতি, ১৬ এ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর ঢাকা ১০০০। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। সমাজ, রাজনীতি, দেশ (প্রেম, কালের অবক্ষয়, হতাশা, বিকারগ্রস্ততা পুরো বইয়ের ২৪টি কবিতা জুড়ে জ্বলজ্বল করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল '১৯৪৭' শীর্ষক কবিতাটি। সাম্প্রদায়িকতার ওপর ভর করে উপমহাদেশটি কেমন দু টুকরো হয়ে গেল তার নান্দনিক উপস্থাপনা লক্ষ করি কবিতাটিতে। 'ধারালো ছুরির মতো তোমার হৃদয়।/ এক কোপে দুই ভাগ করে ফেলে।/ তরমুজের মতো লাল প্রেম ;/ রক্তের ভেতর থেকে তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে স্তম্ভিত উপমহাদেশ !' এ ছাড়া 'উদ্বাস্তু' শিরোনামে ১০টি অনবদ্য কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবির দুই চোখ যখন মেঘনার জলে মিশে যায় তখন খিদিরপুর ডাক দেয় তাঁর ঘুমের ভেতরে। সময় এবং স্থানের ব্যবধান ঘুচিয়ে 'পাঁচটি বুকের মধ্যে একটি শিকড় এসে গেঁথে যায় পাঁজরের মতো !' কবির এই শিকড়ের বিস্তার সর্বব্যাপী। তাই তো তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পৃথিবীর সকল উদ্বাস্তু'কে উৎসর্গ করে তৃপ্ত হন। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন কবি অসীম সাহা তাঁর কাব্যভুবন নির্মাণ করেন খুব সতর্কতার সঙ্গে। কবিতা যেন কোনক্রমে স্লোগানের বাহন হয়ে না ওঠে। **শা. আ.**

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ : শামসুর রাহমানের সপ্তদশতম কাব্য গ্রন্থ। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৮২। প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী, ৪১ নয়াপল্টন ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : দশ টাকা মাত্র। ২৩টি কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত। বইয়ের নামকরণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে আছে কবির স্বদেশ চেতনার পরিচয়। আর আছে অন্যান্য বইয়ের মতোই দুঃসময় দীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার ও অস্থিরতা। সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিকে কখনো কখনো ব্যাঙ্গাত্মক চোখেও দেখেছেন এখানে। কবিতাগুলোর অধিকাংশই দীর্ঘায়তন। চাঁদ সদাগরকে নিয়ে লেখা দীর্ঘ কবিতাটি পাশ্চাত্য পুরাণের পাশাপাশি তাঁর স্বদেশী পুরাণের মাধ্যমে ব্যক্তিমহিমা সন্ধানের পরিচায়ক। প্রেমের কবিতার উপস্থিতি এখানেও বিরল নয়। তবে আগের তুলনায় এখানে যে প্রেমিক সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায়, সে প্রৌঢ় সংরাগে তীব্র হলেও তা সংহত তারুণ্যে মত্ত মাতাল নয়। **আ. মা.**

উদ্ভট কবিতা/শ্লোক : সংস্কৃত সাহিত্যে উদ্ভট কবিতা বা শ্লোক বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে উদ্ভট রসের মিল খুব কম। সংস্কৃতে এই জাতীয় রচনায় ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক ও লঘু সুরের স্পর্শ থাকে। কোনো সুমহান চিন্তার পরিচয়বাহী নয়, অথচ যুক্তি এবং রসরসিকতা থাকে, এমন সব কবিতাই সংস্কৃতে উদ্ভট শ্লোক বা কবিতা রূপে অভিহিত হয়। সংস্কৃতে উদ্ভট শ্লোকের একটি উদাহরণ,—'কালীঘাট্টে, কলৌকালে কিল্বিষকুলনাশিনী।/ সপত্নীবিভবং দৃষ্টা গঙ্গা চ মলিনা কৃশা॥' অর্থাৎ কালীঘাটে কলিকালে সপত্নী–প্রভাব দৃষ্টে পাপনাশিনী গঙ্গা মলিন ও কৃশ হয়েছেন। ভাবের অসংলগ্নতা বা যুক্তির পারম্পর্যহীনতায় যে কবিতার জন্ম তাকেই উদ্ভট কবিতা রূপে অভিহিত করা হয়। **আ.ই.**

উদ্ভিদ সংহিতা : উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। লেখক এফ.এম. মনিরুজ্জামান। মূল্য একশত পঁচাত্তর টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৯৬। প্রকাশক–: বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল জুন ১৯৯৩, প্রচ্ছদ–প্রবীর দাশগুপ্ত। এই গ্রন্থে প্রায় ৩৪৫টি উদ্ভিদের পরিচয় বিধৃত করা হয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি উদ্ভিদের জন্য সমনাম (Synonym) ব্যবহার করা হয়েছে

www.pathagar.com

এবং ক্ষেত্র বিশেষে উদ্ভিদের ভেষজগুণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায়ই বৈজ্ঞানিক নাম পরিবর্তন করা হয়। গ্রন্থের প্রথমাংশে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দুটি পৃথক স্থানের উদ্ভিদ সম্প্রদায় কোনদিনও এক প্রকারের হয় না। এমনকি একটি ক্ষুদ্র এলাকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের উদ্ভিদের মধ্যে আকৃতি ও গঠনের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। স্থানের দূরত্ব ও সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা, মাটির ধরন, জলবায়ু ও জীবকুলের প্রভাব উদ্ভিদকূলের ব্যাপক পরিবর্তন করে থাকে। ভৌগোলিক এলাকার দিক থেকে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ হলেও স্থানের তারতম্যের জন্য এর উদ্ভিদকুলের ধরন বিভিন্নতর। তাছাড়া উচ্চতার তারতম্যের জন্যও উদ্ভিদের ধরনের পরিবর্তন হয়। প্রতিটি উদ্ভিদের উচ্চতা, শাখা প্রশাখার ধরন, পাতার বিন্যাস, পাতার গঠন, ফুল, ফল ও পাতার বর্ণ, বৈজ্ঞানিক নাম, প্রজাতি সংখ্যা, ব্যবহার, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদির পুঙখানুপুঙখ বর্ণনা গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যে কোনো লেখক তার সাহিত্যে উদ্ভিদ সম্পর্কে এ বইটি থেকে তথ্য ব্যবহার করতে পারেন। **পা. র.**

উদ্ভিন্ন উল্লাস : কবি দিলওয়ারের কাব্যগ্রন্থ। ৩৯টি কবিতার সমন্বয়ে এই গ্রন্থে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে যুথবদ্ধ বাঙালি তথা সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনা, আকাঙ্ক্ষা ও অভিব্যক্তি। এছাড়া ব্যক্তিমানুষের আমিত্ব, প্রকৃতি ও মানবের একাত্ততা, মানব অস্তিত্বের উৎস, শ্লীল যৌনতা ও দেশীয় ঐতিহ্য। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন, আইয়ূবের সামরিক শাসন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯'এর গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতি অনুষঙ্গ স্বাধীনতার দৃঢ় চেতনায় রূপায়িত হয়েছে এ গ্রন্থে। ৬৯' এর পূর্বের রচনা হয়েও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আইয়ুব খানকে তুলনা করা হয়েছে হিটলারের সঙ্গে। সব কিছু ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক সমাজের আকাঙ্ক্ষার কথা। বইটি উৎসর্গই করা হয়েছে "শ্রমজীবী সেই মহামানবের রক্তগোলাপী হাতে"। বাদ যায়নি – নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, গোর্কির 'মা', লেনিন ও সোমেন চন্দের প্রসঙ্গও। ছন্দ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষর বৃত্ত ও গদ্যছন্দ। ৩৯টি কবিতার মধ্যে ১০টি সনেটও রয়েছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে সিলেট থেকে প্রকাশিত 'উদ্ভিন্ন উল্লাসে' ভাবে ও শৈলীতে অসাধারণ। প্রচ্ছদ : প্রাণেশ মণ্ডল। প্রকাশক : আব্দুল কাদির মাহ্‌মুদ, সুরভি প্রকাশনী, মৌলভী বাজার, সিলেট। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৬৯। **মো. আ. মি.**

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা : ডক্টর ওয়াকিল আহমদ রচিত গবেষণা গ্রন্থ। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানদের প্রসঙ্গ, মুসলিম সমাজ ও আধুনিকতা, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ও মুসলমান সমাজের পতন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও মুসলমান মধ্যবিত্ত। দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে যথাক্রমে ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব, সভা ও সমিতি, নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি ও সভা সমিতি। সাহিত্য ও সাহিত্যিক, অপ্রধান লেখকবৃন্দ, পত্রপত্রিকা। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে লেখক জানিয়েছেন, 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য রচনায় সমকালীন চিন্তার স্বরূপ ; (১৮৫৭-১৯০৫) শিরোনামে ডি-লিট অভিসন্দর্ভ-এর পরিবর্তিত নাম 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা'। নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, সিপাহী বিদ্রোহ ও বঙ্গভঙ্গ এই দুইটি রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রান্ত সীমা হিসাবে ধরেছি, কেননা উভয় ঘটনা বাংলার মানুষের জীবনে গভীর রেখাপাত করে। প্রধানত উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ আলোচনার লক্ষ্য হলেও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষার

www.pathagar.com

কারণে ঐ শতকের প্রথম ভাগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ বারবার আলোচিত হয়েছে। এরূপ দৃশ্যপট মনে রেখে আমি স্বদেশের সময় গ্রন্থের বর্তমান শিরোনামটি গ্রহণ করেছি।' এ কারণে প্রথম খণ্ডের সূচিক্রমের ধারাবাহিকতার সাথে সংগতি রেখে দ্বিতীয় খণ্ড শুরু করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায় থেকে। গ্রন্থটি পাঠ করলে ইতিহাসের বিশেষ কালপর্বে বাঙালি মুসলমানদের উদ্ভব, ভ্রান্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী। দুই খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৮৩। প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান। মা. আ.

উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য : আবুল কাসেম ফজলুল হক রচিত প্রবন্ধের বই। প্রকাশক : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ৬৭ প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৯। গ্রন্থটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো : সাহিত্যের শ্রেণী-চরিত্র ; বাঙলা সাহিত্যের রূপান্তর ; মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ ; সমাজব্যবস্থার রূপান্তর : সামন্তশ্রেণীর অবক্ষয় ; সমাজব্যবস্থার রূপান্তর : মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয় ; মধ্যশ্রেণীত জীবন-ভাবনা ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্য এবং যুগ সংক্রান্তির জীবনোৎকণ্ঠা : নবযুগের অভীপ্সা। লেখক উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্যের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পাশাপাশি আরও একটি সত্য প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। আর এ হলো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত, সামাজিকভাবে পঙ্গু, নৈতিকভাবে অধঃপতিত, আদর্শগতভাবে দিশেহারা এবং অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া ও ঋণের জালে বন্দি ছিল। মধ্যশ্রেণীর জীবন ভাবনা ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্য প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য : যে সাহিত্য আধুনিক বাঙলা সাহিত্য বলে অভিহিত হয়, বৈশিষ্ট্য-বিচারে তা সমগ্র বাঙালির সাহিত্য নয়, এই মধ্যশ্রেণীরই সাহিত্য। তিনি মনে করেন—ব্রিটিশ শাসন বাঙালি সমাজকে যে শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল তা থেকে উজ্জীবনের একটি প্রয়াস উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যশ্রেণীর ভিতর থেকেই জেগেছিল। বিভিন্ন লাইনে বিভক্ত মধ্যশ্রেণীর তৎকালীন পাশ্চাত্যপন্থী এবং ঐতিহ্যপন্থী চিন্তাধারা ও আন্দোলনসমূহ ছিল তারই অভিব্যক্তি। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা ও সৃষ্টিশীল কর্মধারার বর্তমান দৈন্য ও অবক্ষয়ের ঐতিহাসিক সূত্র অনুসন্ধান করতে হলে উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সূত্রটি যে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার—বর্তমান গ্রন্থে সে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। শা. আ.

উনিশে মে আয়ুষ্মান হও : অনুরূপা বিশ্বাস। এটি একটি ছোট্ট পুস্তিকা। আসামের কাছাড় জেলার শিলচরে সংগঠিত মাতৃভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত। এই পুস্তিকায় কয়েকটি কবিতা আছে। তার মধ্যে অন্যতম 'অবাক শিলচর', 'দুঃখিনী মা', 'উনিশের ডাকে' ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে একটি ছোট রচনা : 'আমাদের যেন সে দুর্ভাগ্য না হয়' নামে। এ লেখায় তিনি এক জায়গায় বলেছেন : 'কেন আমরা দ্ব্যর্থহীন সুরে বলতে পারি না উনিশে মে কোনো অঞ্চলগত সমস্যার গর্ভজাত সন্তান মাত্র নয়, উনিশে মের পতাকা সর্বকালের সর্বদেশের সংগ্রামী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষায় রক্তিম। ভাষা মানুষের অতি প্রিয় সামগ্রী। যে কোনো জাতির কাছে তার মাতৃভাষা খুব দামি, প্রাণ প্রিয় সম্পদ। মাতৃভাষাকে খর্ব করার অর্থ মৌলিক মানবাধিকার হরণ করা।' অনুরূপা বিশ্বাসের কবিতায় আবেগের বহিঃপ্রকাশ যতটা আছে, কবিতার শিল্পরূপ ততটা বিধৃত নয়। কিন্তু এ ধরনের রচনা সময়কে ধারণ করে বলে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিচয়বাহী। সেদিক থেকে এর মূল্য বিচার করতে হবে। বরাক উপত্যকায় সংঘটিত ভাষা

www.pathagar.com

আন্দোলনের শহীদেরা একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-শহীদদের উত্তরসূরি। তারা সবাই বাংলা ভাষার গৌরব। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে গোপাল ভট্টাচার্য, চার্চ রোড, শিলচর-৪। মূল্য : দশ রুপি। সে. হো.

উনিশের উত্তরাধিকার : শিলচরের ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে সংকলিত ছোট পুস্তিকা। সম্পাদকমণ্ডলিতে আছেন অনন্ত দেব, মৃনাল কান্তি দত্ত বিশ্বাস, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, তৈমুর রাজা চৌধুরী ও মিলন উদ্দিন লস্কর। প্রকাশক : শুভম প্রকাশনী, হাইলাকান্দি রোড, শিলচর। প্রথম প্রকাশ : ২১ জুলাই ১৯৭৭। ১৯৬১ সালের ১৯ মে মাতৃভাষা বাংলাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের ওপর পুলিশের যে গুলিবর্ষণ হয়েছিল এবং তাতে যে ১১ জন শহীদ হয়েছিলেন সেই ঘটনার স্মরণে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় নয়টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলো হলো : সে দিন যা ঘটেছিল—পরিতোষ পাল চৌধুরী : একষট্টির ভাষা আন্দোলনে করিমগঞ্জ ; কিছু তথ্য কিছু কথা—নির্মল দাস ; উনিশের ভাষা আন্দোলনে মহিলা সমাজ—শিবানী বিশ্বাস ; আসছে ফাল্গুন ও আমরা--ইমাদ উদ্দিন বুলবুল ; ভাষা আন্দোলনের চেতনা ; আমাদের কথা—কানু আইচ ; উনিশে মের আলোকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ—চন্দন সেন গুপ্ত ; ১৯৬১ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন—নিশীথ রঞ্জন দাস ; একজন চিকিৎসকের জবানীতে—মন্মথ নাথ দাস ; উনিশে মে : মহান ভূমিকায় শিলচর পৌরসভা—মৃনাল কান্তি দত্ত বিশ্বাস। এইসব প্রবন্ধে ১৯৬১ সালের উনিশ মে কি ঘটেছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কাছাড় জেলার শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এলাকাকে বরাক উপত্যকা বলে। এই বরাক উপত্যকার মানুষেরা ঐদিন নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে আসাম রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা করার লক্ষ্যে পুলিশের গুলির মুখে জীবন দিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালের ২২ এপ্রিল আসাম রাজ্য সরকার 'আসাম রাজ্য সভা আইন' ১৯৬০ প্রণয়নের উদ্যোগ নেন, এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আসাম রাজ্যের ভাষা হিসেবে একমাত্র অসমীয়াই স্বীকৃত ভাষা হবে। কিন্তু আসাম রাজ্যে আরো অনেক নৃতাত্ত্বিক ভাষা গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাঙালি, খাসি, গারো, বোড়ো, নাগা, মিজো, মনিপুরিসহ আরো অসংখ্য। অসমিয়া ভাষীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অন্যান্য ভাষীক গোষ্ঠীর সম্মিলিত সংখ্যার তুলনায় ছিল সংখ্যালঘু। ফলে আসাম রাজ্যসভার আইন প্রণয়নের উদ্যোগ বাঙালি জনগোষ্ঠীকে শঙ্কিত করে এবং তারা এই আইনের বিরুদ্ধে বরাক উপত্যকায় আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকা জুড়ে হরতাল, সড়ক ও রেলপথ অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। শিলচর বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র। এই শহরে আন্দোলনের তীব্রতা ছিল অনেক বেশি। ঐদিন পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে এবং ১১ জন শহীদ হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। পরবর্তী সময়ে আসাম রাজ্যসভা বাংলা ভাষাকে রাজ্যের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এটি একটি ছোট পুস্তিকা, কিন্তু ভাষার দাবিতে প্রাণ দানকারী শহীদদের ঘটনার জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। সে. হো.

উন্নত জীবন, মহৎজীবন, মানব জীবন : ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান রচিত প্রবন্ধ পুস্তক। উন্নত জীবনের প্রথম প্রকাশ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। এ গ্রন্থে মোট ১৫টি নীতিমূলক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে—জাতির উত্থান, ব্যক্তিত্ব ও শক্তির সফলতা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা, ব্যবসায়, শিল্পবাণিজ্য, সাধনা ও পরিশ্রম, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন--নিজের শক্তি সাধনা, কর্মে প্রাণযোগ—দৃঢ় ইচ্ছা, পয়সা কড়ি, জীবনের মর্যাদা, চাকুরী, কাজ-কাম ও ব্যবসা : উদ্যম চেষ্টা পরিশ্রম, চরিত্র ও চরিত্রশক্তি, শারীরিক পরিশ্রম, কথার মূল্য-প্রতিজ্ঞা রক্ষা, উত্তপ্ত স্বভাব এবং আদর্শ-জীবন আদর্শ।

www.pathagar.com

মহৎজীবন ১৩২৮ সালের তৃতীয় বর্ষ মাঘ-৪র্থ সংখ্যা 'সওগাতে' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৩৩ সনের দিকে গ্রন্থবদ্ধ হয়। 'মহৎ জীবনে'র প্রবন্ধ সংখ্যা ৩—মহৎ জীবন, কাজ ও ভদ্রতা। 'মানব-জীবন' শিরোনামে তিনটি রচনা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-সংখ্যা 'সওগাতে' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এ গ্রন্থের প্রবন্ধ সংখ্যা ১৩—মানবচিত্তের তৃপ্তি, আল্লাহ, শয়তান, দৈনন্দিন জীবন, সংস্কার মানুষের অন্তরে, জীবনের মহত্ত্ব, স্বভাব-গঠন, জীবনের সাধনা, বিবেকের বাণী, মিথ্যাচার, পরিবার, প্রেম ও সেবা। তিনটি গ্রন্থেরই মূল সুর এক—মানব জীবনকে মহৎ ও উন্নত করার সাধনা। মানবজীবনের শাশ্বত সত্যের সন্ধানে লুৎফর রহমান ছিলেন একনিষ্ঠ শিল্পী। মানব-কল্যাণবোধ তাই তাঁর রচনার মূল আদর্শ। মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্রকে জ্ঞানে-কর্মে, ত্যাগে-সাধনায় এবং মহৎ চিন্তার দ্বারা উন্নত করুক—এই সত্যকেই তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন ব্যক্তিজীবন ও চরিত্রের নির্মলতা থেকেই সমাজজীবন ও সংসার-জীবনের কল্যাণ সাধিত হয়। পাশ্চাত্যের নানা দেশের উন্নত ও আদর্শ মানবজীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। লুৎফর রহমান তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোতে মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় স্বরূপ জ্ঞানে-ধর্মে-কর্মে, অধ্যবসায়, উদ্যম, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও চরিত্রবলে মানুষকে উন্নত জীবনের পথে পরিচালিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আ.ন.ম.ব.র.

উন্মূল বাসনা—শওকত আলী। গল্পগ্রন্থ। প্রকাশক : বইঘর, চট্টগ্রাম। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী, মূল্য : চার টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৫। বইয়ে মোট এগারোটি গল্প রয়েছে। গল্পের নাম : রঙ্গিনী, ফাগুয়ার পর, ভগবানের ডাক, পুশণা, তৃতীয় রাত্রি, ব্রতযাত্রী, জানোয়ার, রক্তে ও শিশিরে, ফেরতা, বিকলাঙ্গ পিপাসা ও ডাইন। 'উন্মূল বাসনা' কথাশিল্পী শওকত আলীর প্রথম গল্পগ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থেই তিনি একজন অসাধারণ গল্পকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্পের মধ্যে মানুষের জীবন এবং জীবনসংলগ্ন যাবতীয় বোধ বড় তীক্ষ্ণভাবে উঠে এসেছে। তাঁর ভাষা গতানুগতিকতার বাইরে এক ভিন্ন আমেজ তৈরি করে যা গল্পকে নিয়ে যায় পাঠকের বোধের উপরে অনুভবের তীব্র আলোতে। যে আলোয় স্পষ্ট চেনা যায় গোপীনাথকে, সুচলাকে, নুকু পরামানিককে এবং লেখকের অন্তর্জগতকে। সে. হো.

উপকথা : ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) রচিত বিদেশি উপকথার একটি শিশুতোষ সংকলন। গল্পসমূহ অ্যানডারসন ও গ্রিমের উপকথা থেকে সংকলিত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী গল্পসমূহ বঙ্গানুবাদ করলেও সেগুলো বিদেশি উপকথার হুবহু অনুবাদ নয়। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিলো 'নীতিশিক্ষা, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নীতিশিক্ষা ও আনন্দ দান।' শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুবাদ মৌলিক রচনার ধারঘেঁষা। ভাষা সহজ সরল এবং শিশু ও কিশোরমনের বিশেষ উপযোগী। রচনার নিদর্শন হিসেবে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো—'মেয়েটির বয়স যখন ছয় সাত বৎসর, তখন সে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। একদিন রাত্রে মেয়েটি খাইতে না পাইয়া পেটের জ্বালায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার পিতামাতা কাছে বসিয়া বলাবলি করিতেছে, এখন কি করি, কি করে আপনারা বা বাঁচি, আর মেয়েটিকেই বা কি করে বাঁচাই।' (কাঠুরের মেয়ে)। আ. ই

উপকথা : বাংলায় জীবজন্তু সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্রাকৃতি লোকগল্পের একটি শাখার নাম উপকথা। রূপকথা জীন, পরী-রাক্ষস দৈত্য ও মানুষ সম্পর্কিত গল্প। তাই রূপকথা ও উপকথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উপকথায় পশুপাখির রূপকে সামাজিক মানুষের চরিত্রই উদ্ঘাটিত

www.pathagar.com

হয় এবং এগুলো আকারে প্রকারে রূপকথার চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি। কোনো কোনো উপকথায় মানুষ ও জীবজন্তু উভয়ই সমান অংশগ্রহণ করে। ইংরেজিতে উপকথাকে বলা হয় Animal Tales. ধূর্ত ও নির্বোধ পশু-পাখির চরিত্র মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেবার প্রয়াস থাকে উপকথায়। ইংরেজির Fables-গুলোও উপকথা। সংস্কৃতের 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', প্রাচীন গ্রিসের 'Aesop's Fables', উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখের বই উপকথা শ্রেণীর। উপকথাগুলো সাধারণত গদ্যে রচিত। সময় বিশেষে মুখরোচক রসসৃষ্টির নিমিত্ত তাতে ছড়ার মিশ্রণ থাকতে পারে। নীতিবাক্য শেষে প্রকাশ্য বা গোপনে পরিবেশিত হয়। শিশু ও লোকশিক্ষার নানা প্রয়োজনে উপকথাগুলো সেই আদিকাল থেকেই রচিত হয়ে আসছে। সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্ব থেকেই উপকথার চরিত্রগুলো কল্পিত হয়েছে। আদিম মানবের প্রকৃতি ও সর্বপ্রাণী সকাশে নিবিড় জীবনযাত্রার স্মারক স্বরূপ রচিত হয়েছে এই উপকথা। রূপকের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের বিচিত্র শিক্ষা চলতে পারে এগুলো দিয়ে। আ. জ.

উপকীচক : মহাভারতোক্ত মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের ভাই। তাদের সংখ্যা ছিলো একশো পাঁচ। দ্রৌপদীর সঙ্গে অসদাচরণের জন্য কীচক ভীমের হাতে নিহত হলে উপকীচকরা কীচকের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়ে তাকেও কীচকের সঙ্গে দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যায়। দ্রৌপদীর আর্তনাদ শুনে ভীম শ্মশানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন এবং একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে উপকীচকদের সবাইকে নিহত করেন। আ. রা.

উপচার : হিন্দুদের পূজার উপকরণ। পাঁচ, দশ, ষোল, আঠারো কিংবা চৌষট্টি উপচারে পূজার বিধান আছে। অপ্রধান দেবতার পূজা পঞ্চোপচারে, সাধারণ পূজা দশোপচারে এবং বিশেষ পূজা ষোড়শোপচারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আঠারো কিংবা চৌষট্টি উপচারের প্রচলন তেমন দেখা যায় না। পঞ্চোপচারে গন্ধ (চন্দন বাটা), পুষ্প (ফুল, বেলপাতা ও তুলসী), ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের প্রয়োজন হয়। দশোপচারে পাদ্য (পা ধোরায় জল), অর্ঘ্য (দূর্বা, ভেজা আতপ চাল, ফুল, চন্দন ও জল), আচমনীয় (আচমনের জল), গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বুলের প্রয়োজন হয়। ষোড়শোপচারের বস্তু হচ্ছে—আসন (সাধারণত রূপোর পাতের টুকরো), স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক (কাঁসার পাত্রে রাখা দই, মধু ও ঘি), স্নানের জল, বস্ত্র, আভরণ (সাধারণত রূপোর আংটি), গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বুল। গন্ধপুষ্পাদির ক্ষেত্রে দেবতা বিশেষে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৈষ্ণব দেবতার পূজায় রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও বেলপাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ। শক্তিপূজায় এগুলোর ব্যবহার বিধেয়। শিবপূজায় ধুতুরা ফুল, আকন্দ ফুল ও বেলপাতা অতি প্রশস্ত। ম. চৌ.

উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী : সম্পাদনা করেছেন অশোক কুমার দেওয়ান। এতে আছে চাকমা পৌরাণিক কাহিনী 'লক্ষ্মী পালা'র লেখক সুগত চাকমা, মারমা রূপকাহিনী 'মনরি মাঁসুমি'র উস্যাংমা চৌধুরী, চাক রূপকাহিনী 'আউক পধুং সাং'-এর মং সং চক, খুশি কিংবদন্তী 'ভোগা কাইন'-এর বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বোম কিংবদন্তী' ভোগা কাইন'-এর এস.এ.প্রু এবং ত্রিপুরা রূপকাহিনী 'থাইওযান'-এর লেখক মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। প্রকাশক : পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম। প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৬৮, মূল্য ৮.৫০ টাকা। বি. ব.

উপনয়ন : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপবীত গ্রহণরূপ বিশিষ্ট হিন্দুসংস্কার। এর সময়কাল হলো—ব্রাহ্মণের পক্ষে সাতবছর তিনমাস থেকে পনেরো বছর তিনমাস ; ক্ষত্রিয়ের

www.pathagar.com

পক্ষে দশবছর তিনমাস থেকে একুশ বছর তিনমাস এবং বৈশ্যের পক্ষে এগারো বছর তিনমাস থেকে তেইশ বছর তিনমাস। এ সময়ের মধ্যে উপনয়ন না হলে কঠিন ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত্য করতে হয়। বর্তমানে প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প হিসেবে সামান্য অর্থদান করলেই চলে। এ সংস্কারের সূচনায় বালককে অধ্যয়নের জন্য আচার্য কিংবা গুরু সমীপে নেয়া হয়। আচার্য বালককে কতকগুলি নির্দেশ দিয়ে দণ্ড ও উপবীত ধারণ করান এবং গায়ত্রীমন্ত্র শিক্ষা দেন। নির্দেশগুলোর মধ্যে দিবানিদ্রা-নিষেধ অন্যতম। গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে ব্রহ্মচর্যাবস্থায় ক্ষার-লবণবর্জিত ভিক্ষান্ন আহারের বিধান আছে। উপনয়নের পর বেদারম্ভের অনুষ্ঠান। এতে চার বেদের চারটি মন্ত্র শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। উপনয়নের পূর্বসংস্কার হলো টিকি রেখে মস্তক-মুণ্ডণ ও কর্ণবেধ। উপনয়নের পরবর্তী সংস্কার হলো সমাবর্তন—অধ্যয়ন শেষে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ত্যাগ করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের জন্য গুরুগৃহ থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। সমাবর্তন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক স্নান এবং দণ্ডত্যাগপূর্বক নতুন বস্ত্র উপবীত পাদুকা কুণ্ডল ও গন্ধমাল্যাদি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে উপনয়নের পূর্ব ও পরবর্তীকাজগুলো উপনয়নের সঙ্গে একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে তিনদিন কিংবা বারো দিন ব্রহ্মচর্যপালন ও হবিষ্যান্ন গ্রহণের রীতি কেউ কেউ পালন করেন। ব্রহ্মচর্যকালের পর দণ্ড ভেঙে ব্রহ্মচারীর বেশ বর্জন করে নতুন বস্ত্রাদি গ্রহণ করতে হয়। এ রীতি ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে এবং উপনয়নানুষ্ঠানের গুরুত্ব কমে আসছে। ম. চৌ.

উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে : কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধের কাল ১৮৫০-১৮৮৮ সাল। এছাড়া মার্কসের 'পুঁজি' বই থেকে রচনা সংকলিত হয়েছে। 'প্রকাশের বক্তব্য' ও 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার (উদ্ধৃতি)। মার্কস এঙ্গেলস' নামে দুটি বক্তব্যও সংযুক্ত হয়েছে। কার্ল মার্কস-এর সম্পূর্ণ নাম হাইনরিশ্ কার্ল মার্কস। ১৮১৮ সালের ৫ মে জন্ম, মৃত্যু ১৮৮১ সালের ১৪ মার্চ। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে লন্ডনে মৃত্যু, জন্ম জার্মানির ট্রিয়রে। মার্কসের প্রণীত তত্ত্ব পরবর্তীকালে বিশ্বে মার্কসবাদ নামে পরিচিত লাভ করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'ডাস্ ক্যাপিটাল', 'এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি', গ্রুনডিস্', 'দ্য জার্মান আইডিওলজি', 'দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্টস্' ইত্যাদি। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস জার্মান সমাজতন্ত্রী, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক। কার্ল মার্কসের সঙ্গে যৌথভাবে 'মার্কসবাদ' হিসাবে পরিচিত সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা অনন্য। ১৮২০ সালে ধনাঢ্য জার্মান পরিবারে জন্ম, ১৮৯৫ সালে ৫ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকাশিত বই 'দ্য কন্ডিশান অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড' (১৮৪৫)। মার্কস ও তাঁর যৌথ প্রচেষ্টার ফসল 'জার্মান আইডিওলজি' (১৮৪৫), তাঁদের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল 'কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো' (১৮৪৮)। মার্কসের মৃত্যুর পর 'ডাস ক্যাপিটালের' ২য় ও ৩য় খণ্ড সম্পাদনা ও প্রকাশের কৃতিত্ব এঙ্গেল্সের। ইতিহাসে এই দুই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা কিংবদন্তিতুল্য, তবুও এঙ্গেল্সের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, বিপ্লব ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'এন্টিডুরিং' এবং 'দ্য ওরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রপার্টি অ্যান্ড দ্যা স্টেট'। 'উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে' বইয়ের প্রকাশক 'বিদেশি ভাষায় সাহিত্য' প্রকাশনায় মস্কো। পৃষ্ঠা ৪৪৬, মূল্য বা প্রকাশকাল লেখা নেই। বি. ব.

উপন্যাস : সমাজ এবং মানবজীবন যখন লেখকের ব্যক্তিক অনুভূতি ও জীবনদর্শনের

www.pathagar.com

আলোকে নিরীক্ষিত হয়ে বর্ণনাত্মক সাহিত্যকর্মে রূপ পরিগ্রহ করে তখন তাকে উপন্যাস বলা হয়। প্লট বা বৃত্ত উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ। বৃত্তের মূল লক্ষ্য চরিত্র সৃষ্টি ও চরিত্রই ঘটনা সৃষ্টি করে। চরিত্রের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনা-দর্শন ও অনুভূতিকে রূপদান করেন। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি বা দুটি মূল চরিত্র থাকলেও সমগ্র সমাজ এবং গোষ্ঠীজীবনের সার্থক রূপায়ণেই কাহিনীর সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। উপন্যাস বর্ণনাত্মক শিল্পকর্ম হলেও এতে নাটকীয়তা ও গীতিরসের প্রক্ষেপ থাকতে পারে। চরিত্র নিজের চারদিকে ঘটনার প্রবাহ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, ঘটনা চরিত্রের বিকাশে সহায়তা করে। দেশ কাল ও সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী রুচি, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রকাশ উপন্যাসের জন্য অপরিহার্য। তার ফলে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে দেশীয় বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে। নীতিবাদ বা তত্ত্বকথা প্রচারে উপন্যাসের শিল্পমাহাত্ম্য ক্ষুণ্ন হয়। মহৎ কথাশিল্পী সমাজজীবন, গোষ্ঠীজীবন বা মানবজীবনের মূল রহস্য পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটন করে অপ্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করতে পারেন, কিন্তু কোনোক্রমেই তিনি খোলাখুলিভাবে উপদেষ্টার বেদীমূলে আরূঢ় হতে পারেন না। বিষয়ভেদে উপন্যাস কয়েক প্রকার হতে পারে ; যেমন—ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, রহস্য উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ইত্যাদি। আ. ই

উপন্যাস নিয়ে : দেবেশ রায়। কোনো একটি বইয়ের যুক্তি কাঠামো যেভাবে মনে আসে, সেরকম করে এ বইটি গড়ে ওঠে নি। গ্রন্থের ভূমিকায় বলে নিয়েছেন এই কথাগুলি দেবেশ রায় (জন্ম : ১৯৩৬)। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে উপন্যাসের সংজ্ঞা, প্রকরণ, এর অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়গত বৈচিত্র্যের ওপর আলোচনা যেমন আছে তেমনই বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার সূত্রপাত সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে বাংলা উপন্যাস কিভাবে মূলত ইংরেজি উপন্যাসের সম্প্রসারিত বাংলা ভাষ্যে পরিণত হয়েছে তার অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও চিন্তা উদ্রেককারী বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। ইংরেজি উপন্যাসের একটি বিশেষ ধরনই বাংলা উপন্যাসের মডেল হয়ে ওঠায় বাংলাদেশের জীবন-বাঁচার উপাখ্যান যে বাংলা উপন্যাসের বিষয় হতে পারলো না, বাঙালির আত্মপরিচয় থেকে আমরা যে অনেক দূরে সরে গিয়েছি—এই অমোঘ সত্যদর্শন একান্তই অনস্বীকার্য। উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়াও এই গ্রন্থের আলোচনায় এসেছে রুশদেশীয় সাহিত্যতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন-এর উপন্যাসচিন্তার বিস্তারিত এবং জার্মান চিন্তাবিদ থিওডর ডবলিউ এ্যাডরনো-র গ্রন্থাবলীর আলোচনার সূত্রে শিল্পের জনসংযোগের তত্ত্ব বিষয়ক একটি রচনা। লেখকের নিজস্ব বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের সাহায্যে এসব আলোচনা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাস বিষয়ে একাধিক রচনার পাশাপাশি উপন্যাস বিষয়ে একটি আলাপ-চারিতাও গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ১৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩। মূল্য : ৩৫.০০ রূপি। মো. শা.

উপন্যাসের বর্ণমালা : প্রাবন্ধিক ও গবেষক সুমিতা চক্রবর্তীর প্রবন্ধ সংকলন। সুমিতা চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সৃজনশীল সমালোচক হিসেবে বিশিষ্ট। তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা বোধ এবং ব্যতিক্রমী ধারণা খুব সুচিন্তিত এবং তীক্ষ্ণ। এ বইয়ে তিনি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের আলোচনা করেছেন এবং সে উপন্যাসগুলো সম্পর্কে যে প্রথাগত ধারণা প্রচলিত আছে তার বিপরীতে নিজস্ব মতামতের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। কোনো কোনো উপন্যাসের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বইয়ে চৌদ্দটি প্রবন্ধ আছে। নামগুলোই বিচিত্র বর্ণনার ইঙ্গিতবাহী। যেমন : ভিন্ন সন্ধান : ভিন্ন আঙ্গিক : উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত ; বিভূতিভূষণের অপু ; একটি জিজ্ঞাসা ; প্রসঙ্গ অপরাজিত : বৃত্তের বিস্তার ; সত্যাচরণের আরণ্যক ; ভানুমতীর ভারতবর্ষ ; হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ; চিরায়ত জীবন ; চেতনাপ্রবাহ, বহির্বাস্তব, ঔপন্যাসিকের সংকট ; নখদর্পণে ভারতবর্ষ : ঢোঁড়াই চরিতমানস ; গাওদিয়া গ্রামের শশী ডাক্তার ; হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ও লেখকের ইঙ্গিত ; বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী : অনল-দহিত জীবন ; বিবরের আলো ; ইতিহাস থেকে উপন্যাস : অরণ্যের অধিকার ; সেই সময় : সত্যের গল্প, গল্পের সত্য ; মরুস্বর্গের স্বপ্ন : মর্ত্যমরুর আর্তি। লেখক এসব উপন্যাসের আলোচনায় শুধুই যে গভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, এ আলোচনা সৃজনশীল রচনার মাধুর্যমণ্ডিতও। যে কোনো পাঠক গবেষণার সহায়ক তথ্য যেমন পাবে, তেমনি অবাধ স্বচ্ছন্দ পাঠের অনুভবে স্নাত হবে। এখানেই সুমিতা চক্রবর্তীর রচনার বৈশিষ্ট্য। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। প্রকাশক পুস্তক বিপনণ, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা। সে. হো.

উপন্যাসের শিল্পরূপ : রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের বই। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৫৯। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ : ঢাকা, ১৯৭৩ (কালিকলম প্রকাশনী)। ২৬টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত বইটিতে উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ, আঙ্গিক ও গঠন, বিষয় ও শৈলী, সর্বোপরি সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের আবির্ভাব কখন কিভাবে ঘটেছে, পৃথিবীর কোন দেশের কোন ঔপন্যাসিক এই শাখায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, সতেরো শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিশ্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো কী কী বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে, সেসবের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা মোট ২০টি (প্রথম ১৭টি এবং শেষ ৩টি) পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে। 'বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা' শীর্ষক পাঁচটি পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সমাজতাত্ত্বিক উপন্যাসগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বইটির পরিমার্জিত সংস্করণে সংযোজিত 'বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের গদ্য মহাকাব্য কথা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' এবং জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী' উপন্যাস তিনটির উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসের শিল্পমূল্য নির্ণয় এ বইয়ের প্রধান আকর্ষণ। স্ব. স.

উপপদ তৎপুরুষ : পূর্বপদের সঙ্গে ক্রিয়া জ্ঞাপক কৃদন্তপদের সমাস হলে তাকে উপপদ তৎপুরুষ বলে। সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত পদের পূর্বে যে শব্দ (উপসর্গ ছাড়া) বসে সেই শব্দকে উপপদ বলে। বলা যায়-উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ-তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার, জলে চরে যে = জলচর। এখানে কুম্ভ, জল শব্দ, নির্মাণ অর্থে ক্রিয়াজ 'কার' এবং বিচরণ অর্থে ক্রিয়াজ 'চর' পদ যুক্ত হয়েছে। শি.প্র.লা.

উপপুরাণ : পুরাণ সাহিত্য দু'ভাগে বিভক্ত— মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অতিরিক্ত পুরাণগ্রন্থাদি উপপুরাণ নামে পরিচিত। এগুলিকে সাধারণত মহাপুরাণের পরবর্তী ও পরিশিষ্টরূপে বিবেচনা করা হয়। দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণের মতো কোনো কোনো উপপুরাণ মহাপুরাণের

www.pathagar.com

সমমর্যাদা কিংবা তদাপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী। এর বিষয়বস্তুও অনেকটা মহাপুরাণেরই মতো। অধিকাংশ উপপুরাণ অর্বাচীন হলেও কোনো কোনো উপপুরাণ বেশ প্রাচীন। যেমন—শাম্ব উপপুরাণ ও বিষ্ণু ধর্মোত্তর উপপুরাণ। কূর্মপুরাণের তালিকায় যে অষ্টাদশ পুরাণের নাম আছে, সেগুলি হলো—আদ্য, নারসিংহ, স্কান্দ (কুমারপ্রোক্ত), শিবধর্ম, দুর্বাসসোক্ত, নারদীয়, কাপিল, বামন, উশনসেরিত, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পরাশরোক্ত, মারীচ ও ভার্গব। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রদত্ত উপপুরাণের তালিকার মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সবগুলি মিলিয়ে দেখলে উপপুরাণের সংখ্যা আঠারোর চেয়ে অনেক বেশি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণ মহাপুরাণের মতো উপপুরাণগুলি থেকেও পাওয়া যায়। আ. রা.

উপবেদ : বেদের চেয়ে উপবেদের স্থান নিম্নে শ্রুতির সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। উপবেদ সাধারণত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। সকল বেদেরই উপবেদ আছে। ঋগ্বেদের উপবেদের নাম আয়ুর্বেদ ; যজুর্বেদের ধনুর্বেদ ; সামবেদের গন্ধর্ববেদ এবং অথর্ববেদের স্থাপত্যবেদ। ম. চৌ.

উপভাষা চর্চার ভূমিকা : প্রাবন্ধিক, গবেষক ও ভাষাবিজ্ঞানী মনিরুজ্জামানের উপভাষা বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অধ্যায়সমূহ : 'উপভাষা জিজ্ঞাসা', 'অপিনিহিতি', 'বাংলাদেশের উপভাষার পরিপ্রেক্ষিত', 'ভাষা-প্রান্তিয়তা ও সংযোগ', 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপভাষা' ও 'সিলেটি নাগরী পরিক্রমা'। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশে আছে 'বাংলা উপভাষার স্থানীয় উপাদান : স্থাননাম ও সংখ্যা' ও 'বাংলাদেশের উপভাষা-তথ্যপঞ্জি'। এর আগেও বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা উপভাষা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। গ্রন্থটির পরিশিষ্ট অংশে সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। ভাষা বিজ্ঞানী মনিরুজ্জামানের 'উপভাষা চর্চার ভূমিকা' আমাদের জানা মতে এ বিষয়ে একক ও বিস্তারিত প্রচেষ্টা। বাংলাদেশে উপভাষা সংক্রান্ত তথ্য এবং তাত্ত্বিক ধারণা লাভের জন্য একটি আকরগ্রন্থ। বইটি প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০। প্রচ্ছদ : উৎপল দাস, প্রকাশকাল : মে ১৯৯৪, পৃষ্ঠা : ৮ + ৪৩২। মূল্য : ২০০.০০ টাকা। সা. আ.

উপমন্যু : মহাভারতোক্ত চরিত্র বিশেষ। মহর্ষি আয়োদ ধৌম্যের শিষ্য। গুরুভক্তির জন্য বিখ্যাত। ধৌম্য তাঁকে গোচারণে নিযুক্ত করেন। শিষ্যকে দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট হতে দেখে গুরু তাঁর আহারের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে ভিক্ষান্নের দ্বারা তাঁর উদরপূর্তি হয়। ভিক্ষান্ন গুরুকে প্রদেয়—গুরুর মুখে একথা শুনে উপমন্যু প্রথম বারের ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে প্রদান করে দ্বিতীয়বারের ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারের মতো ভিক্ষাচরণ গৃহস্থের পক্ষে পীড়াদায়ক—গুরুর এহেন উপদেশে উপমন্যু তা বন্ধ করে দেন। তখন তিনি গোদুগ্ধ পান করে জীবনধারণ করতে থাকেন। এতে গোবৎসরা বঞ্চিত হয় বলে গুরু কর্তৃক গোদুগ্ধ পানও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শিষ্য এরপর গোবৎসের মুখনিঃসৃত ফেনা খেয়ে কালাতিপাত করতে থাকেন। গুরু তা জানতে পেরে তাঁর ফেনাহারও নিষিদ্ধ করে দেন ; কারণ তাঁর আহারের উপযোগী ফেনা নিঃসরণের জন্যে গোবৎসদেরকে বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়। অনন্যোপায় হয়ে ক্ষুধার্ত উপমুন্য অর্কপত্র (আকন্দ পাতা) ভক্ষণ করেন। এই তেজী ও বিষাক্ত পত্র খেয়ে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং পথচলাকালে একটি কূপে পতিত হন। শিষ্যকে ফিরতে না দেখে আয়োদধৌম্য তাঁকে খুঁজতে থাকেন। গুরুর আহ্বানে অভিমন্যু কূপ থেকে সাড়া দিয়ে নিজের দুরবস্থার কথা তাঁকে জানান। গুরুর নির্দেশে তিনি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আরোগ্য লাভের জন্য তাঁকে একটি পিষ্টক খেতে

www.pathagar.com

দেন। কিন্তু উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করে তা খেতে অস্বীকার করেন। উপমন্যুর অসাধারণ গুরুভক্তি দেখে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে বর দেন। এর ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। ধৌম্য সকল বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। গুরুর আশীর্বাদে সকল বেদ ও ধর্মশাস্ত্র আয়ত্ত করে উপমন্যু স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। মু. আ. রা.

উপমা : একই বাক্যে সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট দু'টি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ-যোজনা দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হলে উপমা অলঙ্কার হয়। এতে একটি জানা জিনিসের সঙ্গে অন্য একটি অজানা জিনিসকে তুলনা করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়। 'মিশির মতো কালো' বললে বস্তুর রঙকে বোঝানো হয়ে থাকে। 'চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে' (রবীন্দ্রনাথ)। একই বাক্যে 'আলো' ও 'আশা' এই দু'টি বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে 'আলো' এবং 'আশা' উভয়ই চঞ্চল। 'আলো' যেমন কম্পিত হয়, 'আশা'ও তেমনি কাঁপে। সুতরাং একটার সঙ্গে আর একটার উপমা সার্থক হয়েছে। এইরূপ আরো কয়েকটি উদাহরণ, যেমন—(ক) হে ক্ষমতা, বিদ্যুতের মতো তুমি সুন্দর ভীষণ (জীবনানন্দ দাশ), (খ) মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম (অজিত দত্ত), (গ) হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো--তখন পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল (সমর সেন) ইত্যাদি। উপমার চারটি অঙ্গ। যেমন--উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপমা প্রধানত পাঁচ প্রকার। যেমন—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা, বিম্ব-প্রতিবিম্বোপমা ও স্মরণোপমা। আ. ই

উপমাদ্যোতক অব্যয় : যে অব্যয় উপমা বা তুলনা বোঝায় তাকে উপমাদ্যোতক অব্যয় বলে। অব্যয়ের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভক্তি, বচন ও লিঙ্গে এ ধরনের শব্দ অপরিবর্তিত থাকে। উদাহরণ—হাতির পা যেন একটা থাম। কি গরম, যেন আগুন। তাকে বকাও যা, না বকাও তা। ছেলে তো না, একটা ডাকাত ইত্যাদি। শি.প্র.লা.

উপমান : যার সঙ্গে উপমা ও তুলনা দেওয়া হয়, তাকে উপমান বলে। এই জাতীয় অলঙ্কার-প্রয়োগে অনেক সময় অনুপস্থিত বস্তুর সঙ্গে উপমেয়ের তুলনা দেওয়া হয়। যেমন--'পদ্মের মতো সুন্দর মুখ', এই বাক্যে অনুপস্থিত 'পদ্ম'র সঙ্গে উপস্থিত 'মুখে'র তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং 'পদ্ম' এখানে উপমান। এইরূপ,--'সন্ধ্যার আবছা আলোর মতো গায়ের রঙ', 'চাঁদের মতো সুন্দর মুখ'। 'জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়' ইত্যাদি। শি.প্র.লা.

উপমান কর্মধারয় : 'উপমান' শব্দটির অর্থ তুলনীয় বস্তু ; প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে অন্য কোনো পরোক্ষ বস্তুর তুলনা করা হলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলে 'উপমেয়' এবং যার সাথে উপমা বা তুলনা করা হয় তাকে বলে 'উপমান'। উপমান ও উপমেয়ের তুলনায় উভয়ের মধ্যে সাধারণ গুণ থাকতে হবে। এ সমাসের সংজ্ঞা : সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। সাধারণত ন্যায়, মতো, সাদৃশ্য ইত্যাদি ব্যাসবাক্য ব্যবহার করে উপমান কর্মধারয় সমাস গঠন করতে হয়। যেমন—তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র ; নবনীতের ন্যায় কোমল = নবনীতকোমল ইত্যাদি। শি.প্র.লা.

উপমান সমাস : উপমান কর্মধারয় সমাসের ব্যাখ্যা করতে গেলেই উপমান সমাসের পরিচয় দেয়া হয়ে যায়। মূলত উভয় ধরনের সমাস একই রকম বলতে হয়। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান সমাস বলে। যেমন,—শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত। এ সমাসগুলো সাধারণত বিশেষণ। 'ন্যায়', 'মতো', 'সাদৃশ্য' ইত্যাদি শব্দ এ জাতীয় সমাসের ব্যাস বাক্যে ব্যবহৃত হয়। শি.প্র.লা.

www.pathagar.com

উপমাপ্রধান বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে উপমা প্রাধান্য পায়, অর্থাৎ যে বহুব্রীহিতে উপমেয় পদের সাথে উপমানের সমাস হয়, তাকে উপমাত্মক বা উপমাপ্রধান বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা : চন্দ্রের ন্যায় মুখ যার = চন্দ্রমুখ ইত্যাদি। **শি.প্র.লা.**

উপমিত কর্মধারয় সমাস : সাধরণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নিতে হয় এবং ব্যাসবাক্যে তার উল্লেখ থাকে না। এতে উপমেয় পদটি সাধারণত পূর্বে বসে। যথা,—বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা, মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র ইত্যাদি। **শি.প্র.লা.**

উপমেয় : বাঙলা ব্যাকরণে অলংকার বর্ণনার সময় উপমা, উপমান, উপমেয় ইত্যাদি শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলা কর্মধারয় সমাসে এর উল্লেখ আছে। উমমেয় বলতে কোনো 'প্রত্যক্ষ বস্তু' বোঝায়। কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে অন্যকোনো পরোক্ষ বস্তুর তুলনা করা হলে, নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়। যেমন,--মুখচন্দ্র। এখানে 'মুখ' উপমেয়। **শি.প্র.লা.**

উপমেয় ও রূপক কর্মধারয় সমাস : যে বস্তু বা প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে এবং যে বস্তু বা প্রাণীকে তুলনা করা হয় তাকে উপমেয় বলে ; যে গুণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে তুলনা করা অর্থাৎ সাদৃশ্য অথবা অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে ঐ দু'টোর সাধারণ (common) ধর্ম সাধারণ গুণ বলে। উপমান পদের সাথে সাধারণ ধর্মবাচক পদের সমাসকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। উপমান পদের সঙ্গে মতো, ন্যায়, সাদৃশ্য প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে ব্যাসবাক্য তৈরি করা হয়। যথা—মেঘের ন্যায় শ্যাম = মেঘশ্যাম। তুষারের মতো শীতল = তুষারশীতল। গোলাপের মতো লাল = গোলাপলাল। উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য—(ক) উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যের সাধারণ গুণের উল্লেখ থাকে না। (খ) উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে উপমিত কর্মধারয় সমাস হয়। (গ) উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, কিন্তু রূপক কর্মধারয় সমাসের মত উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় না। (ঘ) উপমান কর্মধারয় সমাসে উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না। (ঙ) উপমান কর্মধারয় সমাসে উপমানের সাথে সাধারণ কর্মবাচক পদের সমাস হয়। (চ) রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমেয়ের সাথে উপমান পদের সমাস হয়। (ছ) রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, কিন্তু তাদের সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না। (জ)রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদটি সর্বদা পূর্বে বসে ; উপমান কর্মধারয় সমাসে উপমান পদটি সর্বদা পূর্বে বসে এবং সাধারণ কর্মবাচক পদটি পরে বসে ; উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদটি সাধারণত পূর্বে বসে, কিন্তু কখনো কখনো উপমান উপমান পদটিও পূর্বে বসে। (ঝ) উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে 'ন্যায়', 'তুল্য' 'সদৃশ' বা এধরনের শব্দ প্রয়োগ করে তুলনা বোঝান হয়। কিন্তু রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা প্রকাশ করার জন্য ব্যাসবাক্যে উপমেয় পদের পরে 'রূপ' অথবা উপমেয় পদের সাথে 'ই' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। (ঞ) উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসে সমাসবদ্ধ পূর্ব ও উত্তরপদ দুটোই বিশেষ্য, কিন্তু উপমান কর্মধারয় সমাসে সমাসবদ্ধ উত্তরপদ সর্বদাই বিশেষণ পদ।

উদাহরণ-- মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র (উপমিত কর্মধারয় সমাস)।

মুখরূপ চন্দ্র মুখই চন্দ্র	= মুখচন্দ্র (রূপক কর্মধারয় সমাস)।

www.pathagar.com

তুষারের ন্যায় শীতল = তুষারশীতল (উপমান কর্মধারয় সমাস)। **শি.প্র.লা.**

উপযতি : কবিতা পড়বার সময় পর্বযতির চেয়েও লঘু একপ্রকার যতির ক্ষীণ অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এই যতির পারিভাষিক নাম 'উপযতি'।

বুঝেছি ০ আমার | নিশার ০ স্বপন | হয়েছে ০ ভোর।

উপরে উদ্ধৃত পংক্তির পর্ববিভাগ (।) চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে। প্রতি পর্ব শেষে যথা নিয়মে পর্বযতি পড়েছে। উদ্ধৃত পংক্তিতে পর্ব তিনটি : প্রথম দুটি পূর্ণ পর্ব, শেষেরটি অপূর্ণ পর্ব। পূর্ণ-অপূর্ণ এই তিনটি পর্ব দুটি করে শব্দদ্বারা সংগঠিত এবং দেখা যাবে প্রত্যেক পর্বের দুটি শব্দের মাঝখানে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র যতি রয়েছে। এইটিই হচ্ছে উপযতি। উপরের কাব্যপংক্তিতে উপযতি বৃত্ত (০) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, উপযতিই উপপর্ব বা পর্বাঙ্গ নির্দিষ্ট করে। প্রকৃতপক্ষে, উপপর্ব বা পর্বাঙ্গগুলো দুই বা তিন মাত্রার গোটা গোটা শব্দ (পর্বাঙ্গ দ্র:)। রবীন্দ্রনাথের মতে এগুলোই ছন্দের মূল উপাদান। দুইমাত্রার ও তিনমাত্রার উপপর্বকে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে সমমাত্রার এবং অসমমাত্রার 'চলন' বলে উল্লেখ করেছেন 'চলন' শব্দের অর্থ, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী, উপপর্ব ; এবং উপপর্ব উপযতি দ্বারা নির্দিষ্ট। আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক—

সব ০ ঠাঁই ০ মোর | ঘর ০ আছে ০ আমি |
সেই ০ ঘর ০ মরি। খুঁজিয়া ;
দেশে ০ দেশে ০ মোর | দেশ ০ আছে, ০
আমি | সেই ০ দেশ ০ লব। যুঝিয়া।

এখানে দুই মাত্রার পরপর একটি উপযতি পড়েছে {(০) চিহ্ন উপযতি-নির্দেশক}। একটি পূর্ণপর্বে মোট তিনটি উপযতি নির্দিষ্ট পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব রয়েছে। **আ. ক.**

উপরাল : আট মাত্রায় গঠিত তাল। এই তালের তালাঙ্ক সংখ্যা দুই। প্রতি তালাঙ্কে চারটি করে মাত্রা। মাত্রা বিন্যাস দাঁড়ায় : ১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮। একটি তালি ও একটি খালি বা ফাঁক। সম ও ফাঁক এই ক্রমে তালাঙ্ক দুটি বিন্যস্ত হয়। প্রচলিত বোল :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
তা	তা	কেনে	কাৎ	ধা	ঘেনে	তেরকেট	ঘেনে ।

ক. গো.

উপরূপক : কাহিনীমূলক কোনো রচনায় যদি গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয় তবে তাকে উপরূপক বা Parable বলে। সাধারণত মানবজগতের বাসিন্দাদের নিয়েই এর কাহিনী গড়ে ওঠে এবং কাহিনীটি আকারে একটু বড় হয়। মহাভারতের মধ্যে অনেক উপকাহিনী আছে যার মাধ্যমে গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব উপকাহিনীই উপরূপকের নিদর্শন। **আ. ই.**

উপল উপকূলে : ১ম খণ্ড। সামস্ রাশীদ রচিত উপন্যাস। প্রকাশক : এস. আলম রাশীদ ; ৫২৫ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ১১ অক্টোবর, ১৯৬৯। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। পৃষ্ঠা : ৮ + ৩৩৯। মূল্য : সাত টাকা। ঐ। ২য় খণ্ড। প্রথম প্রকাশ : ৯ জুলাই, ১৯৭০। পৃষ্ঠা : ৮ + ৪২৪। মূল্য : আট টাকা। দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'উপল উপকূল'-এর পটভূমি বোম্বাই ; সেখানকার সমুদ্র, জাহাজ, নাবিক জীবন, প্রেম, ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয় এতে তুলে ধরা হয়েছে। আরো রয়েছে রাম্না নামের এক বাঙালি মেয়ের হৃদয়ের গভীর শূন্যতা ও তার জীবনের বঞ্চনার মর্মস্পর্শী চিত্র। ব্যক্তিগত জীবনে সামস রাশীদের স্বামী ব্রিটিশ ভারতের নৌবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা হওয়ার সুবাদে তিনি সমুদ্র-জীবন দেখেছেন গভীরভাবে ; দেখেছেন সমুদ্রচারীদের জীবনাচরণ, বন্দরে-বন্দরে নানা ঘটনা। সমুদ্র-জীবন নিয়ে সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে খুবই কম। শুধু এ-কারণেই নয়, সামস্ রাশীদের সহজ গদ্য, চরিত্র চিত্রণ, ঘটনা বিন্যাস এবং কাহিনীর গতি দুই খণ্ডের 'উপল

www.pathagar.com

উপকূল'-কে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছে। র. হা.

উপসংহৃতি : নাটক বা যে-কোনো রচনার করুণ রসাত্মক পরিসমাপ্তি বা উপসংহার। নাটকের Climax শেষে যে ঘটনা দিয়ে নাটকীয় কাহিনীর সমাপ্তি টানা হয়, সেই ঘটনাটিকেই Catastrophe বলা হয়। লেখক সুকৌশলে Catartrophe-তে মূল কাহিনীর সমাপ্তিসূচক বর্ণনায় করুণ রসকে ঘনীভূত করে তোলেন। কাহিনীর পরিণতি করুণ রসাত্মক না হলে catastrophe হয় না। গল্পের রস যেখানে হাস্যরসকে উজ্জীবিত করে সেখানে কাহিনীর পরিণতি Catastrophe না হয়ে Conclusion-এ পর্যবসিত হয়। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' নাটকের পরিণতি Catastrophe -র সুন্দর দৃষ্টান্ত। আ. ই

উপসর্গ : হার (হৃ)থেকে আহার, প্রহার, সংহার, উপহার, পরিহার উদ্ধার ; মুখ থেকে উন্মুখ, সম্মুখ, বিমুখ, প্রমুখ, অভিমুখ গঠিত হয়ে বিভিন্ন অর্থে এরূপ ধ্বনি বা বর্ণ সমষ্টি ধাতু বা নাম পদের পূর্বে বসে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তাকে উপসর্গ বলে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলো তিনভাগে ভাগ করা যায় : সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশি। (১) সংস্কৃত—প্র, পরা, অপ, সম, অভি, দুর, নি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নির, প্রতি, পরি, অপি, উপ আ, অনু, অব—এই কুড়িটি উপসর্গ। (২) বাংলায়—অ, আ, অনা, সি, ভর, হা, সু, অঘা, অজ, ইতি, উন, কদ, কু, আন, আড়, আব, সা, স, রাম, বি, পতি—একুশটি উপসর্গ। উদাহরণ—

অ—অকেজো	কু—কুকথা
অঘা—অঘারাম	নি—নিখোঁজ
অজ্—অজ্পাড়া গাঁ	পাতি—পাতিকাক
অনা—অনাবৃষ্টি	বি—বিফল
আ—আগাছা	ভর—ভরপেট
আড়—আড়চোখে	রাম—রামদা
আন্—আন্কোরা	স—সঠিক
আব—আবডাল	সা—সাজোয়ান
ইতি—ইতিপূর্ব	সু—সুখবর
উন—উনপাঁজুরে	হা—হাঘরে
কদ—কদাকার	

(৩) বিদেশি উপসর্গ :

(ক) ফারসি উপসর্গ :

কার—কারবার	দর—দরবার
না—নারাজ	নিম—নিমরাজি
ফি—ফি-বছর	বদ—বদরাগী
বে—বেআদব	বর—বরদাশ্ত
ব—বমানা	কম—কমজোর

(খ) আরবি উপসর্গ :

আম—আমমোক্তার	খাস—খাসমহল
না—নাখেরাজ	বাজে—বাজে খরচ
গর—গররাজী	

(গ) হিন্দি উপসর্গ :

হর—হররোজ

(ঘ) ইংরেজি উপসর্গ :

ফুল (full)—ফুলমোজা	সাব (sub)—সাবজজ
হাফ (half)—হাফহাতা	হেড (head)—হেডপণ্ডিত।

শি. প্র.লা.

উপসুন্দ, সুন্দ : হিন্দু পুরাণ মতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশজাত নিকুম্ভের অন্যতম পুত্র। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুন্দ। কঠোর তপস্যায় দুই ভাই ব্রহ্মার নিকট থেকে বর পায় যে তারা পরস্পরের হাত ছাড়া অবধ্য থাকবে। ত্রিভুবন জয় করে তারা তখন দেবতা ও তপস্বীগণের উপর উৎপীড়ন চালায়। দেব ও ঋষিগণের অনুরোধে ব্রহ্মা তখন বিশ্বকর্মাকে দিয়ে পরমাসুন্দরী নারী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন। তিলোত্তমা সুন্দ-উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হলে তাকে পাবার মানসে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে তারা দুজনেই নিহত হয়। তখন দেবলোক ও ত্রিভুবনে শান্তি ফিরে আসে। সু. মু.

www.pathagar.com

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী : ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে ১৮৬৩-র ১০ মে (২৭ বৈশাখ ১২৭০) জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদত্ত নাম কামদারঞ্জন। পিতার নাম কালীনাথ রায় ওরফে শ্যামসুন্দর মুন্সী, মাতা জয়তারা। কালীনাথ রায় তাঁর এক অপুত্রক আত্মীয় ময়মনসিংহের জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে বালক কামদারঞ্জনকে দত্তক দেন। হরিকিশোর তাঁর পোষ্যপুত্রের নাম রাখেন উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে উপেন্দ্রকিশোর ১৮৮০-তে বৃত্তিসহ এন্ট্রাস পাশ করেন। স্কুলজীবনে বাঁশি ও বেহালা বাজাতেন, ছবি আঁকতেন ও গান গাইতেন। কলকাতা মেট্রোপলিট্রন ইনস্টিটিউট থেকে ১৮৮৪-তে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। কলেজে পাঠকালে ফটোগ্রাফি শেখেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ১৮৮৬-তে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধমুখীর সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের বিবাহ হয়। কলকাতায় ইউ রায় এন্ড সন্স নামক ছাপাখানা স্থাপন করেন। তাঁর সম্পাদনায় ছোটদের মাসিক সাহিত্যপত্র 'সন্দেশ' (বৈশাখ ১৩২০) প্রকাশিত হয়। বাংলা শিশুসাহিত্যের তিনি একজন অসাধারণ লেখক। গ্রহ-নক্ষত্রের কথা, পশুপাখি ও গাছপালার কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের গল্প, দেশ-বিদেশের নতুন ও পুরানো কাহিনী, ইতিহাস ও ভূগোল তিনি ছোটদের জন্য হৃদয়গ্রাহী করে রচনা করেছেন। মিষ্টি ভাব ও ভাষা এবং মনোরম ছবি এসব মিলে তাঁর পদ্য ও গদ্য রচনা রসে টইটম্বুর। ছবিগুলো তিনি নিজে এঁকেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছোটদের রামায়ণ (১৩১৪), টুনটুনির বই (১৩১৬), মহাভারতের গল্প (১৩১৬), ছড়া-কবিতা-গান (১৯১৩-১৯১৫), সেকালের কথা, গল্পমালা, পুরাণের গল্প, বিবিধ প্রবন্ধ। প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) তাঁর পুত্র এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) তাঁর পৌত্র। মৃত্যু. গিরিডি, ডায়াবেটিস রোগে, ২০ ডিসেম্বর ১৯১৫। নূ. ই.

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : কথাশিল্পী ও সম্পাদক। সাময়িক পত্রের জগতে বিচিত্রার আবির্ভাব সেকালে প্রচণ্ডভাবে সাড়া জাগিয়েছিলো। আর 'বিচিত্রা'র স্বনামধন্য সম্পাদক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু সম্পাদনাই নয় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জননন্দিত কথাসাহিত্যিক। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৮১ সালের ১২ অক্টোবর ভারতের বিহার রাজ্যের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পৈত্রিক নিবাস হালিশহর। তিনি ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতুল সম্পর্কীয়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল পাস করার পর ওকালতি শুরু করেন। পাশাপাশি চলে সাহিত্যচর্চা। তাঁর প্রথম রচনা সন্ধ্যা (কবিতা) সখা ও সাথীতে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম সপ্তক (গল্পের বই) প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। এই বছরই তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কলকাতা আসেন এবং সাহিত্যে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। তাঁর জীবনের অমর কীর্তি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, যমুনা, বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, কালিকলম, আত্মশক্তি প্রভৃতি পত্রিকার পাশাপাশি 'বিচিত্রা' প্রকাশ ও সম্পাদনা। এটি ১৩৩৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিচিত্রার উপদেষ্টা। বিচিত্রা ছিলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বারোটি বছর এটি প্রকাশিত হয়েছিলো। তিনি 'গল্পভারতী'ও সম্পাদনা করেন। সংগীতেও তাঁর দখল ছিলো যথেষ্ট। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে শশিনাথ (১৯১২), রাজপথ (১৯২৫), অন্তরাগ (১৯৩২), স্মৃতিকথা (৪ খণ্ড ১৯৫১-১৯৫২), বিগত দিন (১৯৫৭), শেষ বৈঠক (১৯৫৮), দিকশুল, অভিজ্ঞান, যৌতুক, অমলতায়, অমলা, ছদ্মবেশী, বিদূষী

www.pathagar.com

ভার্যা, নাস্তিক প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সাহিত্যিক জীবনে তিনি অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্যে হুগলী জেলার সাহিত্য সম্মেলনে মানপত্র, প্রয়াগ সাহিত্য সম্মেলন, পুরী বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের অভিনন্দন, নবদ্বীপ পূর্ণিমা বিদ্বজ্জন সভার সম্মানলিপি, ভাগলপুর বাঙলা সাহিত্য সংঘের সম্মাননা এবং ১৯৫৬ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সম্মান জ্ঞাপন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯৫৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক প্রদান করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 'নরসিংহ-দাস' পুরস্কার প্রদান করেন ১৯৫৮ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে লীলা লেকচারার রূপে সম্মানিত করে। ১৯৬০সালে আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সদালাপী ও সুরসিক। তিনি ১৯৬০ সালের ৩০শে জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। **খা.বি.জ. উ.**

উপেন্দ্রনাথ দাস : নাট্যকার ও অভিনেতা। ১৮৪৮ সালে কলকাতার বৌবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এরপর তিনি সংবাদপত্র প্রকাশ, রাজনীতি এবং নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন। ১৮৭৫সালে উপেন্দ্রনাথ দাস কলকাতা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক হন। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ আসলে তিনি 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামের বিদ্রূপাত্মক প্রহসনটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ফলে পুলিশ তাঁর অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তাঁর পরিচালিত 'হনুমান চরিত্র' প্রহসন সম্পর্কেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তিনি তাঁর রচিত 'পোলিশ অফ পিগ অ্যান্ড শীপ' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটক অভিনয় করান। ফলে অশ্লীলতা ও রাজদ্রোহের দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু বিচারে মুক্তি পান। এই ঘটনার পর সরকার 'ড্রামাটিক কন্ট্রোল বিল' পাশ করে নাট্যমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক—শরৎসরোজিনী (১৮৭৪), সুরেন্দ্র-বিনোদিনী (১৮৭৫), দাদা ও আমি (১৮৮৮) ইত্যাদি। তিনি ১৮৯৫ সালের জুলাই মাসে মৃত্যুবরণ করেন। **আ. ই.**

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিপ্লবী, সাংবাদিক ও লেখক। ১৮৭৯ সালের ৬ জুন চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা ডাফ কলেজে বি.এ. পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ১৯০৫ সালে 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০৮ সালে মুরারি পুকুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯০৯ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১২ বছর পর মুক্তি পান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯২২ সালে অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পত্রিকা 'আত্মশক্তি'র সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অমরেন্দ্রনাথের উৎসাহে 'আত্মশক্তি লাইব্রেরী' থেকে উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২৬ সালে মুক্তি পান। এরপর সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সূত্রে 'ফরোয়ার্ড', 'লিবার্টি', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৫ সাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদনা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি নিযুক্ত হন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হিসেবে সরস বাগভঙ্গী ও প্রাঞ্জল রচনারীতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ--নির্বাসিতের আত্মকথা (১৯২১), ঊনপঞ্চাশী (১৯২২), পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম,বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান জগৎ ইত্যাদি। তিনি ১৯৫০ সালের ৪ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। **আ. জ. ভূ.**

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও পত্রিকা সম্পাদক। জন্মস্থান কলকাতা। ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পূর্ণচন্দ্র

www.pathagar.com

মুখোপাধ্যায়। জনসাধারণের মধ্যে মহৎ সাহিত্য প্রচারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্দেশ্যে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রখ্যাত গ্রন্থাকারদের গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তিনি ১৮৯৬ সালের ২৫ আগস্ট 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকা এবং ১৯১৪ সালের ৬ আগস্ট 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকা সম্পাদনা করেন ও কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থ—'হিন্দু সমাজের ইতিহাস', 'রাজভাষা', 'পাতঞ্জল দর্শন', 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী', 'কথা সরিৎসাগর' (কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সহযোগে), 'রামমোহন গ্রন্থাবলী' ইত্যাদি। তিনি ১৯১৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আ.ন.ম.ব.র.

উবাই ইব্‌নে কা'ব : মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী এবং প্রত্যাদেশ লেখক। লাজ্জাব গোত্রে জন্ম। উবাই ইব্‌নে কা'ব আনসারদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। এ কারণে মহানবী তাঁকে 'সাইয়িদুল আনসার' (আনসারদের সরদার) খেতাব দান করেন। তিনি বদর থেকে তাইফ পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কুরআনে হাফিয ছিলেন। হযরত আবু বকরের সময় কুরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব যাঁদের উপর অর্পিত হয়, উবাই ইব্‌নে কা'ব তাঁদের প্রধান ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কুরআনের কিরআতের ব্যাপারে যে মতভেদ দেখা দেয়, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের আমলে এর নিরসন হয়। তিনি উবাই ইব্‌নে কা'বের কিরআতের আদর্শে কুরআনের কিরআত নির্দিষ্ট করে সর্বত্র তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অদ্যাবধি কুরআন পাঠের সেই আদর্শই সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অনুসৃত হচ্ছে। আ. সৈ. গো. দ.

উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে যিয়াদ : উমাইয়া খিলাফত কালের বিশিষ্ট শাসক ও সেনাপতি। ইমাম হুসাইনের মর্মান্তিক হত্যার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। তিনি যিয়াদ ইব্‌নে আবীহির পুত্র ছিলেন। উবাইদুল্লাহ তরুণ বয়সেই পারস্যের খুরাসান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। পরে ইরানের গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে অত্যন্ত কঠোর হস্তে সেখানকার খারিজী বিদ্রোহ দমন করেন। কুফায় হযরত আলীর সমর্থকদের সংখ্যা অধিক থাকায় সেখানে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিলে ইয়াযীদ উবাইদুল্লাহ্‌কে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইমাম হুসাইনের চাচাতো ভাই মুসলিম ইব্‌নে আকিলের নেতৃত্বে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা প্রবল ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দমন করে মুসলিমকে হত্যা করেন। ইতোপূর্বে কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে ইমাম হুসাইন একদল অনুচর সঙ্গে নিয়ে স্বপরিবারে মদীনা থেকে কুফা যাত্রা করেন ; কিন্তু পথিমধ্যে মুসলিমের হত্যার এবং উবাইদুল্লাহ্‌র ইমাম বিরোধী কার্যকলাপের খবর পেয়ে তিনি কুফা প্রবেশের আশা পরিত্যাগ করেন। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবস্থায় তিনি কুফা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে কারবালা প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হন। সেখানকার ফোরাত নদীর তীরে উবাইদুল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী তাঁকে বাধা দেয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর অধিকাংশ পুরুষ আত্মীয়স্বজন ও অনুচরসহ তিনি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেন। তাঁদের অনেকেই নিহত হন। ইয়াযীদ বাহিনী হুসাইনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তাঁর হতাবশিষ্ট পরিবার ঐ বাহিনীর হাতে বন্দি হন। উবাইদুল্লাহ্ পরে ইমাম হুসাইনের সমর্থক সেনাদলের সঙ্গে এক যুদ্ধে নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চল্লিশ বছরও হয়নি। ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী হিসেবে ইয়াযীদের সঙ্গে

www.pathagar.com

উবাইদুল্লাহ্ও ইসলামের ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন। আ. সৈ. গো. দ.

উভচর মানুষ : আলেকসান্দর বেলায়েভ। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকের কল্পনার সৃষ্টি তরুণ হ'কথিয়ান্তর, 'উভচর মানুষ'। এই 'দরিয়ার দানো' কখনো জাল টেনে নিয়ে যায় সমুদ্রে, ধরা মাছ ছেড়ে দেয়, কখনো আবার উদ্ধার করে ডুবন্তদের। সে ছোটে ডলফিনের পিঠে চেপে, শঙ্খধ্বনি করে জানায় নিজের আগমন। ইকথিয়াণ্ডরের অভিযান, তাকে ধরার জন্য লোভী মুক্তা-সন্ধানীর তৎপরতা, ইকথিয়ান্ডর যাকে বাঁচায় সেই সুন্দরী তরুণীর প্রতি তার প্রেম—এসবেরই বিবরণ দিয়েছেন বেলায়েভ তাঁর বইয়ে। আলেকসান্দর বেলায়েভ (১৮৮৪-১৯৪২) পড়াশুনা করেন আইন বিভাগে ও সঙ্গীত-ভবনে, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্তির জন্য বেলায়েভকে অর্কেস্ট্রায় বাজনা বাজাতে হত, রঙ্গমঞ্চেও দৃশ্যপট আঁকতে হত, সাংবাদিকতা করতে হত। ১৯২৫ সালে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্যে। তাঁর সুবিখ্যাত রচনাগুলো—'উভচর মানুষ', 'প্রফেসর ডোয়েলের মস্তক', 'শূন্যে ঝাঁপ', 'বাতাসের কারবারী' ও 'সুখের সন্ধানী'—পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত। 'উভচর মানুষ' চলচ্চিত্র হয় এবং খ্যাতি অর্জন করে। বইটি রাশিয়ায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। বি. ব.

উভয়লিঙ্গ : যে সমস্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয় তাদের উভয় লিঙ্গবাচক শব্দ বলে। যেমন—মানুষ, গরু, হাঁস, জনগণ, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, চিত্রকর,কবি, দেশপ্রেমিক, শিল্পী, বক্তা, মেধাবী, কর্মী ইত্যাদি। শি. প্র. লা.

উমর (রাঃ): ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। ৫৮৩ সালে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব, মাতা হানতাম। উমর শিক্ষা দীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। কুস্তিগির, যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। ফারুক তাঁর উপাধি। ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রথমে ছিলেন পৌত্তলিক ও ইসলামের ঘোরতর শত্রু। হযরত মুহম্মদ (স.) ইসলাম প্রচার শুরু করলে উমর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, ভগ্নী ও ভগ্নীপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদেরকে তিনি প্রহার করেন। এমনি মানসিক উত্তেজিত অবস্থায় সেই প্রহৃতা বোনের কণ্ঠে কুরআন পাঠ শুনে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। নবীর (স.) দরবারে গিয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বদর থেকে শুরু করে সব ধর্মযুদ্ধে অংশ নেন। আবুবকরের মৃত্যুর পর তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খেলাফতের সময়কাল দশ বছর (৬৩৪-৬৪৪)। তাঁর শাসনামলে মুসলমান সাম্রাজ্যের সীমা আরব থেকে শুরু করে মিশর, সিরিয়া ও তুর্কিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একজন ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী, নির্ভীক, দূরদর্শী, লোকপ্রিয় ও গণতন্ত্রমনা শাসক হিসেবে উমরের খ্যাতি অম্লান। জনগণের দুঃখকষ্টের কথা অবগত হওয়ার জন্য তিনি গভীর রাতে প্রহরীবিহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন, নীতিবোধ, মানবিক গুণাবলী ও সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণা বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের 'উমর ফারুক' কবিতায় এর প্রমাণ মেলে। মসজিদে ফজরের নামাজরত অবস্থায় ৬৪৪ সালের নভেম্বর মাসে একজন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হন। আহত অবস্থায় তিন দিনের দিন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। নূ. ই

উমরাই কাযা : মহানবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে পৌঁছার

আগেই হুদায়বিয়া নামক স্থানে কুরাইশগণ তাঁকে বাধা দেয়। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি বা নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর শর্তানুসারে মহানবী ও তাঁর অনুগামীগণ উক্ত বছর মক্কা গমনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। পরের বছর তিনি মক্কায় এসে উমরা পালন করেন। এই উমরাকেই 'উমরাই কাযা' বলা হয়। হিজরতের পর মক্কায় তাঁর প্রথম আগমন হিসেব এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। মক্কাবাসীরা ঐ সময়ের জন্য শহর থেকে চলে যায়। রসূলুল্লাহ্ তাঁর সাহাবীদেরকে কাবা শরীফ তওয়াকে প্রথম তিন চক্কর দ্রুতবেগে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন, যাতে দৈহিক শক্তির প্রকাশ ঘটে। এটিকে 'রমল' বলা হয়। এখন পর্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত আছে। মদীনায় চলে যাওয়ার পর মুসলমানেরা দুর্বল হয়ে পড়েছে, কুরাইশদের এমন ধারণা দূর করার জন্য উমরাই কাযায় এমন রমলের ব্যবস্থা করা হয়। আ. সৈ. গো. দ.

উমরাওজান : উর্দু লেখক মীর্জা মহম্মদ হফিজ রুশোয়ার লেখা উপন্যাস। উর্দু থেকে ভাষান্তর করেছেন সুনীলকুমার বসু। কাহিনী হলো—শত্রুতা ছিল ছোট্ট মেয়েটির বাবার সঙ্গে ডাকু দিলোয়ার খাঁর। ফজিয়াবাদ শহর থেকে ডাকু তাই চুরি করে এনে বিক্রি করেছিল নয় বছরের আমীরণকে, লক্ষ্ণৌতে, খানুম জানের কোঠিতে। সেখানে আমীরণের নাম পাল্টে রাখা হয় উমরাও। উমরাও ক্রমে হয়ে উঠেছিলো লোক প্রসিদ্ধ বাঈজী উমরাওজান, কবি উমরাওজান 'আদা'। লেখক মীর্জা রুশোয়ার এক সময় পরিচয় হয়েছিল উমরাওজানের সঙ্গে। তাঁর অজ্ঞাতপূর্ব জীবনের অশ্রুসিক্ত উপাখ্যান পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন রুশোয়া, 'উমরাওজান আদা' উপন্যাসে। বাস্তব-আশ্রিত এই রচনায় নিষিদ্ধ জগতের অজানা কাহিনীর রুদ্ধশ্বাস আকর্ষণ ছাড়াও লেখকের অনবদ্য রচনাশৈলীর স্বাদ ছিল সেখানে পাঠকের অতিরিক্ত প্রাপ্তি। এবং এই সুবাদেই প্রধানত, মীর্জা রুশোয়ার 'উমরাও জান আদা' ধ্রুপদী উর্দু সাহিত্য হিসাবে আজও সমাদৃত। জীবিতকালেই কিংবদন্তী মীর্জা ১৮৫৭ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন, সিপাহী বিদ্রোহের বছরে। মাত্র ষোল বছর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে তিনি মামার আশ্রয়ে গিয়ে পড়েন এবং মাতুলের সৌজন্যে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। ব্যক্তি জীবনের এক গভীর সংকটে তৎকালের প্রখ্যাত লিপি বিশারদ হায়দর বক্সের বন্ধুত্ব রুশোয়াকে অনুপ্রাণিত করে। লেখক-জীবনে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছেন নানাভাবে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রসিদ্ধ উর্দু কবি 'দবির'। ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে ওভারসিয়ারিতে বিপ্রমা পান, সরকারি চাকরি নেন, এই চাকরি ছেড়ে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যুরো অব ট্রানস্লেশনে' কাজ করেন এক বছর। এই চাকরি ছেড়ে ফের সরকারি চাকরিতে ফিরে যান। ১৯৩১ সালের ৩১ অক্টোবর টাইফয়েডে মৃত্যু হয়। 'আখতারি বেগম' উপন্যাসে প্রথম খ্যাতি পান। সুনীলকুমার বসু অনুবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। জন্ম ১৯২০, মৃত্যু ১৯৯০ সাল। প্রকাশক : সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মাগান্ধি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রকাশকাল : ১ বৈশাখ ১৩৯৮, পৃষ্ঠা ১৯৯, মূল্য ৪০ রুপি। বি. ব.

উমা : হিন্দু পুরাণোক্ত মহাদেবের পত্নী এবং হিমালয় ও সুমেরুদুহিতা মেনকার কন্যা। পূর্বজন্মে দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে তিনি সেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দেন এবং হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করেন। যথাসময়ে শিবকে পতিরূপে পাওয়ার মানসে অর্পণা সেজে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তখন মেনকা উ (হে পার্বতি) মা (না—তপস্যা করো না) বললে তাঁর নাম হয় উমা। তারকাসুর দেবতাদের উপর উৎপাত করলে ব্রহ্মার নির্দেশ অনুযায়ী দেবগণের কৌশলে হরপার্বতীর মিলন ঘটলে কার্তিকের

www.pathagar.com

জন্ম হয়। তখন কার্তিক কর্তৃক তারকাসুর নিহত হয়। উমার সঙ্গে মহাদেব হিমালয় একদা বিহাররত থাকাকালীন কুবেরের দৃষ্টি সেখানে নিপতিত হলে কুবের একাক্ষিপঙ্গল হন। পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা বলে উমার অপর নাম পার্বতী। দক্ষের কন্যারূপে মহামায়া সতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিবকে তুষ্ট করে গৌরবর্ণ লাভ করায় তার অপর নাম হয় গৌরী। ম. চৌ.

উমাপতি ধর : বঙ্গের বিখ্যাত রাজা লক্ষ্ণণসেনের সভাকবি এবং পঞ্চরত্নের অন্যতম। আবির্ভাবকাল ১২শ শতাব্দী। লক্ষ্ণণসেনের রাজসভায় অপর চার রত্নের নাম--জয়দেব, গোবর্ধন, শরণ ও ধোয়ী। জয়দেবের গীতগোবিন্দে উমাপতিধরের উল্লেখ আছে। জয়দেবের মতে বাক্য পল্লবিত করা এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ বিজয় সেনের 'দেওপাড়া প্রশস্তি'-র রচয়িতা হিসেবে উমাপতির নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূক্তিগ্রন্থে উমাপতি-বিরচিত বহু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রীধর দাস সংকলিত (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) সংস্কৃত কাব্য 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' তাঁর ৯০টি শ্লোক স্থান পেয়েছে। এতে বাঙালি নারীর সুন্দর একটি প্রাকৃত অথচ অনন্যসাধারণ ছবি তিনি এঁকে রেখে গেছেন। উমাপতির রচনা বলে কথিত 'চন্দ্রচূড়-চরিত' কাব্যটি পাওয়া যায়নি। লক্ষ্ণণ সেনের বিজয় কাহিনী নিয়ে তিনি কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনও সম্ভবত তাঁরই রচনা। আ.খা.

উমামাহ্ বিনতে আবুল আস : মহানবী হযরত মুহম্মদের (দঃ) দৌহিত্রী। তাঁর কন্যা যয়নবের গর্ভে জন্ম। পিতার নাম আবুল আস ইব্‌বে রাবী ইব্‌নে আবদুল উয্‌যা। মহানবী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিবি ফাতিমার মৃত্যুর পর তাঁরই ওসিয়ত অনুযায়ী হযরত আলী উমামাহ্‌কে বিয়ে করেন। হিজরী ৪০ অব্দে হযরত আলীর শাহাদাত বরণের পর তাঁরই ওসিয়ত অনুযায়ী মুগীরাহ্ ইব্‌নে নওফলের সঙ্গে উমামাহ্‌র দ্বিতীয় বিয়ে হয়। আমীর মুয়াবিয়া তাঁর বিয়ের প্রার্থী হতে পারেন এই আশঙ্কায় হযরত আলী উক্ত ওসিয়ত করে যান। তিনি শহীদ হওয়ার পর পরই তাঁর ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়। আমীর মুয়াবিয়া মারোয়ানকে উমামাহ্‌র কাছে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে বিয়ের পয়গাম পৌঁছাবার আদেশ দেন। এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুগীরাহ্ ইব্‌নে নওফলকে তা জানানো হয় এবং ইমাম হুসাইনের অনুমতিক্রমে তাঁদের বিয়ে হয়। মহানবী উমামাহ্‌কে এত স্নেহ করতেন যে, তিনি সালাতে দাঁড়লে রুকু ও সিজদার সময় এই শিশু দৌহিত্রী তাঁর পিঠ ও কাঁধে উপবেশন করতেন। একবার মহানবী উপঢৌকনস্বরূপ একটি হার পেয়ে বলেন যে, তাঁর নিকট যিনি সবচাইতে অধিক প্রিয়, তাঁকেই তিনি তা দান করবেন। সকলের ধারণা ছিল উক্ত হার হযরত 'আয়িশার গলায়ই শোভা পাবে। কিন্তু মহানবী তা উমামাহ্‌কে দান করেন। মুগীরাহ্ ইব্‌নে নওফলের ঔরসে তাঁর গর্ভে ইয়াহিয়া নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একারণে মুগীরার উপনাম হয় আবু ইয়াহিয়া। মুগীরার ঘরেই উমামাহ ইন্তেকাল করেন। আ. সৈ. গো. দ.

উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন : বেদের নতুন ব্যাখ্যাকার। বাংলাদেশের যশোর জেলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রামের বৈদ্যবংশে উমেশচন্দ্র গুপ্তের জন্ম। দীর্ঘকাল বেদাদি শাস্ত্র আলোচনা করে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা ভ্রান্তিপূর্ণ। নিজের মতানুযায়ী বেদের শুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদানকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্র প্রত্যহ বিকেলে কলকাতার গোল-দীঘিতে বক্তৃতা করতেন। ১৯১১সালে তিনি ঋগ্‌বেদের 'প্রকৃতার্থবাহী' নামক সংস্কৃত ব্যাখ্যা রচনা করেন। ১৯১২ সালে উমেশচন্দ্র বিরচিত 'মানবের আদি জন্মভূমি' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঋগ্‌বেদ ব্যাখ্যার

www.pathagar.com

উপোদখাতপ্রকরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তবে গ্রন্থে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। উমেশচন্দ্রের মতে ব্রাহ্মণরাই দেবতা ; তাঁদের আদি বাসভূমি স্বর্গ অথবা মঙ্গোলিয়া। দৈত্য, দানব বা রেড ইন্ডিয়ান জাতি কর্তৃক উপদ্রুত হয়ে তাঁরা সামবেদ ও সংস্কৃত নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদ ভূলোকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে রচিত এবং যজুর্বেদ ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ লোক অথবা তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তান অঞ্চলে রচিত। আ. খা.

উমেশচন্দ্র বটব্যাল : ১৮৫২ সালের ৩০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ও পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার রামনগর নামক স্থান। ছাত্রজীবনে একজন কৃতি শিক্ষার্থী ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৭৪ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৭৬ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির জন্য 'বিদ্যালংকার' উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান দখল করে 'স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ন' পদ লাভ করেন। সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন। ইতিহাস ও দর্শনে গভীর জ্ঞান সঞ্চয়ন করেন এবং তৎবিষয়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁরই প্রস্তাবে অনুযায়ী পরিষদের নামকরণ হয়। উমেশচন্দ্র বটব্যাল একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। বৈদিক পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস ও সাংখ্যদর্শনে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও দখল ছিল। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'বৈদিক সোম' রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁর দর্শন সংক্রান্ত যেসব প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিলে, তাঁর মৃত্যুর পর 'সাংখ্যদর্শন' (১৯০০) গ্রন্থে সেসব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বৈদিক আলোচনামূলক প্রবন্ধসমূহ উতাঁর 'বেদ-প্রকাশিকা' (১৯০৫) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তিনি ১৮৯৮ সালের ১৬ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। আ. জ. ভূ.

উম্মুল কুরআন : মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁয়ের অনুবাদ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতহার বঙ্গানুবাদ। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে আটক থাকার সময় তিনি এটি অনুবাদ করেন। সূরা ফাতিহা কুরআনের প্রথম সূরা এবং তার সমগ্র কুরআন শরীফের নির্যাস স্বরূপ। এতে আল্লাহর অপার মহিমা, করুণা ও অনুগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর ছোট কলেবরের সূরাটির অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের কথা লেখক একাধারে যুক্তি ও ভাবানুভূতির দ্বারা মনোরমভাবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে মওলানা আকরম খাঁ সমগ্র কুরআন শরীফের অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করেছেন। দু'খণ্ডে প্রকাশিত এই বিরাট অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থটি সন্নিবেশিত হয়েছে। আ. সৈ. গো. দ.

উরুবিল্ব : পালি উরুবেলা। বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি স্থান। ভারতের বিহার রাজ্যের গয়া শহর থেকে দক্ষিণে প্রাচীন মগধ রাজ্যে নিরঞ্জনা (বর্তমানে ফল্গু) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে উরুবিল্ব বলা হতো। এর সেনানিগাম স্থানটি গৌতম তাঁর সাধনভূমিরূপে নির্বাচন করেন। বুদ্ধত্ব অর্জনের পূর্বে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনার পথ বর্জন করলে তাঁর 'পঞ্চবগ্‌গীয়' সব্রহ্মচারীগণ উরুবিল্বেই তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। সাধারণ ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করবেন স্থির করলে সেনানিগাম অধিবাসিনী সেনানীকন্যা সুজাতার নিকট তিনি পায়সান্ন গ্রহণ করেন। যে বোধিবৃক্ষতলে দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনায় রত থেকে গৌতম অবশেষে বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা এই উরুবিল্ব অঞ্চলেই অবস্থিত। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তিনি উরুবিল্বর নিকটস্থ অজপাল বটবৃক্ষ, মুচলিন্দবৃক্ষ এবং রাজায়তনে

www.pathagar.com

বৃক্ষতলে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এসব স্থানে কয়েকটি বিখ্যাত চৈত্য নির্মিত হয়। এ স্থানেই সহস্র শিষ্যসহ জটিল তপস্বী ভ্রাতৃত্রয় উরুবেল কস্‌সপ, নদী কস্‌সপ ও গয়া কস্‌সপ বাস করতেন। বুদ্ধ তাঁর অসাধারণ বিভূতির প্রভাবে তাঁদেরকে দীক্ষিত করেন। উরুবেলা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বালুকার চড়া। একটি প্রাচীন গল্পে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে দশ হাজার তপস্বী এই অঞ্চলে বাস করতেন। তাঁরা স্থির করেন যে, তাঁদের কারও মনে কোনো অসৎ চিন্তার উদয় হলে তাঁকে এক ঝুড়ি বালি বহন করে বিশেষ একটি স্থানে ফেলতে হবে। এভাবেই এখানে বালুকার চড়ার সৃষ্টি হয়। পূর্বোক্ত সেনানিগাম 'মহাবস্তু অবদান' গ্রন্থে সেনাপতিগ্রাম নামে আখ্যাত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে এই গ্রামের সন্নিকটে আরো ৪টি ভদ্রগ্রামের উল্লেখ আছে—প্রস্কন্দক, বলাকল্প, উজ্জঙ্গল ও জঙ্গল। এতে মনে হয় সেনাপতিগ্রামসহ এই চারটি গ্রাম নিয়ে উরুবিল্ব অঞ্চল গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এখানে বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির বহু স্তূপ ও চৈত্য নির্মিত হয়। আ. খা.

উর্বশী : পুরাণোক্ত অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী স্বর্গ অপ্সরা। উর্বশীর জন্ম সম্পর্কে প্রচলিত মতসমূহ হচ্ছে—নারায়ণের উরু থেকে তাঁর সৃষ্টি। সমুদ্র মন্থনের ফলে তাঁর জন্ম। সপ্ত মনু কর্তৃক তাঁর সৃষ্টি এরূপ অভিমতও আছে। উর্বশী সম্পর্কে হিন্দুপুরাণে অনেকগুলি কাহিনী আছে। যেমন--ইন্দ্রসভায় আহূত রাজা পুরুরবাকে দেখে উর্বশীর নৃত্যের তাল কাটে, ফলে ইন্দ্রের শাপে উর্বশী মর্ত্যে এসে প্রার্থনা অনুযায়ী পুরুরবার পত্নী হন। স্বর্গে উর্বশীর অভাববোধে গন্ধর্বরা পরে চক্রান্ত করে উর্বশীকে শাপমুক্ত করেন। শোকগ্রস্ত পুরুরবা ঘুরতে ঘুরতে কুরুক্ষেত্রের নিকট স্নানরতা উর্বশীকে লাভ করেন। উর্বশীর গর্ভে পুরুরবার পাঁচটি মতান্তরে সাতটি সন্তান লাভ হয়। বেদ মতে আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রিত উর্বশীর রূপে মুগ্ধ হয়ে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হয়, সেই রেতঃ থেকে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। আর একটি কাহিনী—ইন্দ্রালোকে উর্বশী অর্জুনের সঙ্গকামনা করলে অর্জুন মাতৃবৎ পূজনীয়া জ্ঞানে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রুদ্ধ উর্বশীর শাপে অর্জুন নপুংসক নর্তকের বেশে বৃহন্নলা নামে বিরাটরাজার গৃহে অজ্ঞাতবাস করেন। পদ্মপুরাণ মতে ইন্দ্র কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বতে কঠোর তপস্যারত বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করায় ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে উর্বশীকে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতায় উর্বশীর সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা আছে। কালিদাসের 'বিক্রম-উর্বশী' নাটকটিও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ম. চৌ.

উর্বশী ও আর্টেমিস : বিষ্ণু দে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৯৩২ খিস্টাব্দ। উল্লেখযোগ্য কবিতা উর্বশী, উর্বশী ও আর্টেমিস, প্রেম, ছেদ, পলায়ন, রাত্রিশেষে ইত্যাদি। বাংলা কাব্যে গতানুগতিক রীতিতে যে রোমান্টিকতার সুর চলছিলো, তারই বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থে। যুগের পরিবর্তনে রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শ অচল হয়ে পড়েছে, কেননা পারিপার্শ্বিকতার বিরোধী। অতএব কবিকে সনাতন রোমান্টিক ও গীতিকাব্যিক আদর্শে ছেদ টানতে হয়েছে। কেননা—'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।' (ছেদ)। কিন্তু বিষ্ণু দে ঐতিহ্যসচেতন কবি। এই ঐতিহ্যসচেতনতার জন্যই আর্টেমিসের চিত্রকল্পের সঙ্গে উর্বশীর চিত্রকল্প পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে। 'উর্বশী ও আর্টেমিসে' বিষ্ণু দে আত্মসচেতন কবিও বটে। একদিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিচেতনা, অন্যদিকে আত্মসচেতনতা—এই দু'য়ের দ্বন্দ্বে কবি ক্রমশ নৈরাশ্যের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন,—'এ আলোতে আমি আছি, আর আছে বিশ্ব চারপাশে/সে বিশ্ব আমারই মূর্তি--দীর্ঘ ছায়া আমার মনের।' (রাত্রিশেষে)। ঐতিহ্যসচেতন কবি বিষ্ণু দের মতে ঐতিহ্য কোনো দেশ কালে সীমাবদ্ধ নয়। তাই

www.pathagar.com

ঐতিহ্য সহজেই তাঁর কবিতায় স্থান করে নিয়েছে—'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেম-পুটে।' (পলায়ন)। সনাতন রোমান্টিকতার বিরোধী হতে গিয়ে বিষ্ণু দে কখনো কখনো বেদনাবিধুর ও দিশেহারা হয়েছেন। পুরাতনের স্বপ্নভঙ্গের জন্য কবিহৃদয়ের আর্তির প্রকাশ ঘটেছে—'আমার এ পুরাতন পৃথিবীকে ছেড়ে/ শূন্যতার অশেষ সাগরে/অজ্ঞাত এ গূঢ় অন্ধকারে/ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো তোমার আহ্বানে বিহঙ্গের মতো/চিরতরে চিত্তে কোথা আশা?' (প্রেম)। কবির যুগচেতনা অতীত সৌন্দর্যের মোহ ত্যাগ করলেও নতুন কাব্যাদর্শ গ্রহণে কবিচিত্ত তাই প্রথমে দ্বিধান্বিত হয়েছে—'আজো এই আমাদের কাল/আজো এই জ্ঞান-বিজ্ঞ জরা বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ভুবন/পলাতক উর্বশীর প্রতি পদপাতে/ দুলে দুলে ওঠে স্নায়ু আলোড়িত উতল কম্পনে।' (উর্বশী ও আর্টেমিস)। **আ. ই.**

উলূপী : মহাভারতোক্ত চরিত্র বিশেষ। মাগরাজ ঐরাবতের বংশজাত কৌরব্যের বিধবা কন্যা। তাঁর স্বামী গরুড় কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। কথিত আছে, যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর একাসনে থাকার দৃশ্য দৈবাৎ একদিন অর্জুনের দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন বারো বছরের বনবাসে চলে যান এবং গঙ্গাতীরে অবস্থান করতে থাকেন। একদা গঙ্গাস্নানরত অর্জুনকে দেখে বিধবা উলূপী মদনবাণে পীড়িত হন এবং তাঁকে পাতালস্থ নাগলোকে নিয়ে যান। তথায় উলূপী অর্জুনের কাছে আত্মনিবেদন করলে অর্জুন তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে ইরাবান নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। বনবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে অর্জুন উলূপীকে সেখানে রেখেই স্বগৃহে ফিরে যান। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রাক্কালে উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উলূপীর মায়ায় অর্জুন পুত্রহস্তে পরাজিত ও মৃতবৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। উলূপীই আবার অর্জুনকে সঞ্জীবনী মণির সাহায্যে চৈতন্য দান করেন। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পর উলূপী জাহ্নবী জলে প্রবেশ করেন। **মু. আ. রা.**

উল্টোবুড়ি : শাহজাহান কিবরিয়া রচিত দেশে-বিদেশের রূপকথার গল্প। প্রকাশক : মুক্তধারা, ঢাকা-১২১৬। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৭, প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাজী আবুল কাশেম, মূল্য সাদা : ১৭.০০ টাকা, লেখক কাগজ : ১২.০০ টাকা। বইটিতে সর্বমোট দশটি দেশের দশটি রূপকথার গল্প আছে। গল্পগুলোর নামও খুব চমৎকার। যেমন—১. লোভী মাকড়শা (লাইবেরীয়া), ২. লোভী শিয়ালের সাজা (গ্রেট ব্রিটেন), ৩. বুকী চাচার বোকামি (হাইতী দ্বীপ), ৪. উল্টোবুড়ি (স্ক্যানডিনিভিয়া), ৫. জেলে ও নীলটুপি (স্কটল্যাণ্ড), ৬. খরগোশ ও হাতি (আফ্রিকা), ৭. কুকুর কেমন করে প্রভু ভক্ত হলো? (কঙ্গো), ৮. বাঘা বীর (ভারত), ৯. বাঘের দাওয়াত খাওয়া (বাংলাদেশ), ১০. গিরগিটির মামা (মধ্য আফ্রিকা)। শিশু কিশোরদের জন্যে সহজ সরল ভাষায় গল্পোগুলো লেখা হয়েছে। গল্পে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। কিশোরদের জন্য একটি চমৎকার বই। **আ. তা.**

উল্টোরাজার দেশ : সরদার জয়েন উদ্‌দীন রচিত রূপকথার বই। প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৭০। বাংলাদেশে প্রচলিত একটি লোকগল্পকে লেখক সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। এতে প্রচলিত রূপকার স্বাদ গন্ধ অনেকটা বজায় রয়েছে। একটিমাত্র গল্পে বইটি সমাপ্ত। গল্পের মধ্যে মধ্যে ছড়া সন্নিবেশের ফলে বইটি অধিকতর সুপাঠ্য হয়েছে। সহজ সরল রূপকথার ঢঙে গল্পটি পরিবেশিত। আবহমানকালের বাংলার সুন্দর একটি চিত্র পরিস্ফুট এই বইয়ে। কাব্যিক ভাষা ও অপরূপ বর্ণনা-গুণে বাংলা শিশুসাহিত্যের আসরে বইখানি সমাদৃত হয়েছে। **আ. জ.**

উল্টোষষ্ঠী : ছয় মাত্রায় গঠিত তাল। এই তালের তালাঙ্ক সংখ্যা দুই। প্রথম তালাঙ্কে

www.pathagar.com

চার মাত্রা ও দ্বিতীয় তালাঙ্কে দুই মাত্রা। মাত্রা বিন্যাস দাঁড়ায় : ১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ | এই তালে সবই তালি, কোনো খালি বা ফাঁক নেই। সম, দ্বিতীয় তাল—এই ক্রমে তালাঙ্ক সমূহ বিন্যস্ত হয়। তবলায় বাদনীয় বোল হচ্ছে :

১	২	৩	৪	৫	৬
ধাগে	তেটে	কন	না	ধা	তেটে

। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তালরূপ উদ্ভাবন করেন। ফলে এই তাল রাবীন্দ্রিক তাল রূপে অভিহিত হতে থাকে। কা. গো.

উল্লেখ : বহু গুণের সমাহার থাকায় একই বস্তু যদি বহু প্রকারে উল্লিখিত হয় তখন সেখানে উল্লেখ অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়। বর্ণিতব্য বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে সাহিত্যিকগণ তার বিভিন্ন গুণ বা ধর্মের উল্লেখ করেন বলে এই জাতীয় অলঙ্কারের নাম উল্লেখ। যেমন—(ক) প্রভু মোর গুণের সাগর, রসময় রূপের নাগর/ রসিকের শিরোমণি, বিলাস ধনের ধনী/নৃত্যগীত বাদ্যের আকর (ভারতচন্দ্র)। একই 'প্রভু' এখানে বিভিন্ন দৃষ্টি থেকে বিভিন্নগুণে ভূষিত হয়ে উল্লিখিত হয়েছেন। (খ) স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ (রবীন্দ্রনাথ)। তিনি অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদার বিভিন্ন গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। (গ) জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী/ সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি (নজরুল)। নারী এখানে বিভিন্ন রূপে ও গুণে ভূষিতা হয়েছে। (ঘ) রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হতে শতবর্ষ পরে/কবি-রূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,/প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবন-ঋতু,/সকল শোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা/শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন (বুদ্ধদেব বসু)। আ.ই.

উষ্ট্রযুদ্ধ : হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজে উটে চড়ে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে যুদ্ধকে 'উষ্ট্রযুদ্ধ' বলা হয়। ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে বসরার নিকটবর্তী স্থানে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের এক পক্ষ ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী এবং অপর পক্ষে ছিলেন উম্মুল মুমিনীন (বিশ্ববাসীদের মাতা) হযরত আয়িশা এবং যুবায়ের ইব্‌নে আওয়াম ও তালহা ইব্‌নে আবদুল্লাহ্‌র সম্মিলিত বাহিনী। যুদ্ধের ফলাফল আলীর অনুকূলে যায়। আলীর দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীই পরাজিত ও নিহত হন এবং হযরত আয়িশা বন্দি হন। যুদ্ধের পর হযরত আলী পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে হযরত আয়িশাকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে তাঁর বসবাসের জন্য একটি বাসভবনের ব্যবস্থা করে দেন। আ. সৈ. গো. দ.

উহুদের যুদ্ধ : হিজরী তৃতীয় সালে সংঘটিত ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। মদীনার তিন মাইল উত্তর-পূর্বে উহুদ নামক একটি পাহাড়ে ও কঙ্করময় স্থানের নিকটস্থ প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর এক পক্ষে ছিলেন মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর নেতৃত্বে মদীনার নবদীক্ষিত মুসলমানগণ এবং অপর পক্ষে ছিল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ইসলামের শত্রু মক্কার কুরাইশগণ। ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার উদ্দেশ্যে এবং বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মক্কার তিন হাজার যোদ্ধা মদীনা অভিযান করে। এ সংবাদ অবগত হয়ে মক্কাবাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মহানবীর নেতৃত্বে এক হাজার মুসলমান যোদ্ধা মদীনা থেকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু পথিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই নামক জনৈক মুনাফেক ৩০০ অনুচর নিয়ে রসুলুল্লাহ্‌র পক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়। উহুদের প্রান্তরে তৃতীয় হিজরীর ১১ সাওয়াল উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। প্রথমাবস্থায় মুসলিম বাহিনীর বিজয় লাভের লক্ষণ দেখা গেলেও সামান্য ভুলের জন্য তাঁদের বিপর্যয় ঘটে। এর কারণ রসুলুল্লাহ্‌র নির্দেশ ভুলে গিয়ে মুসলমান তীরন্দাজগণ নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করায় মক্কার যোদ্ধাগণ পিছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের

www.pathagar.com

সুযোগ পায়। ফলে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে। মহাবীর হামজাসহ প্রায় সত্তর জন মুসলমান বীর শহীদ হন। হযরত মুহম্মদ, হযরত আবুবকর ও হযরত উমর আহি হন। রসুলুল্লাহ্‌র একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। মদীনাবাসীদের পক্ষে আলী এবং মক্কাবাসীদের পক্ষে খালিদ ইব্‌নে ওলীদ (তখন পর্যন্ত ইনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি।) অসীম শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন। কুরাইশ রমণীরা মুসলমান শহীদদের নাক-কান কেটে মালা গেঁথে বর্বরোচিত উৎসব পালন করে। মুসলমানেরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কোনো রকমে আত্মরক্ষার প্রয়াস পান। তবে তাঁরা জয়ী না হলেও শত্রুপক্ষকে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য এবং দ্বিতীয় বারের মতো ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধের মতো উহদের যুদ্ধও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আ. সৈ.গো. দ.

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক : নাট্যকার-গবেষক-অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিমের উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক' লেখকের পিএইচ.ডি. গবেষণা-অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। উনিশ শতকে বাংলাদেশে সংঘটিত হয় সীমাবদ্ধ নবজাগরণ। নবজাগরণের ফলে সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য—সর্বত্র সূচিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের হাওয়ায় বিকশিত হয় বাংলা নাটক। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়সীমায় রচিত বাংলা নাটকে সমকালীন সমাজজীবনের প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে, আলোচ্য গ্রন্থে তা-ই সন্ধান করা হয়েছে। 'কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় নাটক', 'ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে মদ্যপানাসক্তি ও তাহার প্রতিকারকল্পে রচিত নাটক', 'জাতীয়তাবাদ প্রচারমূলক নাটক', 'নারীকল্যাণ কামনায় রচিত নাটক', 'ধর্মমূলক নাটক', এবং 'বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রচিত নাটক'—প্রধানত এই ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে লেখক তাঁর অন্বিষ্ট বিষয় উপস্থাপন করেছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলা নাট্যসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক' গ্রন্থটি একটি বিশিষ্ট প্রয়াস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বি. ঘো.

ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন : সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানে একনায়কতন্ত্র চালু করেন। আইয়ুব খানের কালাকানুন পাকিস্তানের নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত তথা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছিল। শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত, শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের ইত্যাদি কারণে পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) জনসাধারণ আইয়ুব সরকারের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি ও শিল্পপতির হাতে। সেখানকার সাধারণ মানুষও বাঙালিদের মতই ধনিক-বণিক ও শাসকদের দ্বারা শোষিত, শাসিত ও নিগৃহীত হয়। সে অঞ্চলের গণ-মানুষের মনেও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এমনি অবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা ১৯৬৯ সালের গোড়ার দিকে আইয়ুব-সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলনের জোয়ারকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ঢাকায় ডাকসুর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ এর আহ্বায়ক এবং ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন

www.pathagar.com

উভয় গ্রুপ) ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (দোলন গ্রুপ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ ছিলেন সদস্য। সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের ১১-দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ছাত্র বেতন হ্রাস ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন ; শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস-আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা চালু, কৃষকদের খাজনা-ট্যাক্স হ্রাস, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রদান ও ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার অধিকারের স্বীকৃতি, বাক-ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, ব্যাঙ্ক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত ফেডারেল পদ্ধতির সংসদীয় সরকার, আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল ইত্যাদি গণ-দাবী ১১-দফায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। অপর দিকে আওয়ামী লীগ (৬-দফা ও ৮ দফা উভয় গ্রুপ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কোপন্থী), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম ও জামিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতৃবৃন্দ ৮ জানুয়ারি (১৯৬৯) ঢাকায় এক সভায় মিলিত হয়ে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণ বাধভাঙ্গা স্রোতের মতো আন্দোলনে নামে। গুলি, হত্যা, কারফিউ, সামরিক বাহিনীর টহল কোনো কিছুই সংগ্রামী জনতার গতিরোধ করতে পারেনি। হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও ও গণবিক্ষোভের মুখে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে আইয়ুব খান বিদায় নেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি ছাড়াও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টিও এ আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। এ ঐতিহাসিক আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সুফল হলো এই যে, গণ-দাবির মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব আসামিকে মুক্তি দেয়া হয় এবং জনগণের ভোটাধিকার ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের দাবিও মেনে নেয়া হয়। শত শত মানুষ এ আন্দোলনে আহত ও নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে বামপন্থী ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান, ঢাকা নবকুমার হাইস্কুলের ছাত্র মতিউর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের এ আন্দোলন আলোড়িত করেছিল। তাঁরা তাঁদের সাহিত্য রচনায় আন্দোলনের চেতনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি শামসুর রাহমানের 'আসাদের সার্ট'-এ আন্দোলনের উপর রচিত একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাস উনসত্তরের গণআন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। সেলিনা হোসেন 'উনসত্তরের গণআন্দোলন' নামে একটি বই লেখেন। অন্যান্য আরো লেখকবৃন্দ প্রবন্ধসহ অন্যান্য শিল্প মাধ্যমে এ আন্দোলনকে বিষয় করে সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম রচনা করেন। নূ. ই

উভশৃঙ্গ : শওকত ওসমানের গল্পগ্রন্থ। মূল্য : ৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৯৮। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫। প্রকাশক : পুথিঘর লিঃ, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। প্রচ্ছদপট : কামাল মাহমুদ। মোট ২৩টি গল্প নিয়ে উভশৃঙ্গ গল্পগ্রন্থ। গল্পগুলো যথাক্রমে মৎস্য, সৌদামিনী মালো, চিড়িয়া, সাহেবালি সাহেব জমাখরচ, নোট, কর্ণব্যাধি, স্বগতোক্তি, লুডু, কিংবদন্তী, বোনবিবির কেচ্ছা, ক্লাশ, শকুনের চোখ, জাতক কাহিনী

শৃগালস্য। রাজ, ষাঁড়, দাশসত্র, আখেরী সংক্রান্ত, কৌর্ৎ, নেমক হালা, গরুচোরের কাহিনী, উভশৃঙ্গ। বিষয় বৈচিত্র্য এ গ্রন্থের প্রধান সম্পদ। অধিকাংশ গল্পই মনস্তত্ব নির্ভর। মানব মনের চির দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্‌ঘাটন করাতেই যেন লেখক বদ্ধপরিকর। লেখকের হাস্যরসপ্রিয়তার ফলে কিছু গল্প রম্যধর্মী হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'চিড়িয়া' গল্পের নাম করা যায়। মানুষের লোভলালসার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ দেখি 'সৌদামিনী মালো' গল্পে। মানবেতর জীবনযাত্রার সার্থক রূপ প্রকাশিত হয়েছে 'নেমক হালাল' গল্পে। সমাজের নানা অসংগতির দিকে দৃকপাত করার ফলে গল্পগুলো বৈচিত্র্য প্রধান হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের শেষে নাম গল্পটি স্থান পেয়েছে। 'উভশৃঙ্গ' গল্পটি রূপকধর্মী। উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের যথাযথ প্রয়োগে গল্পগুলোতে যুক্ত হয়েছে নানাবিধ দ্যোতনা। পা.র.

উর্মিলা চক্রবর্তী : কবি ও প্রাবন্ধিক। ১৯৪৬ সালের ১১ আগস্ট বাংলাদেশের পাবনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতভাগের পর তাঁর পরিবারসহ ভারতে চলে যান। ১৯৬২ সনে কলকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল হতে হায়ার সেকেন্ডারীতে কলা বিভাগে প্রথম হন। তারপর ইংরেজিতে অনার্সসহ ১৯৬৫ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজিতে এম.এ. পাস করেন। পরবর্তী সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবি সিলভিয়া প্লাথের সাহিত্যকর্মের ওপর গবেষণা করে পিএইচ.ডি সনদ পান। কর্মজীবনে ১৯৭৬-এ শিলিগুড়ি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অতপর ১৯৮৬-তে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬-এ অধ্যাপক পদে নিয়োগ পান। তিনি মূলত কবি হলেও 'জিজ্ঞাসা'য় অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ হলে প্রাবন্ধিক হিসেবেও খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'খোঁড়াদের রাজ্যপাট' (১৯৮৯), 'তুমি, আমি ও শয়তান' (১৯৯৫), 'ডাইনি হাওয়ার পিঠে' (১৯৯৭) প্রকাশিত হয়েছে। অন্য আর একটি বই 'রাতকাহনী নষ্ট চাঁদে'। 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় নারীমুক্তি বিষয়ক বিশেষ সংখ্যায় তিনি অতিথি সম্পাদক ছিলেন। ম্যানফেড জুরগেনসেন সম্পাদিত 'Riding Out : New writing from Around the World' গ্রন্থে উর্মিলা চক্রবর্তীর মূল কবিতাসহ চারটি কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া বিদেশের একাধিক পত্রিকায় অনূদিত কবিতা ও ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় নারীর ভেতরের স্বাধীন চেতনার আঁচড় লক্ষ করা যায়। তিনি 'ডাইনি হাওয়ার পিঠে' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'কবি দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন। গৌ. ম.

ঊষা : বৈদিক দেবতা বিশেষ ; প্রাতঃকালের দেবতা। তিনি জ্যোতি বসনা, চিরযৌবনা ও সকল সৌন্দর্যের আধার। ঋগ্‌বেদের ২০টি সূক্তে এই দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। ঋষি কবিগণ উষাকে অপূর্ব সজ্জায় ভূষিতা প্রণয়িনী তরুণী রমণীরূপে কল্পনা করেছেন। তিনি 'দিবো দুহিতা' রূপেও বর্ণিত হয়েছেন। উষা ও রাত্রি দুই বোন। সূর্যদেবকে উষা দেবীর প্রণয়ীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, যিনি প্রণয়ীর ন্যায় মনোহারিণী ঊষার অনুগমন করেন। কোথাও কোথাও আবার অগ্নিই তাঁর প্রণয়ীরূপে কীর্তিত। বেদে যে উষার কথা বলা হয়েছে তিনি প্রজাপতির কন্যা। কথিত আছে, প্রজাপতি রাজা সোমের (চন্দ্রের) সাথে কন্যার বিবাহ দেবার সংকল্প করেন। এ সংবাদ পেয়ে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয় উষার পাণিপ্রার্থী হন। এই পাঁচজন শক্তিশালী দেবতার মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করতে হবে। তাই প্রজাপতি ঘোষণা করলেন, অনন্ত আকাশ-পথ অনুধাবনে যিনি কৃতকার্য হবেন এবং সেই সঙ্গে যিনি যত বেশি সংখ্যক স্বরচিত বেদসূক্ত উচ্চারণ করতে পারবেন, তাঁর হাতেই উষাকে সমর্পণ করা হবে। একথা শুনে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য আকাশ-পথে অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন

www.pathagar.com

অশ্বিনীদ্বয় ইন্দ্রের নিকট থেকে বেদসূক্ত লাভ করে শেষ পর্যন্ত সফলকাম হন এবং ঊষাকে লাভ করেন। আ. রা.

ঋণং কৃত্বা : প্রমথনাথ বিশী রচিত পারিবারিক সমস্যাবহুল নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ খিস্টাব্দ। একটি পারিবারিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী শুরু হয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃঋণের বোঝা সনৎকুমারের ঘাড়ে চাপে। পুত্র বিত্তশালী নয়। সুতরাং পিতার পাওনাদারগণ এলে সনৎ গা ঢাকা দেয়। সনতের চাকর ভজয়াও ঋণ-করা ও ঋণ-ঠেকানোর এই অভিনয় কৌশলটি আয়ত্ত করে নেয়। এদিকে সনৎ পিতৃবন্ধুর কন্যা মঞ্জরীকে বিয়ে করতে চায়। সনতের বন্ধু ললিত। সে আবার মঞ্জরীর বন্ধু মণিকাকে ভালোবাসে। নানা ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সনৎ-মঞ্জরী ও ললিত-মণিকার প্রণয়কাহিনী পরিণতির পথে এগিয়ে যায়। কাহিনীর রূপায়ণে নাট্যকার অনেক কৌতুককর দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। মূল চরিত্র কয়টি ছাড়াও নাটকে অন্যান্য যেসব চরিত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তারা হচ্ছে মঞ্জরীর দাদু, সুরদাস বাবু, সুরদাস বাবুর বন্ধু উকিল হর্ষনাথ বাবু, হর্ষনাথ বাবুর বন্ধু লোকেনের শ্যালক চন্দ্রনাথ বাবু ইত্যাদি। হাস্যকৌতুকের সঙ্গে রোমান্টিক প্রেমের চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আ. ই

ঋতুরাগ : ষড় ঋতুতে গেয় ছয়টি রাগের উল্লেখ নানা সূত্রে পাওয়া যায়। ঋতু অনুসারে গেয় রাগকে ঋতুরাগ বলা হয়। বর্তমানকালে সর্বাধিক গ্রাহ্য হনুমন্ত মত অনুযায়ী ষড়ঋতুতে গেয় ছয়রাগ হচ্ছে গ্রীষ্মে দীপক, বর্ষায় মেঘ, শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালকোষ, শীতে শ্রী ও বসন্তে হিন্দোল। ক. গো.

ঋত্বিক : সুরমা ঘটক রচিত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের বর্ণাঢ্য জীবনের বিবিধ বিষয় নিয়ে লেখা তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ। প্রখর জীবনদৃষ্টি সম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক মনে করতেন, 'সব শিল্পকর্মেরই সত্যকার শিল্পপদবাচ্য হতে হলে সর্বপ্রথম হতে হবে সত্যবাদী। এই হচ্ছে শিল্প বিচারের দৃঢ়তম মানদণ্ড এবং যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত।' ঋত্বিক নিজে স্বঘোষিত এই 'সত্যবাদী' পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে আমৃত্যু শিল্পচর্চা করে গেছেন। তবে সম্পূর্ণরূপে চলচ্চিত্রে আত্মনিয়োগের পূর্বে হাত বাড়িয়েছিলেন শিল্প সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও। যৌবনের উন্মেষ পর্বে লিখেছিলেন কবিতা। কিন্তু খুব দ্রুত অনুভব করলেন, 'ওটা আমার হবে না। কাব্যিক এক লক্ষ মাইলের মধ্যে আমি কোনদিন যেতে পারব না।' অতঃপর কিছুদিনের জন্যে ঝুঁকে পড়লেন মার্কসবাদী রাজনীতির দিকে। একই সময় লিখতে থাকেন ছোটগল্প। তাঁর ভাষায় 'গল্প আমি খারাপ লিখতাম না। আমার এখনো মনে আছে আমার আর সমরেশের প্রথম ছাপা গল্প বেরোয় 'অগ্রণী'তে, তারপর সজনীবাবুর 'শনিবারের চিঠি', 'গল্পভারতী', 'দেনা'-সব মিলিয়ে গোটা কয়েক গল্প বেরিয়েছিল। তারপর মনে হল গল্পটা Inadequate, তখন আমার টগবগে রক্ত Immediate reaction চাই। সেই সময়ে হলো 'নবান্ন'। 'নবান্ন' আমার সমস্ত জীবনধারা পাল্টে দিল।' এরপর ঋত্বিক নাটক লিখেছেন, অভিনয় করেছেন। তখন মাঠে ময়দানে তার পাঁচ হাজার দর্শক নাটক দেখতেন। কিন্তু কিছুদিন পর নাটকেও তাঁর Inadequate মনে হলো। শেষে আরো বেশি মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের আশায় বেছে নেন সিনেমা মাধ্যম। তবে এ মাধ্যম সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমি সিনেমাতে এসেছি...কাল যদি সিনেমার চেয়ে better medium বেরোয় তা হলে সিনেমাকে লাথি মেরে চলে যাব।' এই মহান ও দ্রোহী চলচ্চিত্রকার এবং শেষজীবনে আকণ্ঠ ঋণভারে পীড়িত ও কিছুটা উদভ্রান্ত মানুষ, ঋত্বিক ঘটকের জীবনের বহুবিধ খণ্ড খণ্ড ঘটনা সুরমা ঘটক তাঁর 'ঋত্বিক' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছে, অনুষ্টুপ। মূল্য : ষাট টাকা। প্রকাশকাল : ১৪০২। মা. আ.

www.pathagar.com

ঋত্বিক ঘটক : বিশিষ্ট চলচ্চিকার। ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস পাবনার নতুন ভারেঙ্গা। পিতা সুরেশচন্দ্র ঘটক। ১৯৪৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ. ও ১৯৪৮ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. (ইংরেজি) কোর্স শেষ করলেও পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালিত ও বিমল রায় প্রযোজিত 'তথাপি' (১৯৫০) ছবির সহকারী পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর পরিচালিত 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৭) ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সফল চলচ্চিত্রকার-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবি : 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৮), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৫৯), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬০) ও 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২)। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবি : 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' (১৯৭৪)। বাংলাদেশে তাঁর নির্মিত ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩)। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ছবিগুলো শিল্পনিষ্ঠ হয়ে ওঠায় তা দর্শক-মহলে বিপুলভাবে প্রশংসা কুড়িয়েছে। গল্প ও নাটক রচনা এবং ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তাঁর সমকালের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বোম্বাই-এর হিন্দি ছবিতেও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। কিছুদিন তিনি পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৬ সালের ২ জনু তিনি পরলোক গমন করেন। নূ. ই

এই কলকাতায় : গৌরকিশোর ঘোষ প্রণীত কলকাতা সম্পর্কিত স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'এই কলকাতায়' রবিবারের সত্যযুগে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে। বই হিসেবে বের করতে গিয়ে খোলনলচে দুইই পাল্টাতে হয়েছে, বলতে গেলে খোলো হুঁকো থেকে গড়গড়া গড়েছি।' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে বইয়ে রূপান্তরিত হবার পরে পরিবর্তন কি হয়েছে এই বই থেকে পাঠকের তা জানার সুযোগ নেই। তবে কলকাতার একটি বিশেষ সময়কে এই বইয়ে খুঁজে পাওয়া যায়। বইটি ছোট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০। বর্ণনায় লেখক গল্পের ঢং ব্যবহার করেছেন। বাক্য নির্মাণে প্রচুর রসিকতা লক্ষণীয়। কখনও কখনও কষ্টের কথা বলেছেন, রসিকতার ভেতর দিয়ে। কখনও রসিকতাকে ব্যবহার করেছেন বিদ্রূপ হিসেবে। কখনও প্রবল দুঃখ সব কিছু ছাড়িয়ে এই বইয়ের পাঠককে একটি ভিন্ন ভুবনে নিয়ে যায়। বইয়ের একটি অন্যতম চরিত্র গৌরদাস। কলকাতায় আসার পর লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর সম্পর্কে লেখক বলছেন, 'গৌরদাস আমার গুরু। কলকাতায় এসে জ্ঞানের গুদামে আমার যা কিছু সঞ্চয় তার প্রায় অর্ধেকটাই গৌরদাসের দৌলতে।' গৌরদাস ছিলো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। এই গৌরদাস লেখককে একটি টিউশনি জোগাড় করে দিয়েছিলো। এক সময়ে এই টিউশনিটা তাঁর চলেও যায়। এরপর নানা ঘটনার বর্ণনা আছে। বই শেষ হয়েছে গৌরদাসের মৃত্যু দিয়ে। পাড়ায় আগুন লাগলে গৌরদাস দেখতে পায় একটি বাচ্চা ছেলে ঘরে আটকা পড়েছে। অন্য সবার নিষেধ না মেনে ও বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য ঘরের ভেতর ছুটে যায়। ছেলেটিকে নিয়ে বেরোনোর আগেই মাথার উপর পোড়া চাল ভেঙে পড়ে। গৌরদাসের এই মৃত্যুর শোক নিয়ে লেখক কলকাতা থেকে ফিরে যান ঠিকই, কিন্তু আবার তাঁকে ফিরে আসতে হয় কলকাতায়। তিনি বলেছেন, 'এসেছি, বারবার এসেছি এই কলকাতায়। আনন্দ পেয়েছি, আঘাত খেয়েছি। বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে গেছি। তবু কলকাতার ডাক এড়াতে পারিনি।' বইটি প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা। প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩, মূল্য : দশ রুপি। সে. হো.

www.pathagar.com

এই গৃহ এই সন্ন্যাস : মহাদেব সাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। মূল্য ৩৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০, প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭২. চতুর্থ প্রকাশ–মার্চ ১৯৮৯। 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যা ৪২টি। গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা প্রেম ও রাজনীতি বিষয়ক। রাজনীতিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি আছে কবির সন্তসুলভ নিভৃত স্বভাব, দার্শনিক নির্লিপ্তি, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রশান্ত বিষাদ। গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই প্রতীমান হয় দুই বিপরীত মেরুর পাশাপাশি অবস্থান। ফলে দেখা যায় একদিকে অবক্ষয়ী চেতনা, অন্যদিকে মানুষ, সমাজ, দেশ, প্রকৃতি ও চরাচরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। নিঃসঙ্গতা কবিকে গ্রাস করে। অস্তিত্ববাদী অন্ধকারে লোমশ পশু কুঁড়ে কুঁড়ে খায় সত্তা। আবার প্রেমিকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল কবি বলে ওঠেন, 'ঢাকার আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন–মাধবী তুমি এখন বাইরে যেওনা। এই করুণ বৃষ্টিতে তুমি ভিজে গেলে বড়ো ম্লান হয়ে যাবে তোমার শরীর।' এই গৃহ এই সন্ন্যাস কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে সুখ, দুঃখ, আনন্দ বেদনা, স্বদেশের করুণতম ট্র্যাজেডি, শৈশব স্মৃতি, মানুষের জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি। অস্তিত্ববাদী বেদনার চিত্র অঙ্কনে কবি চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে জিরাফের ভয়ঙ্কর গলা, তক্ষকের ডাক, লেকের জলের দামের মাঝে চিত্রকল্পের সার্থক ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রেম ও রাজনীতির সহাবস্থানে এই গৃহ এই সন্ন্যাস অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। **পা. র.**

এই ট্রেনটির নাম·গার্সিয়া লোরকা : জাহিদুল হক রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক : শাহজাহান বাচ্চু, ৩১/৩২ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৌষ ১৪০৩। মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা। স্পেনের প্রখ্যাত কবি গার্সিয়া লোরকার নামে সেখানের একটি ট্রেনের নামকরণ করা হয়েছে। গ্রন্থটির শিরোনামের উৎস সেই ট্রেন। গ্রন্থিত অধিকাংশ কবিতা জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের শহরে বসে লেখা। প্রত্যেকটি কবিতার নিচে রয়েছে কবিতা লেখার তারিখ ও স্থানের নাম। এই গ্রন্থটিতে রয়েছে গ্রন্থকারের বিখ্যাত কবিতা 'ঢাকা'। এই কবিতাটি ফ্লরেন্সে বসে লেখা। কবিতাটির শেষ স্তবকের কয়েকটি লাইন এরকম : 'আজ যদি পূর্ণ চাঁদ নামে ওই নীল পাটাতনে আকাশের/স্মরণ করাচ্ছি, ঢাকা, আছে কি স্মরণে সেদিনের পূর্ণিমাকে?/ যুদ্ধ শেষ, দেশান্তরী যারা সবাই ফিরছে ঘরে,/কিন্তু যারা ফেরে নাই—তারা অলৌকিক মহোৎসবে উঠেছিলে মেতে স্তব্ধ রাতে।' গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কবিতার শিরোনাম হলো : আম্মা, তুমি, এই ট্রেনটির নাম গার্সিয়া লোরকা, বিরহ, আমার যা কিছু অগোছালো, কীটস–এর জন্য পঙক্তিমালা, আর্ণোর উদ্দেশ্যে, অসুখ, সনেট–চাঁদের উদ্দেশ্যে ১, ২, অন্য পূর্ণিমার জন্য, তোমাকে আদর করি, সাইপ্রেসে বীথিকাকে নিয়ে কবিতা, চিঠি, হে উপমা ধরা দাও ও ভিন্ন বাড়ি। এসব কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতি, ভালোবাসা, নিসর্গ এবং উপমা উৎপ্রেক্ষার চমৎকার নির্দেশন রয়েছে। **খা. বি. জ.উ.**

এই দিন মিথ্যে : মনজুরে মওলা। কাব্যগ্রন্থ। দেশপ্রেম, স্বদেশচিন্তা, মাঝে মধ্যে স্বাপ্নিক বিপ্লবের ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষার সসংকোচ অভিব্যক্তি— এইসব উচ্চতর ভাববাদী বক্তব্য নিয়ে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় এই কবিতার বইটি। ছোট–বড় মিলিয়ে গ্রন্থভুক্ত ৪৫টি কবিতার মধ্যে 'স্বদেশ' শীর্ষক প্রথম কবিতাতেই কবির পুরো কাব্যভাবনার পরিচয়টি অঙ্কুরাকারে সুপ্ত হয়ে আছে। এখানে তিনি শুরুতেই প্রশ্ন তুলেছেন, 'স্বদেশে পরবাসী কে?/ আমি নই, তুমি নও?' প্রশ্নের পরই আবার তিনি যেন স্বগত বলে দেন, 'এই দিন মিথ্যে, এই দিন মিথ্যে, এই দিন মিথ্যে,/এসো,/ স্বদেশকে স্বদেশ ক'রে তুলি।' গ্রন্থের নামটি এই কবিতা থেকে নেয়া এবং এই কবিতার

www.pathagar.com

ভেতরেই রয়েছে তাঁর কাব্যের ভাষাভঙ্গির মূল রূপটিও। রয়েছে আধুনিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানসিক দ্বন্দ্ব ও তার যন্ত্রণাময় ঘাত-প্রতিঘাতের স্বরূপটি। অবশ্য এই কাব্যগ্রন্থে কবির মানসিক দ্বন্দ্বের চেহারাটি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এক ধরনের দ্বিধাগ্রস্ততার ভেতর দিয়ে কবি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। দেশের উন্নয়ন শুধু নয়, দেশের জন্য নিজের কর্তব্যকর্মে নামতেও যে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত-- এই সত্য প্রায়স অপ্রকাশ্য থাকেনি। তিনি বলেছেন, 'আমার সমাজ নেই কোনো।...আমার প্রতিজ্ঞা নেই কোনো।... আমার সময় নেই কোনো।' এবং একথাও বলেছেন যে, 'মৃত্যু, আজ জানি,/একমাত্র পথ/বেঁচে থাকবার।' তিনি অকপটে নিজের কাব্যকীর্তির মূল্যায়ন করেন সাহসিকতার সঙ্গে এভাবে, 'কোনো দিনই অমর হবো না।/লিখি নি এমন কিছু মার্বেলের চেয়ে স্থায়ী হবে।/মুক্তিযুদ্ধে বন্দুক ধরি নি যে কীর্তিত হবো।' বইটি প্রকাশ করেছে হাক্কানী পাবলিশার্স, স্টেডিয়াম, ঢাকা। প্রকাশ কাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। মূল্য : ত্রিশ টাকা। মো. শা.

এই ভাই : কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক ও মুদ্রক : লালন প্রকাশনী, ২৬২ বংশাল রোড, ঢাকা-১। প্রচ্ছদপট : কাইয়ুম চৌধুরী। ২২টি কবিতা নিয়ে 'এই ভাই' কাব্য গ্রন্থটি ষাটের দশকের শেষ এবং সত্তর দশকের শুরুতে লেখা। ব্যক্তিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনে ও জগতে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত, তার সূক্ষ্মতম অনুরণনটুকু ধরা পড়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গভাবে কথা সাজাবার অব্যাহত ধারায়, যা জেদি তটিনীর মতো প্রবাহিত থেকেছে সমস্ত প্রতিকূলতাকে ভেদ করে। যা বিশাল কোনো মহাকাব্যিক প্রবাহে পরিণত না হলেও দেশ ও জগতের সঙ্গে গভীরভাবে ভিতর এবং বাইরের দিক দিয়ে যুক্ত রয়েছে রূপ-রঙ-রস ধ্বনিভাব দিয়ে নিয়ে। গণবৈপ্লবিক শিবিরের অভ্যন্তরীণ ভাতৃঘাতী, আত্মঘাতী পটভূমিতে লেখা 'এই ভাই' কাব্যগ্রন্থ। পা. র.

এই যে তুমুল বৃষ্টি : সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। মূল্য : পনের টাকা। প্রচ্ছদ : বীরেন সোম। প্রকাশক : লেখক প্রকাশনী, ১৯২ ফকিরাপুল, ঢাকা-২। পঞ্চাশের কবিদের মাঝে অনন্য হলেও তাঁর কাব্যযাত্রা কিছুটা বিলম্বিত, সেক্ষেত্রে কাব্য খ্যাতিটাও। কারণ গ্রন্থাকারে তাঁর উপস্থিতি বিলম্বে। মোট বত্রিশটি কবিতা গ্রন্থনা 'এই যে তুমুল বৃষ্টি'। এগ্রন্থে কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ'র নিজস্ব মুদ্রা পরিলক্ষিত। গদ্য প্রধান কবিতা বলে তাঁর বাচনভঙ্গি কিছুটা নিজস্ব এবং কিছুটা স্বকালের। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে প্রতিটি কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। কারণ বাংলা কবিতার ভিড়ে ভাবালুতা যেখানে আশ্রয়, কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ এখানে ব্যঙ্গ নিপুণতায় চতুর। তাঁর সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি 'এই যে তুমুল বৃষ্টি'তে প্রখরভাবে উঠে এসেছে। কবি সমাজকে দেখেছে আবেগহীন রূঢ় বাস্তবতায়। নিরেট গদ্য ছন্দে লেখা হলেও তাঁর প্রথম কবিতা যাত্রা থেকে লক্ষ করা গেছে কবি তাঁর কবিতার পাশাপাশি সৃষ্টি করেছেন আলাদা একটি কাব্যভাষা ও পাঠক গোষ্ঠী যা সাইয়িদ আতীকুল্লার মুদ্রায় আলাদা ভাবে মুদ্রিত। মননশীল লেখকদের মাঝে কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ এ গ্রন্থে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন শব্দের নিজস্ব নির্মাণে। কবিতাগুলো সুপাঠ্য এবং সহজবোধ্য। নেই কৈবল্যের অতিরিক্ত চর্চা। তবে গদ্য এবং টানা গদ্যে। মা. জা.

এই স্বাধীনতা : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) রচিত দেশবিভাগের পটভূমিকায় পরিকল্পিত নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ। স্বাধীনতার ফলে ছিন্নমূল শরণার্থীর দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী এই নাটকে প্রধান অংশ অধিকার করেছে। মানবকল্যাণবিরোধী এই স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে নাট্যকার

www.pathagar.com

প্রশ্ন তুলেছেন। নাটকে বর্ণিত ছিন্নমূল শরণার্থী নরনারীগণের মধ্যে রয়েছে দীপক, প্রমথ, কার্তিক, অবনী, প্রভাবতী, রাইমণি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। স্বাধীনতার আগে তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সুখ-সম্পদ এবং আশ্রয় সবই ছিল। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে তারা আজ আশ্রয়হীন, নিরন্ন ব্যক্তি। তাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদেরই নিজেদের লোভ, লালসা, নীচতা ও স্বার্থপরতা। ফলে তারা একরকম ঘৃণ্য, কলুষ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মুখপাত্রী সাধনা। সাধনার চরিত্রে নাট্যকার মানবতাবাদ ও আশাবাদের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। তবে এই চরিত্রে মানবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চেয়ে তত্ত্বপ্রাধান্যই লক্ষ করা যায়। কার্তিকের লাঠির আঘাতে সাধনা আহত হয়। কিন্তু এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কোনো নাটকীয় তাৎপর্য নেই। নাটকের কাহিনীটি একই দৃশ্যপটে বিরামহীনভাবে সংঘটিত হয়েছে। আ. ই

এক অনিশ্চিত বসন্তের কাল : বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের লেখা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯১। প্রকাশক : ঢাকা প্রকাশনী, গ-১৬ মহাখালি, বা/এ, ঢাকা-১২১২। এক মাত্র পরিবেশক : ডানা পাবলিশার্স, ৩৬ বাংলাবাজার (দোতলা) ঢাকা-১১০০। প্রচ্ছদ : আবদুর রহমান। ১৬টি প্রবন্ধ এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল : ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সাল। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির একটি উত্তাল সময়ে লিখিত বলে জাতীয় রাজনীতি বিষয়ে অর্থাৎ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা উত্তর কালের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি তাঁর ব্যক্তিগত অবচেতন সত্তায় কীভাবে ক্রিয়াশীল তার প্রতিফলন ঘটেছে এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলোয়। বাতাস, ক্যাকটাস, অ্যাশট্রে, টেবিলল্যাম্প, কফি—এইসবের বস্তুগত ও নির্বস্তুক ব্যক্তিগত অনুভবের পাশাপাশি ঢাকা, চারপাশের গ্রাম, কাঁধে সাতপুরুষের স্বপ্ন ইত্যাদি অনুষঙ্গ তাঁর স্মৃতিকে করে তুলেছে সজীব ; এসব অনুষঙ্গের সঙ্গে অতীত, বর্তমান, শৈশব ও যৌবনের স্মৃতির আতশবাজির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বকালে পরিব্রাজন করেছেন। আ. ম.

একই সমতলে : শাহেদ আলী রচিত গ্রন্থগ্রন্থ। গন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে। প্রকাশক : সুরমা প্রকাশনী, ৪১ বি. কে. গাঙ্গুলি লেন, কায়েতটুলী, ঢাকা-১। মূল্য : ৩.৫০ টাকা মাত্র। গল্পগ্রন্থটির অবয়ব গড়ে উঠেছে ১০টি গল্পের সমন্বয়ে। গল্পসমূহ এরকম : 'সিতারা', 'দীন ব্রাদার্স', 'মহাকালের পাখনায়', 'বন্যা', 'অহেতুক', 'কান্না', 'বমি', 'মা', 'পুতুল' এবং 'একই সমতলে'। 'সিতারা' গল্পে নারী জ্ঞানমহিমায় উদ্ভাসিত। এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন নারী শুধু গার্হস্থ্য কর্মে নয়, জ্ঞান-বুদ্ধিতেও পারদর্শী। 'মা' গল্পে দেখানো হয়েছে একজন প্রকৃত মায়ের কাছে পৃথিবীর যে কোনো সন্তান মানসিক আশ্রয় পেতে পারে। সন্তানের জন্য মায়ের কি অপরিসীম উদ্বেল আকুলতা। গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'একই সমতলে'। এই গল্পে দেখা গেছে গরুর বাছুরকে গরুর দুধ খেতে দেয়া হচ্ছে না। অথচ মানব শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। গল্পের জৈগুন আট বছর বয়স হতে বাবাকে গাইয়ের দুধ দোহাতে সহায়তা করে। সময়ের ব্যবধানে জৈগুন নিজে মা হয়েছে। একদিন সকালে সে ছেলে কোলে বারান্দায় বসে আছে। এমন সময় তার বাবা এবং ছোট ভাই গরুর দুধ দোহাতে বসেছে। এ সময়ে জৈগুনের ছেলে মায়ের দুধ খেতে শুরু করেছে। তার মনে হলো মায়ের দুধ যদি সন্তানের জন্য হয়, তবে গরুর দুধ বাছুর কেন খেতে পারবে না। জৈগুন বাছুরটিকে ছেড়ে দিতে বলে। শাহেদ আলীর বিভিন্ন গল্পে মানব মনের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে বহুমাত্রিকতা। সৈ. আ. জা.

www.pathagar.com

একক সন্ধ্যায় বসন্ত : সৈয়দ আলী আহসান। প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৯। প্রচ্ছদ : কামরুল হাসান। মূল্য : দুই টাকা। সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের খ্যাতিমান বর্ষীয়ান আধুনিক কবিদের অন্যতম। 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' নামে কোনো কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে নেই, তবে অধিকাংশ কবিতাই প্রেম-ভালোবাসার অনুষঙ্গ প্রকাশ করেছে। সে প্রেম-ভালোবাসা শুধু যে মানব-মানবী কেন্দ্রিক তা নয় ; দেশ, প্রকৃতি, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বিষয়ও রয়েছে। 'আধুনিক ফরাসী থেকে' শিরোনামে তিনটি কবিতাও এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবির কণ্ঠ কখনও উচ্চকিত নয় ; উপমা-উৎপ্রেক্ষায় দ্যুতিময় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে মোট ৩৩টি কবিতা। র. হা.

এক চক্ষু হরিণ : আল মাহমুদ রচিত কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে। প্রকাশক : শিল্পতরু প্রকাশনী, সোনার গাঁও রোড, ঢাকা। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিবনাথ বিশ্বাস। মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র। কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ২৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দূরদৃষ্টি'। এই কবিতায় কবি মানুষের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। মানুষ নিজের শরীরের সম্পূর্ণ অংশই নিজে দেখতে পায় না। এই 'দেখতে না পাওয়া' কবি প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'মীনার প্রান্তরে ইয়াসির আরাফাত' কবিতা রাষ্ট্রবিহীন একজন মহান রাষ্ট্রনেতার সংগ্রামী সময় কিভাবে অতিবাহিত হয়, তা বিবৃত হয়েছে। ইয়াসির আরাফাতকে এমন রাষ্ট্রনায়কদের সাথে কথা বলতে হয়, 'যাদের প্রত্যেকের সিংহাসনের পায়ার নীচে ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস বিস্ফোরক/বারুদের সুপোরি হয়ে গুটি বেধে আছে।' এই কাব্যগ্রন্থে কবি 'সুড়সুড়ির ছড়া' লিখেছেন ; লিখেছেন 'দিওয়ান : হাফিজের স্মরণে কবিতা ; আত্ম-সংহারের গান'ও রচনা করেছেন। 'আধুনিক কবিতা' এই কবিতায় একজন প্রশ্নকর্তা কবিকে 'আধুনিক কবিতা' প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন : কবি এর উত্তরে অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দিয়েছেন। এরপরও প্রশ্নকারী বিচলিত হয় নি। কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'এক চক্ষু হরিণ'। এই কবিতায় কবি মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে 'এক চক্ষু হরিণ' নামে অভিহিত করেছেন বলে মনে হয়। মানুষ তাঁর দুই চোখকে বন্ধ করতে পারে বটে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিকে কেমন করে রুখবে? সমগ্র কাব্যগ্রন্থে কবি গল্প বলার ভঙ্গিতে বিভিন্ন বিষয়ে এবং আঙ্গিকে কবিতার পংক্তি রচনা করেছেন। সৈ. আ. জা.

একচল্লিশ নম্বর : বরিস লাভরেনিওভ রচিত রুশ দেশের তিনটি বড় গল্পের সংকলন। বাংলায় অনুবাদ করেন ননী ভৌমিক। গল্পগুলোর নাম—'একচল্লিশ নম্বর', 'সোজা কথা' ও 'জলদি চালান'। একচল্লিশ নম্বর গল্পটিকে বলা হয় রোমান্টিক গাথা, চরিত্রগুলো বলিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ, প্লট অসাধারণ এবং বিয়োগান্তক। সাধারণ জেলে মেয়ে মারিউৎকা এবং তার শত্রু, তার হেফাজতে বন্দি ও প্রণয়াস্পদ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক অফিসার, দু'জনেই তরুণ প্রাণবান, শুধু একজনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে নতুন মানবিক সম্পর্কের জন্য বিপ্লবী জনগণের ঐকান্তিকতা, লোভ ও স্বার্থপরতার ঠাঁই নেই তাতে, অন্যজন ব্যক্তিগত সুখের সংকীর্ণ চেতনায় আচ্ছন্ন। দু'জনেই অস্ত্র হাতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে নিজ নিজ সমর্থনে প্রস্তুত। 'সোজা কথা'র নাটকীয় প্লট পাঠকের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়, আগ্রহী হয়ে ওঠে চিত্র-প্রযোজকেরা। দ্রুত পরিবর্তিত আশ্চর্য সব ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে নবীন সাহিত্যিক বরিস লাভ্‌রেনিওভ সে সময়কার সাহিত্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সব সমস্যার সমাধান দিতে চেয়েছেন। 'জলদি চালান' গল্পটি লেখকের অন্যান্য রচনার চেয়ে সরলতর, পুরনো রুশ সাহিত্যের বাস্তববাদী মানবিক ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে, ফুটে উঠেছে বিগতের নৈতিক নিষ্ঠুরতা। ছুঁচো নামের এগারো বছর বয়সের বালকের ভয়াবহ

www.pathagar.com

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন মালিক ও তার কর্মচারীদের কাছে মানবজীবনের দাম কত সামান্য। লাভরেনিওভের জন্ম ১৮৯১, মৃত্যু ১৯৫৯ সালে। তাঁর এই তিনটি গল্প চিরায়ত রুশ সাহিত্য বলে পরিচিত। এগুলো লেখেন বিশের দশকে, গৃহযুদ্ধের স্মৃতি তখনও খুবই তাজা, লেখকের কর্তব্যবোধ ও বিবেকের কাছে বিপ্লবের বীর্যোদ্দীপনার আবেদন ছিল সরাসরি। যুগের ডাকে সবেগে সাড়া দেন সাহিত্যিক বরিস লাভরেনিওভ। বহু চমৎকার রচনার স্রষ্টা, একাধিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজেতা বরিস লাভ্‌রেনিওভের নাম বর্তমানে রুশ সাহিত্যের প্রথিতযশাদের অন্যতম। প্রকাশক : প্রগতি প্রকাশন, মস্কো। সাল ও দাম লেখা নেই। বি. ব.

এক ঝাঁক পায়রা : মনিরউদ্দীন ইউসুফের লেখা কাব্য। কাব্যটিতে মোট ২৫টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৮৮ (কালান্তর প্রকাশনী)। কবিতাগুলো ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত। বিভিন্ন সময়ে রচিত হলেও কবিতাগুলোর আঙ্গিক ও বিষয় মোটামুটি অভিন্ন। কিছু কবিতা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এবং অন্যগুলো অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মাত্র কয়েকটি কবিতা ফারসি রুবাইয়ের অনুকরণে লেখা, লেখক যার নাম দিয়েছেন চতুষ্পঙ্‌ক্তি-মালা, শুধু এগুলোতেই রুবাইয়ের মতো ‘ককখক’ ধরনের মিল চোখে পড়ে। বিচিত্র বিষয় অনুপ্রাণিত করে কবিকে। তার মধ্যে সেমিটিক, গ্রিক, এমনকি ভারতবর্ষীয় পুরাণ স্থান পায়। এছাড়া কাব্যটিতে সমকালীন পৃথিবীর নানা প্রান্তে সংঘটিত বহু ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে। যাবতীয় ঘটনাকে মুক্ত, উদার ও মানববাদী দৃষ্টিতে কবি গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর কাছে মানব-সভ্যতার উত্তরাধিকার। ‘পর্যায়ক্রমে খসছে’ শিরোনামের কবিতাটি এ কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা। এখানে মানব-সভ্যতার পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিবন্ধকতাহীন মিলনের আশাবাদও কবিতাটির মধ্যে অনুরণিত হয়। তাঁর অন্যান্য রচনার মতো এটিতেও রোমান্টিকতা ও যুক্তিবাদের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। স্ব. স.

একটি অচল আনি : নাজমুল আলমের প্রথম গল্পগ্রন্থ। মূল্য তিন টাকা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫। প্রকাশক : পূরবী পাবলিশার্স, ৭ আহসান উল্লাহ রোড, ঢাকা-২। প্রথম প্রকাশ ১৪ আগস্ট ১৯৬৬। প্রচ্ছদ : এস. এম. আনসার আলী। ‘একটি অচল আনি’ গ্রন্থে গল্পের সংখ্যা চৌদ্দটি। গল্পগুলো যথাক্রমে একটি অচল আনি, ক্ষণমুহূর্ত, পেন্সিল, তাবিজ, ধুপিপিঠে, ঊর্নায়ু, দান, প্রতিচ্ছবি, ম্লান জ্যোৎস্নায়, নিরুক্ত, আগুন, ক্ষুধা, মল্লার ও অব্যয়। নাজমুল আলমের অধিকাংশ গল্পই ঈশপের গল্পের মতো। অর্থাৎ গোচরে বা অগোচরে হিতোপদেশমূলক বিষয়টি থাকে। আর গল্পের ভেতরে হিতোপদেশ ভাষার আবরণে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এ গ্রন্থের প্রথম ও নাম গল্পটিতে এর ওরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষিত ভদ্রসমাজ কত সহজে প্রতারণা করে বসে। অথচ যাদের মাঝে শিক্ষার আলো নেই, বিবেকই তাদের প্রধান শিক্ষক। মুনিয়াকে প্রতারিত করার পর কথকও বিবেকের আগুনে দগ্ধ হন। বিবেক দংশনে যে বিষের নীল উদগীরণ হয় তা সহ্য করা কঠিন। ফলে কথক নিজের কাছেই বারংবার অনুতপ্ত হয়েছেন। আর প্রবৃত্তি দমন করতে পারার নামই সংযম। ‘ক্ষণমুহূর্ত’ গল্পে লেখক রিয়েলিষ্টিক। এ গল্পটি বাস্তববোধের দৃষ্টান্ত। সময়কে কিছুতেই আটকানো যায় না। সময় দৌড়ায় লাগামহীন অশ্বের মতো। মানুষ এখানে অক্ষম। সবই মুছে যায় শুধু কিছু স্মৃতি জমা থাকে যাদুকর সময়ের আশ্চর্য থলেতে। ‘পেন্সিল’ গল্পে পরাবাস্তবতা কতোটা গ্রহণযোগ্য তাই যেন বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চান্দু ছেলেটি আগেভাগেই বিপদের আভাস

www.pathagar.com

পায়। অথচ নিজেই কী না একদিন বিপদের মাঝে অবলীলায় ঝাঁপ দেয়। ফলাফল মৃত্যু। পরাবাস্তবতার সংশয়ের চেয়ে চান্দুর নীতিবোধই গল্পের গল্প হয়ে ওঠে। 'একটি অচল আনি'র শেষ গল্পের নাম 'অব্যয়'। একজন ডাক্তার যখন কসাই হয়ে ওঠে তখন মানব সেবার মহান ব্রত ধিকৃত হয়। অথচ তাতে এ সমাজের বুর্জোয়ারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং তারা মাথা উঁচু করে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি মার খাওয়াদের পাশে এসে দাঁড়াতে চাইলে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তাও আর হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ অর্থনৈতিক মুক্তি তাদের কোনো কালেই ঘটেনা। ফলে ধুকে ধুকে মৃত্যুই তাদের নিয়তি। 'একটি অচল আনির' অনুপম বিষয় বৈচিত্র্য প্রধান সম্পদ। লেখকের মুন্সিয়ানায় সমাজের দুষ্টক্ষতগুলো উন্মোচিত হয় বলে পাঠক ভাবতে বাধ্য হন। পা. র.

একটি উপন্যাসের সন্ধানে : সমালোচকের বিশ্লেষণে 'একটি উপন্যাসের সন্ধানে' সেলিনা হোসেনের নিরীক্ষা প্রবণতার তলায় তলায় আত্মার সত্যানুসন্ধানের এক ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার আধুনিক উপন্যাসের গোড়ায় সন-তারিখের উল্লেখ থাকে। এ গ্রন্থেও উত্তম পুরুষ কথক কাহিনীর শুরুতেই ঘোষণা দেন : ১৯৮৭ সালে 'দাঁড়কাক' নামে আমি একটি গল্প লিখি। গল্পের পটভূমি একজন মানুষের নিজের এক টুকরো জমি পাওয়ার স্বপ্ন। এই কথনের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যায় কথক আমাদের মানুষ, জমি ও স্বপ্নের সাতকাহন বলবেন। বইটি শেষ হয় এভাবে : পার্বত্য চট্টগ্রামে ও (লারা) যে রূপালি রঙের কানের রিংটি দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলো, বিধ্বস্ত উড়োজাহাজে পুড়ে যাওয়া ওর পার্সের এক কোণায় সে রিংটি পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে কথকের আত্মজা 'ও' অর্থাৎ লারার মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে লেখক ঐ এলাকার মানুষের স্বপ্ন ও জমির আকাঙ্ক্ষাকে চোখ ধাঁধানো বাস্তবতার মুখোমুখি করিয়ে দেন। মৃত্যুর পরেও রূপালি রঙের রিং পাওয়া যায়। এ কিসের ইঙ্গিত? 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।' রূপালি রঙ মানুষের মানবতার প্রতীক, চিরায়ত নান্দনিক বোধের সংকেত। আর বিধ্বস্ত উড়োজাহাজ যেটা মাটিতে পোড়ে না, পোড়ে আকাশে--এর পেছনে রয়েছে কথকের বাংলাদেশের বাস্তবতা অনুসন্ধানের পর তাঁর সিদ্ধান্ত। এই গ্রন্থের কাহিনী বিন্যাসে আছে : পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির পর সমগ্র পৃথিবীতে তার অভিঘাত ; কথক নিজে বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় ভ্রমণ করে গণমানুষের কথা জেনেছেন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় যে প্রায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণহীন বিশৃঙ্খলা চলছে তার ভেতরের কথা কথক ধরার চেষ্টা করেছেন। কথকের স্পষ্ট উচ্চারণ : লেখকই কেবল জানেন তিনি কী করে লিখবেন। একটি উপন্যাসের সন্ধানে বইটি বাংলাদেশের সাহিত্যে গুরুত্ব পাবে কারণ : এ গ্রন্থ উপন্যাস সম্পর্কে সমস্ত ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে জীবন উপন্যায়ের এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটিয়েছেন কথক। গৌ. ম.

একটি তুলসীগাছের কাহিনী : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এ গল্পটি 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে সংকলিত। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ গল্প। বাংলাদেশের এক অঞ্চলে পরিত্যক্ত একটি হিন্দু বাড়িতে ওঠে কলকাতা থেকে বিতাড়িত ক'জন বিপর্যস্ত মুসলমান উদ্বাস্তু। জন্মাবধি তারা সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করেছে কলকাতার ঘিঞ্জি মানবেতর পরিবেশে। দেশভাগের ফলে বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছে এদেশে। তেমনি সর্বস্ব ফেলে রেখে প্রাণটুকু সম্বল করে এদেশ থেকে পালিয়েছে বহু হিন্দু পরিবার। সেরকমই একটি পরিবারের এই পরিত্যক্ত খোলামেলা আবাস উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে বাঁচার আশায় উদ্দীপ্ত করে।

www.pathagar.com

এদের মধ্যে নতুন করে গেরস্থালি সাজিয়ে তোলার প্রবৃত্তি জাগে। নিজেদের বিপন্ন জীবন থেকে উত্তরণের স্বপ্নে তারা এতোটা মশগুল যে, বাড়িটি থেকে নিরুপায় চলে-যাওয়া মানুষগুলোর কথা তাদের মনে পড়ে না। আকস্মিকভাবে রান্নাঘরের পাশে মাটির চৌকোণ মঞ্চে বিবর্ণপ্রায় একটি তুলসিগাছ আবিষ্কার করে তারা। হিন্দু গেরস্থালির এই অপরিহার্য উপকরণটি তাদের ঘুমন্ত মানবিকতাকে জাগিয়ে তোলে। অবচেতনেই তাদের মনে আসে এই তুলসীতলায় প্রতি সন্ধ্যায় যে গৃহকর্ত্রী প্রণাম করে প্রদীপ জ্বালাতো, তার কথা। সেই গৃহস্থ নারী, তার পরিবারের বর্তমান অজানা উদ্বাস্তু জীবনের প্রতি সহানুভূতি জন্মায়। ধর্মীয় সংস্কারে উদ্যত হয়েও তুলসীগাছটিকে তারা উপড়ে ফেলতে পারে না। বরং সকলের অজ্ঞাতে তাদেরই একজন গোপনে গাছটির যত্ন নেয়। গাছটি পরিচ্ছন্ন ও সতেজ হয়ে ওঠে। কিন্তু ক'দিন পরেই এদেশীয় সরকারের রিকুইজিশনে সর্বোচ্চ সাতদিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পায় তারা। উধাও হয়ে যায় সমস্ত ভবিষ্যত পরিকল্পনা। আবার তারা ঠাঁইহীন অনির্দেশ্য জীবনের কথা ভেবে শূন্যতায় নিমজ্জিত হয়। তুলসী গাছটিও আবার অযত্নে বিবর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। সেদিকে কারো নজর থাকে না। মানুষের নিজস্ব জীবন যখন বিপন্ন ও অর্থহীন, তখন তার পরিপার্শ্বের অনুষঙ্গসমূহও হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। দেখা যায়, দেশভাগের নির্মম পরিণতিতে সর্বস্বান্ত মানুষের মানবিক মূল্যবোধও পরিস্থিতির কাছে জিম্মি। এ গল্পে সহজ বিষয়ের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের এই গভীর সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। র. আ. ক.

একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা : আহমদ ছফা রচিত কাব্যগ্রন্থ। এর প্রকাশকাল : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭। প্রকাশক : দেওয়ান আবদুল কাদের, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী : বরুণ মজুমদার, মূল্য : ছয় টাকা। এই কাব্যগ্রন্থ রচনার পক্ষে গ্রন্থের শুরুতে কবি প্রেরণার উৎস বর্ণনা করেছেন। চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের 'নিসর্গ ও মানুষ' চিত্রাবলীর প্রদর্শনী আহমদ ছফা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখেছিলেন। এর মাসখানেক পরে স্বগ্রামের শৈশবের প্রবীণ বটগাছটি তাঁর বুকের ভেতরে শেকড় ছড়াতে থাকে। কিন্তু তিনি প্রবীণ তরুর সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার প্রত্যয়েই বিশ্বাসী ছিলেন। সেই সময়ে তিনি জার্মান কবি ভোলফগাঙ গ্যয়টের মহাকাব্য 'ফাউস্ট'-এর বাংলা অনুবাদ করছিলেন। এই অনুবাদের সময়েই 'একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থ রচনার প্রেরণা অর্জন করেন বলেই তিনি মনে করেন। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি একটি প্রবীণ বট গাছের কাছে তাঁর সকল সনির্বন্ধ কথা নিবেদন করেছেন। এই বট গাছের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির শৈশব, কৈশোরের উজ্জ্বল স্মৃতি। কাব্যগ্রন্থের শুরুতেই তিনি জটাধারী বৃদ্ধ বট গাছকে 'পিতামহ' বলে সম্বোধন করতেও দ্বিধা করেননি। কবির কাছে সৌম্য, সুন্দর প্রবীণ বট গাছকে মনে হয়েছে অনাদিকালের তাপসগুরু। তিনি সহস্র বিশেষণের অভিধায় তাঁর প্রিয় বট গাছকে বিশেষিত করেছেন। কাব্যগ্রন্থের শেষ চার পঙ্‌ক্তিতে কবি পিতামহ বটের কাছে বিনীত ভঙ্গিতে বর চেয়েছেন যাতে করে তিনি হাজার বছর এই বাংলার অবারিত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করতে পারেন। সৈ. আ. জা.

একটি সাদা গল্প : প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬) রচিত গল্পের আর্ট সম্পর্কিত গল্প। লেখকের 'আহুতি' (১৯১৯) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্প। গল্পের আর্ট সম্পর্কে আলোচনাই এ গল্পের মূল বক্তব্য। 'সদানন্দের কথায়' গল্পের বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। বাস্তবতা-বিমুখ শ্যামলাল কেবল শুষ্ক পুঁথিচর্চাকেই জীবনের অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবজীবনের সংঘাত যখন তাঁর জীবনে

www.pathagar.com

বিড়ম্বিত অবস্থার সৃষ্টি করে, তখন জীবনের বাস্তবতার কাছে তাঁর হয় পরাজয়। প্রৌঢ় ক্ষেত্রপতির সঙ্গে ঘটনার চাপে তাঁর কন্যা শ্রীমতীর বিয়ে হয়। কিন্তু এই অসম বিয়েতে শ্যামলালের মন কিছুতেই সায় দেয় নি। সদানন্দের মতে জীবনের এই পরিণতি ট্র্যাজেডি কি কমেডি তা নিরূপণ করা অসম্ভব। আসলে জীবনের ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডি আর কমেডি পরস্পর বিভাজ্য নয়। কমেডির মধ্যেই ট্র্যাজেডির বীজ লুকিয়ে থাকে। এ দুটি ভাবকে স্বতন্ত্রভাবে দেখাও ঠিক নয়। ছোটগল্পের পরিমিতিবোধ ও ইঙ্গিতময়তা সম্পর্কেও এ গল্পে মন্তব্য আছে। শ্রীমতীর সঙ্গে প্রৌঢ় ক্ষেত্রপতির বিয়ে সম্পন্ন হলেও এই অসম বিয়ের পরিণতি কি, পাঠকের রসবোধের কাছে তা সমর্পণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রপতি যখন বিয়ের মন্ত্র আবৃত্তি করছিল, ঘটনার বক্তা সদানন্দ তখন নীরবে উঠে আসেন। ঘটনার পরবর্তী উপলব্ধি পাঠকের কাছেই ছেড়ে দেওয়া হয়। জীবনের এই অম্লমধুর পর্যালোচনায় যে একটি নির্মম কঠিন irony লক্ষ করা যায়, ছোটগল্পের ভাবব্যঞ্জনার দিক থেকে তা সার্থক। আ. ন. ম. ব. র.

এক টুকরো মেঘ : শহীদ সাবের রচিত গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থে রয়েছে দশটি ছোটগল্প। গ্রন্থভুক্ত প্রায় প্রতিটি গল্প অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত দোদুল্যমান মধ্যবিত্তের জীবন, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে রচিত। 'এক টুকরো মেঘ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৫৫ সালে। গল্পগুলো লেখা হয়েছে এরও আগে। বলাবাহুল্য তখন এদেশের কিছু প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখক ছোটগল্পের শিল্পোৎকর্ষ বিষয়ে যুগপৎ অনুশীলন ও নিরীক্ষারত ছিলেন মাত্র। শহীদ সাবেরও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ফলে সেই সময়ের একজন তরুণ লেখক শহীদ সাবেরের সব গল্প হয়তো গুণগত বিচারে অনবদ্য হয়ে ওঠেনি, তবে প্রতিটি গল্পে পরিব্যপ্ত হয়ে উঠেছে মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। সমাজ সচেতন পরিপক্ক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েও তাঁর কোনো কোনো গল্প রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। যেমন 'একটুকরো মেঘ' গল্প গ্রন্থের মানুষজন অল্প প্রাপ্তিতে মাত্রাতিরিক্ত উৎফুল্ল বোধ করে আবার ঠুনকো আঘাতে মুষড়ে পড়ে। তাঁর গল্পের পাত্র পাত্রীরা বেশ কষ্টসহিষ্ণু এবং সংবেদনশীলও বটে তবে ; কোনো অবস্থায় দ্রোহী নয়। যেমন 'বিষকন্যা' গল্পে জীবনের শুরুতে স্বামী পরিত্যক্ত মায়মুনা ক্রমে স্বাভাবিক জীবনাচরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে কেমন উদভ্রান্তের মতো হয়ে ওঠে এবং একদিন স্বামী ফিরে আসবে মনের ভেতরে এ স্বপ্ন পুষে রাখে। ছোট খাট ত্রুটির কথা বাদ দিলে 'বিষকন্যা' এই গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। অন্যান্য গল্পেও পাঠকমনকে আন্দোলিত করার যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গ্রন্থভুক্ত অন্য গল্প সমূহ হচ্ছে, এক টুকরো মেঘ, প্রাণের চেয়ে প্রিয়, জসুভাবীর জন্য, দেয়াল, যে গল্প কেউ বলেনি, যৌবন, চালচুলো, ছেলেটা, শেষ সংবাদ। 'এক টুকরো মেঘ' ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'শহীদ সাবের রচনাবলী'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শহীদ সাবের রচনাবলী সম্পাদনা করেছেন কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন। মূল্য : ষাট টাকা মাত্র। মা. আ.

একতা : বজলুর রহমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'একতা' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১ আগস্ট ১৯৭০ সালে। সম্পাদক কর্তৃক 'একতা' দি পপুলার প্রেস, ১-কে. পি. গুপ্ত লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ৩ কাজী আবদুল হামিদ লেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। এ সময় কাগজটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মতিউর রহমান। 'একতা' ১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যার প্রকাশ কাল ছিল ১২ মার্চ ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধের সময় পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে 'কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র' হিসাবে ১ম বর্ষ ৩৫ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৭ মার্চ ১৯৭২ সালে। ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩ অক্টোবর ১৯৭২ সালে। মা. আ.

www.pathagar.com

এক তারাতে কান্না : জিয়া হায়দারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বইটি প্রকাশিত হয় সপ্তক প্রকাশনী থেকে। প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭০। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। প্রথম কাব্যগ্রন্থে জিয়া হায়দার একটি স্বতন্ত্র কবি মানস ও কণ্ঠ ধারণ করেন। এই গ্রন্থে পৌরাণিক. মধ্যযুগের গাঁথা-কাহিনী, প্রেম, সামাজিক টানাপোড়েন, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগণের মানসিকতা নানা রেখায় চিত্রিত, বর্ণিত। আঞ্চলিক, মধ্যযুগীয় এবং কথ্য শব্দ ব্যবহারে তিনি স্বচ্ছন্দ। এই কাব্যগ্রন্থে অক্ষর বৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং প্রবহমান গদ্যছন্দ তিনি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় নাট্যিকগুণ লক্ষ করা যায়। র. হা.

একতাল : বার মাত্রায় গঠিত তালের নাম। তালাঙ্ক বিভাগে পার্থক্যের জন্য এক তালের কয়েকটি প্রকারভেদ আছে। এক তালের একটি রূপ প্রতি অঙ্গে দুই মাত্রা বিভাগ যুক্ত। মাত্রা বিন্যাস : ১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ | ১১ ১২। সম, ফাঁক, দ্বিতীয় তাল, ফাঁক, তৃতীয় তাল, চতুর্থ তাল--এই ক্রমে তালাঙ্কসমূহ বিন্যাসিত হয়। তবলায় বাদনীয় বিলম্বিত লয়ের বোল হচ্ছে :

১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ | ১১ ১২
ধিন ধিন | ধাগে তেরেকেটে | থুননা নানা | কৎ তা | ধাগে তেরেকেটে | ধিন নানা

। একতালের অপর রূপটি ত্রিমাত্রিক ছন্দে গঠিত হয়। এর তিনটি তালি ও একটি খালি। মাত্রা বিন্যাস : ১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ | ১০ ১১ ১২। সম, দ্বিতীয় তাল, ফাঁক তৃতীয় তাল—এই ক্রমে তালাঙ্ক সমূহ বিন্যাসিত হয়। তবলায় বাদনীয় অন্যতম বোল হচ্ছে :

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ | ১০ ১১ ১২
ধা ধিন ধা | ধাগে তিন না | কৎ তেটে ধিন | তেটে ধিন তেটে

। এক তালের তৃতীয় রূপটি চতুর্মাত্রিক। এর তালাঙ্ক সংখ্যা তিন। তিনটিই তালি। সম, দ্বিতীয় তাল, তৃতীয় তাল— এই ক্রমে তালাঙ্ক বিন্যাস ঘটে। বিলম্বিত লয়ে তবলায় বাদনীয় অন্যতম বোল হচ্ছে :

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২
ধিন ধিন ধা ধা | ধুন্ নানা কৎ তা | ধাগে তেরেকেটে ধিন ধাধা

। এই ছন্দে মধ্য ও দ্রুত লয়ে বাদনীয় বোল হচ্ছে :

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২
ধিন ধিন ধাগে তেটে | থুন না কৎ তা | ধাগে তেটে ধিন ধা

। ধ্রুপদ ও খেয়াল উভয় অঙ্গের গানেই একতাল প্রযুক্ত হয়। ক. গো.

একদা (১৯৩৯), অন্যদিন (১৯৫০), আর একদিন (১৯৫১) : গোপাল হালদার রচিত এই ট্রিলজি বা ত্রয়ী উপন্যাসের পটভূমি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র অমিত একজন কম্যুনিস্ট কর্মী, লেখকের ভাষায় intellectual communist ও আত্মনিবেদিত সাধক। উপন্যাস ত্রয়ীতে অমিতের জীবনের তিনটি পর্ব তিন দিনের ঘটনায় রূপায়িত হয়েছে, যার সময় পরিসর আট থেকে দশ বছর। 'একদা'-য় অমিতের আবির্ভাব ঘটে মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও স্বাধীনতার স্বপ্নে প্রণোদিত একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে। সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই সে বেশ সচেতন এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। সে বিশ্বাস করে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত সংগ্রাম। জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের বিপ্লবকে সে সমর্থন করে না। তবে তাদের ত্যাগকেও সে তুচ্ছ মনে করে নি। তাই সন্ত্রাসবাদী সুনীলের প্রতি তাকে সহানুভূতিশীল হতে দেখা যায়। 'একদা' পর্বেই অমিত ধীরে ধীরে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ছয় বছর কারাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে অমিত ফিরে আসে 'অন্যদিন'-এ। কোনো বিশেষ দলের সঙ্গে নিজেকে সে

www.pathagar.com

সম্পৃক্ত করেনি। কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা না করে কোনো মতবাদের কাছে সমর্পিত হতে চায়নি অমিত। তার কাছে 'দল' বা 'ইমেজ' বড় ব্যাপার নয়। রাজনীতিকে সে দায়িত্ব হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এ পর্বে সে একনিষ্ঠ সমাজকর্মীর দায়িত্ব পালন করে বন্যা ও দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের সেবার মধ্য দিয়ে। কাজ করে যায় মজুরদের জন্য। কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে গ্রন্থ প্রচার ও সম্পাদনার কাজেও তার নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের ফ্ল্যাটে পার্টির সভা হওয়ার অভিযোগে অমিত আবার ধরা পড়ে এবং তাকে জেলে যেতে হয়। এ ঘটনার পর থেকে শুরু হয় 'আর একদিন'-এর পর্ব। এই পর্বে দেখা যায়, কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবেই অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে অমিতেরও জেল হয়। ১৯৪৮ সালের নিরাপত্তা আইনের অধীনে শুরু হয় কম্যুনিস্ট কর্মীর বন্দিজীবন। 'অন্যদিন'-এ দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের স্বৈরাচারী শাসকদের দ্বারা অমিতরা নির্যাতিত হয়। 'আর একদিন'-এর কম্যুনিস্ট কর্মীরা স্বাধীন ভারতের সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হয়। কংগ্রেসের আন্দোলন যে ভারতের শেষ আন্দোলন ছিল না, এরপরও যে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত থাকে, সে বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'আর একদিন'-এর কম্যুনিস্টদের কণ্ঠে। গোপাল হালদার কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তাঁর নিজের রাজনৈতিক জীবনের এবং কারাবাসের অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে উপন্যাসে, বিশেষভাবে অমিত চরিত্রে। 'একদা-অন্যদিন-আর একদিন'-এ অমিতের সাফল্য ও সার্থকতা এটুকু যে, সে তার পরিবারের সদস্যদের নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করেছে। অনু, শ্যামল, মঞ্জু-তিনজনই অমিতের আদর্শ গ্রহণ করেছে। অমিতের অকালপ্রয়াত বোন সুরের মেয়ে মঞ্জু এ উপন্যাসে নারীমুক্তির প্রতীক। মঞ্জুর মা তার নিজের জীবনে যে কষ্ট, অপমান ও লাঞ্ছনা পেয়ে নিঃশেষ হয়েছে, তা মঞ্জুকে স্পর্শ করেছে গভীরভাবে। তাই সে আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনে যোগ দেয়। নারীমুক্তির বিষয়টিকে সে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখেছে। তার মতে, উভয়ের সংগ্রামই এক লক্ষ্যে পরিচালিত—শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি। শিল্পরীতির দিক থেকে এই ত্রয়ী উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য চেতনাপ্রবাহ রীতি প্রয়োগের প্রয়াস। একজন ব্যক্তির আত্মকথন ও অন্তর্মুখী ভাবনার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি যুগের রাজনৈতিক ঘটনা ও আবহ। স্মৃতির পর্দায় অমিত প্রত্যক্ষ করেছে একটি যুগের জীবনপ্রবাহকে। আত্মকথন রীতির জন্যই উপন্যাসে অমিতের সংগ্রামমুখর কর্মী রূপের চেয়েও অন্তর্মুখী চিন্তাভাবনা ও আত্মবিশ্লেষণ মুখ্য হয়ে ওঠে। মার্কসবাদী আদর্শ তার চিন্তায় যতটা স্পষ্ট, কর্মে ততটা প্রতিফলিত নয়। মূলত এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কম্যুনিস্টদের চারিত্রিক দ্বিধার কিছুটা প্রতিফলন প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যায় অমিতের মধ্যে। গোপাল হালদার এই ত্রয়ী উপন্যাসে কম্যুনিস্ট কর্মীর কারাবাসের যন্ত্রণা, তার রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আত্মগত ভাবনার ভিতর দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক আবর্ত, সমাজ ও দেশ সম্পর্কে তাদের ভাবনা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। ড.শা.আ.

একদা এক বসন্তে : শহীদ আখন্দ রচিত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৪। প্রকাশক : পালক পাবলিশার্স, ঢাকা। কাজী হাসান হাবিবের আঁকা প্রচ্ছদের ৯৭ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির দাম ২৩.০০ টাকা। উপন্যাসটির মর্মকথা এরকম—প্যারিসের পটভূমিতে লেখা এটি প্রেমের আখ্যান। কাহিনীর নায়ক মিলন কিছুদিনের জন্য প্যারিস গমন করে। সে বিবাহিত, স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখী সংসারী মানুষ। প্যারিসের খোলামেলা জীবনে

www.pathagar.com

কোনো ভিন্ন ধরনের চমকের জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। তবু তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় শরমিনের। এ দেখা হওয়াতে সুলভ সঙ্গতার নগরী প্যারিসে মিলন নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকে। স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল শরমিন, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই মিলনের সঙ্গে যখন তার দেখা হলো, তার মনে হলো, সামান্য এই বর্তমানটুকুই তার জীবন। তার কোনো অতীত ছিল না, নেই ভবিষ্যতের কোনো হাতছানি। জীবনে ধর্মের কাছে শ্রদ্ধাবনত না হয়ে তার উপায় থাকে না। ফরাসি প্রবীণা মাদাম কোলমঁ শরমিনকে বলেছিলেন, 'গির্জায় প্রার্থনা সভায় ধর্মকথা শোনার চেয়ে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতে বেশি ভাল লাগে কেন বলো ত! তোমার সঙ্গ আমাকে অফুরন্ত আনন্দ দান করে।' শরমিনের মনে হয়, তার দশাও মাদাম কোলমঁ-র মতো। তার যত আনন্দ হাসি গান সব মিলনের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। মিলন স্ত্রী রাবেয়াকে ভালবাসে, এ কথা সত্য। শরমিনকে সে ভালবাসে এ কথাও মিথ্যে নয়। দুটি ভালবাসার চরিত্র এক নয়, দুটি জীবনও এক নয়। তবু এর কোনটাই কোনো আরোপিত আবেগ নয়, কোনটাই হালকা তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময় হলো জীবনকাল। এই জীবনকালের ভিতরে আরও এক ফালি জীবনকাল রচিত হতে পারে কোনো ঘটনার জন্ম ও মৃত্যুর সীমার ভিতরে। জীবনের ভিতরে জীবন। ভালবাসার ভিতরে ভালবাসার কথা বলেছেন শহীদ আখন্দ তাঁর একদা এক বসন্তে উপন্যাসে। **শা. আ.**

একদা এবং অনন্ত : দিলারা হাশেমের উপন্যাস। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৭। মূল্য : ১২.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৩। প্রকাশনায় আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ৬০ পাটুয়াটুলী, ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মুদ্রণে এ্যাবকো প্রেস, ৬-৭ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা। নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনাচার নিয়ে উপন্যাসটি তিন পর্বে বিভক্ত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবক্ষয় কিভাবে মানুষের জীবনকে পর্যুদস্ত করে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লেখক দিয়েছেন। প্রেম, বাৎসল্য, সংস্কার, নীতি, ভালোবাসা, ত্যাগ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, কান্না, ভালোলাগার অনবদ্য উপাখ্যান হয়ে উঠেছে একদা এবং অনন্ত। অভাবের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে মানুষ হারিয়ে ফেলে নৈতিকতা। হারিয়ে ফেলে আভিজাত্যের গরিমা, পাপ পুণ্যের ব্যবধান। 'তবে কি সব ইচ্ছের কবর দেয়ার নামই ভালো থাকা?' লেখকের এ প্রশ্ন সকল মানুষের কাছে। 'আশার আরেক নামইতো আল্লা। আশা আর আশ্বাস নইলে কি নিয়ে বাঁচে মানুষ?' এই আশা নিয়ে বাঁচে উপন্যাসের নায়িকা সুর্মা। বাঁচে বিলু। জাহেদ। মা-বাবা সকলে। সুর্মার অন্তর্জগতের ভাবনাই পল্লবিত হয়ে উপন্যাসকে গতিশীল করে। রোগ, জরা, শোক, অপ্রাপ্তি, দুঃখ, বেদনাকে পাশ কাটিয়ে সুর্মা নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়। সন্তানের প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় বাবা অসৎ পথে পা রাখেন। শর্করাশূন্য হয়ে নানা ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। কাজের বুয়া কালুর মার সন্তান লাভ সুন্দর আগামীর ইঙ্গিতবহ। জীবনতো এমনই--নদীর মতন এক কূল ভাঙে তো অন্যকূলে জেগে ওঠে চর। চরের নতুন জীবনই সমস্ত বহমানতাকে ধারণ করে। ফুরিয়ে যাওয়ার মাঝে আশা-নিরাশার দোলাচলে মানুষেরা বেঁচে থাকে। জীবন যুদ্ধে জয়ী সুর্মা তাই মানুষের আশার প্রতিভূ। অবক্ষয়কে দুপায়ে দলে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। নতুন জীবনের হাতছানি তার বুকের মাঝখানে আবার স্বপ্নের ছবি আঁকে। **পা. র.**

একদা তুমি প্রিয়ে : বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) রচিত প্রেম সম্পর্কিত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৩ সাল। একদা পলাশ ও রেবার মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তারই স্মৃতি ধরে উভয়ের মনে এক জটিল

সমস্যার সৃষ্টি হয়। রেবা নতুনভাবে প্রেমের অভিষেক করতে চায়, কিন্তু পলাশ বুঝতে পারে নতুন করে বিগত প্রেমের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। উভয়ের পুনর্মিলনে তাই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। পূর্বস্মৃতির রোমান্টিক পথটি অনুসরণ করে মৃত প্রেমকে জীবন দান করা যায় না। মিথ্যে ভাবাবেগ থেকে বিরত থাকতে পলাশ তাই দৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু রেবা পূর্ব স্মৃতির ভারে আক্রান্ত। তার নারীহৃদয় ভাবাবেগে ব্যাকুল। পলাশের নিষ্ঠুর বাস্তবপ্রিয়তায় রেবা তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মনের পরস্পর বিরোধী সংঘাতের অবসান ঘটে। পলাশ ও রেবা বুঝতে পারে স্মৃতির আবর্জনায় জীবনের নবীন বাসনাগুলো কলুষিত হতে পারে না। তবে পূর্ব প্রেমের রূপান্তর হয়। রেবা প্রণয়নী থেকে বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের দহনজ্বালা থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। রেবার কিশোরী ছাত্রী প্রতিমা পলাশ এবং রেবার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নিজের নবোদ্ভিন্ন প্রেমকে আবিষ্কার করে। অবশেষে এক রোমান্টিক প্রাকৃতিক পরিবেশে পলাশ ও প্রতিমার মধ্যে এক নতুন প্রেমের জন্মলাভ হয়। শুক্লপক্ষের প্রথম চাঁদ এই নবজাত প্রেমের উপর জ্যোতির তিলক পরিয়ে দেয়। কিন্তু পূর্বস্মৃতিজর্জর পলাশের হৃদয় এই নতুন প্রেমের আবির্ভাবকে সহ্য করতে পারলো না। সে প্রতিমার প্রেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আত্মরক্ষা করে নতুন সমস্যা থেকে মুক্তি পায়। আ. ন. ম. ব. র

একদা নিশীথকালে : মনোজ বসু রচিত দাম্পত্য প্রেমের মিলন মধুর গল্প। 'একদা নিশীথকালে' (১৯৪২) নামক গল্পগ্রন্থের নাম-গল্প। গল্পের বিষয়বস্তু রোমান্স ও রোমান্টিকতার ভাবমাধুর্যে উদ্ভাসিত। সদ্য বিবাহিত দম্পতির জীবনের প্রথম মধুঝরা দিনগুলোতে সাময়িক বিচ্ছেদ এনে যে একটি পরিহাস-নির্মল ভাবমণ্ডল গড়ে ওঠে তা গল্পের পরিণতিকে রোমান্টিক ও মিলনাত্মক করে তোলে। প্রণয়রাগ রঞ্জিত এ গল্পে হাস্যরসই সঞ্চারী ভাবের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। আ. ই

একদিন প্রতিদিন : কবি আতাউর রহমানের কবিতার বই। সাহিত্য মন্‌জিল, ঢাকা-১ থেকে এটি প্রকাশ করেছেন মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌। প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৬৫। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের জয়গান এ কাব্যের মৌল বিষয়। প্রকাশ ভঙ্গি উচ্চকিত নয়। একটি স্নিগ্ধ কোমল ভাব লক্ষ করা যায় কবিতা-গুলোর শরীরে। সহজ-সরল ভাষা, শব্দ ও উপমায় কবি তাঁর সমকাল ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনোপলব্ধির যে চিত্র এঁকেছেন কাব্যমূল্যের দিক থেকে তা উচ্চ পর্যায়ের। যেমন : 'জানি তুমি আজ আমার আকাশে দেখবে কাকের ছায়া/ দেখবে কেবল কুটির আমার মাকড়সা জালে ভরা।/সুখের রাজ্য লুটপাট ক'রে শান্তির ঝুঁটি ছিঁড়ে।/ জীবন আমার অট্টহাস্য, চৈত্রের পোড়া মাঠ।' কিন্তু কবিতাগুলো কোনো নির্দিষ্ট কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে নি। সময়কে অতিক্রম করে গেছে অনায়াসে। কাব্য গ্রন্থটিতে মোট ৪১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হলো : দিনপঞ্জি : যাত্রা শেষ যাত্রা শুরু, সিরাজদ্দৌলাকে, পুরাতন পৃথিবীতে, ডাক, ইশারা, একটি জীবন একটি মৃত্যু, রাত্রি, আমার দেশ, গ্রামের মাটি, বেশ আছি, উদ্বাস্তু, কনফেসান, অন্ধকার সিঁড়ি, একদিন প্রতিদিন ইত্যাদি। এছাড়া কবি ঋতু নিয়ে তিনটি অনবদ্য কবিতা রচনা করেছেন। ধূসর পায়ে পায়ে শীত চলে যাওয়ার মাঝে গ্রীষ্মকে, রোদে পোড়া আকাশটাকে সজল স্নেহে ছুঁয়ে যাওয়ার মাঝে বর্ষাকে এবং মেঘের কবল থেকে আকাশের মুক্তি খুঁজে পান শরৎকালে। কবিকে পথ ডাকে, গতিমান দ্বান্দ্বিক সময় ডাকে, ডাকে অস্বচ্ছ, জটিল বিষণ্ণ নীরব পৃথিবী। হতাশা আর অবক্ষয় তাঁর মনোজগতে

www.pathagar.com

ভিড় করলেও কবি তাঁর কাঙ্খিত গন্তব্য ঠিকই খুঁজে বের করেন। কারণ তিনি জানেন — 'সব মাটি সব ঋতু দেয় না ফসল।/ তবুও নিষ্ক্রিয় নয় দৃঢ়বাহু চাষী। /নিষ্ফলতার মাঠে নতুন মৌসুমে।' শা. আ.

এক ধরনের অংহকার : শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল : মাঘ ১৩৮১ বাংলা এবং জানুয়ারি ১৯৭৫ ইংরেজি। প্রকাশক : বইঘর ১১০-২৮৬ বিপণী বিতান, চট্টগ্রাম। মুদ্রণে : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। দাম : সাত টাকা। অন্তর্ভুক্ত কবিতা-গুলির রচনাকাল : ১৯৭৪। উৎসর্গ : আবু সয়ীদ আইয়ুব শ্রদ্ধাস্পদেষু। সংকলিত ৫২টি কবিতার মধ্য দিয়ে বইটিতে যেন সমাহৃত হয়েছে শামসুর রাহমানের কবিসত্তার বৈচিত্র্য। প্রেম ও কাম,নিসর্গ-প্রকৃতি, আশা-নিরাশার দ্বৈরথে বিদীর্ণ আত্মবিশ্লেষণ, শৈশব ও বাল্য, যৌবন ও বাৎসল্য প্রভৃতি হাত ধরাধরি করে আছে এখানে। প্রত্যাশিত জীবনের পথে যাবতীয় প্রতিকূলতার মুখোমুখি বিষাদাক্রান্ত মানুষের সংগ্রামশীলতার অহংকারে এ কাব্যগ্রন্থ দীপ্র। বিষয়বৈচিত্র্যের মতো ছন্দোবৈচিত্র্যেও বইটি ঋদ্ধ। দীর্ঘতাপ্রবণ কবিতার পাশাপাশি সংহত সনেটের উপস্থিতি শামসুর রাহমানের কবিস্বভাবের বৈপরীত্যকে বাঙ্ময় করে। আ. মা.

এক পয়সার বাঁশী : কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত কিশোর উপযোগী কবিতার বই। প্রকাশক : শেখ মনিরুদ্দীন এন্ড কোং, ৩/১ বাংলা বাজার, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৫৮। বইটিতে মোট ১৭টি সচিত্র কবিতা সংকলিত হয়েছে। জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় মাটি ও মানুষের প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে কোনো জটিলতা নেই, ভনিতা নেই--নেই কোনো লুকোছাপা। ফলে কবিতাগুলো সহজেই শিশু-কিশোরদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। পল্লীর ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর মানুষের জীবন-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'এক পয়সার বাঁশীতে। তবে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টির প্রয়াস নেই এতে। কবির দৃষ্টিতে সবাই সমান। 'খোসমানী' ও 'আসমানী' কবিতায় তার সাক্ষ্য মেলে 'সেথায় আছে খোসমালী সে সোনার বরণ গা,/ বিজলী-বরণ হাত দুখানি আলতা-পরা পা।/ সন্ধ্যাবেলা যখন এসে দাঁড়ায় প্রদীপ করে'।/হাজার তারা ফুটে ওঠে নীল আকাশের পরে'। পরক্ষণেই কবির দরদ পরিলক্ষিত হয় 'আসমানী' কবিতায় : 'আসমানীদের দেখতে যদি তোমরা সবে চাও, /রহিমদ্দির ছোট্টবাড়ী/রসুল পুরে যাও। /বাড়ী ত নয় পাখীর বাসা/ভেন্না পাতার ছানি'/একটু খানি বৃষ্টি হলেই/গড়িয়ে পড়ে পানি।/একটু খানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে,/ তারি তলে আসমানীরা থাকে বছর ভ'রে.../খোসমানী আর আসমানী যে রয় দুইটি দেশে'/কওত যাদু, কারে নেবে অধিক ভালবেসে?' গ্রামের মানুষের সহজ সরল জীবনের নিখুঁত চিত্র তাঁর প্রতিটি কবিতায় বিদ্যমান। কবি আবহমান বাংলার যে ছবি তাঁর কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন তা পাঠকের হৃদয়কে নিয়ত আন্দোলিত করে। শহরের যান্ত্রিক জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আস্বাদ রয়েছে 'এক পয়সার বাঁশী'তে। শা. আ.

একবচন : যে শব্দে একটি মাত্র সংখ্যার ধারণা জন্মায় তাকে এক বচন বলে। যেমন— বালকটি গাছ থেকে পড়ে গেল। একবচন চেনার কতগুলো উপায় আছে। 'এক' নামক সংখ্যাবাচক বিশেষণটি এবং 'টি, টা, খানা' ইত্যাদি প্রত্যয় দ্বারা একবচনের নির্দিষ্টতা প্রকাশ পায়। শি. প্র. লা.

এক বছরের গল্প : লীলা মজুমদারের স্মৃতিচারণমূলক রচনা। প্রকাশ করেছে শিশু সাহিত্য বিতান, ৮ কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, চট্টগ্রাম। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬। মূল্য ২৫.০০। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই বই। বইয়ের লেখক বলছেন তাঁর চার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন নি। এমনকি তাঁর ছবিও দেখেন নি। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার

www.pathagar.com

এই য রবীন্দ্রনাথের বই পড়ার আগেই তিনি 'খেয়া' বইটির পৃষ্ঠা ছিঁড়ে আচার রাখেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রথম দেখেন শিলিংয়ে বনের ছায়ায়। ক্লাসের বন্ধুদের কাছে 'ট্যাগো'র শব্দটি প্রথম শোনেন।--এমনি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানা হতে থাকে তাঁর। ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেন একজন বড় মানুষকে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করার সময় তাঁকে দেখেছেন আরো কাছ থেকে। চমৎকার বর্ণনায় তিনি যেন পাঠককে নিয়ে যান এক ছবির জগতে। যারা রবীন্দ্র-নাথকে দেখেননি তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই অপরূপ ছবি। লেখকের অসাধারণ গদ্যে বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের গভীর ও মহৎ মৃত্যুর দিনের কথা। এমনভাবে সে কথা তুলে ধরেছেন যে, বাইশে শ্রাবণ ভিজিয়ে দেয় চোখ। সে. হো.

এক মহিলার ছবি : সৈয়দ শামসুল হক রচিত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এতে নারী হৃদয়ের বিচিত্র গতিবিধি রূপায়িত হয়েছে। বিয়ের পর নাসিমা স্বামীকে সরল মনে বলেছিল যে, সে একজনকে ভালবাসতো। স্বামী ব্যাপারটি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। একদিন সে স্ত্রীকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। নাসিমা স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। নাসিমার সমস্ত অন্তর জুড়ে নেমে আসে ব্যর্থতা ও আবিলতা। উপন্যাসটির সমগ্র পরিসরে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই উপন্যাসটি ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নূ. ই

এক মুঠো : অমিয় চক্রবর্তী রচিত কাব্য। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯ সাল। দৃশ্যমান জগতের নানা বিষয়কে কবি 'এক মুঠো'র বিভিন্ন কবিতায় রূপ দিয়েছেন। বিশ শতকের বিজ্ঞানের যুগে ব্যবহারিক জীবনে যেমন জটিলতা বাড়ছে, মানুষের মনেও তেমনি চিন্তার জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। যুগবৈশিষ্ট্যকে বোঝানোর জন্য কবি মানুষের মনের বিচিত্র ভাবনাকেও যুগধর্মের পাশাপাশি রেখে প্রকাশ করেছেন। যুগধর্মের উপস্থাপনায় কবি আপাত অসংলগ্ন শব্দ ও বাক্যাংশ প্রয়োগ করেছেন ; যেমন, — যুদ্ধের নৈরাজ্যকে বোঝাতে গিয়ে কবি লিখেছেন--'... গোয়েরিং ফরাসি পল্টন/ গঙ্গাফড়িং বড়ো বাজার/ হাতির পা, ধর্মযাজক, উত্যক্ত বৃদ্ধ, ওয়ারশ, বর্ণর্ডশ/বর্মার হাজার/ চুরোট, খুন, প্রহ্লাদ, জহ্লাদ, চাকরির দ্বন্দ্ব, হিন্দু, মুসলিম/ নির্বিকল্প সামাধি, ব্যাধি/ ইত্যাদি হরেক প্রকার। এক মোড়কে।' (যুদ্ধের খবর)। যুদ্ধের নৈরাজ্যের নানা ছবি মানুষের মনে চিন্তার একটি মাত্র মোড়কে স্থান পেয়েছে। আসলে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় আন্তর্জাতিকতার চেতনায় যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য খুব উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। তিনি টুকরো শব্দ ও বাক্যের মালা গেঁথে খুব সহজেই যুগের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতায় বিষয়ের খুব কষ্টপ্রয়োগ নেই। ব্যবহারিক জীবনের যে কোনো বিষয়কে তিনি তত্ত্বের আলোকে বিচার করেও অতি সহজে রূপ দিয়েছেন ; যেমন—'সবজিমণ্ডীর হিজিবিজি ভিড়ের লোক, ডুব ডুব/ বাজায়, কেউ হাঁকে মূলো, শর্ষে ঝাঁকায়,/একার ঘণ্টা, হুড়মুড়ে চাকায়, ডুব।/ মাছি ধূলো. ছেঁড়া খানিক দাড়ি চুলে/ তালি-দেওয়া সালওয়ার চটা কামিজে ডুব ডুব' (সঙ্গৎ)। বহির্জগতের বিচিত্র দৃশ্যপট কবির মনের গভীরে আবেদন সৃষ্টি করে। প্রবাস-যাত্রায়ও অন্তরঙ্গ পরিবেশ তাঁর মনের কোণে ভেসে ওঠে,—'ডুবন্ত মনে ছবির পরে ছবি/মৃন্ময়ী বাড়ি গোলকচাঁপা গোড়া বাঁধানো' (উড়ন্ত)। অমিয় চক্রবর্তী মূলত পরিবেশ-সচেতন কবি। 'এক মুঠো'র কবিতাগুচ্ছ তাঁর সেই শিল্পীমানসকেই সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। আ. ই

এক যে ছিল নেংটি : এখলাস উদ্দিন আহমদের শিশুতোষ উপন্যাস। মূল্য : তিন টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০৩। প্রকাশক : সৈয়দ মোহাম্মদ শফী, ফিরিঙ্গি বাজার রোড, চট্টগ্রাম। মুদ্রণে আর্ট প্রেস, ফিরিঙ্গি বাজার

www.pathagar.com

রোড, চট্টগ্রাম। প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান। প্রচ্ছদ সাবলীল, ঝরঝরে ভাষার এই উপন্যাসটি শিশু সাহিত্যিক এখলাস উদ্দিন আহমদের বিশিষ্ট সৃষ্টি। এতে সর্বমোট চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে গ্রামে বাস করা এক নেংটি ইঁদুরকে নিয়ে যার নাম কুটুস কুটুস। অকারণেই একদিন কুটুস কুটুসের মন খারাপ হলো। সে আর কিছুতেই স্বস্তি পায় না। তখন এক ফুটফুটে শহুরে পাখি তাকে উপদেশ দিল 'হাওয়া বদলাও আর মুখ বদলাও।' এই কথা শোনামাত্র কুটুস কুটুস চললো শহরের উদ্দেশ্যে। কাটলেট, মামলেটের লোভ তাড়া করে করে তাকে নানা পথ ঘুরিয়ে মারলো। অনেক প্রতিকূলতার পর অবশেষে সে পেল শহরের দেখা। কিন্তু শহরের প্রাণহীনতা, যান্ত্রিকতা তাকে আরো বেশি উদভ্রান্ত করে দিল। এই রকম দুঃসময়ে তাকে সঙ্গ দিল চৌকিদার ধেড়ে ইঁদুর। শহর দেখার অভিলাষের সমাপ্তি ঘটলেও নেংটি কুটুস কুটুস শহরের প্রতি টান অনুভব করলো না। শহর মানে তার কাছে 'ইটের পর ইট আর মাঝে মানুষকীট।' শহর মানেই ফেরেববাজি। কিসের যেন শূন্যতা—হাহাকার তাকে ফের আষ্টেপৃষ্টে বেধে ফেললো। এবং ধীরে ধীরে তার উপলব্ধি হলো সেই স্বাধীন শ্যামল গ্রাম শহরের চেয়ে ঢের ভালো। তখন সেই ফুটফুটে পাখিও তার বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে দেখা দিয়ে বললো—এই শহরে সেও বড় সুখে নেই। পাখি তার ভুল স্বীকার করে বললো, অনর্থক বাড়িয়ে বানানো কথা বলার জন্য সে অনুতপ্ত। লেখক এই উপন্যাসে যে শিক্ষণীয় দিকের নির্দেশনা দিয়েছেন তা হলো--অন্যের কথা শুনে তা বিবেচনা না করে বিশ্বাস করা অনুচিত। উপন্যাসের শেষে তাই দেখা যায়, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত আর প্রতিকূলতায় জর্জরিত নেংটি কুটুস কুটুস এই সত্য উপলব্ধি করেছে। এবং অবশেষে সে তার প্রিয় গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গী সাথী নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। **পা. র**

একরামুদ্দীন : সাহিত্যিক। জন্ম ১৮৭২ সালে, বর্ধমান জেলার কুলিয়া গ্রামে। পিতা মাহতাবউদ্দীন আহমদ ছিলেন কুলিয়া গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার। একরামুদ্দীন বর্ধমান স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন। হুগলী কলেজে বি. এ. অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৬ সালে সরকারি জরিপ বিভাগে কানুনগো পদে নিযুক্তি লাভ করেন। পরে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। ১৯২৭ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর বীরভূম জেলার কয়থা গ্রামে শ্বশুরালয়ে স্থায়ীভাবে বাস করেন। সাহিত্যসমালোচক ও কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলিম রবীন্দ্র-সমালোচকদের তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' (১৯১৪) একটি বহুল আলোচিত সমালোচনামূলক গ্রন্থ। এতে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' (১৯৯০) নাটকের ভাব, ঘটনা ও চরিত্রের স্বচ্ছ, সরল ও নিপুণ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর 'কাঁচ ও মণি' (১৩৩৭) রোমান্টিক প্রেমের একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : সমালোচনা—রবীন্দ্র-প্রতিভা (১৩২১), কৃষ্ণকান্তের উইল-এ বঙ্কিমচন্দ্র (১৩৩৭) ; নাটক—অনধিকার প্রবেশ (১৯২২) ; উপন্যাস—কাচ ও মণি (১৩৩৭), নতুন মা। ব্যঙ্গকথা, গল্প এবং প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মৃত্যু. কয়থা, বীরভূম, ২০ নভেম্বর ১৯৪০। **নূ. ই**

একশৃঙ্গ নাটক বা ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্বজীবনী : কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন রচিত কাব্যনাট্য। নাটকের মুখবন্ধে লেখা আছে, 'প্রায় দুই মাস অতীত হইল, মদীয় সুহৃৎ রঘুবংশের অনুবাদক বৈদ্যকুল-তিলক সুকবি কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস এম. এ. বি. এল. মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমি এই একশৃঙ্গ বা ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত, যাহা তিনি স্বয়ং ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছিলেন, নাটক আকারে লিখিতে প্রবৃত্ত হই। শ্রীযুক্ত নবীন বাবুর সুললিত ইংরেজি পদ্যে অনূদিত Miracles of

www.pathagar.com

Buddha ও তদীয় অগ্রজ কল্যাণীয় রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই. মহাশয়ের প্রকাশিত মূল অবদান কল্পলতাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অবলম্বন। রায় বাহাদুর মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি শুনিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন।' কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্র 'অবদান কল্পলতা' নামক বৃহৎ বৌদ্ধগ্রন্থ ১০৮ টি পল্লবে সংস্কৃত পদ্যে লিখে গেছেন, তার মধ্যে একশৃঙ্গ উপন্যাস ৬৫তম পল্লব, ৮০টি শ্লোকে পূর্ণ। ১৮৯৭ সালে কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন একশৃঙ্গ নাটক রচনা করেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও কবি ছিলেন। তাঁর সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'রঘুবংশ' অনুবাদ করেছিলেন কবি নবীনচন্দ্র দাস। প্রথম প্রকাশ : ১৮৯৭ সাল। মুদ্রণ প্রেস : সনাতন প্রেস, চট্টগ্রাম। মূল্য : আট আনা। দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ১৯৯১, প্রকাশক : ভুঁইয়া ইকবাল, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। পৃষ্ঠা : চৌধুরী জহুরুল হকের ভূমিকাসহ ৭২। মূল্য : ৬০ টাকা। বি.ব.

একস্তম্ভ শিলা : ফরাসি কবি ও চিত্রশিল্পী আরি মিশোর রচনা সঙ্কলন। ভূমিকাসহ মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন, কবি-অনুবাদক লোকনাথ ভট্টাচার্য। মিশোর জন্ম ২৪ মে ১৮৯৯, মৃত্যু. ২১ অক্টোবর ১৯৮৪ সালে প্যারিসে। সারা জীবন দু'হাতে গদ্য ও কবিতা লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। জীবনের এক পর্যায়ে ছবিই তাঁর আয়ের উৎস হয়। আবার ফরাসি সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েও নিতে অস্বীকার করেছেন। সঙ্কলনের গল্পগুলোও কবিতাক্রান্ত, অথবা গদ্যের ভঙ্গিতে আসলে কবিতাই লিখেছেন। জন্ম বেলজিয়ামে হলেও নিজেকে ফরাসি ভাবতেন এবং পরে ফরাসি নাগরিকত্ব নেন। দু'বার জাহাজের খালাসি হয়ে যাত্রা করেন সমুদ্রে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং পত্রিকা পরিচালনা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ, ভারতে দু'বার এসেছেন, একবার ওক্তাভিও পাজের অতিথি হয়ে ভারতে আসেন। মিশরেও বাস করেন। দুটি সিনেমা তৈরি করেন। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। অজস্র গদ্য-পদ্য রচনা করেন। বইটি প্রকাশ করে সাহিত্য আকাদেমী, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১। প্রকাশকাল : ১৯৯১, পৃষ্ঠা : ১৬৩, মূল্য : ৪০ রুপি। বি. বি.

একা এবং কয়েকজন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪। তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮১। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। ভারতবর্ষের প্রায় তিন যুগের ঘটনাপ্রবাহ এ উপন্যাসের পটভূমি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত এখানকার সমাজ ও জনজীবনে যে উত্তাল ও বিপর্যস্ত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত 'একা এবং কয়েকজন'-এর কাহিনী। দেশ-কাল ও সামাজিক রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এতে। চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত জীবনবোধ, তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও পরিণতির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র কাহিনীতে। কাহিনীর ধারাবাহিকতায় কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে উপন্যাসে। জন্মসূত্রে মানুষ একা—এ কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বারবার গোষ্ঠীবদ্ধ হতে গিয়ে গোষ্ঠীকেই তারা ভাঙে। লেখকের এই জীবনদর্শন অভিব্যক্ত হয়েছে বিশাল আয়তনের উপন্যাসটিতে। বাদলের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর শুরু। তার শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিচারণের ভিতর থেকে উঠে আসে তার পরিবারের কয়েক পুরুষের ইতিহাস, ঠাকুর্দা সারদারঞ্জন, পিসেমশায় অমরনাথ ভাদুড়ী ও পূর্ণিমা পিসিমার ঘটনাবহুল জীবনের বিচিত্র অধ্যায়। এরই মধ্যে ফুটে উঠেছে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও অন্তঃসারশূন্য সামাজিক

www.pathagar.com

প্রথার নির্মম চিত্র। একদিকে সমাজের কূপমণ্ডুকতা, ব্রাহ্মণদের ফাঁকা দম্ভ আর অন্যদিকে নতুন কালের নবচেতনায় জাগ্রত তরুণদের সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাজের বিবর্তনের ধাপগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো রীতিনীতি বদলাতে থাকে। সমাজের ভিতর থেকে জেগে ওঠে বিপরীত ধারা। এই ধারার প্রতিভূ ছিল একসময় বিশ্বরঞ্জন, গঙ্গাধর, অমরনাথ এবং পরবর্তী প্রজন্মের সূর্য, বাদল আর তাদের সঙ্গীরা। কয়েকটি পরিবারের ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ প্রথার সমালোচনা, বিধবা বিবাহের সূচনা এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যার বর্ণনা। সামাজিক ইতিবৃত্তের পাশাপাশি রাজনীতি এ উপন্যাসের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এই প্রেক্ষাপটেই এতে স্থান পেয়েছে কংগ্রেসের আন্দোলন, গান্ধীর সত্যাগ্রহ, বিপ্লবী আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশভাগের পটভূমিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ প্রভৃতি প্রসঙ্গ এবং রাজনৈতিক চরিত্রসমূহ। স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীদের জীবন বাজি রেখে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার ঘটনাগুলি লেখকের বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিপ্লবীদের প্রিজন সেলের বন্দিজীবন, তাদের ওপর সরকারের চরম উৎপীড়ন এবং অসংখ্য বিপ্লবীর ফাঁসির ঘটনার বিবরণ ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়কে তুলে ধরে। অমরনাথ ভাদুড়ীর একমাত্র সন্তান সূর্যকুমার ভাদুড়ী প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক চরিত্র নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে জড়িয়ে যায় রাজনীতির সঙ্গে। বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তার জীবনের গতি বদলে যায়। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাকেও পলাতক জীবন ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়েও সে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে না। বন্দি জীবনের স্মৃতি, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও তাদের ওপর পুলিশের নির্যাতনের বীভৎস ঘটনা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মকাণ্ড তাকে আরও ক্ষুব্ধ করে। তার মধ্যে এ উপলব্ধি জাগে, যে স্বাধীনতার জন্য তার দলের কর্মীরা ইংরেজের নির্মম নির্যাতন সহ্য করে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, সত্যিকার অর্থে সেই স্বাধীনতা আসে নি। চারপাশের ঘটনা তাকে আরও হতাশ করে। অন্যদিকে রাজনীতির সূত্রে দীপ্তির সঙ্গে সূর্যের পরিচয়, অন্তরঙ্গতা এবং অবশেষে দীপ্তির প্রত্যাখ্যান তার জীবনকে চরমভাবে বিড়ম্বিত করে তোলে। পিতা অমরনাথের মতোই সূর্যও হয়ে পড়ে একাকী, বিচ্ছিন্ন। পিতার মৃত্যুর পর তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য সে মায়ের স্মৃতি বিজড়িত এলাহাবাদে ছুটে যায়, যেখানে তার মা বুলবুলের বাঈজি জীবন কেটেছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মায়ের কোনো স্মৃতিচিহ্ন সূর্য খুঁজে পেল না। তার বদলে পেল আরেক বাঈজি বুলবুলকে। তাকে আঁকড়ে ধরে সূর্য দীপ্তিকে ভুলবার চেষ্টা করে। কিন্তু বুলবুলের মৃত্যু তার শূন্যতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ছন্নছাড়ার মতো নানা জায়গায় ঘুরে আবার সে ফিরে আসে কলকাতায়। এবার তার অদ্ভুত আচরণ ও খাপছাড়া জীবনযাপন বাড়ির সবাইকে স্তম্ভিত করে। সবশেষে দীপ্তিকে পাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দীপ্তি তখন কংগ্রেসের মন্ত্রী শংকর বসুর স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত দীপ্তির জন্যই সূর্যকে প্রাণ দিতে হয়। অন্যদিকে বাদলের জীবনও বহু ঘটনার আবর্তে পড়ে ক্রমাগত বদলাতে থাকে। সেও এক বিচ্ছিন্ন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সবশেষে দার্জিলিংয়ে গিয়ে সে রেনুকে ফিরে পায়। ড. শা. আ.

একাত্তর আমার : মোহাম্মদ নুরুল কাদের। মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রকাশক সাহিত্য প্রকাশ : ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা–১০০০। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৯, ভাদ্র ১৪০৬। প্রচ্ছদপট : কাইয়ুম চৌধুরী, মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা। ১৯৭১ সালে গ্রন্থকার মোহাম্মদ নুরুল কাদের ছিলেন পাবনার জেলা প্রশাসক। পঁচিশে মার্চের

www.pathagar.com

পর বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের রাবার স্ট্যাম্প বানিয়ে পাবনায় মুক্তাঞ্চলীয় প্রশাসন শুরু করেন। পরে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে এবং প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের সংস্থাপন সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এই গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, সরকার গঠন, আনুষ্ঠানিক শপথ, প্রশাসনিক সরকার প্রতিষ্ঠাসহ মুজিবনগর সরকারের ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায় ধারাবাহিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হলে পাঠকসমাজ আগ্রহ নিয়ে পড়ে। দুইশত সাত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে পটভূমিকা, তিনটি পরিশিষ্টসহ বত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় আর্মি ক্র্যাকডাউন, পাবনায় অবাঙালি এডিসি, তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে আলোচনা, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার ঘোষণা, শপথ অনুষ্ঠান, প্রশাসনিক সরকার বিন্যাস, আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ, বাংলাদেশের প্রথম সরকারের বৈশিষ্ট্য, কলকাতায় ইন্দিরা গান্ধী, বিজয়ের দিন ও জীবনের স্বাদ পেয়েছি মাটির স্পর্শে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গ্রন্থটির একটি চমৎকার মুখবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুলেখন করেছেন মোস্তফা হোসেইন। উন্নতমানের কাগজে ছাপা, নয়নকাড়া প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর যোদ্ধাকে। **খা. বি. জ. উ.**

একাত্তরের ডায়েরী : সুফিয়া কামাল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত লিপিবদ্ধ কবির দিনলিপি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। প্রকাশক : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৫ লারমিনি স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা ১২০৩। ১০৫ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ৪০ টাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। কবি বইটি উৎসর্গ করেছেন একাত্তরের শহীদদের উদ্দেশে। ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'ভূমিকা নয়, রক্তে লেখা শোক।' মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস কবি নিজ বাড়ির বারান্দায় বসে কাঁথা সেলাই করতে করতে দেখেছেন পাকিস্তানি মিলিটারির পদচারণা। পাশের বাসায় ছিল মিলিটারির ঘাঁটি। রাস্তার মোড়ে, উল্টোদিকের বাসায় সবখানে মিলিটারির পাহারা ছিল। কবি বাসায় বসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন। পাকসরকারের পক্ষে কথা বলার জন্য জোর চাপ পেয়েও তা অগ্রাহ্য করেছেন সাহস ভরে। একাত্তরের নয়টি মাস কাটিয়েছেন বহু সংকট মাথায় নিয়ে। তাঁর মেয়েরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিংয়ের কাজ করেছে। তাদের জন্য দুশ্চিন্তার সময় ছিল না তাঁর। বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সার, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মুনীর চৌধুরীর নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন সবসময়। ডায়েরী লেখার চিরঅভ্যাস অব্যাহত রেখেছিলেন কবি একাত্তর সালের রক্তাক্ত দিনগুলোতেও। তাই তাঁর গদ্যে লেখা দিনপঞ্জি থেকে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের একটি জীবন্ত দলিল। কবির স্বহস্তে লেখা ডায়েরীটি মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রদর্শিত হচ্ছে। **মা. বে.**

একাত্তরের দিনগুলি : জাহানারা ইমাম। প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী, ৪১ নয়া পল্টন, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী কাইউম চৌধুরী। বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের এক অমূল্য সাহিত্য-দলিল। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যে দিনলিপি রেখেছিলেন, তা-ই পরবর্তী সময়ে 'একাত্তরের দিনগুলি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ এক ধ্রুপদী সাহিত্য মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর সন্তান শহীদ হয়েছে, সন্তানের শোকে স্বাধীনতা লাভের তিন দিন আগে স্বামী পরলোকগমন করেছেন, উপরন্তু যুদ্ধের শ্বাসরুদ্ধকর ও ভয়াবহকালের প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা তিনি এক আশ্চর্য সংযম নির্লিপ্ততায় বিবরণ দিয়ে গেছেন। কোথাও আবেগ নেই, নেই অতিকথন, অথচ এই বাকসংযম কোথাও কোথাও পাঠকের মনে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। সহজ সরল ভাষায় লিখিত 'একাত্তরের দিনগুলি' পাঠককে বার বার যুদ্ধ বছরের

www.pathagar.com

দিনগুলিতে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সংক্রান্ত আর কোনো বই এতো পাঠক-স্বীকৃতি লাভ করেনি। বইটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। র. হা.

একাত্তরের নয়মাস : রাবেয়া খাতুন। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসের স্মৃতিকথা। বইটির রচনাকাল ১৯৮৯-১৯৯১। প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯১। ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখক সংগ্রাম শিবিরের দ্বিতীয় বৈঠকে গৃহীত দীর্ঘ কর্মসূচির প্রথম মিছিল ১৬ মার্চ মঙ্গলবারের স্মৃতি নিয়ে শুরু হয়েছে বইটি। শেষ হয়েছে ২০ ডিসেম্বর বেতারে প্রচারিত ড্রাকুলা ইয়াহিয়ার পদত্যাগের খবর দিয়ে। পাকিস্তানের প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খানের দাবিও সেই খবরে জানা যায় যে, তিনি বলেছেন 'সকল কুখ্যাত যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হোক।' পাড়ার মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন ও হাসিবকে কারফিউ চলার সময় নির্মমভাবে হত্যা করে মাদারটেকের ডোবায় ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে সকলে মিলে কবর দিয়েছিল পাড়ার মাঠে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর, স্বাধীনতার পর লেখক রাবেয়া খাতুন সেই দু'জন শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার কবরে নিজের টবের গন্ধরাজ ফুল রেখে দিয়ে বলেছিলেন—'তোমাদের মতো ছেলেরা বারবার যেনো ফিরে আসে চির দুঃখিনী এই বাংলা মায়ের কোলে।' মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস রায়েবা খাতুন দেশের ভিতরেই ছিলেন, ঢাকা এবং পাশের গ্রামে। অংশ নিয়েছেন লেখকদের প্রতিরোধ মিছিলে, খবর সংগ্রহ করেছেন, পরিচিত জনদের খোঁজ নিয়েছেন, অবরুদ্ধ থেকেও অংশ নিয়েছেন নানা রকম প্রতিরোধে। সে সময়ের ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে হয়েছে, পাকসেনা-রাজাকারদের আক্রমণ কিভাবে হয়েছে, সাধারণ মানুষ কিভাবে নিজ নিজ বাড়িতে থেকে, পাড়ার সকলকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, কিভাবে একের পিছনে অন্যজন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন পরস্পর—সে সব কথা ইতিহাসের অনুল্লেখিত ও সাধারণ হয়েও অসাধারণ অজানা সব ঘটনা 'একাত্তরের নয়মাস'—বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বহু ছোটখাটো প্রতিরোধ, সংগ্রাম—যা অনন্য হয়ে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে। সে সময় ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ঘটে গেছে বড় বিপর্যয়। তাঁর স্বামী প্রতিশোধপরায়ণ পুরনো এক অবাঙালি পার্টনারের আর্থিক দাবির সংকটে পড়ে দেশ ত্যাগ করে চলে যান কাউকে না জানিয়ে। তখন একাত্তরের মে মাস। স্বামীর বন্ধুরা, রাবেয়া খাতুনেরও বন্ধুরা, তাঁকে বললেন 'বাস্তবকে বাস্তব অর্থে গ্রহণ করাই সবচেয় বুদ্ধিমানের কাজ। সংসারে তুমিই এখন কাণ্ডারি। উপার্জনের ভাবনা তোমাকেই চিন্তা করতে হবে। কাজ করতে হবে দিনরাত।' জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ও ব্যক্তিগত জীবনের যুদ্ধ এক হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ব্যক্তি তাঁর লেখায় অনন্য হয়ে উঠেছে। বাংলা একাডেমীর বটতলার সভায় ১৪ মার্চ ভাষণ দিয়েছিলেন খোন্দকার ইলিয়াস, দাদাভাই রোকুনজ্জামান, লায়লা সামাদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ। ১৬ মার্চ মিছিলে কবি সুফিয়া কামাল, মেহেরুন্নেসা, কাজী রোজী, রাবেয়া খাতুন, অন্য সকলের সাথে প্রতিরোধ-প্রতিবাদের শ্লোগান দিয়ে হেঁটেছেন। এই সংগ্রামের মধ্যেই এলো ২৫ মার্চ। মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড। রাজারবাগের গোলাগুলির শব্দ। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। এর মধ্যেই কারফিউ। প্রতিটি মাসের কথা লেখক লিখেছেন নিজের অংশগ্রহণের, উপলব্ধির, দেখার ও বোঝার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসও নয়, গল্পও নয় জীবন্ত বাস্তব জীবনের ঘটনাবহুল এই কাহিনী, তবুও হয়ে উঠেছে সাহিত্য। জীবন ও সাহিত্যের এমন সমন্বয় খুব কম বইয়ে পাওয়া যায়। আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইটি যুগের, সময়ের দাবি পূরণ করেছে। মা.বে.

www.pathagar.com

একাত্তরের যীশু : শাহরিয়ার কবির রচিত কিশোর গল্প। প্রকাশক : শিখা প্রকাশনী, ৬৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা, প্রকাশকাল : প্রথম শিখা সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : রফিকুন নবী। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। বইটি কিশোরদের উপযোগী পাঠকনন্দিত একটি গল্পগ্রন্থ। এই গল্প গ্রন্থটিতে রয়েছে মোট এগারোটি গল্প। গল্পগুলোর শিরোনাম, একাত্তরের যীশু, পিয়ানো ভূতের গল্প, পল গোমেজের বাবা, নতুন বছরের ছন্দ, দেয়াল, রাজুর পৃথিবী, জয়-পরাজয়, লাল সূর্য, বেনুর সুখদুঃখ। শহরে সকল সুখ এবং শয়তান এ একটি চারাগাছ। এই গ্রন্থটির প্রথম গল্পটিই একাত্তরের যীশু। এটি বহু আলোচিত এবং পঠিত। একাত্তরের যীশু প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায় আলফাতুন সম্পাদিত সাত ভাই চম্পায়। গ্রন্থভুক্ত হয় বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত একটি সংকলনে। আলাদাভাবে বইয়ে ছাপা হয় ১৯৮৫ সালে। ১৯৯১ সালে গল্পকার সিনেমার জন্য চিত্রনাট্য লেখার সময় গল্পটির নতুন কিছু ঘটনা যোগ করেন। নাসির উদ্দিন ইউসুফ-এর তৈরি একাত্তরের যীশু ছবিটি দেশে বিদেশে প্রচুর প্রশংসা কুড়ায়। মূল গল্পটির কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি গীর্জাকে কেন্দ্র করে। বিরাশি বছরের বুড়ো ডেসমণ্ড ও তিন মুক্তিযোদ্ধা এ গল্পটির কেন্দ্রবিন্দু। একাত্তরের বাস্তব ঘটনা এগল্পটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। গীর্জা ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল। বুড়ো তাদের সহায়তাকারী। তিন মুক্তিযোদ্ধা বুড়োর চোখে স্বর্গের দেবদূত। এক অপারেশনের পর ওরা নরপশু পাকিস্তনী সৈন্যদের হাতে বন্দি হয় এবং পাক সেনারা তাদের ক্রসবিদ্ধ করে হত্যা করে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি যোদ্ধাদের সাথে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গ্রন্থটি বাকি গল্পগুলোর কাহিনী ও বর্ণনা চমৎকার। প্রচ্ছদপট ও অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

খা .বি. জ. উ.

একাত্তরের রূপকথা : কাইজার চৌধুরী। শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ। প্রকাশক : প্রকাশ ভবন, ৬ প্যারিদাস রোড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৪, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : ধ্রুব এষ, মূল্য : চল্লিশ টাকা। বিশ শতকের একাত্তর সালটি বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল বছর। এবছর বাঙালি জাতির অভ্যুদয় ঘটে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। অর্থাৎ নরপশু পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সেই ঘটনা, সেই মহাযুদ্ধের কাহিনী এখন মনে হয় রূপকথা। বিশ্বাস করতেই মন চায়না আমরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু একাত্তর একটি জাতির বাস্তব সত্যের দৃষ্টান্ত। রূপকথা অলীক হলেও একাত্তরের রূপকথা কোনো দেওদানব বা লালপরী-নীলপরীর কিচ্ছা নয়। এদেশের মানুষ প্রিয় স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো—ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো সেই কাহিনীই এই গ্রন্থটিতে নানা ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন কাইজার চৌধুরী। গ্রন্থটি গল্পে হলেও তা একাত্তরের গল্প—সংগ্রাম, ত্যাগ সাহস আর দখলদার বাহিনীকে পরাজিত করার ঐতিহাসিক কাহিনী। এক কথায় বাঙালি জাতির ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা। গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে পাঁচটি গল্প। এগুলো হলো : মাঠ একাত্তর, নায়ক, সেই মানুষটা, তুচ্ছ ও একাত্তরের রূপকথা। গ্রন্থভুক্ত সবকটি গল্পেই একাত্তরের বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে সহজ-সরল ভাষায়। গল্প পড়ে ইতিহাসকেই জানা যাবে। জানা যাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল দিনগুলোর কথা। এটি একটি চমৎকার বই। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

খা. বি. জ. উ.

একাত্তরের স্মৃতি : বাসন্তী গুহঠাকুরতার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, ১৯৯১ (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ-বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, ১৬২ পৃষ্ঠার এ বইয়ে তা বিবৃত।

www.pathagar.com

একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে স্বামীর আহত হওয়া এবং পরে তাঁর চিকিৎসাহীন ও সৎকারহীন মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থের সূত্রপাত। নয় মাস পরে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সকালে, যখন ঘাতক আলবদর কর্তৃক অপহৃত ও নারকীয় নির্মমতায় নিহত শহীদ অধ্যাপকদের বিকৃত লাশের কফিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছায়, তার বর্ণনা দিয়েই গ্রন্থের সমাপ্তি। নিজের এবং একমাত্র আত্মজার নয় মাসব্যাপী বিড়ম্বিত যাযাবর জীবন বর্ণনার পাশাপাশি বইটিতে স্থান পেয়েছে তৎকালীন ঢাকার উৎপীড়িত, নির্যাতিত ও নিরুপায় মানুষের দুর্দশা, মৃত্যু আর মরণোত্তর লাঞ্ছনার সজল-করুণ কাহিনী। পাকিস্তানি ঘাতকদের হাতে খণ্ডিত বা উন্মূলিত বৃক্ষলতার কাহিনীও তাতে বাদ পড়ে নি। এমনকি বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে দেশদ্রোহী নরপিশাচদের নিহত ও নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাও লেখিকা সহমর্মিতার সঙ্গে উল্লেখ করেন। বিষাদ-বিধুর বর্ণনার মধ্যে ইতস্তত হিউমারের স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। তবে জীবন, প্রকৃতি ও স্বদেশের প্রতি ভালোবাসায় ভরা এ কাহিনীর মূল সুর যে বিষণ্নতা, তা কখনো ক্ষুণ্ন হয় না। একই কারণে বিজয়-দিবসের উল্লাস বা স্বাধীনতার আনন্দও এখানে স্বজন হারানোর বেদনায় ম্লান হয়ে যায়। উপস্থাপিত দুঃসময়ের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখিকা ইতিহাসের গভীরে কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চালান। ফলে পাকিস্তান শাসনামলের বিভিন্ন পর্যায়ে পাকিস্তানিদের বাঙালি-নিধন পরিকল্পনা তিনি আঁচ করতে পারেন। তবে পাকিস্তানিরা যে তাদের নীলনকশা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে পারেনি, এটাই লেখিকার একমাত্র স্বস্তি। 'র‍্যাডিক্যাল-যুক্তিবাদী-মানবপ্রেমী' স্বামী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার অন্তিম নির্দেশ অনুযায়ী রচিত বাসন্তী গুহঠাকুরতার এ স্মৃতিকথায় ইতিহাসের অনেক নির্মম সত্য সাহিত্যের সংবেদী শৈলীতে পরিবেশিত হয়েছে। প্রী. মি.

একাদশী : এগার মাত্রায় গঠিত তালের নাম। এই তালের তালাঙ্ক সংখ্যা চার। প্রথম তালাঙ্ক তিন মাত্রা, দ্বিতীয় তালাঙ্ক দুই মাত্রা, তৃতীয় তালাঙ্ক দুই মাত্রা ও চতুর্থ তালাঙ্ক চার মাত্রা যুক্ত। মাত্রা বিন্যাস দাঁড়ায় : ১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ৮ ৯ ১০ ১১। চারটিই তালি, কোনো খালি বা ফাঁক নেই। সম, দ্বিতীয় তাল, তৃতীয় তাল, চতুর্থ তাল—এই ক্রমে তালাঙ্কসমূহ বিন্যস্ত হয়। তবলায় বাদনীয় বোল :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ধিন ধিন না | ধিন না | ধিন না | দিন ধিন নাগে তেটে |

পাখোয়াজে বাদনীয় বোল :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ধা দেন তা | তেটে কতা | গেদি ঘেনে | ধাগে তেটে তাগে তেটে |

একাদশী তালের মাত্রা বিন্যাসের একটি ভিন্ন রূপও আছে। তাতে মাত্রা বিন্যাস দাঁড়ায় : ১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭ | ৮ ৯ ১০ ১১। তিনটিই তালি। সম, দ্বিতীয় তাল, তৃতীয় তাল—এই ক্রমে তালাঙ্কসমূহ বিন্যসিত হয়। তবলায় বাদনীয় বোল :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ধিন ধিন না | ধিন না ধিন না | ধিন ধিন নাগে তেটে |

পাখোয়াজে বাদনীয় বোল হচ্ছে : উঅ(১,ধা) উঅ(২,দেন)

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
তা | তেটে কতা গদি ঘেনে | ধাগে তেটে তাগে তেটে |

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তালরূপ উদ্ভাবন করেন। ফলে এটি রাবীন্দ্রিক তালরূপে খ্যাত হয়। ক.গো.

একাদশী বৈরাগী : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) রচিত মানবচরিত্র বিশ্লেষণমূলক গল্প। ১৩২৪ সনের 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে 'স্বামী' (১৩২৪ ব.) গল্প পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখক এতে মানবমনের অসঙ্গতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুদখোর একাদশী তার পাওনা আদায়ের ব্যাপারে একেবারেই চক্ষুলজ্জা রহিত। তার নীতি,

www.pathagar.com

সহজে নিজের পয়সা বের করা চলবে না এবং নির্মম ও নির্লজ্জ ব্যবহারের দ্বারা হলেও সাত তাড়াতাড়ি সুদে আসলে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে হবে। চার আনা চাঁদা দেওয়া তার কাছে দানশীলতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এই নীচাশয় মানুষটির অন্তরেও স্নেহের ফল্গু প্রবাহিত। তার পদস্খলিতা ভগিনীকে আশ্রয় দিতে গিয়ে তাকে জাতিকুল সমাজ সবই হারাতে হয়েছে। কিন্তু তথাপি নিরুপায় ভগিনীর প্রতি তার স্নেহের ধারাটি অবরুদ্ধ হয় নি। এই মহত্ত্ব ছাড়াও একাদশী সৎসাহসী ও সততার প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় অন্যের ন্যায্য পাওনা যেমন সে আত্মসাৎ করে না, তেমনি নিজের পাওনা সে ছাড়ে না। এই গল্পে শরৎচন্দ্র নিতান্ত নীচ প্রকৃতির লোকের মধ্যে যে মহত্ত্বের বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে তারই ইঙ্গিত দান করেছেন। **আ.ই**

একাবলী : একই শৃঙ্খলাক্রমে বিন্যস্ত পূর্ববর্তী বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষণ বা বিশেষণ-ভাবাপন্ন পদ যদি পরবর্তী বাক্য বা বাক্যাংশে বিশেষ্য পদ রূপে বসে, তবে সেখানে একাবলী অলঙ্কার হয়। পূর্ববর্তী বিশেষ্যকে পরবর্তী বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন রূপে ব্যবহার করা হলেও একাবলী হয়। এমন কি আগের বাক্যের বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদগুলো পরিত্যক্ত হলেও একাবলী হতে পারে। যেমন— (ক) 'মরি এই সরোবর কমল-ভূষিত।/ কমলকুসুম সব, ভৃঙ্গ-সুশোভিত॥ /ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে, সঙ্গীত-চতুর।/সঙ্গীত হরিছে মন, মূর্চ্ছনা মধুর॥' (সংস্কৃত থেকে)। প্রথম বাক্যে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদ 'কমল-ভূষিত', দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ্যপদ 'কমল' ; দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদ 'ভৃঙ্গ-সুশোভিত', তৃতীয় বাক্যে বিশেষ্য পদ 'ভৃঙ্গ', তৃতীয় বাক্যে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদ 'সঙ্গীত-চতুর', চতুর্থ বাক্যে বিশেষ্যপদ 'সঙ্গীত'। এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত—কবি জীবনানন্দের কাব্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তি, 'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, বর্ণনা চিত্রবহুল এবং চিত্র বর্ণবহুল।' (খ) 'গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি/ সুন্দর ধরাতল।' (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)। প্রথম বাক্যাংশের বিশেষ্য 'ফুল' পরবর্তী বাক্যাংশে অলির বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। (গ) 'সে জল ছিল না, যাহা কমল-বিহীন ;/কমল ছিল না, যাহা অলিদল-হীন ;/সে-অলি ছিল না, যাহা গুঞ্জন না করে ;/গুঞ্জন ছিল না, যাহা মন নাহি হরে।' (সংস্কৃত শ্লোক থেকে)। এখানে প্রতি বাক্যশেষের বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদগুলো নিষেধ বা পরিত্যক্ত হয়েছে। **আ.ই**

একালে আমাদের কাল : সুফিয়া কামাল রচিত আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ। প্রকাশক : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৫ লারমিনি স্ট্রীট, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ২০ জুন, ১৯৮৮। উৎসর্গ করেছেন 'পৃথিবীর নিপীড়িত শোষিত নারীসমাজকে'। প্রকাশকের কথা থেকে জানা যায়, মাসিক সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা গণসাহিত্যে (১৩৮৫ বাং/১৯৭৮ ইং) 'স্মৃতি : আমার কথা' শিরোনামে প্রকাশিত। অসম্পূর্ণ লেখার সাথে নতুন করে লেখা (৭০ সাল পর্যন্ত) নিয়ে 'একালে আমার কাল' বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় কবির ৭৭তম জন্মবর্ষপূর্তিতে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায় সজ্জিত ৫৬ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য শোভন ২২ টাকা, সুলভ ১৮ টাকা। সুফিয়া কামাল বইটির শুরুতে জানিয়েছেন : 'কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার সিকান্দার আবু জাফর আমাকে অনুরোধ করেছেন সেকালের কথা কিছু কিছু লিখে যেতে। আমি যা লিখতে পারি লিখে যাব। কিন্তু সে লেখা যেন আত্মজীবনী বলে কেউ মনে না করেন।' বইটির প্রথম অংশে স্থান পেয়েছে শায়েস্তাবাদে কবির শৈশব কালের কথা, নানা, মামা, মা, শৈশবের সাথীদের কথা, সে সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, বরিশালের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দ দাস, ইসমাইল চৌধুরী, শেরে বাংলার প্রসঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলনের সাথে

www.pathagar.com

কবির কৈশোর কালের সম্পৃক্ততা, প্রথম লেখা গল্প 'সৈনিক বধূ' প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ। বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি, চরকায় সুতা কেটে কবি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এসব মূল্যবান স্মৃতি কথা রয়েছে। বেগম রোকেয়া প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন ১৫ পৃষ্ঠা জুড়ে। ৬/৭ বছর বয়সে কলকাতায় প্রথম বেগম রোকেয়ার সান্নিধ্যে আসেন কবি সুফিয়া কামাল। কবিকে বেগম রোকেয়া ডাকতেন 'ফুলকবি' নামে। মহৎ ব্যক্তিত্ব কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, কবি বেনজীর আহমদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লীলা রায়, শামসুন নাহার মাহমুদ, মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখের স্মৃতি তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধার সাথে গাঁথা রয়েছে। বইটিতে তা ভাষায় রূপ পেয়েছে। দেশের সকল সংকটের সময়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে, '৫২-র ভাষা আন্দোলনে, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সময় পূর্বপাকিস্তানে রবীন্দ্র বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, উনসত্তরের গণআন্দোলনে কবির অংশগ্রহণ, এসবও স্মৃতিচারণে সমুজ্জ্বল। প্রকাশিত গ্রন্থের হিসেব অনুযায়ী এ পর্যন্ত কবির সাহিত্য রচনার সময়কাল ৫২ বছর (১৯৩৭-১৯৮৯) এবং প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৬টি। পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্প অন্তরা ও জনক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে কবির ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মা.বে.

একালে নজরুল : আহমদ শরীফ রচিত প্রবন্ধ সংকলন। প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন সমর মজুমদার। মূল্য : একশ টাকা। ছয়টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। প্রবন্ধসমূহ যথাক্রমে : নজরুল ইসলাম : কবির মনোজগৎ, পাঠক সমালোচকদের চোখে নজরুল সাহিত্য, কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ, নজরুল ইসলামের কবিস্বভাব : শক্তিপূজা, নজরুলের কবিস্বভাব : প্রেম-তৃষ্ণা এবং নজরুলের কবি ভাষা : পুরাণ ও প্রকৃতি। প্রথম প্রবন্ধে লেখক বলতে চেয়েছেন নজরুলের জন্ম হয়েছিল অখণ্ড ভারতবর্ষে। ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ ব্যবস্থা ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ--এসবই কবির মনোজগতে দ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেখক পাঠক-সমালোচকেরা কিভাবে নজরুলের সাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন সেটা তুলে ধরেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আহমদ শরীফ নজরুলের রাজনীতিসম্পৃক্ত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং স্বতন্ত্র রচনার উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ প্রবন্ধে 'বিদ্রোহী' প্রসঙ্গে মোহিতলালের 'আমি' নামক গদ্য রচনার বিষয়টি উপস্থাপিত। নজরুলের বিভিন্ন রচনায় নজরুল বিভিন্ন শক্তির পূজা করেছেন। যেমন : প্রকৃতি, দেবতা, মানুষ, জন্তু, প্রতীক ইত্যাদি। পঞ্চম প্রবন্ধে দেখা যায় নজরুল সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে নারীপ্রেম। দোলন চাঁপা (১৯২০), ছায়ানট (১৯২৪), পূবের হাওয়া (১৯২৫), সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭), চক্রবাক (১৯২৯), নতুন চাঁদ (১৯৪৫) ইত্যাদি তাঁর প্রেম বিষয়ক কবিতা সংকলন। শেষ প্রবন্ধে নজরুল যে পুরাণ ও প্রকৃতিকে তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন তা আমরা বিভিন্ন দৃষ্টান্তের আলোকে অবগত হতে পারি। সৈ.আ.জা.

একালের ইউরোপীয় একাংক : সম্পাদনা : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও সুনীল দত্ত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজন থেকে আধুনিক একাংক নাটকের জন্ম। তারপর ইউরোপের সব নামী নাট্যকারই—অসবোর্ণ, ওয়েসকার, পিন্টার, সার্ত্র, বেকেট, ইয়নেসকো. পিরানদেল্ও, লরকা, ব্রেশ্‌ট এবং আরো অনেকে স্বতন্ত্রভাবে একাংক নাট্যচর্চা করেছেন

বা করছেন। একাঙ্কগুলো হলো—ইংল্যান্ডের ১. রুটস : আর্নল্ড ওয়েস্কার, বাংলায় : ফুল ফুটক না ফুটুক-রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ২. দ্য ডাম্ব ওয়েটার : হ্যারল্ড পিন্টার, নির্বাক প্রতীক্ষা—হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়। ৩. অ্যান্টস্ : ব্যরিল চার্চিল, পিঁপড়ে : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। রাশিয়ার ৪. সোয়ান সঙ্ : আন্তন চেখভ, নানা রঙের দিন—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. দ্য প্রপোজাল : আন্তন চেখভ, প্রস্তাব—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফ্রান্সের ৬. অ্যাক্ট উইদাউট ওয়ার্ডস : স্যামুয়েল বেকেট, একটি মাইম :রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৭. দ্য লেসন : ইউজিন ইয়নেস্কো, নীলিমা—উদয়ন ঘোষ। ৮. লা মিউজিকা : মারস্যুরিত দুরা, অন্ত-আদি-অন্ত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ইতালির ৯. দ্য ম্যান উইথ দ্য ফ্লাওয়ার ইন্ হিজ্ মাউথ্—পিরানদেল্ও, মৃত্যুর কুঁড়ি ; হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়। সুইডেন ১০. দ্য স্ট্রিঙ্গার : স্ট্রিন্ডবার্গ, উত্তমা—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। জার্মানি ১১. দ্য বেগার আর দ্য ডেড ডগ : ব্রেশ্ট, একটি ভিক্ষুক অথবা একটি মৃত কুকুর। স্পেন ১২. দ্য লাভ অব ডন পারলিনপ্লিন এবং বলিজা ইন দ্য গার্ডেন : ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকা, বাগানের মাঝখানে ডন পারলিনপ্লিন এবং বলিজার প্রেম—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৩০০, মূল্য ৮.০০ রুপি। বি.ব.

একালের কথা : অসীম রায়। উপন্যাস। পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় রাজনীতির বিচিত্র গতিধারা বাঙালি যুবমানসকে কতটা আলোড়িত ও দ্বিধাগ্রস্ত করেছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৬০ সনে। উনিশ শ' ছেচল্লিশের উনত্রিশে জুলাই 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর বিবরণ দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা। তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন লেখক অসীম রায়ের সাম্যবাদী চিন্তা মানুষের সামাজিক ও আত্মিক অস্তিত্বকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে—এ প্রশ্নের উত্তর নিরন্তর খোঁজা হয়েছে উপন্যাসের পর্বে পর্বে। এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কম্যুনিস্টদের চারিত্রিক দ্বিধার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায় উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিত্যর আত্মকথন ও অন্তর্মুখী ভাবনার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি যুগের রাজনৈতিক ঘটনা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিত। খেটে-খাওয়া বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক রূপের আবিষ্কার, ব্যক্তি ও সমাজের অন্তর্গত বিশ্লেষণ, ব্যক্তির আত্মান্বেষণ ও সমাজ-জিজ্ঞাসার উপলব্ধির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের নির্দেশনাই মূলত উপন্যাসটিকে কালোত্তীর্ণ করেছে। ড. শা. আ.

একালের মলয়ালম গল্পগুচ্ছ : সম্পাদনা করেছেন এম. মুকুন্দন। বাংলা অনুবাদ করেছেন নিলীনা আব্রাহাম ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। মলয়ালম ভাষার গল্পকারেরা হলেন—এন.পি. মুহম্মদ ; পাট্টাতুবিলা করুণাকরণ ; কোবিল ; এন. মোহনন ; এম. গোবিন্দন ; জয়দেবন ; কাক্কনাডন ; ও. বি. বিজয়ন ; এম. মুকুন্দন ; এম. পি. নারায়ণ পিল্লা ; তুলসী ; পুনত্তিল্ কুঞ্জ আবদুল্লা ; সেতু ; সক্কারিয়া ; এম. এ. সুকুমারন ; পি. পদ্মরাজন ; ঈ. হরিকুমার এবং আকামন্নুর হরিহরণ। এছাড়া ভারতের মলয়ালম ভাষার গল্প-সাহিত্যের একটি ছোট ভূমিকা আছে। তাতে জানা যায় ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল মলয়ালম ছোট গল্পের স্বর্ণযুগ। এই যুগে মলয়ালম গল্প-সাহিত্য বিকশিত হয়ে পরিণতি লাভ করে। ১৪৯৪ সনে প্রথম মলয়ালম গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পটির লেখক মূরকোত কুমারন। পরে তিনি ১০০টির বেশি গল্প লেখেন। যথার্থ ছোটগল্প জন্মলাভ করে প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ার চার দশক পরে। নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন মানুষের সৃষ্টি চেতনার ফল হচ্ছে আধুনিককালের মলয়ালম গল্পগুলো। বিজয়নের গল্প কক্কনাডনের গল্প থেকে খুবই ভিন্ন ধরনের। পুনত্তিল কুঞ্জ আবদুল্লার লেখা 'সেতু' গল্পের

www.pathagar.com

মতো নয়। জীবনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আত্যন্তিক জটিলতা আধুনিক লেখকদের গল্পে অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়। মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মূল্যক্ষয়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই দলে আছেন এম. সুকুমারন। নতুন গল্পকারেরা আত্মানুসন্ধান করেন, তাঁরা নিরন্তর নিজেদের প্রশ্ন করে চলেছেন 'আমি একটা পথের সন্ধান করছি। বাইরে যাওয়ার পথ।' কক্কনাডন লিখেছেন 'বাইরের পথ' গল্প। বিজয়ন আবার অবলম্বন করেছেন সুর-রিয়্যালিজমকে। কক্কনাডন, ও.বি. বিজয়ন, এম.পি. নারায়ণ পিল্লা প্রভৃতির সঙ্গে আর যাঁরা নতুন গল্প সাহিত্যকে পুষ্ট করে চলেছেন তাঁরা হলেন সেতু, পদ্মরাজন, পুনাত্তিল কুঞ্জ আবদুল্লা, সক্কারিয়া, ঈ. হরিকুমার প্রভৃতি। আক্কামানুর হরিহরণের 'স্বপ্ন' একটি মনোবৈজ্ঞানিক গল্প। মলয়ালম গল্পে এক দিকে আছে রক্ষণশীল লেখক ও পাঠক সম্প্রদায়, অন্য দিকে কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীর দল। এই গল্প-সাহিত্য দিনে দিনে বিকশিত হয়ে উঠছে। প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি। পৃষ্ঠা : ১৬২, প্রকাশকাল : ১৯৮০, মূল্য : ৭.৫০ রুপি। বি.ব.

একুশে ফেব্রুয়ারি : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলন। প্রকাশক : পুঁথিপত্র প্রকাশনীর পক্ষে মোহাম্মদ সুলতান। প্রচ্ছদ : আমিনুল ইসলাম। রেখাঙ্কন মুর্তজা বশীর ও অন্যান্য। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+১৮০। মূল্য : দুই টাকা আট আনা। 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র প্রথম সংস্করণে একুশের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা, ইতিহাস শিরোনামে ৬টি বিভাগে মোট ২২জন লেখকের রচনা মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' নামে ৪ পৃষ্ঠার একটি সম্পাদকীয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় ৪টি ও তাঁর মৃত্যুর পর ১টিসহ 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র মোট ৫টি সংস্করণ (২য় সং. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ ; ৩য় সং মে ১৯৬৮, ৪র্থ সং ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ও ৫ম সং ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ১২টি (৪টি কবিতা, ৪টি প্রবন্ধ, ১টি নাটক ও একুশের ঘটনাপঞ্জি) ও তৃতীয় সংস্করণে ৪টি (১টি কবিতা, ২টি প্রবন্ধ ও ১টি গান) নতুন রচনা সংযোজিত হয়েছে। চতুর্থ সংস্করণে কোনো নতুন লেখা সংযোজিত হয়নি। পঞ্চম সংস্করণটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তিনটি অংশে বিন্যস্ত এটি সম্পাদনা করেছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফয়েজ আহমদ ও আনিসুজ্জামান। এই সংস্করণের ১ম অংশে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র আদি সংস্করণ, ২য় অংশে পরবর্তী সময়ের সংস্করণগুলোতে সংযোজিত রচনাসমূহ এবং ৩য় অংশে হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ সুলতান ও পুঁথিপত্র প্রকাশনী সম্পর্কিত রচনা মুদ্রিত হয়েছে। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রথম সংস্করণের সূচিপত্র : সম্পাদকীয় একুশে ফেব্রুয়ারি। প্রবন্ধ, আলী আশরাফ সকল ভাষার সমান মর্যাদা। একুশের কবিতা : শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জামালুদ্দিন, আতাউর রহহান, সৈয়দ শামসুল হক ও হাসান হাফিজুর রহমান। একুশের গল্প : শওকত ওসমান–মৌণ নয় ; সাইয়িদ আতীকুল্লাহ – হাসি ; আনিসুজ্জামান – দৃষ্টি ; সিরাজুল ইসলাম – পলিমাটি ; আতোয়ার রহমান – অগ্নিবাজ। একুশের নক্শা : মূর্তজা বশীর— একটি বেওয়ারিশ ডায়েরীর কয়েকটি পাতা ; সালেহ আহমদ – অমর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত স্বাক্ষর। একুশের গান : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও তোফাজ্জল হোসেন। একুশের ইতিহাস : কবিরউদ্দিন আহমদ। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনটি বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকাশের একুশ দিন পর তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার সংকলনটি বাজেয়াপ্ত করে এবং পুঁথিপত্র প্রকাশনী অফিসে পুলিশি হামলা চালায়। ১৯৫৩ সালে অমর একুশে প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে 'একুশে

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারি' নামের সংকলনটি সম্পাদনার মাধ্যমে হাসান হাফিজুর রহমান একুশের সংকলন প্রকাশের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও অব্যাহত রয়েছে। তবে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'-ই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত একুশের সংকলনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল করে আছে। সা.আ.

একুশে পদক : অমর একুশে উদযাপন উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী,বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীয় ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'একুশে পদক' নামে রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন করেন। এটি ১৯৭৬ সালে প্রবর্তন করা হয়। প্রতি বছরেই পদক দেয়া হয়ে থাকে। প্রতিবছর প্রদত্ত পদকের সংখ্যা অনধিক ১৫। পদক প্রাপ্তদের প্রত্যেককে নগদ টাকা, একটি স্বর্ণপদক ও একটি সম্মাননাপত্র দেয়া হয়। এই পদকটি একটি বিশেষ সম্মান হিসেবে গুণীজনের মাঝে স্বীকৃত। সে. হো.

একুশে সংসদ : অমর একুশের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কতিপয় তরুণ কলকাতায় 'একুশে সংসদ' নামে এই সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৯ সালে। প্রতি বছর এরা কলকাতায় অমর একুশে উদযাপন করে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এঁরা নতুন নতুন কর্মসূচিও গ্রহণ করতে শুরু করেন। এর মধ্যে ছিল আলোচনা সভা আয়োজন ও গান, কবিতা পাঠ, ভাষা নিয়ে নানা ধরনের আলেখ্য অনুষ্ঠান প্রযোজনা। এর মধ্যে 'বাংলা ভাষা মা আমার' খুব জনপ্রিয় হয়। বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, শিল্পীরা 'একুশে সংসদ' আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই সংগঠনের আর একটি অন্যতম আয়োজন প্রকাশনা। বিভিন্ন সময়ে তারা সংকলন জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে। ১৯৯৪ সালে তারা প্রকাশিত করে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' শীর্ষক সংকলন। এই সংকলন মুদ্রণের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এটি সম্পাদনা করেন দেবাশিস সেনগুপ্ত। সংকলনে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের লেখকদের লেখা মুদ্রিত হয়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর এই সংগঠন বড় আকারে এর একযুগ পূর্তি উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে সংস্থার মুখপত্র 'এবং প্রতর্ক'-র দশম বর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় 'নন্দন'-এর সেমিনার কক্ষে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নাট্যশোধ সংস্থান-এর সহযোগিতায় প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরীর করা প্রচ্ছদ, ড্রইং, বিভিন্ন নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা, পোশাক ইত্যাদির প্রদর্শনী। এটি ছিল একজন শিল্পীর কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অসাধারণ প্রদর্শনী। এভাবেই বাংলাদেশের অমর একুশে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে সম্মানিত হয়। জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পায় তাদের জাতিসত্তা এবং বাংলা ভাষাকে সমুন্নত রাখার প্রেরণা। 'একুশে সংসদ' ধারণ করে একুশের চেতনার অমর বাণী। গত এগারো বছর ধরে ধারাবাহিক কর্মসূচির নানা দিক বিশ্লেষণ করে যে কাজটিকে এখন পর্যন্ত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় সেটি 'প্রগতির পথিকেরা' প্রকাশনা। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ এই ১৫ বছরে গড়ে ওঠা কয়েকটি সংগঠন যেমন প্রগতি সংঘ, ইয়থ কালচারাল ইন্সটিটিউট, ভারত সোভিয়েত মৈত্রী সংঘ, ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ ইত্যাদি সংগঠন-গুলিতে কোনোও না কোনোও ভাবে যুক্ত ছিলেন এখন প্রয়াত হয়েছেন এ রকম ষাটজন মানুষের বিস্তৃত কাজ ও জীবনচর্চা নিয়েই 'প্রগতির পথিকেরা'। সময়ের দাবি মেনে নিতান্ত স্বল্প সামর্থে এভাবেই 'একুশে সংসদ' বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার স্বপ্ন লালন করে চলেছে। সে. হো.

একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস : আহমদ রফিক রচিত স্মৃতিচারণমূলক

ইতিহাসগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক : গণ-প্রকাশনী, নয়ারহাট ভায়া ধামরাই, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩৯৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম খান। মূল্য : ৩৫.০০ টাকা। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রাবাসের ভূমিকাই গ্রন্থটির আলোচিত বিষয়। আন্দোলনের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসটি পরিচিত হয়ে উঠেছিল ব্যারাক নামে। একুশের রূপরেখা চিত্রণের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই ব্যারাক ও ব্যারাকবাসীদের রাজনৈতিক জীবন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। গ্রন্থের লেখক আহমদ রফিক নিজেও ছিলেন এর শরিক। তাই গ্রন্থটির চরিত্রধর্ম ইতিহাস হলেও এর বাচনভঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়েছে স্মৃতিচারণের ভাষা। তবে গ্রন্থের উপাদানসমূহ একান্তভাবেই সঠিক তথ্যভিত্তিক। একারণে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এটি। সু. ব.

একুশের কবিতা : বাংলা একাডেমী প্রকাশিত একুশ বিষয়ক কবিতার সংকলন। সংকলনটিতে ১৯৫৩ থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত একুশ নিয়ে লেখা ১১৫ জন কবির ১৩২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'একুশের কবিতা' এ পর্যন্ত প্রকাশিত একুশ বিষয়ক কবিতার সর্ববৃহৎ সংকলন। একুশ বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রথম সোপান নির্মাণ করেছিল। সেই পথ ধরে বাঙালি জাতি আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের গর্বিত অধিকারী। তাই বাঙালির সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে একুশের উপস্থিতি সর্বদা প্রবহমান সত্য। 'একুশের কবিতা'য় গত প্রায় পাঁচ দশকে বাংলাদেশের কবিদের চেতনায় জাগ্রত একুশের প্রবহমান সত্তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সা. আ.

একেই কি বলে সভ্যতা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত দই অঙ্কবিশিষ্ট নাটক। প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই দুইটি প্রহসনের মূল্য অপরিসীম। সমসাময়িক দুইপুরুষের চরিত্রগত দুর্বলতার এমন অনবদ্য চিত্র তৎকালে অন্য কারো রচনায় আর দেখা যায় না। নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষাভিমানী যুবকদের উচ্ছৃখলতা ও অনাচারের কথা ব্যক্ত হয়েছে 'একেই কি বলে সভ্যতায়'। প্রহসনখানির প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নবকুমার ও কালীনাথের সংলাপ-আলাপে তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গল দলের মন্দ দিকটি অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তি মদ্যপানে আসক্ত এবং সেটাকে তারা সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে মনে করে। এই মদ্যপানাসক্তি তখন সমাজে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের সরলপ্রাণ বাবাজীর বিপর্যস্ত অবস্থা, বারবিলাসিনীর রঙ্গ রসিকতা, চৌকিদার ও সার্জেন্টদের অর্থলোলুপতা, নর্তকী নিতম্বিনী ও পয়োধরীর কদর্যপনা ইত্যাদি কৌতুকরস মিশ্রিত নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সর্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত হওয়ার জন্য জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অধিবেশন বসে। কিন্তু সভ্যগণ সুরাপানে আসক্ত ও গণিকাদেবীর উপাসক। মাইকেল সরস ব্যঙ্গ সহকারে তাদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা'? প্রহসনের শেষদৃশ্যে মদোন্মত্ত নবকুমারের গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং তার পূর্বে অন্ত : পুরিকা রমণীদের তাসখেলারত অবস্থায় নানা রকম পরিহাস রসিকতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভ্যদের কথায় বারো আনা ইংরেজি বুকনি। তাতে তাদের কথাবার্তার বিকৃত উচ্চারণে নিজেদের অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়ই অধিক প্রকট হয়ে উঠেছে। যেমন 'আমার Father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctor-কে call করা গেল' ইত্যাদি। সহজ ও সরল বিশুদ্ধ কথ্য ভাষায় প্রয়োগ 'একেই কি বলে সভ্যতার' ভাষার বৈশিষ্ট্য। ম.চৌ.

এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম : গবেষক। ১৯৩০ সালের ২১ ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। পিতা মোঃ সেকান্দার আলী। ঢাকা সরকারি মুসলিম হাই স্কুল থেকে ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫০ সালে আই. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে বি.এ. অনার্স (বাংলা) ও ১৯৫৪ সালে এম. এ. (বাংলা), লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সালে এম. এ. (ভাষাতত্ত্ব), কানাডার টোরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে এম. এ. (মানববিজ্ঞান) পাস করেন। 'Conflict and cohesion in an East Pakistan Village' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৬৯ সালে কানাডার ম্যাগগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ডেটনের (ওহাইও) রাইট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিজ্ঞানের তিনি একজন প্রফেসর। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের তিনি বিশিষ্ট গবেষক। বাংলা ভাষায় মানববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'এই পৃথিবীর মানুষ' রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের জীবন ও তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন তাঁর আরেকটি প্রধান কাজ। প্রকাশিত গ্রন্থ : জসীমউদ্‌দীন : কবি ও কাব্য (১৯৫৬), বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবি ও কাব্য (১৯৫৯), প্রয়োগিক মানববিজ্ঞান (১৯৯৫), এই পৃথিবীর মানুষ (১ম খণ্ড ১৯৯০, ২য় খণ্ড ১৯৯৩)। নু.ই

একোক্তি : নাটকীয় চরিত্রের একক কথনকে একোক্তি বলা হয়। নাটকে অন্য চরিত্রের উপস্থিতিতে যখন একটি বিশেষ চরিত্রের একক ভাষণে দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হয়, তখন সেই দীর্ঘ ভাষণটিই একোক্তি বা Monologue বলে অভিহিত হয়। একোক্তিতে বক্তা একাই কথা বলতে থাকে, তবে তার বক্তব্য শোনার জন্য অপর একটি চরিত্রের আবশ্যক হয়। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' নাটকে বক্তার দীর্ঘ বক্তব্য কথনের সময় শ্রোতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সুতরাং এটি নাটকীয় একোক্তির দৃষ্টান্ত। আ.ই

এক্সপোজিসন/পরিচয়-স্থাপনা : নাটকীয় বিষয়বস্তুর পরিচয়-স্থাপনার নাম এক্সপোজিসন। এক্সপোজিসনের মাধ্যমে পাঠক বা দর্শক নাটক রচনার উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতি জ্ঞাপক পটভূমি ও মূল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়। নাটকে পাত্রপাত্রীদের সংলাপেই পরিচয়-স্থাপনার কাজ শেষ হয়। Exposition প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় মূল কাহিনীর Focus স্বরূপ। আ. ই

এক্ষণ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য। একাদশ বর্ষ, ৩-৪ যুগ্ম বিশেষ সংখ্যা—১৩৮১/১৯৭৪। প্রকাশক : শ্রী প্রবীর ঘোষ, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে 'এক্ষণ' একটি সমাদৃত ও সুপরিচিত পত্রিকা। 'এক্ষণ' প্রকাশিত হয় ১৩৭১ সনে। আলোচ্য সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আর এতে প্রকাশিত হয়েছে কালজয়ী কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত ছয়টি ডায়েরি। ডায়েরিগুলো হলো : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯ ও ৫০ সালের লেখা। ডায়েরিগুলো সম্পাদনা করেছেন যুগান্তর চক্রবর্তী। এ সংখ্যাটির সূচিপত্রে আরো রয়েছে : ভূমিকা, সংযোজন, নির্দেশপঞ্জি, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কেচ, ডায়েরির প্রতিলিপি ও প্রত্রিকার কথা। পত্রিকার কথায় সম্পাদক বলেছেন : 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'-কে প্রকাশের যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মিলিয়ে সমগ্রভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়ন ও নতুন সমালোচনার সূত্রপাত করা। আমরা আশা করতে পারি এক্ষণ পত্রিকায় যথাসম্ভব সে কাজ চলতে থাকবে।' এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত ডায়েরি প্রকাশ নতুন নয়। গত সংখ্যায় তাঁর জীবনের শেষ

www.pathagar.com

চারটি ডায়েরি প্রকাশ করে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সে ডায়েরিগুলোর কালগত সীমা ছিলো ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪। ডায়েরিতে তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়াদি ছাড়াও জোরালো মন্তব্য রয়েছে। ১৯৪৯ সালের ২৪ মার্চ তিনি লিখেছেন : 'একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে। সেক্সপিয়ার যদি বুর্জোয়া সমাজের মর্ম বুঝে দূর ভবিষ্যতে তাকিয়ে সৃষ্টি করেছিল, বুর্জোয়া যখন বিপ্লবী, তার নাটকে কেন ফিউডালের ক্রোধ জাগায়নি, বুর্জোয়া বিপ্লবে যার ধ্বংস? 'এক্ষণ' বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি প্রকাশ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। **খা. বি. জ. উ.**

এখনও ক্রীতদাস : আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে শীর্ষস্থানীয় মঞ্চসফল নাটকগুলোর একটি। নাটকটি লেখকের নির্দেশনায় 'থিয়েটার'-এর প্রযোজনায় মহিলা সমিতি মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় ১৯৮৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর। অতঃপর ঢাকা শহর থেকে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলসমূহে অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে। ঢাকা শহরের 'গলাচিপা' বস্তির যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের অসহায় জীবন-যাপনের ইতিবৃত্ত। নাটকে বাক্কা মিয়ার পরিবারটি গলাচিপা বস্তির প্রতীক। আর গলাচিপা বস্তি ঢাকা শহরের প্রতীক। অপরদিকে কেন্দ্রীয়ভাবে তা গোটা বাংলাদেশের গণ-মানুষের প্রতীক। এছাড়া এই নাটকে বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাঁতাকলে নারী নির্যাতনের নির্মম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে : বাক্কা মিয়া, মর্জিনা, কান্দুনী, হারেস আলী, কাজী আবদুল মালেক প্রমুখ। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৪, প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা। প্রচ্ছদ : মাহবুব আখন্দ। **মো. আ. মি.**

এখনও সময় আছে : কবি আবুল হোসেন রচিত কব্যগ্রন্থ। মূল্য : ৫০.০০। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮০, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। 'এখনও সময় আছে' কাব্যগ্রন্থে ৫১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথম কবিতা 'ভিজে কাক' আর শেষ কবিতা 'যে আছে জীবন জুড়ে'। এ গ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতা বন্ধু বা পরিচিতজনদের উদ্দেশ্যে লেখা। শওকত ওসমান, জীবনানন্দ দাশ, ফররুখ আহমদ, শামসুর রাহমানকে উৎসর্গ করে লেখা কবিতাবলী এ গ্রন্থকে দ্যোতনা দিয়েছে। অন্যসব কবিতায় কবির ব্যক্তিগত চিন্তা, অভিমান ইত্যাদি সুস্পষ্ট। **পা.র.**

এখনো উত্থান আছে : কবি সমুদ্র গুপ্তের কবিতার বই। প্রকাশক : ডানা পাবলিশার্স, ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সাল। গ্রন্থটি বৃক্ষের সাহস নিয়ে অবিচল সমুদ্র তরঙ্গের ধ্বনি শুনে বেড়ে ওঠা আমাদের এ কালের দৃঢ় কণ্ঠস্বর আহমদ শরীফ'কে উৎসর্গ করা হয়েছে—প্রকারান্তরে যা একটি কবিতার মর্যাদা লাভ করেছে। মোট পঞ্চাশটি কবিতার সংকলন এটি। এ বইয়ের উল্লেখযোগ্য কবিতা : আশ্রিত দেশের মতো, গাধা, রাজপথে একজন ক্ষুধার্ত পথিক, বাংলার কৃষক, ক্ষুধাক্লিষ্ট পৃথিবীর গান, উন্নাসিকের স্বগতঃ ভাষণ, পৃথিবী এবং মানুষের কাছ থেকে। সমুদ্র গুপ্তের কবিতা রাজনীতির পুকুরে রাজহাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর কবিতা এতোটাই স্নিগ্ধ আর কোমল যে তা থেকে পাশ ফেরানো যে কারোর জন্যেই কঠিনতর কাজ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এ রকম—'চারিদিকে এখনো আছে প্রাণ /তাই, বাতাসে সঙ্গীত আছে /মৃত্তিকায় ফসলের ঘ্রাণ। /বৃক্ষে সবুজ আছে জলময় ঢেউ।/ মানুষে সত্য আছে, ভালবাসা সেও আছে তাই।/ আমাকে এখনো পিছু ফেরাতে পারে না কেউ। /কোমল আঙুল আছে, আছে কর, কররেখা। / আমার এসব কিছু। মানুষের

www.pathagar.com

কাছ থেকে পাওয়া আর শেখা।'/সমুদ্র গুপ্তের কাব্যভাষা সহজেই পাঠকের ধমনীতে প্রবেশ করে। **শা. আ.**

এখলাস উদ্দিন আহমদ : শিশু সাহিত্যিক। তিনি ১৯৪০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগণা জেলার গৌরীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তিনি একজন স্বশিক্ষিত মানুষ। পেশায় সাংবাদিক। বর্তমানে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ও ফিচার সম্পাদক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : গল্প–উপন্যাস : এক যে ছিল নেংটি (১৯৬৫) ; বেলুন বেলুন (১৯৬৯) ; মাঠ পারের গল্প (১৯৭০) ; হঠাৎ রাজার খামখেয়ালী (১৩৮৭) ; তুনুর দুপুর (১৯৮২) ; অন্য মনে দেখা (১৩৯৭) ; টাট্টুঘোড়া টাট্টুঘোড়া (১৯৮৭) ; রাজ রাজড়ার গপ্পো (১৯৮৯) ; তুনু ও কেঁদো বাঘের গপ্পো (১৯৭৯) ; তুনতু বুড়ির আজব সফর (১৯৯০) ; কেঁদোর কাণ্ডকারখানা ; তুনুকে নিয়ে গপ্পো (১৯৯৩) ; তুনতুর গপ্পো ; রোজদিনকার রোজনামচা ; যত্তোসব আজগুবি (১৯৯৫) ; তুনু ও তার ক্ষুদে বন্ধুদের গপ্পো (১৯৯৫) ; লোকটা ; বক্তৃবাবু ও মামদোর গপ্পো (১৯৯৬) ; তুনুর বন্ধু হালুম (১৯৯৭) ; তুনুর হারানো পুতুলগুলো (১৯৯৭)। ছড়া ও কবিতা : হাসির ছড়া মজার ছড়া (১৯৬২) ; তুনতু বুড়ির ছড়া (১৯৬৬) ; টুকরো ছড়ার ঝাঁপি (১৯৬৬) ; বাজাও ঝাঁঝর বাদ্যি (১৯৭০) ; ইকড়ি মিকড়ি (১৯৭৫) ; বৈঠকী ছড়া (১৯৭৫) ; কাটুম কুটুম (১৯৭৭) ; ছোট রঙিন পাখি (১৯৮১) ; প্রতিরোধের ছড়া (১৯৮৬) ; অষ্টাশির ছড়া (১৯৯২) ; ছড়ানো ছিটানো ছড়া ; বাছাই ছড়া। সম্পাদনা : কিশোর সংকলন 'টাপুর টুপুর' (১৯৬৫) ; ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ (১৯৬৫) ; রঙিন ফানুস ; দুই বাংলার ছোটদের গল্প (যৌথ) ; দুই বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়া (যৌথ) ; দুই বাংলার একালের ছড়া (যৌথ) ; হাজার বছরের কিশোর কবিতা (যৌথ) ; বাংলাদেশের ছোটগল্প (যৌথ)। তিনি যে সমস্ত পুরস্কার লাভ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে : পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব পুরস্কার (১৯৬২) ; বিশ্ব যুব উৎসব পুরস্কার, হেলসিংকি (১৯৬২) ; বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭১) ; আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) ; অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭)। একুশে পদক (২০০০) এবং শিশু একাডেমী পুরস্কার (২০০০)। এখলাসউদ্দিন আহমদ একজন নিবেদিত প্রাণ শিশু সাহিত্যিক। তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম ছোটদেরই জন্য। তিনি সেই শিল্পী যিনি ছোটদের স্বপ্নময় জগতটিতে আনন্দের রঙ ছড়িয়েছেন। সে রঙ স্নিগ্ধ করেছে শিশুদের মানস ভুবন। এছাড়াও তাঁর গল্প–ছড়ার যেমন নির্মল আনন্দরস আছে, তেমনি সমাজের অসঙ্গতি কিংবা স্বৈরাচারী ক্ষমতাবানদের বাস্তবতা রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যে লেখা শিশুদের কাছে মনে হবে রূপকথার মতো। শিশুদের খুব কাছের মানুষ তিনি। ইঁদুর, ঘোড়া, বাঘ ইত্যাদি প্রাণী তাঁর রচনায় শিশুদের নিজেদের চরিত্র হয়ে ওঠে। চমৎকার ছড়া, গল্প, উপন্যাস দিয়ে তিনি এ দেশের শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের একজন অন্যতম সম্পাদক হিসেবে তিনি স্বীকৃত। তাঁর সম্পাদিত 'টাপুর টুপুর', 'ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ' ষাটের দশকে ছোটদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় বই ছিলো। এছাড়াও তিনি আরো অনেকগুলো বই সম্পাদনা করেন। এখন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সচল লেখক। **সে.হো.**

এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং : ফ্রেডারিক এঙ্গেল রচিত এই গ্রন্থের দর্শন অংশের বাংলা অনুবাদ করেছেন সরদার ফজলুল করিম। 'অনুবাদকের ভূমিকা' সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন, 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডারিক এঙ্গেলস–এর একখানি গ্রন্থের প্রচলিত নাম হচ্ছে 'এ্যান্টি–ডুরিং'। আসলে এঙ্গেলস–এর গ্রন্থখানির মূল নাম হচ্ছে : হার ইউজেন ডুরিংস রিভোল্যুশন ইন সায়েন্স বা হার ইউজেন ডুরিংকৃত বিজ্ঞান বিপ্লব'। নামটির মধ্যে একটি ব্যঙ্গাত্বক সুর

আছে। কারণ ডুরিং নামক সমকালীন এক লেখক মার্কসবাদের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। তাঁর সেই ভুল ব্যাখ্যার সমালোচনা হিসেবে এঙ্গেলস ১৮৭৬ সালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। এই সমস্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন উল্লিখিত নামে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এ্যান্টি-ডুরিং'-এর মধ্যে এঙ্গেলস মার্কসবাদের তিনটি মূল দিকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন : ১. দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; ২. রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি ; ৩. বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব।...বস্তুত 'এ্যান্টি-ডুরিং' মার্কসবাদের একখানি মৌলিক গ্রন্থ। মার্কসবাদের মূল প্রশ্নসমূহের প্রাঞ্জল আলোচনা গ্রন্থখানিকে জনপ্রিয় চিরায়ত সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। 'মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ এ্যান্টি-ডুরিং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জন্যে তো বটেই উপরন্তু ঝরঝরে অনুবাদের কারণেও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ্যান্টি-ডুরিং বাংলা একাডেমী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে এবং পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ১৯৯১ সালে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন সমর মজুমদার। মূল্য : ষাট টাকা। **মা. আ.**

এডগার এলান পো রচনাবলী : অনুবাদ গ্রন্থ। অনুবাদক মণীন্দ্র দত্ত। ৪৩টি গল্পের অনুবাদ আছে এই সংকলনে। ইংরেজি সাহিত্যে গোয়েন্দা উপন্যাসের যে বেগবতী স্রোতস্বিনী নানা বিচিত্রধারায় প্রবাহিত, তার উৎস সন্ধানে যাত্রা করলে পো-র রহস্য গল্পকথার জটাজালে পৌঁছতেই হবে। 'স্বর্ণ-পতঙ্গ', 'রু মর্গের হত্যাকাণ্ড', ও 'মারি রোগেতের রহস্য' প্রভতি বিখ্যাত গল্প স্মর্তব্য। গল্পগুলো এই সংকলনে রয়েছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই কথাশিল্পীর নিজস্ব রহস্য-সন্ধানী চরিত্র অগাস্ত দুপেঁ বিখ্যাত শার্লক হোমসেরই পূর্বসূরি। পো-র জন্ম ১৮০৯ সালে। মার্কিন সাহিত্যের অন্যতম কবি ও কথাশিল্পী। বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী এই সাহিত্যিকের জীবন কাটে নানা রকম যন্ত্রণা, আর্থিক দৈন্যদশা ও মানসিক অস্থিরতার মধ্যে। বিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। ১৮৪৯ সালে পো রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'হেলেনের প্রতি', 'স্বপ্ন', 'ইস্রাফিল', 'দাঁড়কাক', 'আনাবেল লী' প্রভৃতি। তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রহস্যময়, ভুতুড়ে, মৃত্যুর গল্পমাখা, খুনখারাবি ভরা, আতঙ্ক-তাড়িত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আজও পো-র সাহিত্যকর্ম সাধারণ পাঠক ও বিদগ্ধ সমালোচক সবার কাছে সমাদৃত হচ্ছে। প্রকাশক : তুলি-কলম, ১ কলেজ রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩৯৪, মূল্য ৩০.০০ রুপি। **বি.ব.**

এত রক্ত কেন : মৈত্রেয়ী দেবী রচিত এই বইটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন কলকাতাকে আশ্রয় করে লেখা। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে পরম বরেণ্য অপরূপা অতুলনীয়া-ইন্দিরা গান্ধীকে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৫ সালে, এর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছে ১৯৯২ সালে। বইটি প্রকাশ করেছেন নাথ পাবলিশিং থেকে সমীর কুমার নাথ। মূল্য ৪০ টাকা। মৈত্রেয়ী দেবীর ভাষায় '১৯৭১ সালের ঘটনা, ১৯৮৩ সালে লিখতে শুরু করেছি। কাজেই এর মধ্যে কিছু ভ্রম সময় তারিখের থাকতে পারে। লেখাটা কতকটা ঐতিহাসিক যদিও আমার নিজের ঐতিহাসিক রচনা লেখার অভ্যাস নেই। আমি প্রধানতই স্মৃতিচারক।' তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ সম্বন্ধে বই লেখা অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস লেখা। দেশ ভাগ হবার পর থেকে দুই বাংলায় কোনদিন পূর্ণ শান্তি আসেনি। তার কারণ পূর্ববঙ্গে এক কোটি হিন্দু এবং ভারতে পাঁচকোটি মুসলমান রয়ে গিয়েছিল।' ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি ১৯৪৭-এর পর থেকে বাংলাদেশের নানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা লিখেছেন। ১৯৭১-এর সংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের কথা, ১৯৭১-এর

www.pathagar.com

২৫ মার্চের কালরাত্রির কথা, পাক খানসেনাদের মানুষ হত্যার কথা, শরণার্থীদের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা, রাজনীতির কথা সবই রয়েছে এই বইয়ে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে ভারতীয়দের সম্পৃক্ত থাকার মানবিক সব দিকই তুলে ধরেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। সত্যি সত্যি দু'একটি ভুল সময় তারিখ বইটিতে রয়ে গেছে। সম্পাদনা করে ছাপানো প্রয়োজন ছিল। ১৬ ডিসেম্বর নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। তারিখটি বইয়ে আছে ১৩ ডিসেম্বর। ১৪ ডিসেম্বর পাক-সেনা-রাজাকারের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবীদের কথা বলেছেন মর্মান্তিক শোকগাথা লেখার মতো করে। বইটি শেষ হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আততায়ীর হাতে নিহত হবার ঘটনায় মর্মাহত শোক জানিয়ে। যেদিন ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন সেদিন মৈত্রেয়ী দেবী 'এতরক্ত কেন' বইটি লেখা শেষ করে জানলেন 'আর একবার ভারতভূমি রক্তে ভাসছে। এক অতুলনীয়া নারীর রক্ত। ৬৭ বছরের বৃদ্ধা তাঁর আপন রক্ষকের হাতে নিহত হয়েছেন।' বইটি পড়ে পাঠকের চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হবে— বাংলাদেশের স্বাধীনতার নায়ক বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার কথা মনে করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দুই অকৃত্রিম নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী। দু'জনেই নিহত হয়েছেন তাঁদের রক্ষকের হাতে। মা. বে.

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি : কবি ওমর আলীর কাব্যগ্রন্থ। মূল্য ৪০.০০। পৃষ্ঠাসংখ্যা-৬১। প্রকাশনায় ত্রয়ী প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০। প্রথম প্রকাশ ১৯৬০। এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি -কাব্যগ্রন্থটির নাম বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে ভীষণ পরিচিত। গ্রন্থে কবিতার সংখ্যা পঞ্চাশটি। অধিকাংশ কবিতা কবির ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, প্রেম নির্ভর। কবি হৃদয় প্রেমাকাঙ্ক্ষায় অসম্ভব কাতর এবং তা পংক্তিতে পংক্তিতে বিদ্যমান। তাঁর তুলিতে বাঙালি নারীদের আটপৌরে রূপটিও অসাধারণ হয়ে মূর্ত হয়েছে। ফলে কবি অকুণ্ঠভাবে বলে উঠেছেন, এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম সুনেছি/আইভি লতার মতো সে নাকি সরল, হাসি মাখা ;/সে নাকি স্নানের পরে ভিজে চুল শুকায় রোদ্দুরে,/রূপ তার এদেশের মাটি দিয়ে যেন পথে আঁকা। এ গ্রন্থের ফাল্গুন কবিতাটি প্রকৃতি প্রেম নির্ভর। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কবি লিখেছেন 'প্রাণের আগুন' আর 'নীলগ্রাম' কবিতা। দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে 'আমার দেশকে'। মৃত্যুর কথা স্মরণ করে 'দূরের গান'। আঞ্চলিক ভাষায় কবির একটি অনবদ্য কবিতার নাম 'আমি কিন্তু যামুগা'। বাংলাদেশের কবিতার নতুন আঙ্গিক ও শরীর গঠন পদ্ধতির দিক থেকে 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। পা. র.

এনামুল হক : প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক। ১৯৩৭ সালের ১লা মার্চ বগুড়া জেলার সূত্রাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম এনায়েত আলী। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলার হিন্দু ভাস্কর্যের ওপর গবেষণা করে ডি. ফিল ডিগ্রি লাভ করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষক হিসেবে খ্যাত। এসব বিষয়ের ওপর তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যা ইংরেজি ভাষায় লেখা। এর মধ্যে ট্রেজারার্স ইন দ্যা ঢাকা মিউজিয়াম (১৯৫৭), ইসলামিক আর্ট ইন বাংলাদেশ (১৯৭৮) ও বেংগল স্কাল্পাচার : হিন্দু আইকোনোগ্রাফী আপটু সি-১২৫০ এডি (১৯৯২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে কবিতা, গীতিনাট্য ও শিশুতোষ গ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে উত্তরণের দেশে (১৯৬০), হাজার তারের বীণা (১৯৬১), রাজপথ জনপথ (১৯৬৯), অস্ত্র তুলে নাও (১৯৭১), সুবর্ণ

www.pathagar.com

ইত্যাদি উত্তেজনা (১৯৭৮) ও গীতিনাট্য চতুষ্টয় (১৯৯০) এবং শিশুতোষ গ্রন্থ টুকুনমনি (১৯৮৫)। ১৯৮৭ সালে টুকুনমনি গ্রন্থের জন্য অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। **খা.বি.জ.উ.**

এন্টনি ফিরিঙ্গী : প্রথিতযশা কবিয়াল, পুরোনাম হেন্সম্যান এন্টনি। জাতিতে পর্তুগিজ খ্রিস্টান। তাঁর পিতা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে এদেশে এসে ফরাসডাঙ্গায় বসবাস শুরু করেন। সম্ভবত এন্টনি আঠারো শতকের সত্তুরের দশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৬ সালে মারা যান। যৌবনে গাঞ্জিয়ালদের সংস্পর্শে পড়ে এন্টনির স্বভাব খুব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে। এক বিধবা ব্রাহ্মণ যুবতীকে নিয়ে তিনি গঙ্গার ধারে গিরিটির বাগান বাড়িতে ঘর বাঁধেন। এই হিন্দু কন্যার সান্নিধ্যে এসে এন্টনি হিন্দুর আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন। তিনি বাংলা শেখেন এবং ইউরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে ধুতি-চাদর পরিধান করতেন। এন্টনি পুজো-পার্বণের সময় আপন বাটীতে কবির দল নিমন্ত্রণ করে আনতেন। কালক্রমে তিনি কবি-গানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি কবি-গান শেখেন এবং একটি সখের কবির-দল গঠন করেন। পরে তিনি আদি ব্যবসা পরিত্যাগ করে সখের দলকে পেশাদারি দলে পরিণত করেন এবং নিজেই যুগপৎ বাঁধনদার ও গায়েন হয়ে আসরে অবতীর্ণ হন। সে যুগের বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা, ঠাকুর সিংহ, রামবসু প্রমুখ তাঁর কবি-গাহনার প্রতিপক্ষ ছিলেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (১৩০১), খনুলাল মিশ্র সম্পাদিত 'প্রাচীন ওস্তাদি কবিগান' (১৩০৩), প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' (১৯৫৮) ইত্যাদি কবিগানের সংগ্রহ গ্রন্থে এন্টনির বেশ কিছু গান সঙ্কলিত হয়েছে। **নূ. ই**

এন্টিগোনি : সফোক্লিস (৪৯৬-৪০৬ খ্রিঃ পূঃ) রচিত এই নাটকটি গ্রিক ভাষায় রচিত ট্রাজেডি নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম। এন্টিগোনি রাজা ইডিপাসের কন্যা। রাজা ইডিপাস যখন থিবিস থেকে বহিষ্কৃত হন এবং নির্বাসনে যান তখন এন্টিগোনি তাঁর সঙ্গে যায়। এর পরে ইডিপাসের দুই পুত্র সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দুই ভাই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়। থিবিস-এর রাজা ক্রেয়ন ঘোষণা করেন যে, ছোট ভাই ইটিওক্লিসকে বীরের মর্যদা দিয়ে সম্মানিত করা হবে। আর বড় ভাই পলিনিসেসকে দেশদ্রোহী অভিযুক্ত করে সমাহিত করা হবে না। এখান থেকেই 'এন্টিগোনি' নাটকের কাহিনীর সূচনা হয়। বড় ভাইকে কবর দেয়া হবে না এন্টিগোনি এটা কিছুতেই মানতে পারে না। সে বড় ভাইকে কবর দেবার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। এক সময়ে সে লাশ পাহারারত শান্ত্রীদের অসতর্ক মুহূর্তে পলিনিসিসকে কবর দিয়ে ফেলে। শুরু হয় রাজা ক্রেয়ন এবং এন্টিগোনির সংঘর্ষ। রাজা ক্রেয়ন এন্টিগোনিকে বন্দি করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। এন্টিগোনি ছিলো ক্রেয়নের ছোট ছেলে হ্যামনের বাগদত্তা। হ্যামন পিতার এই আদেশ মানতে পারে না। সে এন্টিগোনিকে যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিলো সেখানে যায়। দুজনেই আত্মহত্যা করে। এই ট্র্যাজেডির এখানেই শেষ। এই নাটকটির প্রধান দ্বন্দ্ব ছিলো স্বৈরাচারী রাজা ও একজন কর্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল নারীর মানবিক আবেগের দ্বন্দ্ব। নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন মোবাশ্বের আলী। প্রকাশ করে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ, ঢাকা। মূল্য : ৩০.০০ টাকা। **সে. হো.**

এপিঠ ওপিঠ : কবি হায়াৎ সাইফ ও আবু আবদুল্লাহর কবিতা নিয়ে যৌথভাবে প্রকাশিত একটি কবিতাগ্রন্থ। একই প্রচ্ছদে দুপাশ থেকে দু'জনের কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। হায়াৎ সাইফের কবিতাগুলো (১৬টি) মূলত নারী শক্তির মাহাত্ম্য, নরনারীর প্রণয়, প্রণয়ের অনাবিল শক্তি, জৈবিকতা ও জৈবিকতা-উত্তর ভালোবাসা প্রভৃতি প্রধান হয়ে উঠেছে। কবিতাগুলো সুখপাঠ্য। অন্যদিকে আবু আবদুল্লাহর ১৭টি

www.pathagar.com

কবিতা সংযোজিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় দেশ, সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের সংগ্রামী চেতনা। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, প্রচ্ছদ : বীরেন ঘোষ, প্রকাশক : শিল্পতরু প্রকাশনী, ২৯০ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা–১২০৫। মো. আ. মি.

এবং ইন্দ্রজিৎ : বাদল সরকার রচিত বহুবিতর্কিত নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫ সাল। নাটকটি অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। এর মধ্যে যেমন একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনী নেই, তেমনি ঘটনার পরিণতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলো হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ, অমল, বিমল, কমল এবং স্বয়ং লেখক। একমাত্র উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র মানসী। চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর জীবনদর্শন ব্যক্ত করেছেন। মৃত্যুকামনা এই জীবনদর্শনের অন্যতম বিষয়। মানসী তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে বহু ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ইন্দ্রজিৎ, অমল, বিমল এবং কমল তারা প্রত্যেকেই নিজেদের মানস-প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছে মানসীর মধ্যে। মানসী আসলে বহু নারীর প্রতিনিধি। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে বহু অসঙ্গতি ও অর্থহীনতার মধ্যেও জীবনদর্শনের সত্য পরিস্ফুট হয়েছে। নাট্যকারের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছে—অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ ও মানসী। তারা সকলেই জন্মায়, জীবনের নানা ক্রিয়াকর্মের মধ্যে নিজেদেরকে ছড়িয়ে দেয় এবং জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এই দর্শনের অর্থ হলো, জীবনটা আসলে অর্থহীন, মৃত্যুটাই সত্য। জীবনের অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবল বর্তমান মুহূর্তটি আলোর চুমকির মতো জ্বলে ওঠে পরিণামে এক সময় নিভে যায়। সুতরাং ইন্দ্রজিৎ সহজেই বলতে পেরেছে— 'এখনই মরি না কেন?' আ. ই

এবসার্ডবাদ : সাহিত্যে এবসার্ডবাদ বলতে জীবন সম্পর্কে এক মোহমুক্ত শূন্যতাবোধ অর্থাৎ মানবিক জীবনবোধের অর্থহীনতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ও যুক্তিনির্ভর সকল পদ্ধতিকে অস্বীকার করে শিল্পীর নিজস্ব অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় এবসার্ডবাদ সাহিত্যে ও শিল্পে। এতে জীবনদর্শনের কোনো সৎ উদ্দেশ্য নেই, জীবনকে কতকটা উদ্ভট ও আজগুবি করে ভাবাই এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাই এই জাতীয় সাহিত্যের কোথাও প্রশান্তি বা চিরন্তনতার আশ্বাস খুঁজে পাওয়া যায় না। এবসার্ড সাহিত্যের রচয়িতার কাছে পুরনো জীবনবোধ কিংবা প্রাচীন সমাজের আদর্শগত ভাবধারার কোনো মূল্য নেই। বিলাসের স্তূপ কিংবা সুখের আয়োজনের মধ্যে মানবাত্মার চরম মুক্তি কিংবা পরম প্রশান্তি নেই। এরূপ নৈরাশ্যের মধ্যেই এবসার্ডবাদের উদ্ভব। ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যে কারো কারো রচনায় এবসার্ডবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এবসার্ড নাটকের প্লট পরিকল্পনা কিংবা গঠনপদ্ধতি উদ্দেশ্যহীন, চরিত্রসৃষ্টি উদ্ভট ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে এতে কখনো কখনো আজগুবি জগতের কাণ্ডকারখানা বাস্তব জগতের নানা বিষয়ের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই বৈশিষ্ট্য সুররিয়ালিস্ট চেতনা বা মগ্নচৈতন্যের অনুভবের প্রসূনও বটে। আ. ই

এবাদত নামা : ষাটের দশকের কবি ফরহাদ মজহারের দশম কবিতার বই। চুয়াল্লিশটি নিরীক্ষাধর্মী সনেটের সংকলন এটি। প্রথম প্রকাশ : ৯ ফাল্গুন ১৩৯৬, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। প্রকাশক : প্রতিপক্ষ, ৫/৩ বারাবো মাহানপুর রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা–১২০৭। প্রচ্ছদ : আতিক মামুন। মূল্য : তিরিশ টাকা। বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে উল্লিখিত হয়েছে 'খ্রিষ্টীয় মনোগাঠনিক ভিত্তি ও মানসিক পরিমণ্ডলের ওপর ইয়োরোপীয় আধুনিকতার যে ধারা আমাদের সাহিত্যে এখনো প্রগতির লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত সে ধারা আদতে সাম্প্রদায়িক-কম্যুনাল। ঐতিহাসিক অবদান অবশ্যই আছে। তা সত্ত্বেও একই সঙ্গে তা সাম্রাজ্যবাদেরও মনোগাঠনিক ভিত্তি ও মানসিক পরিমণ্ডল। প্রগতির এই ধারা এই যোগসাজস সম্পর্কে

www.pathagar.com

আদৌ সতর্ক নয়। এই অসতর্কতা মারাত্মক।' শেষ প্রচ্ছদে উল্লিখিত এই ধারণার বিপ্রতীপ চেতনা বিস্তারের লক্ষে এই বইয়ের কবিতাগুলি লিখিত হয়েছে। শব্দানুষঙ্গে এর কবিতাগুলো আরবি-ফারসি বা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবহস্নিগ্ধ। ধার্মিকদের মনে যেমন সংশয় জেগে ওঠে, ধর্মবোধ যেভাবে মানুষকে সমর্পিত করে স্রষ্টার উদ্দেশে, জীবনের অপ্রাপ্তিগুলো যেমন অকস্মাৎ সৃষ্টিকর্তার ওপর অভিমানি করে তোলে অথবা আস্তিনাস্তির বোধ মানুষকে যেভাবে পীড়িত করে তার বোধ এবাদতনামার কবিতার প্রকীর্ণ ; অর্থাৎ ঈশ্বর আল্লা বা স্রষ্টা কিংবা ধর্মের প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাস সংশয় ইত্যাদি এর উপজীব্য বিষয়বস্তু। যদিও উৎসর্গ পদ্যে কবি বলেছেন , '...আমি লিখিয়াছি এই পদ্য প্রেমে ও এশেকে/লিখিয়েছি বুদ্ধিকে বানিয়ে ক্রীতদাস' তা সত্ত্বেও এবাদত নামা পরিপূর্ণভাবে বুদ্ধিরই কবিতা। আ. মা.

এম. আকবর আলী : বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক। পাবনা জেলার চর লক্ষ্মীপুর গ্রামে ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে রসায়নে এম.এস.সি. পাস করেন। অতঃপর কলকাতায় আয়কর বিভাগে নিরীক্ষকের চাকরি পান। ১৯৫৪ সালে আয়কর বিভাগে যুগ্ম-কমিশনার নিযুক্ত হন। ১২ খণ্ডে সমাপ্ত 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' (১ম খণ্ড ১৯৪৩) রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলমান বিজ্ঞানীরা গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্রে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যে সব অবদান রেখেছেন তার-ই ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এ সুবৃহৎ গ্রন্থে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : চাঁদ মামার দেশ (১৯৩৬), আলবেরুনী ও ইবন সিনা (১৯৪১), আরব রসায়নে সোনা তৈরি (১৯৬৮), Science in the Quran (১ম খণ্ড ১৯৭১, ২য় ও ৩য় খণ্ড ১৯৭৬), ইস্তাম্বুলের পথে পথে (১৯৯২)। ২০০১ সালের ১৮ জানুয়ারি তিনি মারা যান। নূ. ই.

এম আর আখতার মুকুল : লেখক, সাংবাদিক। ১৯৩০ সালের ৯ আগস্ট বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সাদত আলী আখন্দ। দিনাজপুর কারাগারে বন্দিদশায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করেন। লেখালেখি ও সাংবাদিকতা তাঁর পেশা। রাজনীতি ও ইতিহাস তাঁর লেখার বিষয়। মুজিবনগর সরকারের প্রকাশনা ও তথ্য বিভাগের পরিচালক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চরম পত্রের' লেখক ও পাঠক হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি যেসব বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন, সেই লব্ধ জ্ঞান ও সংগৃহীত দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে রচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ 'আমি বিজয় দেখেছি' (১৯৮৫)। পূর্ব বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবন ও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং মুক্তি-যুদ্ধের অভিজ্ঞান ও মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরব গাঁথা অবলম্বনে তাঁর অন্যান্য বই রচিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : রূপালী বাতাস (১৯৭৩), মুজিবের রক্ত লাল (১৯৭৬), লন্ডনে ছক্কু মিয়া (১৯৮১), ভাসানী মুজিবের রাজনীতি (১৯৮৪), আমি বিজয় দেখেছি (১৯৮৫), চল্লিশ থেকে একাত্তর (১৯৮৫), কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী (১৯৮৭), নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (১৯৮৭), ওরা চারজন (১৯৮৭), লেছড়াগঞ্জের লড়াই (১৯৮৮), একাত্তরের বর্ণমালা (১৯৮৯), একুশের দলিল (১৯৯০), মহাপুরুষ (১৯৯১), দুমুখী লড়াই (১৯৯২), আমাকে কথা বলতে দিন (১৯৯৩), হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদীর চোখে কবি নজরুল (১৯৯৪), কে ভারতের দালাল (১৯৯৫), বঙ্গবন্ধু (১৯৯৭), একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (১৯৯৭), পঞ্চাশের দশকের আমরা ও ভাষা আন্দোলন (১৩৯১)। বায়ান্নোর জবানবন্দী (১৩৯২)। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'স্বাধীনতা পদক' (২০০১) প্রদান করে। নূ. ই.

www.pathagar.com

এম.টি. বাসুদেবন নায়ার : মালয়ালম ভাষার প্রখ্যাত ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯৩৩ সালে কেরালার এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত তিনি আটটি উপন্যাস, আঠোরোটি ছোট গল্পের সংকলন, দু'টি ভ্রমণ কাহিনী, পাঁচটি সমালচনামূলক গ্রন্থ এবং দু'টি বাচ্চাদের জন্য বই রচনা করেছেন। ভারতীয় প্রতিটি ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও তাঁর একাধিক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। ইংরেজি তাঁর অনুবাদের একটি প্রধান ভাষা। চলচ্চিত্র তাঁর একটি প্রিয় বিষয়। তিনি এ পর্যন্ত পঞ্চাশটির মতো চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। এরমধ্যে অনেকগুলো বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রনাট্য রচনার জন্য তিনি চারবার ভারতের জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার তিনি পেয়েছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানপিঠ পুরস্কার, কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার, কেরালা সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার ইত্যাদি। তিনি কেলিকাট বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় কট্যান থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রিতে ভূষিত হন। এম. টি. বাসুদেবন নায়ার কেরালার সাহিত্যকে সমৃদ্ধি করেছেন তাঁর মানব জীবন সম্পর্কিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে। তাঁর চারপাশের চিরচেনা জগৎ, তাঁর শহর এবং তাঁর পরিচিত মানুষেরা তাঁর লেখায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ হয়ে উঠে আসে। সে. হো.

এমাজউদ্দীন আহমদ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। নবাবগঞ্জ জেলার গোহালবাড়ি নামক স্থানে ১৯৩৩ সালের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শামসুদ্দীন আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. এবং ১৯৬১ সালে ইংরেজিতে এম. এ. পাস করেন। 'Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth, Pakistan and Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৭৮ সালে কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর। ১৯৯২-১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাঁর লেখার বিষয়। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর রূপ, পররাষ্ট্র নীতির মৌল বৈশিষ্ট্য, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা, গণতন্ত্রের অতীত ও বর্তমান কাঠামো তিনি সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা (১৯৬৪), মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা (১৯৭৫), তুলনামূলক রাজনীতি : রাজনৈতিক বিশ্লেষণ (১৯৮২), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন (১৯৮০), বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮২), বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট (১৯৯১), বাংলাদেশ : সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি (১৯৯২), সমাজ ও রাজনীতি (১৯৯৩), গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (১৯৯৪), Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth: Bangladesh and Pakistan (1980), Development Administration : Bangladesh (1981), SAARC : Seeds of Harmony (1985), Military Rule and Myth of Democracy (1988)। নূ.ই.

এমিলিয়ার প্রেম : বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) রচিত রোমান্টিক প্রেমের গল্প। লেখকের 'মিসেস গুপ্ত' (এপ্রিল ১৯৩৪) গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গল্প। প্রথমে গল্পটির নাম ছিল 'ওথেলো'। পরে লেখক নামটি পরিবর্তন করে গল্পের নাম রাখেন 'এমিলিয়ার প্রেম'। গল্পটি এক অভিজাত নগর-জীবনের বাস্তব আলেখ্য। চিত্রশিল্পী ভাস্কর ও এককালের বহু ব্যক্তির হৃদয়হরণকারিণী এমিলিয়ার অন্ধপ্রেমের চিত্ররূপ এ গল্প। উভয়ের প্রেম যখন পরস্পরের নিবিড় সাহচর্যে দেহের অভ্যন্তরে নীড় রচনা করছে তখন সেখানে অতর্কিতে আবির্ভূত হয় প্রদোষ নামের এক ব্যক্তি। এমিলিয়ার দেহাশ্রিত ভাস্করের আত্মকেন্দ্রিক যৌনানুভূতি সেদিন সহসা তীব্র

www.pathagar.com

হোঁচট খায় অসহ্য ঈর্ষা আর সন্দেহের কুটিল তাড়নায়। আত্মসুখপরায়ণ মানুষের হাতে শুভবুদ্ধির যে অপমৃত্যু ঘটে এ গল্প তারই চমৎকার নিদর্শন। গল্পের শেষ দৃশ্য পাঠকের মনে এক ভয়াবহ অতিপ্রাকৃতের শিহরণ জাগায়। আত্মসুখপরায়ণ নায়ক এমিলিয়াকে অন্যের অংশীদার হতে কিছুতেই দেবে না। ঈর্ষার কুটিল অন্তর্দ্বন্দ্বে দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত ভাস্কর এমিলিয়াকে একান্তভাবে নিজস্ব করার জন্য ধীরে ধীরে তার তীক্ষ্ণ আঙুলগুলো অনায়াসে বসিয়ে দেয় ঘুমন্ত প্রেমিকার কোমল গলায়। বিস্ফারিত হয় এমিলিয়ার চোখ। ভাস্কর দুহাটু দিয়ে চেপে ধরে তার বুক। আহত পাখির মতো পাখা ঝাপটানোর পর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে এমিলিয়ার সুন্দর শরীর। মনে মনে ভাস্কর বলে, আর ভয় নেই, এখন সে চিরকাল আমার। এই দুর্ঘটনার মধ্য থেকে লেখক অনবদ্য শিল্প-কৌশলে গল্পের স্বপ্নিল ভাবময়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আ. ন. ম. র. ব.

এর উপায় কি : মীর মশাররফ হোসেন-রচিত প্রহসন। বইটির সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য সাধক' চরিতমালায় বলেছেন : 'এটি ১৮৭৫, ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়' বিজ্ঞপ্তি হয়েছিলো।' এর পরে কালী প্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকার ১২৮৩ সনের আশ্বিন সংখ্যায় এই বইটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সনের ১ কার্তিক, প্রকাশস্থান : টাঙ্গাইল। লেখক নিজেই বইটিকে প্রহসন বলে উল্লেখ করেছেন। এই বইয়ের বিষয় সমকালীন সময়ের শহুরে মানুষের সমস্যা। সে সময়ে এক শ্রেণীর লোক যে স্ত্রীর প্রতি অবহেলা দেখিয়েছিলো, মদ ও পতিতাবৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়ে নানা ধরনের অনাচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত হয়েছিলো। এই বই তারই একটি ব্যাঙ্গচিত্র। তবে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বইটির বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিলো। এই সমালোচনার নিন্দা সহ্য করে লেখক বলেছিলেন : 'সাধারণের উপকারের জন্য সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিতে কখনো সঙ্কোচিত হইবো না।' এভাবেই মীর মশাররফ হোসেন নিজের শিল্পী সত্তাকে অক্ষুণ্ন রাখায় সচেষ্ট ছিলেন। সে. হো.

এলাটিং বেলাটিং : কবি শামসুর রাহমানের প্রথম ছড়ার বই। মোট একুশটি ছড়া দিয়ে এ বই সাজানো। ছড়াগুলোর বিষয় বহুমুখী। শিশু-মনস্তত্ত্ব-সংলগ্ন বিষয় অনুষঙ্গের পাশাপাশি আধুনিক নগরজীবনের নানা চমকপ্রদ উপাদানেরও সন্নিবেশ ঘটেছে ছড়াগুলোতে। লোকছড়ার আদলে আধুনিক ভাবধারার প্রকাশই ছড়াগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবির কল্পনার বৈভবে বইয়ের প্রতটি ছড়াই পেয়েছে নতুন মাত্রা। গ্রন্থে রয়েছে তাঁর বিখ্যাত ছড়া 'আঁটুল বাঁটুল'। আঁটুল বাঁটুল শামলা সাঁটুল, শামলা গেছে হাটে।/ কুঁচবরণ কন্যা যিনি, তিনি ঘুমান খাটে।/খাট নিয়েছে বোয়াল মাছে, কন্যে ব'সে কাঁদে,/ ঘটি-বাটি সব নিয়েছে, কিসে তবে রাঁধে?/ আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা, ছোলা ভাজা খেয়ো,/মাটির ওপর মাদুর পেতে ঘুমের বাড়ি যেয়ো। 'এলাটিং বেলাটিং' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রকাশক আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা। বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী কালাম মাহমুদ ও অলঙ্করণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন শিল্পী রফিকুন নবী। সু. ব.

এলিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড বা আজব দেশে এলিস : ইংরেজ শিশুসাহিত্যিক লুইস ক্যারোল রচিত একটি শিশুতোষ উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকৃত নাম 'এলিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'। তবে সংক্ষেপে এটি এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড বা আজব দেশে এলিস নামে অধিক পরিচিত। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র এলিস নামের একটি ছোট্ট মেয়ে। এলিস নদীর ধারে বসে তার বড় বোনের কাছে

www.pathagar.com

গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে এবং স্বপ্ন দেখতে থাকে। স্বপ্নে সে এক সাদা খরগোশের পিছু ছুটতে গিয়ে গভীর গর্তে পড়ে এক আজব ও মজাদার জায়গায় পৌঁছে যায়। জায়গাটা অদ্ভুত সব জীব-জানোয়ারে ভরা। সেখানে এলিসের শরীরের আকার আকৃতিও বদল হতে থাকে হঠাৎ হঠাৎ। সে দেশের রানী খেলছিল এক আজব খেলা, তাস দিয়ে উইকেট তৈরি করে বলের বদল রানী কাটাচুয়াকে পেটাচ্ছিল গোলাপি রাজহাঁসের ঠোঁট দিয়ে। খেলতে খেলতে রানী হঠাৎ এলিসের ওপর ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠল—"কে আছিস! ওর মাথাটা এখনই কেটে ফেল।" এলিস এবার দৌড়ে পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে শূন্যে ভাসতে থাকে। এমন সময় বড় বোনের ডাকে তার ঘুম ভাঙে এবং সে বাস্তবে ফিরে আসে। 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' রচিত হয় ১৮৬৫ সালে। রচয়িতার প্রকৃত নাম চার্লস লাটউইজ ডজসন। তিনি অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন। উক্ত কলেজের ডীন হেনরি জর্জ লিজেলের ছিল তিন কন্যা। ডজসন তিন শিশু কন্যাকে খুব ভালোবাসতেন এবং নানা সময়ে তাদের মজার মজার গল্প বানিয়ে শোনাতেন। এক বড়দিনের উৎসবে তাদের 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' গল্পটি তিনি শোনান, পরে কাহিনী হাতে লিখে তিনি তাঁর সহকর্মীর মধ্যম মেয়ে এলিস নিভেলকে উপহার দেন। এটি বই আকারে প্রকাশ হতে পারে এমন চিন্তা তখনো তাঁর ছিল না। পরবর্তীকালে দু'জন লেখকের পরামর্শে লিউইস ক্যারোল ছদ্মনামে বইটি প্রকাশ করেন। শিল্পী স্যার জন টেনিয়েল বইটির অলঙ্করণ করেন। আজব পটভূমি ও অদ্ভুতুড়ে ঘটনা বিন্যাসের জন্য বইটি তখনই চারদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এখন এটি শুধু শিশুসাহিত্য হিসেবে নয়, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা সম্পদ হিসেবেও বিবেচিত হয়। সু. ব.

এলেবেলে : জিয়া হায়দার। প্রকাশক : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮১। 'এলেবেলে' জিয়া হায়দারের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। উল্লেখযোগ্য, কারণ ইমপ্রোভাইজেশনকে অবলম্বন করে রেনেসাঁ-ইউরোপে 'কমেডিয়া ডেল আর্ট' নামে যে নাট্যধারা সূচিত হয়, 'এলেবেলে' সেই ধারা অনুসরণেই রচিত। বাংলাদেশের নাটকে এই ধরনের নাটকের সংখ্যা খুবই কম। এই নাটকেও লক্ষণীয়, ইমপ্রোভাইজেশনে সাধারণত একটিমাত্র পরিস্থিতি অথবা কাহিনীক্রম (সিনারিও) দেয়া হয় ; কুশীলবরা নিজ দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তায় তাকে এগিয়ে নিয় যায়, নাটকীয় পরিণতি দান করে। ষাটের দশকে পাশ্চাত্যে রেস্টুরেন্ট থিয়েটারের যে প্রচলন ঘটেছিলো, 'এলেবেলে'-র উপস্থাপনাও সেই রেস্টুরেন্টেই। নাট্যকার জিয়া হায়দার 'কমেডিয়া ডেল আর্টে'-র চারিত্র বজায় রেখেই পরিবেশন করেছেন 'এলেবেলে'। স্বচ্ছন্দ সংলাপ, কৌতুকময় কাহিনী ও ঘটনার গতি নাটকটিকে পাঠে ও সঙ্গে উপভোগ করে তুলতে সক্ষম। র. হা.

এলোপাতাড়ি : এলোপাতাড়ি সুকুমার বড়ুয়া রচিত ছড়ার বই। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৮০। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : লাজিনা মুনা, বয়স ১১। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৬, মূল্য : সাত টাকা। সুকুমার বড়ুয়ার ৩১টি ছড়া বইটিতে স্থান পেয়েছে। বেশির ভাগ ছড়াই শিশু-মনস্তত্ত্ব সংলগ্ন। সুকুমার বড়ুয়ার স্বভাবজাত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার ছন্দময় প্রকাশই ছড়াগুলোর বৈশিষ্ট্য। বইটির বাড়তি আকর্ষণ শিশু চিত্রশিল্পী লাজিনা মুনার অংকন। লাজিনা মুনা প্রতিটি ছড়ার কেন্দ্রীয় ভাবকে তার তুলিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। একজন শিশু-চিত্রশিল্পী কর্তৃক শিশুতোষ ছড়ার বই অলঙ্করণের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। সু. ব.

এশিয়াটিক সোসাইটি : এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি এবং এশীয় সমাজ, ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠান। ১৭৮৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের

www.pathagar.com

তদানীন্তন বিচারপতি ও প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম জোনস-এর উদ্যোগে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন নাথানিয়েল হেলহেড, চার্লস উইলকিনস, হেনরি টমাস কোলব্রুক, তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ ইংরেজ। উইলিয়াম জোনস ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং ১৭৯৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। জর্জ বার্লো এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এ প্রতিষ্ঠানের পাঁচ জন নির্বাচিত দেশীয় সদস্য ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস, রসময় দত্ত ও রামকমল সেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বিদগ্ধ ব্যক্তিই এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারতেন। প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল Asiatick Society. ১৮২৫ সালে নামটির বানান পরিবর্তন করে লেখা হয় Asiatic Society. ১৮৩২ সাল থেকে জেমস প্রিন্সেপ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (Journal of the Asiatic Society of Bengal) ছিল একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রকাশনা। এ পত্রিকা এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করতো। ১৮৪২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি উক্ত জার্নালের মালিকানা গ্রহণ করে। তবে নামটি অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৩৬ সালে একটি চার্টারের মাধ্যমে এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন নামকরণ হয় 'দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (The Royal Asiatic Society of Bengal). কিন্তু ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে আবার প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তিত হয়ে তা 'এশিয়াটিক সোসাইটি' হিসেবে পরিচিত হয়। ১৮৩২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত জার্নালটি 'দি জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এটির নাম ছিল 'জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' শিরোনামে। ১৯৫৩ সালে পুনরায় জার্নালটির শিরোনাম হয় 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি'। অন্যদিকে আরেকটি জার্নাল Asiatick Researchers ১৭৮৮ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার নবমূল্যায়ন ও পুনর্নির্মাণে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্যার উইলিয়াম জোনস এবং তাঁর সমসাময়িক প্রাচ্যবিদ ও ভারততত্ত্ববিদদের নিরন্তর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার ফলে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নের পথ উন্মুক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার বিকাশ এবং মুক্তবুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রেও এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রেরণা অনুভূত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮২৯ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড' (The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland). এই প্রতিষ্ঠানের চ্যাপটার হিসেবে বোম্বেতে গড়ে ওঠে 'বোম্বে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি' (Bombay Royal Asiatic Society)। একইভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, টোকিও, আমেরিকা ও পাকিস্তানে। কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান নাম 'ক্যালকাটা এশিয়াটিক সোসাইটি'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান'-এর নাম হয়ে যায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ'। বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির আদর্শ ও উদ্দেশ্য এক হলেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। ভাবধারায় অভিন্ন হলেও সংগঠন হিসেবে প্রতিটিই নিজস্ব বিধিবিধান ও পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই মুনাফামুক্ত, বেসরকারি এবং অরাজনৈতিক। আদর্শগত দিক থেকে এশিয়া বিষয়ক গবেষণাই এশিয়াটিক সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য।

ড. শা. আ.

www.pathagar.com

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ : প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম জোনস ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তিত হয়ে অবেশেষে নামকরণ হয় ক্যালকাটা এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর নতুন প্রেক্ষাপটে তৎকালীন পাকিস্তানে একই নামে ভিন্ন একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ক্যালকাটা এশিয়াটিক সোসাইটির আদর্শ অনুসরণ করেই ১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান। এর প্রতিষ্ঠায় প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এটি একটি মুনাফামুক্ত, অরাজনৈতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-এর আওতায় একটি নির্বাচিত পরিষদ দ্বারা এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান পরিচালিত হতো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, এশিয়ার মানুষ, সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মাসিক গবেষণাধর্মী বক্তৃতার আয়োজন, গবেষণামূলক জার্নাল (৩টি) ও গ্রন্থ প্রকাশ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন, দেশের ও বিদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের দ্বারা গবেষণাভিত্তিক বক্তৃতার আয়োজন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এশিয়া বিষয়ক গবেষক ও পণ্ডিতগণ এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারেন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এই সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর আয়ের উৎস সদস্যদের চাঁদা, অনুদান, প্রকাশনা বিক্রয়, সরকারি অনুদান এবং সোসাইটিতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ট্রাস্ট। উল্লেখ্য, সোসাইটির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য ১৩টি ট্রাস্ট রয়েছে। সোসাইটি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকদের এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. পর্যায়ে গবেষণার জন্য স্কলারশিপ এবং পিএইচ.ডি.-উত্তর গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করে। দেশ-বিদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতদের সম্মানসূচক ফেলোশিপও সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। এ ছাড়া নির্বাচিত গবেষণার জন্য লেখক-গবেষকদের স্বর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, তিনজন সহ-সভাপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ, দুইজন ফেলো এবং দশজন সদস্য। এ প্রতিষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য কাজের নিদর্শন হলো "বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকল্প"-এর আওতায় তিন খণ্ডে বাংলা ও ইংরেজিতে "বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)" শীর্ষক প্রকাশনা। তিনটি নিয়মিত ষান্মাসিক প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে--Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities), Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Sciences) এবং এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা। সোসাইটি থেকে একটি Newsletter ও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া রয়েছে সোসাইটি কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত অসংখ্য গবেষণাভিত্তিক ও নিরীক্ষাধর্মী গ্রন্থ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও ব্যাপক প্রকল্প "বাংলাপিডিয়া প্রকল্প" (National Encyclopedia Project of Bangladesh). পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৯৮ সালের জানুযারি মাসে এবং এটি সম্পন্ন হবে ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে। বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হবে দশ খণ্ডে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য এই বাংলাপিডিয়ার মাল্টিমিডিয়া (সিডি রোম) সংস্করণও থাকবে। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধানে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে। এ ছাড়া প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং দুষ্প্রাপ্য দলিলও এখানে

www.pathagar.com

সংরক্ষিত আছে। আরও রয়েছে বিখ্যাত চিত্রকর ও ভাস্করদের ছবি ও ভাস্কর্য সম্বলিত একটি স্থায়ী গ্যালারি। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় অবস্থিত ঢাকার নিমতলীতে ৫ নং পুরাতন সেক্রেটারিয়েট রোডে। ড. শা. আ.

এশিয়ার গল্প : কিশোরদের উপযোগী এই গল্পগুচ্ছের মধ্যে বিভিন্ন দেশের একটি সাংস্কৃতিক রূপরেখা পাওয়া যাবে। এতে ইরান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, বার্মা, ভারত, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, জাপান ও সিঙ্গাপুরের একটি করে গল্প আছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে এশীয়-সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করার উদ্দেশ্যে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করার প্রকল্প গ্রহণ করেছে এশিয়ান কালচারাল সেন্টার ফর ইউনেস্কো। মূল বইটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে জাপান থেকে। বাংলা সংস্করণের অনুবাদকরা হলেন— আসাদ চৌধুরী, সুব্রত বড়ুয়া, রশীদ হায়দার ও সেলিনা হোসেন। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১০৬, মূল্য ২০.০০ টাকা। বি. ব.

এষা : অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) রচিত একটি শোককাব্য। অক্ষয়কুমারের এ কাব্যে পত্নীপ্রেম অভিব্যক্ত হয়েছে। পত্নীর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত কবি শোক অশৌচ, শ্রাদ্ধশান্তি পর্বে জন্ম-মৃত্যু-প্রেম-জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা উপলব্ধি তত্ত্ব ও তথ্য এ কাব্যে পরিবেশন করেছেন। কাব্যের প্রকাশকাল ১৯১২ সাল। কবির অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা জীবন-মৃত্যুর সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের বৃহত্তর ব্যঞ্জনার মধ্যে কবি আশ্বাসের সান্ত্বনা লাভ করেছেন। মানবী গৃহলক্ষ্মী যেন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই 'বিশ্বরমা'য় পরিণত হয়েছেন। কবির শিল্পীমানস পরিচিত জীবন পরিবেশ ও বাঙালি হিন্দুর গার্হস্থ্য ধর্মবোধকে একসূত্রে গেঁথেছে এবং মানবমনের শোক ও বেদনাকে এক সর্বজনীনতার ভিত্তিতে ব্যক্ত করেছে। কবি বলেছেন—, 'নহে কল্পনার লীলা। স্বরগ নরক বাস্তব জগৎ এই মর্মান্তিক ব্যথা। নহে ছন্দ, ভাববন্ধ, বাক্য রসাত্মক। মানবীর তরে কাঁদি - যাচি না দেবতা।' এ কাব্যে তাঁর ঐহিক-জীবনপ্রীতি পরিব্যক্ত। মু. আ.জ.

এস. এম. সুলতান : প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। বাংলাদেশের নড়াইল জেলার মাসিমদিয়া গ্রামে ১৯২৩-এর ১০ আগস্ট এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মেছের ধাউড়িয়ার পেশা ছিল রাজমিস্ত্রিগিরি। স্থানীয় স্কুলে পাঠকালে নিজে নিজেই ছবি আঁকা শেখেন। কাঠ-কয়লা, কাঁচা হলুদ ও পুঁই ফলের রস দিয়ে ছবি আঁকতেন। এসব ছবি স্থানীয় জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের নজরে পড়ে। পুরস্কারস্বরূপ তিনি সুলতানকে ছবি আঁকার রং, তুলি কিনে দেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করার আগে একদিন বাড়ি থেকে সঙ্গোপনে কলকাতায় চলে চান। ছবি আঁকার সুবাদে বিখ্যাত চিত্রসমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী সুলতানকে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তিন বছর পরে আর্ট স্কুল ত্যাগ করে সুলতান ভবঘুরে জীবন শুরু করেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) কাল। পাঁচ-দশ টাকার বিনিময়ে গোরা সৈন্যদের ছবি আঁকতেন, আর ভারতের শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে পাকিস্তানে আসেন। করাচী আর্ট স্কুলে দুই বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেন। সেসব স্থানে ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৫ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে চিত্রা নদীর তীরে জন্মভূমি নড়াইলের মাসিমদিয়া গ্রামে স্থায়ী বাসস্থান রচনা করেন। যুগ প্রবর্তক চিত্রশিল্পী। বাংলাদেশের পাড়াগাঁর গতর খাটা মানুষের নির্মল জীবন ও সে জীবনের নির্যাস অনুসন্ধান তাঁর চিত্রকলার প্রতিপাদ্য। কৃষক, জেলে, কুমার তথা পল্লীর শ্রমজীবী মানুষের জীবন, জীবিকা, সংগ্রাম,

www.pathagar.com

সমস্যা, সঙ্কট তাঁর চিত্রের ক্যানভাসে উদ্ভাসিত হয়েছে। চিত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে কর্মজীবী মানুষের জীবন ধারণের প্রতীক কুঁড়ে ঘর, গাছপালা, গরু-মহিষ, চাষের যন্ত্রপাতি, মাছ ধরার সরঞ্জাম ; সংগ্রামের প্রতীক ঢাল, রামদা, বল্লম, লাঠি। সুলতানের তুলিতে বাংলার কৃষক-কৃষাণী অঙ্কিত হয়েছে বীর হিসেবে। তাদের এঁকেছেন পেশীবহুল শক্তিশালী নর-নারী রূপে। কৃষক সমাজকে বলবান রূপে অঙ্কন করে বাংলাদেশের চিত্রকলায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। অকৃতদার এস. এম. সুলতান (শেখ মুহম্মদ সুলতান) ছিলেন আত্ম-প্রচারাবিমুখ, সংসার বিরাগী ও প্রেমের অবতার কৃষ্ণের অনুরাগী। চিত্রকলায় অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশে পদক' (১৯৮৬)-এ ভূষিত করে। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। কথাশিল্পী হাসনাত আবদুল হাই তাঁর জীবন অবলম্বন করে 'সুলতান' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসটি ভিন্ন আঙ্গিকের কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এস. এম. সুলতানকে নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি হয়। **নূ. ই**

এস এম সুলতান স্মারক গ্রন্থ : সম্পাদনা সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সবীর চৌধুরী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৯৯৫ সালে এ স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করে। বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের কর্মময় জীবন ও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কিছুটা পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। সংকলন গ্রন্থটিতে মোট বত্রিশটি রচনা স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : সুলতানের ছবি—আবদুর রাজ্জাক, শেখ মুহম্মদ সুলতন—কবির চৌধুরী, সুলতান তাঁর সালতানাত ত্যাগ করেন নি—শামসুর রাহমান, দেশজ আধুনিকতা॥ সুলতানের কাজ—বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সুলতানের শিল্পকর্ম—নজরুল ইসলাম, সুলতান ভাই : কিছু স্মৃতিকথা--সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আমার দেখা সুলতান—রফিকুন নবী, অভিনব উদ্ভাসন—আহমদ ছফা, আমার স্মৃতিতে সুলতান--শাহাবুদ্দীন আহমেদ, শিল্পী সুলতান ও তাঁর লৌকিক ঐতিহ্যশালী অতীতাগ্র যাত্রা—রবিউল হুসাইন ইত্যাদি। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সুলতানের ছবি সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : সুলতান বাংলা এবং বাঙালি বিষয়বস্তু নিয়ে যে সকল ছবি এঁকেছেন, সেগুলো দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে সব মানবের উজ্জ্বল উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে। এস এম সুলতান স্মারক গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্র এবং শিল্পীর চিত্রকর্মের রঙিন স্বচ্ছচিত্র গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদা এনে দিয়েছে। **শা. আ.**

এসরাজ : সঙ্গীতের অনুগামী একটি বাদ্যযন্ত্র। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য বিশেষভাবে এসরাজের ব্যবহার হয়ে থাকে। এসরাজ একটি সুমধুর স্বরের তারযন্ত্র। এর সুরে একটি করুণ মূর্ছনা থাকে যা শ্রোতাকে অভিভূত ও আবিষ্ট করে। এসরাজ এককভাবেও বাজানো যায়। আবার উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে বাজানো হয়। সারিন্দা, সেতার ও সরেঙ্গী — এই তিন যন্ত্রের সমন্বয়ে এসরাজের সৃষ্টি। এই যন্ত্রের আরেক নাম 'আশুরঞ্জনী'। এসরাজের দুটি অংশ থাকে। উপরের অংশের নাম দণ্ড আর নিচের অংশ খোল। দণ্ড ও খোল কাঠের তৈরি। দণ্ডের ভিতরটা ফাঁপা। নিচের খোলের ভিতরে খোদাই করা। এসরাজের আকৃতি মাঝারি ধরনের। খোলটি চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত। চামড়ার ছাউনির উপর একটি হাড়ের সোয়ারি বসানো। সোয়ারিতে বারোটি ছিদ্র রয়েছে। এসরাজের প্রধান চারটি তার সোয়ারির উপর দিয়ে এবং বারোটি তরফের তার বারোটি ছিদ্র দিয়ে সংযুক্ত। এই যন্ত্রের দণ্ডের বুকে একটা চ্যাপ্টা ও পাতলা কাঠের ঢাকনি থাকে। এটির নাম পটরী। পটরীর উপর ষোলটি পেতলের পর্দা বা সারিকা শক্ত সুতো দিয়ে জড়ানো থাকে। পটরীর উপরের প্রান্তে দুটি হাড়ের তারগহণ লাগানো হয়। কাঠের বা স্ক্রুর

www.pathagar.com

তৈরি প্রধান চারটি বয়লা এসরাজের দণ্ডের মাথার দিকে সংযোজিত হয়। খোলের শেষ প্রান্তে থাকে লেঙ্গুট বা টেলপীস। এসরাজের দণ্ডের পাশে পৃথক একটি লম্বা কাঠে বয়লা লাগিয়ে তরফের তারগুলো যুক্ত করা হয়। এই তার ব্যবহৃত হয় অনুরণনের জন্য। বাম হাতের তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে তারগুলি পর্দার সঙ্গে টিপে ছড় টেনে এসরাজ বাজাতে হয়। ছড়টি লম্বা এবং কাঠের তৈরি। এতে ঘোড়ার লেজের চুল লাগানো হয়। এসরাজের মতো আরও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র আছে। যেমন : দিলরুবা, মনোহরা, মন্দ্রবাহার ও তারসানাই। এসরাজের প্রধান তারের সঙ্গে একটি সাউন্ডবক্স সংযোগ করে 'তারসানাই' তৈরি করা যায়। মিষ্টি সুরের জন্য সঙ্গীত জগতে এসরাজ যন্ত্রটি সমাদৃত। এসরাজ বাদকদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ওস্তাদ ইসরাইল খাঁ ও ওস্তাদ ফুলঝুরি খাঁ। **ড. শা. আ.**

এসো ছড়া পড়ি – দুই : সম্পাদক– গোলাম কিবরিয়া। শিশুতোষ ছড়া-কবিতার সংকলন। প্রকাশনা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা। প্রচ্ছদ : হাশেম খান, অঙ্গসজ্জা : রফিকুন নবী, গোলাম সারোয়ার, সৈয়দ এনায়েত হোসেন ও রেজাউন নবী। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯৬ , জুলাই ১৯৮৯। মূল্য : পঁচিশ টাকা। আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষের দশমপূর্তি উপলক্ষে এসো ছড়া পড়ি– দুই প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে সংকলিত ছড়া-কবিতাগুলো ইতোপূর্বে মাসিক শিশু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে দেশের নবীন-প্রবীণ নিরানব্বই জন ছড়া-লেখকের ছড়া-কবিতা স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মহান ভাষা আন্দোলন, সামাজিক চিত্র, সুখ-দুঃখ, হাসি এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সংকলিত ছড়ায় বিষয়-আশয়। বিষয়-বৈচিত্র্যে ছড়া-কবিতার এই বিপুলতা ছড়া পাঠকদের জন্য নিশ্চয়ই সুখবর। এসো ছড়া পড়ি–দুই-এ যাঁদের লেখা স্থান পেয়েছে, তাদের মধ্যে আহসান হাবীব, সরদার জয়েন উদ্‌দীন, সানাউল হক, আতোয়ার রহমান, শামসুর রাহমান, গাজী খোরশেদুজ্জামান, আবুল হোসেন মিয়া, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, শামসুল হক, হাকিম ভাই, জাহানারা আরজু, হালিমা খাতুন, এখলাস উদ্দিন আহমদ, লুৎফর রহমান সরকার, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবুবকর সিদ্দিক, সুকুমার বড়ুয়া, মোহাম্মদ মোস্তফা, রফিকুল হক, মহাদেব সাহা, শিকদার আমিনুল হক, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ এবং আরো অনেকে। **খা. বি. জ.উ.**

এসো তুমি পুরাণের পাখি : মহাদেব সাহা। কবিতাগ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী, ৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : ৪০.০০ টাকা। ছত্রিশটি কবিতার সংকলন। বইয়ের নাম কবিতা 'এসো তুমি পুরাণের পাখি?' এই কবিতায় কবি বারবার পুরাণের পবিত্র পাখিকে আবাহন করেছেন। বলেছেন অতিথি পাখিদের এই বাংলায় আগমন করতে। এখানে হয় তো মায়াময় সরোবর নেই ; নেই রূপালি ঝর্নার জল। তবুও কবি আশা করেন পুরাণের পাখি বাস্তবের ভয়াল আকাশ ঢেকে দেবে পাপড়ি খচিত তার সহস্র পাখায়। কবিতার শেষে কবি পুরাণের পাখিকে স্বরস্বর-সভার রাজ হাঁস হিসেবে অভিহিত করেছেন। 'মানুষ বলেই' কবিতায় কবি একবিন্দু জলের জন্য বিলাপ করেছেন। 'জীবনের পাঠ' থেকে শিক্ষা নিতে গিয়ে কবি প্রথমে বৃক্ষের কাছে গিয়েছিলেন, বৃক্ষ বলেছে, 'শোনো, এই সহিষ্ণুতাই জীবন।' নদীর কাছে গেলে নদী বলেছে, 'দুঃখের অপর নাম জীবনযাপন।' মৌন পাহাড়ের কাছে যেতেই পাহাড় নিজেকে দেখিয়েছে। সবশেষে চঞ্চল শিশু বলেছে, 'এসো খেলা করি আমরা দু'জনে।' 'ভালো ভাষা' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন ভালবাসার জন্য মানুষের এত হাহাকার কেন। 'তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ' কবিতায় কবির আবেগের

www.pathagar.com

আতিশয্য ঘটেছে। কবির দৃষ্টিতে এখনও পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছে ; যাদের স্নিগ্ধ, ছায়াময় ছায়ায় কিছুক্ষণ অবস্থান করা যায় ('কেউ কেউ')। উল্লেখ্য যে, এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতার সাথে কবিতা রচনার তারিখ মুদ্রিত রয়েছে। সৈ. আ. জা.

এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে : আবদুল্লাহ আল-মুতী রচিত শিশু-কিশোর উপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। এবং এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৫৫ সালের মে মাসে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫ বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : রফিকুন নবী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০। এই বইয়ে লেখকের মোট তেরোটি রচনা স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন জিনিসের আবিষ্কারের কথা ও পরিচিতি গল্প বলার ঢঙে লেখাগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনায় এরকম প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গি ছিল একেবারে অভিনব। সুন্দর সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় ও তথ্য পরিবেশনের জন্য অচিরেই এটি একটি মজার বই হিসেবে পাঠক প্রিয়তা লাভ করে। রচনার শিরোনামগুলোও আকর্ষণীয়। যেমন : নুনের আবিষ্কার ও প্রসার বিষয়ে আলোচিত রচনাটির নাম 'নুনের মতো ভালোবাসা', ভূমিকম্প পরিচিতিমূলক অংশের নাম 'টলমল পদ ভার' ইত্যাদি। পঞ্চাশের দশকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' একটি উল্লেখযোগ্য বই। সু. ব.

এ্যাগনেস স্মেডলীর জীবন গল্প মৃত্তিকা কন্যা : মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন শামীম আখতার। ৪০০ পৃষ্ঠার বইকে ১৭২ পৃষ্ঠায় অনুসৃজন করেছেন বলে লিখেছেন শামীম আখতার। এ্যাগনেস নাৎসী বিরোধী সাংবাদিকতার জন্য হয়রানির শিকার হন, সোভিয়েত রাশিয়ায় অনাথ শিশুদের জন্য রক্ষণাগার তৈরি ও সেখানে বিভিন্ন সময়ে অবস্থানের জন্য রাশিয়ার চর বলে ধিকৃত হন মার্কিন দেশে। শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বরাবরই উচ্চকণ্ঠ। এসব কথা বিবৃত হয়েছে 'ডটার অফ আর্থ' বা মৃত্তিকা কন্যায়। উত্তর আমেরিকার মিসৌরীর ধূসর প্রান্তরের মাটি মেখে তাঁর বড় হওয়া। বাবা রেড ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত, মা ইউরোপীয়। বাবার খামখেয়ালিপনায় দুঃসহ দারিদ্র্যে বেড়ে ওঠা, মায়ের পরিচারিকাবৃত্তির মাধ্যমে লেখাপড়া, কৈশোরে পরের বাড়িতে খেটে তিলেতিলে নিজেকে গড়ে তোলা, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্বরূপে বিকাশের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে মৃত্তিকা কন্যায়। দ্বিতীয় স্বামী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর এ্যাগনেস মানসিক-ভাবে ভেঙে পড়েন। আরোগ্য লাভের জন্য ডেনমার্কে অবস্থান কালে তিনি রচনা করেন তার জীবনের গল্প এই বই। এ্যাগনেসের আত্মচরিতের বিশাল পটভূমি জুড়ে মূর্ত হয়ে ওঠে বিপন্ন জীনের ক্লিন্নতা বর্জন এবং সুন্দরকে আঁকড়ে ধরে মনুষ্যত্বের বিশ্বস্ততম রূপকে সংহত করা তাঁর প্রগাঢ় সাধনা। এই সংগ্রামী নারীর জীবন বৃত্তান্ত চেতনমূলে শক্তি সঞ্চার করে। বইটি জার্মানি, জাপানি ও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। অনুসৃজনকারী শামীম আখতার, বাংলাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন কর্মী। বইটির প্রকাশক : রূপান্তর প্রকাশনা, ৪২ কাপ্তান বাজার, ঢাকা ১২০৩। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, মূল্য : ৮০ টাকা। বি. ব.

এ্যাবসার্ড নাটক : অস্তিত্ববাদী ধ্যান-ধারণা, বিচ্ছিন্নতাবোধ অথবা অধিবাস্তব চেতনার দ্বারা যেসব নাটকের জন্ম, সেগুলোকে এ্যাবসার্ড নাটক বলা হয়। আজকের দিনে অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন সমস্যা ও যন্ত্রণাকর অবস্থার চাপে কখনো হতাশাগ্রস্ত, কখনো সমাজ এবং যৌথ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মানুষের মনে প্রত্যয় জন্মেছে যে জীবন অর্থহীন এবং একটা বোঝা বিশেষ। এ্যাবসার্ড নাটকের রচয়িতার মনেও এই বোধের প্রাধান্য থাকায় তাঁর রচিত নাটকে দেখা যায় জীবন কখনো অবিশ্বাসের, কখনো অকল্যাণের আবার

www.pathagar.com

কখনোবা অসহায়তার আকর হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহ্যময় জীবনবোধ বা প্রাচীন সমাজের আদর্শগত মূল্যও এসব নাটকে অর্থহীনরূপে বিবৃত হয়। এ্যাবসার্ড নাটক তাই মানবাত্মার মুক্তি বা শান্তি অথবা বিশ্বাসের আশ্বাস দেয় না। নাট্যকারও এতে জগৎ ও জীবনকে মিথ্যা ও মায়া ভেবে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি, স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগাযোগ কতটা এবং মানুষের ইচ্ছার পরিণতিই বা কি ইত্যাদি প্রশ্ন রাখলেও তার কোনো সদুত্তর দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন না। স্বভাবতঃই তাঁর নাটকে বাস্তবের চেয়ে উদ্ভট বস্তুর আমদানি হয় বেশি। প্রেমের কাহিনী বর্ণনায় নাট্যকার প্রেমকে অস্বীকার করে কাহিনীর মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেন। এই জাতীয় নাটকের গঠনপদ্ধতিও থাকে শিথিল, প্লট সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই ; যে-কোনো স্থান থেকে যেমন খুশি বা যেন-তেন উপায়ে কাহিনীর শুরু এবং যখন খুশি তার পরিসমাপ্তি, পাত্রপাত্রীদের মুখে অর্থহীন চটকধারী উক্তি ছাড়া কোনো কল্যাণপ্রদ বা সুস্থ মানসিকতার প্রকাশ থাকে না। উদ্ভট চরিত্র এবং উদ্ভট কাহিনীই হচ্ছে এ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য। যেমন, মৃতদেহের নড়ে-ওঠা, মানুষের আকাশে উড়ে বেড়ানো ইত্যাদি। ব্রেখট প্রমুখ কয়েকজন এখন এ্যাবসার্ড নাট্যকার হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। আ. ই

এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। গ্রিক পণ্ডিত প্লেটোর অন্যতম উত্তরসূরী-শিষ্য এ্যারিস্টটল যাঁকে বলা হয় 'জ্ঞানীদের শিক্ষক' এবং যাঁকে 'পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক' বলে অনুমান করা হয়—কাব্য ও সাহিত্যিক দর্শন বিষয়ে তাঁর মতবাদ ও বক্তৃতামালার অনুবাদ ও আলোচনা সম্বলিত প্রবন্ধের বই। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ সালে রচিত এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের অধ্যায় বিভাজিত ও শিরোনামচিহ্নিত বক্তৃতামালা সংকলিত করবার আগে সাইত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্যবহুল ভূমিকায় বইটিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি লেখকের পরিচয় ও জ্ঞানপরিধির পূর্বাভাস, তাঁর প্রতিভাবিকাশের পটভূমি, সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তাঁর মৌলিক স্বাতন্ত্র্য আলোচিত হয়েছে। এছাড়া রচনার আড়াই হাজার বছর পরেও সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরিস্টটলের মতবাদের অপরিহার্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ভূমিকায়। মোট ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে ট্রাজেডি-কমেডি এবং মহাকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, উভয় শাখার বিভিন্ন অংশের সংখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য, ঐক্য-অনৈক্য ; কবিতার উৎকর্ষ অপকর্ষের কারণ সমালোচকদের আপত্তি ও দ্বিমতের উত্তরে যুক্তিখণ্ডনসমেত আলোচনা রয়েছে। প্রথম থেকে তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাব্যের সংজ্ঞা, অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে পার্থক্য এবং কাব্যের বিষয়বস্তু ও রীতি আলোচিত। চতুর্থ থেকে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে রয়েছে নাটকীয় কবিতা, ট্রাজেডি-কমেডি ও এপিক, চরিত্র, রচনারীতি, ট্রাজেডির মধ্যকার পর্বভাগ ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা আছে। ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের প্রধান আলোচ্য বিষয় মহাকাব্য। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে সমালোচনার সূত্র, ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে মহাকাব্য ও ট্রাজেডির সম্পর্ক বিশদভাবে বিশ্লেষিত। বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় রীতিসিদ্ধভাবে বিষয়ানুগ তথ্যসূত্র ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে যা পাঠক-গবেষকদের জন্যে খুবই সহায়ক। র. আ. ক.

এ্যারিস্টোফেন্‌স : (৪৫০ খ্রি. পূ.) প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সে বেঁচে ছিলেন। এই মহান নাট্যকারের জীবন সম্পর্কে আর সঠিক কিছু জানা যায় না। জাতীয় নাট্যোৎসবে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হতো। প্রহসন-জাতীয় সেই নাটকগুলোতে এ্যারিস্টোফেন্‌স্ প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ ও লেখকের নির্মম চরিত্র-চিত্রায়ন করেছেন। সে যুগে এথেনীয় নগর-রাষ্ট্র চিন্তার স্বাধীনতা কত ব্যাপক ছিল, তা এর থেকে বুঝা যায়। "ক্লাউড" (Cloud) নাটকে সক্রেটিসকে

www.pathagar.com

ব্যঙ্গ করা হয়েছে ; "ফ্রগ্‌স" (Frogs) নাটকে এস্কাইলাস ও ইউরিপিদিসের সাহিত্যিক-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এস্কাইলাসকে জয়ী দেখান হয়েছে। এ্যারিস্টোফেন্‌সের জীবনকালেই স্পার্টার সঙ্গে চলছিল এথেন্সের যুদ্ধ। এখানেও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ভিত্তিতে নাট্যকার তাঁর নাটকে যুদ্ধের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে, সমসাময়িক রাজনীতিবিদদের ব্যঙ্গ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, যুদ্ধের বিপর্যয়ের কারণে হোক কিংবা অন্য কোন কারণে, এ্যারিস্টোফেন্‌সের শেষ দিকের নাটকগুলিতে স্বাধীন মতামত কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। এ্যারিস্টোফেন্‌সের মাত্র এগারোটি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোন কোন সমালোচকের মতে, প্রহসন জাতীয় নাট্য লেখকদের মধ্যে এ্যারিস্টোফেন্‌স শ্রেষ্ঠ। ম. ই

এ্যালবাম : আনিস চৌধুরী। নাটক। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা-২, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭১, জুলাই ১৯৬৫, প্রচ্ছদপট : রশীদ চৌধুরী, মূল্য : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা মাত্র। এটি একটি সামাজিক নাটক। এটি নাট্যকারের দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থটি হলো মানচিত্র। এটি এ্যালবাম প্রকাশের এক বছর আগে প্রকাশিত হয়। আনিস চৌধুরীর নাটক ও উপন্যাসে মধ্যবিত্তের মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দুঃখ-দারিদ্র্য, ব্যথা-বেদনা এবং সংগ্রামী চেতনা বর্ণিত। এ্যালবাম তার বহুলালোচিত নাট্যগ্রন্থ। নাট্য-গ্রন্থটির চরিত্র গড়ে উঠেছে জনৈক অধ্যাপক, দুজন বেকার যুবক, দুজন ছাত্র, ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ীর মেয়ে, ছাত্রের স্ত্রী ও মেয়ে কর্মচারী-টাইপিস্টের ঘটনা নিয়ে। এসব চরিত্রের রূপায়ণী নাম হলো : ইনাম, কাইয়ুম, কলিম, মকবুল, আনোয়ার, মুস্তাফা, লিলি, রুবী, নাসিমবানু, মীনু ও একজন টাইপিষ্ট। নাটকটির সংলাপ সাধারণ কথা-বার্তার মতো। মধ্যবিত্ত জীবনে কড়চা হেতু, নেই কোনো সাংকেতিকতা। সাধারণ আটপৌরে কাহিনী। কিন্তু নাট্যগুণ বর্জিত নয়। খা. বি.জ.উ.

ঐকতান : কবি দিলওয়ারের কাব্যগ্রন্থ। মূল্য : ৩.০০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬২। প্রকাশনায় কবি দিলওয়ার সম্বর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী, হাওয়াপাড়া, সিলেট। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৪ সাল। প্রচ্ছদ শিল্পী : সালেহ। 'ঐকতানে' কবিতার সংখ্যা চুয়ান্নটি। অধিকাংশ কবিতা চর্তুদশপদী। বাক্য ব্যঞ্জনায় উচ্চকিত মিলের প্রয়াস নেই। বরং আটপৌরে সৌরভে কবিতাগুলিকে হৃদয়গ্রাহ্য মনে হয়। যেন মাটির ঘরে বসবাস করে কবিতাগুলি অন্যরকম স্নিগ্ধতা অর্জন করেছে। যে স্নিগ্ধতা মানুষের নিবিড় নৈকট্যের আভাস দেয়। অবশ্য কবি কেবল অন্তপুরের জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট নন। সমস্ত বিশ্বের ডাক শোনার জন্যও তিনি উন্মুখ। ফলে মাটির ঘরের জানালার কপাট খুলে দেয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানান, যাও/জানালাটা পুরো খুলে দাও/রোদ বায়ু ভেতরে আসুক/তোমার সজল চোখ হাসুক/শীতের শিশিরে ধোয়া/প্রভাতের ফুলটির মতো/রোদনের কাল হোক গত/(যাও তুমি)। কবির বুকে জ্বলে অগ্নিকুণ্ড কিন্তু সংযম তাঁর বিষের বাঁশীকে মোহন বাঁশী করে তোলে। কিন্তু এ মোহন বাঁশী শিশুর হাতের খেলনা নয়। বরং এ বাঁশীর সুর মনসংযোগ দাবী করে। সর্বত্র শুনতে পাই পরিচিত সুর/রূপ-রস আনন্দে মধুর/চারিদিকে শতোকোটি প্রেমময় হাত/সাগ্রহে আমাকে চায়/বুঝি তাই শঙ্খচূড় রাত/বিষদাঁত ভাঙে তার নিষ্ফল আক্রোশে/উপেক্ষায় পাথুরে পাপোষে/(মানচিত্রে যে পৃথিবী)। কবির ঐকতান বিশ্বের একাত্মতার জন্য। পা. র.

ঐকতানিক স্বরলিপি : ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত ক্ষেত্রমোহন রচিত বিখ্যাত স্বরলিপি গ্রন্থ। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী রচিত ও তৎপরিচালিত যে ঐকতান বাদন অনুষ্ঠিত হয় তাকে ভারতবর্ষের প্রথম ঐকতান বাদন সংগঠন বলে উল্লেখ করা হয়। সেই ঐকতান বাদনের জন্য ব্যবহৃত গৎ সমূহের স্বরলিপি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। তাছাড়া পাথুরিয়া ঘাটা

www.pathagar.com

নাট্যশালার জন্য শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর রচিত কয়েকটি গতের স্বরলিপিও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ৪৮টি গতের স্বরলিপি আছে। তার মধ্যে ২৯টি গতের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং ও বাকি ১৯টি গতের স্বরলিপি করেছেন শৌরীন্দ্র মোহন। ব্যবহারিক দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রণয়ন করেন ক্ষেত্রমোহন। ঐকতানিক স্বরলিপি সেট পদ্ধতিতে রচিত। স্বরলিপি গ্রন্থ রচনায় ইতিহাসে 'ঐকতানিক স্বরলিপি' এক ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। ক. গো.

ঐতিহাসিক নাটক : ঐতিহাসিক যুগের ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশ সমন্বয়ে গঠিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটককে 'ঐতিহাসিক নাটক' বলা হয়। ঐতিহাসিক কাহিনী বলতে কেবল রাজনৈতিক কাহিনীকেই বোঝায় না। ঐতিহাসিক কালের রাজনীতির সঙ্গে সমকালীন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের কাহিনীও এই জাতীয় নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে তোলে। তবে রাজা বা ঐতিহাসিক রাষ্ট্রনায়কের কাহিনীই ঐতিহাসিক নাটকে প্রাধান্য লাভ করে। যেমন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তাঁদের জীবনী অবলম্বনে রচিত নাটক ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত না হয়ে 'চরিত নাটক' রূপে চিহ্নিত হয়, কিন্তু অশোক, সাজাহান, প্রতাপসিংহ প্রমুখ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রনায়কগণের জীবনী নিয়ে রচিত নাটককে অবশ্যই ঐতিহাসিক নাটক বলতে হবে। কেননা তাঁদের জীবন কোনো বিশেষ যুগের রাজনীতির ইতিহাস গড়ে তুলেছে। তবে ইতিহাসের উপস্থাপনায় একটি বিশেষ যুগের সম্ভাব্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশও এতে উপেক্ষিত হয় না ; নাটকীয় কাহিনীর উৎকর্ষ বিধান ও নাটকের শিল্পরস অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শুধু অলীক বা অবাস্তব ঘটনা যা ইতিহাসকে বিকৃত করে তার উপস্থাপনা এতে থাকে না। ইংরেজি সাহিত্যে সেক্সপীয়র, বাংলায় গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। আ. ন. ম. ব. র.

ঐতিহাসিক ব্যাকরণ : যে ব্যাকরণে কোনো ভাষার ধ্বনিগত, বিভক্তিগত, বিন্যাসগত স্থানিক ও কালিক বিকৃতি, পরিবর্তন তথা রূপান্তরের ধারাবাহিক ও কারণ পরম্পরাগত আলোচনা থাকে, তাকে ঐতিহাসিক ব্যাকরণ বলে। ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, বিবর্তনের ইতিবৃত্তগুলিই সাধারণভবে ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Origin & development of Bengali language, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষার ইতিহাস, সুকুমার সেনের ভাষার ইতিবৃত্ত প্রভৃতি এ শ্রেণীর গ্রন্থ। শি. প্র. লা.

ঐতিহাসিক রহস্য : রামদাস সেন (১৮৪৫–১৮৮৭) রচিত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। প্রকাশকাল : ১৮৭৪–১৮৭৬ সাল। এই গ্রন্থে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা ছাড়াও ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পর্কে লেখক সমালোচনা করেছেন। হিন্দুদের নাট্যাভিনয় এবং বেদপ্রচার সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। 'ঐতিহাসিক রহস্যে'র অন্য আলোচিত বিষয় কয়েকজন বিখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় কবি। এই প্রসঙ্গে কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ কবি সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। আ.ন.ম. ব. র.

ঐন্দ্রজালিক ছড়া : যাদু বিশ্বাস মানুষকে ঝাড়, ফুক, বাণ-উচাটন উদ্ভাবনে প্রবর্তনা দিয়েছে আদিকাল থেকেই। জীবজন্তু, মানুষ, পশুপাখি ও প্রকৃতিকে উচ্চারিত মন্ত্রের তথা ছড়ার সাহায্যে বশীভূত করার রেওয়াজ বাংলাদেশেও অতি প্রাচীন। এগুলিকে বশীকরণ বা উচাটন মন্ত্রও বলা যেতে পারে। এর পেছনে কাজ করে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। সাপের মন্ত্র, হাতি বন্দির ছড়া, বাঘ বন্দির ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, হিরালীর ছড়া, ভূমিকম্পের

www.pathagar.com

ছড়া ইত্যাদি নামে এগুলি সুপরিচিত। ছড়া বা মন্ত্র আবৃত্তির সাহায্যে ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক সৃষ্টি করে ঈপ্সিত বস্তু, জীব বা ব্যক্তিকে বশীভূত বা পরাভূত করে মানুষ যখন নিজের কল্যাণসাধন করার প্রয়াস পায় তখন এই ছড়াগুলি এক ধরনের মোক্ষম অস্ত্রের শামিল হয়। পাগল হাতিকে ধরার জন্যে, বাঘকে বন্দি করার জন্যে, বৃষ্টি আসবার জন্যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে শস্যাদি রক্ষার জন্যে এবং অন্যান্য বিচিত্র পরিবেশে প্রাকৃত শক্তিকে বশ করে জীবন জীবিকার নিরাপত্তা বৃদ্ধি সাধনই ঐন্দ্রজালিক ছড়ার বা মন্ত্রের তথা (ইন্দ্র রূপ দেবতার) ইন্দ্রজাল সৃষ্টির লক্ষ্য। আ. জ.

ঐরাবত : বুলবন ওসমান। প্রকাশনা : বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৫, প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : রফিকুন নবী। মূল্য : সাত টাকা। 'ঐরাবত' কিশোর উপন্যাস। ঐরাবত শব্দের অর্থ হাতি। এই উপন্যাসটিতে একটি বাচ্চা হাতির জন্ম, বেড়ে ওঠা, মান অভিমান এবং হাতি থেকে ইঁদুর হয়ে যাওয়ার এক মজার কাহিনী বলা হয়েছে। ঐরাবতের মাহুতের নাম হাতেম আলী। জয়দেবপুরের এক উকার জমিদার নরেন দেব ঐরাবতের মালিক। এক সময় ঐরাবত ও তার সঙ্গী কলাবতী ঢাকায় এলে হারিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মাহুত আলী একা হয়ে পড়ে। ঐরাবতের এমন মজাদার ঘটনা ছোটদের আকৃষ্ট করবে। উপন্যাসটির ভাষা সহজ-সরল। রফিকুন নবী আঁকা প্রচ্ছদ ও ছবিগুলো সুন্দর। আ. তা.

ওঙ্কার : আহমদ ছফা রচিত উপন্যাস। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালের অক্টোবরে। প্রকাশক : বুক সোসাইটি ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন : প্রাণেশ কুমার মন্ডল। মূল্য : ৮.০০ টাকা মাত্র। এই উপন্যাসটি উনসত্তরের গণ-আন্দোলের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসের নায়ক তাঁর বাবা দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে গিয়ে আবুনসর মোক্তার নামের একজন লোকের বোবা মেয়ে বিয়ে করেছে। আবুনসর মোক্তার অত্যন্ত কুচক্রী একজন মানুষ। তাঁর কূটকৌশলে নায়কের বাবার সমস্ত সম্পত্তি ভিটেমাটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। আবুনসর মোক্তারের সাথে আইয়ুব খানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্র ধরে রাতকে দিন করতে আবুনসরের কোনো সমস্যা হত না। হিন্দু পুরাণ মতে সব ধ্বনির মূল হলো 'ওঙ্কার'। লেখক বলতে চেয়েছেন মানুষ বোবা হোক, কালা হোক তাঁর ভেতরে জন্মগত মৌলিক প্রবণতা থাকবেই। কথকের স্ত্রী একটি বোবা মেয়ে সে তাঁর প্রাণ দিয়ে তা প্রমাণ করেছে। উপন্যাসের শেষে দেখা গেছে বোবা মেয়েটি 'বাঙলা' শব্দটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করেছে। ফলে তাঁর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। লেখক জানতে চেয়েছেন, 'কোন রক্ত বেশী লাল? শহীদ আসাদের না আমার বোবা বৌয়ের।' উপন্যাসটি সাবলীল গদ্যে রচিত। লেখক উপন্যাসে একটি সূক্ষ্ম বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ ও তীব্রভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। সৈ. আ. জা.

ওজঃ : সাধারণত গদ্য রচনার ক্ষেত্রেই ওজঃ গুণের ব্যবহার বেশি দেখা যায় ; তবে কাব্য বিশেষত মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও এরূপ রচনারীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসের বর্ণনা ছাড়াও যে কোনো মহৎ গুণ ও ভাবের দ্যোতনায় ওজঃগুণের ব্যবহার হয়ে থাকে। এরূপ রচনা স্বভাবতই বেগবান, এবং চিত্তকে সহজে উদ্দীপ্ত করে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে ওজঃগুণ প্রধানত চার প্রকার,—সমাধি, শ্লেষ, উদারতা ও ক্রমোৎকর্ষ। কাব্যে বীবরস উদ্দীপনকারী ওজঃগুণাত্মক রচনারীতির নিদর্শন- 'রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী।/কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি/বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,/কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি/দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষ:-কুল-বধূ,/রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,/ আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?/ পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;/ দেখিব কেমনে মোরে

www.pathagar.com

নিবারে নৃমণি?' (মেঘনাদবধ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত)। আ. ই

ওজু : ওজু ইসলামি আচার বিষয়ক শব্দ। মুসলমানদের মধ্যে শারীরিক পবিত্রতা লাভের জন্য গোসলের পরে ওজুর স্থান দ্বিতীয়। ইসলামের বিধি হিসেবে পবিত্র কুরআনে ওজুর হুকুম আছে বিশেষভাবে সালাত বা নামায পড়ার পূর্বে ওজু করতে হয়। অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থায় ফিরে আসার জন্য ওজু করা প্রয়োজন। অপবিত্র অবস্থায় ফিরে আসার কারণ হলো পায়খানা–প্রশ্রাম করা, বায়ু নিঃসরণ হওয়, অচেতন হওয়া বা ঘুমিয়ে পড়া, হালকা রক্তক্ষরণ হওয়া ইত্যাদি। সুন্নাহ অনুযায়ী একবারের স্থলে তিনবার নির্ধারিত অঙ্গ ধুতে হয়। ওজু তিন প্রকার : ফরজ, ওয়াজেব এবং মুস্তাহাব। নামাজের জন্য অজু ফরজ। ওজু করার সময় বিসমিল্লাহর সাথে প্রথমে নিয়ত করতে হয়। তারপর ডান হাতের উপর তিনবার ও বাম হাতের উপর তিনবার পানি ঢেলে ধুতে হবে। আঙ্গুলের ফাঁকে এবং আংটির মাঝেও পানি প্রবেশ করতে হবে। হাতের তালুতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে গড়গড়ার সাথে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে নাকের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে তিনবার পরিষ্কার করে নিতে হবে। আবার দু'হাতে পানি ছিটিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলতে হবে। পরে বাম হাতে পানি নিয়ে ডাল বাহু কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুতে হবে এবং একইভাবে ডান হাতে পানি নিয়ে বাম বাহু কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুতে হবে। এর পরে ভেজা হাত মাথার উপরে সম্মুখ হতে পিছে এবং পিছন হতে সম্মুখে মাছেহ বা মোছার কাজ করতে হবে। এ সময় কলেমা শাহাদত মনে মনে পড়া যেতে পারে। তারপর তর্জনী দু'কানে দু'হাতে প্রবেশ করিয়ে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের পিছনে আগে পিছে করিয়ে কানের ছিদ্র ও বাইরের অংশ মুছে পরিষ্কার করতে হবে। শেষে বাম হাতের তালু দিয়ে ডান পায়ের উপরে, নিচে ও আঙ্গুলের ফাঁক ধুতে হবে এবং একইভাবে ডান হাতের তালু দিয়ে বাম পায়ের উপরে নিচে ও আঙ্গুলের ফাঁক ধুয়ে ওজু শেষ করতে হবে। কাবাশরীফে তাওয়াফের জন্য ওজু করা ওয়াজেব। কুরআন পাঠ, গোছল ও নিদ্রার পূর্বে ওজু করা মুস্তাহাব। আ. সৈ. গো. দ.

ওডেসী : ট্রয় যুদ্ধের পটভূমিতে হোমার রচিত মহাকাব্য। ট্রয় যুদ্ধের অন্যতম বীর ইথাকার রাজা ওডিসাস, তাঁর বৃদ্ধ পিতা, পত্নী পেনিলোপি, শিশুপুত্র টেলিমেকাস ও নিজ দেশের প্রজাদের রেখে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের মাঠে ওডিসাসের কেটে যায় দশ বছর। 'ইলিয়ড'–এ হোমার সেই কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধাবসানের দশ বছর পর ওডিসাসকে স্বদেশ পৌঁছুতে লেগে যায় আরো দশ বছর। তাঁকে পথে বহুদিন বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। 'ওডিসি' রচনার মধ্য দিয়ে হোমার মূলত সুস্থ জীবনবোধ ও মানবতার উত্থানকে তুলে ধরেছেন। বীর ওডিসাসকে নায়ক করে হোমার রচনা করেছিলেন 'ওডেসী'। স্বদেশের উদ্দেশে আপন গৃহে ফেরার সময় নানা ষড়যন্ত্র,, বিপর্যয় ও বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিচিত্র পর্বসমূহ হচ্ছে 'ওডেসী'র মূল উপজীব্য। এই চরম ও পরম উপভোগ্য কালজয়ী মহাকাব্যের বাংলা ভাষায় গদ্যানুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি হাসান হাফিজুর রহমান। অবশ্য হাসান হাফিজুর রহমান 'ওডেসী'র সম্পূর্ণ অনুবাদ করে যেতে পারেননি। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান অসমাপ্ত সাতটি অধ্যায় অনুবাদ করে গ্রন্থটির সম্পূর্ণতা দান করেছেন। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে। মূল্য : একশ টাকা। মা. আ.

ওবায়দুল ইসলাম : কবি ও শিশুসাহিত্যিক। ১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারি রাজবাড়ী জেলার ধর্মশী গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস রাজবাড়ী জেলার রাজাপুর গ্রাম। পিতার নাম ওয়াহাব আলী বিশ্বাস ও মাতা রাহেলা খাতুন। তিনি রাজাপুর ইয়াসিন

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৬২ সালে মাধ্যমিক, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৬৭ সালে স্নাতক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে ১৯৬৯ সালে বাংলায় স্নাতকোত্তর ও ১৯৭৮ সালে এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক পদে চাকরিরত। ওবায়দুল ইসলাম সত্তর দশকের কবি। দেশ–মাটি–মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও শ্রেয়োবোধ তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রেম ও প্রকৃতির নানাবিধ বৈচিত্র্যময় রূপায়ণ তাঁর কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে। কবিতায় দার্শনিক–ভাবনার শিল্পোত্তীর্ণ ব্যবহার তাঁর অনায়াসলব্ধ কাব্যকুশলতার স্বাক্ষরবহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা—এইসব মহৎ মিথ্যাচার (১৯৮৬) ; সারাবেলা মুখোমুখি (১৯৯০) ; জলে জোছনায় (১৯৯২) ও যে দাঁড়ায় মেঘের ছায়ায় (১৯৯৮)। শিশুতোষ গ্রন্থ : দীপনের জবানবন্দী (১৯৮৫) ও আপনের সপ্তপাঠ (১৯৮৮)। **সা. আ.**

ওবায়েদ-উল-হক : প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার। জীবন শুরু করেছিলেন কলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে। বিভাগোত্তরকালে ঢাকায় পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। দীর্ঘদিন তিনি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা অবজারভার এর সম্পাদক ছিলেন। ওবায়েদ–উল হক একজন প্রগতিশীল চিন্তা–চেতনার মানুষ। তাঁর প্রকাশিত নাটকে সমাজচিত্র ও জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। নিয়মিত কলাম লেখেন বাংলায়। সমাজের অনিয়ম ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে তার কলাম সোচ্চার। তিনি ১৯১১ সালে ফেনীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলো নাটকের। এগুলো হলো : এই পার্কে, এটি ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। দিগ্বিজয়ী বাজার, প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। ব্যতিক্রম ও রুগ্ন পৃথিবী, প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। নাটকের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৪ সালে। আর একুশে পদক লাভ করেন ১৯৮১ সালে। এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য পুরস্কারসহ ইউনিসেফ পদক লাভ করেন। **খা.বি.জ.উ.**

ওমর আলী : কবি। পাবনা জেলার চর শিবরামপুর গ্রামে ১৯৩৯ সালের ২০ অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা উজির আলী। ঢাকা হাম্মাদিয়া হাইস্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে ম্যাট্রিক, ঢাকা কায়েদে আযম কলেজ থেকে ১৯৬২ সালে আই.এ., পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ সালে ইংরেজিতে এম.এ. ও ১৯৭৫ সালে বাংলায় এম.এ. পাস করেন। পাবনার শহীদ বুলবুল কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কবিতার ভাববস্তু। গ্রাম বাংলার নিসর্গ, মাটির অকৃত্রিম সোঁদা গন্ধ এবং শ্যামবর্ণ ও স্বাস্থ্যবতী শাশ্বত বাঙালি নারীর প্রেমময়ী রূপ অঙ্কনে তিনি সৃষ্টিশীল কবি–প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা —এদেশের শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি (১৯৬৭), আত্মার দিকে (১৯৬৮), নদী (১৯৬৯), অরণ্যে একটি লোক (১৯৭৪), নিঃশব্দ বাড়ি (১৯৭৩), বিলেতে অনিচ্ছুক একজন (১৯৭৫), নরকে বা স্বর্গে (১৯৭৫)। ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। **নূ. ই.**

ওমর খৈয়াম (খ্রিস্টীয় ১১ শতক) : প্রখ্যাত পারস্য কবি। পারস্য ঐতিহাসিকগণের মতে সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর কিছুকাল পরে পারস্যের নিশাপুরে কবি ওমর খৈয়ামের জন্ম হয়। তাঁর পুরো নাম ওমর খৈয়াম বিন ইব্রাহীম অল–নিশাপুরী। ১০৭৪–৭৫ সালে মালিক শাহ জুলিয়ান নির্মিত মানমন্দিরে ওমর খৈয়ামও গবেষণাকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ওমর খৈয়াম একজন বিদ্বান কবি ছিলেন। ইউনানী বা গ্রিক দর্শনে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। অঙ্ক এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করেন। জানা যায় যে, মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী ও ওমর খৈয়ামের বন্ধু নিজাম উল–মুলকের

www.pathagar.com

সহায়তায় খৈয়াম একটি জায়গীর পেয়েছিলেন। ওমর খৈয়াম বিখ্যাত রুবাইয়াতের রচয়িতা। তিনি তাঁর রুবাইয়াতে আপাতঃ দ্রোহী ভাব প্রকাশ করেছেন। এজন্য কবি তৎকালীন পারস্যের মুসলমান সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছিলেন। রুবাইয়াতে এ ব্যাপারে কবির ক্ষোভ ও অভিমানের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ওমর খৈয়ামের খৈয়ামকে কেউ কেউ সুফীবাদী, কেউ কেউ ভোগবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কবির রুবাইয়াতের সংখ্যা ১৭৮টি বলে জানা যায়। ওমর খৈয়াম সমকালে প্রখ্যাত গণিতবিদ্ ছিলেন। তিনি ৫৩৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন (১১০৯ সালের পূর্বে)। **সু. মু.**

ওমর খৈয়াম মেঘদূত গীতগোবিন্দ : তিনজন অমর কবির তিনটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ। প্রকাশ করেছে ময়না প্রকাশনী, ১৪/এ টেমার লেন, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ, ১৩৯১। এই বইটি রঙের বিন্যাসে, অলঙ্করণের সৌন্দর্যে একটি চমৎকার প্রকাশনা। মূল্য : ষাট টাকা। গ্রন্থের প্রথম কাব্য রোবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম। ফার্সি ভাষায় রচিত মূল বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড। এই অনুবাদের মাধ্যমে ওমরখৈয়াম জগৎজুড়ে খ্যাতিলাভ করেন। এই গ্রন্থ ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদ। এখানে মোট পঁচাত্তরটি রুবাইয়াত স্থান পেয়েছে। ওপর খৈয়ামের কালজয়ী রুবাইয়াতগুলোর অসাধারণ বাণী ও ব্যঞ্জনা পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। বাংলা ভাষায় ওমর খৈয়ামের অনুবাদ শুরু হয়েছে উনিশ শতকে। সে সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা রুবাইয়াতের অনুবাদ করেছে। যেমন—অক্ষয়কুমার বড়াল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে এটা তো সবাই জানে অনুবাদ মূলকে অতিক্রম করতে পারে না। তারপরও ওমর খৈয়াম যে অনুবাদের মাধ্যমেই ভিন্নভাষী মানুষের কাছে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে সে তো তার অসাধারণ কাব্যসুধার কারণেই। এ বইয়ের দ্বিতীয় কাব্য কালিদাসের 'মেঘদূত'। মূল রচনা সংস্কৃত ভাষায়। কালিদাসকে বলা হয় সংস্কৃত ভাষার মহাকবি। 'মেঘদূত' অনুবাদ করেছেন অসংখ্যজন। ১৮১৩ সালে অনুবাদ করেন উইলসন। ১৮৬১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "মেঘদূত সম্পাদনায় অসামান্য পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচারবোধের পরিচয় দেন, মল্লিনাথ যে শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত মনে করেছিলেন তার সঙ্গে বিদ্যাসাগর আরও কয়েকটি যোগ করেন।" মুখবন্ধে আরো বলা হয়েছে রাজশেখর বসু 'মেঘদূত'-এর গদ্যানুবাদ করেছিলেন। আর 'বুদ্ধদেব বসু 'মেঘদূত' অনুবাদকালে ছন্দ নিয়ে অনেক ভেবেছেন।' এবং 'শেষ পর্যন্ত 'মেঘদূতে'র একমাত্র আকর্ষণ হয়ে ওঠে তার অসামান্য ধ্বনি-সঙ্গীত, যা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করলে 'প্রাণ' আকুল হয়ে ওঠে।" এই গ্রন্থের তৃতীয় কাব্য জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ।' মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, 'মধ্যযুগে ভক্তিমূলক কাব্য হিসাবে গীতগোবিন্দ সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করেছিল।' এই কাব্যের বাংলা অনুবাদ শুরু হয়েছে মধ্যযুগ থেকে। আগের কাব্য দুটোর মতো এই কাব্যটিও অনেকে অনুবাদ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। একথাও বলা হয় যে, 'এক সময় মনে করা হয়েছিলো, গীতগোবিন্দের গানগুলি প্রথমে প্রাকৃত বা অপভ্রংশভাষায় রচিত, পরে তা সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছে। কিন্তু সুশীলকুমার দে শুধু এই মত ভ্রান্ত প্রমাণ করেন নি, তিনি দেখিয়েছেন যে এর 'শব্দবর্ণের বিন্যাস-কৌশল ও অলঙ্কার-সন্নিবেশ', ভাষান্তরিত রচনায় সম্ভবপর নয়।' শিল্পরূপের অসাধারণ ব্যতিক্রমের কারণে সে সময়ের পাঠক ও শ্রোতা বিস্মিত হয়েছিলো। এই ধ্রুপদী তিনটি কাব্যের নতুন উপস্থাপনা আধুনিক পাঠকের সঙ্গে কাব্যগুলোর পরিচয় করায়। নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বই। বইটির গ্রন্থনা ও ভাষান্তর করেছেন প্রণব বাহুবলীন্দ্র। কবিতা অনুষদে আছেন শ্যামলকান্তি দাশ, শ্রীসুধীর গুপ্ত, কাঞ্চনকুণ্ডলা মুখোপাধ্যায়। মুখবন্ধ লিখেছেন

www.pathagar.com

অলোক রায়। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সত্য চক্রবর্তী ও ভূপেন সেন। সে. হো.

ওয়াকিল আহমদ : গবেষক। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার আজাদনগরে ১৯৪১ সালের ৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রিয়াজউদ্দিন বিশ্বাস। স্থানীয় নিমতিতা জি.ডি. ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক, জঙ্গিপুর কলেজ থেকে ১৯৫৮ সালে আই.এ., সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে বাংলায় বি.এ. অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে বাংলায় এম.এ. পাস করেন। 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ও 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর। ১৯৯০-১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং উনিশ শতকের সমাজ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তাঁর গবেষণার বিষয়। লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান কবি-সাহিত্যিক, চিন্তানায়ক ও সমাজকর্মীর মানস-প্রবণতা এবং সাহিত্য ও সমাজকর্মে তাঁদের অবদান সম্পর্কে সরস আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ — গবেষণা : সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য (১৯৬৮), বাংলার লোকসংস্কৃতি (১৯৭৫), উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (১৯৮৩), বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান (১৯৮৭), বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত (১ম খণ্ড ১৯৭৪, ২য় খণ্ড ১৯৯০), বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৯৮৫), বাংলায় বিদেশী পর্যটক (১৯৯০), মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (১৯৯৪), প্রবাদ ও প্রবচন (১৯৯৪), ধাঁধা (১৯৯৫), মন্ত্র (১৯৯৫), ভাওয়াইয়া (১৯৯৫), ভাটিয়ালী গান (১৯৯৭), সারিগান (১৯৯৭) ; জীবনী : একরামুদ্দীন (১৯৮৮), মোঃ রওশন আলী চৌধুরী (১৯৮৯), রওশন আলী খান ইউশফজী (১৯৯০), শেখ আবদুস সোবহান (১৯৯২)। গবেষণা কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। নূ. ই

ওয়াজেদ আলী শাহ্ : অযোধ্যার শেষ নির্বাসিত নবাব। তিনি একাধারে সংগীতজ্ঞ, গীতিকার, নৃত্যবিদ্ ও সাহিত্যিক ছিলেন। ১৮২২ সালের ১৩ জুলাই লখ্নৌয়ে তাঁর জন্ম। পিতা আমজাদ আলী শাহের মৃত্যুর পর তিনি ১৮৪৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি অযোধ্যার নবাব হন। কিন্তু অযোগ্যতার অভিযোগে ১৮৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সরকার কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। বার্ষিক বারলক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী হয়ে তিনি কলকাতার নিকটবর্তী মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত জীবন কাটান। সিপাহী বিদ্রোহের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৮৫৭ সালে সরকার তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আটক করে রাখে। পরের বছর তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং মেটিয়াবুরুজেই বাকি জীবন কাটান। বাংলার সংগীতের ইতিহাসে তাঁর মেটিয়াবুরুজস্থিত সংগীত দরবারের স্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অসামান্য সংগীত প্রিয়তা ও উদার দাক্ষিণ্যের জন্য তাঁর দরবারে বহু ভারতবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও নৃত্যশিল্পীর আগমন ঘটেছিল। ফলে বহু বাঙালি শিল্পী ঐসব বহিরাগত গুণী প্রতিভার কাছে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। ওয়াজেদ আলী নিজেও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। লখ্নৌয়ে তিনি প্রখ্যাত সেতার বাদক কুতুব-উদ্-দৌলার কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। ঠুংরি গানের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান প্রবর্তক। বাংলাদেশে ঠুংরি প্রসারের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িত। কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঠুংরি ও ধ্রুপদসহ তাঁর রচিত বহু গান অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। কাব্য এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও

তিনি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বন্দি থাকাকালে তিনি 'হুজন-ই-আখ্‌তার' (আখতারের বেদনা) নামে আত্মকাহিনীমূলক একটি ফারসি কাব্য রচনা করেন। আখতার ছিল তাঁর ছদ্মনাম। 'তরিখ-ই-পরীখানা' নামক গ্রন্থেও তাঁর আত্মকথা বর্ণিত হয়েছে। লখ্‌নৌবাসিনী বেগমকে লেখা তাঁর পত্রাবলীর সংকলন 'তারিখ-ই-মুম্‌তাজ'। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীমূলক একটি উর্দু গীতিনাট্য এবং 'নাজু', 'বাজি' ও 'দুল্‌হন' নামে তিন খণ্ড সংগীত বিষয়ক গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। নিজের রচনাবলী মুদ্রণের জন্য তিনি মেটিয়াবুরুজে একটি নিজস্ব ছাপাখানারও প্রতিষ্ঠা করেন। মেটিয়াবুরুজের 'শাহ্‌মঞ্জিল' প্রাসাদে ১৮৮৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। আ. রা.

ওয়ান গালা : বাংলাদেশের একটি উপজাতি গারোদের সর্বজনীন পূজা ও জাতীয় উৎসবের নাম 'ওয়ান গালা'। এটি মূলত সালজং বা সূর্যদেবতার পূজা। গারোদের মতে সূর্যদেবতা অধিকতর শক্তিশালী দেবতা। তাদের বিশ্বাস, এই দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে কোনো অমঙ্গল হবে না। এই পূজা দু'ভাগে সম্পন্ন হয়। একটি সূর্যদেবতার উদ্দেশে ভোগ বা উপচারের উৎসর্গ এবং অন্যটি নিজেদের আনন্দ-উল্লাস ও ভূরিভোজন। এ পূজাকে 'রোগ আলা' বা 'গাততাং'ও বলা হয়। ওয়ান গালা উৎসবের সূচনা হয় গরু, শূকর, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি হত্যা করে নাচ-গান ও মদ্যপানের ভিতর দিয়ে। গারো সমাজের প্রতি পরিবারেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। পূজার প্রথম দিন ভোরে একটি কলাপাতায় শাকসবজি, ফলমূল, আতপ চাল, চালের গুড়ো ও পিঠা সালজং দেবতার উদ্দেশে বাড়ির উঠোনের পূর্ব দিকে অথবা শস্যক্ষেতের পূর্বদিকের আলের পাশে রেখে আসা হয়। হত্যা করা প্রাণীগুলোর রক্তও সেই কলাপাতার উপর ছিটানো হয়। তারা বিশ্বাস করে, এতে সালজং দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং তাদের সকল কাজে সফলতা আসে। শস্যক্ষেতকে বিপদমুক্ত করার জন্য একটি বাঁশের ঘোড়া তৈরি করে ক্ষেতের পাশে স্থাপন করা হয়। তারপর পাঁঠা, বানর বা ইঁদুর ইত্যাদি যে কোনো প্রাণীর গলায় দড়ি বেঁধে গ্রামশুদ্ধ ঘুরিয়ে এনে দা দিয়ে এক কোপে সেই প্রাণীটিকে হত্যা করে বাঁশের ঘোড়ার পাশে বিদ্ধ করে রাখা হয়। গারোদের প্রচলিত বিশ্বাস, অপদেবতা এতে ভয় পাবে এবং শস্যের কোনো ক্ষতি করবে না। 'ওয়ান গালা' উৎসব শুরু হয় 'নকমা' বা গ্রাম্য প্রধানদের বাড়ি থেকে এবং নকমাদের বাড়িতেই এর সমাপ্তি ঘটে। উৎসবের শেষের দিন সবাই নকমার বাড়িতে সমবেত হয়। তার আগে গ্রামের সব বাড়িতে চলে নাচ-গান ও পানাহার। নারী-পুরুষ উভয়েই এই নাচ-গানে অংশগ্রহণ করে। 'গাততাং' পর্বের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় 'রে রে' নাচ। এদিন সবাই নকমার বাড়ি আসে। ঘরের একটি বড় কক্ষে সবাই সারিবদ্ধভাবে বসে। তাদের সামনে বসেন কামাল বা ঠাকুর। ঘরের কোণায় থাকে জালাভর্তি মদ। সবার সামনে কলাপাতা রেখে তার উপর আতপ চাল ও পিঠার গুড়ো দেওয়া হয়। কামাল মন্ত্র পাঠ করেন এবং কলার পাতা মাড়াতে থাকেন। নকমা গিন্নি পিঠার গুড়ো দিয়ে সবার কপালে, হাতে ও পিঠে উল্কি এঁকে দেন। এই উল্কি ঘরের দেওয়াল, দরজা, আসবাবপত্র ইত্যাদিতেও দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় নাচ-গান। কাড়া, নাকাড়া, বাঁশি, মাদল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যগীত চলে। গানে গানে কামালকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি তাঁর যথাযথ উত্তর দেন। এভাবে নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে 'সালজং' দেবতাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে 'ওয়ান গালা' উৎসবের সমাপ্তি টানা হয়। ড. শা. আ.

ওয়ারিশ : শওকত আলী। উপন্যাস। প্রকাশক : বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯। পৃষ্ঠা : ৮+২০৭। শওকত আলীর এই উপন্যাস একটি পরিবারের চারটি প্রজন্মের ধারাবাহিক চরিত্র চিত্রণ হলেও এর মধ্যে মধ্যবিত্ত

www.pathagar.com

বাঙালির ইতিহাসের প্রতিচ্ছবিও পরিলক্ষিত হয়। এর মাঝে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অংশ, যা 'ওয়ারিশ' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা প্রদান করে। ঔপন্যাসিকের কথানুসারে—'ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়, বর্তমান অতীত–এ যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যেতে হয়। মানুষের জীবনে এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিই অধিকতর ক্রিয়াশীল। এরই নাম ইতিহাস, ক্রমবিকাশও একেই বলে। সমাজ, রাজনীতি ও জীবনধারায় ভাংচুর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবন এই প্রক্রিয়াতেই অগ্রসর হয় এবং এই ধারাতেই ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতি নিজেকে আবিষ্কার করে।' কথাশিল্পী শওকত আলী রনজু চরিত্রের মাধ্যমে উপর্যুক্ত ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির ধারাবাহিকতাই প্রকাশ করেন তাঁর অনবদ্য গদ্যশৈলীতে। র. হা.

ওয়াহিদুল হক : প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। পাকিস্তান আমলে যখনই রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংগীতে বিরোধীতা করা হয়েছে, তখনই তিনি অন্যান্যদের সংগে রুখে দাঁড়িয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁর এবং সনজিদা খাতুনের একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্র সংগীতের সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলনকারীদের অন্যতম কর্ণধার। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওয়াহিদুল হক ১৯৩৩ সালের ১৬ মার্চ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু তাইয়েব মাজহারুল হক। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ভাওয়াল মনোহরিয়া গ্রামে। পড়াশোনা করেন ঢাকায় এবং স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সমকালীন বিষয়-আশায় নিয়ে ইংরেজি ও বাংলায় নিয়মিত কলাম লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থ দু'টি হলো : চেতনাধারায় এসো ও গানের ভিতর দিয়ে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পেয়েছেন জসীমউদদীন পুরস্কার ও কাজী মাহবুব উল্লাহ পুরস্কার। খা.বি.জ.উ.

ওঁরাও : আদি অস্ট্রিকবর্গের একটি শাখা ওরাঁও। ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের অস্ট্রিক (মুণ্ডারী) ভাষী উপজাতি। ওরাঁওরা জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দিনাজপুর ও চব্বিশ পরগনায় বেশি সংখ্যায় বাস করে। বর্তমানে ওরাঁওর মোট জনসংখ্যা তিন লক্ষের অধিক। পার্বত্য অঞ্চলে এদের প্রধান উপজীবিকা চাষাবাদ। ওরাঁওদের সমাজে বহু গোত্র আছে। প্রতিটি গোত্রের এক একটি টোটেম আছে। এই নামগুলি (টোটেম) প্রায়ই প্রাকৃতিক বস্তু থেকে গ্রহণ করা হয়। সগোত্রে এদের বিয়ে হয় না। বিয়ের জন্য বর পক্ষকে পণ দিতে হয়। বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজ অনুমোদিত। গ্রামের মাতব্বরকে মাহাতেব বলে। পূজা অর্চনার জন্য 'পাহান' আছে। তার সহকারীর নাম 'পূজার'। 'সরন বুড়িয়া' হলো প্রধান গ্রাম দেবী। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্য শোয়ার ঘর আছে। তার অবস্থান আখড়া বা মঞ্চাকৃতি নাচের জায়গার কাছে। এই শোয়ার ঘর বা 'ধুমকুড়িয়ার' নেতাকে 'ধাঙড় মাহাতো বলে। বিয়ের আগে যুবক যুবতীরা স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতে পারে। ওরাঁওদের মধ্যে হিন্দু ও খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব আছে। সারজল পরব এদের প্রধান পরব। উৎসর্গ পর্বে স্ত্রী–পুরুষ, যুবক–যুবতী এক সঙ্গে নৃত্য-গীত করে থাকে। মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয় – দাহ করার রীতিও প্রচলিত। মু. আ. জ.

ওঁরাওদের গান : এ গান হচ্ছে বৃক্ষবন্দনার গান। এর অন্তরালে রয়েছে আদিম জীবনের লোকায়ত বিশ্বাসের প্রভাব। প্রাচীনকালে মানুষ বৃক্ষকে শক্তির প্রতীক মনে করে তার পূজা করত। এই পূজা উৎসবের একটি পর্ব 'ওঁরাওদের গান'। এ গান 'ভাদাই গান' নামেও অভিহিত। উপজাতীয় শিল্পীদের কণ্ঠে গীত এ গানের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা।

www.pathagar.com

উন্মোচিত হয় তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির নানা রূপ। গানে গানে তারা প্রকাশ করে স্বীয় আবেগ-অনুভূতি।। প্রকৃতিই তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। তাই তাদের গানে প্রতিধ্বনিত হয় প্রকৃতির বন্দনা ও তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা। ড. শা. আ.

ওরাও কথা বলে : মূল রুশ ভাষার লেখক ইউরি দ্‌মিত্রিয়েঙ। স্কুলের মাঝারি বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। মূল রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন অরুণ সোম। বইয়ের বিষয়বস্তু পৃথিবীতে জীবজন্তু সংরক্ষণের গুরুত্ব কত অসীম তা বলে দেওয়া। জীবজন্তু শুধু আমাদের মাংস ও পশমের জোগানদারই নয়। ইঞ্জিনিয়র, ডিজাইনার ও জীববিজ্ঞানীরা জীবজন্তুদের সম্পর্কে চর্চা করতে গিয়ে বিস্ময়কর নানা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তৈরি করে থাকেন। মানুষ জীবজন্তু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের গোপন রহস্য আবিষ্কার করে, আর বর্তমানে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জীবজন্তুর 'সাহায্য' ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সম্ভব নয়। এটাই সব নয়, বর্তমানে মানুষের দ্বারা আবহাওয়া এত দূষিত হয়ে পড়েছে যে এর ফলে পৃথিবীতে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। আর আবহাওয়া বিশুদ্ধ রাখে উদ্ভিদকুল। পোকামাকড় ছাড়া গাছপালা বাঁচতে পারে না, আবার ক্ষতিকর পোকা বেড়ে গেলেও মুশকিল। এই বইতে জীবজন্তুরা কথা বলে, বিচিত্র স্বভাব বলে দেয়। এসব বিচিত্র তথ্য আবার লেখক এই বইয়ে সমাবেশ করে আমাদের পড়তে দিয়েছেন। পশুপাখি বা গাছপালা যে কথা বলে, মাছেরা সংকেত দিয়ে ভাব বিনিময় করে—এসব কথা 'ওরাও কথা বলে' বইয়ের মূল উপজীব্য বিষয়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় আর অজানা তথ্যের চমৎকার উপস্থাপন ভঙ্গি বইটিকে করে তুলেছে অনন্য। প্রকাশক : রাদুগা প্রকাশন, মস্কো। বাংলায় প্রকাশকাল ১৯৮৭। পৃষ্ঠা ১১১। মূল্য লেখা নেই। বি. ব.

ওরা কদম আলী : মামুনুর রশীদের নাটক। ঢাকার মুক্তধারা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। এ-গ্রন্থের মধ্য দিয়েই নাট্যকার হিসেবে মামুনুর রশীদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি শ্রেণীসচেতন নাট্যকার। শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের জন্য তিনি নাটক লিখেছেন। বস্তুত, তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হচ্ছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধচেতনা। মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাসকে নাট্যরূপ দেয়াই মামুনুর রশীদের নাটকের মৌল প্রবণতা। 'ওরা কদম আলী' নাটকেও মামুনুর রশীদের নাট্য-সাহিত্যের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়। এ-নাটকে সর্দার চরিত্রের মাধ্যমে রূপান্বিত হয়েছে মামুনুর রশীদের সদর্থক শ্রেণীচেতনা। নাট্যচরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের সমাজভাবনার পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। বঞ্চিত-শোষিত মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের রূপকার হিসেবে মামুনুর রশীদের আলোচ্য নাটক সমকালীন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় সংযোজন করেছে বিশিষ্ট মাত্রা। বি. ঘো.

ওলী : ওলী অর্থ আল্লাহর বন্ধু। বহুবচন আউলিয়া। সুফি সাধকগণ যাঁরা এবাদত, রিযাযত ও মুজাহিদার মাধ্যমে নিজ প্রবৃত্তির সংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি করে, অহংবোধ বর্জন করে আল্লাহপ্রেমে ফানা (লয়) ও বাকা (স্থিতি) লাভ করেন, তাঁদের আল্লাহ বন্ধুর মর্যাদা দেন। হাদিসে আছে আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা যখন নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে তখন আমি তাঁকে ভালবাসি এবং আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা দেখে, কান হয়ে যাই যা দ্বারা শোনে, হাত হয়ে যাই যা দ্বারা স্পর্শ করে এবং পা হয়ে যাই যা দ্বারা চলে, এবং আমি তাঁর দোয়া কবুল করি।" তাঁরা দেহ মনে অনুভব করেন পবিত্র কোরানের বাণী, "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নহে" (১০ : ৬১)। পরবর্তী আয়াতে কোরান করিমে আছে, "জানিয়া রাখ, আল্লাহর বন্ধুদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।"

www.pathagar.com

আল্লাহ প্রেমিক ওলী অন্তরের চোখে আল্লাহর নূর দেখেন ও নৈকট্য ও সাজুয্য লাভ করেন। ব্যক্তি আত্মা বিশ্বআত্মায় মিলিত হয়। প্রেমে আত্মা পরমাত্মায় লয় পায়। নবী করিম (দ:) বলেছেন, "মোমেনের অন্তর আল্লাহর আরশ।" পবিত্র কোরআনে আছে, "আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি" (২৪ : ৩৫)। ওলী তাতে অন্তরের অনুভূতিতে মিশে থাকেন এবং বেলায়েত প্রাপ্ত হন। কাশফ, এলহাম ও স্বপ্নের মাধ্যমে ওলী আল্লাহ এ বেলায়েত সম্বন্ধে জ্ঞাত হন। আ. সৈ. গো. দ.

ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ : আবদুল মান্নান সৈয়দ। কবিতা সংকলন। রচনাকাল : ১৯৭০–১৯৭৩, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৪, প্রকাশক : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ৬০ পটুয়াটুলী ঢাকা-১। প্রচ্ছদ ও নাম পত্র : কাইয়ুম চৌধুরী, দাম : ছয় টাকা। পৃষ্ঠা : ৬৪, উৎসর্গ : সিকান্‌দার আবু জাফর। বাংলাদেশের কবিতার ষাট দশকের অন্যতম কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ। ব্যতিক্রম তিনি কবিতার প্রকরণে এবং বিষয়ে। 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ' কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। পরাবাস্তব ঘরানার এ কবির 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ' এর কবিতাবলীতে একটি পরাক্রান্ত সময়ের চালচিত্র বা মনোচিত্র পাই। মান্নান সৈয়দের কবিতা মানে অন্যরকম, অন্য স্বাদ, পাতা সরিয়ে সবাই যেমনি ফলের দিকে এগিয়ে যায় সৈয়দও এখানে সমস্ত হঠিয়ে কবিতার দিকে চলে যান। তাই সাদা পৃষ্ঠায় একরাশ তারার মতো শব্দ বুনে লিখে ফেলেন 'ও চৈত্র ও ডানাওয়ালা ঘোড়া, স্বপ্নের এ্যানটেনা, শহরে অচেনা মাছ, দয়িতা কবিতা, তুষি, সুন্দর, আনন্দ আহত আমি অনাহত আমির'র মত চমৎকার কবিতাগুলো। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ' কবিতাগুলো লেখা। বলা যায় বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের কবিতার শিল্পিত স্মারক *এ কবিতাগুচ্ছ।* একাত্তরের দুর্বিষহ জীবনে একটি কাব্যচিত্র এবং কৈবল্য ঘরানায় উঠে আসা সামাজিক চিত্রে গুচ্ছ গুচ্ছ চিত্রকল্প পাওয়া যায় এ কবিতাবলীতে। মা.জা.

ওসমান (রাঃ) : মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা। ৫৭৩ সালে মক্কায় কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফফান, মাতা আরওয়াহ। তিনি লজ্জাশীল, নম্র ও ভদ্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায় ছিলেন স্বনামধন্য। ব্যবসা-বাণিজ্য করে অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হন। আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ছিলেন বলে তাঁকে গনি (ধনী) বলা হতো। তিনি হযরত মুহম্মদের (দঃ) দুই কন্যা রুকাইয়া ও কুলসুমকে বিবাহ (একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে) করেন। চল্লিশ বছর বয়সে ওসমান (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। তাবুক যুদ্ধে এক হাজার দিরহাম ও এক হাজার উট দান করেন। উমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ৬৪৪ সালে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। কুরআন সংকলন তাঁর শাসনামলের এক অসাধারণ কীর্তি। তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদল লোক তাঁর বাড়ি অবরোধ করে। কতিপয় লোক তাঁর গৃহে প্রবেশ করে ৬৫৬ সালের ১৭ জুন তাঁকে হত্যা করে। ওসমানের ধর্মপরায়ণতা ও দানশীলতা বাঙালি লেখকরা নানা মাত্রিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নূ. ই

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর পত্রাবলী : মোবারক হোসেন খান রচিত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জীবনালেখ্য ও তাঁর বারটি পত্রের সংলকন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ আট-দশ বছর বয়সে সঙ্গীতের অমোঘ আকর্ষণে মা-বাবা ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন। যৌবনে বরের পাগড়ি ও শেরোয়ানি লুকিয়ে ঘাটে ঘুমন্ত নববধূকে ফেলে স্টিমারে চড়ে আরো একবার নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এসবের পেছনে ছিল সঙ্গীতের প্রতি দুর্মর আকর্ষণ। পরে এই আলাউদ্দিন খাঁ অক্লান্ত সাধনার পথ ধরে অর্জন করেছিলেন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি, সঙ্গীত জগতে

হয়ে ওঠেন মহান কিংবদন্তী। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত বাদক রবি শঙ্কর। পরবর্তীকালে রবি শঙ্কর আলাউদ্দিন খাঁর কনিষ্ট কন্যা অন্নপূর্ণার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই গ্রন্থের লেখক মোবারক হোসেনও সম্পর্কে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ উদয় শঙ্করের নৃত্য দলের সাথে ইউরোপ, আমেরিকা, প্যারিস, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং লাভ করেছেন অভূতপূর্ব সম্মান। এ সময়ে আত্মীয় স্বজনদের কাছে লিখিত পত্রসমূহ গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। তবে পত্রসমূহ গতানুগতিক-ভাবে গ্রন্থভুক্ত না করে আলাউদ্দিন খাঁর জীবনালেখ্য বর্ণনার সাথে প্রারম্ভিকভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে পত্রগুলোও এক ধরনের ঘরোয়া মাত্রা লাভ করেছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়া ছিল প্রাথমিক পাঠশালা, তথা বাল্যশিক্ষা পর্যন্ত। অথচ গ্রন্থভুক্ত পত্রগুলোর সাহিত্য মূল্য এবং ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। শিল্পী ও ব্যক্তি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে জানার জন্যে পত্রগুলো গবেষকদের নিকট মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর পত্রাবলী'র প্রকাশক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা হাশেম খান। প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৮৪। মূল্য : চুয়াল্লিশ টাকা।

মা. আ.

ঔচিত্যবাদ : কাব্যলঙ্কারের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে আনন্দবর্ধন, ক্ষেমেন্দ্র প্রমুখ আলঙ্কারিক বলেছেন, ঔচিত্য সকল রসের প্রাণ। কারণ রসের উৎস যে শিল্পবোধ, ঔচিত্য তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিজড়িত। ঔচিত্য কি? এর উত্তরে বলা যায় কাব্যে বিবিধ অলঙ্কারের সামঞ্জস্য বিধানই ঔচিত্য। অর্থাৎ আলঙ্কারিক বা শাব্দিক বা লক্ষণা-ব্যঞ্জনার উপযোগীতানুসারে প্রয়োগের যথাযোগ্যতাই বা যাথার্থতাই ওচিত্য। ইংরেজি Propriety-র সঙ্গে ঔচিত্যবাদের সম্পর্ক রয়েছে।

সু. মু.

ঔষধী গাছপালা : এস.কে. জৈন রচিত গ্রন্থ থেকে বাংলা অনুবাদ করেছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে বনৌষধির মাধ্যমে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা হত। প্রাচীনকালে এসব ওষুধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার কথা প্রচারিত হত কম, অন্যদিকে সাধু ও ফকিরদের হাতে চিকিৎসার সুফলই প্রচারিত হত বেশি। এখন উন্নত দেশগুলোও নিজেদের দেশজ গাছপালা নিয়ে গবেষণা করছে, নতুন নতুন ঔষধী গুণ তারা সেসব গাছপালায় খুঁজেও পাচ্ছেন। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে এসব গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। ড. এস.কে. জৈন একশটি ঔষধী গাছপালা নিয়ে এই বইতে আলোচনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন আকার-আকৃতি, প্রাপ্তিস্থান এবং ঔষধী গুণের কথা। সন্ধান দিয়েছে অনুরূপ অন্যান্য ঔষধী গাছপালারও। সচিত্র গ্রন্থ। প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া। বাংলায় প্রকাশকাল ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রস্তাবনা ও ভূমিকাসহ ১৭৮। মূল্য : ৩৯ রুপি।

বি. ব.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

[অনবধানতাবশত নিম্নলিখিত ভুক্তিসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়নি বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]

আকবর হোসেন : কথাশিল্পী। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর কেয়াগ্রামে ১৯১৭ সালের ১ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাজী আবদুল আলী বিশ্বাস ছিলেন একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিক, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ১৯৩৮ সালে আই.এ. এবং কলকাতা রিপন কলেজ থেকে ১৯৪১ সালে বি.এ. পাস করেন। অতঃপর কলকাতা সিভিল সাপ্লাই অফিসে ফুড ইন্সপেক্টর পদে চাকরি পান। দেশবিভাগের (১৯৪৭) পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন। ১৯৪৮ সালে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে অডিট অফিসার পদে যোগ দেন। ১৯৭৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। সমকালীন জীবনবোধ, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রেমের বিচিত্র রূপ তাঁর উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। অবাঞ্ছিত (১৯৫০), কি পাইনি (১৯৫১), মোহমুক্তি (১৯৫৩), টেডজাগে (১৯৬১), দুদিনের খেলাঘরে (১৯৬৫), মেঘ বিজলী বাদল (১৯৬৮), নতুন পৃথিবী (১৯৭৪) ইত্যাদি তাঁর পাঠকনন্দিত উপন্যাস। নূ. ই

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : সংগ্রাহক, সম্পাদক ও গবেষক। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে ১৮৭১ সালের ১১ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুনশী নুরউদ্দীন। ১৮৯৩ সালে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন। চট্টগ্রাম কলেজে দুই বছর এফ. এ. পড়েন। এফ. এ. পরীক্ষার পূর্বে সন্নিপাত রোগে আক্রান্ত হন। ফলে পরীক্ষা না দিয়ে কলেজের পাঠ ত্যাগ করেন। ১৮৯৫ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। একই বছর সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অস্থায়ী পদ গ্রহণ করেন। পরের বছর (১৮৯৬) চট্টগ্রাম সাব-জজ আদালতে শিক্ষানবিস পদে যোগ দেন। এ সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পূর্ণিমা' (১৩০২-১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' শীর্ষক এক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি পাঠ করে কবি নবীনচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন। তিনি চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি করতেন। নবীনচন্দ্র তাঁর অফিসে আবদুল করিমকে কেরানির পদে চাকরি দেন (১৮৯৮)। পুঁথি সংগ্রহের মানসে আবদুল করিম স্থানীয় 'জ্যোতি' পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন দেন। এ বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে তিনি চাকরিচ্যুত হন। কিছুদিন বেকার থাকার পর আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভ করেন (১৮৯৯)। ১৯০৬ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে দ্বিতীয় কেরানির পদে চাকরি পান। ১৯৩৪ সালে এপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩২৬), চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি (১৯১৮), কলকাতা মুসলিম সমিতির সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯৩৯), চট্টগ্রাম সংস্কৃতি

www.pathagar.com

সম্মেলনের মূল সভাপতি (১৯৫১) ও কুমিল্লা সংস্কৃতি সম্মেলনের মূল সভাপতি (১৯৫২) ছিলেন। প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও গবেষণায় অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার পুঁথি বাঙালি মুসলমান কর্তৃক রচিত। এককভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এতো পুঁথি সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাঁর এই সংগ্রহ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কোন সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তার পক্ষেই সম্ভব হতো না। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণামূলক রচনাবলীর অনেকাংশ তাঁর সংগৃহীত উপাদানের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩২০) 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' শিরোনামে তাঁর সংগৃহীত পুঁথির পরিচিতি প্রকাশিত হয়। পরে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। বাংলা প্রাচীন পুঁথির উপর অন্য লেখকদের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'ই (১৩২১) অধিকতর সমৃদ্ধ ও আদর্শস্থানীয়। আবদুল করিমের সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরের 'রাধিকার মানভঙ্গ', কবি বল্লভের 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ', রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সম্বাদ', দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল', আলী রাজার 'জ্ঞানসাগর', বাসুদেব ঘোষের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস', মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল', শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী' (খণ্ডাংশ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। পুঁথি সংগ্রহ, সম্পাদনা ও তার পরিচিতি রচনার পাশাপাশি দেশ–কাল–সমাজ–ভাষা–শিক্ষা–সাহিত্য–সংস্কৃতি–রাজনীতি–ইতিহাস ইত্যাদি নানামুখী চিন্তা–চেতনামূলক অজস্র মৌলিক প্রবন্ধও রচনা করেছেন। 'ইসলামাবাদ' (চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস) ও 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগিতায় রচিত) তাঁর দুইটি মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। 'পুঁথি পরিচিতি' (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তা–চেতনায় বিশ্বাসী একজন মনীষী। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ ও মমত্ববোধ। পাকিস্তানের ভাষা বিতর্কে বাংলা ভাষার পক্ষে মত প্রকাস করেন। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার দাবি জানান। তাঁর সংগৃহীত বিপুল পুঁথি সম্পদের মুসলিম পুঁথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ও হিন্দু পুঁথিগুলো রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়ামকে তিনি দান করে গেছেন। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁকে 'সাহিত্যবিশারদ' (১৯২০) উপাধি এবং গবেষণাকর্মে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার 'স্বাধীনতা পদক' (মরণোত্তর ১৯৯৫) প্রদান করে। মৃত্যু. সুচক্রদণ্ডী, চট্টগ্রাম, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩। নূ. ই

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : কবি, প্রাবন্ধিক ও সংগঠক। ১৯৪০ সালের ২৫ জুলাই কলকাতার পার্ক সার্কাসে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার কচুয়ার কামারগতি গ্রামে। তাঁর পিতা আজীমউদ্দীন ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার। পাবনা জিলা স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে মাধ্যমিক, বাগেরহাটের প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে স্নাতক সম্মান (বাংলা) ও ১৯৬১ সালে স্নাতকোত্তর (বাংলা) ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর অধ্যাপনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৪–১৯৮৩) সম্পাদনা তাঁর জীবনের এক অনন্যসাধারণ কীর্তি। এ সাময়িকীটিকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় এক নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রগতি, সাম্য, তারুণ্য, মানবতা ও শ্রেয়োবোধ প্রতিষ্ঠাই কণ্ঠস্বরের মূল আদর্শ ছিলো। ঢাকায় 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' (১৯৭৮) প্রতিষ্ঠা তাঁর

www.pathagar.com

আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে 'আলোকিত মানুষ' তৈরির আন্দোলনে নেতৃত্ব করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮৬) ; উত্তর প্রজন্ম (১৯৯২)। জার্নাল : বিস্রস্ত জার্নাল (১৯৯৩) ; আমার অনুভূতিতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র (১৯৯৩)। কবিতা : মৃত্যুময় ও চিরহরিৎ (১৯৮৮)। গল্প : রোদনরূপসী (১৯৯৬)। নাটক : যুদ্ধযাত্রা (১৯৯৭)। স্মৃতিচারণ : বিদায় অবন্তী (১৯৯৫)। অনুবাদ : শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস (১৯৯২) ; দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (১৯৬৯)। সম্পাদনা : এক দশকের কবিতা (১৯৯৫) ; সাম্প্রতিক ধারার গল্প (১৯৮৪) ; সাম্প্রতি ধারার কবিতা (১৯৭৬) ; সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ (১৯৭৬) ; সুকান্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৫) ; মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা (১৯৯০) ; খান মোহাম্মদ ফারাবী : কবিতা ও অন্যান্য (১৯৭৬) ; লুৎফর রহমান রিটন : সেরা কিশোর কবিতা (১৯৯৬) ; আবদুশ শাকুর : সেরা রম্যরচনা (১৯৯৭) ; শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯২)। পুরস্কার : জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (১৯৭৭)। সমাজ-নিরীক্ষা ও সাহিত্য বিচারের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রগুলো স্ব স্ব মহিমায় স্বতন্ত্র। সা. আ.

আবু ইসহাক : কথাসাহিত্যিক। শরিয়তপুর জেলার শিরঙ্গল গ্রামে ১৯২৬ সালের ১ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ ইবাদুল্লাহ। স্থানীয় উপসী তারাপ্রসন্ন হাই স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক ও ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে আই.এ. পাস করেন। করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনে সিভিল সাপ্লাই, পুলিশ বিভাগ ও বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিসে চাকরি করেন। খুলনা বিভাগের এন. এস. আই-এর ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে ১৯৮৪ সালে অবসরগ্রহণ করেন। আবু ইসহাক 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাস লিখে বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রাম-বাংলার নিরক্ষর খেটে-খাওয়া দরিদ্র মানুষের জীবনালেখ্য এই উপন্যাসে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। ছোটগল্পেরও তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পী। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। তাঁর ভাষাশৈলী নিরাভরণ হলেও শিল্পসম্মত। প্রকাশিত গ্রন্থ—উপন্যাস : 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫), 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬), 'জাল' (১৯৮৮); গল্প : 'হারেম' (১৯৬২), 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩); সম্পাদনা (অভিধান) : 'বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান' (স্বরবর্ণ অংশ ১৯৯৩, ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ ক–ঞ, ১৯৯৮)। সাহিত্যকৃতির জন্য ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৯৭ সালে একুশে পদক লাভ করেন। নূ. ই.

আবুল ফজল : সাহিত্যিক। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার কেঁওচিয়া গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলিম ধর্মীয় পরিবারে ১৯০৩–এর ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলবী ফজলুল রহমান ছিলেন চট্টগ্রাম জুমা মসজিদের ঈমাম। চট্টগ্রাম মাদ্রাসা থেকে ১৯২৩–এ ম্যাট্রিক, ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯২৫–এ আই.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮–এ বি.এ. এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯৩১–এ বি.টি. পাস করেন। ১৯৪০–এ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল-শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। চট্টগ্রাম কাজেম আলী হাইস্কুল, সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা, খুলনা জেলা স্কুল ও চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন (১৯৩২–১৯৪০)। ১৯৪১–এ কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলার লেকচারার পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৬–এ চট্টগ্রাম কলেজে বদলি হন। ১৯৫৬–তে প্রফেসর পদে প্রমোশন পান। ১৯৫৯–এ অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৩–এর ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্তি হন। ১৯৭৫-এর ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরের দিন ২৬ নভেম্বর (১৯৭৫) রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য পদে যোগ দেন। মন্ত্রীর পদমর্যাদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭-এর ২৩ জুন এই পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র (১৯২৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'মুক্তবুদ্ধির চর্চা' সাহিত্য সমাজ তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। সমিতির বক্তব্য ছিল : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' সমাজের একজন অন্যতম কর্ণধার হিসেবে আবুল ফজল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের মুখপত্র বার্ষিক 'শিখা'র (১৯২৭) ৫ম সংখ্যা (১৯৩১) তিনি সম্পাদনা করেন। সমাজ ও সমকাল সচেতন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। কথাশিল্পী হিসেবেও তাঁর সুনাম রয়েছে। স্বদেশপ্রীতি, আধুনিক অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যানুসন্ধান, মানবতা ও কল্যাণবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের মর্মকথা। তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ—প্রবন্ধ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), মানবতন্ত্র (১৩৭৯), সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৪), শুভবুদ্ধি (১৯৭৪), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯) ; উপন্যাস : চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৩৪৭), রাঙ্গা প্রভাত (১৩৬৪) ; গল্প : মাটির পৃথিবী (১৩৪৭), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৭১), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮) ; নাটক : কায়েদে আজম (১৯৪৬), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বরা (১৯৬৬) ; স্মৃতিকথা : রেখাচিত্র (১৯৬৫), লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২), শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৮) ; জীবনী : সাংবাদিক মুজিবর রহমান (১৯৭০)। ১৯৬২-তে উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৩-তে প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও ১৯৬৬-তে রেখাচিত্র গ্রন্থের জন্য আদমজি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৪ মে ১৯৮৩। **নূ. ই**

আরো দুটি মৃত্যু : হাসান হাফিজুর রহমান। বইটি প্রকাশ করেছে লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭০। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন মানবতা, মানব হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও সমাজ বাস্তবতার বৈচিত্র্য নিয়ে লেখা আরো দু'টি মৃত্যু, মানুষের মন, ছায়াহীন পক্ষ্মহীন পলকহীন, অপমৃত্যু, মাছ, বৌ, মানিকজোড়, অনুতপ্ত পিতা, ইচ্ছার দেয়াল, পাখি। প্রথমেই রয়েছে নাম গল্প 'আরো দু'টি মৃত্যু'। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভীতিসঙ্কুল পটভূমিতে বিন্যস্ত হয়েছে কাহিনীটি। আসন্ন প্রসবা এক নারী অসুরের তত্ত্বাবধানে দাঙ্গা-আক্রান্ত এলাকা ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে। সেখানেই প্রসববেদনা উঠলে তার নিরুপায় স্বজনের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না। মৃত্যুতাড়িত এই মানবী গর্ভের সন্তানসহ মৃত্যুরই কোলে ঢলে পড়ে চলমান ট্রেনে। 'মানুষের মন' গল্পে পরিস্থিতির তারতম্যে অভিন্ন মানুষের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। 'ছায়াহীন পক্ষ্মহীন পলকহীন' গল্পে এক সচেতন নারী-অস্তিত্বের আত্ম-বিশ্লেষণের বিভিন্ন রূপ উন্মোচিত। অপমৃত্যু গল্পের মূল চরিত্র অতিস্পর্শকাতর একগুঁয়ে প্রৌঢ় জলিচাচা বিচিত্র মানবচরিত্রের প্রতিরূপ। মাছ, বৌ, মানিকজোড়, অনুতপ্ত পিতা ইত্যাদি গল্পের উপজীব্য বিষয় দরিদ্র মানুষের দুর্ভাগ্য পীড়িত জীবন, অপূর্ণ বাসনা ও অমোঘ নিয়তি। প্রতিটি গল্পেই একটি স্বাভাবিক বাস্তব প্রেক্ষাপটে লেখক উন্মোচিত করেছেন জীবনের গূঢ় বিশিষ্টতাকে। গল্পের চরিত্রগুলোর শ্রেণীগত অবস্থান অনুযায়ী সংলাপের ভাষা মানানসই। বইয়ের প্রতিটি গল্পই বিষয়বস্তুর গভীরতায় গুরুত্বপূর্ণ, উপস্থাপন রীতির দক্ষতায় রসোত্তীর্ণ। **র. আ. ক.**

আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ : সঙ্গীত কলাকার। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুরে ১৮৬২ (আনুমানিক) সালে জন্মগ্রহণ করেন। বড় ভাই ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁর কাছে তাঁর সঙ্গীতে হাতেখড়ি। গ্রামের পাঠশালার পাঠ ত্যাগ করে সুরের সন্ধানে কিশোর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে যাত্রাদলের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। অতঃপর কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে কেদারনাথ নামক এক ডাক্তারের সহায়তায় প্রখ্যাত সঙ্গীত-সাধক নুলো গোপাল (গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য)-এর শিষ্যত্ব লাভ করেন। বারো বছর ক্রমাগত সরগম সাধনার অঙ্গীকারের বিনিময়ে নুলো গোপাল তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। সাত বছর পর প্লেগ রোগে নুলো গোপালের মৃত্যু হলে কণ্ঠ-সঙ্গীত ছেড়ে যন্ত্র-সঙ্গীতের সাধনায় নিমগ্ন হন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই স্টার থিয়েটারের সঙ্গীত পরিচালক হাবু দত্তের (অমৃতলাল দত্ত) কাছে বাঁশি, পিক্‌লু, সেতার, ম্যান্ডোলিন, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। গোয়ানিজ ব্যান্ড-মাস্টার লবো সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে এবং অমর দাসের কাছে দেশি পদ্ধতিতে বেহালা বাজানো শেখেন। লবো সাহেবের স্ত্রীর কাছ থেকে 'স্টাফ নোটেশন' দেখে বাজনা বাজাতে পারদর্শিতা লাভ করেন। হাজারী ওস্তাদের কাছে সানাই, নাকাড়া, টিকারা যন্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। এভাবে একজন সর্ববাদ্যবিশারদ হয়ে ওঠেন। কিছুদিন মিনার্ভা থিয়েটারে তবলাবাদকের চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। পরে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার রাজা জগৎ কিশোরের দরবারে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। সেখানে ওস্তাদ আহমদ আলী খাঁর কাছে সরোদ বাদ্যযন্ত্রে তালিম গ্রহণ করেন। পরে তানসেন বংশীয় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর কাছে সরোদবাদন শেখার জন্য রামপুরে যাত্রা করেন। ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ রামপুরের নবাব হামেদ আলী খাঁর শিক্ষাগুরু ও দরবার-সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর দর্শনলাভ খুব সহজ ছিলো না। একদিন নবাবের চলন্ত গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নবাবের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হন এবং নবাবের অনুগ্রহে ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেন। গুরুর কাছে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর 'সেনী ঘরানার' অত্যন্ত দুরূহ এবং সূক্ষ্ম সঙ্গীত কলাকৌশল শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৮-তে নবাব-কর্তৃক মধ্যপ্রদেশের মাইহার রাজ্যে প্রেরিত হন। মাইহার রাজ্যের নবাবের সঙ্গীতগুরু নিযুক্ত হন। তারপর থেকে মাইহারে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। উপমহাদেশের রাগসঙ্গীতকে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যে পরিচিত করার অগ্রপথিক তিনি। সরোদে 'দিরি দিরি' সুরক্ষেপণের পরিবর্তে 'দারা দারা' সুরক্ষেপণ প্রয়োগ চালু করেন। এ ধরনের সুরক্ষেপণ পূর্বে অপ্রচলিত ছিলো। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'খাঁ সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫২-তে ভারতের সঙ্গীত আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৮-তে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ', ১৯৬১-তে বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' এবং ১৯৭১-এ ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। দিল্লী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত হন। শান্তিনিকেতনে 'আমন্ত্রিত অধ্যাপক' হিসেবে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। উপমহাদেশের কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবনের পরামর্শদাতা। তাঁর উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত পদ্ধতি 'আলাউদ্দিন ঘরানা' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ হেমন্ত, দুর্গেশ্বরী, মেঘ-বাহার, প্রভাতকেলী, হেম-বেহাগ, মদনমঞ্জরী (মদিনামঞ্জরী), আরাধনা ইত্যাদি রাগ-রাগিণীর স্রষ্টা। তিনি 'মদিনা ভবন', মাইহারে ১৯৭২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। **নু. ই**

আশরাফ সিদ্দিকী : গবেষক, কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার। টাঙ্গাইল জেলার নাগরবাড়ি নামক স্থানে ১৯২৭ সালের ১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবদুস সাত্তার সিদ্দিকী। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১৯৪২সালে ম্যাট্রিক, বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৪৫ সালে আই.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে বি.এ. অনার্স (বাংলা) ও ১৯৪৯ সালে এম.এ. (বাংলা) পাস করেন। 'বেঙ্গুলি ফোকলোর ডিউরিং দি ব্রিটিশ

www.pathagar.com

পিরিয়ড' (১৮০০-১৯৪৭) শীর্ষক গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনা করে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি পান। তিনি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক (১৯৭৬-১৯৮২) ও ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৮২-১৯৮৫) ছিলেন। ১৯৮৫ সালে কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণ করেন। আশরাফ সিদ্দিকী আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত একজন লোকবিজ্ঞানী। ফোকলোর ও লোক-সংস্কৃতির সংগ্রহ, গবেষণা ও বিশ্লেষণে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। কবিতা, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য ও স্মৃতিকথা রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। আবহমান বাংলার সুখ-দুঃখে গড়া ঐতিহ্য তিনি তাঁর এসব লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখাগুলো সমকালীন সমাজের এক রসজ্ঞ চিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ-গবেষণা—লোকসাহিত্য (১৯৬৪), কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫), শুভ নববর্ষ (১৯৭৭), লোকায়ত বাংলা (১৯৭৮), আবহমান বাংলা (১৯৮৭) ; গল্প—রাবেয়া আপা (১৯৫৬), কাগজের নৌকা (১৯৬২), গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১), শেষ নালিশ (১৯৯২) ; উপন্যাস—শেষ কথা কে বলবে (১৯৮০), আরশিনগর (১৯৮৮), গুণীন (১৯৮৯) ; কবিতা -তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০), সাত ভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), উত্তর আকাশের তারা (১৯৫৮), তিরিশ বসন্তের ফুল (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৭৫), ঝড় তুফানে (১ম পর্ব ১৯৮১, ২য় পর্ব ১৯৯০), দাঁড়াও পথিক বর (১৯৯০) ; শিশুতোষ—সিংহের মামা ভোম্বল দাস (১৯৬৩), আমার দেশের রূপকাহিনী (১৯৬৪), বাণিজ্যেতে যাবো আমি (১৯৭৮), বাংলাদেশের রূপকথা (১৯৯১), রূপকথার রাজ্যে (১৯৯৩) ; স্মৃতিকথা--রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন (১৯৭৪), যা দেখেছি যা পেয়েছি (১৯৭৬), স্মৃতির আয়নায় (১ম—৫ম খণ্ড ১৯৮৬), শান্তিনিকেতনের পত্র (১৯৭৫—১৯৯৭)। ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৫ সালে দাউদ পুরস্কার, ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার ও ১৯৮৮ সালে একুশে পদক লাভ করেন। নূ. ই

ঈশ্বর : সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। তিনিই ব্রহ্ম। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর স্বয়ম্ভু ও অবিনশ্বর। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি জগতের বিধান, আধার ও আশ্রয়। সর্বকর্মের ফলদাতা। ঈশ্বর সর্বভূতে, সর্ব অণুতে পরমাণুতে বিদ্যমান। তিনি অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্ঞানময়, গুণময়, রসময়, কল্যাণময়, করুণাময়, আনন্দময়, জ্যোতির্ময়, পরমপবিত্র ও পরমগুরু। তিনি পরমাত্মা ও অন্তর্যামী, অনন্ত তাঁর রূপ। ঈশ্বরের সত্তায়ই সবকিছুর অস্তিত্ব, তাঁর সৌন্দর্যেই সবকিছু সুন্দর। তাঁর থেকেই জীব ও নিখিল ভুবনের সৃষ্টি, তাঁতে জগৎ অবস্থিত, তাঁতেই জগৎ লীন। জীবের আত্মারূপে ঈশ্বর জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি নিজের আলোতে নিজে প্রকাশিত হন, একই সাথে অপরকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু তিনি যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মরক্ষার জন্য তিনি নানারূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অবতরণ করেন বলে তাঁকে অবতার বলা হয়। তিনি যখন অবতার রূপে আসেন তখন মানুষ তাঁকে অবলোকন করে। কৃষ্ণ, বামন, নরসিংহ, রাম প্রমুখ ঈশ্বরের অবতার। ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে মহামায়া বা প্রকৃতির মধ্যে। দেবতারা ঈশ্বরের শক্তির সাকার রূপ। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ঈশ্বরের মধ্যে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি ভগ বা গুণ আছে বলে তিনি ভগবান। নূ. ই

উইলিয়াম কেরী : মিশনারি ও বাংলায় গদ্যপাঠ্য পুস্তকের প্রণেতা। ১৭৬১ সালের ১৭ আগস্ট ইংল্যান্ডের নর্দানটনশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টমাস জোনসের কাছ থেকে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শেখেন এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ১৭৯৩-তে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। কলকাতায় এসে রামরাম বসুকে মুনশির পদে নিযুক্ত এবং বাংলা শেখেন। ১৭৯৪-তে মালদহের মদনবাটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

এখানে আসার পরই স্থানীয় কৃষক প্রজাদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৯৭-তে বই ছাপার উদ্দেশ্যে দেশি হরফ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়েই চার্লস উইলকিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নীলকুঠি বন্ধ হয়ে গেলে কুঠির মালিক উডনির কাছ থেকে খিদিরপুর গ্রাম ক্রয় করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শ্যার্লম্যান, ওয়ার্ড, গ্রান্ট প্রমুখ মিশনারি ১৭৯৯-র শেষের দিকে শ্রীরামপুর এলে খিদিরপুরের সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং ১৮০০-র জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প কিছুদিন পরেই পঞ্চানন কর্মকারেরও মিশন প্রেসে যোগদান করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮০০-র ১৮ মার্চ 'ম্যাথু রচিত সমাচার'-এর প্রথম পাতাটি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয়। ঐ বছরেরই আগস্ট মাসে 'মিশন সমাচার' মুদ্রিত হয়। এটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ। ১৮০১-এর মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এখানে ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেন। ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করবার জন্য নিজেকে পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর অধীনস্থ পণ্ডিতদেরকেও এই কাজে উৎসাহ যোগান। কথোপকথন (১৮০১) ও ইতিহাসমালা (১৮১২) গ্রন্থদ্বয় তাঁর নিজস্ব রচনা। তাঁর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর থেকে প্রায় ৪০টি ভাষা ও উপভাষায় খ্রিস্টধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মারাঠা (১৮০৫), সংস্কৃত (১৮০৬), পাঞ্জাবী (১৮১২) ও তেলিঙ্গা (১৮১৪) ভাষায় ব্যাকরণ রচনা এবং মারাঠা (১৮১৮), বাংলা (১৮১৮) ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অভিধান সংকলন করেন। রামায়ণ সম্পাদনা করেন (১৮০৬-১৮১০)। বাংলা হরফের সংস্কার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হরফ তৈরি এবং এ-দেশীয় কৃষ্টি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্যে অমর হয়ে থাকবেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। এটি ১৮২৩-এ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ১৮২৪-এ সোসাইটির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং সরকারি অনুবাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : নিউ টেস্টামেন্ট, বাংলা ব্যাকরণ, ওল্ড টেস্টামেন্ট, কথোপকথন, ইতিহাসমালা, বাংলা-ইংরেজি অভিধান। উইলিয়াম কেরীর মূল পেশা ছিলো পাদুকা নির্মাণ। ভিন্ন পেশার এবং ভিন্ন ভাষার লোক হয়েও তিনি বাংলা ভাষায় যে দক্ষতা অর্জন করেন তা অসাধারণ। গদ্য পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক হিসেবে বাংলা গদ্যের বিকাশধারার ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয়। মৃত্যু : ১৮৩৪ সালের ৯ই জুন। সা. আ.

উপনিষদ : বেদের দুটি কাণ্ড—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর, জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ ইত্যাদি দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্ত্বকথা উপনিষদের প্রতিপাদ্য। বেদের শেষ ভাগ আর বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম পর্যায়ের বলে উপনিষদের আরেক নাম বেদান্ত। প্রধান উপনিষদ বারটি। সেগুলো হলো : ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, মৈত্রী, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য। মা. আ.

এস. ওয়াজেদ আলী : সাহিত্যিক। হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বড়তাজপুর গ্রামে ১৮৯০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ বেলায়েত আলী ছিলেন শিলং (আসাম)-এর একজন ব্যবসায়ী। শিলং মোখার হাইস্কুল থেকে ১৯০৬-এ এন্ট্রান্স, আলীগড় কলেজ থেক ১৯০৮-এ আই.এ. এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১০-এ বি.এ. পাস করেন। ১৯১২-তে আইন অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ড যান। ১৯১৫-তে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ও বার-এট্-ল ডিগ্রি লাভের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯২৩-এ কলকাতা

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং অবসর গ্রহণের (১৯৪৫) পূর্ব পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা গুলিস্তাঁ (১৩৩২) প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এস. ওয়াজেদ আলী ছিলেন খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও গল্পকার এবং বিশিষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ—জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালী (১৯৪৩), আকবরের রাষ্ট্রসাধনা (১৯৪৯), মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, ইসলামের পয়গাম। গল্প—গুলদাস্তা (১৯২৭), মাশুকের দরবার (১৯৩০), দরবেশের দোয়া (১৯৩১), বাদশাহী গল্প (১৯৪৪), গল্পের মজলিস (১৯৪৪), ভাঙ্গাবাঁশী। ভ্রমণ কাহিনী—মোটরযোগে রাঁচির সফর (১৯৪৯), পশ্চিম ভারত (১৩৫৫)। ঐতিহাসিক উপন্যাস—গ্রানাডার শেষ বীর (১৯৪০)। সত্য ও সুন্দরের সাধনায়, নীতিজ্ঞান, ধর্মবোধ ও প্রেমের শাশ্বত মহিমায়, মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন রসবোধে তাঁর সাহিত্যকর্ম সমৃদ্ধ। মৃত্যু : কলকাতা, ১০ জুন ১৯৫১। নূ. ই

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রতিনিধিত্বশীল কোষগ্রন্থ। এর ব্যাপ্তি আদিকাল থেকে আধুনিক কালের ২০০০ সাল পর্যন্ত।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যে সব বাঙালি লেখকের জন্ম তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থ ও উল্লেখযোগ্য রচনার পরিচিতি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যে সব দেশি ও বিদেশি মনীষীর জীবন ও কর্ম বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের পরিচিতিও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাহিত্য, ধর্ম, দার্শনিক তত্ত্ব; পৌরাণিক চরিত্র; সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ের পরিচিতিও উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রতিটি ভুক্তির শেষে সংকলকদের নাম সংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com